[দ্বিতীয় খণ্ড]

গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদক ঃ

দীপক চন্দ্র * মনীষী বসু * ময়ূখ বসু

ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী ঃ

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৫৯

প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৭৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি. ১৯৭৮

নতুন মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ, ১৩৯১

প্রকাশক ঃ ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম পর্ব

আমার পিতৃদেব

রামলাল বসুর

পুণ্য স্মৃতিতে

এত শৈশবে তাঁকে হারিয়েছি যে চেহারাই মনে করতে পারিনে।
তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যেই পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছি।

প্রথম পর্ব

এক

গায়ের উপর মৃদু স্পর্শ। বাহুর উপর, বাহু থেকে গলায়, তারপর কোমরের দিকটায়। জানি গো জানি—তোমার হাতের আঙুল। চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সরীসৃপের মতন।

ঘুমের মধ্যে আশালতার মুখে হাসি খেলে যায়। সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঝিমিয়ে আসে আরও যেন চেতনা। হাত একটা বাড়িয়ে দেয় পুরুষের দিকে, কাছে টেনে আনে। একেবারে কাছে। হবে এই রকম, সাহেব তা জানে। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

নাম হল গণেশ, সাহেব-সাহেব করে সকলে। আরও পরে অঞ্চলময় এই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল, সকলের আতঙ্ক—সাহেব চোর।

হাতের বেষ্টনে আশালতা কঠিন করে বেঁধেছে। যুবতী মেয়ের দেহের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে সাহেব। মেয়েমানুষের কোমল অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ নয়—কাঠ এক-টুকরো। অথবা খুব বেশি তো তুলোর পাশবালিশ একটা। এ-ও নিয়ম। নিঃসাড় হয়ে খানিক পড়ে থেকে ভাব বুঝে নেবে। তারপরে কাজ।

ঘর অন্ধকার। যত অন্ধকার, তত এরা ভাল দেখে; চোখ জ্বলে যেন বিড়ালের মতো, সময়বিশেষে বন্য বাঘের মতো। মেয়েটা কালো কি ফর্সা ধরা যায় না, কিন্তু ভরভরন্ত যৌবন। নিশিরাত্রে বিশাল খাটের গদির বিছানায় যৌবনে যেন ঢেউ দিয়েছে, দেহ ছাপিয়ে যৌবন উছলে পড়ে যায়। কিন্তু এ-সবে গরজ নেই কিছু। কোমরে সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে, যতটা দেখা যায় দুরকম—একালের নেকলেশ, সেকালের কণ্ঠমালা। বেশিও থাকতে পারে। হাতে কঙ্কণ, বাহুতে অনন্ত, কানে কানপাশা। হাত বুলিয়ে দেখে নিয়েছে সাহেব, হাতের স্পর্শে ওজনেরও মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছে। দিব্যি ভারী জিনিস। হবেই —নবগ্রামের সেন-বাড়ির বউ যে। সেনেরা পুরনো গৃহস্থ, টাকাকড়ির বড় দেমাক। সেই বাড়ির শঙ্করানন্দ সেনের সঙ্গে আশালতার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। খুঁজিয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে, অতিশয় পাকা লোক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তার খবরে ভুল থাকে না।

দোজপক্ষের বর শঙ্করানন্দ—বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল। কন্যাপক্ষের জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও আত্মীয়-স্বজনরা দোমনা হলেন, শুভকর্মে টালবাহানা হল খানিকটা। কিন্তু মিথ্যা রটনা, দুটো-পাঁচটার বেশি বরের মাথায় চুল পাকে নি। হিংসা করে লোকে বুড়ো বুড়ো করছিল। বিয়ের পরে এবার সেনরা তার

শোধ তুললেন। নতুন বউকে পাঠিয়েছেন। মেয়ের সুখ দেখুক সেই হিংসুকেরা, দেখে জ্বলে পুড়ে মরুক।

হয়েছে ঠিক তাই। আশালতা বাপের বাড়ি পা দিতে খবর হয়ে গেল। বউ-মেয়েরা ভেঙে এসে পড়ে। তাকে দেখতে নয়—পাড়ার মেয়ে চিরকালই দেখে আসছে, নতুন করে কি দেখবে আবার। দেখছে গয়না। হাতের গয়না, কানের গয়না, সিঁথির গয়না, খোঁপার গয়না, গলার গয়না, কোমরের গয়না, পায়ের গয়না—দেখে সব হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নিজে দেখে, অন্যকে দেখায়। মুখ সিঁটকায়ঃ ওমা, সেকেলে প্যাটার্ন, ঠাকুরমা-দিদিমারা পরতেন, আজকাল কেউ পরে না এ জিনিস। আবার তারিফও করছেঃ সে যাই হোক, মালে আছে কিন্তু। আজকালকার ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

বলছে হেসে হেসে বটে, মনের মধ্যে বিষের জ্বালা। মেয়েটা সেদিন সাদামাটা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি গেল, আজ দুপুরে রাজরাজেশ্বরী হয়ে ফিরেছে, দেখ। সারা বিকাল পাড়াশুদ্ধ আনাগোনা, রাত্রি হয়ে গেল তখন অবধি চলছে। এরই মধ্যে এক গণকঠাকুর এসে গেছেন বাড়িতে—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। অতি মহাশয় ব্যক্তি তিনি। এই তল্লাটে ঘুরছেন ক'দিন। আজ সকালে গাঁয়ের ঘাটে এসেছেন। আশা-লতার হাত দেখে আশীর্বাদ করে গেছেনঃ বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুখ-সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না তোমার মা, কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ। আশীর্বাদ করে যথারীতি প্রণামী নিয়ে গেছেন। তাঁর যা করণীয়, সন্ধ্যার আগে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

রাত দুপুরে এইবার সাহেবদের কাজ। ডেপুটি অপেক্ষা করছে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। আরও দূরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সতর্ক পাহারাদার। আজ রাত্রের কারখানার কারিগর সাহেব। কিন্তু খাটের উপর আশালতার কঠিন বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে আছে। তবু তো দেখেনি মেয়েটা, কী রূপ ধরে এই পুরুষ। ফর্সা ধবধবে দেহবর্ণের জন্য নাম হয়ে গেল সাহেব। সায়েব একেবারে মড়া হয়ে পড়ে আছে—নিঃশ্বাসটাও পড়ে কি না পড়ে। অজগর সাপে পেঁচিয়ে ধরেছে যেন। অজগরের কবল থেকে এমনি কায়দায় বাঁচতে হয়—জোরজারি করতে গেলে উল্টো ফল ছোবল দেয়।

সত্যি সত্যি ঘটেছিল তাই এক নিশিরাত্রে। সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে। ফুলহাটা গাঁয়ে সেকালের নীলকর সাহেবদের শৈবালাচ্ছন্ন বিশাল দীঘি। ছিপে বেঙ গেঁথে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে সাহেব জলের উপর নাচাচ্ছে। পায়ের উপর এমনি সময় ঠান্ডা স্পর্শ। এই জঙ্গলে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে, সীমাসংখ্যা নেই। তাদের একটি নিঃসন্দেহে। সায়েব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একবিন্দু নড়চড়া করে না। দুখানা পায়ের পাতার উপর দিয়ে সাপ ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে গেল গাছের শিকড় বা অমনি একটা কিছু ভেবে। চলে গেছে, তখনও সাহেব অচল অনড়। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জায়গা থেকে সরে এল। আজকেও অবিকল তাই।

উঁহু তার বেশি। সাপের চেয়ে যুবতী মেয়েমানুষের কবল বেশি শক্ত। শুধু

চুপচাপ থেকে হবে না, আলতো ভাবে আঙুল বুলোতে হবে গায়ে—আদর-সোহাগ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাঁচটা আঙুলের ডগা বেয়ে। এবং মুখে নিদালি-বিড়ি—প্রয়োজন মতো ধোঁয়া ছাড়বে। চুপিসারে এরই মধ্যে কাজ চলেছে। শিকার বল কিম্বা মক্কেল বল সে মেয়ে ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে না—নিজেকে এলিয়ে দিয়ে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে কাজের। জোঁক ধরলে যেমন হয়—দু-মুখ দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে, সে কি টের পায়? সুড়সুড় করছে ক্ষতস্থানে, আরাম লাগছে। হাত দুটো জোঁকের দুই মুখের মতন হতে হবে, ওস্তাদ বলে দিয়েছে।

দুটো হাতই ব্যস্ত এখন সায়েবের। বাঁ-হাতটা আদর বুলাচ্ছে, ডান হাতের ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ইতিমধ্যে নেকলেশ, চন্দ্রহার, কঙ্কণ একটা একটা করে খুলে সরিয়ে নিল। গা খালি হয়ে গেল—কিছুই টের পায় না মেয়ে, আবেশে চোখ বুজে আছে। হাতের এমনিধারা মিহি কাজ। শুধু সাহেবই পারে, আর পারতেন বোধহয় সেকালের মুরুব্বিদের কেউ কেউ। আজকাল ওসব নেই, কষ্ট করে কেউ কিছু শিখতে চায় না। নজর খাটো—সামনের মাথায় ক্ষুদকুড়ো যা পেল কুড়িয়েবাড়িয়ে অবসর। কাজেরও তাই ইজ্জত থাকে না—বলে, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি। সেকালে ছিল—চোর মানেই চতুর, চুরি হল চাতুরী।

চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা—বড় নাম এমনি হয় নি। অতিশয় কঠিন বিদ্যা। এ লাইনে দিকপাল হতে হলে ওস্তাদের কাছে রীতিমত পাঠ নিতে হত। পরীক্ষা দিতে হত। সাদা কাগজে খানিকটা কালির আঁকজোক কেটে বি-এ এম-এ-র মতো পরীক্ষা নয়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটা—পরীক্ষায় পাশ করে তবে তার 'বাইটা' খেতাব। সে যে কী ভীষণ পরীক্ষা—কিন্তু থাক এখন, ওস্তাদের মুখেই শোনা যাবে যথাসময়ে। এবং সাহেবকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হল ঐ বাইটা মশায়ের কাছে—।

সাহেব নিঃসাড়ে পড়ে আছে। কাজ চুকেছে, নড়াচড়ার জো নেই। সেই মাছ ধরতে গিয়ে সাপ পায়ে ওঠার অবস্থা। যতক্ষণ না যুবতী নিজের ইচ্ছায় বাহুর বাঁধন খুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ পড়ে থাকবে এমনি। হল তাই—একসময় হতেই হবে—হাত সরিয়ে নিয়ে আশালতা নড়েচড়ে ভাল করে শুল। সুড়ুৎ করে সাহেব উঠে পড়ে তখনি। দুয়োরের খিল খুলে রেখে দিয়েছে, টিপিটিপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধীরেসুস্থে সমস্ত, তাড়াহুড়োর কিছু নয়। বেরিয়ে পড়ে এক লহমার মধ্যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

যুবতী আবেশে বিহ্বল। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কথা ফুটল এইবার। ফিসফিসিয়ে বলে, ঘুমুলে? চোখ মেলল। ধ্বক করে অমনি মনে পড়ে যায়, শ্বশুরবাড়ি কোথা—এ যে বাপের বাড়ি। একে একে সমস্ত মনে পড়েঃ নবগ্রাম থেকে আজ দুপুরে বাপের বাড়ি জুড়নপুর চলে এসেছে। শঙ্করানন্দ তাকে জুড়নপুরের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সেই পানসিতে খুলনা সদর চলে গেল। সম্পত্তিঘটিত জরুরি মামলা সেখানে। কাল নিশিরাত্রে কথা কাটাকাটি এই নিয়ে। আশালতা বলেছিল, যেও না, অসুখ হয়েছে বলে মামলার সময় নাও। শেষটা ফোঁস করে

নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল, বর অশেষ রকমে চেষ্টা করেও সে মান ভাঙ্গাতে পারে নি। তার পরে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কিছু সে জানে না। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠেই রওনা হবার তোড়জোড়। শঙ্করানন্দ বলে গেছে, বাড়ি ফেরবার মুখে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে নামবে একবার, নেমে একটা দিন অন্তত থেকে দেখেশুনে যাবে। তার এখনো ছ-সাত দিন দেরি। অভ্যাসে আশালতা কিনা আজ রাত্রেই ভিন্ন এক পুরুষকে সেই মানুষ ভেবে—ছি-ছি-ছি!

ছি-ছি করে জিভ কাটে। সত্যি সত্যি ঘটেছে, অথবা ঘুমের ভিতর আজব স্বপ্ন একটা? উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি আশালতা আলো জ্বালে। দক্ষিণের পোতার ঘরে ছোটবোন শান্তিলতাকে নিয়ে শুয়েছে। বড় খাটের শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে শান্তি ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে—এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু জানে না। খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে! কেমন একটা গন্ধ গন্ধ ঘরের মধ্যে—অতি মধুর। আর দেখে, জানলার ঠিক নিচে সিঁধ।

চোর, চোর! চোর এসেছে—

আচমকা চেঁচামেচিতে শান্তিলতা ধড়মড়িয়ে উঠে দিদিকে জড়িয়ে ধরে। থরথর কাঁপছে, বুক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বাড়িসুদ্ধ তোলপাড়। বড়ভাই মধুসূদন লাফ দিয়ে উঠানের উপর পড়ল। ভাজ ছুটে এসে তার হাত এঁটে ধরে। চার বছরের ছেলেটাও দেখি ঘুম ভেঙে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। মধুসূদনের মা গিয়ে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। চাকর মাহিন্দারেরা বাইরে-বাড়ি থেকে ছুটে এল। কর্তামশায়ের ওঠার অবস্থা নেই, পুবের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার করছেন তিনি।

কোন দিকে গেল চোর? কতক্ষণ পালাল? দাঁড়িয়ে কী গুলতানি হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখ সব। নিয়েছে নাকি কিছু? কি কি নিল?

এইবারে আশালতার খেয়াল হচ্ছে, কোমরের চন্দ্রহারটা নেই। পুরানো ভারী জিনিস, অনেক সোনা—বুড়ি দিদিশাশুড়ী এই দিয়ে নতুন বউয়ের মুখ দেখেছিলেন। গলার নেকলেশটাও নেই যে! একটা হাতের কঙ্কণ নেই। এ দুটো শঙ্করানন্দের আগের স্ত্রীর গয়না। ডান হাত চেপে কাত হয়েছিল, একটা কঙ্কণ তাই রক্ষে পেয়েছে।

মধুসূদন ওদিকে হাত ছাড়াবার জন্যে ঝুলোঝুলি। বউয়ের উপর তড়পাচ্ছে: ছাড়ো বলছি। অপমানের একশেষ। বলি, বাড়িটা আমাদের না চোরের? যেখানে থাকুক টুঁটি চেপে ধরব। আকাশে উঠুক আর সাগরে ডুবে যাক, আমার কাছে পার পাবে না।

বউ প্রাণপণে ধরে থাকে। মুখের কথাই শুধু নয়, মানুষটা সেই রকমের বটে। রোগা দেহ, বলশক্তিও তেমন নেই, কিন্তু দুনিয়ার উপর কিছুই পরোয়া করে না। কপালখানা জুড়ে কাটা দাগ—সে চিহ্ন কোনদিন মুছবার নয়, একবারের গোয়ার্তুমির পরিণাম। হাড়মাংস কেটে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যমে-মানুষে টানাটানি করে বাঁচিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি কিছুমাত্র। ছাড়া পেলেই ধনুক থেকে ছোঁড়া

তীরের মতো অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বউ বোঝাচ্ছে ঃ একজন দু-জন নয় ওরা দল বেঁধে আসে। তলোয়ার-ছোরা সঙ্গে রাখে। সেবারে মাথা ফাটিয়েছিল, গলা কেটে নেবে কোন দিন।

মধুসূদন গর্জে ওঠে ঃ নিক তাই। অসতের সঙ্গে লড়ে প্রাণ যাবে তো যাক। সে মরণে পুণ্যি আছে।

বউ রেগে উঠে ব্যঙ্গের সুরে বলে, কাজকর্ম না থাকলে বড় বড় বচন আসে অমনি। মাথার উপরে সব রয়েছেন, সংসারের কুটোগাছটি ভাঙতে হয় না তো!

আশালতা হাপুসনয়নে কাঁদছে। গয়নার শোক বড় শোক মেয়েদের কাছে। অঙ্গ একখানা কেটে নাও, খুব বেশি আপত্তি নেই। কিন্তু সেই অঙ্গের গয়নাখানা অতি-অবশ্য খুলে রেখে যেও। মা বকছেন ঃ একটা একটা করে এতগুলো জিনিস গা থেকে খুলল, টের পেলি নে তুই। ঘুমুচ্ছিলি না মরেছিলি?

কেমন করে খুলে খুলে নিয়েছে সে তো মরে গেলেও বলা যাবে না। যা মনে আসে মায়ের কাছে সেই রকম বলে যাচ্ছে ঃ কঙ্কণে টান পড়তেই তো ধড়মড়িয়ে উঠলাম মা। কে-কে—করছি, দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল। যদি টের না পেতাম, গয়নার একখানাও থাকত নাকি?

গয়নার দুঃখ আছে—কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ, মেয়েমানুষের জীবনে সকলের বড় যে গয়না অচেনা পুরুষ এসে তার খানিক তচনচ করে দিয়ে গেল। খানিকটা তো বটেই। আশালতা তাই হতে দিয়েছে, নিজেই যেচে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সেই বুক-ফেটে চৌচির হলে, কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটবে না কারও কাছে।

চোরের নামে পাড়াপ্রতিবেশী এসে জুটছে। সিঁধের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ। বড় বাহারের সিঁধ গো! দেখ দেখ—জানলার গরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মত কেটেছে। কেটেছে যেন কম্পাস ধরে, একচুলের এদিক-ওদিক নেই। হাত কত চোস্ত হলে তাড়াতাড়ির মধ্যে এমন নিখুঁত গর্ত হয়।

কাজের প্রশংসা সাহেব কানে শুনছে না—কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারীর গল্পের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারী, হেন শাস্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। সাহেব তাঁর বড় অনুরক্ত। মৃচ্ছকটিক নাটকের গল্প। ব্রাহ্মণ-ঘরের ছেলে শর্বিলক এদিকে চতুর্বেদ বিশারদ, আবার চোরও তেমনি পাকা। চারুদত্তের বাড়ি সিঁধ কেটে গয়না নিয়ে গেছে। গচ্ছিত-রাখা গয়না সমস্ত—কি নিয়ে গেছে, ক্ষতির বিবেচনা পরে। চারুদত্ত মুগ্ধ হয়ে সিঁধ দেখছে—সত্যিকারের শিল্পকর্ম একটি। সাহেবদেরও তেমনি কতকটা—হাতের কাজের তুলনা নেই। জাত-কারিগরের কাজ।

পাড়ার এক গিন্নি করকর করে ওঠেন ঃ কেমনধারা আক্কেল তোমার আশার মা! সোমত্ত মেয়ে তার এক গা গয়না—কি কি নিয়ে গেল শুনি? সেই চন্দ্রহার, বল কি, অনেক দামের জিনিস গো, বিস্তর সোনা—

বিকালবেলা ইনিই কিন্তু অন্যকে চোখ টিপে বলেছিলেন, সোনা না কচু। গিল্টি। কাপড়ের নিচে কোমরে পরবে, কেউ চোখে দেখবে না, সোনা কেন দিতে যাবে? সোনায় গিনি গেঁথে তার চেয়ে সিন্দুকে রাখবে। বলেছিলেন

এমনি সব। সেই চন্দ্রহার চুরি যাওয়ায় মনে মনে আরাম পাচ্ছেন! বলছেন আক্কেল বলিহারি! সোমত্ত মেয়েটাকে ঐটুকু এক গুঁড়ো মেয়ের হিল্লেয় আলাদা করে দিয়েছ। তবু ভাল যে শুধু গয়নার উপর দিয়েই গেছে—

অপ্রতিভ হয়ে মা বলছেন, বললাম তো আমি শুই তোর সঙ্গে, শান্তিলতা বাপের কাছে থাকুক। মেয়ে আড় হয়ে পড়ল, ঠেলে পাঠিয়ে দিল পুবের ঘরে। আজকালকার মেয়ে কারও কি কথা শোনে!

আশালতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। রাত্তির-বেলা কখন কি দরকার হয়—

মধুসূদনের বউ বলে, আমিও তো বলেছিলাম ভাই—

তার কথায় আশালতা জবাব দেয় না। বলেছিল বউ সত্যিই, কিন্তু আশালতাই প্রাণ ধরে সেটা হতে দেয় নি। বর নিয়ে শোওয়ার স্বাদ পেয়ে এসেছে, মন চায় নি ওদের স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করতে। তাছাড়া একটা-দুটো রাতের ব্যাপার নয়, চৈত্র মাস সামনে—সেই মাসটা পুরো থাকবে সে বাপের বাড়ি। দাদা-বউদি ততদিন আলাদা শোবে—নিজের হলে ঠেকবে কেমন? এই তো একটা রাতের বিচ্ছেদেই কী কেলেঙ্কারি ঘটে গেল।

যত ভাবছে, ভয়ে লজ্জায় তত কাঁটা হয়ে যায়। গয়না চুরি নিয়ে শ্বশুরবাড়ির ওরা কি বলবে? এত সাজিয়ে বউ পাঠাল, কী বেশে গিয়ে দাঁড়াবে আবার সেখানে! বলতেও পারে, বাপ-ভাই গয়না বেচে দিয়ে চুরির রটনা করেছে। মুখে না বলুক, মনে মনে ভাববে হয়তো তাই। সর্বরক্ষে, তবু ঐ ছাইভস্ম সোনার উপর দিয়ে গেছে, ধর্ম কেড়ে নেয় নি। কেড়ে নেবার কথাও তো ওঠে না, ঘুমের ঘোরে তখনকার যা অবস্থা—

পাড়াশুদ্ধ লোক হৈ-চৈ করে চোর ধরতে বেরুল। ঘরের ডানদিকে কশাড় বাঁশবন। লণ্ঠন তুলে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি দেয় সেদিকে। বেশি এগোবার সাহস নেই—কী জানি কোনখানে বজ্জাত চোর ঘাপটি মেরে আছে। দিল বা অন্ধকারে এক বাঁশের বাড়ি কষিয়ে। একদা মধুসূদনের মাথা যেমন দু-ফাঁক করে দিয়েছিল।

থানা ক্রোশখানেক দূরে। বাঁশবনটা ছাড়িয়েই নদী, কিনারা ধরে পথ। তারার আলোয় নদীর-জল চিক-চিক করছে। ঘাটের উপর এক ডিঙিতে গণকঠাকুর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সুর করে মহাভারত পাঠ করছে। আরও পাঁচ-ছ'খানা নৌকো—মাঝিমাল্লা চড়ন্দার উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সকলে। হেন কালে চোর-চোর উৎকট চেঁচামেচি। চোরের নামে এ-নৌকো সে-নৌকো থেকে নেমে পড়ে অনেকে। পাঠে বাধা পড়ে যায়, ভট্টাচার্য অতিমাত্রায় বিরক্ত। গ্রামের চৌকিদার এই রাত্রে খবর দিতে থানায় ছুটেছে।

যারা নেমে পড়েছে, তারা সব জিজ্ঞাসা করেঃ চুরি কোন বাড়ি? ধরা পড়েছে নাকি চোর? পালিয়েছে—কোন দিকে গেল?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য পাঠ থামিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ছিল, গলা চড়িয়ে আবার শুরু করল :

নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্যচক্ষু সর্বজনে দেন নারায়ণ॥
দিব্যচক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায়॥
তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে আছে ব্রহ্মা দেখে সবিশেষে॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোবন।
নয়নে দেখায় একাদশ রুদ্রগণ॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে তারা কহিতে লাগিল॥

পাণ্ডব হইবে জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণবীর করিল গমন।
প্রেম রূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ভণিতা শেষ করে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সশব্দে পুঁথি বন্ধ করল। চোরের খবরা-খবর নিয়ে তখন সকলে ফিরে আসছে। পাশের নৌকোয় বুড়ো মাঝি বলে, চলুক না ঠাকুরমশায় আরো খানিক।

না—ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ল। রাগ হয়েছে, রাগের সঙ্গে অভিমানও। বলে, বেনাবনে মুক্তো ছড়ালাম এতক্ষণ ধরে। সৎপ্রসঙ্গে কারো মতি নেই, কেউ কানে নাওনি তোমরা। যাকগে, বলে আর কী হবে! অন্য কেউ না শোনে, আমার নিজের কাজ তো হল। আমার শিষ্যসাগরেদ এরা ক'জন শুনল। তাই বা মন্দ কি!

কে-একজন ওদিক থেকে টিপ্পনী কেটে ওঠে : একটি সাগরেদ কাড়ালে ঐ তো চট মুড়ি দিয়ে পড়েছে সন্ধ্যে থেকে। সকলেরই ঐ গতিক—নয় তো সাড়া পাওয়া যায় না কেন? ঠাকুরমশায়, মাছ খায় সবাই, নাম পড়ে কেবল মাছরাঙার।

বুড়ো মাঝি লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে : শুনছিলাম তো ঠাকুরমশায়। চোরের কথা কানে পড়েই না ছোঁড়াগুলো হৈ-হৈ করে ছুটল।

ছোঁড়া বলে কেন, তুমি নিজেও ছুটেছিলে মুরুব্বির পো। তাই তো দেখলাম, পাপ কলিযুগে গোবিন্দ-নামের চেয়ে চোরের নামের কদর বেশি।

এরপর কিছুক্ষণ ক্ষুদিরাম গুম হয়ে রইল। রাগ পড়েনি, পুঁথি আর খুলল না।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। কাড়ালের দিকটায় চট মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে সাহেব—ঐ নৌকোর লোক খোঁটা দিয়ে যার কথা বলল। সন্ধ্যা থেকেই সকলে চট-মোড়া মানুষটা দেখছে। ছিল কিন্তু চটের নিচে রামদাস। কর্ম সাঙ্গ হবার পর—এদিকে জমিয়ে সকলে পাঠ শুনছে, রামদাসকে সরিয়ে সাহেব নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ল। গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে।

ছোট্ট ডিঙি সকালবেলা আজ এই ঘাটে ধরেছে। মূলে সোয়ারি ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তল্পিদার বংশী। এবং সাহেবের সম্বন্ধে কী বলা যায়—সাগরেদ হলে সকলের সেরা পয়লা নম্বরের সাগরেদ সে। হাল বেয়ে বেয়ে জলে আলোড়ন তুলে নৌকো লাগাল ঘাটে, ঘাটে লাগতে না লাগতে একছুটে হাটখোলায় গিয়ে চাল-ডাল নুন-তেল কিনে আনল, মুহুর্মুহু তামাক সেজে সসম্ভ্রমে ভট্টাচার্যের দিকে হুঁকো এগিয়ে দিচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়ে ফুঁ পাড়ছে মুখ ফুলিয়ে। এ ছাড়া মাল্লা দুজন—কেষ্টদাস, রামদাস। মোটমাট পাঁচ।

সেকালে ফি বছর শীতের সময়টা ক্ষুদিরাম ডিঙি নিয়ে এই রকম বেরিয়ে পড়ত। বয়স হয়ে ইদানীং বন্ধ একরকম। খাতিরে পড়ে এইবারটা কেবল বেরিয়েছে। নদীখাল যেন জাল বুনে আছে—জলের জীবন, জলের ধারে বসবাস মানুষের। ডিঙি আস্তেব্যস্তে স্রোতে ভেসে চলে। ভাল গাঁগ্রাম দেখে নেমে পড়ে ভট্টাচার্য মশায়, ভদ্র গৃহস্থবাড়ি উঠে আলাপ-পরিচয় করে। ব্যাগ খুলে স্বর্ণসিঁদুর ও চাটি-মকরধ্বজ বের করে দেখায়—বাজারে বস্তু নয়, ভট্টাচার্য নিজ হাতে বকাল মেপে ষোলআনা শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে বানিয়েছে, ছেলেপুলের ঘরে রেখে দিতে হয় এ সমস্ত—সামান্য অসুখবিসুখে বড় কাজে লাগে। এ ছাড়া হস্তরেখাদি বিচার করে ক্ষুদিরাম, খড়ি পেতে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়! অতিশয় নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণ—তা সত্ত্বেও চাপাচাপি করলে সৎগৃহস্থের বাড়ি চাট্টি চাল ফুটিয়ে সেবা নিতে খুব বেশি আপত্তি করবে না। বাইরের পরিচয় এই হল মোটামুটি।

জলের কাজ—নৌকো চেপে জলে জলে ঘোরা। ডাঙার কাজের চেয়ে সোজা, সুবিধা অনেক বেশি। সকালে জানে না সন্ধ্যাবেলা কোনখানে আজ আস্তানা। শিকার হয়ে কে মুখে এসে পড়ে, কোন-কিছু ঠিকঠিকানা নেই। অথবা ভাগ্যদোষে নিজেরাও পড়তে পারে জলপুলিসের শিকার হয়ে। তখন সাঁ-সাঁ করে নৌকো ছুটিয়ে কোন এক পাশখালিতে ঢুকে পড়ে। আঁকাবাঁকা খাল, বাঁকে বাঁকে শতেক মুখ বেরিয়েছে। বেঁচে যায় সেই গোলকধাঁধার মধ্যে লুকোচুরি খেলে। আবার কত সময় ধরেও ফেলে ফাঁদ পেতে সুকৌশলে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে। এমন হয়েছে, দলকে দল একেবারে খতম হয়ে গেছে। দল নয়, নল বলাই ঠিক। দল তো অতি সামান্য জিনিস, পাঁচটি মানুষ এরা যেমন দল করে এসেছে। বড় বড় নল উৎখাত হয়েছে, তবু কাজকর্ম ঠিক চলেছে, এক দিনের তরে বন্ধ হয়নি। নতুন নতুন নল গড়ে উঠেছে আবার। এখন তো দয়াময় সরকার। ধরল এবং আদালতে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেল তো এক বছর দু-বছরের জেল। সরকারি পাকা দালান, শীতের কম্বল, নিশ্চিন্তে তিন বেলা আহার—আর দশটা গুণীর সঙ্গে মিলেমিশে দিনগুলো দিব্যি কেটে যায়।

গায়ে গত্তি লাগে, মনে স্ফূর্তি আসে। বেরিয়ে এসে ডবল জোরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড় আবার। কিন্তু সেকালে—অনেক কাল আগে—এমন সুখ ছিল না। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শোনা। মহাবিদ্বান জগবন্ধু বলাধিকারী—তাঁর যে কাজ তাতে খাটাখাটনি অল্প, বইপত্র নিয়ে দিনরাত পড়ে আছেন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো ফোঁটা-কাটা মানুষভোলানো পণ্ডিত নন তিনি। সেকালে নাকি খুব কড়া ব্যবস্থা ছিল—চোরকে শূলে দিত, চোরের হাত কেটে ফেলত। তা বলে বিদ্যা কি লোপ পেয়েছে কোন রাজ্যে! বড়-বিদ্যা বলে কত জাঁক। এই বিদ্যার জোরে কত দেশের কত শত মানুষ করে খাচ্ছে। চুরি কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে মানী লোকের বোধকরি ইজ্জতহানি ঘটে। রকমারি নাম দিয়েছে তাই—পান খাওয়া, উপরি পাওনা। হালফিল আবার একটা নতুন নাম কানে আসে—কালোবাজারি। নাম যা-ই হোক, কাজ সেই সনাতন বস্তু। এই সমস্ত বলেন বলাধিকারী, আর হেসে খুন হন।

সে যাকগে। সাহেব চট মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে ডিঙির উপর, তারই ত্রিশ হাতের ভিতর পাড়ের রাস্তা দিয়ে হনহন করে চৌকিদার থানায় চলল। বাঁশের জঙ্গল না থাকলে সেহ দক্ষিণের পোতার ঘরটাও নজরে আসত এই জায়গা থেকে। গাঁয়ের মানুষ পাতি-পাতি করে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে, এদিকে কেউ তাকায় না। চোর যে কাজ সেরে এসে ভালমানুষ হয়ে বাড়ির ঘাটে শুয়ে পড়েছে, এমন সন্দেহ হয় না কারো। হলেই বা কি! নৌকো তল্লাসি করলে মিলবে হাঁড়িকুড়ি চাল-ডাল তেল-মশলা এবং ভট্টাচার্য মশায়ের ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু স্বর্ণসিঁদুর মকরধ্বজ মধু এবং মহাভারত নূতন-পঞ্জিকা কাকচরিত্র বৃহৎ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত এই জাতীয় বই কয়েকখানা। গয়না সিকিখানা পাবে না খুঁজে, সমস্ত গাঙের নিচে। সিঁধ কাটার সময়টা বংশী সাহেবের পাশে থেকে সাহায্য করছিল, তারপর সাহেব ঘরে ঢুকে গেল তো সে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। এদের ভাষায় পদটিকে বলে ডেপুটি। মাল নিয়ে বাইরে এসে ডেপুটির হাতে পাচার করে দিল। ব্যস, কারিগরের দায়িত্ব শেষ, ছুটি এবার। যা করবার ডেপুটি করবে।

গামছায় পুঁটলি করে সেই মাল বংশী গাঙের জলে ছুঁড়ে দেয়। নিশানা আছে—সরু দড়ি গিঁট দেওয়া পুঁটলিতে, দড়ির অন্য মাথা আগাছার সঙ্গে বাঁধা। দড়ি টেনে যখন খুশি মাল ডাঙায় আনা যাবে। সিঁধকাঠি ছোরা লেজা রামদা—সরঞ্জাম-গুলোরও ঐ ব্যবস্থা। ডিঙির উপরে যা-কিছু সমস্ত নিরীহ নির্দোষ জিনিস। জলের উপর কাজকারবারে এই বড় সুবিধা। তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ অশাবে যদি বোঝ, নৌকো চাপান দিয়ে গদিয়ান হয়ে ঘাটে থাক একদিন দু-দিন। ফাঁক বুঝে তারপর পিঠটান দাও, মাল থাকুক যেমন আছে পড়ে। চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন একসময় এসে তুলে নেওয়া যাবে। নৌকো না হল তো হেঁটেই চলে আসবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সাহেব ফিরে আসতে একবার চোখাচোখি হল ক্ষুদিরামের সঙ্গে। বড় খুসি দু-জনেই। পাঠ চলছে—তপোধন নারদ শোভা পাচ্ছেন শ্রীগোবিন্দবক্ষে—বলতে বলতে

নিজের বুকে প্রচণ্ড এক থাবা বসিয়ে দেয়। অর্থাৎ দেখলে বটে তো ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের কাজের নমুনা—কী দরের খুঁজিয়াল বুঝে দেখ। খোঁজদারির বখরা অন্য লোকের যদি হয় এক আনা, ক্ষুদিরামের নিদেনপক্ষে ছয় পয়সা। কাজ যা করে একেবারে নিটোল, কোন অঙ্গে ভুলচুক থাকে না। যেমন এই আজকের কাজ।

আশালতা গা-ভরা গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছে, ডিঙিতে বসে বসে টের পাবার কথা নয়। খুঁজিয়াল খবর বয়ে এনে দিল। অন্যের মুখের খবর নয়, খোদ ক্ষুদিরামের—গণকঠাকুর হয়ে নিজে দেখেশুনে মেয়ের হাত গণে এসে বলল। যা করবার আজ রাত্রেই। দেরি হলে হবে না, দেরিতে মানুষের বুদ্ধিবিবেচনা এসে যায়। বাড়িসুদ্ধ আজকের দিন দেমাকে রয়েছে পাড়ার মানুষদের গয়নাগাঁটি দেখাচ্ছে। একদিন দু-দিন পরে তুলেপেড়ে ফেলবে। বড়লোক মিত্তিরদের লোহার সিন্দুকে রেখে আসবে সম্ভবত। তখন সিঁধকাঠিতে কুলাবে না, রীতিমত বন্দুক-বোমার ব্যাপার। চুরি নয় তখন, ডাকাতি—আয়োজন তার বিস্তর। কাজও নোংরা। চুরির মতন এমনধারা পরিচ্ছন্ন নয় যে—মাল সমস্ত পাচার হয়ে গেল, বাড়ির মানুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ল না।

পহরখানেক রাতে আর একবার নৌকো থেকে নেমে ক্ষুদিরাম শেষ খবর এনে দিল। না, কুকুর নেই বাড়িতে। বাইরের অতিথি অভ্যাগত নেই। ছোট্ট সংসার। অসুখ-বিসুখের কথা যদি বল—আছে অসুখ বটে, কিন্তু পুরানো ব্যাধি। পক্ষাঘাতে কর্তামশায় শয্যাশায়ী। কর্তার সেই পুবের ঘরও অনেকখানি দূরে দক্ষিণের পোতার ঘর থেকে। ছোট বোন আজ একসঙ্গে এক খাটে শুয়ে আছে। বয়সে ছেলেমানুষ, শুয়েছেও একেবারে দেয়াল ঘেঁষে। এসব মেয়ে ঘুমিয়েই থাকে, হাঙ্গামা করে না। ভাবনা কিছু মুল-মক্কেলকে নিয়ে—আশালতাটা ডবকা রীতিমত। তবে বিয়ে হয়ে গেছে, নতুন বিয়ের পর আজকেই দ্বিরাগমনে ফিরল। এবারে তুমি বিবেচনা করে দেখ সাহেব।

খবর বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম ছইয়ের মাথায় হেরিকেন লণ্ঠন টাঙিয়ে নিশ্চিন্তে এবার মহাভারত খুলে বসল। উদ্যোগ পর্ব। কুরুক্ষেত্র আসন্ন—তারই ঠিক আগের পাঠ।

খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা। ওস্তাদের নিষেধ: ডবকা মেয়ের ঘরে ঢুকবে না। সে মেয়ে অবিবাহিতা কুমারী হলে তো কথাই নেই। ঢুকে পড়লেও কদাপি সে মেয়ের গা ছোঁবে না। না, না, না—ওস্তাদের দিব্যি দেওয়া আছে। কুমারী দেহ অপবিত্র হবে, সেটা খুব বড় কথা নয়। যে সময়টা কাজে নেমে পড়েছ, পুরুষমানুষ নও তুমি তখন। মানুষই নও। কাজ করবার কল। যেমন সিঁধকাঠি আছে, সিঁধকাঠি ধরবার কলও আছে একটা। সে কলের একজোড়া চোখ, সেই চোখের জ্বলজ্বলে নজর। নজর কিন্তু মেয়ের গায়ের দিকে নয়, গায়ের উপর যেখানে যে বস্তু রয়েছে শুধুমাত্র সেইটুকুর উপর। মুশকিল হল ভিন্ন দিক দিয়ে। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের পশরা সাজিয়ে মেয়েটা উন্মুখ হয়ে আছে ডালি দেবার জন্য। রক্ষে আছে অঙ্গের উপর প্রথম পুরুষের ছোঁয়া পেলে! ঘুমে হোক আর জাগরণে হোক মাথা থেকে

পদতল অবধি শিরশির করে উঠবে, গায়ে কাঁটা দেবে। ঘুমন্ত হলে চক্ষের পলকে জাগবে, ভয় পেয়ে চেঁচাবে নতুন অনুভূতিতে।

এবং আরও একদিক দিয়েও বিবেচনা—গয়না কখানাই বা থাকে কুমারী মেয়ের গায়ে! হাতে দু-গাছা চুড়ি, কি দুটো কানের ফুলের জন্য অতখানি ঝুঁকি কোন সুবুদ্ধি কারিগর নিতে যাবে?

কিন্তু বিবাহিত মেয়ের আলাদা বৃত্তান্ত। এক কথায় খারিজ করা যাবে না। পুরুষ-সঙ্গ অভ্যাসে এসে গেছে তখন। গয়নাগাঁটিও খুব এসে জমে বিয়ের পর থেকে। জোয়ারের জলের মতো। বাপের বাড়ির গয়না—বিয়ের মুখে কষেমেজে পাত্রপক্ষ যা আদায় করেছে। শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের দেওয়া গয়না। আর সোহাগিনী বউকে সুগোপনে দেওয়া বরের গয়না। সেই সব গয়না পরে দেমাকে মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। গা-ভরা টাকশাল। পার যদি সেই টাকশালের টাকা সরাতে নিষেধ নেই। পেরে উঠবে কিনা সেই বিবেচনা। ঐ যা বলা হল—ডবকা মেয়ে ঘুমোয় না বেশি। বয়সের দোষে ছটফট করে, ক্ষণে ক্ষণে উঠে বসে। ঘুমোল তো অতি পাতলা সে ঘুম। একটা ইঁদুর নড়লে জেগে ওঠে। ঢুকে পড়তে পার এ হেন গয়না-পরা নতুন বিয়ের মেয়ের ঘরে—ওস্তাদের আশীর্বাদ এবং ষড়ানন কার্তিকের ও মা-কালীর তেমনিধারা কৃপা যদি থাকে তোমার উপর। জ্ঞান-গুণ যদি থাকে। একটা সুঁচ পড়ার যে শব্দ, সেটুকুও হবে না তোমার চলাচলে। সিঁধ কাটতে গিয়ে ঝুরঝুর করে মাটির গুঁড়ো পড়বে না, ডেপুটি হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে রাখবে। নিঃসাড়ে মেয়েটার কাছে চলে যাবে, অবস্থা বিশেষে শুয়ে পড়বে পাশটিতে। বর যেমনধারা করে। গায়ে হাত দেবে আলতো ভাবে, সইয়ে সইয়ে—ঘোর কেটে না যায় মেয়ের, সন্দেহ না আসে যে ভিন্ন পুরুষ। বড় কঠিন কাজ। যৌবন বয়সের জোয়ান পুরুষ তুমি, মন কিন্তু দুলবে না একটুও। সে কেমন? ভরা কলসি নিয়ে নাচওয়ালী যেমন সভায় নাচে। ঢং করছে কত রকম, পুরুষের দিকে চক্ষু হানচে। করতে হয়, তাই করে। কিন্তু আসল নজর মাথার কলসি মাটিতে না পড়ে যায়। তোমারও তেমনি। যুবতী নারী কে বলেছে, শুধুমাত্র একটি মক্কেল। কুষ্ঠী অষ্টাবক্র হলে যা করতে, যুবতীর বেলাতেও সেই পদ্ধতি অবিকল। কাজ কিসে হাসিল হবে তাই শুধু দেখ।

ঘুমেরও একটা হিসাব নিতে হবে। ঘুমোচ্ছে কতক্ষণ ধরে। ঘরের কানাচে বসে বসে সাড় নাও। বেড়ার ঘর হলে নিশ্বাসের শব্দ থেকে টের পাবে—এতক্ষণে জেগে ছিল, ঘুমোল এইবারে। এই সঙ্গে কালাকালের বিচার আছে। শীতকালে ঘুম আসতে দেরি হয় না—লেপের তলে গিয়েই সন্ধ্যারাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষরাতের ঘুম তাই পাতলা, ভোর না হতে জেগে ওঠে। শীতকালের কাজকর্ম অতএব সকাল সকাল। গরমের সময়টা ঠিক উল্টো। সারারাত আই-ঢাই করে ভোররাত্রে ঘুম আসে। অতএব গ্রীষ্মের কাজে চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে। ছটফট করলে হবে না।

কত দিক কত রকমের বিচার-বন্দোবস্ত। নির্বিঘ্নে তবেই এক একখানা কাজ

নামানো যায়। চুরি অমনি করলেই হল না, বিদ্যেটা সহজ নয়। তাই যদি হত, দুর্নিবারক্ষুধ মানুষ সোজাসুজি বেরিয়ে পড়ত সিঁধকাঠি হাতে। ঘোরপ্যাঁচ করে বেনামি চুরির তালে যেত না।

সকালবেলা বংশী নেমে গিয়ে একটা আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে গাঙের ধারে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করল। শীত-শীত বলে চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। দাঁড় টেনে টুক করে গয়নার পুঁটুলি তুলে ফেলল একসময়। তুলে চাদরের নিচে ঢুকিয়েছে। ছোট জিনিস বলেই হাতের কায়দা দেখানো গেল। সরঞ্জামগুলোর ব্যাপারে সাহস করা যায় না, চাদরে সামাল হবে না অত জিনিস। জলতলে থাকুক পড়ে আপাতত, যাচ্ছে কোথায় ? আর গেলেই বা কী—কত আর দাম।

কাজ সমাধা, নানান জায়গায় বেকুব হয়ে হয়ে এইবারে আশাতীত রকম হয়ে গেল। জুড়নপুরের ঘাটে আর কেন ? অকুস্থলে অকারণে পড়ে থাকতে নেই। সাহস দেখাতে হবে বটে, কিন্তু মাত্রা আছে।

চললাম ভাইসকল। অর্ধেক জোয়ার হয়ে গেল, জো ধরে গিয়ে উঠি।

রৌদ্রে ভরে গেছে চারিদিক। ঘাটের মাঝিমাল্লাদের বলেকয়ে রীতিমত শব্দসাড়া করে ভট্টাচার্য মশায়ের ডিঙি ছাড়ল।

কালকের সেই বুড়ো মাঝি প্রশ্ন করে, কদ্দুর যাওয়া হচ্ছেন ?

হুঁকো টানছিল ক্ষুদিরাম, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সেটা তো জানিনে। গাঙের স্রোত আর ভবিতব্য যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জীবনেও ঠিক এমনি, ভাই। কাল রাত্রে এখানে এই ঘাটে কত সৎপ্রসঙ্গ করেছি, আজ রাত্রের কোন কাজ বিধাতা-পুরুষ কোন ঘাটে লিখে রেখেছেন—

মাঝি গদগদ হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কিন্তু চালাকি খাটে না বিধাতাপুরুষের। কপালের লিখন কেমন পুটপুট করে বলে দেন।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে গৌরবটা পরিপাক করে নেয়। মাঝি বলছে, সকলের হাঁড়ির খবর বলে দেন ঠাকুরমশায়, নিজেরটা কেন তবে পারবেন না ?

ঐ তো মজা। ডাক্তারে তাবৎ লোকের চিকিচ্ছে করে বেড়ায়, নিজের রোগ ধরতে পারে না। বলি খনার চেয়ে তো বিদ্যাবতী কেউ ছিল না—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নখের উপর ভাসত, চোখ তুলে একটিবার দেখে নেবার ওয়াস্তা। কিন্তু শ্বশুরে বেটা যে জিভ কেটে টিকটিকি দিয়ে খাওয়াবে সেইটেই ধরতে পারলেন না তিনি।

বাঁক ঘুরে যেতে বংশীকেই ক্ষুদিরাম সেই প্রশ্ন করেঃ যাওয়া হচ্ছেন কতদ্দুর ? উত্তর অঞ্চলে, কয়েকটা ভাল তল্লাট আছে চুঁ মেরে আসা যায়। তুমিই বল বংশী, তোমার দায়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি।

বংশী বলে সকলের আগে ফুলহাটা। বলাধিকারী মশায়ের হাতে মাল গিয়ে তো পড়ুক। তারপর তিনি যেমন বলেন।

সাহেবেরও সেই মত। নৌকোর সকলেরই। মাল বলাধিকারী অবধি পৌঁছলে

তখনই জানলাম, রোজগারের টাকা সত্যি সত্যি গাঁটে এসে গেল। মাল গলিয়ে বিক্রি-করা টাকাপয়সা বখরা করে দেওয়া সমস্ত তাঁর কাজ। ধর্মভীরু মানুষ—চিরকাল, সেই যখন দারোগা ছিলেন তখনও। সিকি পয়সার তঞ্চকতা নেই তাঁর কাছে। কত কত মহাজন এ-লাইনে, কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারী দ্বিতীয় একজন নেই। কাজও অঢেল। বড় বড় দলের সঙ্গে কাজকারবার। কাপ্তেন কেনা মল্লিক প্রধান তার মধ্যে। ছোটখাট দল আমল পায় না। তবে সাহেব আছে বলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। বড় গুণের ছোকরা, বলাধিকারী বড় ভালবাসেন। তার উপর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—বলাধিকারীর চিরকালের পোষ্য। বংশীও পায়ে পায়ে ঘুরে তার। হাত পেতে নেবেন তিনি ওদের জিনিস। নৌকা অতএব সোজা গিয়ে ফুলহাটা উঠুক, পথের মধ্যে কোনখানে থামাথামি নেই।

বড় গাঙ ছেড়ে সরু খালে ঢুকল। ফুলহাটা এসে গেছে। কত বড় জায়গা ছিল একদিন, কত জাঁকজমক। ফুলহাটার নীলকুঠির এদেশ-সেদেশ নামডাক, অঞ্চলের যত নীল নৌকো বোঝাই হয়ে খালের ঘাটে উঠত। প্রকাণ্ড দীঘি, দীঘির পাড়ে সারি সারি নীল পচানোর চৌবাচ্চা। তেতলা বিশাল অট্টালিকা—নীলকর সাহেবরা থাকত সেখানে। সময় সময় মেমসাহেবরাও আসত বিলাত থেকে, ছ-মাস এক বছর থেকে আবার চলে যেত। কাঠের মেঝের নাচঘর বানিয়েছিল অট্টালিকার নিচের তলায়। ভেঙেচুরে কাঠে উই ধরে এখনো খানিকটা নমুনা রয়েছে। দিনদুপুরে আজ বুনো-শুয়োর আর সাপ-শিয়াল চরে বেড়ায় নীলকুঠির জঙ্গলে। শীতকালে কেঁদোবাঘও আসে।

জঙ্গল ফুঁড়ে অট্টালিকার চিলেকোঠা উঠেছে, ডিঙি থেকে নজরে পাওয়া যায়। বলাধিকারীর চোখ বেঁধে একদিন ঐখানে কোথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কী কাণ্ড! গল্প শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হেসেও খুন হতে হয়। আজকে সেই জায়গায় সকলের প্রভু হয়ে আছেন বলাধিকারী, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে আশ্রিত-পালন করছেন। অঞ্চলের যাবতীয় থানার লোক এসে খোশামোদ করে যায়। না করে উপায় কি? খুব খাওয়ান তাদের বলাধিকারী। অন্তরালে তাদের সম্বন্ধে বলেন: ভাল খাওয়ার লোভে আসে তো যতবার আসে আসুক আপত্তি নেই। অতিথি-সেবার ত্রুটি হবে না। ভিতরে অন্য কোন মতলব থাকে তো বিপদে পড়বে। আমিও দারোগা ছিলাম একদিন, অত্যন্ত দুঁদে দারোগা। আমার যেমন হয়েছিল, তার শতেক গুণ নাজেহাল হতে হবে।

গয়নাগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে নেড়েচেড়ে রেখে এলেন বলাধিকারী। ফিরে এসে সাহেবকে তারিপ করেন: পাকা কারিগর তুমি হে! এইটুকু বয়সে এমনধারা কাজ আমার আমলে কখনো দেখি নি। না হবে কেন, শিক্ষা কত বড় ওস্তাদের কাছে! আবার তা-ও বলি, বীজ ভাল হলেই ফসল যে সব সময় ভাল হবে তা নয়। উর্বর ক্ষেত্র চাই, তবে অঙ্কুর ওঠে। অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে সুফল। তোমার ব্যাপারে সেইটে হয়েছে। তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, রেলগাড়ির কামরায় পয়লা নজরে সেটা টের পেয়েছিলাম। তখনই ঠিক করলাম, এমন প্রতিভা নষ্ট হতে দেব না। হয়েছে

তাই। আরও কত হবে! আজ আমার বড় আনন্দ।

পেশায় মহাজন বটে, কিন্তু বলাধিকারী সত্যিকার বিদ্বান মানুষ। কথাবার্তা পন্ডিতজনের মতো। গদগদ হয়ে সাহেবকে তিনি আশীর্বাদ করেন: ভবিষ্যদ্বাণী করছি, কাপ্তেন হবে তুমি একদিন। কাপ্তেন তো কতজনা—কেনা মল্লিকও মস্তবড় কাপ্তেন। কিন্তু মিহি কাজ বড় কেউ জানে না। তুমি যাবে সকলের উপরে। পুঁথিপুরাণে অনেক ইজ্জত এই বিদ্যার। সর্বশাস্ত্রের সঙ্গে রাজপুত্র চৌর্যবিদ্যারও পাঠ নিচ্ছেন, নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। চৌষট্টি কলার একটি। উচ্চাঙ্গের কলা বটে—যা এক একটা বিবরণ পাওয়া যায়, শিল্পীর দক্ষ হাত ছাড়া তেমন বস্তু না। অতদূরের পুরাণ-ইতিহাসেই বা যেতে হবে কেন—তোমারই ওস্তাদ বাইটা মশায় বয়সকালে কী সব কান্ড করে বেড়িয়েছে! একদিন গিয়ে তোমার এই কাজকর্মের কথা সবিস্তারে বলে এসো বুড়োকে, বড় আনন্দ পাবে। যেমন গুরু ঠিক তার উপযুক্ত শিষ্য।

সাহেবের গুরু পঞ্চানন বর্ধন। পচা বাইটা নামে পরিচয়। ওস্তাদের কথা উঠলে সাহেবের হাত দুটো আপনি জোড় হয়ে কপালে গিয়ে ওঠে, ঘাড় নুয়ে আসে। সেকালের কথা জানিনে, কিন্তু এখনকার দিনে এত বড় ওস্তাদ আর জন্মে না।

গয়নার পুঁটুলি নিয়ে কোথায় চলে গেলেন বলাধিকারী। এই অধ্যায়টা একেবারে অজ্ঞাত, নানা জনের নানা রকম আন্দাজ। হঠাৎ একদিন বলাধিকারীর মুখে বখরার হিসাব পাওয়া যায়, বখরাদার যত জনই থাকুক, টাকা-আনা-পয়সায় কার কত পাওনা মুখে মুখে বলে দেন। এ কাজে কাগজ-কালির কারবার নেই। কাগজের লেখা সর্বনেশে জিনিস—বিপদ ঐ পথ ধরে আসে অনেক সময়। বলাধিকারীর মৌখিক হিসাবে সকলে খুশি। আড়ম্বরে গদি সাজিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ঐ যে হিসাবপত্র রাখে, যত গলদ তাদেরই কাছে। বলাধিকারীর কাছ থেকে মানুষে দরদম আগাম নিয়ে যাচ্ছে, তারও লেখাজোখা থাকে না, মনে গেঁথে রাখেন। আগামের টাকাপয়সা কেটে নিয়ে বাকি প্রাপ্য মিটিয়ে দিচ্ছেন, সিকি পয়সার ভুলচুক নেই।

গয়নার ব্যবস্থায় পুরো একটা বেলা কাটিয়ে বলাধিকারী বাসায় ফিরলেন। হাসি-হাসি মুখ—তাই থেকে অনুমান হয়, মাল অতিশয় সাচ্চা। এবং ওজনে উত্তম। কাজ চুকিয়ে এসে এখন অন্য দশরকম কথাবার্তা।

একবার বললেন, তাড়াহুড়ো করতে বলিনে, শুয়ে বসে থাক এখন পাঁচ-সাত-দশ দিন—জিরিয়ে নাও। ছিপ ফেল, তাস-পাশা খেল। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ওদিকে দিন দেখতে লাগুন আবার একটা। শুভক্ষণে বেরিয়ে পড়ো মাতৃনাম স্মরণ করে। পয় যাচ্ছে এখন, দু'হাতে কুড়োও।

হাতে কাজকর্ম না থাকলে ক্ষুদিরাম অবিরত পঞ্জিকা উলটায়। সকলের বড় শাস্ত্র, তার মতে, পঞ্জিকা। ডিঙি থেকে ডাঙায় উঠেই সে পাঁজি নিয়ে পড়েছে। দিনক্ষণ প্রায় কন্ঠস্থ। বলে, সামনের বিষ্যুৎবারেই হতে পারে। নবমী তিথি আছে, যেটা হল রিক্তা তিথি। মঘা নক্ষত্র তার উপরে—যাত্রামুখে মঘা, সামলাবি তুই ক'ঘা?

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ওরে বাবা!

ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বলে, সেই তো মজা। বিষে বিষক্ষয়। দুই শয়তান কাঁধে কাঁধ দিয়ে গ্রামুতযোগ হয়ে দাঁড়াল। অব্যর্থ অভীষ্টলাভ।

বলাধিকারী বললেন, জলে জলে নয়, এবারে ডাঙা অঞ্চলে। ডাঙার কাজ একখানা দেখাতে হবে সাহেব—নিখুঁত পরিপাটি কাজ। কেনা মল্লিকের কাছে জাঁক করে জলের কথা বলব, তেমনি ডাঙার কথাও বলতে পারি যেন।

বিস্তর ভাল ভাল গাঁ-গ্রাম আছে, গাঙখাল নেই সেখানে। নৌকো করে যাওয়া যায় না, গাড়ি-পাল্কিতে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। চীনের হুয়েনসাং এসে যা দেখেছিলেন, এখনকার এই যুগেও প্রায় সেই অবস্থা—উৎপাতের অভাবে দরজায় খিল দিতে ভুলে যায় সেখানকার লোকে, বাক্সের তালা-চাবি কেনা বাহুল্য মনে করে। সাহেব গিয়ে বাহারের কাজ কিছু দেখিয়ে আসুক, চারিদিকে তোলপাড় পড়ে যাক। যাতায়াতের কষ্ট বলে মানুষগুলো কেন একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? এবং ভেবে দেখলে, সাহেবদের পক্ষেও সেটা অগৌরবের কথা বটে।

কিন্তু আর একবার তো আশালতাদের গাঁয়ে যেতে হয়। জুড়নপুর গাঁয়ে। সরঞ্জামগুলো গাঙের নিচে পড়ে রইল, কি নিয়ে তবে কাজে বেরোয়? প্রশ্ন হবে, সরঞ্জাম এই একটা সেট কি শুধু? পড়ুক না ওরা বেরিয়ে—বলাধিকারী মশায়ের উপর ভার থাকবে, সুযোগ মতন তিনি ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু আর যাই হোক, সিঁধকাঠিটা আদর ও সম্মানের বস্তু সাহেবের কাছে। ওটা হাতে না পেয়ে বেরুবে না। ঐ কাঠি ওস্তাদ তার হাতে দিয়েছে। সে ওস্তাদ আজেবাজে কেউ নয়, স্বয়ং পচা বাইটা। কাঠিখানাও বাজারের সাধারণ জিনিস নয়, যুধিষ্ঠিরের নিজ হাতে গড়া। অমন কারিগর তল্লাটের মধ্যে নেই, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কামান-বন্দুক গড়েছে তার পূর্ব-পুরুষেরা। সেই বংশের কারিগর যুধিষ্ঠির।

তাছাড়া নতুন কাঠির কথাই তো আসে না। ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছেন, সে বস্তু তুলবেই সে জল থেকে। লাইনে নেমেই এতখানি নামযশ, সেটা সাহেবের নিজের কিছু নয়—ওস্তাদের আশীর্বাদ আর ওস্তাদের দেওয়া কাঠির গুণে। অনেক রকম গুণজ্ঞান থাকে তো ওঁদের, হয়তো বা মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন বস্তুটা। কাঠি ধরে কাজে বসলে সাহেব তখন আর এই মানুষ থাকে না। কী এসে ভর করে যেন কাঁধে—আলাদা মানুষ।

ফাঁসুড়ে ঠগদের কথা বলেন বলাধিকারী। বিস্তর তাজ্জব কাহিনী। এমনি তারা খুব ভাল। ধার্মিক, দয়াশীল, দানধ্যান জপতপ পুজোআচ্চা করে—বলতে হবে বাড়াবাড়ি রকমের ধার্মিক। বছরের মধ্যে অন্তত একটিবার বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যেশ্বরী অথবা কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর পাদপদ্মে গিয়ে পড়বে, আয়ের একটা মোটা অংশ পুজোয় খরচ করবে। গলায় রুমালের ফাঁস এঁটে মানুষ মারা পেশা তাদের। পেশা বলা ঠিক হল না, দেবী চামুণ্ডার নিত্যপুজো এই পদ্ধতিতে। মানুষ মেরে টাকা পয়সা নিয়ে নেয় বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য টাকা নয় সেটা তো যৎসামান্য উপরি লাভ। চামুণ্ডার তুষ্টিতে নরবধ—এক একটা নরবধে বিস্তর পুণ্য। কাজটা আসলে দেবীরই, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে দেয়। পৌরাণিক রক্তবীজ-

দৈত্য বধ করতে গিয়ে দেবী নাজেহাল হলেন, সেই তখন থেকেই ধারা চলে আসছে। মন্ত্র-পড়া একরকম গুড় আছে, কাজের আগে দলের মানুষকে সেই গুড় খাইয়ে দেয়। মুহূর্তে সে ভিন্ন একজন। গলায় ফাঁস দেবার জন্য হাত নিসপিস করে। সেই মুখে বাইরের মানুষ না পেলে শেষটা হয়তো হাতের রুমালে নিজেরই গলায় দেবে টেনে ফাঁস। সিঁধকাঠির বেলাতেও তাই, হাতে ধরলে সাহেব আলাদা মানুষ। কী করি কী করি অবস্থা। যুবতীর পাশে শুয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চুকিয়ে বেরিয়ে এল নিশ্চিন্ত ঐ কাঠির গুণে। কত লোকে ঐ অবস্থায় ধর্মভ্রষ্ট হয়, ধরা পড়ে জেল খেটে লবেজান হয়। চোরের সমাজের কলঙ্ক তারা।

জুড়নপুরের ঘাটে এসে পেঁছিল সাহেব। আশালতাদের সেই ঘাট। প্রায় দুপুর তখন। ঘাটে আজ বড় মহাজনী নৌকা একখানা—গাঁয়ে গাঁয়ে লঙ্কা মসুরকলাই আর খেজুরগুড় কিনে বোঝাই দিচ্ছে। বিপদ হয়েছে, মাঝিমাল্লারা হঠাৎ কি রকম কবিতাভাবাপন্ন হয়ে নৌকো থেকে নেমে গাঙের ধারে অশ্বত্থতলায় রান্নাবান্নায় লেগেছে। ঝাঁটপাট দেওয়ার ধুম দেখে অনুমান করা যায়, আহারাদিও ঐ জায়গায় হবে। এবং আহারান্তে শীতল ছায়াতলে শুয়ে বসে গুলতানি করাও একেবারে অসম্ভব বলা যায় না। বিষম বিপদ। কিছু না হোক, সিঁধকাঠি তো তুলতেই হবে। সেই সঙ্গে ছোরাখানা যদি পারা যায়। এত পথ ভেঙে সেই জন্যে এসেছে। তুলে নিলেই হবে না, কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে। দুই উরুতে দু-খানা। খানিকটা তো সময় লাগবে—এতগুলো মানুষের দৃষ্টি বাঁচিয়ে কাজ। সেই ফুরসত কতক্ষণে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। গাঙের ধারেই বা কাঁহাতক ঘোরাঘুরি করা যায়—নজর পড়ে যাবে ওদের, সন্দেহ করতে পারে।

খুনীর সম্বন্ধে শোনা যায়, যেখানে খুন করেছে টানে টানে একটিবার অন্তত যেতে হবে সেই জায়গায়। ঝানু পুলিস ওত পেতে থাকে, অপরাধী স্বেচ্ছায় কবলে গিয়ে পড়ে।

ঘাটের উপর এসে সাহেবেরও আজ দুর্দম লোভ, আর কয়েক পা এগিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখে আসে। রাত্রিবেলা দেখেছে, দিনমানে দেখবে। অন্ধকার ঘরে ঘুমের মধ্যে আশালতা মেয়েটা বউয়ের মতো ভাব করেছিল, দিনদুপুরে সেই মেয়ের চেহারাটা ভাল করে দেখবার কৌতুহল। তার উপরে, যদি সম্ভব হয়, দেখে আসবে দিনের আলোয় এখন সে কী সব বলে, কেমন ভাব দেখায়।

দক্ষিণের পোতার ঘর, পিছনে বাঁশবন—এই ঘরে ছিল দুইবোন। জানলার নিচে মাটির দেয়ালে সিঁধ কেটেছিল, সেটা মেরামত করে ফেলেছে। পুরানো দেওয়ালের সঙ্গে নতুন মাটি মিশ খায় নি, চিনতে পারা যায় জায়গাটা।

আরও এগিয়ে সাহেব ভিতর-উঠানে এসে দাঁড়ায়। লাউমাচা এদিকে, লম্বা আকারের লাউ ঝুলে ঝুলে আছে। গাইগরু একটা মাটিতে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে বোধকরি একটি দুটি ঘাসের আশায়। পুবের ঘরের ছাঁচতলায় সারি সারি ধানের ছড়া ঝোলানো—দাওয়ায় উঠতে নামতে সর্বক্ষণ মাথার উপর ধানের আশীর্বাদ ঠেকে যায়। বাঁশবাগানের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ছোট পুকুর একটা ডোবার মতন। লকলকে

কলমিডগায় বেগ্যনি কলমিফুল ফুটে আছে অজস্র। রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোঁক করে সমারোহে রান্নাবান্না হচ্ছে। কিন্তু বাইরে কোন দিকে একটা মানুষ দেখা যায় না।

নিঃশব্দে এমন দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক। সাহেব সাড়া দেয়ঃ ঘরে কে আছেন, জল দেবেন একটু। জল খাব।

রান্নাঘর নয়, পুবের ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠে। আশালতার মা উনি —ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হিসাব মতো। কর্তা-গিন্নি থাকেন ঐ ঘরে। দিনমানে এখন অন্য মেয়েলোক যে না থাকতে পারে এমন নয়। কিন্তু কতৃত্বের ঝাঁজে বাড়ির গিন্নি বলেই তো ঠেকে। বলছেন, একটা-কিছু মুখে করে যে না সে-ই ঢুকে পড়বে, ভদ্দরলোকের বাড়ির একটা আবরুপর্দা নেই। সেদিন এই এতবড় সর্বনাশ হল। এত করে বলি, দেয়াল দেবার পয়সা না জোটে বাঁশ ফেড়ে কাচানির বেড়া তো দিয়ে নেওয়া যায়। তা শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় পায় না, ফুরসত কোথা বাবুর?

নিশ্চয় গিন্নিঠাকরুন। বাবু বলে ঠেস দিচ্ছেন ছেলেকে—আশালতার বড় ভাই মধুসূদনকে। চুরির দরুন মনের ভিতরটা জ্বলছে, কথার মাঝে ফুটে বেরুচ্ছে জ্বলুনি। নিজের বাহাদুরিতে সাহেবের তো মজা পাবার কথা—কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। তার এই উল্টো স্বভাব। এয়ারবন্ধু যত আছে সকলের থেকে আলাদা। মধ্যবিত্ত সংসার—পক্ষাঘাতে গৃহকর্তার পঙ্গু অবস্থা, কিছু জমিজমা আছে, কষ্টেসৃষ্টে দুবেলা দু-মুঠোর সংস্থান হয় কোন রকমে? কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বড়লোক দেখে জামাই করেছেন, জামাইয়ের বয়সটা আমলের মধ্যে আনেন নি। সমস্ত খবর ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া গেছে। গয়না সেই বড়লোকদের। সাহেব এতবড় সর্বনাশ করে গেছে নিরীহ পরিবারের।

ঘরের ভিতরের বকাবকি থামতেই চায় না। অপরাধ তো একঢোক জল চেয়েছে। বলছেন, গাঙ-খাল রয়েছে, সে সমস্ত চোখে পড়ে না। জলসত্র করেছি কিনা আমরা, বাড়ির মধ্যে পাছদুয়োর অবধি ম্যাচ-ম্যাচ করে মানুষ চলে আসে!

সাহেবের কিন্তু একটুও মনে লাগে না। ন্যয্য পাওনা। পাওনা অনেক বেশি —তারই ছিঁটেফোঁটা সামান্য একটু। হেন অবস্থায় চলে যাওয়া বোধ হয় উচিত, সে ইতস্তত করছে। এমনি সময় এঁটো থালা-বাটি-গেলাস নিয়ে গিন্নি বেরিয়ে এলেন। পঙ্গু স্বামীর খাওয়া সকাল-সকাল সকলের আগে সমাধা হল, বাসন কখানা ধুয়ে নেবেন। এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, ডাকছিলে কে, তুমি? কোন দিকে?

নজর তুলে দেখে সাহেব পাথর। কী সর্বনাশ! একবার ভাবে, চোঁচা দৌড় দিয়ে বেরোয়। তাতে অব্যাহতি নেই—এই দিনমানে চোর চোর বলে সারা গ্রাম পিছন ছুটে পলকের মধ্যে ধরে ফেলবে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই—সাহস করে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ফুৎকারে অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া! ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিল মা-জননীর সঙ্গে—ভিন্ন অবস্থায়। এঁরই ঠিক পায়ের নিচে শুয়েছিল। ইনি এবং ছেলে-বউ, একটি ছোট বাচ্চা। চেহারা হুবহু মনে গাঁথা আছে, ভুল হবার জো নেই। গিন্নিঠাকরুনও বুঝি চিনেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ দুটো

স্থাপিত করেছেন তার দিকে। সাহেবও ঠিক করে ফেলেছে—যত কিছু বলুন, ন্যাকা সেজে সমস্ত বেকবুল যাবে। জন্মে চোখে দেখিনি এঁদের, এই প্রথম দেখছে—এমনিতরো ভাব।

গিন্নি বললেন, জল না খেয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়? সোনাদানা নয়, শুধু একটু তেষ্টার জল। না খেয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ। দিচ্ছে এক্ষুনি, দাঁড়াও।

আশালতার উদ্দেশে হাঁক দিয়ে ওঠেন, বড়-খুকি, কানে শুনতে পাস নে? জল চাচ্ছে, এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে যা ছেলেটাকে।

সাহেবের গোলমাল হয়ে যায়। কী ভেবেছিল, আর দাঁড়াল কী রকমটা! ঘরের ভিতর উৎকট মেজাজ—বেরিয়ে এসে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়ে গঙ্গাজল। কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা, এ যেন এক ভিন্ন মানুষ কথা বলছেন।

সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, জল খেয়েই যাব আমি মা। বাইরের ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়াই, জল ঐখানে পাঠিয়ে দেন।

অর্থাৎ চোখের সামনে থেকে একটুকু সরে পড়তে দাও বুড়ি, তারপর বুঝব। জল এখন মাথায় উঠে গেছে।

বৃদ্ধা বলেন, এসে পড়েছ যখন জলটা খেয়েই বাইরে যাবে। রাগ হয়েছে তোমার, সেটা কিছু অন্যায় নয়। আমি ভেবেছিলাম কে না কে—আজেবাজে চোর-জোচ্চোর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়। সেদিন আমাদের এক মস্তবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা।

সাহেব অতএব সেই আজেবাজে চোর-জোচ্চোরের দলের মধ্যে পড়ে না। সাধুসজ্জন লোক, ঘরের ছাঁচতলায় স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। চিনতে পারেন নি বুড়োমানুষটি। এই একটা জিনিস বরাবর দেখে এল, মানুষ কেমন চট করে সাহেবের আপন হয়ে যায়। যেন গুণ করে ফেলে। চটকদার চেহারাখানা, নিরীহ চাউনি, চলাফেরার ভাবভঙ্গি—সমস্ত মিলিয়ে গুণীনের মন্ত্রের চেয়ে বেশি জোরদার। কথা বলছেন গিন্নিঠাকরুন—সত্যিকার মা সে জানে না, বোধকরি তারা ছেলের সঙ্গে এমনিভাবেই বলে থাকে!

অধীর কণ্ঠে মেয়ের উদ্দেশে বলেছেন, শুনতে পেলি বড়-খুকি? এঁটোকাঁটা নিয়ে আমি তো মেটেকলসি ছুঁতে পারব না। বাসন ক'খানা মেজেঘষে তাড়াতাড়ি নেয়ে-ধুয়ে আসি। এক্ষুনি জামাই এসে পড়বে।

আশালতা দক্ষিণের ঘর থেকে জবাব দিল: যাচ্ছি মা। আলতার শিশি খুলে নিয়ে বসেছি। এই হয়ে গেল আমার, যাচ্ছি—

সন্ধ্যার দিকে সকলে সাজগোজ করে, এই মেয়ে খাওয়াদাওয়ার বেলায় আলতা পরতে বসে গিয়েছে—ভারি তো শৌখিন মেয়ে তবে! আর ঠাকরুন বললেন তাড়াতাড়ি নেয়েধুয়ে আসবেন, তারও তো গতিক দেখা যায় না। এঁটো থালা চিতানো বাঁ-হাতের উপর ধরে সেই এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে সাহেবের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। চোখে বোধকরি পলকও পড়ে না। বিপদ কেটেছে ভেবে সাহেব নিশ্চিন্ত ছিল, এতক্ষণ পরে সেই শঙ্কার কথা উঠে পড়ে—

তোমায় কোথায় যেন দেখেছি বাবা।

সাহেব গুরুর নাম জপছে মনে মনে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলে, আজ্ঞে না, কোথায় দেখবেন? আমি এদিকে আসি নি আর কখনো। গরু কিনতে বেরিয়েছি।

একগাদা আত্মপরিচয় দিয়ে যায়ঃ গাঁয়ে ঘুরে গরু কেনা ভাল, দেখে শুনে খোঁজখবর নিয়ে পছন্দ করা যায়। তা পেলাম না তেমন; মিছামিছি হয়রানি। শেষবেশ গাবতলির হাট আছে—বিস্তর গরু ওঠে, আজকেই তো হাটবার—

বৃদ্ধা এসব শুনছেন না। বলে উঠলেন, হুঁ, নিশ্চয় দেখেছি, মনে পড়েছে—

এমনি সময়ে বাচ্চা ভাইপোটাকে কোলে করে শান্তিলতা পাড়া বেড়িয়ে এল। গিন্নিঠাকরুন হাসি-হাসি মুখে রহস্যভরা কণ্ঠে বলেন, ছোট-খুকি, বল দিকি কে ছেলেটা? দেখি, কেমন মনে আছে তোর।

শান্তিলতা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, জানিনে তো মা।

কী তোরা! তুই তো ছিলি সঙ্গে। গাজিবপীরের থানে পুজো দিতে গিয়ে পিছল ঘাটে গেলাম। ছেলেটা ধরে ফেলল। প্রাণ বাঁচাল বলতে হবে। প্রসাদ রান্না-বান্না করে একসঙ্গে খেলি তোরা সবাই। দেখ দিকি ঠাহর করে।

শান্তিলতা বলে, মা তোমার চোখের নজর একেবারে গেছে। সে তো কালোভুষো এই গাট্টাগোট্টা মানুষ।

সেই উঠানের প্রান্তে আঁস্তাকুঁড়ের পাশে ঠাকরুন বাসন ধুতে বসে গেলেন। সে মানুষ এই নয়, বুঝতে পেরেছেন। ঘটনাটা মাস পাঁচ ছয় আগেকার। জাগ্রত গাজিবপীরের থান দূরবর্তী নয়। প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দু মুসলমান অগণ্য মানুষ থানে যায়, রোগপীড়া বিপদআপদের জন্য মানসিক করে, বিপদ কাটলে ঢাকঢোল নিয়ে মানসিক শোধ দিতে যায় আবার একদিন। হিন্দুর পাঁঠা-বলি মুসলমানের মুরগি-জবাই—একই গাছতলায় পূর্বদিকে আর পশ্চিম দিকে দুই তরফের পুজো-সিন্নি চলে। খড়-পুকুরের দুই পারে দুই জাতের আলাদা রান্নাবান্না ও বিশ্রামের ঘর। সেদিন উপকারী মানুষটাকে ওরা ছেড়ে দেয় নি—বলির পাঁঠা রান্নাবান্না হল, খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় সন্ধ্যা অবধি ছিল সকলে একসঙ্গে। ঠাকরুন চোখে কম দেখেন, কিন্তু শান্তিলতার কাঁচা চোখে তফাৎ না বুঝবার কথা নয়।

দক্ষিণের ঘরের দিকে মুখ করে ঠাকরুন আবার বলে উঠলেন, রেকাবিতে করে চাট্টি মুড়কি নিয়ে আসবি রে বড়-খুকি। যা মেয়ে তোরা আজকালকার, জলের কথা বলেছি তো শুধু এক গেলাস জলই এনে ধরলি মুখের কাছে!

আশালতার গলা আসেঃ মুড়কি কোথায় রেখেছ মা?

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেনঃ রেখেছি আমার মাথায়। মুড়কি কৌচড়ে নিয়ে বাসন ধুতে বসেছি। কুলোয় আছে, নয়তো ধামায়। মাথার উপর দুটো চোখ বসানো আছে কি করতে?

সাহেবের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে বলেন, মনে পড়েছে। গুরুঠাকুর মশায়ের সঙ্গে এসেছিলে সেবার। নতুন পৈতে হয়েছে, মাথা মুড়ানো। রাত্রে সুর করে ভাগবত পড়লে—কী মিষ্টি গলা, এখনো ভুলতে পারি নি—

শান্তিলতা বলে, না মা, ঠাকুরমশায়ের ছেলে নয়।

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন বলেন, তোমার নামটা কি বল তো বাবা?

আশালতা খোঁজাখুঁজি করছিল, এই সময়ে রায় দিয়ে উঠল: পাচ্ছিনে তো মুড়কি। নেই।

নেই তবে আর কি হবে? জল চেয়েছে, তাই দাও এনে, আর কতক্ষণ ভোগাবে? আমি গেলে ঠিক পেতাম। একটা কাজ দেখেশুনে গুছিয়ে করবার যদি ক্ষমতা থাকে!

মায়ের বকুনি খেয়ে—বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে—আশালতা রাগে গরগর করতে করতে জলের গেলাস নিয়ে বাইরে আসে। বেরিয়েই ও মা, ও বাবাগো—তুমুল আর্তনাদ।

সাহেবের মুখ সাদা হয়ে গেছে। অন্ধকারে চোখে তো দেখেনি, মেয়েটা চিনল তবে কি করে? শান্তিলতা খিলখিল করে হাসছে। একটুকরো ঢিল ছুঁড়ে মারল—সাহেবকে নয়, একটা বিড়ালের দিকে। বিড়াল ছুটে পালায়। হাসিতে শান্তিলতা শতখান হয়ে ভেঙে পড়ে।

মাঠাকরুন বলেন, মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। বাঘ দেখেও মানুষ এমন চেঁচায় না।

অপ্রতিভ মুখে আশালতা জল দিতে এলো। হাত বাড়িয়ে সাহেব নেবে কি, চোখ মেলে দেখেই কুল পায় না। দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনমতীকে। স্নান করে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে ধবধবে কাপড় পরেছে, আলতা দিয়েছে পায়ে। কপালে সিঁদুরের টিপ, কী সব গন্ধ-টন্ধ মেখেছে, এই সব করছিল এতক্ষণ বসে বসে—কাছে এসে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। জান না মেয়ে, সে রাত্রে কাছে যাকে টেনেছিলে সে মানুষ আমি। চোরকে বলে রাতের কুটুম—বিদ্বান বলাধিকারী বাহার করে বলেন নিশিকুটুম্ব। নিশিকুটুম্ব আজ দিনমানে এসে পড়েছি। ওস্তাদের আশীর্বাদী সিঁধকাঠি নিয়ে চোর ছিলাম সেরাত্রে—সিঁধকাঠি বিহনে আজকে মানুষ। জোয়ান যুবা পুরুষমানুষ। আর তুমি যুবতী নারী আমার সামনে।

জলের গেলাস আশালতা হাতে দেয় না, পৈঠার উপর রেখে দিল। নিক ওখান থেকে তুলে। লোকটা কি দেখে রে অমনধারা তাকিয়ে? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আশালতার। ভয় করছে! শিশুটা কোলে নিয়ে শান্তিলতা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে—আশালতা সেদিকে তাকায়। এককোঁটা মেয়ে তার কোন খেয়াল নেই।

মাঠাকরুন তখন বাসন ধুয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছেন। আশালতা ডেকে বলে, মুড়কি তো নেই, খেয়ে ফেলেছি আমরা সব। ভাত হয়ে গেছে, বল তো ভাত এনে দিই।

ঠাকরুন ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রীত হয়ে বললেন, ভাল বলেছিস মা। জামাই আসছে বাড়িতে, দশ রকম রান্নাবান্না—দুপুরবেলা ছেলেটা শুধু-মুখে বেরিয়ে যাবে, মনটা খচখচ করছিল আমার। চাট্টি ভাতই খেয়ে যাও বাবা। দাওয়ার উপর একটা ঠাঁই করে দে ছোট-খুকি।

আশালতা ভাত এনে দেয়—নিশিকুটুম্বর সেবা আসল জামাই-কুটুম্বর আগে। সাহেব একগাল হেসে বলে, দেন তাই, মালক্ষ্মীকে কখনো না বলতে নেই।

যে ঘরে সিঁধ কেটেছিল, সেই দক্ষিণের দাওয়ায় শান্তিলতা জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিল। স্নানে যাচ্ছেন ঠাকরুন, দাওয়ার ধারে এসে একবার দাঁড়ান। পরিচয় দিচ্ছেন : আমার বড় মেয়ে ঐ ভাত আনতে গেল, ওর বিয়ে দিয়েছি এক মাসও হয়নি এখনো। আজকে এই নতুন জামাই আসছে। বউমা সাত সকালে চান করে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছেলে পাঁচবেঁকির মুখ অবধি এগিয়ে বসে আছে—সদর থেকে ফিরছে আজ জামাই—না আসতে চায় তো জোরজার করে নিয়ে আসবে। খুব বড়লোক তারা, নবগ্রামের সেনেরা—

শান্তিলতা ঠাঁই করে দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলেছে আবার। কথার মধ্যে সে প্রশ্ন করে ওঠে : বেলা তো অনেক হল। আসে না কেন এখনো ?

পাঁচবেকি তো এখানে নয়। তার উপর উজোন টেনে আসতে হচ্ছে। এইবার এসে পড়বে। না আসবার হলে একলা মধু পায়ে হেঁটে এতক্ষণ ফিরে আসত।

মধু—মধুসূদন নামে নতুন করে সাহেবের চমক লাগে। বেপরোয়া গোঁয়ারগোবিন্দ মধুসূদনের চিনে ফেলতে মুহূর্তকাল দেরি হবে না। মধুর বউ রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, নইলে সেও চিনত। শান্তিলতার কোলের এই ছেলেটাই রেলের কামরায় ছিল সেদিন। অজান্তে একেবারে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে। তার উপর লোভে পড়ে—আশালতাকে ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার দেখবার লোভে—খেতে বসে গেল। বুড়ি ঠাহর করতে পারলেন না—কিন্তু মধুসূদন দেখতে পেলে, এমন কি বউটা দেখলেও রক্ষে নেই। চিনে ফেলবে এক নজর দেখেই। এক্ষুনি আসছে মধু, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে সরে পড়তে পারলে হয় তার আগে।

মাঠাকরুন হঠাৎ ধরা গলায় বলে উঠলেন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা। বড়লোক কুটুম্ব এক-গা গয়না দিয়ে বউকে রাজরানী সাজিয়ে বাপের বাড়ি পাঠাল, সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চোরে সমস্ত নিয়ে গেছে।

[সতেজ লতার মতো যুবতী মেয়ে গয়নাগুলো অঙ্গ জুড়ে ফুল হয়ে ফুটে ফুটে ছিল। সোনার ফুল। খুঁটে খুঁটে সাহেব ফুল তুলে নিয়ে লতা শূন্য করে দিয়ে গেছে।]

ঠাকরুণ বলছেন, জামাই আসছে, ভয়ে লজ্জায় কাঁটা হয়ে আছি বাবা। কী বলব, মনে ওরাই বা কী ভাববে ! অভাবে পড়ে মেয়ের গয়না বেচে খেয়েছি, তাই যদি ভেবে বসে—

সাহেবের মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে—গয়না গলে গিয়ে এত দিনে যে টাকা হয়ে গেছে ! নয়তো সেই গয়না ছুঁড়ে দিয়ে যেত আবার এক রাত্রে এসে। প্রতিবাদ করে উঠল : তা ভাবতে যাবে কেন ? সত্যিই যখন সিঁধ কেটেছিল—

সিঁধ তো আমরাও কেটে চেঁচামেচি করে লোক-জানান দিতে পারি। অভাবে মানুষ কত কি করে—

এরই মধ্যে খপ করে বললেন, আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলি। সত্যিই তোমায় দেখেছি, কোনখানে সেটা মনে করতে পারছি নে। হাটের মধ্যে আমার মধুকে মেরে-ধরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তুমি বোধ হয় সেই ছেলেটা—সকলের সঙ্গে লড়ালড়ি করে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। ঠিক মনে পড়েছে এবার। রক্তে কাপড়-চোপড় ভেসে যাচ্ছে—মাগো মা, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে তুমি। গোড়ায় ভাবলাম, জখম তুমিই হয়েছ, পালিয়ে চলে এসেছ হাট থেকে—

এই উদ্বেগের মধ্যে বারম্বার এক ধরণের কথা ভাল লাগে না। সাহেব বলে, ভুল করছেন। আমি নই, সে অন্য কেউ—

বয়স হয়ে ঠাকরুনের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। স্মৃতিও দুর্বল। যত ভাল ভাল কাজ চাপাচ্ছেন সাহেবের উপর। বৃন্দাকে বাঁচিয়েছে সে, অথবা তাঁর ছেলেকে। নেহাৎ পক্ষে মুণ্ডিতশির গুরুপুত্র হয়ে ভাগবত পাঠ করে গেছে এ বাড়ি। যে কর্মের মধ্যে সত্যি সত্যি দেখা হয়েছিল, সেটা কিছুতে মনে পড়ে না মা-জননীর।

আশালতা রান্নাঘরে ঢুকে ভাজকে বলে, ও বউদি, কুটুম্ব এসেছে।

এসে গেল বর ? মধুসূদনের বউ মুখ টিপে হেসে তাড়া দিয়ে ওঠে : তুমি বুঝি ধোঁয়ার মধ্যে মুখ লুকোতে এলে। যাও বলছি, নয় তো চেলাকাঠের এক বাড়ি—

আশালতা বলে, উঁহু, সে কুটুম্ব নয়—আলাদা একজন। ভেবে ভেবে মা ধরতে পারছে না, মানুষটা কে। কিন্তু কুটুম্ব ঠিকই। জল খেতে চেয়েছিল, শুধু জল দিয়েছি বলে মা রেগে আগুন। দশখানা তরকারি দিয়ে ভাত বেড়ে দিতে বলল।

বউ এবারে রাগ করে উঠল : বাড়িতে জামাই আসছে—এ কোন লাটসাহেব এসে উদয় হল, আগ ভেঙে ভাত-তরকারি দিতে হবে ?

দিতেই হবে। নয় তো রক্ষে রাখবে না মা। হেসে চোখ-মুখ নাচিয়ে আশালতা বলে, চুপি চুপি বলি বউদি, চেহারায় কার্তিকঠাকুরটি, ময়ূর থেকে নেমে যেন উঠানের উপর দাঁড়িয়েছে। অত ভাল লেগেছে মায়ের তাই।

রান্না শেষ হয় নি, কড়াইয়ে তেল ঢেলে দিয়েছে, বউ সেদিকে ব্যস্ত। থালা নিয়ে আশালতা ভাত বাড়ল। ডালের সঙ্গে চিংড়িমাছ, ডাল ঢেলে নিয়েছে খানিকটা বাটিতে—

নজর পড়ে বউ রে-রে করে ওঠে : সকলের বড় মাছটা দিয়ে দিলে, এ কোন ঠাকুরজামাই বল তো ঠাকুরঝি ?

আশালতা নিরীহ ভাবে বলে, কি জানি কোনটা বড় আর কোনটা ছোট। তোমাদের নিক্তি-ধরা ওজন বুঝিনে আমি বাপু। জামাইয়ের মাছ সিকি আন্দাজ যদি কমই হয়, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বউ কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলে, হুঁ, বুঝতে পেরেছি। মজেছ তুমি কার্তিক ঠাকুরটি দেখে।

পিঁড়ির উপর সাহেব বসে আছে ভাতের অপেক্ষায়। ইচ্ছাসুখে নয়, না বসে উপায় নেই সেই জন্য। দুই পাহারাদার সামনে খাড়া—শান্তিলতা আর গিন্নি-

ঠাকরুন। স্নানে যাওয়া এখনো ঠাকরুনের হয়ে ওঠেনি, সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে মেতে গেছেন। সাহেব যেন কতকালের চেনা, কত আপন! কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করে যান—স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন চলছে, কোনখানে দেখেছেন একে? কবে? রেলের কামরার মধ্যে সেই বিচিত্র ঘটনার কথা কেউ যদি এখন মনে করিয়ে দেয়, ঘাড় নেড়ে ঠাকরুন নিজেই বেকবুল যাবেন। চুরির কাজের মধ্যে এই ছেলে—অসম্ভব, শত্রুতা করে বলছে।

আশালতা দাওয়ায় উঠে সাহেবের সামনে ঝুঁকে পড়ে ভাতের থালা রাখল। ব্যবধান বিঘতখানেক বড় জোর। কিন্তু সে রাত্রে একেবারে কিছু ছিল না, গায়ে গায়ে শুয়েছিল দুজনে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য তন্নতন্ন করে খবর নিয়ে গিয়েছিল। জামাই বড়লোক বটে, কিন্তু বয়সে আধ-বুড়ো, চেহারায় কালোকুচ্ছিত। আলতা পরে গন্ধ মেখে এতক্ষণ ধরে সাজগোজ করেছে সেই লোকের মন ভোলাবার জন্য। দিন-মানে একবার দেখ না রূপসী তোমার সেই বরের পাশাপাশি মনে মনে মিলিয়ে। কিছু অভ্যাসক্রমে খানিক হয়তো শিকড় পোড়ানোর ধোঁয়া ও নিদালি-বিড়ির গুণে এবং খানিকটা কারিগরের আঙুলের সম্মোহনে অন্ধকারের মধ্যে আলিঙ্গনে বেঁধেছিলে, কিন্তু আমাদের মতন আঁধারে দেখবার চোখ যদি থাকত চেঁচিয়ে উঠতে নাকি সতী-সাধ্বী বউয়ের যা করা উচিত?

যৌবন জ্বলছে যেন দুপুরের রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এরই গায়ে গা ঠেকিয়ে-ছিল, যত ভাবছে ততই এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সাহেব। বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বুঝি একবাড়ি লোকের চোখের সামনে—যা হবার হোক। রাত্রিবেলা গায়ের গয়না চুরি করে নিয়েছিল, ডাকাতি করে আজকে গোটা মানুষটাকেই নিয়ে বুঝি পালায়।

এমনি সময় বাইরের দিকে কলরব। মধুসূদনের গলা: ও মা, এসে গেছি আমরা—

জামাই নিয়ে এসেছে। শান্তিলতা ছুটল। গিন্নিঠাকরুনের স্নানের কথা মনে পড়েছে, এঁটোকাঁটা ছুঁয়ে জামাইয়ের কাছে দাঁড়াবেন কেমন করে? দ্রুতপায়ে বাঁশ-তলার পুকুরে চললেন। মধুসূদনের বউ খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দরজায়, নজর ঐ বাইরের দিকে। সে নজর সাহেবের দাওয়ার দিকে ফিরবে না, সেটা জানা আছে। আশালতা ঘরে ঢুকে গেছে, সে-ও বর দেখছে সুনিশ্চিত। এইবারে ফুরসত। বড় গলদা-চিংড়ি সাহেব সবেমাত্র থালায় নামিয়ে নিয়েছে। কথা বলতে বলতে মধুসূদন ভগ্নিপতির হাত ধরে উঠানে এসে পড়ল। লহমার তরে দেখে নিয়েছে সাহেব। সেই ফাটা কপাল—জাঁক করে যাকে বলেছিল জয়তিলক।

সাহেব আর নেই। শূন্য পিঁড়ি। পাখি হয়ে উড়ল, কিংবা বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাথায় উলুখড়ের আঁটি, বলাধিকারীর ফুলহাটায় সাহেব এসে হাজির। বোঝা দাওয়ার উপর ফেলল। পাকানো গামছার বিড়ে মাথা থেকে নিয়ে বাতাস খেল দু-চারবার। বংশীকে ডেকে চাপাগলায় বলে, সমস্ত এসে গেছে—কাঁঠি ছোরা লেজা

রামদা, যা সমস্ত রেখে এসেছিলে। আঁটি খুলে তুলেপেড়ে রাখ।

হেসে বলে, জলজ্যান্ত মানুষের ঘরে ঢুকে সিঁধের মুখে ধনসম্পত্তি বের করে নিয়ে আসি, জলের নিচে ক'টা জিনিষ আনব এ আর কত বড় কথা !

আশালতাদের বাড়ি ছেড়ে সাহেব সোজা নদীর ধারে অশ্বত্থের মাথায় চড়ে বসল ঃ আপাতত কিছু নয়, পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে থাকা। মহাজনি নৌকো বিদায় হয়েছে, কপালক্রমে ঘাট একেবারে খালি। তাই বলে নামা চলবে না, শখ করে নদী-স্নানেও এসে পড়তে পারে শ্যালক আর ভগ্নিপতি। এলো না অবশ্য। খানিক পরে আন্দাজ করে নিল খাওয়াদাওয়ায় বসেছে এইবার। গুরুভোজনের পরেই তো গড়িয়ে পড়া। এবং হল তো বউয়ের সঙ্গে নতুন জামাইয়ের নিরিবিলি ঘরে কিছু ফষ্টিনষ্টি।

সাহেব পরম নিশ্চিন্তে ধীরেসুস্থে জিনিসগুলো তুলে ফেলল। লেজার লম্বা আছাড় খুলে জলে ছুঁড়ে দেয়। মতলব ঠিক করা আছে—চরের উলুবনে চাষীরা উলু কেটে কেটে আঁটি করে রেখেছে ; ঘর ছাইতে লাগে। তারই একটা নিল মাথায় তুলে। সিঁধকাটি ও ছোরা নিজ অঙ্গের সমান—ঐ দুটো বস্তু আলাদা রাখতে পারে না, কাপড়ের নিচ উরুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। আর সমস্ত উলুর আঁটির ভিতর গোঁজা। সদর-পথের উপর দিয়ে বুক চিতিয়ে চলে এসেছে সাহেব। চাষাভুষো লোক হামেশাই এমন যায়, চোখ তুলে কেউ তাকায় না।

আঁটি থেকে বের করে সেরে সামলে রাখ বংশী—

বলাধিকারী সাহেবকে দেখে বললেন, একটা চিঠি এসেছে গণেশচন্দ্র পালের নামে। গণেশটা কে, ভেবে পাইনে। বংশী বলল, তোমার তোলা-নাম।

চিঠির নামে সাহেব রীতিমত ভড়কে যায়।

আমার ? আমায় কে চিঠি দিতে যাবে ? গণেশ নামই ছিল নাকি গোড়ার দিকে। শোনা কথা, জ্ঞান হয়নি তখন আমার। কারণ সে নামও মনে নেই, আমার নিজেরও নেই। চিঠি অন্য কারো হবে, ঠিকানা ভুল করে এসেছে।

বলাধিকারী মুখ টিপে হেসে বলেন, তোমার মা লিখেছে।

সাহেব জ্বলে উঠল ঃ মা নেই আমার। থাকলে তবে তো মা লিখবে চিঠি।

বলাধিকারী বিশ্বাস করলেন, মনে হয় না। আগের কথারই জের টেনে বলছেন, বিয়েথাওয়া দিয়ে শোধন করে তুলতে চায় তোমার মা। গব্যরসে যেমন পারা শোধন করে। বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরতে দেবে না।

হাসতে হাসতে তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। পোস্টকার্ডের চিঠির আদ্যন্ত পড়েছেন, তাই আরও বেশি হাসি সাহেবের উৎকট রাগ দেখে। রাগারাগি করে ছোঁড়াটা ঘর থেকে পালিয়েছে, মা তাকে বাঁধার কলাকৌশল করছে। খুব সম্ভব প্রণয়ের ব্যাপার —মনের মানুষ না পেয়ে মনোদুঃখে পালিয়ে এসেছে।

হেসে গেলেন বলাধিকারী—হাসিটা নিদারুণ রকম ব্যঙ্গের। সাহেবের বুকে ধারালো ছুরির মতো কেটে কেটে বসে। বিয়ে করে ঘর-লাগা শিষ্ট মানুষ হয়ে যাবে, এত বড় অপদার্থ ভাবলেন তাকে। সে যেন আর এক বংশী। বংশীও কথাটা

শুনে নিল—কত রকম ঠাট্টাতামাসা করবে সে, সকলকে বলে দেবে।

উপস্থিত বংশীর কাছেই সাহেব সাফাই দিচ্ছে: মা-টা নেই আমার। কোনদিন ছিল না।

চিঠি হাতে করে এমনি সময় জগবন্ধু বলাধিকারী ফিরে এলেন।

নেই বুঝি মা তোমার? পড়ে দেখ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। কুড়িখানেক কনে দেখা হয়ে গেছে, গোটা চার-পাঁচ মনে ধরেছে তার ভিতর। মা নেই তো করছে কে এত সব? ছেলের বিয়ে দিয়ে গৃহস্থালী পাতাবার সাধ মা ছাড়া কার এমন?

থেমে গিয়ে হঠাৎ কৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, রানীকে জানো তুমি?

চমক লাগে সাহেবের। এত খবর ঐটুকু চিঠিতে। বিয়ের কথা, আবার রানীর কথাও! মুখ টিপে হাসছেন বলাধিকারী। প্রণয়ের ব্যাপার ভেবেছেন, কিন্তু সাহেবের একেবারে নির্বিকার ভাব। এটুকু যদি না পারবে, অতবড় ওস্তাদের কাছে শিখল কি এতদিন ধরে? চোর গ্রেপ্তার করে দারোগা কত রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তার উপরে বাঘা-বাঘা উকিল-হাকিমের জেরা—তুমি নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেকবুল যাচ্ছ আগাগোড়া। সিকিখানা কথা আদায় করতে পারবে না কেউ। শিক্ষা তো এই।

রানীকে চেনো না?

সাহেব বলে, দুনিয়া জুড়ে কত রাজা কত রানী রয়েছে। তাদের চেনবার লোক কি আমরা?

মুকুট-পরা রানী নয়। রানী বলে একটা মেয়ে। এখন তার অনেক টাকা। খুব ধনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বুঝি?

দেন তো দেখি—

ফস করে পোস্টকার্ডটা একরকম ছিনিয়ে নিল জগবন্ধু বলাধিকারীর হাত থেকে। চিঠি চোখের সামনে ধরে বলে, বুঝেছি, নফরকেষ্টর কারসাজি। হাতের লেখা, লেখার বয়ান সমস্ত তার। মার খেতে খেতে পালিয়ে বাঁচল—সেই রাগ রয়েছে তো! দল থেকে বের করে আবার আমাকে কালীঘাটে নিয়ে ফেলতে চায়। তাই তো বলি, সরকারের জল-পুলিসে পাত্তা পায় না, আর পোস্টকার্ডের চিঠি এতগুলো গাঙ-খাল স্টেশন-বন্দর পার হয়ে এসে ধরে ফেলল—পিছনে চর না থাকলে এমন হয় না। নফরাই ঠিকানা জানে, সে ছাড়া অন্য কেউ পারত না।

নফরকেষ্ট মানুষটা এই ফুলহাটাতেই ছিল, সাহেবের সঙ্গে এসেছিল। কাজের মধ্যে সর্বনাশা বেকুবি করল, তুমুল কাণ্ড হতে হতে কোন রকমে বেঁচে এল সবাই। অনেক রকমে জগবন্ধু তাকে দেখেছেন। সেই মানুষের এমন ক্ষমতা, বিশ্বাস করবেন কেন? বলবেন, ইতি—'তোমার মা' বলে সই করেছে, কিন্তু সুধামুখী দাসী।

সাহেব আরও জোর দিয়ে বলে, সুধামুখী-টুখি কিচ্ছু নয়, রানীও কেউ নেই। আগাগোড়া বানানো।

ঝকমকে হস্তাক্ষর, এমন খাসা রচনাশক্তি—রীতিমত গুণীলোক তবে তো! বললে না কেন এখানে যখন ছিল। তবে আর ছেড়ে দিই! চাকরি দিয়ে কাছে কাছে

রাখতাম। আমার আত্মজীবনী বলে যেতাম, নিজের মতন করে সে লিখত। নবেল-নাটক হার মানত সেই বইয়ের কাছে।

হাসতে হাসতে জগবন্ধু আবার বললেন, নফরকেষ্টও কিন্তু বলত, বাপ হয় সে তোমার। বংশীকে বলেছে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে বলেছে আরও বলেছে কতজনকে। তুমি বলছ বানানো। বানানো বাপ, বানানো মা। তুমি কি স্বয়ম্ভু হয়ে ভুবনে এসেছ বাপধন? স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—স্বর্ণ অণ্ডে জলের উপর জন্ম?

সাহেব রাগ করে বলে, বিশ্বাস হবে না জানিই তো। চোরের কথা কে বিশ্বাস করে!

বলাধিকারী তখন কোমল সুরে বলেন, যাদের ঘরের কনে বাছাবাছি হচ্ছে, পিতামাতা গাঁইগোত্র নিয়ে তারাই সব মাথা ঘামাক। আমাদের বিশ্বাস হল না-হল কী যায় আসে! পড়ে ফেল চিঠিখানা, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। কালীঘাটে নিয়ে তোলবারই যদি ফিকির—যে বিদ্যে শিখেছ, শহরে গিয়ে কিন্তু কোন সুবিধে হবে না। শহরের কাজের ধরন আলাদা। সে হল তাস-পাশা খেলার মতো—একটুখানি জায়গার মধ্যে এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তোমার কাজ হল দরাজ জায়গায় খেলা দেখানো। বড় বড় গাঙ ভারি ভারি গাঁ-গ্রাম বনজঙ্গল ডাঙা-ডহরের এলাকা জুড়ে দিগ্বিজয়ী বাহিনী। কেনা মল্লিকের নামই শুনেছ, মরশুমে এসে বেরিয়ে পোড়ো তাদের কোন একটা দলের সঙ্গে। তোমার মতন কারিগর লুফে নেবে তারা। বৃহৎ কাজের নমুনা দেখে এসো স্বচক্ষে। মস্তবড় জীবন সামনে—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে তারপর পথ ঠিক করে নাও।

চিঠি নিয়ে সাহেব চলে গেল। গেল নির্জন খালের ধারে। ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুলে যাতায়াত ছিল, তার উপরে বলাধিকারী মশায়ের সঙ্গে এতগুলো দিন। সঙ্গদোষে এখানেও দশ-বিশটা বই পড়ে ফেলেছে। জগবন্ধু বলেন, ও সাহেব, তোমার যা মাথা, নিয়মিত লেখাপড়া করলে—

সাহেবের তুড়ক জবাব: করলে কচু হত। হতাম আর এক মুকুন্দ মাস্টার! ওরে বাবা, কী বাঁচা বেঁচে গিয়েছি!

সুধামুখী সাহেবকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল। তারই জেদে ইস্কুল যেতে হয়েছিল কিছুকাল। চিঠি অতএব না পড়তে পারার কথা নয়। মুক্তোর মতন ঝক-ঝকে অক্ষরগুলো সাজিয়ে গেছে—না পড়ে চিঠির উপর শুধুমাত্র একবার হাত বুলিয়েই বোধকরি মর্মকথা বলে দেওয়া যায়।

কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে সুধামুখী স্বপ্ন দেখছে।

সাহেবের বিয়ের আগেই বস্তি ছেড়ে তারা ভদ্রপাড়ায় গিয়ে উঠবে। কালীঘাট থেকে অনেক দূরে, কালীঘাটের লোক যে পাড়ায় না যায়। বস্তির ঘরে পুরুষ ডেকে ডেকে এনে দিন গুজরান করত, সাহেবের বউ সে কথা জানবে না, নতুন পাড়ার কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। মনের বাঞ্ছা সুধামুখী কতদিন মুখে মুখে বলেছে—সাহেবকে বলেছে, নফরকেষ্টর কাছে বলেছে। পিছন-পথের সকল পঙ্ক গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে নতুন পাড়ার নতুন জীবনে যাবে। পোস্টকার্ডের চিঠিতে

খোলাখুলি লেখা চলে না। কিন্তু বরানগরে ঘর দেখে পছন্দ করে এসেছে—বাসা বদলের মানেই তো সেই পুরানো অভিপ্রায়। অথচ বস্তির নতুন মালিক হচ্ছে নাকি অন্য কেউ নয়—রানী। টাকা হয়েছে রানীর, মাটকোঠা ভেঙে ইতিমধ্যেই তাদের দু-কুঠুরি দালান হয়ে গেছে। বস্তি ছাড়তে হলে সুধামুখীর রাতারাতি পালাতে হবে—চোখের উপর দিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই, রানী সে মেয়ে নয়।

সাহেবকে বলাধিকারী ঠাট্টা করে বলেন স্বয়ম্ভু। বিস্তর পুঁথিপত্র পড়া আছে, তাই দেবতাগোঁসাইয়ের তুলনা দিয়ে বললেন। দেবতা না হয়ে সাহেব হল সিঁধেল চোর। বাপমায়ের ব্যাপারটা কিন্তু তা-বড় তা-বড় দেবদেবী মুনিঋষিদের মতোই গোলমেলে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মা হরিণী, সীতা লাঙলের ফলায় উঠে এলেন, বশিষ্ঠ জন্ম নিলেন ভাঁড়ের মধ্যে—

এই কথাবার্তার সময় বংশীটা ছিল। কৌতূহলে এক সময়ে বলল, নফরা আমাদের কাছেও বলেছে কিন্তু। নেশার মুখে বেশি করে বলত, আর হাউহাউ করে কাঁদত। সে নাকি বাপ হয় তোমার—

সাহেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভিন্ন কথা বলে এখন ঃ হতে পারে।

বলাধিকারী মশায়ের কাছে তবে যে 'না' বলে দিলে ?

সাহেব বলে, না-ও হতে পারে। মিথ্যুকে আর সত্যবাদীতে মিশাল দুনিয়া। সত্যি মিথ্যে কোনটা সে বলত, কে জানে ?

বংশী আবার জিজ্ঞাসা করে, আর ঐ মায়ের কথাটা—বললে যে মা নেই তোমার ?

সাহেব দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে, মা নেই তো ভবধামে এলাম কি করে ? জন্মেছি যখন মা ঠিক আছে একটা।

হাসছে সাহেব। হেসে উঠে বলে, অত খোঁজ কেন রে বংশী ? মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই করতে চাও ? সবেধন একটা ছেলে তো তোমার। তা দুনিয়া আজব—বউয়ের পেটে না হলেও কত মেয়ে কত দিকে জন্মে থাকতে পারে। সেই মুনিঋষির কাল থেকেই হয়ে আসছে!

জ্ঞান হওয়া অবধি এই বড় সমস্যা সাহেবের—কে তার বাবা ? মা কে ? নফরটা বড় আঁকুপাকু করে—কিন্তু নফরকেষ্ট নামের বদলে নফরকালি বলে তার মিশকালো রঙের জন্য—ঐ বাপের সাহেব হেন ছেলে কেমনে হতে পারে ? সুধামুখীও তেমনি মা নয়—হাড়গিলের শাবক হাড়গিলেই হয়, মানুষ হয় না কখনো। তবু কিন্তু মনটা কী রকম হয়ে আছে সেই থেকে—সুধামুখীর চিঠি যখন তখন চোখের সামনে মেলে ধরে। হঠাৎ এক সময় দুর্দিবার ঝোঁক উঠল—সাহেব এক বেলার পথ পোস্টঅফিস অবধি গিয়ে পোস্টমাস্টারকে দিয়ে ইংরেজিতে ঠিকানা লিখিয়ে চিঠির জবাব ডাকে দিয়ে এল ঃ চাকরিতে আছি আমি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। ইতিমধ্যে কিছু টাকাও পাঠাচ্ছি, নতুন বাসার দরুন বায়না দিতে হয় তো দিও।

কালীঘাট ছাড়বে সুধামুখী, কিন্তু শহর ছাড়ার কথা মাথায় আসে না। আসবে চলে পাকারাস্তা আর কলের জলের মোহ কাটিয়ে, পিছনের জীবন বিস্মৃতির জলে

ডুবিয়ে দিয়ে। কোন এক বিশাল গাছে ঢেউয়ের আছাড়িপিছাড়ি, তারই কূলে বাড়ি তুলবে। সুধামুখী হল শাশুড়ী, আশালতার মতো একটা ডাগরডোগর বউ। গোলপাতার ছাউনির ঘর একটা-দুটো, লাউয়ের মাচা উঠানে, লম্বা লম্বা লাউ ঝুলে আছে। কানাচের ছোট্ট পুকুরে প্যাক প্যাক করে পাতিহাঁস নামে সকালবেলা। মাঘ মাসে ধানের পালায় পালায় উঠানে পা দেবার জায়গা থাকে না। বাচ্চাছেলে থপথপ করে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ধানের পালার আড়ালে আবডালে। আশালতা ছুটে গিয়ে ধরে তোলে বুকের উপর ঃ মাগো মা, চলে যাচ্ছিল বাঁশতলার পুকুরের দিকে, কী যে করি এই ডাকাতটুকু নিয়ে !

যুবতী নারীর গায়ে ঠিক বিষ থাকে। বিষের ছোঁয়া সে রাত্রে গায়ে লেগেছিল, তারই জ্বালায় বংশীর কাজটা সে নিজে নিয়ে নিল। সিঁধকাঠি আনার নামে চলে গিয়েছিল জুড়নপুর গাঁয়ে আশালতার কাছে। সুধামুখীর মতন সাহেবকেও ঠিক নেশায় ধরেছে, নেশার ঘোরে সুধামুখীর চিঠির জবাব দিয়ে এল। কিম্বা মনের গড়নটাই তার এমনি। মনের উপরে যখন তখন স্বপ্ন খেলে বেড়ায়। বাপ কিম্বা মা একজনের মন বোধহয় এইরকম ছিল, সাহেব তাই পেয়েছে। মা কিম্বা বাপের একজন ছিল ভাল, খুব ভাল—অপর জন রাক্ষস।

জন্মলাভের সময় শিশুর যে জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না ! ক্ষুদে শিশু চোখ পিটপিট করে দেখছিল সেই রাক্ষস বাপ বা রাক্ষসী মায়ের ষড়যন্ত্র, কিন্তু বড় হয়ে মনে নেই আর কিছু। তা হলে সত্যিকার বাপ খুঁজে বের করে ফেলত। কিম্বা সেই মা-জননীটিকে। কী করত তখন ! চুলের মুঠি ধরত গরীয়সী জননীর ঃ বাপের নামটা বল্, বাপ চিনিয়ে দে। চুলের মুঠি ধরে বনবন করে পাক দিত। বয়সটা কত হবে এখন সাহেবের ? আঠার অথবা কুড়ি। সঠিক বলতে পারে সুধামুখী। সেই ততটা বছর আগে এই কব্জির জোর আর মানুষ চেনবার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে জন্ম নিতে পারত যদি !

চলে যাই সেই আঠারো অথবা কুড়িটা বছর পিছিয়ে সাহেব-চোরের যখন জন্ম। কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে—গঙ্গার ঠিক উপরে বস্তি। দোতলা মাটকোঠা। সুধামুখী ও আর কতকগুলো মেয়ে থাকে।

দুই

আদিগঙ্গার উপরে মাটকোঠা। মেয়েরা থাকে। বিকালবেলা সেই মেয়েদের সাজগোজের ধুম। সন্ধ্যা থেকেই রাজকন্যা এক একটি। পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেলা দেড়প্রহর। তখন বিসর্জনের পরের প্রতিমার মতো খড়-দড়ির বোঝা।

এক বিকালে সুধামুখীর সাড়া-শব্দ নেই, ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় টোকা পড়ে, ফিসফিসিয়ে তার নাম ধরে ডাকছে।

ভিতর থেকে সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ঃ শরীর ভাল নেই। চলে যাও।

মিহি গলায় সুর করে ডাকছিল, মানুষটা এবার খিকখিক করে হেসে উঠে।

বুঝতে পেরেছে সুধামুখী, নিঃসংশয় হবার জন্য তবু একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কে?

গলায় চিনলে না, হায় আমার কপাল! নফরকেষ্ট আমি গো। নফরা, নফর-কালি—যেটা বললে বোঝ। দুয়োর এঁটে দিয়ে কার আদর-সোহাগ হচ্ছে শুনি?

এ হেন কথার উপরেও সুধামুখী বাপ তুলে মা তুলে করকর করে ওঠে না। প্রেমের গৌরচন্দ্রিকা হল গালি—ঐ বস্তুর লোভে নফরকেষ্ট মজে আছে, এত কালেও নেশা কাটে না। খানিক সে হতভম্ব হয়ে থাকে। একটা-কিছু হয়েছে আজ ঠিক, বড় রকমের কোন গোলমেলে ব্যাপার।

বলে, খবর আছে। দুটি বাবু গান শুনতে আসবে আজ।

বললাম তো শরীর গতিক খারাপ। পেরে উঠব না, বল গিয়ে সেই বাবুদের।

নফরকেষ্ট এবারে সত্যি রেগে গেল: স্বর্গ-মর্ত্য চুঁড়ে মানুষ আনব, এক কথায় উনি নাকচ করে দেবেন। খোল না দরজা, কী হয়েছে দেখি।

সুধামুখীর এবার নরম হতে হয়। নফরকেষ্টর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক। বয়সের সঙ্গে কুঞ্জবনের বিহঙ্গেরা পিঠটান দিয়েছে, শুধু এই নফরায় ঠেকেছে। কুহু-ডাকা কোকিল নয়, নিশিরাত্রের পেঁচা। অনেক দিনের মানুষটা, সেসব দিনের একমাত্র অবশেষ।

একদিন নফর ভাবে গদগদ হয়ে মনের কথা বলে ফেলেছিল। এমনি এক বিকাল-বেলা। সুধামুখী স্নান করে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে, পাউডার বুলাচ্ছে মুখে, গয়না-গাটি পরছে। নফরকেষ্ট উদয় হয়ে হঠাৎ প্রেমগুঞ্জন শুরু করে দিল: ভালবাসি, তোমার মতন কাউকে ভালবাসিনি আমি জীবনে।

সুধামুখীর হাত জোড়া, এতগুলো কথা তাই বলতে পেরেছে। কানের ছিদ্রে টাবজোড়া লাগানো শেষ করে ধাই করে চাপড় কষিয়ে দিল নফরকেষ্টর গালে। পাহাড়ের মতো জোয়ান পুরুষটা হকচকিয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

মিথ্যে বলবে না। অত সব বানানো কথা তোমার মুখে শুনতে পারিনে।

মিথ্যে বলছি, কেমন করে জানলে? ভাল না বাসলে পিছন পিছন ঘুরি কেন দিনরাত?

বউ আমল দেয় না, বারো মাস বাপের বাড়ি পড়ে থাকে, সেইজন্যে। বউয়ের সোহাগ পেলে থুতু ফেলতেও আসতে না। কিন্তু দিনে আসতে মানা করে দিয়েছি না? দিনমানে কিছু নয়, তোমার ভালবাসা রাত্রে—গভীর রাত্রে। সন্ধ্যারাত্রের মানুষেরা ভালটাল বেসে চলে যাবে, তারপরে। তারা টাকা দিয়ে ভালবাসে, তোমার মুফতের ভালবাসায় তো ক্ষিধে মরবে না। রাত করে এসো—ভালবাসা পাবে।

নিশিরাত্রে নফরকেষ্টর আসার সময়। সুধামুখীর দিনকাল এখন খারাপ—আপোসে বড় কেউ ভালবাসতে আসে না সন্ধ্যারাত্রে আগেকার মতন। তদ্বির করে আনতে হয়। সে তদ্বির সুধামুখী নিজে তো বটেই, নফরকেষ্টও করে থাকে। আজকে তেমনি এক খবর নিয়ে এসেছে।

নফর বলে, দেখি কী হয়েছে তোমার।

গায়েগতরে ব্যথা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। চোখে দেখে কী বুঝবে তুমি ?

আরও খানিকটা ইতস্তত করে ধীরেসুস্থে সুধামুখী দরজার খিল খুলে দিল। আজকে যা হয়েছে, ঠিক এমনি জিনিসই একদিন ঘটেছিল তার জীবনে। পুরানো কথা নফরকেষ্টর জানতে বাকি নেই। সে এসে দেখবে, বড় লজ্জা হচ্ছে। ভয়ও বটে। যদি সে খোঁটা দিয়ে কিছু বলে বসে। বহুকালের ক্ষতে রক্ত ঝরবে আবার।

তা হলেও খুলতে হয় দরজা। খুলতে খুলতে সহজভাবে একটা সাফাই গেয়ে রাখে ঃ যেটা ভাবলে, মোটেই কিন্তু তা নয়। বাইরের মানুষ নেই ঘরে। থাকলে কেন বলব না, কাকে ডরাই ?

খুব আড়ম্বর করে নফরকেষ্ট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আলনার কাপড়চোপড় সরিয়ে দেখে। ঘাড় লম্বা করে বড় আলমারির পিছনটা দেখে নেয়। এসব সুধামুখীকে চটাবার জন্য। চটে গিয়ে গালিগালাজ করবে অন্য দিনের মতো। নিষ্প্রাণ ঘর অকস্মাৎ রসে টইটম্বুর হবে, উঠানে জানলার সামনে হয়তো বা অন্য মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে যাবে। ভারি সে এক মজা !

কিছুই না। পালঙ্কের পাশে গিয়ে নফরকেষ্টর নিজেরই মুখে বাক্য নেই। দুষমণ চেহারার পুরুষ, মহিষের মতো মোটা, মহিষের মতো কালো, টকটকে রাঙা চোখে চেয়ে দেখে না—যেন রক্ত শুষে নেয়। সেই দৃষ্টিদুটো দিয়ে পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে যেন। পালঙ্কের গদির উপরে শাড়ি ভাঁজ করে এক বাচ্চা শুইয়ে দিয়েছে।

নফরকেষ্ট বলে, সুধা, তুমি মিছে কথা বললে। মানুষ নেই নাকি ঘরে ?

একগাল হেসে সুধামুখী বলে, বয়স একদিন কি দুদিন। এই আবার মানুষ নাকি ? রক্ত-মাংসের দলা—

গভীর কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, রক্ত-মাংস নয় গো, মাখন। মাখনের পুতুল গড়ে পাঠিয়েছেন বিধাতাপুরুষ।

সুধামুখী কোথা থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। দরজা খুলতে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার এক ছিটে মধু আঙুলের ডগায় লাগিয়ে বাচ্চার মুখে ধরল। চুকচুক করে কেমন সেই আঙুলটা চুষছে।

নফরকেষ্ট বলে, রাক্ষস। তোমার আঙুলসুদ্ধ না খেয়ে ফেলে !

হেসে আবার আগের প্রসঙ্গই শুরু করে ঃ বাচ্চাছেলে মানুষ না-ই হল, বাইরের বটে তো ! পুরো সত্যি তবে হল কই ?

সুধামুখী বলে, বাইরের কেন হবে ? আমার ছেলে।

তোমার ? কবে হল গো ?

আজ সকালে।

পালঙ্কের কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথার পিঠে কথা দিয়ে রসের ঝগড়া চলল খানিকক্ষণ। নফরকেষ্ট ব্যাপার খানিকটা আন্দাজ করেছে। ঘাড় নেড়ে বলে, ছেলে তোমার নয়—আমার, আমার। সকাল থেকে পাচ্ছিলাম না খুঁজে, এখানে এসে

জুটেছে কেমন করে বুঝব ?

ফিক ফিক করে হাসে একটু আপন মনে। বলে, কালকুটি পাথরের বাটি, তোমার আব্বা দেখে বাঁচিনে সুধামুখী ! মুখের উপর বলছি, রাগ করো না। ছেলে তোমার হলে, ঐ যে কাপড়ের উপর শুইয়ে দিয়েছ—ছেলের ঘামের কালিতে ওটা এতক্ষণ কাল হয়ে যেত।

সুধামুখীর ভারি ভাল মেজাজ, কিছুতে আজ রাগ করে না। বলে তুমি কিন্তু নফরকালি সাক্ষাৎ কন্দর্পঠাকুর। চেহারায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। ছেলে তোমার, একনজর দেখেই লোকে সেটা বলে দেবে।

নিজ অঙ্গের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট বলে, তা কেন। আমার বউ দেখনি তো। মাগী আধা-মেমসায়েব। ছেলে যদি মায়ের রং পেয়ে থাকে ?

সুধামুখী তর্ক করে : আমার বেলায়ও বা সেইটে হবে না কেন ? কতলোক আসে—তার মধ্যে যে জন ওর বাপ, সে হল খাঁটি বিলাতি সাহেব। ছেলে বাপের মতন হয়েছে।

নফরাকে কোণঠাসা করবার জন্য হঠাৎ আবার বলে ওঠে, তবু যদি একদিনের তরে ঘরবসত করত তোমার মেমসাহেব বউ !

ব্যথার জায়গাটায় নিষ্ঠুর সুধামুখী ঘা দিয়েছে। হাসিখুশি রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে গরল উঠে গেল। মেজাজের মুখে নফরকেষ্ট সমস্ত খুলে বলেছে সুধামুখীর কাছে। কথা সে পেটে রাখতে পারে না, বলেকয়ে খালাস। খুব সুন্দরী বউ নফরার, হাজারে অমন একটা হয় না।

সুধামুখী বলে, কতই তো মেম আছে দুনিয়ায়। ট্রামরাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, চৌরঙ্গীপাড়ায় ডজন ডজন মেমসাহেব। লঙ্কায় সোনা সস্তা—তোমার কোন মুনাফা তাতে ?

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, বিয়ে-করা বউ আমার। মন্তোর পড়ে সাতপাক ঘোরানো। বড় শক্ত গিঁঠ—তিন সাতে একুশটা উল্টো পাক দিলেও ফাঁক কাটিয়ে বেরুবার জো নেই। যাবে কোথায় ? আজ না হল কাল, কাল না হল পরশু—

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি খারাপ কিনা ! ভাল হলে আসবে বলেছে।

খাওয়ানো শেষ হয়েছে। মধুর শিশি কুলুঙ্গিতে রেখে সুধামুখী নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, ভাল হয়ে গেলেই তো পার।

সে আর এ জন্মে হবে না। লেখাপড়া করিনি, স্বভাব নষ্ট করে ফেলেছি। নইলে যা বউ আমার—পেটে ছেলে ধরলে ঠিক এই জিনিসই বেরুত। কিন্তু আমিও ছাড়ছিনে। ভাইকে সব খুলে বললাম, ভাল হতে যদি না-ই পারি টাকা হলে তোমার বউদি এসে পড়বে ঠিক। দিনরাত টাকার ধান্দায় ঘুরি। হাতে কিছু জমলেই বাড়ি চলে যাই। তোমায় আর কি বলব, কোনটা তুমি জান না সুধামুখী ? রমারম খরচা করি বাড়ি গিয়ে। হাটে গিয়ে সকলের বড় মাছটা কিনি, মানুষজন ডেকে ডেকে খাওয়াই। বুঝলে না, মাছ মারতে গিয়ে চার ফেলে যেমন আগে—

চারের গন্ধে মাছ আসে। শ্বশুরবাড়ি তিন ক্রোশ পথ—খবর পৌঁছুতে দেরী হয় না। চার ফেলেই যাচ্ছি—মাছ আসে আসে, আসে না। একবার প্রায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু টাকাকড়ি তদ্দিনে ফুঁকে গেছে। চারেই সব খরচা হয়েছে, টোপের মসলা নেই। পালিয়ে এলাম।

হেসে উঠল উদ্দাম হাসি। মস্তবড় দেহখানা হাসির দমকে দুলে দুলে ওঠে। ছেলের দিকে একনজরে তাকিয়ে আছে। বলে, আগড়া একটা বউ গাঁথা চাট্টিকথা নয়, মবলগ টাকা লাগে। তাই সই, আমিও ছাড়ছিনে।

সুধামুখী হেসে বলে, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার, পারিব না এ কথাটি বলিও না আর'—

কথাবার্তা সহজ হয়ে এসেছে। নফরকেষ্ট বলে, কষ্টদুঃখের কথা থাক। এই ছেলে কিন্তু সত্যি সত্যি মেমের বাচ্চা। চৌরঙ্গিপাড়ারই কোন মেমসাহেবের। আমাদের পাড়ায় এ জিনিস হয় না।

সুধামুখী বলে, যেমন তোমার কথা। মেমসাহেব বাচ্চা ফেলতে আদিগঙ্গায় এসেছে! তে-মহলা, চার-মহলা মস্ত মস্ত বাড়ি—কত ভাল ভাল মেয়ে সেই সব বাড়িতে। ধুলো লাগে না, মাটি লাগে না, কাজকর্ম করে বেড়াতে হয় না, ঝিলিক মারছে গায়ের রং। মেমসাহেব তাদের পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়। দেখ নি, মোটর হাঁকিয়ে তারা মায়ের মন্দিরে আসে—

কথা কেড়ে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, মন্দিরে এসে মায়ের দিকে তাকায় না একবারও—ফালুক্ফুলুক করে। নাটমণ্ডপের উঠান থেকে ফুলবাবু কেউ ইশারা দিল, চলল গাড়িহাঁকিয়ে চাকুরে গোড়ে ছাড়িয়ে যে চুলো অবধি দুজনের চার চক্ষু যায়।

সুধা বলে, ফল তারপরে একদিন গঙ্গায় সমর্পণ করে দিয়ে যায় চুপি চুপি। কালির দাগ মুছে যেমনকার তেমনি ঘরে ফেরে।

বাচ্চারে গলার দিকে নজর পড়ে যায় হঠাৎ। নফরকেষ্ট হেন দস্যুমানুষও শিউরে উঠল: হায় হায় গো, গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। গলার উপর আঙুলের দাগ কালশিটে পড়ে আছে। পেটের সন্তান দম আটকে মেরে ফেলে—মা নয় সে রাক্ষসী।

সুধামুখী বারংবার ঘাড় নেড়ে আর্তনাদের মতো বলে মা কখনো করেনি, কখনো না। বাবা, পুরুষমানুষ। মেয়েমানুষে এ কাজ পারে না।

তার বাচ্চার বেলা সুধামুখী গলায় দাগ পায় নি। পেয়েছিল গলার ভিতরে—নুন। গালের ভিতরে নুন ঠেসে ঠেসে নাক টিপে মেরে ফেলা। পুরুষের পাকা হাত ছাড়া তেমন কাজ হয় না। সে পুরুষ নার্সিং-হোমের ডাক্তারবাবু। কিংবা সুধামুখীর বাবা—অতি নিরীহ পুণ্যবান মানুষটি। অথবা এমন হতে পারে বাচ্চার জন্মদাতা প্রেমিকপ্রবরটি হঠাৎ কোন ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে পিতৃকর্তব্য সেরে গেছে।

তিক্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, খুনজখম পুরুষের পেশা নফরকালি। পুরুষেরা রাক্ষস।

নফরকেষ্ট আজকে যেন যাবতীয় পুরুষজাতির প্রতিনিধি। জোর গলায় সে

সুধামুখীর প্রতিবাদ করেঃ পুরুষের খুনোখুনি সমানে সমানে—খুন করতে গিয়ে খুনও সে হয়ে যায়। একদিন-দুদিন বয়সের একফোঁটা অবোধ শিশু, যার সঙ্গে কোন রকম শত্রুতা নেই—

শত্রুতা নেই কী বলছ! পেটের শত্রুর—পেটে জন্মানোই শত্রুতা। ধার্মিক মানুষ আমার বাবা একটা মাছি-পিঁপড়ে মারতে কষ্ট হয়—এমন মানুষটিও ক্ষেপে ওঠে ক্ষুদে শত্রুর নিপাতের জন্য।

বলতে বলতে সুধামুখীর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। সেই বাচ্চাকে পেয়ে গেছে আবার যেন। ছেলে নয়, সেটি মেয়ে। প্রসবে বড় কষ্ট পেয়েছিল দিনরাত। তারপরে কাতর হয়ে ঘুমাত। সন্দেহ, ডাক্তার চৌধুরীর কারসাজি—ওষুধ দিয়ে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। পরে একদিন এই নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, মায়ের মন বলে সন্দেহ উঠেছিল কেমন একটা। নার্সটাকেও সে উত্যক্ত করে তুলল। নার্স-ডাক্তারে স্তোক দিয়েছিল ঃ ভাল আছে, শিশু ঘুমুচ্ছে। নিয়ে এল তারপর সামনে। আনতেই হল, সুধামুখী এমন চেঁচামেচি করছে। জীবনদীপ নিবে গেছে তখন——মুঠি-করা হাত দুখানি, চোখ দুটি বন্ধ।

কঠিন মুঠিতে সুধাময়ী ডাক্তার চৌধুরির হাত চেপে ধরল ঃ ঘুমুচ্ছে বললেন যে, ঘুম থেকে জাগিয়ে দিন এবার। দিন, দিন—

রোগিনীর মূর্তিতে ডাক্তার ভয় পেয়ে গেছেন, মুখে হঠাৎ উত্তর যোগায় না। বললেন, আমাদের কাজ বাঁচিয়ে তোলা, মেরে ফেলা নয়। চেষ্টা যথেষ্ট করেছি, কিন্তু হেরে গেলাম। গর্ভাবস্থায় অনেক বিষাক্ত অষুধ খাওয়ানো হয়েছে, শিশু শেষ পর্যন্ত ধকল সামলাতে পারল না। গালিগালাজ তাদের দাওগে, ব্যবস্থা দিয়ে যারা সেই সব অষুধ গিলিয়েছে।

সহসা সুধাময়ীর নজরে পড়ে, নুন আছে বাচ্চার ঠোঁটের কোণে, নুনের গোলা। হাঁ করাতে গালের মধ্যেও কিছু ভিজে নুন পাওয়া গেল। ডাক্তার পাগলের মতো দিব্যিদিলেশা করছেন, তিনি কিছু জানেন না, একেবারে কিছুই না। অমলা নামে নার্স মেয়েটা—ডাক্তার চৌধুরি পরে যাকে বিয়ে করেন, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন —সে-ও নির্দোষ। ব্রতের মতো রোগী-সেবা নিয়ে পড়ে আছে, এমন জঘন্য কাণ্ড সেই মেয়ের সম্বন্ধে ভাবতে যাওয়াও মহাপাপ।

বললেন, নার্সিং-হোমে তোমার বাবাও তো হরদম আসাযাওয়া করছেন। প্রবীণ মানুষ, ধর্মভীরুও বটে—নিজের চোখে যখন দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু বলতে চাইনে।

ব্যাপারটা মোটের উপর রহস্যময় হয়ে আছে। সন্তানের বাপটি গোলমাল বুঝে শহর থেকেই পিঠটান দিয়েছিল। সুধামুখীর এমনও সন্দেহ হয়, কর্তব্যের তাড়নায় সেই লোক এসে পড়ে ডাক্তার-নার্সকে টাকা খাইয়ে দায়িত্ব শেষ করে গেল নাকি?

মধু খাওয়ানো হয়ে গিয়ে সুধামুখী এখন পালঙ্কের উপর শিশুর শিয়রে বসে গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

নকফরকেস্ট বলে ওঠে, ও কি, কাঁদছ তুমি সুধা? কী হল তোমার?

দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, সুধামুখী বাচ্চা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলায়। শনির দৃষ্টি না পড়ে যেন শিশুর উপর। মা দক্ষিণাকালী, দেখো তুমি একে। শয়তান মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। কোন ডাক্তারের দৃষ্টি। যে জন একে ধরণীতে এনেছে সেই জন্মদাতা পিতার দৃষ্টি।

সেই ছেলে গণেশ। গণেশ নাম বড় কেউ জানে না। গণেশচন্দ্র পাল—শিরো-নামায় চিঠি এসেছে, বলাধিকারী লোক খুঁজে খুঁজে হয়রান। নাম শুনে সাহেবের নিজেরও গোড়ায় ধাঁধা লেগেছিল—নিজের নামই ভুলে বসে আছে। সকলে সাহেব-সাহেব করে ছোট বয়সের সেই গায়ের রঙের জন্য। রঙই শুধু নয়—টানা চোখ, টিকল নাক। অযত্নে, অবহেলায় গায়ের রঙ জ্বলেপুড়ে অবশেষে তামাটে হয়ে গেল। শিশু-বয়সটা বস্তির ঘরে—তারপরেই বা ভাল জায়গায় কে কবে থাকতে দিল দয়াময় সরকার বাহাদুর ছাড়া? জেলখানায় নিয়ে পোরো, পাকা দালানে আয়েস করে থাকা যায়। সে সুখও বা বেশি কী হল জীবনে! বুড়ো হবার পর এখন তো একেবারেই গেছে। দারোগা বিশ্বাসই করে না জেলবাস অর্জনের মতো তাগত আছে তার বুড়ো-বয়সের শরীরে। খাওয়া-থাকাটা চলনসই গোছের হলেও সাহেব কেন, রাজার ঘরের ছেলে বলে চালানো যেত এই চোর মানুষটাকে!

যাকগে, সেই গোড়ার কথা যা হচ্ছিল। সুধামুখীর কথা। সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুধামুখীর, বিশ বছরে চুকিয়েবুকিয়ে বাপের বাড়ি উঠল। বাপের বাড়ি বেলেঘাটার এক ঘিঞ্জি রাস্তার কয়েকটা কুঠুরি। সমস্ত ঘুচে গেল, পোড়া যৌবন গেল না। চার বোনের মধ্যে সে সকলের বড়। মা নেই মাথার উপরে। বাপ এক ব্যারিস্টারের কেরানি। কেরানির কাজ হাইকোর্টে নয়, সাহেবের বাড়িতে। গবেষণার বাতিক আছে ব্যারিস্টারের—লাইব্রেরীতে বসে সাহেবের হয়ে সুধামুখীর বাপকে সেই মত করে দিতে হয়। লাইব্রেরীতে পুঁথিপত্র এবং বাড়িতে পুজোআচ্চা এই দুটো মাত্র জিনিস জানেন তিনি জগৎসংসারে। সুধামুখীরই অতএব সকল দিক বুঝেসমঝে সংসারের হাল ধরবার কথা। কিন্তু অবুঝ হল সে নিজেই, সাধুভাষায় যাকে বলে পদস্খলন তাই ঘটে গেল। বাপ চোখে সর্ষের ফুল দেখেন। এ লাইনের যারা বহুদর্শী, দায়ে পড়ে এমনি দু-একজনের দ্বারস্থ হলেন। অষুধপত্র খাওয়ানো হল যথারীতি, কিন্তু নিষ্ফল। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার চৌধুরীর হেফাজতে দেওয়া হল—তাঁর নার্সিং-হোমে।

ডাক্তার চৌধুরি কোন রকমে পশার জমাতে না পেরে শহরতলীতে নতুন নার্সিং-হোম খুলেছেন। ভাল টাকা পেলে যে কোন রকম চিকিৎসায় রাজি। একটিমাত্র নার্স, অমলা—পরে যাকে বিয়ে করেছিলেন। এবং ঠিকে ঝি ও বিশ্বাসী পুরানো চাকর—রোগী যা আসত, সবই প্রায় এই জাতীয়—রোগী নয় রোগিণী। এখন দিন ফিরেছে ডাক্তার চৌধুরির, ডাক্তার হিসাবে রীতিমতো নামডাক। সেই জন্যেই পুরো নাম প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কালীঘাটের অনতিদূরে নতুন রাস্তার উপর প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছেন। সেদিনের সেই জঙ্গুলে শহরতলী জায়গা জমজমে শহর এখন।

নার্সিং-হোমেরও খ্যাতি খুব, আজেবাজে রোগী নেওয়া হয় না।

জঞ্জালমুক্ত হয়ে মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে, বাপ নিতে এলেনঃ চল সুধা, বাড়ি এইবারে।

সুধামুখীর কী রকম জাতক্রোধ সেই ব্যাপারের পর থেকে—বাপ বলে নয়, বিশ্ব-সুদ্ধ সকলের উপর। বলে, তোমার মেয়ে পাপ করেছে তো বিষ খাইয়ে তাকেই বধ করলে না কেন? মারলে মেয়ের পেটের মেয়েটাকে, যে কিছু জানে না। ধার্মিক মানুষ হয়ে এ তোমার কেমন বিচার?

বাপ থতমত খেয়ে যান। কোথায় লজ্জায় নুয়ে থাকবে তা নয় উল্টে ধমকানি। ভালমানুষ লোক—ঠিক জবাবটা হাতড়ে পাচ্ছেন না তিনি। বলেন, আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাফসাফাই হল। আরও তিনতিনটে মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সেগুলো পার করতে হবে। সকলে আমায় খাতিরসম্ভ্রম করে। এমনি বাপের মেয়ের যা হওয়া উচিত, এর পর সেই রকম থাকবি।

নিয়ে এলেন বাড়িতে। বৃত্তান্তটা ভেবেছিলেন বাড়ির মধ্যের তাঁরা কটা প্রাণী ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। আড়াই মাস পরে সুধামুখী বাড়ি পা দিতে না দিতেই বোঝা গেল, রসের খবর বাতাসের আগে ছড়িয়েছে। সম্পূর্ণ দায়মুক্ত সেই প্রেমিক-প্রবরটিও বুঝি একদিন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, পাড়ার মানুষ ধরে তাকে আচ্ছা রকম পিটুনি দিয়ে দিল। মচ্ছব না জমে যায় কোথা এর পর?

তিন বোন মাথায় মাথায়, বিয়ের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনখানে সম্বন্ধ গাঁথে না। বাড়ির উপরে সুধামুখী হেন মেয়ে রয়েছে, সেই একটা কারণ। প্রধান কারণ হয়তো তাই। বোনেরা খিটখিট করে রাত্রিদিন, কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করেছে সুধামুখীর সঙ্গে, পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করলে তবে হয়তো একটা জবাব দিল। বিধবা আধবুড়ো এক মেয়েলোক রান্না করে, একদিন সে কাজ ছাড়বে বলে হুমকি দিল, সুধামুখী ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে সেইজন্য। বাপ একটু বকুনি দিলেনঃ কী দরকার তোর রান্নাঘরে যাবার? পরে জানা গেল, বোনেরা উসকে দিয়েছিল রাঁধুনিকে, নিজে থেকে সে কিছু বলতে যায়নি।

টিকে থাকা হেন অবস্থায় অসম্ভব। ঘরের অন্ধকূপে দম বন্ধ হয়ে আসে। জানলায় এসে আকাশের একটু ফাঁকা হাওয়া নিয়ে বাঁচবে, সে উপায় নেই। প্রায়ই দেখা যায়, কেউ না কেউ সেখানে—মূর্তিমান কোন প্রেমিক। কয়লার জায়গা থেকে এক টুকরো কয়লা ছুঁড়ে মারল রাগ করে। গায়ে লাগে নি, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানলার পাখি দিয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে, ছোঁড়া সেই কয়লাখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দেখছে। ওর সঙ্গে প্রেমপত্র বাঁধা আছে কিনা, খুঁজছে নিশ্চয় তাই। বাপের বাড়ি এই ক'টা বছর কী করে যে কাটিয়ে এসেছে সে শুধু তার অন্তর্যামীর জানা।

বাড়ি ছেড়ে সুধামুখী ডাক্তার চৌধুরির নার্সিং-হোমে এসে হাজির। বলে, অমলাদিদি কাজ তো ছেড়ে দিয়েছেন। সেই নার্সের কাজ আমায় দিন ডাক্তারবাবু।

চৌধুরি বলেন, ট্রেনিং চাইতো আগে। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' কেমন করে হয়। কিছু শিখে পড়ে নাও।

চলল সেই ট্রেনিং, সদাশয় ডাক্তারবাবু উঠে পড়ে লাগলেন। জরুরি কেস এসে ডাক্তারের পাত্তা পায় না! একদিন হঠাৎ অমলা এসে পড়ে পায়ের স্লিপার খুলে পটাপট ঘা কতক দিয়ে সুধামুখীকে দূর করে দিল।

হনহন করে যাচ্ছে সে চলে, মোড়ের মাথায় শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারবাবু।

আপনজন সবই তো ছেড়ে এসেছ, যাচ্ছ কার কাছে শুনি?

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, জুটিয়ে নেবো নতুন নতুন আপন জন।

তাকিয়ে দেখে, গিলে খেতে আসছেন যেন ডাক্তারবাবু। মুখে নয়, চোখ দুটো দিয়ে।

বলে, আপনি হবেন তো বলুন।

ডাক্তার চৌধুরি সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে। স্বরে গাম্ভীর্য এনে মোটা রকম উপদেশ ছাড়েন: বাঁদরামি করো না। বিস্তর তো দেখলে। ভাল হয়ে থাকবে এবার থেকে, কথা দিয়ে যাও।

সুধামুখী বলে, এই মাত্র জুতো খেয়েছি। জুতোর বাড়ি কেটে কেটে বসেছে। আজকের রাতটা ভাল থাকব, কথা দিচ্ছি। কাল থেকে নইলে কে আমায় খাওয়াবে, বলতে পারেন? থাকব কোথা?

হি-হি করে উৎকট হাসি হাসে। উন্মাদের মতো। বলে, জুতো না খেলেও চলে যেতাম। আজ না হলেও কাল-পরশু। থাকার উপায় নেই, সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। রোগী হয়ে আপনার নার্সিং-হোমে থেকে গেছি—সেই রোগের বৃত্তান্ত জানাজানি হয়ে গেল। তার পরে আমার হাতে শুধুমাত্র নার্সের সেবা নিয়ে লোকে খুশি থাকতে পারে না। সে আমি জানতাম। ভেবেছিলাম, রোগীরা মুশকিল করবে। কিন্তু সে অবধি পেঁছিনোর আগেই দেখি ডাক্তার—

ডাক্তারবাবুর এ সব কানেই যাচ্ছে না, অথবা কানে শুনেও বুঝতে পারেন না। নিরীহভাবে বলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কোনখানে গিয়ে উঠবে ঠিকঠাক আছে কিছু?

সুধামুখী বলে, খুব ভাল জায়গা। গতিকটা বুঝে আগে থাকতে ঘর দেখে রেখেছি। কালীঘাটে মা-কালীর পাদপদ্মের নিচে। ঠিক একেবারে আদিগঙ্গার পাশে। বড্ড সুবিধা। যত খুশি অনাচার কর, সকালবেলা গোটা কয়েক ডুব দিয়ে সাফসাফাই। সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল, পতিতপাবনী সব গ্লানি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার চালাও পুরো দিন আর পুরো রাত্রি। গঙ্গায় স্রোত যতক্ষণ আছে, কী ভাবনা!

রাত্রে খুব বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে। জের কাটে নি, ভোরবেলাতেও জোর হাওয়া, আকাশ মেঘে থমথম করছে। সুধামুখী যথানিয়ম গঙ্গাস্নানে গেছে। দুর্যোগে একটা মানুষও ঘাটে আসে নি এখন অবধি। শেষ ভাঁটা, বাঁধানো ঘাটের শেষ সিঁড়িরও অনেক নিচে জল। কতটুকু আর—এক হাত দেড় হাত গভীর হবে বড় জোর। অবগাহন স্নান হবে না আজ, কোন একখানে বসে পড়ে গামছা ডুবিয়ে জল মাথায় দেওয়া। সেই জল অবধি গিয়ে পেঁছুতেও অনেক কাদা।

যাচ্ছে তাই সুধামুখী, না গিয়ে উপায় কী ! গঙ্গাজলে যতক্ষণ না দেহটা ধোয়া হচ্ছে, গা ঘিনঘিন করে। অসুখবিসুখ যা-ই হোক, রাতের বিছানা ছেড়ে উঠেই সকলের আগে ঘাটে ছুটবে।

নজরে পড়ল, ভাঙা সিঁড়ির ইটের গাঁথনির গায়ে ন্যাকড়ার পুঁটলি আটকে আছে। কী বস্তু না জানি ভেসে এসেছে ! কোন দিকে কেউ দেখছে না, ভয়সঙ্কোচের কারণ নেই। দিনকাল বড্ড খারাপ যাচ্ছে। পরশুদিন পারুল নামে মেয়েটার কাছ থেকে ধার করে এনে চালিয়েছে। নির্জন দুপুরে কাল বড় দুঃখে কালীবাড়ির নাট-মন্ডপে পড়ে কেঁদেছিল একা একা। মা তাই কি পাঠিয়ে দিলেন কিছু ? দামি মাল যদি হয় গাপ করবে। নোংরা-আবর্জনা হলে—গঙ্গাগর্ভে রয়েছে, স্নানের জন্যই তো এসেছে—ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঘরে ফিরবে।

পুঁটলি খুলে দেখে বাচ্চা ছেলে। কী ছেলে মরি মরি ! মেরে ফেলে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়েছে। কার বুকের নিধি ছিনিয়ে আনল গো ! ঠাহর হল, ধুক পুকানি এখনো যেন বুকে, এই হিমের মধ্যেও একটু যেন উত্তাপ পাওয়া যায়। এত গর্ভযন্ত্রণা সয়ে ধরাতলে এসে নামল, সঙ্গে সঙ্গেই অমনি প্রাণটা দিতে চায় না, আঁকুপাকু করে দেখে। তার মেয়েটাও এমনি হয়তো ছিল, কিন্তু দেখতেই দিল না ভাল করে। নার্সিং-হোমের চাকরটা তাড়াতাড়ি বস্তায় ভরে রেললাইন পার হয়ে গিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত কবরখানার কোনখানে পুঁতে রেখে এল। নিশ্চিন্ত ! প্রাণ নিয়ে দৈবক্রমে ফিরবে, তেমনি কোন শঙ্কা রইল না।

কে কখন এসে পড়ে এমন ধারা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কী হল সুধামুখীর—নিজেরই চলে না শঙ্করাকে ডাকে—ঘাটের জঞ্জাল ঘরে তোলার ঝঞ্ঝাট বুঝে দেখল না। গঙ্গাস্নান হল না আজ, কাপড়ের নিচে বাচ্চা জড়িয়ে ঘরে ফিরে এল।

ঘরে গিয়ে সেঁকতাপ দিচ্ছে। লাইনের সর্বশেষে সকলের বড় ঘরখানায় পারুল থাকে। মেয়েটা ভাল। তাকে ডেকে এনে দু-জনে মিলে করছে।

সুধাময়ী বলে, তুই একটুখানি থাক পারুল। ডাক্তার নিয়ে আসি।

পারুল বলে, ডাক্তার কি হবে ! সাড় তো হয়েছে একটু, আরও হবে।

তবু একবার দেখানো ভাল। ডাক্তারের পয়সা তো লাগছে না। বড় ডাক্তার—এমনি আসবে।

সকালবেলা এই সময়টা রোগীর ভিড়। ডাক্তার চৌধুরির বাড়ি। সুধাময়ী সেখানে গিয়ে পড়ল। চৌধুরী স্তম্ভিত। সিঁড়ির দিকে সশঙ্কে তাকান, উপর নিচে করবার মুখে অমলার নজরে সুধাময়ী পড়ে না যায়।

হাতের রোগীটাকে আপাতত শুইয়ে রেখে বসবার ঘরে সুধামুখীকে নিয়ে গেলেন। এখানে কি ? বেশ রাগত স্বরেই বললেন।

সুধামুখী বলে, আমার বাড়িতে একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

অসম্ভব।

সুধামুখীর স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে ঃ আমার দরকারে আজ যাবেন না, নিজের

যেদিন দরকার ছিল তখন তো গটগট করে চলে যেতেন। গড়ের মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে গেছি—সেইমাত্র একটা রাত—তা-ও দেখি রেগে মেগে চিঠি রেখে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু গোঁ-গোঁ করে অবোধ্য আওয়াজ করেন একটা। হয়তো প্রতিবাদ, হয়তো বা কিছুই নয়। জবাব দেবার কিছু নেই, সেইজন্যে।

সুধামুখী আরও রেগে বলে, মিছে কথা? একদিন সমস্ত মিথ্যে হয়ে হয়ে যাবে, আমিও তা জানতাম। সে চিঠি রয়েছে আমার কাছে। আমার দলিল। দরকার হলে বের করে দেখাব। অমলা-দিদিকে দেখিয়ে যাব।

ডাক্তার চৌধুরির চক্ষু কপালে উঠে যায়ঃ বলিস কি রে, এমনি সর্বনেশে মেয়েমানুষ তুই! ঝোঁকের মাথায় কোন অবস্থায় লিখেছিলাম, সেই চোতা কাগজ তুই রেখে দিয়েছিস ব্লাকমেইল করবি বলে। এই তোর ধর্ম হল।

সুধামুখী শান্ত হয়ে বলে, কিছু করব না! আসুন আপনি ডাক্তারবাবু, এসে একটিবার দেখে যান। হয়তো কিছুই নয়। তবু কাছাকাছি এত বড় ডাক্তার আছেন, একবার না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নে!

চৌধুরি কিছু নির্ভয় হয়ে বলেন, কার অসুখ?

আমার ছেলের—

বটে! ছেলে হয়েছে বুঝি তোর! কবে হল, কিছু তো জানিনে। বয়স কত ছেলের?

একদিন কিম্বা দু-দিন।

ডাক্তার সচকিত হয়ে সুধামুখীর দিকে নজর ঘুরিয়ে নেন। কাঁচা পোয়াতির লক্ষণ নেই, সুধামুখী মিছেকথা বলছে।

সুধামুখী বলে, পেটে আসে নি, কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

দু-চক্ষু বুজে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুহূর্তকাল বুঝি অশ্রু সামলে নিলঃ মাটিতে পুঁতেছিলেন আমার বাচ্চা—মাটি ফুঁড়ে সে-ই আবার ফিরে এসেছে। সাত ভাই চম্পার তাই হয়েছিল ডাক্তারবাবু, আমার বাচ্চারই বা কেন হবে না?

ডাক্তার বিরক্তির সুরে বললেন, হেঁয়ালি ছাড়। কী ব্যাপার খুলে বল সমস্ত। ডাক্তারকে না বললে চিকিচ্ছে হবে কি করে?

সুধামুখী সমস্ত বলল। বলে, এত চেষ্টা হচ্ছে তবু কেমন সাড়া পাওয়া যায় না। ভয় ঘোচে না। সেইজন্যে ছুটে এলাম। সেবারে মেরেছিলেন, এবারে বাঁচিয়ে দিতে হবে ডাক্তারবাবু। তা যদি করেন, চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলব। আপনার সামনেই ছিঁড়ব।

ডাক্তার একটু ভেবে বলেন, না গেলে হবে না? এখান থেকে যদি ওষুধ দিয়ে দিই?

কঠিন স্বরে সুধামুখী বলে, না—

ডাক্তার বলেন, ষোল টাকা ফী আমার। এক পয়সা কম করতে পারব না।

সুধামুখী সকৌতুকে বলে, ফী আমার কাছেও?

আর কম্পাউণ্ডার যাবে আমার সঙ্গে। ছোঁড়া শুধু-হাতে ফিরবে, সেই বা কেমন! তার দু-টাকা বখশিস।

কম্পাউণ্ডারের কি দরকার ?

ততক্ষণে ডাক্তার চৌধুরি মনিব্যাগ খুলে দু-খানা দশ টাকার নোট সুধামুখীর হাতে দিলেন।

নিয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি। এদিককার এই দরজা দিয়ে। ঠিক সাড়ে-দশটায় তোর বাড়ি যাব। কম্পাউণ্ডারের দরকার তোর নয়, আমারও নয়—অমলার। কম্পাউণ্ডারের সামনে গুণে ষোল আর দুই, আঠারো টাকা দিবি। সে ছোঁড়া অমলার লোক, কি রকম ভাই সম্পর্কের হয় তার। স্পাই রেখেছে আমার উপর খবরদারি করতে। ডাক্তার আর রোগী—ছোঁড়ার সামনে আমাদের এইমাত্র সম্পর্ক, খাতির-উপরোধ নেই। খেয়াল রাখিস। আমি ঠিক তেমনি ভাবে কথাবার্তা বলব। যাব ঠিক সুধা, ভাবনা করিস নে।

রূপকথার সাত-ভাই-চম্পা সুধামুখীর মনে এসে গেল হঠাৎ, ডাক্তার চৌধুরির কাছে বলে ফেলল। চক্রান্ত করে দুয়োরাণীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে ছাইগাদায় পুঁতে ফেলেছিল। ফুল হয়ে তারা ডালে ডালে ফুটে উঠল, মায়ের কোলে-কাঁখে ঝুপ-ঝুপ করে নেমে এল একদিন। সারা পথ ঐ গল্প ভাবতে ভাবতে সুধামুখী বাসায় ফিরেছে। চেয়ে চেয়ে যে বস্তু পাওয়া যায় না, নাছোড়বান্দা মানুষ তা রূপকথার মধ্যে গেঁথে প্রাণ ভরে বলাবলি করে। রূপকথাতেই ঘটে, আর ঘটে গেছে সুধামুখীর অদৃষ্টে। মা-গঙ্গা বাচ্চা ছেলে কোন মুলুক থেকে ভাসিয়ে এনে ভোরবেলা তার খাটে তুলে দিয়ে গেলেন।

ডাক্তার চৌধুরী কম্পাউন্ডার-সহ যথাসময়ে এসে দর্শন দিলেন। ভালই আছে ছেলে। ওষুধপত্র দিলেন না, এক ফোঁটা দু-ফোঁটা করে মধু খাওয়াতে বললেন। ভিজিটের পুরো টাকা গুণে নিয়ে পকেটে ফেলে বিদায় হলেন।

সারা বেলা ধরে বাচ্চার খেদমত চলেছে! এঘর থেকে ওঘর থেকে মেয়েরা কতবার এসে দেখে যাচ্ছে। আহা, হাত নাড়ছে পা নাড়ছে সোনার পুতুল একটুকুন। আসায় যাওয়ায় মেলার মচ্ছব সুধামুখীর ঘরে। আর সন্ধ্যার মুখে সকলের শেষে এই নফরকেষ্ট।

নফরা চলে যেতে পারুল এসে আবার ঘরে ঢুকল। নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করছিল, তখনকার কথাবার্তা সমস্ত কানে গিয়েছে তার। বলে, শরীরের কথা বলে লোক তাড়াচ্ছ দিদি, কিন্তু যে অসুখ ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, শরীর তো একদিন দু-দিনে সারবার নয়। চিরকাল জীবনভোর চলবে। ছোট বোনের কথায় দোষ নিও না—দিন চলবে কিসে সেটাও ভেবে দেখ। মাথার উপরে শ্বশুর-সোয়ামি নেই যে তারা রোজগার-পত্তর করে আনল, ঘরে খিল দিয়ে বসে বসে তুমি ছেলের সোহাগ করলে।

কথা বড্ড খাঁটি। সুধামুখী খানিকটা কৈফিয়তের ভাবে বলে, চানের ঘাটে মা-গঙ্গা হাতের উপর তুলে দিলে, ফেলে আসি কেমন করে? দুটো-চারটে দিন তাউত করে তো তুলি, দেখা যাবে তারপরে।

সাজসজ্জা সারা করে এসেছে পারুল। দিনের শেষে এই সময়টুকুর জন্যই এতক্ষণ ধরে সাজ করেছে। তবু কিন্তু চলে যেতে পারে না। এক দিনের বাচ্চার গাল টিপে

আদর করছে। করছে কত রকম! হাত বুলাচ্ছে দুটো গালে। মুঠির আঙুল খুলে দেয়, আবার কেমন বুজে আসে। এই এক খেলা। সুধামুখীর জবাবে মুখ তুলে চাইল পারুল। বলে, দু-চারটে দিনের পরে কি হবে দিদি, কি করবে? রাখতে না পার তো আমায় দিয়ে দিও। এই বলা রইল। একগাদা বিড়াল পুষি, খরগোস পুষি, কাকাতুয়া পুষি—তার উপরে রইল না হয় একটা ছেলে। অসুবিধে নেই, আমি তো ঘরের বার হইনে। বড্ড খাসা ছেলে গো!

দেমাকের কথা। নবীন বয়স পারুলের, সুখের দিন। চলার ঢঙে যৌবন ছলকে ছলকে ওঠে। বাড়ির মধ্যে তাকেই শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে রূপ দেখাতে হয় না। লোকে তার ঘরে চলে আসে—উল্টে ধমক দেয় সে, মেজাজ দেখায়। চরণের গোলাম যত পুরুষ।

আলাদা চাকর, আলাদা ঝি—হাটবাজার রান্নাবান্না তারাই করে। পারুলের কেবল শুয়ে বসে ঘরের মধ্যে থাকা—দিনমানটা কিছুতেই কাটতে চায় না। বলছে অবশ্য ভাল কথাই। বিবেচনার কথা! ছেলে পোষা বিলাসিতাই একটা—এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র পারুলই পারে সেটা। দেখা যাক কিছুদিন—খদ্দের তো রইলই। পারুল বলে কেন, দেয়ালপাটের মতো ছেলে হাত বাড়িয়ে নেবার কত মানুষ কত দিকে।

মাসখানেকের মধ্যে ছেলে রীতিমত চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুশকিল রাত্রিবেলা। বাড়ির সবগুলো মেয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন। দিনমানটা যত দূর সম্ভব ছেলে জাগিয়ে রাখে, সন্ধ্যা থেকে যাতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। শোয়ানোর বাড়তি ঘর কোথা—রান্নার জন্য পিছন দিকে খোলার চালা, সেইখানে মেজের উপর পাশাপাশি দু-খানা পিঁড়ি পেতে ঘুমন্ত ছেলে শুইয়ে দেয়।

একদিন ছেলের বোধহয় পেট কামড়াচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে ওঠে। চলছে সেই বেলা দুপুর থেকে, রাত্রেও যদি এমনি করে তো সর্বনাশ। আরও একদিন হয়েছিল, ঘর ছেড়ে সুধামুখীকে বেরিয়ে আসতে হল ছেলে ঠাণ্ডা করতে। ঘরের লোক বিরক্ত হয়ে বলে, আর আসব না তোমার কাছে। গোড়াকার সেই সব দিনে রূপ তেমন কিছু না থাক, বয়সটা ছিল। বয়সেও ভাঁটা ধরেছে—আদরযত্ন করে, মিষ্টি কথা বলে এবং ভগবান যে কণ্ঠখানা দিয়েছেন—সেই কণ্ঠের গান গেয়ে ত্রুটি ঢাকতে হয়। কালীবাড়ির দিকে ফিরে সভয়ে বার বার হাত জোড় করে: হে মা দক্ষিণাকালী, ছেলের কান্না ভাল করে দাও। এক্ষুনি—সন্ধ্যে লাগবার আগে।

যত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ততই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কালকের দিনের কানাকড়ি নেই—কী উপায়! ঝিয়ের মাইনের হারাহারি অংশ দিতে হয়—সকাল বিকাল জোর তাগিদ লাগিয়েছে, কাল যদি না পায় পাড়া চৌচির করে কোন্দল লাগাবে। খাওয়া নিয়েও ভাবনা। নিজে উপোস দিয়ে টান-টান হয়ে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চার তো এক ঘণ্টারও সবুর সয় না। দুধ বিহনে জলবার্লিটুকুও না পেলে কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। আবার বজ্জাত কী রকম—এরই মধ্যে স্বাদের তফাত ধরতে শিখেছে।

বালি যদি দিলে, পেটের ক্ষিদেয় দশ-বারো ঝিনুক খেয়ে তার পরে আর খেতে চাইবে না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকবে। ঝিনুক চেপে মাড়ির ফাঁকে ঢেলে দিলে তো ফুস্‌—করে ফোয়ারার মতন ছড়িয়ে দেবে। এক মাসের ছেলে এই, বড় হয়ে তো আস্ত ডাকাত হবে। কিন্তু এই জল-বালিও তো জোটানো যাচ্ছে না।

আরও কত রকমের দায়দেনা—ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে আসে। ভাবনার মধ্যে সুধামুখী যেতে চায় না ভয়ে ভয়ে। নফরকেষ্টর দশাও তথৈবচ। একদিন দুটো টাকা পাওয়া গেল তো আবার কবে মিলবে ঠিকঠিকানা নেই। পারতপক্ষে সে দিতেও চায় না, বউ গাঁথবার টোপের সংগ্রহে আছে। কেড়েকুড়ে নিতে হয় এক একদিন মল্লযুদ্ধ করে।

উল্টে রাত্দুপুরে এসে হুমকি ছাড়বেঃ আর তরকারি কোথা ? কতবার বলেচি, এক তরকারি-ভাত খেতে পারিনে, খেয়ে পেট ভরে না আমার। শুধুমাত্র রাত্রিবাস নয়, রাত্রিবেলা খাওয়ার স্বত্ব জন্মে গেছে যেন এখানে। সুধামুখী হতে দিয়েছে। পারুল জীবজন্তু পোষে, তারও তেমনি একটা পোষা জীব। ভাগ্যবতী বটে পারুল, পশুপাখির উপরেও বাচ্চা পোষার শখ। আরও দু-তিন দিন বলেছে, মুকিয়ে আছে। দিয়ে দিতে হবে শেষ অবধি, তা ছাড়া উপায় দেখিনে।

ভাবছে সুধামুখী, আর প্রাণপণে ছেলে থাবড়াচ্ছে। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যাও, বাটা ভরে পান দিলাম গাল পুরে খাও। গুণগুণ করছে মিষ্টি সুরে। মাসিপিসিদের কাছে পানের চেয়ে প্রিয়তর জিনিস কী! লোভে পড়ে বোধকরি অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ, চোখ বুজল ছেলে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ল। হে মা-কালী, রাতের মধ্যে আর নড়াচড়া করে না যেন।

সন্তর্পণে তুলে যথারীতি রান্নাঘরে শুইয়ে দিয়ে সুধামুখী বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। কপাল আজ বড্ড ভাল গো—সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল না জানি। সেই দলটা এসে গলিতে ঢুকল। একটি মানুষ ওর মধ্যে ভাল রকম চেনা—রাজাবাহাদুর নামে যার পরিচয়। পাড়ার সবাই চেনে। রাজা হন না হন, বড়লোক দস্তুরমতো। নিজে থাকেন চুপচাপ, আমোদ- স্ফূর্তি যত কিছু সঙ্গের মোসাহেবরা করে। এ গলির সবাই চায়, রাজাবাহাদুর আসুন তার ঘরে।

সুধামুখী সবুর করতে পারে না। কোন মুখপুড়ী কোন দিক থেকে এসে গেঁথে ফেলে—ছুটে সে চলে যায় রাজবাহাদুরের কাছেঃ আজকে আমি আপনার সেবা করব।

রাজাবাহাদুর ভ্রুকুটি করেনঃ বলিস কী রে! তোর আস্পর্ধা কম নয়। আমার চাকর-বাকরের সেবাদাসী—এবারে আমা অবধি হাত বাড়াস! হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না ?

বলে হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়েন। তার মানে দয়া হয়েছে, সুধাই পেয়ে গেল দলটা। রাজাবাহাদুর আগে আগে চললেন সুধামুখীর পাশাপাশি।

দেখ, বাজারের ভোজ্য আমি ছুঁইনে। জাত্যাংশে সদ্‌ব্রাহ্মণ, অনাচার আমায় দিয়ে

হবে না। উচ্ছিষ্ট খেয়ে জাত হারাব না, আমার ভোজ সকলের আগে। যে বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় নি—

কথার মাঝে আবার হেসে ওঠেন রাজাবাহাদুর। বললেন, যাকে বলে উদ্যানের অনাঘ্রাত কুসুম। তোদের সব চোখে দেখেই আমার গা বমি-বমি করে।

সুধামুখী আহত কণ্ঠে বলে, তবে আসেন কেন আমাদের পাড়ায় ?

রাজাবাহাদুর বলেন, চারটে পোষা কুকুর আছে আমার বাড়িতে, নিজ হাতে খাওয়ানোর শখ খুব আমার। কুকুরগুলো ভাল, আ-তু-উ-উ—ডাকলে ছুটে আসে, এসে লেজ নাড়ে।

সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেন, এদের মতন আছে আটজন। এই চার আর ঐ আট—পুরোপুরি ডজন হল। এরাও বেশ ভাল। ডাকতে হয় না, চোখ টিপলে ছুটে আসে। সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা শেষ করে রাজাবাহাদুর হাসলেন, তার আগেই হি-হি-করে লোকগুলো হেসে অস্থির। রাজাবাহাদুরের পোষা কুকুরের সঙ্গে তুলনায় তারা কৃতার্থ হয়ে আনন্দে গলে গিয়েছে।

সবে জমে এসেছে, হেনকালে যে ভয় করা গিয়েছিল—ছেলে কেঁদে উঠল। সুধামুখী কাতর হয়ে বলে, ছুটি দিন একটুখানি রাজাবাহাদুর। ছেলের অসুখ, উঠে পড়েছে, ঘুম পাড়িয়ে আসি। এক্ষুনি এসে যাব।

রাজাবাহাদুর চোখ বড় বড় করে বলেন, কী বলিস, তুই আবার ছেলে পেটে ধরলি কবে রে ! ও-মাসেও তো এসে গেছি। মিথ্যে বলবার জায়গা পেলিনে !

সুধামুখী বলে, পেটে না ধরলেও ছেলের কোন অভাব আছে ? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে ছেলে। আপনারা কত সব আছেন মস্ত মস্ত মানীলোক—উচ্ছিষ্ট যাঁদের চলে না। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে ভাল জিনিস উচ্ছিষ্ট করে আসেন। ফল পুষ্ট হবার আগে কুঁড়ি অবস্থায় বেশির ভাগ নষ্ট করে দেন। যাদের সে সুবিধা হল না, তাক বুঝে রাতদুপুরে মা-গঙ্গায় নিবেদন করে দায় খালাস হয়ে আসে।

ছেলে চুপ করে গেছে, আর কাঁদে না। জেগে পড়েছিল, আপনাআপনি আবার ঘুমিয়ে গেছে। একছুটে দেখে গিয়ে সুধামুখী বসে পড়ল আবার। যেটুকু কামাই হল পুষিয়ে নেবার জন্য ডবল করে হাসতে লেগেছে। বলে, জানেন তো রাজাবাহাদুর, সেকালে মরাঞ্চে পোয়াতিরা গঙ্গায় ছেলে ফেলে দিত, তার পরের বাচ্চাটা যাতে মায়ের কোল আলো করে বেঁচেবর্তে থাকে, শতেক পরমায়ু হয় তার। একালের মা-কুন্তীরাও পয়লা বাচ্চা গঙ্গায় দিয়ে মনে মনে বলে, গোড়ার ফলটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি মাগো। ভাল ঘর-বর হয় যেন, সতীসাধ্বী হয়ে পাকাচুলে সিঁদুর পরে চিরদিন সংসারধর্ম করি।

বেড়ে বলেছিস রে ! রাজাবাহাদুর হাসিতে ফেটে পড়লেন, দেখাদেখি সঙ্গীগুলোও হাসে। বলেন, হনুমান বুক ফেড়ে রামনাম দেখিয়েছিল—একালের অনেক সতীর বুকের তলা অমনি যদি কেউ ফেড়ে ফেলে, দেখা যাবে কত গণ্ডা নাম লেখা সেখানে।

হাসি থামিয়ে খানিকটা নড়েচড়ে রাজাবাহাদুর আড় হয়ে পড়লেন পালঙ্কের বিছানায়। বললেন, তোর ঘরে কী জন্যে আসি বল দিকি?

সুধামুখী বলে, ভাগ্য আমার! আপনার মতো মানুষের নেকনজরে পড়েছি।

দূর, নজরই তো বন্ধ করে থাকি তোর কাছে। তুই হলি কোকিল—গলা কোকিলের, চেহারাখানাও তাই। চেহারা দেখতে গেলে গা ঘিনঘিন করে, গানে আর মজা থাকে না! দু-চক্ষু বন্ধ করে গান শুনে যাই। তোর কথার আবার বেশি বাহার গানের চেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে ঠিক তুই, ভাল ভাল কথাবার্তা শুনে পরিপক্ক হয়ে এসেছিস। বিদ্যেসাধ্যিও কিছু হয়ত আছে পেটে।

সুধামুখী দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়। টাকাকড়ি না থাক, বাবা কিন্তু বিদ্যার বারিধি। বলেছিলেন, পড়াশুনো নিয়ে থাক সুধা, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেব, ঘরে পড়ে গ্রাজুয়েট হবি স্বচ্ছন্দে।

আগের কথার জের ধরে রাজাবাহাদুর বলেন, কাদের ঘরের কোন জাতের মেয়ে তুই, ঠিক করে বল আমায়।

সুধামুখী বলে, ছেলে যেমন গাঙে ভেসে এল, আমি একদিন ভাসতে ভাসতে কালীবাড়ির আঁস্তাকুড়ে এসে পড়েছি। জাতজন্ম নেই আমার, পিছন অন্ধকার। আমি একাই, বাবা আর বোনদের উঁচু মাথা কেন হেঁট করতে যাব বলুন।

আরও অনেক কথা বলতে গিয়ে বলল না, চেপে গেল। পিছনে ঘনঘোর অন্ধকার, সামনেটাও তাই। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা খদ্দেরের কাছে বলা চলে না। বরঞ্চ ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে হয়।

কোন খেয়ালে রাজাবাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন: চল রে, তোর ছেলে দেখে আসি।

রান্নাঘরের সুঁড়িপথটা অতি সঙ্কীর্ণ। যা মোটা মানুষ—ভুঁড়ি বেধে আটকে যাবেন জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতন। চালও বড় নিচু সেখানটা। লম্বা রাজাবাহাদুর, তায় রঙে রয়েছেন। কত বার মাথা ঠুকে যাবে ঠিক নেই, তখন মেজাজ বিগড়াবে।

সুধামুখী বলে, আপনি কি জন্যে যেতে যাবেন? বড্ড নোংরা ওদিকটা।

মাতালের রোখ চেপে গেছে। বলেন, তোর ঘরে এসে বসতে পারছি, এর চেয়ে নোংরা জায়গা ভবসংসারে কোথায় আছে রে? নোংরা বলেই তো আসি, নোংরার জন্যে মন কেমন করে ওঠে এক এক সন্ধ্যাবেলা।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলেন, মানুষ জাতটা হল মহিষের রকমফের। সবুজ মাঠে চরে চরে সুখ হয় না; এঁদো ডোবার পচা পাঁকে গিয়ে পড়বে। পড়তেই হবে। এই আমারই দেখ না—ঘরে খাসা সুন্দরী বউ। একটা গেল তো তারও চেয়ে সুন্দরী দেখে দুই নম্বর বিয়ে করে আনলাম। ভালবাসাবাসিও দস্তুরমতো—সে ভালবাসে, আমিও। কিন্তু এটা হল ভিন্ন ব্যাপার! দশের মধ্যে সভা জমিয়ে সৎপ্রসঙ্গ করে এসে দুটো ময়লা কথার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো। ঐ মহিষের বৃত্তি।

উঠে কয়েক পা গিয়েছেনও রাজাবাহাদুর। দেহ বিষম টলছে, গড়িয়ে পড়েন বুঝি বা। সুধামুখী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আপনি ছেলের মুখ দেখবেন, সে তো ছেলের বাপের ভাগ্যি, সাতপুরুষের ভাগ্যি। রান্নাঘরে টেমির আলো ঘুরিয়ে আপনি দেখবেন, সে কি একটা কথার কথা হল? ফরমাস করুন, ঝাড়লণ্ঠনের নিচে গদির উপর এনে দেখিয়ে দিই।

নেশার উপরে হলেও রাজাবাহাদুর নিজের দৌড় বুঝে নিয়েছেন। পা টলছে বেয়াড়া রকম। হাসতে হাসতে ধপ করে চেয়ারখানায় বসে পড়লেন।

নিয়ে আয় এখানে, তোর যখন তক্তাউশে তুলে দেখানোর অভিরুচি। বটেই তো, কত মানমর্যাদা আমার! আমি কেন যেতে যাব খারাপ মেয়ে-মানুষের ছেলে দেখতে? তুই এনে দেখা, বকশিস পাবি।

নিয়ে আসে সুধামুখী। রাজাবাহাদুরের চোখ ঠিকরে যায়। ইয়ারগুলো বকবক করছিল, তারাও চুপ হয়ে গেছে: ব্যাঁ রাজপুত্তুর ছেলে যে!

বিশাল প্যালঙ্কের উপর বিঘতখানেক পুরু গদি। ধবধবে চাদর-বালিশ তার উপরে। রাজাবাহাদুর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: আরে দূর, কত মানুষ শুয়ে বসে গেছে, ওর উপর শোয়ায় কখনো! ভাল কিছু পেতে দে। তুই আর ভাল কী পাবি, নোংরার মধ্যে সবই তো ছোঁয়া-লেপা হয়ে আছে। রোস—

বিচিত্র নক্সাদার সেকেলে জামিয়ারখানা কাঁধের উপর থেকে নিয়ে রাজাবাহাদুর শয্যার উপর পেতে দিলেন। হেসে বলেন, এ ছেলে আমারও হতে পারে। কত ঠাঁই ঘোরাঘুরি করি—কার ঘর থেকে বাচ্চা বেরুল, অত কে হিসাব রেখে বেড়ায়।

একটু থেমে রাজাবাহাদুর আবার বলেন, আমার না-ও যদি হয়, আমারই মতন কোন শয়তান-বেল্লিকের তো বটে। হোক শয়তানের তা হলেও বড়-বাপের বেটা। খাতির-যত্ন করিস রে মাগি, ছেঁড়া ঘরের ছেলে নয়—দস্তুরমতো বনেদি রক্ত চামড়ার নিচে।

সুধামুখী জোর দিয়ে বলে, ছেলে আপনারই। না বললে শুনি নে। অবিকল আপনার মত চাউনি। ফালুকফুলুক করে চোরা চাউনি দিচ্ছে ঐ দেখুন না।

রাজবাহাদুর রাগের ভান করে বলেন, বটে রে! চোরা চাউনি মেরে বেড়াই, এই কলঙ্ক দিলি তুই আমায়? তা বেশ, মেনেই নিলাম ছেলে আমার। এই ছেলের বাপ হতে যে-না-সেই আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াবে। দু-দুটো বিয়ে করা পরিবারে দিল না—ছেলে আলটপকা তোদের নরককুন্ডের মধ্যে পেয়ে গেলাম।

চটে না সুধামুখী, চটলে কাজ হয় না। প্রগলভ সুরে বলে, ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই? দেখুন না, ঐ দেখুন, ঠোঁট ফোলাচ্ছে ছেলে।

মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজাবাহাদুর হা-হা করে হেসে উঠলেন। কী দেখতে পেলেন তিনিই জানেন, বললেন, আচ্ছা ফিচেল ছেলে তো! হবে না—আমি লোকটা কি রকম। কচুর বেটা ঘেচু বড় বাড়েন তো মান।

মেজাজ দিলদরিয়া এখন, মেজাজের গন্ধ ভকভক করে মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় টাকা পনেরোর মতো বেরুল।

রাজাবাহাদুর অবাক হয়ে বলেন, মোটে এই ? আরো তো ছিল ; আরো অনেক থাকবার কথা। গেল কোথা টাকা ?

সঙ্গীদের একটি বলে ওঠে, বলবেন না, বড্ড পাজি জিনিস টাকা। পাখি খাঁচায় পুরে আটকানো যায়, টাকা কোনরকমে পোষ মানে না। উড়ে পালায় পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

রাজাবাহাদুর বলেন, রাজপুত্তুরকে বুঝিয়ে বল রে সুধা, আজকে নেই। সোনার টাকায় মুখ দেখে যাব আর একদিন এসে।

এর পরে একটা জিনিস দেখা গেল, রাজাবাহাদুর পাড়ার মধ্যে ঢুকলেই সরাসরি সুধামুখীর ঘরে আসেন। ডাকাডাকি করতে হয় না। একাই আসেন বেশি, সোজা এসে ছেলের কাছে বসে পড়েন। একদঙ্গল পারিষদ জুটিয়ে এনে হুল্লোড় করেন না আগেকার মতো। অসাধারণ রকমের ফর্সা রং বলে সাহেব-সাহেব করেন—সাহেব নাম চালু হয়ে গেল তাঁরই মুখ থেকে। সোনার টাকা দেন নি বটে, তা বলে খালি হাতেও আসেন না কখনো। কোনদিন জামা কোনদিন বা দুটো খেলনা—কিছু না কিছু আনবেনই। হিংসা এই নিয়ে বাড়ির অন্য মেয়েদের। এবং পাড়ার সকলেরও। কত বড় লোকটাকে গেঁথে ফেলেছে মাংসের দলা ঐ একটুকু ছেলে দেখিয়ে।

প্রথম দিন জামিয়ারখানা পেতে দিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিয়ে যান নি। সাহেবেরই হয়ে গেল সেটা। দামি জিনিস—তবে অনেক দিনের পুরানো, পোকায় কাটা, ফেঁসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। বেচতে গেলে খদ্দের হবে না। সাহেব যখন দশ-বারো বছরের, শীতের ক'মাস সুধামুখী জিনিসটা দোভাঁজ করে বুকের উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে জড়িয়ে পিঠ বেঁধে দিত। গরম খুব, অথচ পাখির পালকের মতো হালকা। শাল গায়ে চড়িয়ে সাহেবের মেজাজ চড়ে যেত, সমবয়সি সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াত : আমার বাবার গায়ের জিনিস। দেখ্ কী সুন্দর ! বাবার এমনি গাদা গাদা ছিল, যাকে তাকে দিয়ে দিত।

রাজাবাহাদুরের যাতায়াত তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটা একেবারে ফোঁত। এ লাইনে হয়ে থাকে যেমন। রাজাবাহাদুরের চেহারাটাও সাহেবের ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু চালচলন মনমেজাজ সুধামুখীর কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে অনেক। তাই নিয়ে সমবয়সিদের কাছে দেমাক করে : বড়লোক আমার বাবা। গা থেকে শাল খুলে আমার বিছানায় পেতে দিল। পকেটের টাকাপয়সা মুঠো মুঠো তুলে মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে দিত।

বালকের সামান্য কথায় নফরকেষ্টর বুক টনটন করে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে সেই বাপটা তোর বড়লোকই ছিল রে সাহেব। কিন্তু পোকায়-কাটা বড়লোক। গায়ের জামিয়ারখানা যেমন, মানুষটাও তাই।

সুধামুখী শুনতে পেয়ে ধমক দিয়েছিল নফরকে। কিন্তু মনে মনে সায় দেয়। এককালে অনেক ছিল রাজাবাহাদুরের—হাবে-ভাবে কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। হেন মানুষটা গলিঘুঁজির পচা আবর্জনায় আনাগোনা করে, বুঝতে হবে ঘুণে-খাওয়া নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা তখন।

কিন্তু তাই বা কেমন করে? টাকার মানুষও যে আসে না, এমন নয়। কোন মানুষের কিসে স্ফূর্তি, বাঁধা নিয়মে তার হিসাব হয় না। একজন এসেছিল—টাকা-কড়ি যেন খোলামকুচি তার কাছে, পকেটের ভারবোঝা। নিতান্ত গঙ্গার জলে না ফেলে গঙ্গার পাড়ে বস্তির ঘরে দু-হাতে ছড়াতে এসেছে। সকালবেলা, অসময়। বাজার করা স্নান করা রান্না করা—খাওয়াদাওয়া অন্তে হল বা কড়িখেলা তাসখেলা দু-এক হাত। শুয়ে পড়ে তারপরে বিশ্রাম। সময়টুকু একেবারে নিজস্ব মেয়েদের। দোকান যদি বলতে চাও তো পুরোপুরি ঝাঁপবন্ধ দোকানঘরের।

এ হেন সময় মানুষটা সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতা মসমস করে ঢুকে পড়ল। পারুলের ঘরটা আয়তনে বড় আর সাজসজ্জায় চমৎকার—উঠানের শেষ প্রান্তে সেই ঘরে উঠল সোজা গিয়ে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে, আনকোরা নতুন মানুষ হলে ঠিক ঠিক ঘর চিনে যাবে কি করে? পারুল ভাগ্যধরী গা তুলে নড়ে বসতে হয় না তার। সে-ই পারে অবেলার খদ্দের সামলাতে।

ক্ষণপরে—ওমা, আরও দু-তিনটে মেয়ে পিলপিল করে যায় যে ওদিকে। সুধা-মুখীরও ডাক এল, পারুল ঝি পাঠিয়ে দিয়েছে।

দূর তোর দিদিমণির যেমন আক্কেল—আধবুড়ো মাগি বসছি গিয়ে আমি ওদের মধ্যে! বসলে কাজকর্ম করে দেবে কে আমার? ছেলে এই এক্ষুনি জেগে উঠবে, তাকে খাওয়ানো—

যাবে না তো পারুল নিজেই এসে পড়ল। সত্যিই ভালবাসে মেয়েটা, বড্ড টানে। বলে, চলে এস দিদি। টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে, ফাঁকতালে কিছু কুড়িয়ে নাও। সাহেব ঘুমুচ্ছে, থাকুক না একলা একটুখানি।

হাত ধরে টেনেটুনে নিয়ে বসাল। শতমুখে লোকটা নিজের চতুরতার কথা বলছে। বাড়ির মেয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছে পুজো দিতে। তিন-চারটে পাণ্ডা জুটে গেছে—যেমন আয়োজনের পুজো, সারা হতে আড়াইটে-তিনটে বাজবে। বলি, চোদ্দ-শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক আমি বেটা কাহাতক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াই। জায়গা খুঁজে বসিগে। খাস কলকাতার পাড়াগুলো বহু বার সার্ভে হয়ে গেছে, দক্ষিণের এইগুলো বাকি। দূরে বলেই হয়ে ওঠেনি। নকুলেশ্বরতলায় যাই বলে ওদের কাছ থেকে সরে পড়লাম।

বেলেল্লা কাণ্ডবাণ্ড। সেই ব্যাপার, সেই যা বলতেন রাজাবাহাদুর—মহিষ দিন দুপুরে পচা ডোবায় গা ডোবাতে এসেছে। মানুষও ইতর জন্তু একটা, সদরে একে অন্যের সঙ্গে অভিনয় করে বেড়ায়—অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রের নিরাবরণ মূর্তি দেখে এই অন্তে সন্দেহ থাকে না। এই জীবনে এসে কত-কিছু চোখে দেখে, তারও বেশি কানে শুনে থাকে—তবু এই দিনের আলোয় সর্বদেহ কঁকড়ে ওঠে সুধামুখীর। ধমকানি দেয়ঃ যান—চলে যান আপনি। ভদ্দরলোকের চেহারা তো আপনার—টাকার লোভে পেটের দায়ে আমরা যদিই বা নোংরা হই, আপনি লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেলেন কি করে! তেমন জায়গা নয় আমাদের, দু-পা গিয়ে ভাল ভাল লোকের বাড়ি। হালদার মশায়ের এলাকা, ছিটেফোঁটা কোনরকমে কানে উঠলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে পাড়াসুদ্ধ

গঙ্গা পার করে দিয়ে আসবেন।

মানুষটা চলে গেলে পারুলকেও তারপর গালি দিয়েছিল ঃ অন্য সকলে জুটেছ পেটের ধান্দায়—না গিয়ে তাদের উপায় নেই। দুর্জনের মনিব্যাগ থেকে বেরুলেও টাকার উপরে দাগ থাকে না, বাজারে চলে। সেই লোভে গিয়েছিল। কিন্তু তুই বোন এই নোংরামীর কি জন্যে আস্কারা দিবি? তোর তো সে অবস্থা নয়।

পারুল একটুও লজ্জিত নয়, হাসিতে গলে গলে পড়ে। বলে, ছোটবেলায় রাস্তায় পাগল দেখলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখতাম। এ লোকটাও তাই—উদ্দণ্ড পাগল একটা। পাগল ক্ষেপে গিয়ে টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে। দুটো-চারটে করে আঁচলে বেঁধে যে-যার ঘরে ফিরল—তুমি বোকা মানুষ, ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলে রাগ করে। সত্যি দিদি, দলছাড়া গোত্রছাড়া তুমি যেন আলাদা কী এক রকম।

অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী—বংশের উপরে আর বাপের মনে দাগা দিয়ে জন্মের মতো বেরিয়ে এসেছে, সুধামুখী মানুষটা তবু সত্যিই ভিন্নগোত্রের। এক বাবু এসেছিল তার ঘরে কয়েকটা দিন—সাকুল্যে আট-দশ দিন মাত্র। এই মোটা লেন্সের চশমা চোখে, ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়-চোপড়—খবরের কাগজ হাতে করে এসেছিল, কাগজটা ফেলে চলে গেল। ঢাউস বাংলা কাগজ, অনেকগুলো পৃষ্ঠা। সুধামুখী পুরো দু-দিন ধরে কাগজখানা পড়ল—সকল অন্ধিসন্ধি, বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন। ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ত। এমনই তো 'বিদ্যেবতী সরস্বতী' বলে অন্য মেয়েরা, কাগজ পড়তে দেখলে তারা রক্ষে রাখত না।

বস্তিবাড়ির বাইরে বৃহৎ একখানা জগৎ—বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলিতে তার আনা-গোনা ছিল, কিন্তু এ জায়গায় নেই। রূপকথার উড়ন্ত কার্পেটের মতো খবরের কাগজের উপর চেপে সেই জগৎ অনেক দিন পরে সুধামুখীর ঘরের মধ্যে হাজির হল। নেশা ধরে গেল, বাজারের মাছ-শাক কিনতে কিনতে ঐ সঙ্গে কাগজও একটা করে কিনে আনত। কদিন পরেই অবশ্য বন্ধ করতে হল পয়সার অভাবে। কোন দেশের এক রাজপুত্র আর তার বউকে মেরেছে, সেই ছুতোয় পৃথিবী জুড়ে দুরন্ত লড়াই। দুটো মানুষের বদলা হাজার লক্ষ মানুষ। সে লড়াই ডাঙায় আর সাগরের উপরে শুধু নয়—মানুষের পাখনা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে উড়েও লড়াই। রামায়ণের ইন্দ্রজিতের যে কায়দা ছিল। খবর পড়তে-পড়তে সুধামুখীর মনটাও যেন আকাশ-মুখো রওনা হয়ে পড়ে খাপরায় ছাওয়া বস্তিবাড়ির অশ্লীল ইতর জীবন ফেলে মেঘের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে।

ঠাট্টা করে সেই বাবুর সকলে নাম দিয়েছিল ঠান্ডাবাবু। ঠাট্টার পাত্র তো বটেই। নিপাট ভাল মানুষজনও এখানে এলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ মাটির এমনি মহিমা। মত্ত মানুষই বা কেন, মত্ত মহিষ। এঁর অপরাধ, মানুষই থাকেন পুরোপুরি। শান্ত হয়ে বসে বসে মোটা চুরুট খান, বই হাতে থাকল তো বই পড়েন চুপচাপ। এক-একদিন কেমন গল্পে পেয়ে যায়। অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন বোধহয়, ঘাঁটা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে। গল্পের আর অন্ত থাকে না।

না থাকতে পেরে সুধামুখী একদিন বলেছিল, আপনি গিয়েছেন বুঝি ঐ সব জায়গায় ?

ঠান্ডাবাবু হেসে বললেন, মিছে জিজ্ঞাসা কর কেন ? চাপাচাপি করলে কতকগুলো বাজে উত্তর শুনবে। নিজের কথা তোমাদের কাছে কেউ বলতে আসে না, আমিও বলব না। নিজের ইচ্ছেয় যা বলি, সেইগুলো শুধু শুনে যাও। ভাল না লাগে কি অন্য রকম যদি তাড়া থাকে, খোলাখুলি বল। উঠে পড়ব এখনই।

সুধামুখী তাড়াতাড়ি বলে, উঠবেন না আপনি, মাথার দিব্যি। বলুন কি বলছিলেন—সারা রাত ধরে বলে যান। ভাল লাগে আমার।

বাবুটি নিজেই এক খবরের কাগজ। কাইজারের নাম তখন লোকের মুখে মুখে—জর্মন দেশের রাজা কাইজার। লড়াইয়ে কাইজার হরদম জিতছে—পিটে পিটে তুলো-ধোনা করছে শত্রুদের। কাইজারের দেশে এক বনেদি শহরের গল্প—ছাপাখানা করে প্রথম যে জায়গায় বই ছাপা হল। নাম-করা এক পুরানো কফিখানা আছে, বাঘা বাঘা গুণীজ্ঞানী পন্ডিতেরা সেখানে যেতেন। মাটির উপরে আমরা একতলা দোতলা তেতলা দেখে থাকি, কফিখানার বাড়িতে মাটির নিচে ঠিক তেমনি তেতলা চারতলা পাঁচতলা নেমে গেছে। যত নিচে তত বেশি অন্ধকার—গুহার মত কুঠুরিগুলো, আসাবাবপত্র অতিশয় নোংরা। কফির দাম কিন্তু লাফিয়ে দ্বিগুণ চারগুণ ছ-গুণ হয়ে যাচ্ছে, বস্তু যদিচ সর্বত্র এক। এইসব ঘরে এই সমস্ত চেয়ারে বসে সেকালের অনেক দিকপাল খানাপিনা ও আমোদস্ফূর্তি করে গেছেন। নিশিরাত্রে চুপি চুপি এসে জুটতেন, প্রেমিকারা আসত, পাতালপুরীর বেলেল্লাপনা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মানুষের কানে বড়-একটা পৌঁছত না। পুরানো আমলের কিছু কিছু প্রেমপত্র কাচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে ঐসব কুঠুরির দেয়ালে। একালের মানুষ সেখানে বসে নিতান্ত নিরামিষ একপাত্র কফি খেয়ে আসে। কিন্তু গুণীদের রাসমন্ডপে বসে খেয়েছে, সেই বাবদে অতিরিক্ত মাশুল গুণে দিতে হল। কফির দামের উপরে মাশুল চেপে গিয়ে অঙ্কটা নিদারুণ।

গল্পের উপসংহারে নীতি-উপদেশ ঃ বুঝে দেখ, আমরাই নতুন কিছু করিনে। এক রীতি সর্বদেশে আর সর্বকালে। হতেই হবে। এই তোমার ঘরে যতক্ষণ আছি, পুরোপুরি এখানকারই। অন্য যা-কিছু পরিচয়—গলির মোড়ে খুলে রেখে এসেছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সেটা গায়ে চড়িয়ে ভদ্র-সমাজে নেমে পড়ব। উঁকি দিতে যেও না সেদিকে, অনধিকারচর্চা হবে।

রাজাবাহাদুরের সেই কথা ! মহিষ পচা পাঁকে গা ডোবাতে এসেছে। গোয়ালটা কোথা, সে খবরে কি দরকার ? তা বলে মন মানতে চায় না। যে সব লোক আসে তারা ঠিক জলে ভেসে-আসা ঐ সাহেবেরই মতন। পিছনের নাম-গোত্র পরিচয় নেই ! একাকী এসে রাজাবাহাদুর বেহুঁশ হয়ে ঘুমুতেন কোন কোন দিন। সুধামুখী তখন জামার পকেট হাতড়েছে। আর দশটা মেয়ের মতো টাকা-পয়সা গাপ করা নয়, কোন একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে যদি পকেট থেকে, অথবা এক টুকরো পরিচয়ের কাগজ। ছেলে-ছেলে করে ছুটে এসে পড়েন—স্নেহ-বুভুক্ষার কারণ যদি কিছু আবিষ্কার হয়।

অথবা এই যে মানুষটি—ঠাণ্ডাবাবু বলে যার উপর অন্যেরা নাক সিঁটকায়। এমনও রটনা আছে, পুলিসের চর নাকি উনি—বোমা-পিস্তলের স্বদেশিদের ধরবার উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে বসে নজর রাখেন, মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকুনি দেন। আবার ঠিক উল্টোটাই বলে কেউ কেউ ঃ উনিই স্বদেশি মানুষ—বিপদের গন্ধ পেয়ে এ পাড়ায় এসে ঠাঁই নিয়েছেন। সরকারের পুলিস সর্বত্র তোলপাড় করবে, লুচো-লম্পটের আড্ডা বলে পরিচিত এই রকমের বাড়িগুলো বাদ দিয়ে।

ঠাণ্ডাবাবুর সত্য পরিচয় কে বলবে?

একদিনের ব্যাপার, বাবুটি এসে সুধামুখীর দাওয়ায় উঠছেন। দাওয়ার নিচে পৈঠার উপর পা দিয়েছেন, একখানা ইট খুলে উল্টে পড়ল, উনিও পড়লেন। কিসের খোঁচায় পা কেটে গেল একটুখানি। অতিশয় ছোট ঘটনা। কত সব ভাল ভাল বড় বড় কথা বলতেন তিনি। সমস্ত তলিয়ে গিয়ে এই এক দিনের তুচ্ছ কথা ভুলল না সুধামুখী জীবনে।

পড়ে গেলেন তিনি পৈঠার ইট খসে। ইটের ফাঁকে আমের চারা। চারা বলা ঠিক হবে না। আম খেয়ে আঁটি ছুড়েছিল, আঁটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছে। ইটের তলে বাড়তে পারেনি—সেই অঙ্কুর অবস্থায় রয়ে গেছে। সবুজ নয় সাদা—মানুষ হলে রক্তহীন ফ্যাকাসে বলা চলত। আঘাত পেয়েছেন ঠাণ্ডাবাবু কিন্তু সেটা কিছু নয়। কত বড় একটা আশ্চর্য জিনিস, এমনিভাবে সুধামুখীকে ডাকলেন? দেখ দেখ, ক্ষমতাটা দেখে যাও এদিকে এসে। ইটের তলে পড়েও মরেনি ঐটুকু অঙ্কুর। দুটো পাতা অবধি বের করে দিয়েছে শিশুর মুখে দু-খানা দুধে-দাঁতের মতন। আশাখানা বোঝ—দু-তিন ইঞ্চিও যদি মাথা বাড়াতে পারে,-আলোর এলাকায় পড়ে যাবে। তখন ঐ পাতার মুখে আলো টেনে টেনে বেঁচে যাবে, বড় হবে, ডালে-পাতায় মহীরুহ হবে একদিন। বাঁচবার কত সাধ দেখ।

কী উল্লাস মানুষটির—উল্লাসের চোটে এক পাক নেচেই ফেলেন বুঝি বা! কাটা-পায়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সুধামুখী ব্যস্ত হয়ে বলে, ইস রে, ঘরে আসুন, গাঁদাফুলের পাতা বেটে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কানে নিতে বয়ে গেছে তাঁর। হাতের কাছে এক ভোঁতা কাটারি পেয়ে তাই নিয়ে মাটি খুঁড়ে অতি সন্তর্পণে চারাটা তুলছেন। বলে যাচ্ছেন যেন নিজেকেই শুনিয়ে ঃ কী মায়া পৃথিবীর মাটির! অমৃতের পুত্র কেবল মানুষই নয়—জীবজন্তু, গাছ-পালা সকলে। মরতে সবাই গররাজি। একটা জীবন নেওয়া বড় সোজা নয়। পারল এই এতবড় ইটখানা?

পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ধারে আমের চারা পুঁতে দিয়ে এলেন। বলেন, দিলাম একটু সাহায্য। মানুষের জন্য কিছু করতে পারিনে, এ-ও একটা জীব বটে তো! গরু-ছাগল পাঁচিলের ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিন্তু মানুষে না উপড়ে ফেলে সেইটে নজর রেখ তোমরা।

কিছুদিন পরে এই ঠাণ্ডাবাবু উধাও হলেন। নতুন কিছু নয়, কত এমন আসে

যায়। চিড়িয়াখানার কোন এক মরশুমে হঠাৎ যেমন বিচিত্র বর্ণের পাখি এসে ঝিলের উপর পড়ে, আবার একদিন চলে যায়। এ ব্যাপার নিয়ত চলছে। মানুষটি নেই, হাতের গাছটা দিব্যি বেঁচে উঠল। বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে ডালপালা বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে সাহেবও দেড় বছরেরটি। কথা ফুটছে এইবার।

পারুল আসে যখন-তখন। ছেলের কাছে বসে থাকে। কথা শেখায়। বলে, আমার কাকাতুয়াকে পড়িয়ে পড়িয়ে কত শিখিয়েছি, ছেলে শেখানো আর কি! জানো দিদি, ভোর না হতেই দাঁড়ের উপর পাখনা ঝটপট করে বলবে, হরি বল মন-রসনা। বোষ্টম- ঠাকুর যেন প্রভাতী গাইতে উঠোনের উপর এসেছেন। আবার রাতের বেলা অন্ধকার থেকে হঠাৎ বলে উঠবে, দেখছি—দেখতে পেয়েছি। শিখিয়েছি তাই আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠল পারুল। বলে, বজ্জাত কি রকম বোঝ দিদি। যে মানুষটা থাকে, ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে ওঠে ঃ কে কে ওখানে? কী দেখতে পেল? অবিকল মানুষের গলা তো! তবু তো পাখি একটা—পাখি কতটুকুই বা শিখবে! এই ছেলেকে যা একখানা করে তুলব। লোকে এসে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুনবে, কাছ ছেড়ে নড়বে না।

সাহেবের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে সুধামুখী তাড়া দিয়ে উঠল ঃ না, আজেবাজে ফাজলামি শেখাতে পারবি নে, খবরদার!

পারুল সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলে, তা কেন, শেখাব শুধু ঠাকুর-দেবতার কথা। রামায়ণ-মহাভারত, আর দেহতত্ত্বের ভাল ভাল উক্তি—কত আশা করে রে মানব দুই দিনের তরে আসিয়া, কাঁচামাটির দেহটা লইয়া অহংকারে মাতিয়া। এই সব।

চপল কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ছেলে চাইলাম তোমার কাছে, তুমি তো দিলে না। তারপরে—কাউকে বলবে না কিন্তু দিদি, মাথার দিব্যি রইল—কেমন এক ঝোঁক চেপে গেল আমার, তারপর কতদিন ভোরে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছি দিদি, যদি এসে পড়ে আবার অমনি একটি! ডাস্টবিন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি। সে কি আর যার তার কপালে দেয় বিধাতাপুরুষ!

সুধামুখী হেসে বলে, আমি বুঝি জানি নে কিছু!

পারুল সচকিত হয়ে তাকায় চারিদিকে। বারবধূ—তবু একটুকু লজ্জার আভা যেন মুখের উপর। বলে, বাজে কথা। কোন রকম অসুখবিসুখ হয়তো। মিছে হয়ে যাবে অসুখ সেরে গিয়ে। কিন্তু কথাটা এরই মধ্যে রটে গেল—একগাদা মেয়েমানুষ এক জায়গায় থাকলে যা হয়। কতবারই তো রটল কত কথা!

সুধামুখী সত্যি সত্যি স্নেহ করে পারুলকে। তার সেই বোন তিনজন—শেষটা অবশ্য বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু ছোট বয়সে কত ভাল ছিল তারা। তাদেরই একটি যেন পারুল। গভীর স্বরে বলে, না পারুল, এবারে মিছে নয়। গোপন করিস কেন? হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে এসেছিস, তাও জানি? বাচ্চা আসুক কোল জুড়ে। বাচ্চার বড় সাধ তোর। আমি না দিয়ে থাকি, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ দিচ্ছেন।

'এবারের প্রত্যাশা মিছে হয়নি। মেয়ে এল পারুলের কোলে। রানী। বলাধিকারী যার কথা নিয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানীকে চেন তুমি? নাকি ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছে সেই রানীর—সুধামুখীর চিঠিতে সেই কথা। সৎপাত্রে মেয়ে দেবে, পারুলের বড় ইচ্ছা। তাই বোধহয় হয়েছে। ফণী আচ্ছির ছোট ছেলেটা—ডাক-নাম ঝিঙে, ঘুরঘুর করত ঐ বয়স থেকেই! সে-ই বর হল কিনা কে জানে! রানীর নাম করে জগবন্ধু বলাধিকারী মুখ টিপে হাসলেন। অর্থাৎ রানীকে না পেয়ে প্রণয়ভঙ্গ হয়ে সাহেব বাউণ্ডুলে হয়েছে, সেই অবস্থায় রেলের কামরায় তাদের ধরেছেন।

সন্ধ্যার মুখে থাবা দিয়ে দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ানো এবার। ঘুম এসে গেছে, বজ্জাত ছেলে তবু নরম হবে না। চোখ বুজল একবার, মিটিমিটি তখনই আবার তাকিয়ে পড়ে। ঘুমো, ঘুমো—বড্ড দেরি হয়ে গেল, ওরা সব গিয়ে পড়েছে এতক্ষণে গলির মুখে।

এরই মধ্যে সুধামুখীর হঠাৎ কি রকম হল—ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি বুলি শেখাচ্ছে। বল রে খোকা—মা। সোনামণি লক্ষ্মীধন, বল—মা, মা, মা—। চারিদিকে তাকিয়ে নিল একবার: আমি তোর মা হই রে, আমারই জন্য ভেসে ভেসে এসেছিল—

জল নেমে আসে দু'-চোখ ছাপিয়ে। বিগতযৌবন কালোকুৎসিত নারী—কেউ না দেখতে পায়—চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে। আয়না তুলে নিয়ে সভয়ে দেখে, রং ধুয়ে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল বুঝি! রাজাবাহাদুর যাকে বলেন কোকিলের চেহারা। মানুষ তবে তো থু-থু করে সরে যাবে, রূপ দেখার পরে কেউ আর এগুবে না।

সকালে উঠে নফরকেষ্ট বেরিয়ে যায়। তার অনেক আগে রাত্রি থাকতেই ছেলে জেগে ওঠে। হাত-পা ছোঁড়ে, অঁ অঁ করে? যেন পাখির কাকলি। কথা বলছে শিশু যেন কার সঙ্গে। পাতলা ঘুমে নফরকেষ্টর চমক লাগল একদিন। মা-কালী বেরিয়ে এসেছেন মন্দির ছেড়ে, ছেড়ে এসেই যেন এই মাটকোঠার বন্ধ দরজা ভেদ করে শিশুর পাশে দাঁড়িয়েছেন হাসি-হাসি মুখ করে। শিশু অবোধ্য দেবভাষায় কত কি বলছে তাঁকে। চোখ বুজে বুজে নফরকেষ্ট সেইসব কথার মানে ধরবার চেষ্টা করে। বলছে কি দুঃখকষ্টের কথা এই সংসারের? দুধ জোটে না, বার্লির জল খাওয়ায়। তাতেও একটুখানি মিষ্টি দেয় না। জগজ্জননীর কাছে নালিশ করছে? ঘুমের ভারে চোখ আচ্ছন্ন, চোখ মেলা যেন বিস্তর খাটুনির ব্যাপার—কান দুটোয় শুনে যাচ্ছে! চোখ মেলতে পারলে দেখা যেত ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি: মা দাঁড়িয়ে আছেন, নৃমুণ্ডমালা খুলে রেখে সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়, খড়্গ-খর্পর ফেলে এক হাতে ধরেছেন ঝিনুক আর হাতে দুধের বাটি। সে বাটিতে দুধই বটে, জল-বার্লি নয়। ভোররাত্রে চুপিসারে ক্ষুধার্ত শিশুকে দুধ খাইয়ে বাতাস হয়ে এখনই মিলিয়ে যাবেন। চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু পাতা যেন আঠা দিয়ে

এঁটে রেখেছে, চোখে দেখা নফরার আর ঘটে উঠল না।

সকালবেলা পাখপাখালি ডাকতে সুধামুখী বাইরে গেছে। চোখ মুছে নফরকেষ্টও উঠে পড়ল। ছেলে ড্যাব-ড্যাব করে একনজরে কি দেখছে ঘরের চালের দিকে। তার-পরে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে তক্তপোষের উপর দুম-দুম পা ছুঁড়ছে, আর সেই অঁ-অঁ-অঁ—

নফরকেষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেঃ অঁ-অঁ নয় রে বোকারাম। মা—মা, মা-জননী—

সুধামুখী এসে পড়েছে। বলে, তবু ভাল, মা ডাক বেরোয় আজও তোমার মুখ দিয়ে।

নফর বলে, সে মা কি আর নরলোকের পাঁচি-খেঁদি মা! যা দু-চার পয়সা রোজগার করি, সবই সেই মায়ের দয়ায়। মা দক্ষিণাকালী। জননী স্বয়ং এসেছিলেন তোমার ঘরে। চোখ খুলতে পারলাম না, তাই দর্শন হল না। বুঝে দেখ, যোগী ঋষি ধেয়ানে পায় না—তাই আমার হতে যাচ্ছিল। ঘুমের ঝোঁকে নষ্ট করে ফেললাম।

স্বপ্ন ছাড়া কি—পুরো স্বপ্ন না হোক, আধাআধি গোছের। বলল সমস্ত নফর-কেষ্ট। সুধামুখী উড়িয়ে দেয় না। বলে, দেবী যদি হন—উনি মা-কালী নন, মা-ষষ্ঠী। এসব ষষ্ঠীঠাকরুনের কাজ—বাচ্চা যেখানে, ষষ্ঠীও সেখানে। বাচ্চা কতবার আছাড় খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে—বড় ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে পড়ত। ওদের কিছুই লাগে না, ষষ্ঠীঠাকরুন কোল পেতে ধরেন। বাচ্চার গায়ে মাছিটা বসলে আঁচল নেড়ে তাড়িয়ে দেন। কালকেউটে ফণা তুলেছে, সে ফণায় আর ছোবল দিতে পারে না, ষষ্ঠীঠাকরুনের হুকুমে দাঁড়িয়েই থাকে, বাচ্চার উপরে ফণার ছত্র ধরে। ছিনতাই-ছ্যাঁচড়ামি কাজ তোমার—কোন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য, শিখবে আর কোথায় তুমি!

নফরকেষ্ট ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, যা দেখেছি, এখন বুঝলাম মা-কালী নয় মা-ষষ্ঠীও নয়। দেবদেবীর হাতে ঝিনুক-বাটি, কোন পটে দেখিনি, পুঁথিতেও শোনা নেই—

সুধামুখীর খোশামুদে করে এই রকম মাঝে মাঝে, মিষ্টি কথার বন্যা বইয়ে দেয়। বলে, দেবতা-টেবতা নয় গো, মনে মনে তখন তোমাকেই দেখেছি। এই যেমন ভাবে তুমি এসেছ, রোজ সকালবেলা যেমন আস। একটা রক্তের ডেলাকে গড়েপিটে মানুষ করা কী সোজা ব্যাপার! ছেলেকে আমি শেখাচ্ছিলাম—বুলি ধরে সকলের আগে তোমায় ডাকবে—মা!

মেঝের উপর সুধামুখী ছেলে নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। খাওয়াচ্ছে। বলে, আমি শেখাব—বাবা। মা নয় রে খোকামণি, বাবা বলা শিখে নে তাড়াতাড়ি। বাবা, বাবা, বাবা— ! সেই হল আসল।

নফরকেষ্ট গদ-গদ হয়ে উঠেছে। মুখে হাসির ছটা। বল কি গো, বাবা ডাকবে আগে! আমি কী-ই বা করলাম! একটা দুটো টাকা—সে তো বরাবর দিয়ে থাকি। ছেলে এসে বেশি কি দিতে পেরেছি, ক্ষমতা কতটুকু আমার!

নফরার হাসি সুধামুখী নিমেষে ঘুচিয়ে দেয়, ফুৎকারে আলো নেভানোর মতো। বলে, শখ দেখে বাঁচিনে! কালোভুতো উৎকট এক বুনো-হাতি—তোমায় বাবা ডাকতে বয়ে গেছে। বাবা ডাকবার মানুষ আমার বাছাই-করা আছে। ডাক এক-একখানা ছাড়বে, আর টুং-টাং করে টাকা এসে পড়বে। বাবা ডাক মাংনা হয় না।

সেই বাছাই-করা মানুষ—একজন তো দেখা যাচ্ছে রাজাবাহাদুর। বাছাইয়ে ভুল হয়নি। তিনি এলেই সুধামুখী ছেলে বসিয়ে দেয় সামনা-সামনি। তারপর খানিকটা পিছু হটে রাজাবাহাদুরের পিছন দিকে গিয়ে ইসারা করে। পারুলের পোষা কাকাতুয়া যেমন—সঙ্গে সঙ্গে ইসারা বুঝে নিয়ে সাহেব ডেকে ওঠে, বাবা! নতুন বুলি বলতে গিয়ে চাঁপার কলির মতো ঠোঁট দুখানা একত্র করে আনে। হাসি-হাসি মুখ। সেই সময়টা পলকহীন চোখে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই।

সাহেব ডাকে ঃ বাবা, বা-আ-ব্বা—। রাজাবাহাদুর গলে গেছেন একেবারে। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে অনেকবার শুনতে চান, শুনে শুনে আশ মেটে না। জিনিসপত্র যা হাতে করে এসেছেন, গোড়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে। এক সময়ে উঠে জামার পকেটের ব্যাগ বের করে একগাদা পয়সা-দুয়ানি-সিকি সাহেবের সামনে রাখেন। খেলা করুক ছেলে যেমন ইচ্ছে ফেলে-ছড়িয়ে। মেজাজি মানুষ যা বের করে দিয়েছেন, পকেটে আর ফিরে তোলেন না।

সুধামুখীর দিনকাল খারাপ। আসেন ঐ রাজাবাহাদুর—ছেলের ফাঁদ পেতে যাঁকে আটকেছে। ঘরের মানুষ নফরকেষ্টরও দুদিন—একটা দুটো টাকা দিত আগে, তাও আর পেরে ওঠে না।

দুঃখে এক-একদিন নফরকেষ্ট ভেঙে পড়ে। সরল মানুষটা মনের কথা চাপতে পারে না, সুধামুখীকে খুলে বলে। মানুষটা ভাল হতে পারবে না তো টাকার মানুষ হবে, সেই ধান্দায় অহরহ ঘুরে বেড়ায়। টাকা রোজগারের সবচেয়ে ইতর পথটা বেছে নিয়েছে। ঘটিচোর বাটিচোর বলে ঠাট্টাতামাসা চলে—সকলের অধম ছিনতাই মানুষ, পথেঘাটে যারা হাতের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। চোর-ডাকাতের যে সমাজ, তার মধ্যে অন্ত্যজ। অথচ শিক্ষা চাই এই কর্মে—পুরোদস্তুর ম্যাজিক দেখানো শতেক জনের চোখের উপর। পাকা হাত হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা হাত নিয়ে নফরকেষ্ট করতে পারে বটে দেমাক!

একদিন হল কি—পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নিয়েছে। স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ—পুরো একটা দল যাচ্ছিল নতুনবাজারে কেনাকাটা করতে। নফরার সঙ্গেও জন তিনেক। এমনটা হবার কথা নয়, তবু কি গতিকে মক্কেলদের একজনের নজরে পড়ে নফরার হাত এঁটে ধরেছে। অন্যদেরও ঘিরে ফেলেছে সবাই, সরে পড়তে দেয় নি। এই মারে তো সেই মারে। মেরে আধমরা করে তারপর পুলিস ডাকবে, পথের কাজের যে রকম দস্তুর। নফরা নিরীহভাবে দু-হাত উঁচু করে তুলেছে ঃ বাজে কথা বললে তো হবে না, তল্লাস করে দেখে তারপরে বলুন। অতএব তল্লাসই চলল—একা একজন নয়, দল-সুদ্ধ মিলে। নেই কোথাও। অপর তিনজনকেও দেখে। নেই, নেই!

নফরা এবার জোর পেয়ে গেছেঃ দেখলেন তবে তো? খুশি হলেন? নিজেরা কোথায় ফেলেছেন। কিম্বা আনেন নি হয় তো একেবারেই। পথের মানুষ ধরে টানাটানি। দল হয়ে যাচ্ছেন, যা ইচ্ছে করলেই হল।

পাবে কোথায় সে বস্তু? যে মানুষটা নফরাকে চেপে ধরেছে, নফরা তারই পকেটে ফেলে দিয়েছে টুক করে। দুনিয়া জুড়ে তল্লাস করলে, নিজের পকেটে কখনো নয়। সরাবার অতএব সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

বিষম বেকুব হয়ে গেছে তারা। দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে নফরকেষ্ট নমস্কার করেঃ খুশি হয়েছেন—আসতে পারি তো এবার? এমন আর করবেন না।

ভদ্রতা মাফিক বিদায় নিয়ে এল। ডেরায় চলে এসেছে। কই, বের কর দিকি, গোনাগুনতি হোক।

সেই নোট নিয়েই ফিরেছে। নফরকেষ্ট নয়, অন্য একজনের কাছ থেকে বেরুল। নমস্কার করে বিদায় নিয়ে আসবার সময় সেই মানুষটার গা ঘেঁষে পুনশ্চ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। গচ্ছিত-রাখা জিনিসটা ফেরত আনার মতো।

এমনি কত। যা সমস্ত নফরকেষ্ট বলে, বাড়িয়ে বলে ঠিকই—খানিকটা তবু সত্যি। নফরকেষ্ট না-ও যদি করে থাকে, কেউ না কেউ করেছে এমনি। দিনকাল তারপরে খারাপ হতে লাগল। মক্কেলরা সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। পয়সা-কড়ির অভাব, মানুষজন প্রায়ই খালি পকেটে বেরোয়। নফরকেষ্ট ট্রামে যেত আগে ফার্স্ট-ক্লাসে। খুব একজন বাবুলোকের পাশে গিয়ে বসল। একটা পকেটে বাবুর হাত ঢোকানো। তার মানে নিজেই দেখিয়ে দিচ্ছে, মাল আছে এইখানটা। নফরকেষ্টর হাতে ঘড়ি—বাজে বাতিল জিনিস, দেখতে চকচকে ঝকঝকে কিন্তু চলে না। নফরা বলে, চলবার জন্য তো ঘড়ি নয় পরবার জন্যে, কাজের সাজপোষাকের মধ্যে পড়ে এটা। সেই ঘড়িসুদ্ধ হাত কানের কাছে এনে ধরেঃ কি মুশকিল, এখন আটটা? দম দেওয়া নেই, বন্ধ হয়ে আছে। বলুন তো ক'টা বেজেছে। পাশের ভদ্রলোক পকেটের হাত তুলে ঘড়ি দেখে সময় বললেন। হাত সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে ঢুকেছে। হাসি ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়, হাত ঢুকিয়ে কি সামলাচ্ছ এখন মানিক? সে বস্তু কি আছে, ডিম ফেটে পাখি হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে পকেট থেকে। নফরই আবার ভদ্রলোকের নজরে এনে দেয়ঃ ব্যাগ পড়ে গেছে আপনার। শশব্যস্তে ভদ্রলোক তুলে নিলেন। হাসি আসে আবার নফরকেষ্টর মুখে—ব্যাগ ভরা কতই যেন ধনসম্পত্তি! তবু যদি পরীক্ষা করে না দেখতাম! দু-তিন আনা ছিল হয়তো গোড়ায়, ফার্স্টক্লাস ট্রামের টিকিট কাটতে খরচা হয়ে গেছে। একেবারে শূন্য ব্যাগ।

সেই থেকে নফরকেষ্ট ফার্স্টক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ডক্লাস ধরল। তাতে বরঞ্চ মেলে কিছু কিছু। এই শিক্ষা হল, ভাল মক্কেল উঁচু ক্লাসে চড়ে না। এক জায়গায় একই সময়ে গাড়ী পৌঁছচ্ছে, বুদ্ধিমান হিসাবি লোক ফার্স্টক্লাসের অতিরিক্ত একটা-দুইটা পয়সা দিতে যাবে কেন? দেয় যারা বেপরোয়া উড়নচণ্ডী বাইরে কোঁচার পত্তন, পকেটে ছুঁচোর কেত্তন।

এসব আগের দিনের কথা, এই ক'টা বছরে বাজার পড়েজলে গেছে একেবারে। বয়সের সঙ্গে বেঢপ মোটা হচ্ছে নফরকেষ্ট, গায়ের রং আরও ঘন হচ্ছে দিনকে দিন—যা নিয়ে সুধামুখী কথায় কথায় খোঁটা দেয়। বড় বড় রাঙা চোখ—আয়নায় চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করে। নিরীহ পকেটের কারবারি কে বলবে, খুনি-দাঙ্গাবাজগুলোই হয় এ রকম। তার যে পেশা, সর্বদা সেজন্য মানুষের কাছাকাছি হতে হয়—কাছ ঘেঁষে গায়ে গা ঠেকিয়ে তবেই তো হাতের খেলা। কিন্তু চোখে দেখেই মক্কেল যদি ছিটকে পড়ে, কাজ হবে কেমন করে?

তার উপরে হাল আমলের ব্যবস্থাও সব নতুন। কাজের এলাকা ভাগ হয়ে গেছে। রাজার যেমন রাজ্যসীমা থাকে। ভিন্ন এলাকায় ঢুঁ মারতে গিয়েছ কি মেরে তক্তাপেটা করবে। পুলিসে নয়, যারা একই কাজের কাজি তারাই। এই কালীঘাটে সে আমলে মফস্বলের সরলপ্রাণ ভক্ত মেয়েপুরুষরা আসত। আসে এখনও গাঁ-গ্রাম থেকে, কিন্তু বিষম ধড়িবাজ—শহুরে মানুষের কান কেটে দেয় তারা। সমস্ত দিন ঘুরেও ভক্তিবিহ্বল আপন-ভোলা মানুষের মতো মানুষ একটি মেলে না। মায়ের নামে পকেটে নিয়ে এসেছে তো সর্বসাকুল্যে গণ্ডা পাঁচ-সাত পয়সা—চলেছে কিন্তু লক্ষপতির মেজাজে। ছত্রিশগড়ের রাজা কি ছত্রির নবাববাহাদুর। পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লে মাল ঠেকবে ঠিকই—সে মাল রুপোর টাকা কি সোনার মোহর কি তামার পয়সা বাইরে থেকে কেমন করে বোঝে? এসব কাজকারবার একলা একজন দিয়ে হয় না, মক্কেল সাব্যস্ত হয়ে গেলে দুটো-তিনটে ডেপুটি অর্থাৎ সহকারী লাগে। কাজ অন্তে সকলের বখরা। সেই বখরা বিলির সময় ধুন্দুমার লেগে যায়—তামার পয়সা তারা মুখে ছুঁড়ে মারে। নফরকেষ্টর গলায় গামছা দিয়ে টানে: ওসব জানি নে, লোক যখন ফেলা হয়েছে খাটনির উপযুক্ত মজুরি চাই। কর কেন ভুয়ো-মক্কেল বাছাই—ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক? কোর্টে কেস উঠলে ছ-মাসের সাজা কি ছ-দিন হত? হয় মজুরি দেবে, নয়তো তোমায় মেরে হাতের সুখ করব।

এই ছ্যাঁচড়া কাজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা উৎকৃষ্ট এক খোঁজদার জুটিয়ে নেওয়া। সেই খোঁজদার আদি অবস্থায় গড়োপিটে গোছগাছ করে দিল, নফরকেষ্ট দ্রুত গিয়ে কাজ হাসিল কবল তারপর। নফরা আর সেই লোক—আজেবাজে ডেপুটি ডাকবে না।

আরও এক নতুন উপদ্রব—থানা-পুলিস। এতকাল তাঁদের নিয়ে উদ্বেগের কারণ ছিল না। থানায় সদাশয় পুরুষরা ছিলেন, পাকা বন্দোবস্ত ছিল। তাঁরা রোজগার করতে এসেছেন, তোমরাও এসেছ—কেউ কারও প্রতিযোগী নয়। মাঝে মাঝে তাঁদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে নিজ রাজ্যে অবাধে চরে খাও—থানা তাকিয়েও দেখবে না। এখন এক হাড়বজ্জাত এসে বসেছে সেই থানার চুড়োয়।

মোক্তারমশায়রা আছেন, অতিশয় দক্ষ ও বিচক্ষণ। আদালতের লিস্টে তাঁদের নাম হয়তো রয়েছে, কিন্তু প্রাকটিশ থানার উপর এবং থানার আশেপাশে। যাবতীয় বন্দোবস্তে এঁরাই মধ্যবর্তী—নাম সেইজন্য পুলিসের মোক্তার। যেমন একজন বসন্ত

মোক্তার। দু-হাতে রোজগার, কিন্তু একদিনও আদালত মুখো হন না। পথ চিনে আদালতে হয়তো পৌঁছতেই পারবেন না। না যেতে যেতে ভুলে গেছেন।

বসন্ত মোক্তার গেলেন নফরকেষ্টর হয়ে। প্রবীণ মানুষটা চোখ-মুখ রাঙা করে ফিরলেন: নচ্ছার ফাজিল ছোঁড়া একটা, মানীর মান রাখে না। ইংরাজি শিখে পুলিসলাইনে ঢুকেছে কিনা, বিদ্যের দেমাকে ফেটে মরছে। কাজের একটু আঁচ দিতে গড়গড় করে ইংরাজি ছাড়তে লাগল—সাপ না ব্যাং মানে কিছু বুঝিনে। জুত হবে না, এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝে এলাম।

বললেন, চিরকেলে মক্কেল তুমি, ফাঁকিজুকি দেব না। একটা টাকা ফী দিয়ে দিও।

নফরকেষ্ট বলে, কাজ হল না, তবু ফী?

সেই জন্যেই তো ষোলআনা। কাজ হলে ষোল টাকাতেও কি পার পেতে? টাকা আজকেই যে দিতে হবে তার মানে নেই। হাতে যখন আসবে, সেই সময় দিও।

বসন্ত সেকেলে বাংলা মোক্তার। তাঁর ক্ষমতায় হল না তো নফরকেষ্ট ইংরেজি-নবিশ রাজমোহন সেনকে গিয়ে ধরে। বিস্তর অসাধ্যসাধন করেছেন ইতিপূর্বে। গেলেনও তিনি দু-তিন দিন, কিন্তু মুখ ভোঁতা করে ফেরেন। বললেন, গুচ্চের বকুনি শুনে এলাম, আর কিছু নয়। অন্তরে বিবেক, মাথার উপরে ভগবান—সৎপথে সাধুভাবে কাজকর্ম করে যাবে। সরকার যথাযোগ্য বেতন দিয়ে পুষছেন, সেই বেতনের উপর একটি আধেলা গোরক্ত-ব্রহ্মরক্ত। সংসার না চললে বরঞ্চ দু-বেলার জায়গায় একবেলা খাবে, অধর্মের পথে তবু পা বাড়াবে না।

সৎপথের পথিক হয়ে ছোকরা দারোগার কোন মোক্ষ লাভ হল, নফরকেষ্ট জানে না। এর অনেক পরে আর এক সাধু-দারোগা জগবন্ধু বলাধিকারীর পরিণাম শুনেছিল সে। বলতে বলতে বলাধিকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন: ধর্ম না কচু! মুকুন্দ মাস্টারের মত অপদার্থ যারা, গাল-ভরা এসব বলে তাঁরা দশের কাছে মান বাড়ায়, নিজের মনে সান্ত্বনা আনে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়—ওটা নিতান্তই কথার কথা। কিছু হয়তো সেকালে চলত, এখন চলে উল্টোটাই। পাপ নামটাই ভুল—পাপের পথ নয়, প্রয়োজনের পথ। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকলে প্রয়োজনের পথই আঁকড়ে ধরবে লোকে। নিরানব্বুই পার্সেন্ট যা করছে তাই বাতিল করে এক পার্সেন্ট পাগলের কথায় নাচানাচি করা আহাম্মুকি ছাড়া কিছু নয়।

এমনি কত কি। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারীর অনেক কথাই নফরকেষ্টর মাথায় ঢুকত না। বলতেন তিনি নফরকেষ্টকে উদ্দেশ করেও নয়। সাহেব থাকত, দল-বলের অনেকেই থাকত। কিন্তু যেটুকু যা-ই বুঝুক, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হত তাঁর এই নতুন ধরনের কথায়। একটা প্রতিহিংসার ভাবও যেন কালীঘাটের সেই ছোকরা-দারোগার উপর। বেঁচে থাকে তো দিব্যজ্ঞান পেয়ে সে-ও এমনিধারা উল্টো কথা বলে নিশ্চয়।

কিন্তু বলাধিকারির সঙ্গে পরিচয়—সে হল অনেক পরের ব্যাপার! থানা থেকে অপদস্থ হয়ে ফিরে রাজমোহন সেনের ব্রহ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্বলছে। খেঁচিয়ে

ওঠেন অলক্ষ্যে দারোগার উদ্দেশে: কসাইখানার মধ্যে বেটা ব্রহ্মার ঘৃত-পায়েস চড়িয়েছে। সাধু হয়েছিস তো বল্কল পরে বনে যা, থানার উপর কেন?

নফরকেষ্টরও মনের কথা তাই। বাবুমশায়রা, ভগবান অঢেল দিয়েছেন, ধর্মপথে থেকে জপতপ হোমযজ্ঞি নামগানে লেগে থাকুনগে। কিন্তু অহরহ ছুটোছুটি করে অন্ন জোটাতে হয়, মাথার উপর পঞ্চাশর্মীন এক ভগবান চাপানো থাকলে আমাদের দিন চলবে কেমন করে?

মনের দুঃখে নফরকেষ্ট সেই কথা বলছিল, কাজ-কারবার শিকেয় উঠে গেল। সদর রাস্তায় নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেড়ালেও ধরবে। শহরের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা, ঘরবাড়ি রয়েছে সেখানে গিয়ে উঠিগে।

সুধামুখী আহা-ওহো করে না, উল্টে খিলখিল করে হাসে: বাড়িঘরে তুমি যাবে না, যেতে পারো না। কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছ?

চটে গিয়ে নফরকেষ্ট বলে, হাসির কী হল শুনি? বাড়ি আমার নেই বুঝি? সে বাড়িতে নেই কোন জিনিস! এক-গোয়াল গরু, আউড়ি-ভরা ধান। ভাইরা আছে বোন আছে—ভাই-বোনে পোণে দুগণ্ডা। ভরভরন্ত সংসার—তার মধ্যে আমিই কেবল হতচ্ছাড়া।

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, সমস্ত আছে, নেই শুধু বউটা।

আছে আলবৎ। দরবার-গুলজার বউ আমার। এই কালীঘাটের মোড়ে এনে যদি দাঁড় করিয়ে দিই, তীর্থধর্ম চুলোয় দিয়ে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে আমার বউয়ের পানে। তুমি তার পাশে দাঁড়ালে চরণের দাসী ছাড়া কেউ ভাবতে পারবে না।

এতবড় কথার উপরেও সুধামুখী রাগ করে না, হাসিমুখে টিপ্পনী কাটে: বউ নিজের বাড়িতেই নিতে পার না, কালীঘাটে আনবে কী করে? বাড়ি গিয়েও তো চার ছড়ানো আর টোপ-গাঁথার ব্যাপার। লম্ফঝম্ফ যতই কর, কোনখানে তোমার নড়বার জো নেই। এই দাসীবাঁদী পোড়ামুখির ঘাড়েই এঁটে থাকবে জোঁকের মতো। যদ্দিন না আবার গাঁট ভারী হচ্ছে।

মর্মভেদী অনেকগুলো কথা বলে শেষটা বোধকরি করুণা হল মানুষটার উপর। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এত যাই যাই করবার কি হল শুনি? পড়তা খারাপ—তোমার রোজগার নেই। আমারও না। তা ছেলে কামাইদার হয়েছে, তার পয়সাই খেতে লাগি এখন।

পুলকের আতিশয্যে সুধামুখী বালিশ সরিয়ে বের করে ধরে। রাজাবাহাদুর এই আজকের দিনেই বাচ্চাকে যা খেলতে দিয়ে গেছেন। রুমালে বেঁধে সেগুলো বালিশের তলে রেখেছিল, রুমাল খুলে গণে দেখল। বলে, দেখ একদিনের রোজগার। তোমার কথা জানি নে, কিন্তু আমায় এতগুলো কেউ দেয় না। রাজাবাহাদুর হপ্তায় দু-তিনবার আসছেন—ভাবনা কিসের, উপোসি থাকব না আমরা।

নফরকেষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে। এত হাসিখুশি সুধামুখী রোজগেরে ছেলের মা বলেই। কঠিন কথাও সেই দেমাকে গায়ে মাখল না। নফরকেষ্ট শতকণ্ঠে তারিফ

করছে ঃ বাহাদুর ছেলে বটে, ভাল করে কথা না ফুটতেই রোজগারে নেমেছে। ভাগ্যিস তখন পারুলকে দিয়ে দাও নি। এখনই এই, বড় হলে ছেলে তো বস্তা বস্তা টাকা এনে দেবে।

ফোঁস করে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল ঃ আমার সেই হারামজাদি বউকে একটা দিনও ঘরে আনা গেল না। ছেলে থাকার কত গুণ, এ জন্মে বুঝল না।

চার দিনের মাথায় রাজাবাহাদুর আবার এসেছেন। ইদানীং বেশি ঘনিষ্ঠতা—তিনি এলে সুধামুখী এটা-ওটা খাওয়ায়। আজকে পিঠে হচ্ছে, পিঠে ভাজতে সে রান্নাঘরে ছিল। ঘরে এসে দেখে, সাহেব একাই বকবক করছে, রাজাবাহাদুর উঠে আলনায় টাঙানো জামার পকেট উদ্বিগ্নভাবে উল্টেপাল্টে খুঁজছেন।

সুধামুখী বলে, কি হল?

রাজাবাহাদুর বলেন, মনিব্যাগ পাচ্ছি নে। ট্রামে আসতে হয় তোর বাড়ি, সহিস-কোচোয়ান জেনে ফেলবে বলে নিজের গাড়িতে আসতে পারি নে। পকেট মেরে দিল না কি হল—খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি, নেই।

সুধামুখী গম্ভীর হল ঃ ছিল কত ব্যাগে?

তাই আমি গুণে দেখেছি নাকি? নিতান্ত খারাপ ছিল না। দশ-বিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে—

সুধামুখী বলে, এক-শ?

হতে পারে। পাঁচ-শ হলেও অবাক হন না। খাজাঞ্চিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

হেসে বললেন, সমস্ত গেছে, ফিরতি ভাড়াটাও রেখে যায় নি। যাবার সময় গোটা দুই টাকা দিস তো সুধা। ছেলেটার হাতে দুটো-চারটে করে পয়সা দিই। অভ্যাস হয়ে গেছে ওর, হাত পাতে। আজ আমি ডাহা বেকুব হলাম ছেলের কাছে।

মুশকিল, আজকেই একটু আগে সুধামুখী ঘরভাড়া চুকিয়ে দিল। হাত শূন্য। নির্ভাবনায় ছিল, রাজাবাহাদুরের আসবার তারিখ। আবার নকরকেষ্ট বলেছে, ডেপুটি হয়ে কোন এক মাঙাতের কাজ করে দিয়েছে—আজ বখরা পাবে। দেবে কিছু রাত্রিবেলা। দুটো মাত্র টাকাও ঘরে নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ঘর খোলা পারুলের—সন্ধ্যার মুখে বন্ধু কেউ এসে থাকে তো বিদায় হয়ে চলে গেছে। মেজাজি মেয়ে পারুল—স্বয়ং লাটসাহেব এলেও তার মন-মেজাজ বুঝে চলতে হবে। যখন বলব, তক্ষণ্ডেই বেরুতে হবে। না পোষায় তো এসো না। কে খোশামুদি করতে যাচ্ছে! সময় ভাল পড়লে এই রকমই হয়, খদ্দের পায়ে পায়ে ঘোরে।

নিরিবিলি ঘরে পারুল এখন মেয়ে নিয়ে আছে। সোহাগি মেয়ে—হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তো ঝরে। মেয়ের চোখে কাজল, কপালে কাচপোকার টিপ, গায়ে রংবেরঙের জামা। পাউডার বুলিয়েছে মুখে—সমস্ত হয়ে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট পা-দু-খানা কোলের উপর তুলে তুলি দিয়ে আলতা পরাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে নিশ্বাস চেপে নেয়। বলে, দুটো টাকা হাওলাত চাচ্ছে সাহেবের বাপ।

পারুল তাকিয়ে পড়তে মৃদু হেসে বলে, সেই যে রাজাবাহাদুর বাপটা। ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না। আবার যেদিন আসবে, দিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে টাকা বের করতে করতে পারুল কলকণ্ঠে বলল, পাঁজি দেখিয়ে এনেছি দিদি, বিষ্যুৎবারে আমার রানীর মুখে-ভাত। পুজোআচ্চা আর কি—মায়ের মন্দিরে নিয়ে প্রসাদ খাইয়ে আনব। বন্ধুমানুষ ক'জনকে বলছি, আর এ-বাড়ির যারা আছে। বেশি জড়াতে গেলে পারব না, কে ব্যবস্থা করে দেয় বলো। তোমার নফরকেষ্ট অবিশ্যি খুব পুলক দিচ্ছে, কিন্তু আমি সাহস করি নে।

সুধামুখী সভয়ে বলে, নফরার হাতে টাকাকড়ি দিস নি তো রে?

পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল। রানাঘাটে কে ওর আপন লোক আছে, সেখান থেকে পান্তুয়া আনবে। তার বায়না!

সুধামুখী হতাশভাবে বলে, রানাঘাটের পান্তুয়ার আশায় থাকিসনে পারুল। মিষ্টির অন্য ব্যবস্থা করে ফেল। নফরা দেশেঘরে চলে গেল।

পারুল অবাক হয়ে বলে, বল কি! এই তো, এইমাত্তর এসে টাকা নিয়ে গেল।

এসেছিল, সে আমি টের পেয়েছি। নয় তো রাজাবাহাদুরের ব্যাগ গেল কোথায়? আমায় দেখা দেয় নি—দেখা হলে হাঙ্গামায় পড়ত। ধরে নে, ঐ পাঁচ টাকাও সে হাওলাত নিয়ে গেছে।

একটু হেসে বলে, সাহেবের বাবাগুলো আজ মহাজন পাকড়েছে তোকে। দু-জনে পর পর। ফিরে এসে শোধও করবে ঠিক। ফিরছে কবে, সেই হল কথা! তোর হল পাঁচ টাকা; আর রাজাবাহাদুর বলছেন তাঁর দশ হতে পারে পাঁচ-শও হতে পারে—

বিড়বিড় করে নিজের মনের মধ্যেই যেন হিসাব করে দেখছে: পাঁচ আর দশ একুনে পনের। তা হলে দিন দশেকের বেশি নয়। পাঁচ-শ যদি হয় ধরে নাও বছর খানেক। বউ ধরার টোপ ফেলতে যাওয়া—খরচের ব্যাপার—টাকা একদিন ফুরোবেই। সেদিন না এসে যাবে কোথা? কেউ যদি একনাগাড়ে টাকা জুগিয়ে যেত, তবে আর নফরকেষ্ট বাড়ি ছেড়ে ফিরত না।

কথাবার্তায় কেমন এক রহস্যের ছোঁওয়া। কৌতূহলী পারুল বলে, দাঁড়িয়ে কেন দিদি, বোসোই না শুনি! সাহেবের বাপ সাহেবকে নিয়ে আছে, তোমায় তার কোন গরজ নেই।

বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে সুধামুখী বলে, বাড়ি গিয়ে নফরা চাকরে সাজে। বাবু নফরকেষ্ট পাল—কলকাতার বড় চাকুরে বাবু। মানুষটা এমনি ভাল তো—এক-একদিন বলে ফেলে অন্তরের কথা। বলে আর চোখ মোছে। চাকরে মানুষের মতো দু-হাতে রমারম খরচ করতে হয়। নয়তো সন্দেহ করবে, খাতিরযত্ন উপে যাবে, হেনস্থা হবে। বউ থাকে বাপের বাড়ি—টাকা দেখিয়ে তাকে খপ্পরে এনে ফেলতে চায়। বউটাও তেমনি ঘড়েল আবার—

পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকার বউ তো আমরাই সব। শালগ্রাম সাক্ষি রেখে মন্তোর পড়ে যাকে বিয়ে-করা—

জানিস নে পারুল, বিয়ের বউয়েরই বেশি খরচা। বউ পোষা আর হাতি পোষা। তা-ও তো সে বউ কাছে পেল না একদিন, লোভে লোভেই ঘুরছে। সম্বল ফুরোলে বাড়িতে তারপর লহমাও দাঁড়াবে না। আসতে হবে এই চুলোয়—আমার কাছে। রাত দুপুরে আপাদমস্তক ক্ষিদে নিয়ে রাক্ষস হয়ে আসবে, তার জন্যে ভাত রেঁধে রাখতে হবে আমায়। গোগ্রাসে পুরো এক পেট গিলে তার পরে কথা। তখন আর কিছুতে নড়বে না। আমি বলি জোঁক—জোঁক যেমন দু-মুখ আটকে গায়ে লেপটে থাকে। কিছুতে ছাড়ান নেই।

বলে, ক'দিন থেকে বাড়ি-বাড়ি করছে। রুপসী বউয়ের টান ধরেছে। আমারই ভুল, রাজাবাহাদুরকে সাবধান করে দিই নি। জানলার কাছে জামা রেখেছেন, বাইরে থেকে ব্যাগ তুলে নিয়েছে। গায়ে থাকলেই বা কি হত—মন্তোর-পড়া হাত ওর, চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেও ধরা যায় না।

টাকা নিয়ে সুধামুখী উঠে পড়ল। দু-পা গিয়ে কি ভেবে দাঁড়ায়ঃ তোরা বলিস, নফরা দিদির ভালবাসার মানুষ। হাসিতামাসা করিস। মিছেও নয়। কিন্তু সেই ভালবাসা নিয়ে সদাসর্বদা সামাল। টাকা হাতে পড়েছে বুঝতে পারলে ঝগড়া করে ভাব করে চুরিচামারি করে, যেমন করে হোক টাকাটা গাপ করে নিতে হবে। রক্তে পেট মোটা হলে জোঁক তখন আর গায়ে থাকে না, খসে পড়বে। আমাদের ভালবাসা জিইয়ে রাখতে কী কষ্ট রে পারুল!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুধামুখী বেরিয়ে গেল।

তিন

অনেক দিন—অনেক বছর পরে। সাহেব বড় হয়েছে। সেই এক বড় সমস্যা। বাচ্চা বয়সে রান্নাঘরে জোড়া পিঁড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখত, কুণ্ডলী পাকিয়ে ছেলে পড়ে পড়ে ঘুমুত। এখন আর সেটা চলে না। শোয়াতে পুরো মাপের মাদুর দরকার! এবং মাদুর পাতবার উপযুক্ত পরিমাণ জায়গা। সন্ধ্যারাত্রে তো ঘুমাবেই না। ঘরে রাখা চলে না ও-সময়—দিনরাত্রির মধ্যে কাজকারবারের ঐ সময়টুকু। বস্তিবাড়ি তখন মানুষজনের হুল্লোড়—বড়সড় ছেলের কাছে মুখ দেখাতে অনিচ্ছুক সেই সব মানুষ। ছোটখাট আলাদা একটু জায়গা পেত ছেলের জন্যে।

সাহেবের চোখ-কান ফুটেছে, জায়গা খুঁজেপেতে নিল নিজেই। কিছু না হোক, শোওয়ার সুখ বড্ড এই পাড়াটায়। বড় বড় লোকেরা গঙ্গার কূলে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মার্বেলপাথরে নাম খোদাই-করা—একের পুণ্য অন্যের হিসাবে ভুলক্রমে জমা পড়ে না যায় খিলান-করা মণ্ডপ ঘাটের উপরে, বৃষ্টির সময়ের আশ্রয়।

সেই সব ঘাটের উপর কোন একখানে পড়ে শুয়ে। সিমেন্ট-বাঁধানো মসৃণ চাতাল, ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। সীতারামের সুখ যাকে বলে। শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখ, তারা দেখ। মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, চাঁদ-তারা ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এক ঘুমে রাত কাবার।

মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই বোধ করি এমনি ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়ায় চাঁদ-তারা দেখতে দেখতে একদিন সাহেব ঘাটে ভেসে এসেছিল। উজান স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে সেই মা-বাপ আত্মীয়জনদের একটিবার যদি দেখে আসা যায়!

ঘাটে সে এমনি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। কাজকর্ম মিটিয়ে সুধামুখী নিশিরাত্রে এক সময় ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে সাহেব আরও খানিকটা বড় হয়ে যাবার পর সেটাও আর ঘটে ওঠে না। মাঝরাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হেঁটে হেঁটে বাড়ি অবধি যেতে বড় নারাজ সাহেব। ঐ ভয়ে শেষটা পালাতে লাগল। ঘাটের তো অবধি নেই—আজ এ-ঘাটে থাকে তো কাল ও-ঘাটে। সুধামুখী খুঁজে পায় না। বেশি খোঁজাখুঁজি হলে দূরে অনেক দূরে হয়তো চলে যাবে। এ তবু পাড়ার ভিতরে—বাইরে বেপাড়ায় গিয়ে কবে কোন বিপদ ঘটে না জানি। ভেবেচিন্তে সুধামুখী বেশি ঘাঁটা ঘাঁটি করে না। মা গঙ্গার উদ্দেশে বলে, তোমার পাশে পড়ে থাকে মা-জননী, দেখো আমার ছেলেকে। হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে গভীর রাত্রে ঘাটের উপর ঘুমন্ত সাহেবকে দেখে চলে যায়। মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে গেল কোনদিন হয়তো।

এমন স্ফূর্তির ঘুমানোয় মুশকিলও আছে, সেইটে বড় বিশ্রী লাগে। উষা-কালে পুণ্যার্থীরা সব গঙ্গাস্নানে আসেন: আরে মোলো, ঘাট জুড়ে পড়ে রয়েছে। উঠে যা ছোঁড়া, সরে যা। চানের পর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে মরি শেষকালে।

চোখে ঘুম এঁটে আছে, হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে সাহেব। পুণ্যবাণের পথ আটকে থাকতে যাবে কেন? দেবেই বা কেন তারা থাকতে? হাতে লাঠি থাকে কোন কোন বুড়োমানুষের। গঙ্গাজল নিয়ে যাবার কলসি থাকে পুণ্যবতীদের কাঁখে। বলা যায় না—লাঠি মারল হয়তো পিঠে, কলসী ভাঙল হয়তো বা তার মাথায়।

সাহেবের এই রকম। সেই রাজাবাহাদুর বাপও অদৃশ্য হয়েছেন অনেক কাল আগে। বয়স আরও তো বেড়েছে—এ পাড়ায় আসেন না তিনি। কোন পাড়ায় যান কে বলবে। হয়তো কোনখানেই নয়। বৃদ্ধ হয়ে মতিগতি বদলেছে, পুজো-আহ্নিক ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছেন। কিম্বা মরেই গেছেন হয়তো। সুধামুখী আজকাল খবরের-কাগজ পড়ে না—সংসারের দশ রকম খরচা এবং ছেলের খরচা কুলিয়ে তার উপরে আর কাগজের বিলাসিতা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই জানে না, কোন সকালবেলা হয়তো-বা কাগজে রাজাবাহাদুরের ছবি বেরিয়ে গেছে। অসংখ্য গুণাবলীর মালিক পূতচরিত্র এ রকম মানুষ হয় না, তাঁর বিয়োগে হাহাকার চতুর্দিকে। অসম্ভব কিছু নয়। নিয়তই ঘটছে তো এমনি। সেই ঠাণ্ডাবাবু

বলত জর্মানির কোন লাইপজিগ শহরের কফিখানার গল্প। কফিখানার পাতালতলে যে মেয়েরা নিশিরাত্রে এসে প্রেমলীলা চালাত, তাদের কাছে দিকপাল মানুষদের খুব সম্ভব একটি মাত্র পরিচয়—লম্পট নটবর। মানুষ মাত্রেই অভিনেতা, বলতেন ঠান্ডাবাবু। নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়—সাজ ফেললে ভন্ড বীভৎস রূপ। এই সঙ্গে গবেষক ব্যারিস্টার সাহেবের কথাও মনে আসে—সুধামুখীর বাপ যাঁর লাইব্রেরিতে কাজকর্ম করেন। অগাধ পান্ডিত্য, দেশ বিশ্রুত নাম—লাইব্রেরির সংগ্রহ যেমন বিপুল তেমনি মূল্যবান। কিন্তু আরও এক নিগূঢ় সংগ্রহ আছে, বাইরের লোকের মধ্যে জেনেছিলেন একমাত্র সুধামুখীর বাপ। ধার্মিক মানুষ বাবা পরম বেদনায় গুরুদেবকে বলছিলেন মানুষের রুচি-বিকৃতি ও পাপলিপ্সার কথা। প্রতিরোধের উপায় জিজ্ঞাসা করতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাপন্ডিত ব্যারিস্টার সাহেবের কথা তুললেন। একটুকু সুধামুখীর হঠাৎ কানে পড়ে গেল, জানলার বাইরে থেকে সে শুনতে পেয়েছিল। লাইব্রেরীর ভিতর একটা লোহার আলমারি সর্বক্ষণ তালাবন্ধ থাকে, তার মধ্যে দেশ-বিদেশের যত অশ্লীল বই আর ছবি। অতি গোপনে বিস্তর দামে এ সব বিক্রি হয়, পুলিশে টের পেলে টানতে টানতে শ্রীঘরে তুলবে। এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জলের মতন অর্থব্যয় করে বছরের পর বছর ব্যারিস্টার সাহেব সংগ্রহ জমিয়ে তুলেছেন। রাত্রে নিরিবিলি আলমারি খুলে দরজায় খিল এঁটে এই সমস্ত নাড়াচাড়া করেন। ছেলেপুলে সবাই জানে, গভীর গবেষণায় ডুবে রয়েছেন, পা টিপে টিপে চলাচল করে তারা, শব্দসাড়া হয়ে পাঠে কোনরকমে ব্যাঘাত না ঘটে। এ ব্যাধি থেকে কবে মুক্ত হবে মানুষ? হবে কি কোনদিন?

কিন্তু পরের কথা থাকুক এখন। দিনকাল আরও খারাপ। সুধামুখী চোখে অন্ধকার দেখে—কী হবে, ভবিষ্যতের কোন উপায়? রাজাবাহাদুর ফৌত, তার উপর নফরকেষ্টরও বিপদ। ধরা পড়েছে সে, ধরে নিয়ে আটকে ফেলেছে। তারই মুখের কথা এ সমস্ত—আগে আগে বলত সে এইরকম। আটকে রেখেছে জেলে নয়, বড়গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় ভাইয়ের বাসায়। অবরেসবরে চলে আসে সেখান থেকে। আসে দিনমানে, ছুটিছাটার দিনে।

বলত, জেলের চেয়ে বেশি খারাপ এ জায়গা। কয়েদিরা ছোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোনে। সে হল আরামের কাজ। এখানে কারখানার ভিতর হাজার চিন্তার গনগনে আগুন—হরিশ্চন্দ্র পালার চন্ডালের মত সর্বক্ষণ সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ। জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়ও হয়ে যায়। ভাইয়ের বাসার গোলকধাঁধা থেকে কোনকালেই বেরুতে দেবে না, শ্বশুরবাড়ি থেকে বউটাকে এনে ফেলে ভাল করে আটঘাট বন্ধ করবে, শুনতে পাচ্ছি। টাকা পড়ে মরুক, একটা সিকিও মুঠোয় রাখতে দেয় না। মাসের মাইনে হাত পেতে নিয়েছি কি ভাই অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলবে।

হেসে বলে, আমার কাছে টাকা দেখলে কারও প্রাণে জল থাকে না সুধামুখী। টাকার গরমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি না ফানুস হয়ে আকাশে উড়ি কেউ যেন সাব্যস্ত

করে উঠতে পারে না। কেড়ে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। সে আমি তোমার বেলাতেও দেখেছি।

আগে আগে ইনিয়েবিনিয়ে বলত এমনি সব। কেমন করে গ্রেপ্তার হল তা-ও বলেছে। নফরের ঠিক পরের ভাই নিমাইকেষ্ট। নিমাইয়ের শ্বশুর হাওড়ার এক ঢালাই কারখানার ম্যানেজার। তিনিই জামাইয়ের চাকরি জুটিয়ে পাড়াগাঁ থেকে মেয়েজামাই উদ্ধার করে আনলেন। কারখানা থেকে ঘর দিয়েছে, বাসা সেখানে। কিন্তু নিজের ভাল নিয়েই নিমাইকেষ্ট খুশি নয়—বড়ভাইটা কত বছর আগে শহরে এসে উঠেছে, তার খোঁজ নিচ্ছে তন্নতন্ন করে। কোথায় থাকে সে, কি করে, রোজগারের টাকাকড়ি যায় কোথায়—

সুধামুখীর কাছে হাত ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করে: কলিযুগের লক্ষ্মণ সম ভাই। খোঁজ করে করে ঠিক গিয়ে ধরেছে। নিমাই কেন যে কারখানার কাজে গেল, টিকটিকি-পুলিশের লাইন হল ওর, অঢেল উন্নতি করত।

একটা গোপন ডেরা আছে নফরাদের, এতকালের ঘনিষ্ঠতায় সুধামুখী পর্যন্ত তার ঠিকানা জানে না। কেমন করে গলির গলি তস্য গলি ঘুরে পনের-বিশটা নর্দমা লাফিয়ে প্যার হয়ে আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে নিমাইকেষ্ট সেখানে গিয়ে হাজির।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ভাইয়ের অবস্থার মোটামুটি আন্দাজ নিয়ে নিল। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা: চাকরিটা কোথায় তোমার দাদা?

থতমত খেলে সন্দেহ করবে। যেমন যেমন মুখে আসে, নফরকেষ্ট চাকরিস্থলের ঠিকানা বলে দেয়।

নিমাইকেষ্ট মেনে নিয়ে চুপচাপ চলে গেল। পরদিন আবার এসেছে। থমথমে মুখ। নফর প্রমাদ গণে।

গিয়েছিলাম দাদা তোমার আপিসে। বিস্তর লোকের বড় আপিস বললে—দেখলাম বিস্তরই বটে। লোক নয়, গরু আর মহিষ জাবনা খাচ্ছে। চাকরিটা কি তোমার—খাটালের গরু-মহিষের জাবনা মাখা?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, বাড়ির নম্বরের হেরফের হয়েছে, ওর পাশের বাড়িটা—চুয়ান্ন নম্বর।

সেইরকম ভেবে আমিও দু-পাশের বাড়ি দুটোয় খোঁজ করেছি। একটায় চুল কাটার সেলুন—চুল ছাঁটে দাড়ি কামায়। আর একটি মেসবাড়ি—দি গ্রাণ্ড প্যারা-ডাইস লজ।

নিমাইকেষ্ট মুখে কথা বলে, আর দুহাতে ভাইয়ের জিনিসপত্র কুড়োয়। এইদিক দিয়ে বড় সুবিধা, একটা বোঁচকায় সমস্ত ধরে গেল। বোঁচকা বড়ও নয় এমন কিছু। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডাকে: চলো—

—কোথায় রে?

বাসা হয়েছে হাওড়ায়, তোমার বউমা এসেছে। বাড়ির বউ মজুত থাকতে ভাসুর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে—ছি ছি করবে লোকে জানতে পারলে।

ফলাও করে নফরকেষ্ট বাসায় নিয়ে তোলার কাহিনীটা বলত। বড় সহজে

সেটা হয়নি, প্যাকছাট মেরেছে সে বিস্তর। নিমাইকেষ্ট তখন হাত চেপে ধরল। সে আরো বেশি পালোয়ান। গায়ের জোরে হিড়হিড় করে ট্রামে তুলে এবং অবশেষে বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে সে হাতের কব্জি ছাড়ে। জেলখানায় ঢোকানো বলছে কেন আর তবে!

নফরকেষ্ট বাড়িয়ে বলত নিঃসন্দেহে, এতদূর কখনও হতে পারে না। সুধামুখীর কাছে ভালমানুষি দেখানো—বুঝতে সেটা আটকায় না। বয়স হয়ে গিয়ে পুরানো কাজকর্মে জুত করতে পারছে না। থানার শনির দৃষ্টি তদুপরি। বাউন্ডুলেপনা ছেড়ে নফরা ঘরসংসারে চেপে পড়ল।

ছোট ভাই নিমাই তাই করে তবে ছেড়েছে। বাসায় তুলে ক্ষান্ত হয় নি, শ্বশুরকে ধরে কারখানায় একটা কাজও জুটিয়ে দিল। হায়রে কপাল, নফরকেষ্ট পাল চাকরে মানুষ রীতিমত। চাকরি করে বলে আগে সে লোকের কাছে ধাপ্পা দিত—কিন্তু কথা তো ক্ষণে-অক্ষণে পড়ে যায়, অন্তরীক্ষের ভগবান তথাস্তু বলে দিলেন। চাকরির গুঁতোয় লবেজান এবারে দিনের পর দিন। আটটায় ভোঁ বাজলে হন্তদন্ত হয়ে কারখানায় ছোটে। গলিত লোহা—লোহা কে বলবে, তরল আগুন—বালতি বালতি এনে ঢালছে ছাঁচের মধ্যে। ঢালছে অবিরত, লহমার বিরাম নেই—কলেই সমস্ত করে। নফরকেষ্টকে খাড়া দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, তাপে তারও দেহ এইবারে বুঝি গলে টগবগ করে ফুটবে। পিঠ চুলকাতে কিংবা গায়ের ঘাম মুছতে ভয় করে—হাতের চাপে সুসিদ্ধ হাড়-মাস-চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে খাবলা খাবলা উঠে আসবে হাতের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা টলতে টলতে বাসায় এসে পড়ে, তারপরে আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। ছুটির দিনে যে একটু-আধটু বেরোয়, ভাইবউ সেটা পণ্ড করবার জন্যে আগেভাগে একশ গণ্ডা কাজের ফরমাস দিয়ে রাখে। আর বাসায় ফিরে ঘরে পা ঠেকানো মাত্র ছোট ভাইয়েরও হাজার গণ্ডা। বলো তা হলে, জেলখানার বাকি থাকল কিসে?

গোড়ার আমলে নফরকেষ্ট এমনি সব বলত। ইদানিং আর বলে না, ধাতস্থ হয়ে এসেছে। বলে, ভালমানুষ না হয়ে আমি টাকার মানুষ হতে গিয়েছিলাম, টাকায় সব কিনব। কিন্তু টাকা হল না, হবার ভরসাও নেই। এবারে মানুষ ভাল হয়ে দেখি। সংসারের বাজারটা আমি করে দিই। নিমাইএর বউ মান্যগণ্য করে বেশ, পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সাজিয়ে এনে দেয়। সন্ধ্যের পর পাড়ার ক্লাবে গিয়ে কোন দিন তাসে বসে যাই। কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়, শুনি তাই বসে বসে। মাইনেও ফি বছর দু-তিন টাকা করে বেড়ে যাচ্ছে।

তবে আর কি! সংসার পোষ মানিয়ে ফেলেছে। এখন হয়তো মাসে একবার আসে, এর পর ছ-মাসেও আসবে না। টাকাপয়সার প্রত্যাশা ছাড়, মানুষটারই চোখের দেখা মিলবে না। হয়তো বা সারা জীবনের মধ্যে নয়—রাজাবাহাদুরের মতো। ভাল হয়ে গেছে নফর, বলবার কিছু নেই। প্রশংসারই ব্যাপার।

সুধামুখী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, বউ এল বাসায়?

উঁহু, আসেনি এখনও। আসার বেশ খানিকটা ভাব হয়েছে। আমার এক

খুড়তুত বোনের বিয়ে হল শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে—বোনকে নাকি আমার চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলে, আছি আমি লেগে পড়ে। আসতেই হবে—না এসে যাবে কোথায়, হারামজাদি? আজ না হয়তো কাল। বয়স তারও বাড়ছে, রূপের গুমোর আর বেশিদিন নয়। পাড়ার ছোঁড়ারা, আগে তো শুনতে পাই ঘরের চারদিকে ঘুরঘুর করত, শিয়াল তাড়ানোর মতো হাঁকডাক করতে হত রাত্রে। এখন একটাবার বেড়ায় ঘা পড়ে না, নাক ডেকে ঘুমোয়। আমারও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মপত্নী হয়তো ঠিক একদিন এসে উঠবে।

পারুল ছোট বোনের মতো, সুধামুখীর সকল সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গে।

ভাঙা আসর কোনদিন আর জমবে না পারুল। থুতু ফেলতেও কেউ আসে না। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা এবার থেকে।

ফোঁস করে পারুল নিঃশ্বাস ছাড়ে। মেয়ে হওয়ার পর থেকে তাকেও ভয়ে ধরেছে। বলে, ত্রিভুবনে আমাদের আপন-কেউ নেই। সবাই সুখের পায়রা, সুখের দিনে ঘরে এসে বকবকম করে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ি যদি পড়ে থাকতাম, রমারম টাকাকড়ি আসত না, গয়নাগাঁটি গায়ে উঠত না। কিন্তু গয়না-টাকায় মন ভরে না দিদি, সুখ আসে না।

পারুলের বয়স আছে, যৌবন আছে। তার আসর অন্ধকার হতে অনেক দেরি। লোকের সামনে কত ঠাকঠমক! সর্বাঙ্গে দোলন দিয়ে হাসে—খিক-খিক খুক-খুক। কিন্তু আড়ালে-আবডালে এমনি হয়ে যায়। আলাদা মানুষ—আমোদস্ফূর্তির মুখোসখানা ঘরের তাকে খুলে রেখে যেন সুধামুখীর কাছে এসে বসেছে. সন্ধ্যাবেলা আবার পরবে।

বলে মেয়েটা বড় হচ্ছে, ওর দিকে তাকিয়ে প্রাণে জল থাকে না দিদি। বিয়ে-থাওয়া দিতে পারব না, সারা জীবন শতেক হেনস্থা সয়ে বেড়াবে।

সুধামুখী সান্ত্বনা দেয়ঃ এমন খাসা মেয়ে, বিয়ে হবে না কে বলল! বয়সকালে আরও কী রকম শ্রী-ছাঁদ খুলবে দেখিস।

ম্লান হেসে পারুল বলে, এই মায়ের মেয়ে কে ঘরে নিতে যাবে বল। মায়ের পাপে মেয়ের খোয়ার। আমার মেয়েও যে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো, এ কথা কেউ বুঝে দেখবে না।

খপ করে সুধামুখীর হাত চেপে ধরলঃ তুমি যদি বউ করে নাও সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বড় ভাব দুটিতে, একসঙ্গে বেড়ায়—

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুধামুখী হেসে বলে, চখাচখী—যেমনধারা পদ্যে লিখে থাকে। একরত্তি ছেলে আর একফোঁটা মেয়ে, সমবয়সি খেলার সাথী—তুই একেবারে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিলি রে! বিয়ে না হলে মেয়ে অন্নত্যাগ করবে, ছেলে দেশান্তরী হবে—উঁ?

পারুল বলে, এড়িয়ে গেলে শুনব না দিদি। এখনই কে বলছে, কথাবার্তা হয়ে

থাক আমাদের। সাহেবকে আমি নিতে চেয়েছিলাম, দাওনি সেদিন। এবার আমার রানীকে দিতে চাচ্ছি, নিয়ে যাও।

সুধামুখী ধমক দিয়ে ওঠেঃ আস্ত পাগল তুই একটা। মায়ের দুধের গন্ধ এখনও মুখে—সেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা লেগে গেল। বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হতে দে, তখন দেখবি সাহেব তো সাহেব —কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সাহেবের কথা উঠলে তুই-ই হয়তো তখন নাকচ করে দিবি।

হত তাই দিদি, না হবার কিছু ছিল না, আমি কালামুখী যদি ওর মা না হতাম। পণ দিয়ে দানসামগ্রী সাজিয়ে আমার ঐ একটা মেয়ের বর খরিদ করে আনতাম। কিন্তু আমার টাকা কলঙ্কের টাকা। বরের বাপের মনে মনে ইচ্ছে হলেও সমাজের ভয়ে পেরে উঠবে না।

চোখে আঁচল-ঢাকা দিল পারুল। কিন্তু পারুলের সঙ্গে যতই ভাবসাব থাক, সুধামুখী কথা দিতে পারে না। ছেলে নিয়ে তার সমস্ত আশা। রূপে যেমন গুণেও একদিন সাহেব সকলের সেরা হবে। সকলের মান্য হবে। এখনই বোঝা যায়, ছেলের টান কত তার উপরে! কিসে একটু সাশ্রয় হবে সেজন্য আঁকুপাঁকু করে ঐটুকু ছেলে। বিয়ে সাহেবের কি এই ঘরের ঐ রানীর মতো মেয়ের সঙ্গে। কত সুন্দর বউ নিয়ে আসবে, সে মতলব মনে মনে সুধামুখীর ছকা রয়েছে।

চোখ মুছে পারুল বলে, কী দুর্বুদ্ধি হল, কেন যে এসেছিলাম মরতে? মেয়েটার একটু সাজতেগুজতে সাধ, তা আমি একটা ভাল কাপড় পরতে দিইনে—নোংরা জায়গার দশ শয়তানে রংতামাশা করবে তাই নিয়ে। এর চেয়ে সমাজের মধ্যে শ্বশুরের ভিটেয় নুন-ভাত খেয়ে যদি থাকতাম, সে ছিল ভাল। মানসম্ভ্রম ছিল তাতে। দায়ে-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল। বড্ড অনুতাপ হয় দিদি।

আমার হয় না।

কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পারুল তার মুখের দিকে তাকায়। সজোরে ঘাড় নেড়ে সুধা-মুখী বলে, কোনদিন আমার হয়নি। কিসের অনুতাপ! কলঙ্ক চাপা দিয়ে ঘরে থাকার মতো যন্ত্রণা নেই। সর্বদা আতঙ্ক, কখন কি ঘটে, কে কখন কি বলে বসে। মানুষ সুযোগও নিয়েছে ভয় দেখিয়ে। আজকে ঢাকাঢাকি নেই। আমি সত্যি সত্যি যে-মানুষ, তারই স্পষ্টাস্পষ্টি চেহারা। অনেক সোয়াস্তি এতে, অনেক আরাম।

পারুল প্রতিবাদ করে বলে, এ তোমার মুখের অহঙ্কার। ছোট বোনের কাছে মিথ্যে বলছ তুমি। কতদিন কাঁদতে দেখেছি তোমায়। আমায় দেখে চোখের জল মুছেছ।

দূর পাগলি, সে বুঝি অনুতাপে। আমার পয়লা নম্বর প্রেমিকটার কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। "জীবনে মরণে তোমার"—কেমন মিষ্টি করে বলত। প্রেমের কথা কতই তো শুনেছি, কিন্তু অমন মিঠে গলা কারো পেলাম না। পাগল হয়ে যেতাম, বুকের মধ্যে তোলপাড় করত। সারাক্ষণ তার পথ চেয়ে থাকতাম।

একটু থেমে ম্লান হেসে সুধামুখী বলে, তারপরে সেই বিপদের লক্ষণ দেখা দিল।

আঁচটুকু পাওয়া মাত্র "জীবনে-মরণে" সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। পুরুষমানুষের সুবিধে আছে—"না" বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়েই পার পেয়ে যায়। প্রমাণ হবে কিসে? মেয়েদের দুটো রাস্তা—হয় নিজের মরণ, নয়তো সেই বিপদের মরণ। বিপদ কাটিয়ে এসে দিব্যি আবার জমিয়ে আছি। সেই মানুষের দেখা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করি। পথের দিকে তাকিয়ে ভাবি, এতজনে ঘোরাফেরা করছে—সে একটিবার আসে না!

পারুল গভীর কণ্ঠে বলে, আজও তাকে ভুলতে পার নি?

ভুলি কেমন করে? হাত নিশপিশ করে, সামনে পেলে খ্যাংরার বাড়ি মারি ঘা কতক। কিন্তু আসবে না সে। হয়তো কোন লাটবেলাট এখন! কোন দেশ-নেতা। এমনি তো আখছার হচ্ছে।

পারুল চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। সহসা নিশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করেছে। খুনেই শোধ যায় নি, মড়া নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশি করে ফাঁসি হবার কথা।

সুধামুখী বলে, ফাঁসি দেয় ওরা সাদামাঠা মানুষ মারলে। খুন করার জন্যে আবার সুখ্যাতিও হয়। খুব বেশি খুন করলে ইতিহাসে জায়গা দিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো। কদিন মাত্র এসে কত রকম ভাবনাই দিয়ে গেছেন; খবরের-কাগজের পাতা-ভরা লড়াইয়ের কথা—মানুষ মারার খবর। তখন আর মানুষ নয় তারা—শত্রু। একজন-দুজন কিম্বা পাঁচজন-দশজন নয়—রেজিমেণ্ট। শত্রু মারবার কত রকম কলকৌশল, বৈজ্ঞানিকেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তাই নিয়ে গবেষণা করছেন—

পারুলের পোষা কাকাতুয়া সহসা ও-ঘর থেকে বলে ওঠে, কৃষ্ণ-কথা বলো—

হেসে ফেলে সুধামুখী: ঠিক একেবারে মানুষের সুরে বলে উঠল। তুই যা শিখিয়েছিস, সেই বাঁধা বুলি বলছে। সমস্ত কিন্তু বলতে পারে ওরা। হ্যাঁ, সত্যি। আগেকার দিনে বলত—রূপকথায় পুরাণো পুঁথিপত্রে রয়েছে। এখনও পারে ঠিক তেমনি। এই কাকাতুয়া বলে নয়, সমস্ত জীব-জন্তু পারে। বলে না কেন জানিস?

পারুলের মুখের উপর মুখ তুলে তীব্র স্বরে বলে, ঘেন্না করে ওরা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে। মানুষের উপরে মানুষ যেমন নৃশংস, কোন ইতর জানোয়ারেরা সে রকম নয়।

রানীর বড্ড বাহার খুলেছে দু-কানে দুই মাকড়ি পরে। বলে দেয়, ইহুদি-মাকড়ি এর নাম। সাহেব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কথায় কথায় ঘাড় দোলানো রানীর অভ্যাস, মনের খুশিতে আজ বেশি করে দোলাচ্ছে। ঘাড় দোলানির সঙ্গে মাকড়ি দুটো দোলে, আর যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কী সুন্দর—মরি, কত সুন্দর হয়েছে রানী নতুন গয়না পরে। হঠাৎ যেন বড়সড় হয়েছে। বয়সে দু-বছরের ছোট, তবু যেন সাহেবের চেয়ে সে অনেকখানি বড়। চালচলনে বড়দের ভাব। মেয়েছেলে কেমন আগে বড় হয়ে যায়। বড্ড কড়া মা পারুল, ফ্রক পরা বন্ধ করে দিয়েছে—

নাকি আব্রু থাকে না ঝকে, বিশ্রী দেখায়। শাড়ি পরে রানী—শাড়ি পরেই হঠাৎ বড় হয়ে পড়ল। রানী যেন আলাদা মানুষ আজকাল।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে, সাহস বলিহারি তোর রানী। কানে গয়না ঝুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিস।

রানী অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারছিস নে?

রানী বলে, গয়না পরব না, তবে মা টাকা খরচ করে কিনে দিল কেন?

কত টাকা রে?

রানী ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, তা দশ টাকা হবে। নয়তো পঁচিশ টাকা। সোনা, হীরে, মুক্তো বসানো কিনা।

রানীর কানের পিঠে হাত রেখে হাতের উপর সাহেব ঘুরিয়েফিরিয়ে মাকড়ি দেখল। হীরে এই বস্তু! কোহিনুর হীরকের কথা পড়া আছে—জিনিস আলাদা হোক, জাত সেই একই বটে! বুকের মধ্যে জ্বালা করে ওঠে!

চাট্টি মুড়ি খেয়ে আছে সাহেব, সুধামুখীর তা-ও নয়। সন্ধ্যার মুখে কাল সুধামুখী বলল, সাঁদ জমে বুকের মধ্যে পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে, উপোস দিলে টেনে যাবে। উপোস প্রায়ই দেয় আজকাল। রাতের পর রাত। কিন্তু ঐ সাঁদ কিছুতেই টানে না। এ সমস্ত বাইরের কাউকে জানতে দেবে না সুধামুখী, পারুলকেও না। কথায় আছে, নিত্যি মরায় কাঁদবে কে? তোমার বাড়ি নিত্যিদিন যদি মরতে থাকে, শেষটা কাঁদবার লোক পাওয়া যাবে না আর। তাই হয়েছে, দুঃখের কাঁদুনি লোকের কাছে গাইতে লজ্জা লাগে।

কিন্তু সুধামুখীর না হয় সাঁদজ্বর, ছেলেমানুষ সাহেবের কি? তার যে ক্ষিধে লাগে, ভাত না খেলে পেটই ভরে না। সুধামুখী বলে, জ্বরে কাঁপুনি ধরেছে, রাঁধতে যেতে পারছি নে বাবা। রাতটুকু মুড়ি খেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দে। সকালে উঠেই ফ্যানসা-ভাত রেঁধে দেব। গরম গরম ভাত, আলু-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

মুড়িও এত ক'টি মাত্র ঠোঙায়। কলাইয়ের বাটিতে সেগুলো ঢেলে দিয়ে জ্বরাক্রান্ত সুধামুখী কিন্তু লেপ-কাঁথার নিচে গেল না। ভাদ্র মাসের টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘ গলিটা শেষ করে বড়রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব বোঝে সমস্ত। দোমহলা-তেমহলার বাবু-ছেলেপুলের মতো ভ্যাবা-গঙ্গারাম নয় এরা। সেই মোড় থেকে সুধামুখী পথচারী কাউকে নিয়ে আসবে ঘরে।

সাহেব মুড়ি ক'টা চিবিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে ততক্ষণে ঘাটে চলে গিয়েছে। রানীকেও নিয়ে বসে কখনোসখনো, কিন্তু মেয়েটা ভালমন্দ খেয়ে তো ঢেকুর তুলছে, তাকে ডাকতে আজ ভাল লাগল না। ঘাটের পাকা পৈঠার উপর একলা বসে নৌকো দেখে। ঘুম ধরলে কোন জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে সুধামুখী তখন আর একটা মেয়ের গলা ধরে হাসিতে গলে পড়েছে। হাসে আর সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল কিনা কেউ। তা যদি হল, বাড়ির দিকে ফিরবে

এবার। এক-পা দু-পা চলে, আর আড়চোখে তাকায়—মানুষটা পিছন ধরল কিনা। একা একা ঘরে ফিরতে হলে কাল সকালে ফ্যানসা-ভাতের লোভ দেখিয়েছে,—সেই বস্তু হয়ে উঠবে না। জ্বর আরও বাড়বে, জ্বরের তাড়সে মাথা ছিঁড়ে পড়বে ঃ মাথা একেবারে তুলতে পারছিনে সাহেব, কেমন করে রাঁধতে বসি বল্ তুই।

কাল রাত্রে সাহেব মুড়ি চিবিয়ে আছে আর হীরে-মুক্তোর মাকড়ি দুলিয়ে বেড়াচ্ছে রানী। চোখ জ্বালা করে—অসহ্য চোখ মেলে গয়নার বাহার দেখা। সাহেব বলে, কানের মাকড়ি খুলে রাখ রানী। দেমাক দেখিয়ে বেড়ানো ভাল নয়।

সাধ করে রানী দেখাতে এসেছে, সাহেবের কথায় মর্মাহত হল। রাগ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জেদ করে বলে, না —। মাকড়ি দুলে ওঠে।

তোর ভালর জন্যেই বলি। মজা টের পাবি কানের নেতি ছিঁড়ে নিয়ে যাবে যখন।

রানী সবিস্ময়ে বলে, মাকড়ি আমার—কে নিতে যাবে? এত টাকা দিয়ে মা কিনে দিয়েছে—

নেয় না? গেরোনের দিনে কি হল সেবার—পাথরপটির ভিতরে, একজনের গলা থেকে মবচেন নিয়ে নিল না? তুইও তো ছিলি সেখানে।

ঠিক বটে। রানীর মনে পড়ে গেল। কত লোক জমে গিয়েছিল, কত হৈ-চৈ!

সাহেব বলে, কত দিকে কত সব চোর জুয়োচোর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটানে ছিঁড়ে নেবে। নেতি ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলবে, রক্ত বেরুবে গলগল করে। কানে আর কোনদিন গয়না পরতে হবে না।

রক্ত বেরোক, আর নেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক, রানী তাতে বিচলিত নয়। কিন্তু সারা জীবনে যে কানের গয়না পরা হবে না, তার চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে রানী সেই কথা বলল, সাহেব-দা আজ বড্ড ভয় দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে নেবে নাকি।

কথাটা ভাল করে শুনে পারুলও ঘাবড়ে যায়। খাঁটি কথা বলেছে। এতখানি তার মনে আসে নি, অথচ আশ্চর্য দেখ ছেলেমানুষটার হুঁশজ্ঞান! বলে, গয়না গেলে গয়না হবে। একখানার জায়গায় পাঁচখানা হতে পারে। তার জন্য ভাবিনে। কিন্তু একটা অঙ্গের খুঁত হয়ে থাকলে সেটা বড় লজ্জার কথা। যেমন কুসুমের নাম হয়ে গিয়েছিল আঙুল-কাটা কুসি। ডাব কাটতে গিয়ে দায়ের কোপ আঙুলে মেরে বসেছিল। যদ্দিন না মরণ হল, আঙুলকাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল কুসির। আমার কাছেই কেঁদেছে কত।

মাকড়ি নিজেই খুলল মেয়ের কান থেকে। বলে, রেখে দে তুই, আর পরিস নে। কানফুল কিনে দেব, নাকছাবি কিনে দেব, যে গয়না ছিঁড়ে নিতে পারে না। মাকড়ি যায়, সেটা কিছু নয়। কান ছিঁড়ে যাবে, লোকে কান-কাটা কান-কাটা করবে—কান-কাটা রানী। সর্বনেশে কথা। বিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো পাঁঠা বলি নিতে চান না, খুঁতো কনে কোন বর নেবে?

তালপুজো সেদিনটা। অমাবস্যা তিথি, তার উপর মঙ্গলবার পড়েছে, ভাদ্রমাস তো আছেই। মা-কালীর ডালির সঙ্গে একটা করে তাল দিতে হয়, তাল পেয়ে দেবী মহাতুষ্ট হন। এতগুলো যোগাযোগ প্রতিবছর ঘটে না, মন্দিরে আজ তাই বড় মচ্ছব। দূর-দূরান্তর থেকেও মানুষ এসে ভিড় করেছে। বাহারের সাজপোশাকে ধাঁধা লাগে চোখে।

সুধামুখীর জ্বর ও মাথাধরা তেমনি চলছে। শুয়ে ছিল, সন্ধ্যার মুখে উঠে পড়ল। সাহেবকে বলে, ভরা অমাবস্যা, তায় ভাদ্দরমাস। তার উপরে এত বড় পরব। পুরোদস্তুর নিশিপালন আজ বুঝলি রে সাহেব? তেষ্টার জলটুকু ছাড়া কিছু নয়।

আরও কি কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিল, গলা আটকে আসে, হাহাকারের মতন একটা আওয়াজ বেরোয়। জলের ঘটিটা নিয়ে সুধামুখী দ্রুতপায়ে বাইরে চলে যায়। জল থাবড়াল খানিকটা মাথায়, ভিজা চুলে তেল দিল। চুল আঁচড়াচ্ছে, রঙিন শাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, মাকে আজ একমনে ডাকতে হয়—মাগো, ভাত-কাপড় দাও, সুখ-শান্তি দাও। উপোসি থেকে খুব ভক্তিভাবে বল্ দিকি—ছেলে-মানুষের কথা আজকের দিনে মা ফেলবেন না, যা চাইবি ঠিক তাই ফলে যাবে।

কাল চাট্টি মুড়ি হয়েছিল, অদৃষ্টে আজ তা-ও নেই বোঝা যাচ্ছে। নিরম্বু উপোস। সাহেব ক্ষেপে গেল: মিছে কথা তোমার, খেতে না দেবার ছুতো। কাল কেন তবে মুড়ি খেতে হয়েছে? ভাত আমি চাই। ভাত রেঁধে দেবে, নয় তো রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে তছনছ করব। পারুল-মাসি নিতে চেয়েছিল, আমি জানি সমস্ত। কত যত্ন করত। রানীকে কত কি কিনে দেয়, আমাকেও দিত। কেন আমায় দাওনি তখন!

সুধামুখী বলে, মা হয়ে ছেলে পোষ্যানি দেব?

মা না হাতি। চালাকি করে মা হয়ে আছ। শুনতে আমার বাকি নেই। পরের বাচ্চা গঙ্গা থেকে কুড়িয়ে এনে মা! চোরাই-মা তুমি।

সুধামুখী আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে: এত বড় কথা বললি তুই সাহেব—পারলি বলতে?

নিঃশব্দে সুধামুখী কাঁদতে লাগল। কথা-কাটাকাটি করে না, এই কলহের একটি কথাও বাইরে চলে না যায়। বাড়িটা এমনি, মজার গন্ধ পেয়ে ভিড় হয়ে যাবে, কাজকর্ম ফেলে মেয়েরা এসে জুটবে। রসাল জিজ্ঞাসা নানা রকম। সাহেবের দিকে সবাই, শতমুখে সুধামুখীর নিন্দা করবে: আক্কেল দেখ না! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নাদুসনুদুস সোনা হেন ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে সলতে করে তুলেছে!

সাহেব রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি ভাঙতে যায় না, সুধামুখীর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। চুপচাপ ঘাটের উপর গিয়ে বসে। মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই ভাসতে ভাসতে একদিন যে ঘাটে এসে লেগেছিল। বন্ধু জুটেছে সমবয়সি কয়েকটা ছোঁড়া, ঘাটের বাঁধানো সমতলের উপরে একটু গর্ত খুঁড়ে নিয়ে গুলি

খেলে সকলে মিলে। ঘাটের মণ্ডপের ছাতে কলেকৌশলে উঠে গিয়ে ঘুঁড়ি উড়ায়। হঠাৎ এক সময় তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে ঘুঁড়ি ধরতে ছোটে। নৌকোঘাটা ঠিক পাশে বলে মাঝিমাল্লাদের এই ঘাটের উপর দিয়ে যাতায়াত। সাহেব তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে গল্প শোনার লোভে। ফুটফুটে ছেলেটা দেখে তারা কাছে ডাকে। ডেকে কত সময় নৌকোর উপর নিয়ে যায়। গল্প শোনা সাহেবের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কত কত গহিন নদী, কত অজানা দেশভুঁই। মালপত্র খালি করে নৌকো আবার ভেসে ভেসে চলে যায়। অমনি করে তারও নতুন নতুন জায়গায় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

ঝিঙে হল বস্তির ছোঁড়াদের সর্দার। এই বস্তির মালিক ফণী আড্ডির ছোট ছেলে। ঝিঙে ছাড়া আরও দুই ছেলে ফণীর। দুনিয়ায় আসা যেমন করে হোক দুটো পয়সা রোজগারের জন্য, ভগবান সেই জন্য নরজন্ম দিয়ে পাঠান—ফণী আড্ডি হামেশাই এই কথা বলেন। এবং ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য অহরহ লেগে পড়ে আছেন। ছেলে কোনটা কোথায় পড়ে রইল, খোঁজ নেবার সময় পান না। বাড়ি-ওয়ালার ছেলে—সেই খাতিরে, এবং নিজের গুণপনার জন্যে ঝিঙে ছোঁড়াদের মধ্যে মাতব্বর।

ঝিঙে ডাকে, ক্যালীবাড়ি চল সাহেব। আমরা যাচ্ছি।

না।

কত লোক এসেছে দেখতে পাবি। কত মজা।

ভাল লাগছে না। জ্বর হয়েছে আমার, শুয়ে পড়ব।

পারুলও আজ বাড়ি থেকে বেরুল। বড়রাস্তার মোড় অবধি এসে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে—মা-কালী করুন, পারুলের তেমন দশা কোন দিন যেন না ঘটে। মোড় ছেড়ে হেঁটে হেঁটে সে মন্দির অবধি চলে এসেছে। আলো দেখছে, দোকানপাট দেখছে, —কত রকমের মানুষ এসে আড়ম্বরের পুজো দিচ্ছে—ঘুরে ঘুরে তা-ও দেখল কতক্ষণ। যেখানে মানুষের ভিড় সেইখানে পারুল। ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে সেই ব্যবস্থা আজ অঢেল রকম করে এসেছে! সারা বেলাভ খেটেছে দেহটা নিয়ে। খাটুনি মিছা হয় নি পায়ে পায়ে সেটা বুঝতে পারে। এই রকম এক-একটা বিশেষ দিনে পারুল বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বেড়ায়। মানুষ টানবার ক্ষমতা বেড়েছে না কমে গেছে গত বছরের তুলনায়, তারও বুঝি একটা পরীক্ষা করে দেখে। একটা-দুটো লোক যেন খিমচি কেটে তুলে নিয়ে আসে জমাট ভিড়ের গা থেকে। খেয়ালি মেয়েমানুষ। লোক পিছনে তো ইচ্ছে করেই পারুল উল্টো-পাল্টা এদিক-সেদিক নিয়ে দুনো তেদুনো পথ ঘুরিয়ে মারে। কষ্ট হোক বেশি, কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না। ছিটকে পড়ে কিনা দেখাই যাক। একবার-বা পিছনে ফিরে, বন্ধন ইতিমধ্যে কিছু ঢিলে হয়ে থাকে তো, চোখের নজরে মুচকি হাসিতে আঁটসাট করে নেয় সেটা। ঢুকল এসে গলিতে, পৌঁছল বাড়ির দরজায়। হঠাৎ তখন মারমুখি হয়ে পড়েঃ পথের জঞ্জাল আদাড়-আঁস্তাকুড় বাড়ি ঢুকবার শখ তোমার! বেরো, বেরো—। পরখ যা করবার, হয়ে গেছে। অথবা মনে ধরল তো মোলায়েম কণ্ঠঃ

আসুন না ভালবাসা, মন্দ বাসায় ঢুকে পড়ুন। টেনে নিয়ে তুলল সাজানো ঘরে—ঘরের খাটের বিছানায়। কত খেলায় এমনি ! অজানা নতুন রাজ্যে দিগ্বিজয়ের আনন্দ।

রানীও মায়ের সঙ্গে। শাসন যতই হোক, মচ্ছবের দিনে মেয়েটি মুখ চুন করে একলা বাড়ি পড়ে থাকবে, সেটা হয় না। কোন প্রাণে পারুল মানা করতে যাবে! কেউ যদি পিছন ধরে তো রানীকে বলে দিতে হবে না, আপনা থেকেই ভিন্ন পথে এগিয়ে চলে যাবে। যেন মা-মেয়ে নয়—নিতান্তই পথের পথিক, কোনরকম জানা-শুনো নেই দুইয়ের মধ্যে। কোন অবস্থায় কেমন ভাব দেখাতে হবে, ছেলেমেয়েদের এখানে হাতে ধরে শেখাতে হয় না।

মন্দিরে যাবার ইচ্ছা সুধামুখীরও। কিন্তু বৃষ্টির পশলা, গায় জ্বর, আপাদ-মস্তক দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে একেবারে। হেন অবস্থায় ভয় হল অতদূর হাঁটতে। তার চেয়েও বড় ভয়—হাত-মুখে রং মেখে সজ্জা করেছে, উজ্জ্বল আলোয় কারসাজি সমস্ত ধরা পড়ে যাবে। গলির মুখে প্রতিদিনের সন্ধ্যাবেলার আলোআঁধারি জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড় কিছু পাড়ার মধ্যেও ছিটকে এসে পড়েছে। মা-কালীর উদ্দেশে জোড়হাতে সুধামুখী বারম্বার কান্নাকাটি করেঃ পার্বণ শুধু তোমার মন্দিরে কেন মা, আমার ঘরেও যেন ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। আমার সাহেবের মুখে চাট্টি চাল ফুটিয়ে ধরতে পারি যেন মা।

সাহেব গঙ্গার ঘাটে। সুড়ুৎ করে এক সময় বস্তিবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সব ঘরের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, দরজায় দরজায় শিকল তোলা। গিয়েছে বেশির ভাগ কালী-বাড়িতে, দুচারজন মোড়ের উপর। এজমালি ভৃত্য মহাবীর—ভৃত্য বটে, আবার খানিকটা অভিভাবকও বটে ! সে লোকটাকেও দেখা যায় না, গিয়ে মচ্ছবে জমে পড়েছে ঠিক। সন্ধ্যাবেলাটা এখন পাহারা দেবার কিছু নেই, মানুষজন আসতে লাগেনি যে এটা-ওটার ফাইফরমাস হবে। নির্ভাবনায় কোনখানে গিয়ে সে আড্ডা জমাচ্ছে !

অবিকল এমনিটাই ভেবে রেখেছে সাহেব। নিশ্চিন্ত। কাজও সাব্যস্ত হয়ে আছে—লাইনের সর্বশেষে পারুল-মাসির ঘরে। দেখেশুনে রেখেছে, তবু ঠিক কাজের মুখটায় সতর্কভাবে আর একবার দেখে নেওয়া উচিত। ঘরের ওপাশে ফাঁকা জায়গা-টুকুতে কয়েকটা গাঁদা দোপাটি ও পাতাবাহারের গাছ। ঠান্ডাবাবু সেই আমচারা পুঁতে গিয়েছিলেন, বিস্তর ঝড়ঝাপটা খেয়েছে—সেবারের আশ্বিনের বড় ঝড়ে পুরানো পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে পড়েছিল চারাগাছের উপর—সামলে উঠে ডালপালা মেলে দিব্যি এখন তেজীয়ান হয়েছে ! সেই গাছের উপর চড়ে সাহেব উঁকিঝুঁকি দেয়—এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে দেখতে পাওয়া যায় কি না, দেখছে কি না কোন লোক। নিঃসংশয় হয়ে এবার বারান্ডায় উঠে পড়ল।

ওরে বাবা, কত বড় তালা ঝুলিয়ে গেছে দেখ দরজায়। আদিগঙ্গার ওপারে লক্ষপতি মহাজনদের বড় বড় আড়ত, তারা কখনো এইরকম আধমনি তালা ঝুলায় না। কী করা যায়, কী করা যায় ! ঝিঙেটা বাহাদুরি করে, সে নাকি হামেশাই এসব করে থাকে। আর সাহেব, ধরতে গেলে, নিজের ঘরেই কাজ করতে এসে হার স্বীকার করে ফিরে যাবে ?

খোঁজাখুঁজি করে পেয়ে গেল কয়লাভাঙ্গা ভারী লোহাখানা। ঠিক হয়েছে। দু হাতে তুলে তালার উপর দেবে মোক্ষম বাড়ি। একের বেশি দুটো বাড়ি লাগবে না। কাছে-পিঠে মানুষ নেই যে শব্দ শুনে রে-রে—করে আসবে। অসে যদি, তারও উপায় ঠিক আছে। আমগাছ বেয়ে উঠে দেবে লাফ পাঁচিলের ওপারে। পাঁচিল টপকানো ব্যাপারটা সাহেবের খুব রপ্ত। সাধারণ যাতায়াতের ব্যাপারেও এই পথ বেশি পছন্দ তার। দরজার ছোট্ট খোপ গলে আর দশটা মানুষের মতো চলাচল সে কালেভদ্রে করে থাকে।

লোহাটা তুলে নিয়ে চতুর্দিক আরও একবার দেখে নেয়। মালকোঁচা সেঁটে নিল। তাড়া খেয়ে দ্রুত যদি পাঁচিলে উঠতে হয়, ঢলঢলে কাপড়ে বেধে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। হাতিয়ারপত্র সহ রীতিমতো বীরমূর্তি। তালাটা হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ঠিক জায়গায় বাড়িটা যাতে লাগে—

হরি, হরি! হাতে ছুঁতে না ছুঁতে তালা হাঁ হয়ে পড়ে। পুরানো বাতিল বস্তু, কোনগতিকে একটুখানি চেপে দিয়ে চলে গেছে। তালার সাইজ দেখেই চোর আঁতকে উঠে সরে পড়বে—ক্ষেতের মধ্যে যেমন খড়ের মানুষ দাঁড় করিয়ে কাক-পক্ষী তাড়ায়। সাহেব খলখল করে হাসে। পারুল-মাসি দশ টাকা কিম্বা পঁচিশ টাকা দিয়ে হীরে-মুক্তোর মাকড়ি কিনে দিয়েছে, দরজার জন্য চার গণ্ডা পয়সারও একটা তালা কিনতে পারে না!

বড় হয়ে এই দিনের ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা নিজেদের মধ্যে। সাহেব বলত, তালা ঠিকই ছিল, তালোদ্ঘাটিনী মন্ত্রে খুলে গেল। এখন সেটা বুঝতে পারি, সেদিন অবাক হয়েছিলাম। তালোদ্ঘাটিনী অতি প্রাচীন মন্ত্র—বলাধিকারী মশায় বলেন, বেদের আমলেও এই পদ্ধতি চলত? শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে তার। নাকি মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালা আপনি খুলে পড়বে। এ লাইনের ভাল ভাল মুরুব্বিদেরও, ঠিক এই বস্তু না হোক, তালা খোলার নানারকম তুকতাক জানা। এক রকম পাতার রস তালার ছিদ্রে ঢেলে দিলে তালা খুলে পড়ে! শিকড়ও আছে, বুলিয়ে দিতে হয়। সমরাদিত্য-সংক্ষেপ নামে পুঁথিতে গল্প আছে—গুরু-শিষ্যকে তালা ভাঙার মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু চুক্তি হচ্ছে কদাপি সে মিথ্যা বলতে পারবে না। কথা রাখতে পারল না শিষ্য, দৈবাৎ মিথ্যা বলে ফেলেছে। ফল অমনি হাতে হাতে। তালা ভেঙে যেইমাত্র ঢোকা, গৃহস্থ ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে। মোটের উপর এই একটা কথা। রীতিমতো নিষ্ঠাবান হতে হবে আপনাকে, নইলে চোরের দেবতা কার্তিকেয়র অভিশাপ লাগবে, যত সতর্কই হন নিশ্চিত ধরে ফেলবে ঘরের ভিতর।

সাহেব তাই বড়াই করে বলে, আমার কি রকম নিষ্ঠা দেখ ভেবে। রানীর সঙ্গে এত ভাবসাব, আমাদের দুজনের জুড়ি দেখে সবাই বর-বউ বলত। আদর্শ বউয়ের যেমনটি হতে হয়—রানীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সব কথা আমার সঙ্গে। তবু দেখ তারই ঘরে কাজের বউনি আমার। অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকে গেলাম। পারুল-

মাসির সাজানো বড়ঘরের পাশে ছোট্ট ঘরখানা—পোষা কাকাতুয়া, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় ও পানের সরঞ্জাম থাকে। সন্ধ্যাবেলাটা বড়ঘর ছেড়ে রানী এসে এখানে আস্তানা নেয়, তার ধনসম্পত্তি যাবতীয় সেখানে।

পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রানী মাকড়ি রেখেছে, সমস্ত জানা। লুকিয়ে রেখে গেছে। ঘরে ঢোকা, গয়না নিয়ে বেরুনো এবং তালা যেমন ছিল তেমনিভাবে লাগিয়ে রাখা—পলক ফেলতে না ফেলতে হয়ে গেল। পাঁচিল টপকে সাহেব সাঁ করে সরে পড়ল। ডুবে গেল তালপুকুরের মচ্ছবে। একবারও যে বাড়ি ঢুকেছিল, কেউ তা জানতে পারবে না।

পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত সাহেব-চোর—ডাঙায় হোক, জলে হোক পরিচ্ছন্ন নিখুঁত একখানা কাজ দেখলেই লোকে বলত নিশিরাত্রে সাহেব-কুটুম্ব এসে গেছে নিশ্চয়। ভাঁটি অঞ্চলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সন্ধ্যাবেলা সুর করে যার নামে ছড়া কাটত—

কচ্ছপের খোলা দুয়ারে—
সাহেব চলল শহরে।
কুচে-কচ্ছপ-কাঁকড়া
সাহেব পালায় আগরা।
শিং-নড়বড়ে বোকা দাড়ি

চৌকি দেচ্ছেন আমার বাড়ি।
আম-শিমের অম্বল
কাঠ-শিমের ঝোল
সাহেব-চোর যায় পলায়ে
বুড়ি ভদ্রার কোল।

সেই সাহেবের পয়লা দিনের কাজ এই। রানীর সাধের মাকড়িজোড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে। যায় কোথা এখন, মাল সামলাবার উপায়টা কি ?

সাহেব-চোরের পয়লা দিনের কাজ। জীবনের পাপ বল, দোষত্রুটি বল, এই তার সর্বপ্রথম। অনেক কাল পরে বলাধিকারীকে সে বলেছিল রানীর মাকড়ি-চুরির এই কাহিনী। আনুপূর্বিক শুনে তো হো-হো করে হেসে ওঠা উচিত ! কিন্তু না হেসে তিনি সবিস্ময়ে তাকালেন : আদর্শ মাতৃভক্তি—মায়ের কথা ভেবেই ভালবাসার জনের মনে দুঃখ দিতে সঙ্কোচ হয়নি।—তুলনা করা ঠিক হবে না—তবু আমার বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা মনে পড়ল। আরও বিস্তর বড় বড় লোকের কথা। মায়ের আশীর্বাদে তাঁরা সব বড় হয়েছেন। তুমিও বড় হবে সাহেব, এই আমি বলে দিলাম।

এত বলেও বলাধিকারীর উচ্ছ্বাস থামে না। আবার বললেন, মহৎ মানুষের ভাল ভাল কাজকর্মের কথাই পুঁথিপত্রে লেখে। চোরের কথা কে লিখতে যাবে? পুণ্যের বড় মান, পাপ হোক খানখান—গালি দিয়ে, থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলে সকলে সামাজিক কর্তব্য সেরে যায়। ভালমানুষ হয় অন্যের কাছে। মানুষের ভিতর অবধি তলিয়ে দেখবার চোখ আছে ক-জনার?

কৌতুক-চোখে সাহেব পিছনের এইসব দিনের পানে তাকিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি সাহেব একসময় খুব বড় হল, নামডাক হল প্রচুর। সাহেবচোর বলতে একডাকে চিনে ফেলত ভাঁটি অঞ্চলের মানুষ। পয়লা কাজে মাতৃআশীর্বাদ পেয়েছিল, তারই ফলে বোধ হয়। সুধামুখীর চোখ ফেটে জল এসেছিল, তালপুজোর রাত্রে চাল-ডাল কিনে এনে সাহেব যখন তার হাতে দিল। সাহেবের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি বলল খানিক। কিন্তু সুধামুখীকে মা-ই যদি বলতে হয় তো চোরাই-মা। সেই মায়ের আশীর্বাদে সন্তান বড় জ্ঞানী, বড় গুণী হয় না—হয় মস্তবড় চোর। সাচ্চা মা হলে সাহেবও সাচ্চা মানুষ হত—যাঁদের নামে লোকে ধন্য-ধন্য করে। তাঁদের পাশাপাশি না হোক, পায়ের নীচে বসবার ঠাঁই পেত।

সেইদিন আরও এক মাতৃভক্তির গল্প করলেন বলাধিকারী। সুবিখ্যাত কাপ্তেন কেনা মল্লিক, তার বড় ভাই বেচারামের। মহামান্য সরকারের বিচারে ফাঁসি হয়েছিল তার। আঙুল ফুলে কলাগাছ বলে—এই বেচা মল্লিক শালগাছ হয়েছিল। কাজের শুরুতে চোরও নয়, চোরাই মাল বয়ে আনার মুটে মাত্র। চোরেদের সঙ্গে গিয়ে পদ্ধতিটা তীক্ষ্ম নজরে দেখত। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে সেই মানুষটা কালক্রমে ধুরন্ধর হয়ে উঠল, জলের পুলিস, ডাঙার পুলিস ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে একাদিক্রমে সাত-আট বছর। এমনি সময় তার উপর-রোমহর্ষক এক খুনের চার্জ এল। খুন করা নিয়ম নয় এদের। মহাপাপ—সমাজে অপাংক্তেয় হতে হয় ইচ্ছায় হোক দৈবক্রমে হোক মানুষ খুন হয়ে গেলে। তার উপরে মেয়ে খুন। মেয়েমানুষের উপর তিল পরিমাণ অত্যাচার হলে ওস্তাদের অভিশাপ লাগে, সর্বনাশ ঘটে যায়। সমস্ত জেনে বুঝে বেচারাম মুক্তাময়ী নামে ধনী ঘরের রূপসী মেয়েটাকে খুন করল—যে মেয়ে বেচারামের জন্য পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল। খুন না করে উপায় ছিল না। প্রণয়ে হতাশ হয়ে মেয়েটা দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল পুলিশের কাছে।

সরকার বাহাদুর বেচারামের মাথার মূল্য ধরে দিলেন দু-হাজার টাকা। জীবিত হোক, মৃত হোক, যে জুটিয়ে এনে দেবে তার এই লভ্য। বুঝুন এবারে। যে লোক সিঁধেল চোরের পিছু পিছু ঘুরে বমাল মাথায় বয়ে সমস্ত রাত্রে আটআনা রোজগার করেছে, সেই মাথাটারই আজ এই দাম উঠে গেছে।

পাঁকাল মাছের মতো বিস্তর কাল পিছলে পিছলে বেড়িয়ে অবশেষে একদিন বেচারাম ধরা পড়ল। সরকারের সবচেয়ে মোটা যে পদ্ধতি তারই প্রয়োগে এ হেন প্রতিভাধরের মর্যাদার ব্যবস্থা হল। ফাঁসি। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তুমি দম আটকে মারা যাও—জজের রায়ের বাঁধুনিটা এই প্রকার।

আঁতুড়ঘরে বেচারামের মা মারা গিয়েছিল। মানুষ করেছে সৎমা—যার গর্ভে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের জন্ম। ফাঁসির আগে সেই বিধবা সৎমা দেখতে এল। এমন শক্ত মানুষ বেচারাম, কিন্তু আজ সে হাপুসনয়নে কাঁদছে। সৎমায়ের পায়ের কাছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে : বড় অভাগা আমি মা। বুকের দুধ কত খাইয়েছ, একবার দুধের ঋণ শোধ করে যেতে পারলাম না!

সে এমন, জেলখানার মানুষ যারা পাহারায় ছিল, তারা অবধি চোখের জল ঠেকাতে পারে না। বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার কথা বলে, ছোটবেলা ওর ছায়ায় কত খেলা করেছে। বড় টান ঐ গাছের উপর। বলে, ফাঁসির পর মড়া তোমাদের দিয়ে দেবে মা। তেঁতুল-কাঠে পোড়ায় যেন আমায়। গোড়াসুদ্ধ গাছটা উপড়ে ফেলবে, চিহ্ন না থাকে। পোড়াতে যা লাগে, বাদ বাকি সমস্ত কাঠ গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবে। মাটির উপর ঐ গাছ থাকতে আমার মুক্তি নেই, অপদেবতা হয়ে ডালে বাসা করতে হবে। গাছ থাকলে তোমারও তো যখন তখন আমার কথা মনে আসবে। কাঁদবে নিরালায়।

শেষ ইচ্ছা তেঁতুলগাছ উপড়ে ফেলা, তেঁতুল-কাঠে দাহ করা। উপড়াতে গিয়ে আসল মতলব পাওয়া গেল। তেঁতুলের শিকড়বাকড়ের মধ্যে ঘটিভরা মোহর। বেচারাম পুঁতে রেখেছে। মায়ের দুধের ঋণ শোধ দিয়ে গেল, মৃত্যুর সামনে একমাত্র মায়ের কথাই সে ভেবেছে।

মাকড়িজোড়া সাহেবের হাতের মুঠোয়। যায় কোথা এখন, মালের কোন ব্যবস্থা করে?

বেশ খানিকটা গিয়ে আদিগঙ্গার কিনারে রেলের পুলের পাশে প্রাচীন এক শিবমন্দির, এবং আনুষঙ্গিক বাগানে দু-পাঁচটা ফলসা গাছ। সাহেব ঐখানে পেয়ারা খেতে আসে। বাগানের ধারে সরু গলির সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ঘরে এক খুনখুনে বুড়ো স্যাকরা দিনমানেও প্রদীপ জেলে ঠুকঠুক করে সোনারুপোর গয়না গড়ে। সে বুড়োর যেন খাওয়া নেই, ঘুম নেই—সাহেব যখনই যায়, কাজ করছে সে একই ভাবে। কাজ করে একাকী—এতদিনের মধ্যে একবার মাত্র সেই ঘরে একটি দ্বিতীয় মানুষ দেখেছে।

বড়রাস্তার ভিড়ের দোকানে যেতে ভরসা পায় না, ভেবেচিন্তে ছুটল সেই স্যাকরার কাছে। এমন পার্বণের দিনে ধর্মকর্মে বুড়োমানুষেরই বেশি করে যাওয়ার কথা। সন্দেহ ছিল পাওয়া যাবে কি না যাবে। কিন্তু স্যাকরামশায় ঠিক তার কাজে—মেজের মাটির উপর নিচু হয়ে পড়ে মুচির আগুনে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।

পিছন ফিরে ছিল। চৌকাঠে সাহেব যেইমাত্র পা ঠেকিয়েছে, গুটানো সাপ যেমন করে ফণা তুলে ওঠে, স্যাকরামশায় চক্ষের পলকে তেমনি খাড়া হয়ে মুখ ফেরাল সাহেবের দিকে।

কে তুমি কি নাম? কোথায় থাক? কেন এসেছ, এখানে কী দরকার বল।

সাহেবের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে যায়।

বলে, বস তুমি। মালটাল এনেছ নাকি, না এমনি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?

বাঁচা গেল রে বাবা! সাহেবকে কোন ভূমিকা করতে হল না। বলে, একজোড়া মাকড়ি নিয়ে এসেছি। নেন যদি আপনি।

কার মাকড়ি?

আমার মার।

এ ছাড়া অন্য কি বলা যায়! ঢোঁক গিলে নিয়ে বলে, মায়ের বড় অসুখ, ওষুধ-পথ্যি হচ্ছে না। মা-ই তখন বের করে দিল—

ছোট ছেলের মুখে এত বড় দুঃখের কথা শুনেও স্যাকরা কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে হাসে: বটেই তো! দায়েবেদায়ে কাজে লাগবে বলেই তো গয়না গড়িয়ে লোকে টাকা লগ্নি করে রাখে। অসময়ে বের করে দেয়। তা বস তুমি, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে কাজ হয় না। মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে পড়।

ফুঁ পাড়া বন্ধ করে দু-হাতে ঝেড়েঝুড়ে এবারে ভাল হয়ে ঘুরে বসল বুড়ো: দাও কি জিনিস দেখি—

হাতে নিয়েই ভুরু কুঁচকে তাকায়: তোমার মায়ের বয়স কত বাপধন?

অ্যাঁ—

এই যখন মায়ের গয়না, মা আর বেটা একবয়সি তোমরা। কোন কারিগর গয়না গড়িয়েছে, তার নামটা বল দিকি।

মুচকি হাসছিল এতক্ষণ, এইবার সে দুলে দুলে হাসতে লাগল। সাহেব রাগ করে বলে, এত খবরাখবর কিসের জন্য? পছন্দ হলে উচিত দামে নিয়ে নেবেন। না হল তো তা-ও বলে দিন।

হাসি থামিয়ে স্যাকরা বলে, জিনিসটা হাতে করে এসেছ, পরখ করে তবে দেখিয়ে দিই। মনে আর সন্দ থাকে কেন?

কষ্টিপাথর বের করে মাকড়ির একটা কিনারে ঘষল বার কয়েক। পাথরখানা সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে। সগর্বে বলল, দেখতে পাচ্ছ? পাথর ঠুকে বলতে হয় না, চোখের নজরেই বলে দিতে পারি। জিনিস সোনা নয় বাপধন, পিতল। এই কর্ম করে করে বয়স চার কুড়ি বছর পার হয়েছে, বিরাশিতে পা দিয়েছি। জোচ্চুরি করে পিতল গছাতে এসেছ—বুড়োমানুষটা ধরতে পারবে না, উঁ?

সাহেব আগুন হয়ে বলে, জোচ্চোর আমি নই। কক্ষনো না। না বুঝতে পেরে এসেছি, আমাদেরই ঠকিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিন ওটা, চলে যাই।

স্যাকরা বলে, চটে যাচ্ছ বাপধন। কাঁচা বয়সে মানুষ হয় এমনি রগচটা।

কাঠের হাতবাক্স থেকে দুটো টাকা দিল সাহেবকে: নিয়ে যাও—

পাথরের দাগ দেখে সাহেব কিছু বোঝেনি, সোনা চিনবার বয়স নয় তার। এবার ভাবছে, বুড়োরই ভাঁওতা। বলে, শুধু যদি পিতলই হয়, দাম তবে কিসের।

টাকার সঙ্গে স্যাকরা মাকড়ি দুটোও দিয়ে দিল। বলে, ষোলআনা পিতল—সোনা একরত্তিও নেই। এ জিনিস আর কোথাও বেচতে যেও না। জোচ্চোর ভাববে, গণ্ডগোলে পড়তে পার। নিতান্ত দায়ে পড়েছ বলেই আমার কাছে এসে

উঠেছ। সেটা বুঝি বাপধন। শুধু হাতে ফেরানো যায় না, সেই জন্যে এই সামান্য কিছু। একেবারে দিচ্ছিনে কিন্তু। দান আমার কুষ্ঠিতে নেই, কারবার তাহলে লাটে উঠবে। সময় হলে শোধ দিয়ে যেও। কেমন?

শুনে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। সুধামুখী বলেছিল, মা-কালীকে ডাকবি আজ এই পার্বণের রাত্রে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সত্যিই তো সেই ব্যাপার। ক্ষিধের চোটে ব্যাকুল হয়ে ঠাকরুনের কাছে খেতে চেয়েছিল। মা-কালী স্যাকরা বুড়োর উপর ভর করে চালের দাম দিয়ে দিচ্ছেন। নইলে চেনা নেই, জানা নেই, কে এমন লোক টাকা দেয়! টাকা একটা নয়, দু-দুটো।

বলে, টাকা শোধ দিয়ে যেতে বলছেন—না-ই যদি দিই? নাম একবারটি জিজ্ঞাসা করলেন, তারও তো জবাব নিলেন না।

বুড়ো বলে, জবাব নিয়ে কি করব? নাম একটা বলতে, সেটা বানানো নাম। পয়লা দিন অজানা লোকের কাছে সত্যি নাম-ঠিকানা কেউ বলে না। নিতান্ত হাঁদারাম বলে বলে হয়তো। আমি তোমায় না-ই জানলাম, আমার আস্তানা তোমার জানা হয়ে রইল। শোধ দেবার অবস্থা হলে এইখানে এসে দিয়ে যেও। হাসতে হাসতে আবার বলে, সত্যি কথাই বলেছ, জোচ্চোর নও তুমি—চোর। হ্যাঁ বাপধন, চোখে দেখেই ধরতে পারি, মুখে কিছু বলতে হয় না। যেমন ঐ মাকোড় পাথরে ঠোকার আগেই বলে দিলাম, মেকি জিনিস। নিতান্ত কাঁচা চোর, নতুন কাজে নেমেছ। মাল সরাতে শিখেছ, কিন্তু হাত বুলিয়ে সোনা-পিতলের তফাত ধরতে পার না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কত ছেলে দেখলাম—আজকে আনাড়ি, দুটো দিন যেতে না যেতে পুরো লায়েক। লাইনে যখন এসেছ, আমাদের সঙ্গে কারবার রাখতে হবে। আমার কাছে না এসো, অন্য কোথাও যাবে। টাকা দুটো তোমায় শোধ করে যেতে হবে না। ঋণ নয়, ধরো ওটা দাদন দিয়ে রাখলাম। মাল দিয়ে রমারম টাকা গুণে নেবে, তাই থেকে দুটো টাকা কেটে নেব আমি তখন। তা সে বিশ-পঁচিশ দিনে হোক, আর বিশ পঁচিশ বছরেই হোক।

চাল কিনেছে, তার উপর আলাদা এক ঠোঙায় ডাল একপোয়া। সেই রাজসূয় আয়োজন হাতে করে সাহেব বাড়ি এল। সুধামুখী ফেরে নি। সাহেব পাঁচিল টপকে বেরিয়েছিল ঢুকেছেও, সেই পথে। বড়রাস্তার মোড় হয়ে আসবার উপায় নেই। মা-মাসিরা রয়েছে, ছেলেমানুষের যাওয়ার বাধা আছে এখন। কাঠ-কাঠ উপোসের কথা হচ্ছিল—সেই জায়গায় চাল ফুটিয়ে ভাত বানিয়ে ভরপেট খাওয়া, ভাতের সঙ্গে আবার ডাল। কিন্তু যে-মানুষটি চাল ফোটাবে সাঁদজ্বর নিয়ে বৃষ্টিজলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে এই তো কয়েক পা মাত্র দূরে। গিয়ে সে হাত ধরে টানবেঃ এস মা, আজ-কাল-পরশু তিন দিনের যোগাড় হয়ে গেছে, তিনটে দিন জিরেন নিয়ে অসুখটা সেরে ফেল, রান্নাঘরে এসে নির্ভাবনায় উনুন ধরাও⋯⋯কিন্তু হবার জো নেই।

একসময় সুধামুখী ফিরে এল। একাই ফিরেছে, অবসন্নভাবে থপথপ করে আসছে।

সাহেব ডাকে, মাগো, মাগো, শুতে গেলে হবে না। দেখবে এস—ডাল-চাল এনেছি। রান্না চাপাও এইবার—আমি খাব, তুমি খাবে।

সাহেব উচ্ছ্বাস ভরে বলে, সেই যে তুমি বললে, তার পর মা-কালীকে খুব করে ডাকতে লাগলাম ঃ কত মানুষ এসে তোমায় কত কি ভোগ দিয়ে যাচ্ছে, আজকের দিনটা নিশিপালন করিও না। ঠিক কথাই বলেছিলে মা, পালাপাব্বনের দিন ঠাকুর খুব জাগ্রত থাকেন—ডালা-নৈবিদ্যি-টাকাপয়সা বিস্তর পড়ে তো! আমার দরবার কানে পৌঁছে গেল—চাল আর ডাল দিয়েছেন এই দেখ।

কী রকমটা হল সুধামুখীর—সাহেবের মাথায় হাতখানা রেখে চোখ বোজে। ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে বলছে কি যেন।

সামলে নিয়ে তারপর বলে, কে দিল এসব?

বললাম তো, মা-কালী দিয়ে দিলেন। বুড়োথুখুড়ে একজনের হাত দিয়ে। মানুষটার নাম জানি নে, দেখে থাকি মাঝে মাঝে। আমায় সে কাছে ডাকল—

দিব্যি তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে! নিজের ক্ষমতা দেখে সাহেব অবাক।

মানুষটা কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, মুখ শুকনো তোমার, খাওয়া হয় নি বুঝি? হাত ধরে হিড়হিড় করে দোকানে নিয়ে চাল কিনে দিল। আর খাঁড়িমুসুরির ডাল। তার মধ্যে ঠিক ঠাকুর ভর করেছিলেন, মানুষে তো এমন করে না। কি বল মা?

খাওয়াদাওয়া বেশ হল মাকালীর দয়ায়। চালই যখন জুটেছে, ভাদ্দুরে অমা-বস্যায় উপোসি থেকে পুণ্যার্জনের কথা আর ওঠে না।

খেয়েদেয়ে সাহেব গঙ্গার ঘাটে চলল। বাইরে বাইরে ঘোরে এ-সময়টা—ঘাটে যায়, রানী ঘুমিয়ে না পড়লে যায় সেখানেও। অনেক রাত্রি অবধি ঘোরাঘুরি করে তারপর একসময় শুয়ে পড়ে।

আজ সুধামুখী মানা করল ঃ যাসনে কোথাও সাহেব। ঘর খালি, কী দরকার? সকাল সকাল আমার পাশে আজ শুয়ে পড়।

মা-কালী এমনি যদি দয়া করে যান আর কয়েকটা বছর! না আর ছেলে নিত্যি-দিন তবে সন্ধ্যারাত্রে শুয়ে পড়বে। সাহেব বড় হয়ে গেলে তখন তো মজা—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগার খাবে। খাওয়াচ্ছে ছেলে সেই তো ক'দিন বয়স থেকে। অল্পবয়সে বিয়ে দেবে সাহেবের—টুকটুকে বউ আনবে, ঘুরঘুর করে বউ বাড়িময় বেড়াবে……

শুয়ে পড়েছে সাহেব বড়খাটের একপাশে। মাকড়িজোড়া গাঁটে, পাশ ফিরতে বারবার গায়ে ফুটছে। ঝুটো গয়না গাঁটে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাই ভাবে। গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেই আপদের শান্তি।

সুধামুখীকে বলে, রানী ঐ যে গয়না পরে বেড়ায়, ও কি সোনার গয়না?

সোনা ছাড়া কি—

উঁহু, সোনা নয়। ওরা সব বলছে পিতল।

ওরা কারা সে প্রশ্ন সুধামুখী করে না। এক বাড়িতে এতগুলো মেয়ে—পরের

সাচ্চা গিনিসোনাও ঠোঁট উলটে পিতল বলে দেয়। নিজের ভাবনায় সে ব্যস্ত, নিস্পৃহ-ভাবে বলে, হতে পারে—

পরে তো পিতল, তবে তার অত দেমাক কেন?

সোনা কি পিতল রানী অতশত কি করে বুঝবে? সোনা না দিয়ে থাকে তো ভালোই করেছে। ছোট মেয়ে কি যত্ন জানে? হারাবে, হয়তো বা ধোঁকা দিয়ে নিয়ে নেবে কেউ। গয়না পরেছে না গয়না পরেছে—ছেলেমানুষের মন ভুলানো। তুই কিছু বলতে যাবি নে, কিন্তু সাহেব। রানী কষ্ট পাবে, পারুলও রাগ করবে।

সাহেব বলে, দাম নাকি দশ টাকা। পঁচিশ টাকা। দশ-পঁচিশ খেলে তো, লম্বা লম্বা অঙ্ক তাই শিখে ফেলেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ সে অন্য কথায় চলে যায়ঃ ফলা-নানান রপ্ত হয়েছে মা, গড়গড় করে পড়ে যেতে পারি। অঙ্ক শিখব আমি এবারে, কাল থেকেই—উঁ?

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, আচ্ছা। সায় না দিলে ভ্যানর-ভ্যানর করবে, ঘুমুবে না।

তখন সাহেব ভাবছে, ভাল করেছি মাকড়ি গঙ্গায় না ফেলে। গয়না ঝুটো কি সাচ্চা, রানী সেটা জানে না। কোনদিন জানবে না। এক ফাঁকে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে মাকড়িজোড়া রেখে আসব।

সকালেও সাহেব পারুলের ঘরের দিকে যায় নি। ঘাটে একাকী বসে। ওপারে বড় বড় আড়ত। লগি বেয়ে দূরদেশের ভারী ভারী নৌকো হেলতে দুলতে গজেন্দ্র-গতিতে আড়তের সামনের ঘাটে লাগে। দালাল-পাইকারের ভিড় জমে যায়। নৌকোর খোল থেকে বস্তা টেনে টেনে গলুয়ের উপর ফেলছে। চালের বস্তা ডাল-কলাইয়ের বস্তা লঙ্কা-হলুদের বস্তা। খচখচ করে বস্তায় বোমা মেরে চাল-কলাইয়ের নমুনা বের করে দেখে। সুঁচাল-আগা লোহার শলাকা, নালার মতন টানা-গর্ত শলাকার উপরে —এই হল বোমাযন্ত্র। মেরে দাও বোমা বস্তার উপর—নালা বেয়ে ঝুরঝুর করে কিছু মাল বেরিয়ে আসবে। বারম্বার এদিক-সেদিক মেরে পরখ করে দেখে, সর্বত্র একই মাল কি না। নমুনা হাতে নিয়ে আড়তের দালাল দরদাম করেঃ কত? ফাঁকা-ফুকো বলো না ভাই—

আঠারো সিকে—

আঁতকে ওঠে দালাল লোকটাঃ অ্যাঁ, মুখ দিয়ে বেরুল কেমন করে ব্যাপারি? আঠারো সিকে মনের চাল কেন খেতে যাবে লোকে? চাল না খেয়ে সোনা খাবে, রুপো খাবে। বাজে বলে কি হবে, পুরোপুরি চার। যাকগে থাক, আর দু-গণ্ডা পয়সা ধরে দেব। খুন করলেও আর নয়।

দরে বনল তো মুটেরা মাথায় তুলে ওপারের রাস্তাটুকু পার হয়ে গিয়ে বস্তা ধপাধপ ফেলছে আড়তের গুদামে।

সাহেব বসে বসে দেখছে। রানীর কাছে যায় নি, রানীই দেখি ঘাটে এসে দাঁড়াল। হাসি নেই মুখে, মন-মরা ভাব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব জানে সমস্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে রানী?

রানী ঘাড় নেড়ে বলে, কিছু না—

হয়েছে বই কি! তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি। লুকোলে শুনব না।

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ হবে আবার কি! সর্দারি করতে তোকে কে ডাকছে?

তারই জন্যে রানীর মনোকষ্ট, সাহেব পুড়ে যাচ্ছে মনে মনে। দুটো-চারটে ভাল ভাল কথা বলে প্রবোধ দেবে, কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা শুনতে হয় রানীর মুখে। নয় তো আজামোজা কিসের উপর বলে? রানী যতবার ঝেড়ে ফেলে দেয়, সাহেব তত আরও খোশামুদি করছে।

বল্ না, বল আমায়। কাউকে বলব না। যে দিব্যি করতে বলবি করছি!

রানী নরম হয়ে ছলছল চোখে বলে, মাকড়িজোড়া পাচ্ছি নে। তাকের উপর পুতুলের বাক্সে রেখেছিলাম।

রাখলি তো গেল কোথা! কাকাতুয়া নয় যে উড়ে পালাবে। মনের ভুলে অন্য কোথায় রেখেছিস, দেখ ভেবে।

পুতুলের বাক্সে রেখেছিল, রানীর স্পষ্ট মনে আছে। সাহেবের কথায় তবু দ্বিধা এসে যায়। রাখতেও পারে অন্য কোথাও, এখন মনে পড়ছে না। মা যদি জানতে পারে গয়না পাওয়া যাচ্ছে না, কেটে আমায় চাক-চাক করবে। এই সেদিন একগাদা টাকায় কিনে দিয়েছে।

কচু! সাহেবের মুখে এসে পড়েছিল আর কি—তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। মেনেই নিল রানীর কথা, একগাদা টাকায় কেনা ঐ বস্তু।

বিপদের বন্ধু ভেবে রানী সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইছেঃ কী করি বল তো সাহেব, বুদ্ধি বাতলে দে। কখন মা খোঁজ করে বসবে, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

সাহেব একটুখানি ভাবনার ভান করে বলে, ঠাকুরকে একমনে ডাক।

কে ঠাকুর?

বোকার মতন কথায় সাহেব খুব একচোট হেসে নেয়ঃ আরে আরে, ঠাকুর জানিস নে? ঈশ্বর ভগবান মা-কালী মহাদেব কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী গরুড় ঘণ্টাকর্ণ —দু-দশজন নয়, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর, ক'টা নাম করি। যে নামে ইচ্ছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ঃ ঠাকুর, মাকড়ি পাচ্ছি নে, খুঁজে-পেতে এনে দাও। কালীঘাটে মা-কালীর এলাকা—তাঁকেই বরঞ্চ ধর চেপে।

রানী বলে, মা-কালী খুঁজে দেবেন?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, আলবৎ। ভক্ত যদি ঠিক মতো ধরতে পারে, আবদার রাখতেই হবে মাকে। আমার কি হল—রাত্রে চাল আর খাঁড়িমুসুরি ডালের কথা বললাম মা-কালীকে। ঠিক অমনি জুটিয়ে দিলেন। রান্নাটা শুধু করে নিতে হল মাকে। ডেকেই দেখ না মনপ্রাণ দিয়ে। ফল না পাস তো বলিস।

ফলটা ঠিক হাতে-হাতে নয়, সন্ধ্যা অবধি সবুর করতে হল। বড়ঘরের পাশে ছোট্ট একটু ঘর, তার মধ্যে পারুলের বাক্স-পেঁটরা—কাকাতুয়ার দাঁড়, পানের সরঞ্জাম, হাঁড়িকলসি, গুচ্ছের আজেবাজে জিনিস। সন্ধ্যার পর এ-বাড়ির অন্য সকলের মতো পারুলও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রানী গিয়ে জোটে তখন ঐ ঘরে। ঘরের দেয়ালে মাকালীর

পটের উপর মাথা ঠুকছে—জোর তাগাদা, গড়িমসি করলে ভক্তির চোটে পটের অধিকক্ষণ আস্ত থাকার কথা নয়। সেই শঙ্কাতেই বুঝি জানলা দিয়ে মা টুক করে ফেলে দিলেন, রানী ছুটে গিয়ে কুড়াল জিনিসটা—তাই তো রে, সেই মাকড়ি!

কী আহ্লাদ রানীর! জাগ্রত ঠাকুরের কাজ-কারবার দেখে অবাক হয়ে গেছে। খবরটা সাহেবকে জানাতে হয়, না জানানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। কোথায় এখন পাওয়া যায় সাহেবকে?

সেই গঙ্গার ঘাটেই। বড় এক সাঙড়নৌকো ভাটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে। মাঝি বাজার-হাট করতে নেমে পড়েছিল, সওদা করে ফিরল এবার। কাদা ভাঙতে নারাজ। জোয়ারের জল তোড়ে এসে ঢুকছে। নৌকো এক্ষুনি ভেসে উঠবে, পাড়ে এসে লাগবে। মাঝি ততক্ষণ ঘাটের উপর অপেক্ষা করছে। সাহেব কেমন করে বুঝে পাকড়াও করছে তাকে: গল্প বল। মাঝিমাল্লারা দূর-দূরান্তর ঘোরে, দেশ-বিদেশের মজার মজার গল্প শোনা যায় তাদের কাছে; হতে হতে রাজা দুয়োরানী সুয়োরানী রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্র ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীদের রূপকথা। রানীও এসে পড়ে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে।

জোয়ারে নৌকো ভেসে ইতিমধ্যে ঘাটে এসে যায়। গল্প থামিয়ে মাঝি এক লাফে কাদা ডিঙিয়ে উঠে পড়ল।

রানী এইবার সুখবর জানায়: মাকড়ি পাওয়া গেছে সাহেব। কানে পরে এসেছি দেখ্ সেই মাকড়ি।

খুশিতে ঘাড় নেড়ে মাকড়ি দুলিয়ে দেখাল। বলে, মোক্ষম বুদ্ধি বাতলে দিলি তুই। যেমন যেমন বলেছিলি ঠিক সেই কায়দায় চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। আরো একটা জিনিস চেয়ে দেখব। মার কাছে কদ্দিন থেকে চাচ্ছি, দেয় না। ভাবছি, মাকে না বলে যা-কিছু দরকার মা-কালীকে বলব এবার থেকে।

সভয়ে সাহেব বলে, একবার হল সে-ই ঢের। ঠাকুর-দেবতাকে বার বার কষ্ট দিতে নেই।

মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে রানী সাহেবের আপত্তি উড়িয়ে দেয়: ওঁদের আবার কি কষ্ট? নড়তেও হবে না জায়গা থেকে। ইচ্ছাময়ী মা—ইচ্ছে করলেই অমনি এসে পড়বে। বেশি কিছু চাচ্ছিনে তো, চুলের ভেলভেট-ফিতে এক গজ।

ভাটার সময় আদিগঙ্গায় জল থাকে না। সেই সময় ঝিঙে ও আর তিন-চারটের সঙ্গে সাহেবও কাদা ভেঙে ওপারে গিয়ে ওঠে। পুরুষোত্তম সা'র চালের আড়ত, মস্তবড় টিনের ঘর। গাঙের খালের নৌকো থেকে বস্তা বস্তা চাল মাথায় মুটেরা গুদামে নিয়ে ফেলছে। মাঝখানের রাস্তাটা পার হয়ে যায়। চলছে তো চলছেই—পিঁপড়ের সারির মতো বওয়ার আর শেষ নাই। বস্তায় বস্তায় গুদামঘরের ছাদ অবধি ঠেকে যায়। ওরে বাবা, কারা খাবে না জানি গুদোম ভীত এত চাল।

পুরুষোত্তমবাবুকে দেখা যায় রাস্তা থেকে। ঢুকবার দরজার ঠিক পাশে জোড়া তক্তাপোশ—কাঠের হাতবাক্স সামনে নিয়ে তিনি তার উপরে বসেন। ডাইনে বাঁয়ে আর দু'জন ঘাড় গুঁজে বসে তারা খাতা লেখে। বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় টাক—খালি

গায়ে থাকেন পুরুষোত্তম প্রায়ই, খুব বেশী তো হাত-কাটা ফতুয়া একটা। গলায় সোনার মোটা চেন, ডান হাতে চৌকো সোনার চাকতি এবং তামা লোহা ও রুপোর একগাদা মাদুলি। হাত নাড়তে গেলে খড়বড় আওয়াজ উঠে। নাড়তেই হয় সেই হাত অনবরত। হাতবাক্স খুলে নোটে টাকায় এই এককাঁড়ি মাঝিদের দিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই পাইকারদের কাছ থেকে টাকা-নোটের গাদা গুণে নিয়ে হাতবাক্সে ঢোকাচ্ছেন। গাঙের জোয়ার-ভাটার মতো সারা দিনমান এই কাণ্ড চলে। ওরে বাবা এত টাকা একসঙ্গে এক বাক্সের ভিতর মানুষ জমিয়ে রাখে। চাল খুঁটতে আসে সাহেবরা। নৌকো থেকে গুদামে উঠবার সময়।

বস্তা গলে দু-চারটে চালের দানা পড়ে! কাঁচাচোখের ছোঁড়াগুলো পথের ধুলো থেকে একটা একটা করে খুঁটে কোঁচড়ে তোলে। পাখি যেমন করে ঠোঁট দিয়ে তুলে তুলে নিয়ে খায়। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিও প্রচণ্ড। সকলের বড় বজ্জাত ঝিঙেটা—

ফণী আড্ডির বেটা তুই কেন এসব ছ্যাঁচড়া কাজে আসিস?

এ রকম প্রশ্নে ঝিঙে হি-হি করে হাসেঃ বাবার সংসারে শুধু খাওয়া-পরার বরাদ্দ। এই যা হল, নিজের রোজগার। বিড়িটা-আসটার খরচা কোথা থেকে আসে? শুধু বিড়িতে শোধ যায় না, মুখের গন্ধ মারতে এলাচ-দানা চিবুই। গৎমা বেটি মুকিয়ে থাকে—হাঁ কর্ তো দেখি। মুখ শুঁকে কিছু পেলে বাবাকে অমনি বলে দেবে। ভাতের বদলে সেদিন মার—

খরচা বেশি বলে ঝিঙের প্রতাপটাও বেশি। একটা দানা দেখলে তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে অন্যের সামনে থেকে। অন্য কারো কিছু হতে দেবে না, রাস্তাটুকুর উপর সর্বক্ষণ যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

কথা হল, জায়গার বাটোয়ারা হয়ে যাক তবে। একটা ডাল ভেঙে এনে রাস্তার উপরে দাগ দিয়ে নেয়—এখান থেকে এই অবধি ঝিঙের সীমানা। এই অবধি সাহেবের, এই অবধি অমুকের—। যার কপালে যা পড়ে, এলাকার বাইরে কেউ যাবে না।

বলিহারি সাহেবের কপালজোর! ভাগাভাগির পর প্রায় তখনই একটা বস্তার ছিদ্র খুলে তার লাইনের ভিতরে ঝুরঝুর করে গাল পড়ে। মুটে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হাত চাপা দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা পড়েছে, সে-ও এক পর্বত—পুরো মুঠোর কাছাকাছি। ঝিঙে তড়াক করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, অনাগুলোও সঙ্গে আছে। সাহেব যা তুলে ফেলেছিল, কোঁচড়ে হেঁচকা টান দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

এ কি, আপোস-বন্দোবস্ত এই যে হয়ে গেল—

সে হল ছিটেফোঁটার বন্দোবস্ত। এখন যদি হুড়মুড় করে স্বর্ণবৃষ্টি হয়, সে-ও তুই একলা কুড়োবি নাকি?

শয়তান মিথ্যেবাদী, মরে গিয়ে কালীঘাটের কুকুর হবি তোরা—।

কিন্তু মৃত্যুর পরের ভাবনা নিয়ে আপাতত কারো মাথাবাথা নেই, মাটিতে পড়া সাহেবের চাল তাড়াতাড়ি খুঁটে তুলে নিচ্ছে। সাহেব পাগলের মতো গিয়ে পড়ল তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

চেঁচামেচিতে গদির উপর পুরুষোত্তমবাবুর নজর পড়েছে। এই, শুনে যা—।

বাঁহাতের আঙুল নেড়ে ডাকলেন।

আছে মোট পাঁচজন, দুঃসাহসী ঝিঙে এগিয়ে যায়। পুরুষোত্তম খিঁচিয়ে ওঠেন ঃ আগ বাড়িয়ে এলি, তোকে কে ডাকে রে হাঁড়ির তলা? ঐ যে, ঐ ধবধবে ছেলেটা—ওকে ডাকছি।

সাহেবকে ডাকেন। ঘোর কালো বলে ঝিঙেকে বললেন হাঁড়ির তলা। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এমন তাকান পুরুষোত্তম, বুকের ভিতর গুরগুর করে। সাহেবের ডাক হল তো দিয়েছে সে চোঁচা-দৌড়—

পরের দিন কাজে আছে, পিছন দিক থেকে কে এসে চটিসুদ্ধ পা তুলে দিল সাহেবের পিঠের উপর, এই ছোঁড়া—

মুখ ফিরিয়ে দেখে পুরুষোত্তম। সর্বনাশ, বাবু নিজে বেরিয়ে পড়েছেন যে!

ছোঁড়া তোকে কাল ডাকলাম, গেলি নে কি জন্যে?

সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকায়! পুরুষোত্তম অন্যদের দিকে ফিরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ বড্ড স্ফূর্তি বেধেছে। আমার চাল পড়ে যায়, সেই সমস্ত তোরা নিয়ে যাস। পালা, পালা—নয় তো পুলিসে দেব।

অপমানিত জ্ঞান করল ঝিঙে—কাল বলেছে হাঁড়ির তলা, এখন এই। ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ায় ঃ চেঁচামেচি করেন কেন মশায়? সরকারি রাস্তা—পড়ে পেলাম খুঁটে নিলাম। আপনার গুদোম থেকে যদি নিতাম, কথা ছিল।

সরকারি রাস্তা—বটে! মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আস্পর্ধা!

দরজার ধারে লাঠি হাতে দরোয়ান বসে থাকে, রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। পুরুষোত্তম তাকে বললেন, তেড়ি দেখেছ এইটুকু ছেলের! লাঠি পিটে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে! বলছে সরকারি রাস্তা। সরকার বাবা ওদের—ঠেকাক এসে সেই সরকার।

দু-হাতে লাঠি তুলে দারোয়ান লম্ফ দিয়ে পড়ে। দৌড়, দৌড়। আর তিনজন উধাও, বেপরোয়া ঝিঙে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে চেঁচাচ্ছে ঃ দেখে নেব। পাড়ায় পাবো না কোনদিন? ইট মেরে তোমার টাক ভাঙব।

দারোয়ান তেড়ে যেতে একেবারে অদৃশ্য। পুরুষোত্তম গর্জন করেন ঃ উঃ, এখনই হ্যাপ-গুণ্ডা। দেখতে পেলে ঐ ছোঁড়ার ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবে, পাকা হুকুম আমার।

সাহেবও পালাবে, উঠে পড়েছিল। হাত এঁটে ধরে আছেন পুরুষোত্তম। ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কেঁদে পড়ল সাহেব ঃ আর কক্ষনো আসব না, কোনদিনও না। কান মলছি বাবু, নাক মলছি। ছেড়ে দিন।

পুরুষোত্তম হেসে ফেলেন ঃ আসবি নে কি রে? তোর জন্যেই তো তাড়ালাম ওগুলো। এটা তোর রাজ্যপাট। দেখি, কতগুলো হল আজ।

কোঁচড় নেড়ে চালের পরিমাণ দেখলেন। হতাশ সুরে বলেন, এই? রোদে তেতেপুড়ে মুখ যে টকটক করছে—এত কষ্টের এই লভ্য? চিল-কাকগুলোকে এই জন্যে তাড়ালাম, এখন তুই একেশ্বর। হ্যাঁরে, থাকিস কোথা তুই? কে কে আছে?

আঙুল তুলে সাহেব ওপারে দেখায়। পুরুষোত্তম ঘাড় বাঁকিয়ে নিরিখ করে দেখছেন ঃ কোনটা রে? ঐ তো ফণী আড্ডির বস্তিবাড়ি—আড্ডির বস্তিতে থাকিস বুঝি? নতুন এসেছিস?

নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেন, কত ঘোরাঘুরি ছিল। ব্যবসা জেঁকে ওঠার পর ইস্তফা পড়ে গেছে। দূর দূর, টাকার নিকুচি করেছে, রসকষ কিছু আর থাকে না জীবনে। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখেছ কি বারো শত্তুর অমনি ফুসুর-ফুসুর করবে ঃ শামশার তাকাচ্ছেন।

একটা আধুলি হাতে গুঁজে দিলেন পুরুষোত্তম। বলেন, কাল থেকে একলা হলি, পুষিয়ে যাবে। অন্য কেউ ঢু' মারতে এলে দরোয়ানকে বলবি, লাঠিপেটা করে পোল পার করে দিয়ে আসবে। হুকুম দেওয়া আছে আমার।

বড় ভাল লোক, বড্ড দয়া। সাহেবের মনে এলো, বাপ হতে পারে—এই মানুষটাও। নয়তো এত টান কিসের? আদিগঙ্গার উপর বাসা—পুঁটলি বেঁধে ছেলে ভাসানো কাজটা অতি সহজে এরা পারে।

গাঙে এখন ভরা জোয়ার, পোল ঘুরে যেতে হচ্ছে। পোলের মুখে দেখে ঝিঙেরা চারজন। পুরুষোত্তমকে কবে পায় না পায়—উপস্থিত তাঁর পেয়ারের মানুষ সাহেবের উপরেই কিছু শোধ তুলবে বোধহয়। কোন কায়দায় সরে পড়া যায়, সাহেব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঝিঙে বলল, ঘরে ঢুকিয়ে মারধোর দিল বুঝি তোকে? তাই দাঁড়িয়ে আছি।

সর্বরক্ষে রে বাবা! নাক ফোঁত-ফোঁত করে হাঁ করে বলে দিলেই চুকে যায়, সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায় ফস করে। এই বড় মুশকিল সাহেবের, সামান্য মিথ্যে কথা বলতেও পারে না—বিস্তর কসরতের পর তবে হয়তো একটা বেরুল। তার জন্যে নানান রকম মহলা দিতে হয় মনে মনে। বাপ-মা ঠিক সত্যবাদী ছিল—ছেলে বাপ-মায়ের মতন হয়, সেই জন্য তার বিপত্তি।

সাহেব সত্যি কথাই বলল, ও রাস্তায় একলা আমি চাল খুঁটব, ডেকে নিয়ে তাই বলে দিল।

বলেই ভয় হয়েছে। ভয়ে ভয়ে আজকের সমস্ত চাল কোঁচড় থেকে ঢেলে দেয়। চাল ঘুস দিয়ে ভাব জমাচ্ছে। বলে, তোদের তো ভালই রে, সারা বেলাস্ত রোদ-পড়া হতে হবে না। নিত্যিদিন এইখানটা এসে আমি ন্যায্য ভাগ দিয়ে যাব। সকলে মিলে আশাসুখে রোজগারে আসি—পুরুষোত্তমবাবু একচোখা, তা বলে আমরা কেন তার মতন হতে যাই।

ঝিঙে তবু প্রবোধ মানে না। নজরে পড়ে, ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। ঐ রকম ডাকাত ছেলে, ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল সহসা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, চেহারার গুণে তোর আদর। হাঁড়ির তলা বলে হেনস্থা করল—ঐ পুরুষোত্তম শালাও তো কালো। আমি যদি ওর ছেলে হতাম, এমন কথা বলত কখনো!

চালগুলো দিয়েথুয়ে সাহেব বাসায় ফেরে। ভাগ করে নিয়ে নিক ওরা।

আধুলিটা তার আছে। ভাগের ভাগ যে চাল পেত, আধুলি তার অনেক উপর দিয়ে যায়।

কিন্তু সে আধুলিও বুঝি রাখা যায় না। বাসায় পা দিতেই রানী এসে ডাকল, শোন সাহেব একটি কথা। শিগগির শুনে যা।

রানী ঝগড়া করে: ফাঁকি কথা বললি কেন সাহেব? মা-কালী কিচ্ছু নয়, একেবারে বাজে। ভেলভেট-ফিতের কথা বলছি, শখ হল জিনিসটার উপর। কত আর দাম শুনি? এদ্দিনের মধ্যে দিতে পারলেন না।

বিপদের কথা বটে! মেয়েটার কালী-পদে মতি নেওয়াচ্ছে, সেই কালীরই পশার থাকে না। সাহেবের নিজেরও পশার নষ্ট। এর পর কোন কথা বললে রানী কি আর মানতে চাইবে?

সমস্যায় পড়ে গিয়ে আপাতত সামাল দেওয়ার কথা বলে, দূর, তাই হয় নাকি রে! এত বড় পৃথিবী সৃজন-পালন করছেন, এক গজ ফিতে দিতে পারেন না তিনি! তোরই দোষ, একমনে তেমনভাবে ডাকতে পারিস নে।

রানী তর্ক করে: পারি নে তো সেদিন মাকড়িজোড়া আদায় করলাম কেমন করে? সেদিন যে সমস্ত কথা যেমন করে বলেছিলাম, ঠিক ঠিক তাই তো বলি।

ইতিমধ্যে সাহেব অজুহাত খুঁজে পেয়েছে। বলে, মাকড়ি যা বললে হয়, ফিতে তাতে কেন হবে? মালে তফাৎ রয়েছে না? বলি, কার্তিকপুজোর যে মন্তোর লক্ষ্মীপুজোর কি তাই? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পারুলমাসিকে দেখ জিজ্ঞাসা করে।

জিনিসটা এতেই সরল যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। রানী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল: তবে কি হবে? ফিতের জন্য কোন কায়দা করতে হবে, বলে দে আমায়।

বারম্বার চাচ্ছিস তো, তোয়াজটা বাড়িয়ে করাই ভাল। কথাবার্তা নয়, মন্তোর। সে মন্তোর আমার কাছে আছে।

সাহেব ছুটে গিয়ে নিজের ভাণ্ডার থেকে মন্ত্র নিয়ে আসে। এক রকমের সিগারেট বাজারে খুব চালু—কালী সিগারেট। পুরুষোত্তমবাবু খুব খান। শেষ হয়ে গেলে বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে। সাহেব কয়েকটা কুড়িয়ে এনেছে। মা-কালীর ছবি বাক্সের উপর। হাতে খাঁড়া আর কাটা-মুণ্ড, গলায় মুণ্ডমালা, মাথার চুল সমস্ত পিছনটা কালো করে পদতল অবধি নেমে এসেছে। শিবঠাকুরের বুকের উপর—লজ্জায় সেজন্য টকটকে জিভ কেটে আছেন। ঠিক যেমনটি হতে হয়, একেবারে সত্যিকার মা-কালী। ছবি ছিঁড়ে সাহেব সেঁটে দিয়েছে ঘরের দেয়ালে। পরে লক্ষ্য হল, ছবি ছাড়াও স্তব ছাপা রয়েছে বাক্সের ওদিকটায়। ভারি চমৎকার। সুধামুখীকে দিয়ে কয়েকবার পড়িয়ে নিল, এখন সাহেবের আধ-মুখস্থ। বস্তুটা সামনে রেখে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। রানীকে তাই শোনাচ্ছে:

করালবদনা কালী কল্যাণদায়িনী
কাতরে করুণা দান করেন জননী।

বঙ্গবাসী জনে দেখি সিগারেটে রত
শ্বাসকাস আদি ক্লেশে ভোগে অবিরত
ব্যথিত হৃদয়ে মাখা দয়া প্রকাশিল
সিগারেট রূপে এবে সুধা বিতরিল।

রানী সন্দেহ ভরে বলে, এ তো সিগারেটের মন্তর। ফিতের কথা কই ?

সিগারেট পালটে ফিতে বললেই হল। চানটান করে শুদ্ধ কাপড়ে শুদ্ধ মনে দেখ না বলে। না খাটে তো তখন বলিস।

পরের দিন চুলে ফিতে পরে বাহার করে রানী মন্ত্রের ফল দেখাতে এল।

ডাকাবুকো মন্তোর গো সাহেব। বেড়ে জিনিস শিখিয়েছ, আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। আজকে আমি একপাতা সেপটিপিন চাইব। সিগারেট পালটে ফিতে বললে হল, ফিতে পালটে সেফটিপিন বললেই বা কেন হবে না ?

যুক্তি অকাট্য। এবং এক পয়সার একপাতা সেফটিপিন জোগানো মা-কালীর পক্ষে কঠিনও নয়। কিন্তু একনাগাড় এমনি যদি চলে, তবে তো সর্বনাশ। চললও ঠিক তাই। সেফটিপিন হল তো মাথার কাঁটা, চিরুনি, গায়ে-মাখা সাবান। যা গতিক, কালীঠাকরুনকে পুরো এক মনোহারি দোকান খুলতে হয় রানীর জিনিস যোগান দেবার জন্যে।

(মায়া-অঞ্জনের খবরটা জানা থাকত যদি ! পরবর্তীকালে সকৌতুকে সাহেব কত সময় ভেবেছে। রানীর আবদার চক্ষের পলকে তাহলে মেটানো যেত। এই কাজল চোখে দিয়ে চোর অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কেউ দেখে না, সে কিন্তু দেখতে পায় সকলকে। সেকালের পুঁথিপত্রে অঞ্জনের গুণপনার কাহিনী—গুরুকে বিস্তর সেবা করলে তবে তিনি এই বস্তু দিতেন। মক্কেল মালপত্র রেখেছে—মাটির নিচে হোক, বাক্স-পেঁটরার ভিতরে হোক, অঞ্জনের গুণে স্পষ্ট নজরে আসবে। নেওয়ারি ভাষায় এক পুরানো পুঁথি—পণ্ডিতেরা বলেন, হাজার বছরের মতো বয়স—ষণ্মুখকল্প। ছয়-মুখওয়ালা কার্তিক হলেন চোরের দেবতা—তাঁর নামের পুঁথি। মায়া-অঞ্জন তৈরির পদ্ধতিও তার মধ্যে। বলাধিকারী চৌরশাস্ত্র নিয়ে পড়েছেন তো আদ্যন্ত না দেখে ছাড়বেন না। খবর পেয়ে বিস্তর কষ্টে পাঠোদ্ধার করে যাবতীয় মন্ত্র লিখে নিয়ে এলেন। অশুদ্ধ ভাষা হলেও মন্ত্রের পাঠে তিলপরিমান হেরফের চলবে না। মায়া-অঞ্জনের মন্ত্র : ওঁ চন্দ্রসূচ্যময়ন্দৃষ্টি দেবনির্মিতং হর হর সময় পুরয়ঃ হুং স্বাহা। উপকরণও এমন-কিছু দুর্লভ নয়। উলুক অর্থাৎ পেঁচার বসা, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আতপ চাল এবং কপিলাঘৃত। কপিলাঘৃত বস্তুটা জানা নেই। সমস্ত একত্র করে জ্বালিয়ে তেল বানাবেন। পদ্মসূত্রের সলতেয় নর-কপালে ঐ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজল পাড়ান, আর মন্ত্রটা এক-শ বার জপ করে ফেলুন। মায়া-অঞ্জন তৈরি হল—চোখে দিয়ে দেখুন মজাটা এবার। যা দিনকাল পড়েছে, গুণীরা দেখুন না পরীক্ষা করে।)

ধৈর্য হারিয়ে সাহেব একদিন বলে, কত আর চাইবি কালীর কাছে ? ইতি দে এবারে। যখন তখন মা'কে মুশকিলে ফেলবিনে।

ভ্রূভঙ্গি করে রানী বলে, মা-কালী তো আমাদের মতন নন। সিকি পয়সা খরচা নেই মায়ের—ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করলেই এসে যায়। তাঁর আবার মুশকিলটা কি ?

সাহেব আমতা আমতা করে ঃ তা হলেও ভাববেন, মেয়েটা বড্ড হ্যাংলা। বিরক্ত হয়ে শেষটা দেওয়া একেবারে বন্ধ করবে দেখে নিস।

এতদূর রানী তলিয়ে দেখেনি। মা-কালীর কাছে বদনাম হয়ে যাচ্ছে বটে। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, এবারে চটিজুতোর আবদার করে বসেছি সাহেব। দিয়ে দিন একজোড়া। তার পরে আর মা-কালীর নামটাও মুখে আনছি নে। ইহজন্মে নয়। কী দরকার ! মা হয়তো ভেবে বসবেন, আবার কোন মতলব আছে মনে মনে। নয়ত ডাকে কেন ?

ঘাড় দুলিয়ে জোর দিয়ে বলল, এই আমার শেষ চাওয়া। টুকটুকে লাল চটি, মাখনের মত নরম। বড়লোকের ঘরের ভাল ভাল মেয়ে-বউরা এই চটি পরে আসে। নাটমণ্ডপের নিচে খুলে রেখে মন্দিরে ঢোকে। দেখে এসো একদিন সাহেব, কী সুন্দর !

দেখতে যেতে হয় অতএব সাহেবকে। জুতোচুরির ভয়ে ভক্তেরা সবসুদ্ধ মন্দিরে ঢোকে না, একজনকে রেখে যায় জুতোর পাহারায়। ব্যাপার বুঝুন। একবাড়ি মানুষ ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, মন্দিরে ঢুকে সবাই ঠাকুর-দর্শন করছে তার মধ্যে একজনই কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে তাক করে আছে সকলের পায়ের জুতোয়। যে যেমন কপাল করে আসে।

অবশেষে চটিজুতোও দিয়ে দিলেন মা-কালী। রানীর পায়ে ঢলঢলে হয়, জিনিসটা তবু পছন্দসই।

হল কি সাহেব, চুরি যে একের পর এক চলল ! পয়লা বার সুধামুখীর কষ্ট দেখে, তারপরে রানীর আবদারে। যে রানীকে সাহেবের বউ বলে সকলেই ক্ষেপায়। রানীও বউয়ের মতন সলজ্জ ভাব দেখায় লোকের সামনে। মায়ের জন্য চুরি, আর বউয়ের আবদার রাখতে চুরি।

ঠিক দুপুরে সাহেব চাল খুঁটছে আড়তের সামনের রাস্তায়। একেশ্বর এখন—তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে খুঁটে খুঁটে তুলে নেওয়া। জুতো মশমশ করে বাবু একজন এল। কতই তো আসে পুরুষোত্তমবাবুর কাছে কাজকর্ম নিয়ে। সাহেব আপন মনে চাল কুড়িয়ে যাচ্ছে।

কে রে, সাহেব না তুই ?

বাদার জঙ্গলে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাঝিদের কাছে সাহেব গল্প শুনেছে। তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবুলোকটা সাহেবের চুলের মুঠি ধরে। তাকিয়ে দেখে, অন্য কেউ নয়—নফরকেষ্ট। এতকাল পরে রাস্তার উপরে হঠাৎ উদয়। চুল এঁটে ধরে প্রকাণ্ড চড় উঁচিয়েছে—

চেহারায় নফরকেষ্ট সত্যি সত্যি বাঘ। অথবা বুনো হাতী। ছেলেমানুষ

সাহেব বলে নয়, বড়রাও আঁতকে ওঠে। কিন্তু রাগে অপমানে জ্ঞান হারিয়েছে সাহেব। তড়াক করে উঠে ক্ষীণ হাত দু-খানায় বিশালদেহ নফরকে এঁটে ধরেছে। খিমচি কাটে, কেঁদেকেটে অনর্থ করেঃ কেন মারবে আমায় তুমি—কেন? কেন?

নফরকেষ্টর হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যায়। চড়ের হাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মিনমিন করে বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে? মারলাম আমি কখন, মিথ্যে বলবি নে। কী চেহারা হয়েছে, দেখ দিকি। না, দেখবি কি করে এখন—ঘরে গিয়ে আয়না ধরে দেখে নিস। ভাদ্দরের এই চড়া রোদে রক্ত যা ছিল সবটুকু মুখে উঠে গেছে।

সাহেব বলে, তোমার কি?

সে তো বটেই আমার কী। কথায় তোর বড্ড ধার হয়েছে সাহেব। পথে বসে বসে চাল কুড়োস—তুই কি কাঙালি-ভিখারি, হালদার-পাড়া রাস্তায় যারা সারবন্দি গামছা পেতে বসে থাকে?

মুহূর্তকাল চুপ থেকে নফরকেষ্ট বলে, এই যে উঞ্ছবৃত্তি করিস, সুধামুখী জানে?

কেন জানবে না! চাল কোন দিন কম হয়ে গেলে সন্ধ্যের আগে আবার পাঠিয়ে দেয়।

চল তো দেখি।

সাহেবের হাত ধরল নফরা। বলে, রাগ করিসনে সাহেব। তোর দশা দেখে মনে দুঃখ হল কিনা। অনেক দিন ছিলাম না—তার মধ্যে এই হাল হয়েছে, আমি বুঝতে পারি নি।

তৃতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত থাকলে মনে ভাবত, গৃহকর্তা প্রবাস থেকে ফিরে গিন্নির সম্পর্কে বকাবকি করছে। এবং ছেলের হাত ধরে কৈফিয়ত নিতে চলল যেন বাড়িতে।

বড়লোকি সাজপোশাক ও ভাবভঙ্গি দেখে সাহেব হাত ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলল, চালগুলো সব পড়ে গেছে। দাঁড়াও তুলে নিই।

নফরকেষ্ট তাচ্ছিল্য করে বলে, থাক না পড়ে। যাদের অভাব-অনটন, তারা এসে তুলবে। ওদিকে তাকাতে হবে না। চাল আমরা দোকান থেকে নেব। একেবারে পাঁচ-দশ সের কিনে নিয়ে যাব।

হল তাই। রাস্তার চাল অভাবগ্রস্তদের তুলে নেবার সুযোগ দিয়ে নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। চিরকালের সে লোকটা নয়—ধবধবে ডবলব্রেস্ট কামিজ পরেছে, প্যায়ের জুতো মশমশ করছে, চলেছেন শ্রীযুক্ত বাবু নফরকেষ্ট পাল। কিম্বা তারও বড়—জমিদার রাজা কি নবাব-বাদশা কেউ একজন।

চালের ঠোঙা নিয়েছে হাতে। আর কি নেওয়া যায় সাহেব? মিষ্টান্নের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়ঃ কিছু মিষ্টি নেওয়া যাক। খুব বড় বড় রাজ-ভোগ বের করো তো হে। ফুটবলের সাইজ—

চালের ঠোঙা আর রসগোল্লার হাঁড়ি বারান্দায় নামিয়ে রাখল। সুধামুখীর

সাড়া নেয়ঃ রাস্তা থেকে ছেলে ধরে আনলাম সুধামুখী। কী চেহারা হয়েছে দেখ।

বহুদিন পরে নফরকেষ্টর গলা পেয়ে সুধামুখী ছুটে আসে। নফরকেষ্ট নালিশ করছেঃ সাত ভিখারির এক ভিখারী হয়ে রোদ্দুরে রাস্তায় চাল খুঁটছিল। আসবে না কিছুতে। আবার কথার কী তেজ!

সুধামুখী স্নেহস্বরে বলে, পেটের দায়ে করতে হয়, নইলে সেই বয়েস কি ওর!

গামছা ভিজিয়ে এনে সাহেবের মুখ মুছে দেয়। তালপাতার পাখা নিয়ে এসেছে—

দূর! বলে সাহেব হেসে সেই পাখা কেড়ে নিল। অন্যে এসে পাখার বাতাস করবে—এতখানি আদর সে সহ্য করতে পারে না। আরও লজ্জা বাইরের একজন—নফরকেষ্টর সামনে ঘটতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। বেরিয়ে পড়ল। ঘাটে যাবার সেই সংক্ষিপ্ত পথ—আমের ডালে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠে ধপ করে ওদিকে এক লাফ।

টসটস করে হঠাৎ জল পড়ে সুধামুখীর চোখে। বলে, সাহেবকে আমি কিছু বলতে যাইনি, চাল কুড়ানোর বুদ্ধিটা নিজে থেকে মাথায় এনেছে। কী করে দুটো পয়সা সংসারে এনে দেবে, তার জন্য আঁকুপাকু করে। কত মায়াদয়া ঐ এক-ফোঁটা ছেলের!

আর চাল খুঁটে বেড়াতে হবে না। চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৈন্যদশা ঠাহর করে দেখল। সুধামুখী বাড়িয়ে বলছে না। লজ্জিত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, চালের দায় আমার। পাঁচ সের নিয়ে এসেছি, ফুরোলে আবার এনে দোব।

আসবে তো ছ'মাস পরে। তদ্দিন বেঁচে থাকলে তবে তো?

আসব রোজই সুধামুখী, ঠিক আগেকার মতো। গাঢ় স্বরে নফরকেষ্ট বলে, কোনদিন কোথাও আর যেতে চাইনে। আসবার পথে পুরানো ডেরাটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। নিমাইকেষ্টকে সব দেখিয়েছি, শুধু কাজের সরঞ্জামগুলো গোপন ছিল। সেগুলো গোছগাছ করে রেখে এলাম। পুরানো কাজকর্ম—এইখানে আগের মতন তোমায় বেড়ে দিয়ে। তোমার ঝাঁটা-লাথি খাব, আর রাঁধা-ভাতও খাব। টাকাপয়সা কিছু আমি হাতে তুলে দেব, বাকিটা তুমি কেড়ে কুড়ে নেবে। যেমন বারবার হয়ে এসেছে।

সুধামুখী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। নফরকেষ্ট বলতে লাগল, তাঁতের মাকু দেখেছ? একবার ডাইনে ছুটছে, একবার বাঁয়ে। আমারও তাই। গোড়ায় ঠিক করলাম, ভাল মানুষ নয়—টাকার মানুষই হব। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা। টাকা হল না, কিছুই হল না—বয়স টা হল আর দেহের মেদ হল। ভাই এসে সুবুদ্ধি দিল। ভাবলাম, বাসায় উঠে ভাল মানুষই হইগে তবে। চাকরিবাকরি-করা বাবু-মানুষ, ঘরগৃহস্থালী করা সংসারী মানুষ। তা-ও হল না, তিতবিরক্ত হয়ে ফিরেছি। কাজ নেই বাবা। ঘেঁটুফুলে পুজোআচ্চা হয় না, ও জিনিস বনেবাদাড়ে ভাল।

সুধামুখী সন্দেহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, বউ এলো না কিছুতে? এত রকমে টোপ

ফেলেও গাঁথতে পারলে না।

আসবে না মানে? বাসায় এসে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে রীতিমত ডাল-চচ্চাড় রাঁধতে লেগেছে। ধর্মপত্নী যখন, না এসে যাবে কোথায়?

সুধামুখীর দৃষ্টিতে তবু বুঝি অবিশ্বাস। চটেমটে পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে নফরকেষ্ট বলে, বউ আসে নি, এটা তবে কি?

রুমালের মতো বস্তুটা চোখের উপর মেলে ধরল।

কৌতূহলী সুধামুখী প্রশ্ন করে, কি ওটা?

বউয়ের শাড়ির আঁচল। কেটে এনেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সুধামুখীর মনের গুমোট কেটে গেছে, নফরার ভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েঃ তুমি যে আর এক শাজাহান বাদশা হলে নফরআলি।

নফরকেষ্ট বলে, শাজাহান বাদশা কি করল?

বউকে ভুলতে না পেরে তার নামে তাজমহল গড়ল। দুনিয়ার মানুষ দেখতে আসে, শাজাহানকে ধন্য-ধন্য করে। তোমারও সেই গতিক। বউ সঙ্গে নেই তো শাড়ির টুকরো পকেটে নিয়ে ঘুরছ। ভুলতে পার না।

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, ভুলবার জিনিস নাকি? পকেটে কি বলছ—আমি বাদশা হলে মাথায় যে মুকুট থাকত, নিশানের মতো তার উপর এই জিনিস উড়িয়ে দিতাম। গাইয়ে-বাজিয়েরা গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আসরে নামে তো—আমায় যদি কখনো আসরে ডাকে, ঐ কাটা-আঁচল আমি গলায় ঝুলিয়ে যাব। কাঁচি ধরার কাজে নেমেছি তখন আমি ঐ সাহেবেরই বয়সি, আর এই অর্ধেকবুড়ো হতে চললাম সত্যি বলছি সুধামুখী, এত বড় বাহাদুরির কাজ আমি করিনি আর কখনো।

বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে নফরকেষ্ট রসগোল্লা খাচ্ছে।

সুধামুখী বলে, বউয়ের রূপের ব্যাখ্যান চিরকাল ধরে করে এসেছ। ধরবার জন্যে কত ফন্দি-ফিকির। সেই বউ খপ্পরে এসে গেল, আর তুমি পালিয়ে চলে এলে?

বউয়ের রূপের কথায় নফর আহার ভুলে শতমুখ হয়ে উঠল। বলে, মাগীর বয়স হয়েছে, সেটা কুষ্ঠি-বিচার করে বলতে হয়। চোখে দেখে ধরতে পারবে না। সাজতে জানে বটে! গয়না পরে সেজেগুজে সব সময় একখানা পটের বিবি। উনুনে ফুঁ পাড়ছে, তখনো পরা আছে নীলাম্বরী শাড়ী।

সুধামুখী সামনে একটি পিঁড়ি পেতে বসে শুনছে। তার দিকে চেয়ে তুলনা এসে যায়। বলে, আর এই তুমি একজন মা-গোঁসাই এখানে। ছাই মেখে বনে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তিরিশ বছরের আধ-বুড়ি আমার বউ—পনের বছরের ছুঁড়ি বলে এখনো আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়। গেরস্থ-বউ হলেও সাজের গুণে বাইরের মানুষ টেনে ধরে—শ্বশুরবাড়ি রাত দুপুরে বেড়ায় ঘা পড়ত, বেড়া বেঁধে

বেঁধে শালামশায়রা নাজেহাল। আর তুমি বাইরের মেয়েমানুষ হয়ে ঘরের লোক ক'টাকেও টেনে রাখতে পার না। রাজাবাহাদুর গেল, সেই ঠাণ্ডাবাবু বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়-ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল। আমি যে এমন নফরকেষ্ট, ত্রিভুবনে সবাই দূর-দূর করে—আমি পর্যন্ত পাকছাট মেরে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে পড়ি।

মিষ্টি নিয়ে এসেছে নফরকেষ্ট, তাই থেকে কয়েকটা তাকে খেতে দিয়েছে। রসগোল্লা আর একটা গলায় ফেলে কোঁৎ করে গিলে নফরকেষ্ট বলে পুরানো বন্ধু হয়ে বলছি, সাজগোজ বেশি করে লাগাও। এখনো যা আছে, সাজিয়েগুছিয়ে লোকের চোখে তুলে ধর। রূপ ভগবান দেয় মানি, আবার মানুষেও দিয়ে থাকে। কবিরাজি মলমের মতো কোটোয় কোটোয় আজকাল রূপের মসলা। সেই মসলা হাতে-মুখে, এখানে-ওখানে লাগাও, যতখানি কাপড়ের বাইরে থাকে। আবার ওদিকে স্যাকরামশায়রা ভেবে ভেবে খেটেখুটে বছর-বছর এ-প্যাটার্নের ও-প্যাটার্নের গয়না গড়াচ্ছেন, যতগুলো পার গায়ের উপর চাপিয়ে দাও। ব্যস, আলাদা মূর্তি হয়ে গেলে। আয়না ধরে অবাক হবেঃ বাঃ রে, আমিই সেই সুধামুখী নাকি? বউয়ের কাছেপিঠে থেকে রূপের কারসাজি এবার ভাল করে বুঝে এসেছি।

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে—সুধামুখী বিব্রত হয়ে ওঠেঃ বলি তো সেই কথা, সাজগোজের সেই রূপসী বউ ছেড়ে চলে এলে কেন?

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, রূপসী বলে রূপসী! যে দেখে সে-ই দেবচক্ষু হয়ে যায়। এক রবিবারে কারখানার একজন গিয়েছিল আমার কাছে। বউ দেখে কানে কানে বলল, সাত জন্ম তপস্যা করলে তবে এমন চিড়িয়া মেলে। বুকের মধ্যে নেচে উঠল শুনে।

তবে।

সে দেখা তো দিনমানের—দিনদুপুরের! রাতের বেলা আলো নিভিয়ে রূপ দেখা যায় না। তখন তুমি সুধামুখী যা, সে-বউও তাই। তখন শুনতে হয় কথা। বউয়ের মুখে কথা তো নয়, আগুন। আগুনের ছেঁকায় সর্বদেহ জ্বলে পুড়ে যায়। বুঝে দেখ সুধামুখী, সারাটা দিন ফার্নেসের পাশে কাজ—রাত্রে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোব, পাশে সেই সময়টা বউ এসে পড়ে। দিনরাত্রি আগুনের পাশে বাঁচব কেমন করে? চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি, বাসা থেকেও পালিয়েছি। বউটা যদি না এসে পড়ত, যে ক'টা দিন বাঁচি ভাইয়ের বাসায় টিকে থাকতে পারতাম।

নিঃশব্দে নফরকেষ্ট আর কয়েকটা মিঠাই গলাধঃকরণ করে। ঢকঢক করে জল খেয়ে নিয়ে আবার বলে, তার উপরে এক কাণ্ড! আগুনে কেরোসিন পড়ল একেবারে। নিমাইকেষ্টর শ্বশুর বাসায় এসেছে মেয়েকে দেখতে। আমার বউ যেন আর-এক মেয়ে—'বাবা' বলে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে, ফাঁক বুঝে তারপর খবর জিজ্ঞাসা করেঃ কত মাইনে দেন আপনারা এ-বাড়ির বড়জনকে। শ্বশুর-বাড়ির সম্পর্কে যার সঙ্গে দেখা, মাইনেটা বরাবর ফাঁপিয়ে বলে এসেছি। নিমাই-কেষ্টকেও সামাল করা আছে—মায়ের পেটের ভাই হয়ে সে ফাঁস করবে না। কিন্তু

আমরা বেড়াই ডালে ডালে, বউ-মাগী বেড়ায় পাতায় পাতায়। কুটুম্বমানুষকে ধরে বসেছে। বুড়ো অতশত জানবে কি করে, বলে দিয়েছে সত্যি কথা। রাত্রে বউ দেখি একেবারে চুপচাপ। এমন তো হবার কথা নয়—ভয়ে আমার গা কাঁপছে। বোমা ফাটবে বুঝতে পারছি—আজ হোক আর একদিন-দুদিন পরে হোক। হল তাই ঠিক—

খাওয়া সমাপ্ত করে নফরকেষ্টর এইবার সাহেবের কথা মনে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ছোঁড়াটার নাম করে মিষ্টিমিঠাই আনলাম সে খেয়েছে?

দু-হাতে দুটো নিয়ে ঐ যে বেরিয়ে গেল। স্থির হয়ে দু-দণ্ড বাড়ি বসে থাকবার জো আছে?

অভিভাবক জনের মতো বিরক্ত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, এই রোদ্দুরে অবেলায় গেল কোথা?

সুধামুখী বলে, কোথায় আবার! ঘাটে গিয়ে বসে আছে।

ঘাটে কী এখন?

ঘাট ওর শোবার ঘর, ঘাটেই বৈঠকখানা। দেখ, পয়সাকড়ি জোটে না। নইলে কত সময় ভাবি, দরজার পাশে ঐ জায়গাটুকুর উপর ছাউনি করে দিলে রাতের বেলা সাহেব দিব্যি পড়ে থাকতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে যা করে ঘুমোয়।

নফরকেষ্ট বলে, বটেই তো! ঘাটে শোবে কেন ছোটলোকের মতন? ওসব হবে না, কালই চালা তোলার ব্যবস্থা করছি।

সুধামুখী প্রীত হয়ে বলে, ভাত চাপিয়ে এসেছি, এতক্ষণে ফুটে উঠল। গিয়ে ফ্যান গালব। তোমার কথা শেষ করে ফেল, শুনে যাই। তার পরে কি হল, কি করল বউ।

নফরকেষ্ট বলে, যা ভেবেছি, বোমাই ফাটল। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একেবারে। পরের দিনটা মাইনের তারিখ। দু-ভাই এসে যেই দাঁড়িয়েছি, বউ নিমাইয়ের সামনে হাত পাতল: ওর মাইনেটা আমার কাছে দাও। টাকা-আনা-পয়সায় ঠিক-ঠিক বলে দিল। আমরা থ। টাকাকড়ি আঁচলে বেঁধে ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে নিশিরাত্রে তারপর নিজমূর্তি ধরে। মিথ্যুক, অকর্মার ঢেঁকি। ভদ্রলোকের মেয়ের মুখের সেই সব বাছা বাছা জোরদার কথা বলতে আমার লজ্জা করছে। গাদা গাদা খরচা করে এই যে জার্মান-ইংরেজে এত বড় লড়াইটা হয়ে গেল—আমি ভাবি, বউকে যদি নিয়ে যেত কামান-বন্দুক, গুলিগোলা কিছু লাগত না, কথার তোড়েই শত্রু খতম হয়ে যেত।

আঁচল মুখে দিয়ে সুধামুখী হাসছে। নফরকেষ্ট বলে, হাসবে বইকি! পরের কষ্টে লোকের মনে বড় সুখ হয় তা জানি। একটা কথা আমার নামে বারবার বলছিল, কোন কাজের ক্ষমতা নেই। ছড়া কাটছিল: কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন। মনে মনে তক্ষুনি কিরে করে বসলাম: চলে তো যাবই—তার আগে গুণের কিছু নমুনা ছেড়ে যাব। চিরকাল যেটা মনে রাখবে। হয়েছেও তাই। তবু তো সরঞ্জাম কিছু পেলাম না, ওরই কাঁথার ডালার ভোঁতা একটা কাঁচি—

সুধামুখী গালে হাতদিয়ে বলে, ওমা, আমার কি হবে! শেষটা নিজের বউয়ের পকেট কাটলে!

মেয়েমানুষের পকেট কোথায়? আঁচল। টাকার নামে মূর্চ্ছা যায়। বাপের বাড়ি থেকে নোট গেঁথে গেঁথে নিয়ে এসেছে। তার উপরে আমার পুরো মাসের মাইনে। ঘরে স্বামীরত্ন ঘুরছে তাই বোধহয় বাক্সপেঁটরায় ভরসা পায় না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। বলি, রসো রূপসী, হাতের খেলা দেখাই একখানা। ঘুঁটে ধরিয়ে উনুনের উপর কয়লা চাপাচ্ছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেয়ানা বেশি কিনা— নোট-বাঁধা আঁচলের মুড়ো ফেরতা দিয়ে কোমরে গুঁজেছে। আমি বসেছি গিয়ে পাশে, কোমর থেকে আঁচল টেনে বের করেছি। কিছু জানে না। ভোঁতা কাঁচির পোঁচে পোঁচে কাপড় কেটেছি, মরি—বাঁচি তখনো উনুনে পাখা করে যাচ্ছে।

হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল নফরকেষ্ট।

সুধামুখী বলে, তবে আর যাচ্ছ না ফিরে। চুকিয়েবুকিয়ে চলে এসেছ, বুঝলাম।

যাতে আর কোনদিন না যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা করে এসেছি।

পকেট থেকে নফরকেষ্ট ধাঁ করে বউয়ের আঁচলের কাটা টুকরো বের করে ধরে। বলে, পাড়টুকু ছিঁড়ে বাহুতে ধারণ করব। আমার ব্রহ্মকবচ।

আবার একচোট হাসি। হাসি থামিয়ে বলে, ছেলেবয়সে দিদিমা এই মোটা তামার মাদুলি হাতে বেঁধে দিয়েছিল—ব্রহ্মকবচ, ভূতপেত্নী পেঁচো-দানোর নজর লাগবে না। এবারও তাই। বউয়ের জন্যে কালেভদ্রে যদি মন আনচান করে ওঠে, শাড়ির আঁচলের দিকে তাকালেই ব্যাধি ঠাণ্ডা—মনে পড়ে যাবে পূর্বাপর সমস্ত।

সুধামুখীও হাসতে হাসতে ভাত নামাতে গেল।

আর ওদিকে ঘাটের উপর রানী এসে সাহেবকে ধরেছে: যা বলেছিলে সত্যি-সত্যি তাই খাটল গো সাহেব। মা-কালী কথা কানে নিচ্ছেন না। বকাবকি করবে বলে তোমায় বলিনি। পরশুদিন মায়ের কাছে একশিশি তরল-আলতা চেয়েছিলাম। তোমার সেই মন্তর পড়ে সিগারেটের জায়গায় বললাম আলতা।

সাহেব জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ করেছিস তুই। আলতা এখন রক্ত হয়ে গলা দিয়ে গলগল করে না বেরোয়!

ভীত হয়ে রানী বলে, রক্ত বেরুবে কেন গলা দিয়ে? কী করলাম?

মায়ের কাছে পায়ের আলতার হুকুম—উঃ, কতখানি সাহস রে তোর!

মা চটিজুতো দিলেন, সে-ও তো পায়ের। পায়ের চেয়ে বড় হয়েছে মাপে। আনকোরা নতুনও নয়। তবু দিয়েছেন তো তিনি। জুতো দিতে পারেন, আলতায় তবে দোষ হবে কেন?

কথা জোগানো থাকে মেয়েটার জিভের ডগায়। পেরে ওঠা দায়।

সাহেব বলে, পা ছুঁয়ে মা তো মাপ নিতে পারেন না, সেই জন্যে জুতো বড় হয়েছে। কিন্তু একবার দিয়েছেন বলে তোর নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকবে

না? চটেছেন কিনা দেখ বুঝে। এতবার এতরকম জিনিস এল, আলতার বেলা কেন ডুব মারলেন?

রানী বলে, বেশ, আলতা বাদ দিয়ে গন্ধতেল চাইব এক শিশি। মাথায় মাখবার জিনিস, এতে কোন দোষ নিতে পারবেন না। আমার লাভই হবে—গন্ধতেলের দাম আলতার চেয়ে অনেক বেশি।

মা-কালীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে অতএব গন্ধতেলের ব্যবস্থাও করতে হয়। কোন কৌশলে হবে, সেটা আপাতত মাথায় আসছে না। চটিজুতোর ব্যাপারে অতি অল্পের জন্য মাথা বেঁচে এসেছে। এক বিয়ে-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল সাহেব। ফর্সা কাপড়-চোপড় পরেছে, তার উপর এই চেহারা। চেহারাটা সর্বক্ষেত্রে অদ্ভুত কাজ দেয়। কন্যাপক্ষের এক মাতব্বর ডাকলেন: ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন খোকা, আসরে গিয়ে বোসো। তাঁরা ভাবছেন, বরযাত্রী হয়ে এসেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে গেলে সরে সরে তাঁরা পথ করে দেন: বর দেখবে খোকা? যাও না, বরের কাছে এগিয়ে বোসোগে। এঁরা ভাবছেন, কন্যাপক্ষের ছেলে। কিন্তু খোকা তো বসবার জন্য ঢোকেনি এ-বাড়ি। পাতা করছে ওদিকে, রকমারি খাদ্যের সুগন্ধ আসছে। বসে পড়া যায় স্বচ্ছন্দে, লোভও হচ্ছে খুব। তবু কিন্তু ভোজে বসা চলবে না সাহেবের। সবাই যখন বসে পড়বে, তার কাজ সেই সময়টা। একজোড়া জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়বে। সে জুতোর বাছাবাছি বিস্তর। চটিজুতো—মেয়েরা যা পরে, সেই জিনিস। চটি হবে লালরঙের এবং হাল ফ্যাশানের। মা-কালী হয়ে পড়ে ফ্যাসাদ কত! সবাই খেতে গেল, ফুটফুটে একটা ছেলে সেই সময় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। ধরো, নজর পড়ে গেল একজনার। বাৎসল্য বশে সে গিয়ে সাহেবের হাত এঁটে ধরেছে। পায়ের দিকে চোখ গেল—মেয়েদের জুতো বেটাছেলের পায়ে। বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। তারপর কি হবে? ভোজ ফেলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ দুদিক দিয়ে রে-রে করে পড়ল। পেটের চেয়ে হাতের সুখ করেই মজাটা বেশি।

হতে যাচ্ছিল ঠিক এমনিটাই।

ও খোকা, খেতে বসনি যে তুমি? যাচ্ছ কোথা? শোন, শোন—

সাহেব তো চোঁচা ছুট। সে লোকও পিছু ছুটেছে। পিছনে তাকায়নি সাহেব, তবে জুতার শব্দ পেয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। ইঁদুরের মতন এ-গলি সে-গলি ছুটে ঘণ্টা দুই পরে সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘাটে এসে পড়ল। এসে সোয়াস্তি, গড়িয়ে পড়ল ক্লান্তির চোটে। পায়ের চটি হাতে তুলে নিয়েছিল কিছুদূর এসে। জুতো-পায়ে ছোটা যায় না। এতক্ষণ পরে তৃপ্তি ভরে জুতোর পানে তাকিয়ে দেখে। খাসা জিনিসটা, রানীকে মানাবে ভাল। পায়ে কিছু বড় হবে। বেটাছেলে সাহেব যা পায়ে ঢুকিয়ে বেরুল, সে জিনিস বড় তো হবেই মেয়েছেলে রানীর পায়ে। পায়ে পরে বেরুনো ছাড়া জুতো সরানোর নিরাপদ উপায় কি? তা-বড় তা-বড় মহাশয় ব্যক্তিরাও এই পন্থা ধরেন।

কিন্তু একবার দু'বার পাঁচবার সাতবারেও তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আবদারের পর আবদার চলল একনাগাড়ে। গতিক দাঁড়িয়েছে সেই বিধাতা-পুরুষের মতো।

সে গল্প সকলের জানা। হবে না, হবে না করে জেলের বাড়ি ছেলে হল। সৎ গৃহস্থ, মিথ্যাচার ফেরেব্বাজির ধার ধারে না—সাচ্চা পথে যা আসে, তাতেই খুশি। সেই জন্যেই গরিব বড্ড। পান্তা খেতে নুন জোটে না। জেলের মা-বুড়ি বিষম ঝানু। আট দিনের দিন রাত্রিবেলা বিধাতা-পুরুষ শিশুর ললাটে ভাগ্য লিখে যান, বুড়ি সেই রাত্রে সূতিকাঘরের দুয়োর জুড়ে শুয়ে আছে। মতলব করেই শুয়েছে, ভাগ্য-লিখনের আগে একটা পাকা-বন্দোবস্ত করে নেবে। নিশিরাত্রে দু-পহরের শিয়াল ডেকে গেল, ঠিক সেই সময়টা পাকা-চুল, পাকা-গোঁফদাড়ি কানে কলমগোঁজা, হাতে দোয়াত-ঝুলানো ভাবনাচিন্তায় কুঞ্চিত-ভ্রূ বিধাতা-পুরুষ চুপিসাড়ে এসে পড়লেন। এসে সূতিকাঘরের দোরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন—মেয়েমানুষ ডিঙিয়ে যান কেমন করে? বুড়িও নড়বে না কিছুতে। আড় হয়ে এমনভাবে শুয়েছে—আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক নেই, যার মধ্য দিয়ে বিধাতাপুরুষ গলে বেরিয়ে যান। সময় বয়ে যাচ্ছে, ব্যস্ত হয়ে বিধাতাপুরুষ বলেন, একটু সরে শোও বুড়িমা, কাজ চুকিয়ে চলে যাই। ত্রিভুবন-জোড়া কাজকর্ম, দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসত নেই।

বুড়ি জো পেয়ে গেছে। বলে, তুমি বিধাতা হাড়-বজ্জাত। আজকে কায়দায় পেয়ে গেছি। আমার ছেলের কপালে ছাইভস্ম কি-সব লিখেছিলে, সারাজন্ম তার দুঃখধান্দায় গেল। দিনরাত্তির খেটে পেটের ভাতের জোগাড় হয় না। নাতির বেলা সেটা হচ্ছে না। ভাল ভাল সব লিখে আসবে কথা দাও, তবে পথ ছাড়ন। নয়তো কাজ নেই।

বিধাতাপুরুষ বুঝিয়ে বলেন, দেখ মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ওঁরাই হলেন ওপরওয়ালা। ভাগ্য উপর থেকে ঠিকঠাক হয়ে আসে, কেরানি হয়ে সেইগুলো কপালে লিখে যাওয়া কাজ আমার। পারো তো ওঁদের গিয়ে চেপে ধরো, চুনো পুঁটির উপর তম্বি করে কী ফল?

বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলে, পাচ্ছি কোথা মুখপোড়া দুটোকে? কৈলাসে আর গোলকধামে লুকিয়ে বসে থাকে, নিচে মুখো হয় না। ঢাকঢোল পিটে পুজো-আচ্চা করে কত তোয়াজে লোকে ডাকাডাকি করে—নৈবিদ্যির লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খপ্পরে একবার আনতে পারলে হয়, তখন আর ছেড়ে কথা কইবে না। তারাও কম সেয়ানা নয়, বোঝে সমস্ত। যত যা-ই কর, কানে ছিপি এঁটে বসে আছে। অবিচার অনাচার তো কম হচ্ছে না—বাগে পেলে কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভয়। সেই-জন্য দেখা দেয় না।

বলে বুড়ি একেবারে চুপ। বিধাতাপুরুষ কত রকম খোশামুদি করেন, কিন্তু গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে সে। এদিকে রাতের মধ্যে মর্ত্যধামের কাজ সারা করে ফিরতে হবে। না হলে বিষম কেলেঙ্কারি—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিন যুগের মধ্যে যা কখনো হয়নি।

তখন বিধাতা পুরুষ বলেন, শোন বলি ভালমানুষের মেয়ে। জেলের বেটার হাতে তো রাজদণ্ড দেওয়া যাবে না, জালই হাতিয়ার। তোমার খাতিরে খানিকটা আমি বাড়িয়ে লিখে যাচ্ছি—জাল ফেললে ভাল মাছ একটা অন্তত পড়বেই। নাতির

অন্নের অভাব হবে না। লেখার প্যাঁচে এইটুকু করে যাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ধরতে পারবেন না।

বিধাতার মুখ দিয়ে যা বেরুল, তার অন্যথা হবে না। একটুখানি ভেবে নিয়ে বুড়ি পথ ছেড়ে দেয়। আর খলখলিয়ে হাসে আপনমনে: ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। যে কথা বলে ফেলছ ঠ্যালাটা বুঝবে হাঁদারাম ঠাকুর।

বড় হল সেই নাতি। নাতিকে বুড়ি গাঙে খালে জাল ফেলতে দেয় না। বলে, জাল ভিজে যাবে, গায়ে কাদা লাগবে তোর। কোথায় পাতবি রে আজকের জাল? আমি বলে দিচ্ছি—বাড়ির উঠানে।

রাত দুপুরে জালে জড়িয়ে গিয়ে রুইমাছ উঠানের উপর লেজের ঝাপটা দিচ্ছে।

পরের রাত্রে জাল কোনখানে পাতবে? ঘরের চালে। খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আস্ফালি!

বুড়ি বলে দেয়, উই যে লম্বা তালগাছটা—বাঁশটাঁশ বেঁধে কষ্ট করে ওর মাথায় উঠে আজ জাল পেতে আসবি।

বিধাতাপুরুষ তো নাকের জলে চোখের জলে। জলে জাল ফেললে তাড়িয়ে-তুড়িয়ে একটা মাছ জালে ঢোকালেই হয়ে যেত। এখন নিজেকেই জলের মাছ ধরে কাঁধে বয়ে কখনো ঘরের চালে উঠে, কখনো বা গাছের মাথায় চড়ে জালে ঢুকিয়ে আসতে হয়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, চোখে আবছা দেখেন—বেকায়দা পা ফেলে হুড়মুড় করে নিচে না পড়েন, প্রতিক্ষণে এই ভয়। অথচ না করে উপায় নেই, দেবতার বচন মিথ্যে হয়ে যাবে তা হলে।

বুড়িরও দুর্বুদ্ধির অন্ত নেই। সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা—দিনের আলোয় অতি সতর্ক হয়ে ঢুকলেও আট-দশ গণ্ডা কাঁটা ফুটে যাবে—নাতিকে বলছে, ঐ কাঁটাবনে জাল পেতে আয় দিকি। রাগে রাগে বিধাতা-পুরুষ খড়ি পেতে হিসাবে বসলেন—কদ্দিন আর জ্বালাবে বুড়িটা, কত বছরের পরমায়ু। সে-ও দেখলেন বিশ বছর এখনো। এই বিধাতাপুরুষই একদিন অঢেল পরমায়ু কপালে লিখে দিয়েছেন, এমনি করেই তার শোধ তুলছে। নাতিটা বুড়ির বুদ্ধি শুনে অস্থানে-কুস্থানে জাল পেতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেবে, বিধাতাপুরুষ তখন জল ঝাঁপিয়ে মাছ ধরে বেড়াবেন, মাছ না পেলে জেলেদের জিয়ানো মাছ চুরি করে এনে মহিমা বজায় রাখতে হবে। বিশ বছর ধরে প্রতিরাত্রে এই কাণ্ড। গোঁয়ার জেলেগুলো টের পেলে পিটিয়ে আধ-মরা করবে। জাল হাতে নিয়ে তবু করে বেড়াতে হবে এই সব। দেবতা হওয়ার গেরো এমনি।

সাহেবেরও ঠিক বিধাতাপুরুষের দশা! রানীর কাছে কী কুক্ষণে ঐ দেবতা হল, সারাজীবনে দেবতাগিরি ছাড়ল না। কত জায়গায় কতবার দেবতা হয়েছে! দেবতা আর সিঁধেল চোর উভয়েই অন্তর্যামী। আশালতার বর হয়ে সেই যে গয়না সরাল (আসল বরেও গয়না সরায়, সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে)—আরও একবার সিঁধ কেটে তার ঘরে ঢুকেছিল। আশালতার শ্বশুরবাড়ি—বরের সঙ্গে সেই ঘরে সে আছে।

পর অ৲

পাকা দালানে বড় করে সিঁধ কাটা—কিন্তু ঢুকে পড়ে শুধুমাত্র দেবতার কাজ করে বেরিয়ে আসে। বর বউয়ে ভাব জমিয়ে দিয়ে। ডেপুটির কাছে মিথ্যা জবাবদিহি করে, কারিগরের পক্ষে যার চেয়ে বড় অন্যায় হয় না।

কাজ একখানা নেমে যায়, হয়তো পনের-বিশ মিনিটে। কিন্তু গোড়া বাঁধতে হয় বিস্তর কাল ধরে। দরকারি ছাড়া বেদরকারিও কত বস্তু নজরে এসে যায়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটার নিজেরই এক ব্যাপার। পচার বুড়ি-মা হাঁপানি-কাশিতে ভুগছে, ভাল পুরানো-ঘি মালিশের প্রয়োজন। খান তিনেক গ্রাম পার হয়ে গিয়ে চকদার পঁটে চক্কোত্তির বাড়ি—পচা বাইটা চক্কোত্তির কাছে গিয়ে পুরানো-ঘি চাইল।

চক্কোত্তি আকাশ থেকে পড়েন ঃ আমি কোথা পুরানো-ঘি পাবো ?

পচা বাইটার নাম জানেন চক্কোত্তি, দস্তুরমতো সমীহ করেন তাকে। বলছেন, পুরানো-ঘি নেই আমার বাড়ি। থাকলে তোমার কাজে একটুখানি দিতে আপত্তি করব কেন ?

সত্যি জানেন না ?

পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি পঞ্চানন।

পচা বলে, হতে পারে। আপনার পিতামহ রামকিশোর চক্কোত্তি মরবার সময় বলতে ভুলে গেছেন। পুবের ঘরের যে সিঁদুরের খুঁটি আছে, তার গোড়ায় খুঁড়ে দেখুন। আমার সামনে খুঁড়ুন। রামকিশোর চক্কোত্তি মেটে ভাঁড়ে পাঁচ সের ঘি পুঁতেছিলেন পুরানো-ঘি করবার জন্য। বছর চল্লিশ মাটির নিচে আছে।

সত্যি সত্যি ঘিয়ের ভাঁড় পাওয়া গেল। চল্লিশ বছর আগে খোঁজদারির কাজে এসে পচা বাইটা দেখে গিয়েছিল। বাড়ির কেউ জানে না, পচা এসে ঠিক ঠিক বলে দিল। তবে আর অন্তর্যামী নয় কিসে ?

নফরকেষ্ট এক গাদা গয়না নিয়ে এলো। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি—যেখানে যেটি পরতে হয়। বলে, যা-কিছু ছিল, বেচে খেয়ে তো বসে আছ। পরো দিকি—মানায় কেমন দেখা যাক।

নফরকেষ্টর রকম দেখে সুধামুখী হাসে ঃ বুড়ো হয়ে গেলাম, ছেলে বড় হয়ে গেছে, এখন এই পরতে যাচ্ছি !

তা পরবে কেন ! ভস্ম মাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাক। আবার বল, মানুষ আসে না। আসবে কেন শুনি ? বলি, মানুষ তো এ-পাড়ায় যোগ-তপস্যা করতে আসে না। সেই ইচ্ছা হলে শ্মশানে-মশানে যাবে।

কথা যা বলছে সত্যি। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। তবু ইতস্তত করে সুধামুখী। গয়না নাড়াচাড়া করে, হাসে ফিকফিক করে। নফরকেষ্ট আগ্রহ ভরে তাকিয়ে। সুধামুখী বলে, পেটের দায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু সত্যি বলছি বড় লজ্জা আমার এখন। ছেলের চোখের উপর দিয়ে যাইনে। সাহেবও বোঝে, তখন সে বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকে না।

কথায় কথা এসে পড়ে। সুধামুখী বলে, তোমায় আসল যে কথাটা বললাম, তার কিছু করলে না এখনো। রাত্রে কেন সাহেব ঘাটে পড়ে থাকবে, একটু শোওয়ার জায়গা করে দাও বাড়ির মধ্যে। বড় কষ্ট ওর, কষ্ট আমারও। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে, শোওয়ার আগে একটিবার দেখে আসি। না দেখে পারা যায় না। লণ্ঠন হাতে করে ঘাটে ঘাটে ঘুরি। এক রাত্রে খুঁজে খুঁজে আর পাইনে। শেষটা যা দেখলাম—মাগো মা, মনে পড়লে এখনো বুক কাঁপে। সিঁড়ির রানার উপর বসেছিল বোধহয়, অমনি ঘুম এসে গেছে। অথবা গুমোট গরম বলে ইচ্ছে করে বাবু গিয়ে জলের ধারে শুয়ে পড়েছে। এগিয়ে দেখি, জোয়ারের জল উঠে রানার উপরটাও প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইঞ্চিখানেক হয়তো বাকি। আর একটু হলে সাহেবকেও নিয়ে যেত—একদিন ভেসে এসেছিল, আবার তেমনি যেত চলে। অমন আর না শোয়, কড়া করে বলে দিয়েছি—গিয়ে গিয়ে দেখেও আসি। কে জানে কোন বেপরোয়া হতচ্ছাড়া বাপের বেটা—এক তিল ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। ভয়ে কাঁপি সর্বদা। ছেলের ব্যবস্থাটা তুমি সকলের আগে করে দাও নফর।

নফরকেষ্ট বলে, বাঁশ দড়ি হোগলা দেখে দরদাম করে এসেছি। কাল হবে। কাল সন্ধ্যের মধ্যে সাহেববাবুর আলাদা ঘর। কিন্তু আমি যে পয়সা খরচ করে জিনিস-গুলো নিয়ে এলাম, একটিবার পরে দেখাবে না?

খরচ করে ভালবেসে দিচ্ছে, কে দেয় এমন! গয়না নিয়ে সুধামুখী পরছে একটি একটি করে। সাহেবের কথার শেষ হয় না—মুচকি হেসে আবার বলে, সবই তো হল নফরকালি। কিন্তু ছেলে দিনমানেই বা এমন পথে পথে ঘুরবে কেন? করপোরেশনের ইস্কুলে মাইনেকড়ি লাগে না—এক একবার ভাবি, ঐখানে জুতে দিলে কেমন হয়!

এবার নফরকেষ্ট এক কথায় সায় দিতে পারে না: ইস্কুলে যাবে সাহেব—ইস্কুলে গিয়ে কোন চতুর্ভুজ হবে?

সুধামুখী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ছাপা বই বানান করে পড়ে যায়। আমি একটু-আধটু বলে দিই, বাকি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। কে জানে কোন বড় বিদ্বানের বেটা—যেমন সাফ মাথা তেমনি স্মরণশক্তি। ছ-মাস এক বছর যদি একটু মাস্টারের কাছে বসতে পায়, সাহেব আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে দেখো। বিদ্যের কত কদর, তুমিই তো বলে থাক। তোমারই ছোট ভাইয়ের কাজ গদি-মোড়া চেয়ারে বসে দশ-বিশটা সই করা, দুটো-চারটে হুকুম-হাকাম ছাড়া। সেই কারখানার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ তোমায় সিদ্ধ হতে হয়। মাইনের বেলাও ভাইকে দেয় চারগুণ।

এইসব তুলনা এবং বিদ্যার গুণাগুণ নফরকেষ্টর ভাল-লাগে না। এড়িয়ে যেতে চায়। সুধামুখীকে তাড়া দিচ্ছে: হল তোমার? হাত চালিয়ে পরো। সেই পুরানো ডেরায় যাব একবার। রুজি-রোজগারে নামতে হবে। বউয়ের টাকা প্রায় ফুঁকে এলো।

এই স্বভাব নফরকেষ্টর। একটা কাজ করে সেই মুহূর্তে ফলাফল দেখতে চায়।

গয়না পরা হয়ে গেল। নফর ধাঁ করে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘাড় কাত করে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। টিকলিটা সরিয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে এনে দেয়। শেষ পোঁচড়া মেরে কুমোর যেমন এগিয়ে পিছিয়ে নিজের হাতের প্রতিমা দেখে। দেখে নফর প্রসন্ন হল ঃ বাঃ বাঃ, তুমি নাকি মন্দ! গয়না পরে মেয়েমানুষগুলো একেবারে আলাদা হয়ে যায়। আমার ঝানু বউ ষোলআনা সেটা জানে, সারাদিনমান গয়নার ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। শুয়ে পড়লে গায়ে ফোটে—রাত্তিরবেলা ঘরে এসে তাই গয়না খুলত। তখন দেখতাম। বলব কি সুধামুখী, রূপ সঙ্গে সঙ্গে সিকিখানা। পিদিম নেভালে যেমন সব অন্ধকার হয়ে যায়।

একগাল হেসে বলে, তোমারও ঠিক তাই। গয়নার বাহার খুলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি পরে থেকো না, গিল্টি চটে ভিতরের মাল বেরিয়ে পড়বে। সারাক্ষণের গরজই বা কি—এই সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা তিন-চার গায়ে থাকবে। এসব হল ব্যবসার সরঞ্জাম। আমার কাঁচিখানা কাজে অকাজে কেবলই যদি চালাই, ধার ক'দিন থাকবে? আর বলে দিয়েছে, আমরুল-পাতা কিম্বা সিদ্ধ-কাঁচাতেঁতুল দিয়ে মাসে একবার করে মেজে নিতে। গয়না চকচক করবে, চেকনাই এক-পুরুষ দু-পুরুষ বজায় থাকবে।

সুধামুখী বলে, দেখতে কিন্তু অবিকল গিনিসোনা। তফাৎ ধরা যায় না।

নফরকেষ্ট বলে, গিল্টির যুগ চলেছে—দুনিয়াসুদ্ধ এই। চোখের দেখা নিয়ে ব্যাপার—কষ্টিপাথর নিয়ে কে ঠুকে দেখতে যাচ্ছে? এ বাজারে খাঁটি সোনার কাজ যারা করে, তারা হল পয়লানম্বরি আহাম্মক।

সুধামুখীও মনে মনে মেনে নেয়। আদরের মেয়েকে পারুল শখ করে মাকড়ি কিনে দিল, তা-ও গিল্টি। শুধু গয়নাই বা কেন, গয়না-পরার মানুষগুলো অবধি গিল্টি।

দরজায় পাশে খাসা একটুকু জায়গা। দু-কোদাল মাটি ফেলে জায়গাটা আরও একটু না হয় উঁচু করে দেওয়া যাবে। মাথার উপরে হোগলার আচ্ছাদন। সাহেবের শোবার জায়গা। রাজ-অট্টালিকা হার মেনে যায়। খাসা হবে, সুধামুখী বলেছে ভাল।

নফরকেষ্টর যে কথা সেই কাজ। হোগলা বাঁশ পরের দিনই এসে পড়ল। আর একজন ঘরামি মিস্ত্রি। মিস্ত্রির সঙ্গে নিজেই সমস্তটা দিন জোগাড় দিচ্ছে। যত ভাবছে, ততই খুশি হয়ে ওঠে। জল খেতে একবার সুধামুখীর রান্নাঘরে গিয়েছে, বলে, বেড়ে বুদ্ধি বের করেছ তুমি। দরজার পাশে শুয়ে থেকে সাহেব আমারও দোর খুলে দেবে। কড়া নেড়ে বাড়িসুদ্ধ লবেজান করতে হবে না। একবার একটুখানি ওঠা—তারপরে ঘুমোক না পড়ে পড়ে রাতভোর এক পহর বেলা অবধি ঘুমোক—ঘাটের লোকের মতো কেউ খিঁচোতে যাচ্ছে না।

ছাউনি সারা হয়ে গেল। নফরকেষ্ট কখনো পিছিয়ে, কখনো ডাইনে কখনো বা বাঁয়ে ঘুরে মুগ্ধ চোখে দেখছে। গয়না পরিয়ে সুধামুখীকে যেমন দেখেছিল কাল। হাঁ, সত্যিকার ঘরই বটে! বসা যায়, দাঁড়ানো যায়।—পুরোপুরি পা

মেলে টান-টান হয়ে শোওয়া যায় কিনা, তারও একটা পরীক্ষা হওয়া নিশ্চয় উচিত।

সাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘর বাঁধা দেখছে। নফরকেষ্ট ডাক দেয়ঃ দেখিস কী রে ছোঁড়া! কলকাতার উপর এমন একখানা আস্তানা—লাট-সাহেব পেলেও তো বর্তে যাবেন। মাদুর নিয়ে এসে লম্বা হয়ে পড় দিকি এইবারে।

ডাকছে সাহেবকে, কিন্তু ডাক নয়—মেঘগর্জন। গলার স্বর আর কথাবার্তার ধরনই এই। চেহারায় ও কণ্ঠে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছে। পারতপক্ষে কেউ সে জন্যে কাছ ঘেঁসে না। নানান কথা নফরকেষ্টকে নিয়ে—সে নাকি ডাকাত, খুনই করেছে পনের-বিশটা, তার মধ্যে বিনা অস্ত্রে হাতের থাপ্পড়েই বা কত! দেখে তাই মনে হবে বটে। এ হেন চেহারা সত্ত্বেও নিস্ফলা ফেরে না কেবল তার হাতখানার গুণেই। আহা-মরি কী একখানা হাত—অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। হাত নিয়ে নফরার বড্ড দেমাক।

নফরা বলছে, শুয়ে পড় সাহেব, দেখব। সারাদিন রোদে খেটে চেহারা আজ আরও উৎকট। শুতে বলছে, কাঁচা মাটির উপর—শুইয়ে ফেলে তারপরে কি করবে কে জানে। ভয় পেয়েছে সাহেব, থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাধ্যপনায় নফরকেষ্ট রেগে গেল। গর্জনই এবার সত্যি সত্যিঃ হাঁ করে দেখিস কি! কথা বুঝি কানে যায় না? মাদুর নিয়ে চোদ্দ পোয়া হয়ে পড়। চিত হয়ে শো, কাত হয়ে শো—জায়গায় কুলোয় কিনা দেখতে চাই।

কিন্তু তার আগেই ভীত সাহেব বোঁ করে ছুট দিয়েছে। তবে রে—বলে নফর-কেষ্টও ছুটল। রোখ চেপেছে—ধরে ঐখানে এনে শোয়াবে। এখনই এই মুহূর্তে। তার যে স্বভাব—কাজ করলে ফলাফলটা চাই নগদ নগদ। সুধামুখী রান্নাঘরে তখন। ছুটতে ছুটতে সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ে। একেবারে কোলের পাশটিতে। চোখ পাকিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুধামুখী নফরকেষ্টকে দেখতে পায়।

ঐ তো সুধামুখী—কালো চামড়ায় ঢাকা হাড় কয়েকখানা। রেগে গেলে তখন ভিন্ন মূর্তি। নফরকেষ্ট হেন দৈত্যব্যক্তি কেঁচো একেবারে। সুধামুখী হুমকি দিয়ে ওঠেঃ কী হয়েছে?

নফরকেষ্ট মিনমিনে গলায় বলে, ছোটবেলা রান্নাঘরে সেই গোল হয়ে শুত। চিরদিন কেন একভাবে কষ্ট করবে? বলছিলাম, পা ছড়িয়ে একবার শুয়ে পড় বাবা। না কুলোলে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে।

সুধামুখী রায় দিলঃ সে আমি দেখব। সরে পড় এখন তুমি। ছেলে ভয় পেয়ে গেছে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে নফর চলে যাচ্ছে, সুধামুখী ডাকলঃ একটা কথা শুনে নাও। এদ্দিন যা হয়েছে তা হয়েছে, চালচলন বদলে ফেল এবারে। ভদ্দর হয়ে বেড়াবে। তোমার এই ভূতের মূর্তি দেখে ছেলে ভয় পায়। আমরাই আঁতকে উঠি, সে তো ছেলেমানুষ!

নফরকেষ্টর মনে বড় লাগল। বলে, মূর্তি এমনধারা হয় কেন, সেটা তো একটু-খানি ভেবে দেখবে! হোগলা এক বোঝা নিজে মাথায় করে পোলের ঘাট থেকে

নিয়ে এসেছি। সারাক্ষণ তারপরে ঘরামির সঙ্গে খাটনি। এসব তো চোখে পড়বে না, মূর্তিটারই দোষ হয়ে গেল।

সুধামুখী বলে, তোমার কথাবার্তাগুলোও ঠেঙা-মারা গোছের। সেই জন্যে কেউ দেখতে পারে না। নিজের বউও না। নরম হয়ে মিষ্টি করে বলতে শেখ এবার থেকে।

রাগে নফরার ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। আপন মনে গজর-গজর করছেঃ ঘরে নবকার্তিকের উদয়—মদনমোহন বেশে ফুলোটবাঁশি বাজিয়ে আমায় কথা বলতে হবে।

সুধামুখী জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ নফর?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, নরমশরম হয়ে খুব মিঠে সুরেই বলব এবার থেকে। মনে মনে মহলাটা দিয়ে নিচ্ছি।

ঐ যে বলে দিল সুধামুখী, সত্যিই এর পরে নফরকেষ্ট সাহেবের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলে না। নফর হেন লোকের পক্ষে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা এবং কথায় কথায় হাসির ভাবে দাঁত বের করা—সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। ওর চেয়ে দশ ঘা লাঠি খাওয়া অনেক ভাল। তবু কিন্তু হাসতে হয় এবং গলা দিয়ে মোলায়েম আওয়াজও বের করতে হয়। না করে উপায় কী?

একদিন দৈবাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। বর্ষায় রাতদুপুরে ভিজে এসে তুরতুর করে কাঁপছে। দরজায় ঘা দিচ্ছে—ডেকে ডেকে সারা হল, সাহেবের সাড়া নেই। অথচ বৃষ্টির ছাট আসে বলে মাথার উপরের হোগলা ছাড়াও জায়গাটির চতুর্দিক দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। খেয়াল করে নিজেই সব করেছে, কেউ বলে দেয়নি—আহা, ভিজে যায় ছেলেটা, ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারে না! আর অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করে মরছে—জেগেও পড়েছে সাহেব, কিন্তু কম্বল আর চট গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। আলস্য লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করে না। তারপর নিতান্ত যখন দোর ভাঙাভাঙি শুরু করল, উঠে হুড়কো খুলে দেয়। নফরকেষ্ট অমনি ঠাস করে মারে এক চড়।

চড় মেরেই বিপদ বুঝেছে। শব্দ বেরুনোর আগেই সাহেবের মুখে হাত চাপা দিল। কাতরাচ্ছেঃ কাঁদিসনে বাপধন আমার। আমি এর শতেক গুণ মারগুতোন খেয়ে থাকি। মেরে মেরে লোকের হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবু এক ফোঁটা চোখের জল বের করুক দিকি। সামান্য এক চড়ে গলে পড়বি তো কিসের পুরুষমানুষ তুই?

পুরুষালির গৌরবে সাহেব চোখের জলটা মুছে ফেলে, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কেন মারবে আমায় তুমি? কী করেছি?

ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেছে, বলছি তো! ঘাট মানছি। তোর বাপ থাকলে সে মারত না? ধরে নে তাই—আমি তোর বাবা। বাপের মতনই করি তোর জন্যে। শোওয়ার জায়গা ছিল না, পথে ঘাটে শুয়ে বেড়াতিস—গাঁটের পয়সা খরচা করে সেই সঙ্গে গতরে খেটে ঘর বানিয়ে দিলাম। মারই দেখছিস, ভাল কাজগুলো একবার

তো ভেবে দেখবি! পুরুষ হয়ে জন্মেছিস, কত জায়গায় কত মার খেতে হবে। একটা চড়ে ঘাবড়ে গেলে হবে কেন?

মুখের কথায় কতদূর চিঁড়ে ভিজবে, ভরসা করা যাচ্ছে না। লেন-দেনে আসাই নিরাপদ। নফরা বলে, বেশ তো, যেমন মেরেছি রসগোল্লা খাওয়াব তোকে। সেদিন হয়েছিল, কাল সকালে আবার একদফা। যতবার মারব, ততবার খাওয়াব—এই কথা রইল। সকালবেলা দোকানে নিয়ে যাব। না নিই তো কুক ছেড়ে তখন কাঁদিস। কান্না তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন মুলতুবি রেখে দে।

পরদিন বেরোবার মুখে নফরকেষ্ট সত্যিই সাহেবকে ডাকছে: চল্—

মনমেজাজ রীতিমত ভাল। সাহেবের উপর বড় খুশি, চড় খাবার কথা সাহেব সুধামুখীকে বলে নি। বলে, মনে পড়ছে না? রসগোল্লা খেতে হবে যে দোকানে গিয়ে। আমায় এত ডরাস কেন বল দিকি? বাপকে যখন চিনিসনে, সে বাপ তো আমার মতোও হতে পারে। চেহারা খারাপ হলেই বাপ বাতিল করে দিবি?

হাত ধরে টান দেয়। লোহার সাঁড়াশি ঐ হাতখানা—সাহেবের নরম কবজি বুঝি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। আদর করে ধরেছে—রাগ করে ধরলে কী কাণ্ড না জানি!

ময়রার দোকানে গিয়ে উঠল। ময়রা পিতলের গেলাসে জল দিয়ে শালপাতা বের করে। নফরকেষ্ট হাঁ-হাঁ করে ওঠে: পাতায় কী ছেলেখেলা হবে গো! ওতে ক'টা মাল ধরবে? রস গড়িয়ে বাইরে যাবে। মালসা বের কর দিকি—দু-জনের দুটো মালসা।

সাহেব সভয়ে বলে, ওরে বাবা! পুরো মালসা খেতে হবে?

নফর সদয়ভাবে বলে, তুই ছেলেমানুষ, দশ-বারোটা না হয় কমই নে আগে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম—যত মার, তত রসগোল্লা। এই লোভেই তো বেঁচে থাকা।

ময়রাকে ডেকে বলে দেয়, ছোট মালসা দাও ছোট মানুষটাকে। আমায় বড়। রস নিংড়ে দিও না, তাহলে অর্ধেক দাম। রসগোল্লা খেয়ে নিয়ে বাড়তি রসে চুমুক দেব।

সাহেবকেই সালিস মানে: কী বলিস তুই—অ্যাঁ? পয়সার মাল চেটেপুঁছে খাব। বড্ড কষ্টের পয়সা রে—

ময়রা মালসা ধুচ্ছে ওদিকে গিয়ে। সেই ফাঁকে নফরকেষ্ট মনের কথাটা বলে নেয়: বয়স হয়ে চেহারা বেঢপ হয়ে গেছে, একলা রোজগারের আর তাগত নেই। তুই আমার ডেপুটি হবি সাহেব? ডেপুটি বলিস কি খোঁজদার বলিস। একেবারে সোজা কাজ। ঘোরপ্যাঁচ যেটুকু, সে রইল আমার ভাগে। সুধামুখীকে বলবিনে কিন্তু—খবরদার, খবরদার! কাউকে বলবি নে, মা-কালীর কিরে। তোকে যদি কাজের মধ্যে পাই, বাপে বেটায় আমরা ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেব? যাবি?

রসগোল্লা এসে পড়ায় পরামর্শটা চাপা পড়ল। সময় নষ্ট না করে নফরকেষ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। কী তাজ্জব কাণ্ড—সাহেব নিজে খাবে, না নফরের খাওয়া দেখবে তাকিয়ে তাকিয়ে? তাই বটে, অমন পাথুরে গতর এমনি হয় না। রসগোল্লা

সোজাসুজি সে গালে নেয় না। বাহার হয় না বোধকরি তাতে। ছুঁড়ে দেয় উপরমুখে, হাঁ করে তারপর গালে ধরে নেয়। পল্লীগ্রামে নাটাখেলা দেখা আছে—কিম্বা গুটিখেলা? অবিকল সেই বস্তু। গোড়ায় একটা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে, হাত এসে গেলে তখন দুটো তিনটে চারটে অবধি। শেষটা এত দ্রুত, যে নিরিখ করা যায় না চোখে। লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহ্বরে ঢুকছে, এইমাত্র বোঝা যায়। কোঁত-কোঁত করে গিলে খাওয়ার আওয়াজ—গালের মধ্যে বস্তুগুলো তিলেক দাঁড়াতে দেয় না, গিলে ফেলে পরবর্তীর জায়গা খালি করছে।

খেয়ে চেকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলাস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হতাশ ভাবে বলে, নাঃ, কোন কাজের নোস তুই। পরের পয়সায় খাবি, তা-ও পেরে উঠলিনে। নিজের পয়সায় হলে তো বাবুভেয়ের মতন আধখানা কামড়ে রেখে দিতিস। খাটতে হবে তোর পিছনে—কাজ শেখাতে হবে, খাওয়াও তো শেখাতে হবে দেখছি।

রাস্তায় নেমে সেই নতুন কাজের আরও ভাল করে হদিস দিয়ে দিচ্ছে: আজকের দিনটা থাক, কাল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব—উঁ? পয়সাকড়ি তোর আমার কাছে না থাক, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ঘুরছে। ধনদৌলতের দেবতা কুবের যত হাঁদারামকে বেছে বেছে টাকা দিয়ে দেন, মুটে হয়ে তারা পকেটে পকেটে বয়ে বেড়ায়। সেইগুলোই ভাণ্ডার আমাদের—খুশি মতন তুলে নিই। নিয়ে তারপরেই ফুর্তিফার্তি, ময়রার দোকানে রসগোল্লার মালসা নিয়ে বসা।

কিন্তু পরদিন সকালে উল্টো কাজ এসে চাপল ঘাড়ে। ইস্কুলে দেবেই সাহেবকে, সুধামুখী ঠিক করে ফেলেছে। নিজেই সেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। সুধামুখীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলে তো সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দেবে। গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মতো খবরাখবর জেনে এল শুধু। হেডমাস্টার বলে দিয়েছেন, হাঙ্গামা নেই, অভিভাবক ছেলে নিয়ে আসুন, ভর্তি হয়ে যাবে।

নফরকেষ্টকে বলে, তুমি নিয়ে যাও।

ওরে বাবা!

সুধামুখী গরম হয়ে বলে, পয়সা খরচ করতে হবে না—শুধু একটু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। তাই তুমি পারবে না?

করুণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নফরকেষ্ট বলে, ভয় করে আমার।

কিসের ভয়?

দৈত্যসম মানুষটার ইস্কুল-পাঠশালে বিষম ভয়। শৈশবে তাকেও কিছুদিন যেতে হয়েছিল। একদিন গুরুমশায় এমন ঠেঙানি দিলেন, তারপরে আর কখনো পাঠশালা মুখো হয়নি। সেই আতঙ্ক রয়ে গেছে। খুনে মানুষ লোকে রটনা করে বেড়ায়—ভয়ডর বলতে কেবল এক পাঠশালার গুরুমশায়। ঐটে বাদ দিয়ে নফরকেষ্টকে যমের বাড়ি যেতে বল, হাসতে হাসতে সে চলে যাবে।

সুধামুখী চোখ পাকিয়ে সজোরে দিল ধাক্কা তার পিঠের উপর: যাও বলছি—

কী উপায়—চাকা গড়িয়ে দিলে গড়গড় করে চলবেই—নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল! ভয়ের বস্তু ইস্কুল-পাঠশালাই কেবল নয়—সুধামুখীই বেশি। যাচ্ছে, আর গজরগজর করছেঃ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে ইস্কুলে গিয়ে, এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে!

নফরকেষ্টর সঙ্গে ছেলে ছেড়ে দিয়ে সুধামুখী নিশ্চিন্ত নয়। মানুষটার হাড়হদ্দ জেনে বসে আছে, ইস্কুলে বলে তার ইচ্ছামতো কোন একখানে নিয়ে না তোলে। নিজে চলল পিছু পিছু। ইস্কুলের কাছাকাছি এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নজর রাখে।

কতক্ষণ পরে দুজনে বেরিয়ে আসছে। নফরকেষ্ট হাসিতে ডগমগ। চোখ তুলে দূরবর্তিনী সুধামুখীকে এক নজর দেখে নিয়ে চাপা গলায় সাহেবকে উৎসাহ দিচ্ছেঃ ঘাবড়াসনে। ইস্কুল এক বেলা বই তো নয়! বিকেল আর সন্ধ্যাটা পুরো হাতে রইল। যত ভাল ভাল কাজ সন্ধ্যার পরেই। কপালে লেগে গেল তো রোজগার মুঠোয় ধরবে না। আমি তো বলি ভালই হল, দুটো পথই তোর দেখা হয়ে যাচ্ছে। কোনটার বেশি মুনাফা এখন থেকে বুঝেসমঝে রাখবি। কলম ঘষে, না কাঁচি ধরে? বড় হয়ে যখন নিজের ইচ্ছেয় সবকিছু হবে, পছন্দমতো বেছে নিস।

সুধামুখী প্রশ্ন করে, হয়ে গেল?

নফরকেষ্ট একগাল হেসে বলে, ছেলের বাপ হয়ে এলাম। পাকা খাতায় রেজিস্ট্রি-করা বাবা। ছেলে গণেশচন্দ্র পাল, পিতা শ্রীনফরকৃষ্ণ পাল।

সুধামুখী রাগ করে বলে, তুমি বাপ হতে গেলে কোন বিবেচনায়? সাহেবের বাপ মস্ত বড়মানুষ, ছেলের চেহারা দেখে যে না সে-ই বলবে। তুমি বড় জোর সে বাপের সহিস-কোচোয়ান।

নফরকেষ্টর মুখের হাসি নিভে গেল। বলে, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করল। যে ছেলের বাপের ঠিক নেই, সে ছেলে ইস্কুলে ভর্তি করে না। তখন বলতে তো হবে একটা-কিছু!

সুধামুখী বলে, এমনি তো মুখ দিয়ে তড়বড় করে লম্বা লম্বা কথা বেরোয়। ভাল লোকের নাম একটা বানিয়েও বলতে পারলে না?

নফরকেষ্ট বলে, মুখে বলে দিলে হয় না, খাতার উপর সই করিয়ে নেয়। বাপের নাম বললাম—নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কি সেনাপতি মোহনলাল। তখন খোঁজ পড়ত কোথায় সেই সিরাজদ্দৌল্লা?—এসে সই মেরে যাক। নফরকেষ্ট পাল বলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামা চুকিয়ে এলাম। কাজটা বড় অন্যায় করেছি!

সুধামুখীকে চুপ করে যেতে হয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না বটে! প্যাকেচক্রে বাপ হয়ে গিয়ে নফরের স্ফূর্তি খুব। সুধামুখী কেবলই দমিয়ে দেয়, ক্ষেপিয়ে মজা দেখে। ইস্কুলে সাহেব ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্লাসের সেরা ছেলে। সগর্বে সুধামুখী বলে, এঁটো-পাতের ধোঁয়া বলতে, এঁটো-পাত কি ধূপ-চন্দন বোঝ এবারে। তুমি এখনো নিজের নামে 'ফ'-এর জায়গায় 'ঝ' লিখে বোসো। কোন সুবাদে তোমার ছেলে হতে যাবে? ওর বাপ মস্তবড় পণ্ডিত।

নফরকেষ্ট তর্কে হারবে নাঃ ও লাইন আমি যে বাতিল করে এসেছি। আমার যে লাইন, সাহেবকে সেইখানে ফেলে তবেই বিচার হবে। হাত সাফাইয়ের কাজে

নফরা পালকে কেউ যদি কোনদিন হারাতে পারে, সে আমাদের এই সাহেব। কেষ্টঠাকুর গোকুলে বাড়ছে।

হাত নিয়ে বড় দেমাক নফরকেষ্টর। অনেক দিন পরের এক ব্যাপার বলি, ফুলহাটায় জগবন্ধু বলাধিকারীর বাড়ি। কাজের গল্প করছে নফরা—যেমন তার অভ্যাস। ভানুমতীর ভোজবিদ্যা কোথায় লাগে নফরার সেই সব কাজের কাছে!

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে আছে। সাহেব তো আছেই। তাজ্জব হয়ে শুনছে সকলে। বলতে বলতে নফরকেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, চাঁদি রুপোয় বাঁধিয়ে রাখবার মতো এই হাত। সুড়সুড় করে লোকের পকেটে ঢুকে যায়। সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে পুকুরের মাছ জালে ছেঁকে তোলার মতন সর্বস্ব মুঠোর ভিতর নিয়ে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে বের করো দিকি আমার মতন এমনি একখানা হাত।

কখন এসে বলাধিকারীও দাঁড়িয়েছেন—হাসির শব্দে টের পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে বলেন, হাজার লক্ষ রয়েছে নফরকেষ্ট। তোমার হাত কোন ছার সে তুলনায়। ট্যাকাটা-সিকেটা তোমার দৌড়, লাখ লাখ কোটি কোটির নিচে তাদের নজর নামে না। কৌশলও পরমাশ্চর্য—অঙ্গ ছুঁতে হবে না, যার পকেটের যত টাকা ঠিক ঠিক বেরিয়ে কারিগরের কাছে চলে যাবে।

এ হেন গুণী ব্যক্তিদের কথা সবিস্তারে শুনতে কার না লোভ হয়। উৎকর্ণ সকলে। জগবন্ধুও বললেন অনেক কথা। কিন্তু টাকাকড়ি ঘটিত গোলমেলে সব ব্যাপার। মুর্খলোকের বুঝবার নয়। এইটুকু বোঝা গেল, দুনিয়া জুড়ে ছিনতাই। ক্ষিধে ক্ষিধে করে লোকে কাঁদছে—সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি খেটেও ক্ষিধে মারবার জোগাড় করতে পারে না। আবার ভিন্ন এক দল পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ক্ষিধে নেই বলে কাঁদছে এক চামচ দুধ খেলেও পেটের মধ্যে গিয়ে পাক দেয়। ক্ষিধে কিসে হয়, সেই জন্য কান্না।

গয়নায় কাজ দিচ্ছে যাই বলো। বউয়ের কাছ থেকে মাহাত্ম্য বুঝে এসেই নফরকেষ্ট সুধামুখীকে কিনে দিয়েছে। নানা রকম তুকতাক চলে এদের মধ্যে—মন্ত্র আছে, কবচ আছে, শিকড়বাকড় আছে। ভূতপেত্নী তাড়ানোর ব্রহ্মকবচের কথা সেই বলেছিল নফরকেষ্ট, আবার উল্টো রকমের মনোমোহন—কবচও রয়েছে ভূতপ্রেত কাছে টানা যায় যার গুণে। আঁধার রাতবিরেতে নাগর রূপে ঘোরাফেরা করে, ভূত বই তারা অন্য কিছু নয়। কন্ধকাটা-ভূত গো-ভূত—তেমনি হল নাগর-ভূত। মনোমোহন-কবচ রাঙা সুতোয় বাম বাহুতে ধারণ করতে হয়। কাজল-পড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত কাজল দু-চোখে পরতে হয়। শিকড়-বাকড়েরও নানা রকম বিধি। কিন্তু সকলের সেরা দেখা যাচ্ছে গয়না। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, কাজ পেতে দেরি হয় না।

পথচারীরা ইদানীং দেখছে খুব চোখ মেলে—দেখে সুধামুখী মানুষটা অথবা মানুষটার গা-ভরা গয়না, সঠিক বলা যায় না। নফরকেষ্টর টোপ ফেলে মাছ ধরার কথাটা এখানেও খাটে। গয়না হল টোপ, সুধামুখী বড়শি। কালো বড়শি লোভনীয়

টোপে ঢেকে দিয়েছে। সেই টোপে পাঁচটা মানুষ হয়তো দৃষ্টির ঠোক্কর দিয়ে সরে গেল, একটা কি গিলবে না শেষ পর্যন্ত? তা হলেই হল।

একদিন ভারি একটা শৌখীন লোক ফাঁদে পড়ে গেল। সুধামুখী যথারীতি গলির মোড়ের আবছা-অন্ধকার তার নিজস্ব জায়গাটিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোকটা গটগট করে সোজা কাছে চলে আসে। এবং পিছন পিছন নয়, পাশাপাশি কথা কইতে কইতে গলি পার হয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। সুধামুখীর চেয়ে বয়সে ছোট বলেই মনে হয়। আর বাহারখানাও সত্যি দেখবার মত। দু-হাতের দশ আঙুলে আংটি, বুড়ো আঙুল দুটো কেবল বাদ। কিন্তু সে ক্ষোভ পুষিয়ে নিয়েছে অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আংটি পরে। সবসুদ্ধ মিলে পুরো ডজন।

দরজার পাশের ঘরটুকুতে সাহেবের এ সময় থাকার কথা নয়, তবু কি গতিকে আজ ছিল। সুধামুখীর সঙ্গে লোকটা ঘরে গেল এসেন্সে উগ্র গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে দিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, গন্ধ তবু বাতাসে ভাসে। কী খেয়াল হল, সাহেবও উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে এগোয়, উঁকি দেয় জানলা দিয়ে। সুধামুখী বাবুটিকে বিছানায় নিয়ে বসিয়েছে। সুতো আর পুঁতিতে রংবেরঙের কারুকার্য-করা একটা বড় পাখা—সেই পাখা হাতে সুধামুখী বাতাস করছে। রাজাবাহাদুরের কথা অনেক দিন পরে সাহেবের মনে পড়ে যায়। তাকে এমনিধারা খাতির করত। এই পাখা তারপরে আর বের হতে দেখেনি।

দুয়োর খুলে এক সময়ে সাহেব ঘরে ঢুকে পড়ে। শৌখিন বাবুটির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার সেই আশ্চর্য ভঙ্গিতে ডাকে, বাবা—

রাজাবাহাদুর ফৌত, কিন্তু বাবা বলার কৌশলটা তারপরেও চলেছে কিছু কিছু। কাজও হয়। সুন্দর ছেলের মুখে "বাবা"—ডাক শুনে ভদ্র-লোকে মেজাজের মাথায় সিকিটা আধুলিটা গুঁজে দেয় ছেলের হাতে। হাত নেড়ে কেউ বা সরিয়েও দেয়ঃ যা, এখন চলে যা তুই। যা দেবার এইখানে রেখে যাব। আবার এমনও আছে, কিছুই দিল না। যাঃ, যাঃ—বলে তাড়া করে।

আজকে অনেক বছর পরে সাহেবের কী রকম হল—বাবুটির গা ঘেঁষে আবদারের সুরে ডাকেঃ বাবা গো—

বাবু খিঁচিয়ে উঠলঃ এটা কোত্থেকে জুটল রে?

সুধামুখী পরিচয় দেয়ঃ ছেলে আমার—

তোমার ছেলে আমায় কি জন্যে বাবা বলতে আসে?

সুধামুখী বলে, সকলের বাপ দেখে ওরও বোধ হয় বাবা-ডাক মুখে এসে যায়। বড়ঘরের ভালমানুষ দেখলে ডেকে বসে।

খোশামুদিতে বাবুটি ভুলবার পাত্র নয়। রাগে কাঁপছে। ভয় পেয়ে সুধামুখী কাতর কণ্ঠে বলে, ধর্ম সম্পর্কও তো পাতায় লোকে, ধর্মবাপ থাকে। ধরে নিন তাই।

রাখো চালাকি। প্যাঁচে ফেলানোর মতলব। বাবা বলিয়ে শেষটা খোরপোষের দায়ে ফেলবে।

খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরে হুঙ্কার দেয়ঃ ছোট মুখে বড় কথা! বাপ হই আমি তোর—উঁ?

ঠহি-ঠহি করে সাহেবের মুখে মারছে। থামে না। মারতে মারতে মেরে ফেলে নাকি? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব ছুটে পালায়। ছেলের পিছু পিছু সুধামুখীও ছুটল।

নিশ্চিন্তে বাবু এবারে সিগারেট ধরায়। মুখের মধ্যে ধোঁয়া জমিয়ে আস্তে আস্তে কায়দা করে ছাড়ছে। গোল গোল আংটি হয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়। বাবু দেখে তাই সকৌতুকে, আর আয়েসে পা দোলায়।

সাহেবের হাত ধরে নিয়ে সুধামুখী আবার এসে ঢুকল: দেখুন বাবু, কী অবস্থা করেছেন দেখুন একবার চেয়ে। গালিগালাজ নয়, বাবা বলে ডেকেছে। যে ডাক শুনে শত্রুমানুষ অবধি আপন হয়ে যায়—

কেঁদে ফেলে বলতে বলতে। আংটির পাথরে সাহেবের চোয়ালের উপর অনেকখানি ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। বাবু শুনে মনে বেকুব হয়েছে। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, চামড়ায় ঘষা লেগেছে একটুখানি। একেবারে ননীর পুতুল বানিয়েছ, টুসকির ভর সয় না—সেটা আমি বুঝি কেমন করে?

একটা টাকা সাহেবের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, যা বললি বললি। ধার দিগর আর বাঁদরামি করবি নে। খুন করে ফেলব। চলে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—

তবু কিন্তু মানুষটির আনাগোনা বহাল হল এই থেকে। আংটির বাহার দেখে সকলের মুখে মুখে আংটিবাবু নাম। আসে খুব কম—দু-একটা গান শুনে বালিশের তলায় কিছু রেখে দিয়ে চলে যায়।

আংটিবাবুর আঘাতের দাগ অনেকদিন ছিল। রানীর কাছে, ঝিঙে ও দলবলের কাছে সাহেব দাগ দেখিয়ে দেমাক করে বেড়ায়ঃ রাগী মানুষ কিনা আমার বাবা—মারের চোটে কেটে গেল। এ কাটা হীরের আংটির। হীরেয় কাচ কাটে, সামান্য চামড়া কেন কাটবে না? বাবার দু-হাতের আট আঙুলে বারোটা আংটি—সমস্ত হীরের।

তা রেগে গেল কেন, কি করেছিলি তুই?

আজগুবি প্রশ্নে অবাক হয়ে সাহেব বলে, বড়লোক-মানুষ যে, রাগ হবে না? যার যত টাকা, তার তত রাগ। ঘরের লোক বাইরের লোক চাকর-দাসী সকলকে মেরে বেড়ায়। আমি একেবারে আপন—আমায় তো মারবেই।

নফরকেষ্টরও কানে গেল! সাহেবকে বলে, তাই বটে! আমার হাত গাল না ছুঁতেই তেরিয়া হয়ে উঠিস, রসগোল্লা খাইয়ে সামাল দিতে হয়। ও-মানুষটা মেরে আধ-জখম করল, সেই আহ্লাদে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস। ও-হল কিনা আংটি-বাবু, আঙুলে আংটি—আমার নেড়া হাতে শুধুই হাড়।

বুকের ভিতর থেকে গভীর এক নিঃশ্বাস মোচন করে বলে, একলা তুই কেন, দুনিয়া জুড়ে এক রীতি। বড়লোকের ধামা ধরে সবাই। বিয়ে করা ধর্মপত্নীকে

টোপ ফেলে ফেলে টেনে আনলাম—যেই না শুনেছে মাইনে কম, সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী।

ব্যঙ্গের সুরে কেটে কেটে বলে, ও সাহেব, তোর রাজাবাহাদুর বাবার শাল ছিঁড়ে কবে ফালা-ফালা হয়ে গেছে, আংটি-বাবার মারের দাগও তো মিলিয়ে এলো—আবার কোন বড়লোক বাবা ধরবি মায়ে-পোয়ে দেখ ভেবেচিন্তে।

শুনে সাহেবের রাগ হয় না, বড় কষ্ট হয়। ভয়ঙ্কর দৈত্য-দেহের ভিতর থেকে এক অসহায় ভিখারি যেন বড় কান্না কাঁদছে। বলে, বড়লোক তুমিই হও না কেন, গালগল্প তো খুব—হেনো করতে পারি, তেনো করতে পারি, ধনদৌলত মুঠো মুঠো তুলে আনতে পারি—

পারি—। চকিতে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে নফরকেষ্ট বলে, আলবৎ পারি। তুই সহায় হ, পারি কিনা চোখের উপর দেখাচ্ছি। তাগত আছে, মা দক্ষিণা-কালীর দয়াও আছে—

যে দিকে কালীমন্দির, নফরকেষ্ট সেই দিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। বলে, আমরা নিমিত্ত মাত্র, দয়াময়ী করেন সব। বাবুভেয়েদের পকেটের টাকা হাতে তুলে এনে দেন। কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ মায়ের নাম স্মরণ করবি, এই একটা কথা কোন দিন ভুলিস নে সাহেব।

সাহেব বলে, কি করতে হবে, আমায় শিখিয়ে দাও।

নফরকেষ্ট খুশিতে তার পিঠ ঠুকে দিল : গোড়ায় গোড়ায় সকলকে যা করতে হয়—খোঁজদারির কাজ। এই দিয়ে হাতে-খড়ি। নকেশ ধরে মালের হদিস দিবি, কারিগরে কাজ হাসিল করে আসবে। বিপদের ঝুঁকি নেই, খোঁজ দিয়েই তো তুই সরে পড়েছিস কাঁহা কাঁহা তেপান্তর। ঘরে গিয়ে হয়তো বা ঘুমুচ্ছিস, ঘুম ভাঙিয়ে বখরা ঠিক হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সাচ্চা কাজকর্ম আমাদের এসব লাইনে —জুয়াচুরি-ফেরেব্বাজি নেই। নেমে দেখ, দিন গেলে নির্ঝঞ্ঝাটে দু-তিন টাকার মার নেই।

সাহেবের থুতনির নিচে হাত রেখে মুখখানা এপাশ-ওপাশ করে দেখে। ছবি দেখার মতন। বলে, দু-তিন টাকা কি বলছি—তোর রোজগার গুণতিতে আসবে না। রাজপুত্তুরের রূপ নিয়ে জন্মেছিস—এই নাক-মুখ-চোখ, এই গায়ের রং! রোদে রোদে চালের দানা কুড়িয়ে বিধাতার-দেওয়া এমন জিনিস তুই বরবাদ করছিলি। হায়, হায়, হায়! আর সেই পোড়া বিধাতা আমার বেলা কি করল! এমন একখানা উদ্ভট চেহারা—পারলে নিজের মুখে নিজেই থুতু ফেলতাম। এমন চোস্ত হাত দুটো নিয়েও নুলো হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দম নিয়ে আবার বলে, চেহারা দেখেই মানুষ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশ হাত ছিটকে পড়ে। কী করে কাজকর্ম হয়, বল। বলে, আমি নাকি খুনে ডাকাত। যারা বলে, তাদেরই খুন করতে ইচ্ছে যায়। ডাকাত হতে পারলে এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে দারোগা-কনেস্টবলের তাড়া খেয়ে ঘুরি! সেই জন্যেই এত করে বলছি, বিধাতার-দেওয়া মূলধন নষ্ট হতে দিসনে বাবা! মহাপাপ। ভাঙিয়ে খা, কাজ-কারবারে লাগা, রাজ্যেশ্বর হয়ে যাবি।

পরবর্তীকালে সাহেব ভাল-ভাল গুরু-ওস্তাদ পেয়েছে। কিন্তু পয়লা গুরু বলতে গেলে নফরকেষ্ট। সাহেবকে সে বড় যত্নে হাতে ধরে শেখায়। শিক্ষাদীক্ষা গুণজ্ঞান সমস্ত দিয়ে যাবে।

বলে, আমার বউয়ের গর্ভে ছেলে হলেও এর বেশি করতাম না। সে বড় রূপসী—ছেলে হলে তোরই মত রূপ হত। তার গর্ভের নোস, তা-ই বা জোর করে কে বলবে! আমার ঘর করতে চায় না—বাপের বাড়ী পড়ে থাকে, নানান রকম বদনাম—

তর্কাতর্কি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে, অত হিসাবের কাজ কি—তুই ছেলে, খাতায় লেখা বাপ আমি এখন। ইস্কুলের তিনটে বাঘা বাঘা পণ্ডিত-মাস্টার সাক্ষি। বাপ-ছেলের আমাদের নতুন কাজকারবার। ছেলে খোঁজদার, বাপ কারিগর।

কিন্তু সাহেব সম্পর্কটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেসে বলে, কাজকারবার কানায় আর খোঁড়ায়—

সে কেমন ?

পাঠ্যবইয়ে গল্পটা আজই সে নতুন পড়ে এসেছে। কানা দেখতে পায় না, খোঁড়া হাঁটতে পারে না। কানার কাঁধে খোঁড়া চেপে বসল—দেখতে পাচ্ছে এবার, হাঁটতেও পারছে।

সাহেব বলে, আমাদেরও তাই। আমার চেহারা, তোমার হাত। দুজনে মিলে এক-মানুষ হয়ে গেলাম।

সুধামুখী টের না পায়। সে জানে, ইস্কুলে পড়ছে ছেলে। লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি বিয়েথাওয়া করে সংসার ধর্ম করবে—যেমন আর দশজনে করে থাকে। সুধামুখীর বাবা যেমন একজন। তাদের বেলেঘাটার গলিটুকু জুড়ে এবং পাড়ায় পাড়ায় যেমন সব শিষ্টশান্ত সংসারী লোকেরা। পড়ছে সাহেব ঠিকই, তাতে অবহেলা নেই। ইস্কুল যখন থাকে না, সেই সময়টা সে নফরকেষ্টর সঙ্গে।

নফরকেষ্ট বুঝিয়েছে: পড়ার সময়ে পড়তে তো মানা নেই। কাজকর্ম তার-পরে। ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা গাড়িজুড়ি চড়ে ইস্কুলে যায়, টিফিনে সন্দেশ খায়, ছুটির পরে বাড়ি গিয়ে খেলা। ধরে নে, আমরা তেমনি খেলে বেড়াই দুজনে।

কিন্তু খেলার আগেও যে কিছু আছে। ভাল ঘরের ছেলে ছুটির পরে বাড়ি ফিরছে, সাহেব একবার লক্ষ্য করে দেখেছিল। মা দাঁড়িয়ে আছে সদর-দরজা অবধি এগিয়ে এসে। হাত ধরে ছেলেকে উপরে নিয়ে গেল। উপরের বারান্দায় বসিয়ে খাবারের প্লেট দেয় হাতে।

নফরকেষ্ট আগের কথার জের ধরে চলেছে: পড়বি যেমন, সংসারও দেখবি সেই সঙ্গে। চালের দানা খুঁটে খুঁটে মায়ের হাতে এনে দিতিস—ধরে নে, এ-ও তাই। চাল না এনে টাকাপয়সা খুঁটে নিয়ে আসা। খুব লাগসই গল্পটা বলেছিলি—কানায় আর খোঁড়ায় একজোট। আমি হলাম সেই খোঁড়া—ঘাড়ে তুলে মোকামে হাজির করে দিস তবে আমি কাজ করি। তুই আপাতত কানা আছিস, দু-দিনেই চোখ ফুটে যাবে। তখন কারিগর খোঁজদার একাই সব। খোঁড়াকে

লাগবে না, কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিবি। দিস তাই, রাগ করব না। তুই বড় হলে সুখই আমার।

বকবক করে নফরকেষ্ট এমনি সব বলছে। সাহেবের কানেও যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এক রাস্তায় ইস্কুলের ফেরত এক বড়লোকের ছেলে দেখেছিল একদিন। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রকাণ্ড ঘোড়ায়-টানা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটেছে—'তফাত যাও', 'তফাত যাও' করছে সহিস পিছনের পাদানি থেকে! ছেলে এসে পৌঁছল বাড়ি। গয়না-পরা ভারি সুন্দরী মা ফটক অবধি এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেন: এত দেরি কেন আজ? অনতিদূরে সাহেব—নিষ্পলক। দোতলার ঝুল বারান্দায় মা আর ছেলেকে আবার দেখা যায়। ছেলের মুখে মা খাবার তুলে দিচ্ছে। সাহেবের আসল মা-ও নিশ্চয় এমনি সুন্দর ছিল। মা মাত্রেই সুন্দর।

ফুলের বাগানের মধ্যে ঝকঝকে বাড়ি, হাস্যমুখ পরমাসুন্দরী মা-জননী, সুবেশ সুন্দর ছেলে, বিকালের রোদে-ভরা প্রসন্ন আকাশ, বড়-রাস্তায় গাড়ি মানুষের সমারোহ—সমস্ত পার হয়ে এসে সাহেব পায়ে পায়ে তাদের গলিতে ঢুকে পড়ে। নর্দমার দুর্গন্ধ নোংরা জল গলি ছাপিয়ে ওপারে পড়ছে, লাফিয়ে পার হতে হয় জায়গাটা। দুটো মেয়ের মধ্যে হঠাৎ কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছে—আকাশ-ফাটানো চেঁচামেচি। ভদ্রমানুষেরা, উজ্জ্বল পথের উপর এইমাত্র যাঁদের সব দেখে এলো—শুনতে পেলে ছি-ছি করে দু-কানে আঙুল দেবেন। কিন্তু ফণী আড্ডির বস্তির যাবতীয় বাসিন্দা কাজকর্ম ফেলে ভীড় করে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে উপভোগ করছে। হাততালি দিয়ে স্ফূর্তি দিচ্ছে: লাগ ভেলকি, লেগে যা। এবং নারদ নারদ বলে কলহের দেবতা নারদ ঋষিকে আহ্বান করছে।

ঘোর হয়ে এলেই এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়া। সাজগোজ সেরে মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়ল—কেউ রাস্তায়, কেউ বা দরজায়। সাহেবও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—খোঁজদার হয়ে মক্কেলের খোঁজ করে। ভাল কাজকর্ম সন্ধ্যার পর থেকেই। স্ফূর্তি-বাজ লোকে টাকা খরচা করতে বেরোয় তখন। আহা, কষ্ট করে কত আর ঘুরবে—সাহেবরাই কাজটুকু টুক করে সমাধা করে দেয়। খরচা করা নিয়ে কথা—লহমার মধ্যে সবশুদ্ধ খরচা হয়ে গেল। টাকা এবং টাকার ব্যাগটাও। মানুষজন ইদানীং নতুন চোখে দেখছে সাহেব—টাকা বয়ে বেড়ানোর মুটে এক একটা। সাহেবী পোষাক-পরা মানুষটা ঐ চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে যায়—ব্যাগের মধ্যে টাকা। শৌখিন কয়েকটি মেয়ে সুবাস ছড়িয়ে দোকানে ঢুকল—টাকা সুনিশ্চিত সকলের সঙ্গে, কে কোথায় গোপন করে রেখেছে সেই হল কথা। কপালে চন্দন স্থূলবপু একজন থপথপ করে যাচ্ছে—এই লোক নোটের তাড়া কোমরে বেঁধে নিয়েছে ঠিক। একরকম আলো ফেলে মানুষের চামড়া-মাংস ভেদ করে ভিতরের ছবি তুলে নেয়। সাহেবের চোখেও তেমনি কোন আলো থাকত—জামা-কাপড় ভেদ হয়ে টাকাপয়সা যাতে দেখতে পাওয়া যায়।

কাজকর্ম সেরেসুরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নফর তো চিরকালের মার্কা-মারা মানুষ—তাকে নিয়ে কথা নেই। কিন্তু নিশিরাত্রে সাহেব তার সঙ্গে রয়েছে, সুধামুখী

দেখতে পেলে মারমুখী হবে। মেজাজি স্ত্রীলোক কী যে করবে ঠিক ঠিকানা নেই। নিজের মাথায় বসিয়ে দেয় এক ঘা, অথবা নফরার মাথায়।

কাজ নেই সাহেব, রাতে তুই বাড়ি যাস নে। আগে এঘাটে-ওঘাটে আস্তানা ছিল, আবার তাই হোক।

দরজার পাশে সাহেবের হোগলার ঘর প্রায়ই এখন খালি পড়ে থাকে। ভোরবেলা ইস্কুলের মুখে বই-খাতা আনতে কেবল একবারটি যায়।

সুধামুখী ধরে ফেলে পথ আটকে দাঁড়াল: দিব্যি তো নিরালা ঘর—পুরানো রোগে কি জন্যে ধরল?

সাহেব বলে, গরম লাগে, ঘুমুতে পারি নে। গঙ্গার কি সুন্দর হাওয়া!

খাস কোথা রাত্রে? পয়সা কোথা পাস, না উপোস করে থাকিস?

সাহেব একগাল হেসে বলে, উপোস কোন দুঃখে করতে যাব? সন্ধ্যাবেলা গোগ্রাসে চাট্টি গিলে নেওয়া আমার ভাল লাগে না।

একটুখানি ঘুরিয়ে বলে, পয়সার অভাব কি পুরুষোত্তমবাবুরা থাকতে! রোজগার করে নিই।

এবং প্রমাণস্বরূপ পকেট উলটে টাকা-পয়সা সমস্ত ঢেলে দেয়। দেখ আছে কিনা। নিয়ে চলে যাও, সমস্ত নিয়ে যাও তুমি।

সুধামুখী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সাহেব বলে, ওদের আড়তে একটা কাজ নিয়েছি।

কিছু তো নিজের জন্য রাখলি নে।

অবহেলার ভঙ্গিতে সাহেব বলে, এসে যাবে আবার। পয়সা রোজগারের মতো সহজ কাজ আর নেই মা।

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে সুধামুখী আঁচলে বাঁধল। কী ভাবল, কে জানে! ভাবল হয়তো, করুণার সাগর পুরুষোত্তমবাবু সাহেবকে আদরের চোখে দেখছেন। সাহেবের চেহারার গুণে, সাহেবের কথাবার্তা শুনে। অঢেল টাকা-পয়সা—কোন একটি অজুহাত করে দিয়ে দিলেই হল।

বই নিয়ে সাহেব তখন ছুটে বেরিয়েছে। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল।

গরম তো কেটে গেছে সাহেব। এবারে ঘরে এসে থাক।

এখন বৃষ্টিবাদলা। হোগলার ছাউনি পড়ে গেছে একেবারে। জল মানায় না।

সুধামুখী নফরকেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে। শুধু মুখে বাপ হওয়া যায় না—

নফরকেষ্টরও তুড়ুক জবাব: লেখাতেও রয়েছে তো। ইস্কুলের খাতায় লেখা—মাস্টার-পণ্ডিতরা সাক্ষি।

বাপ হলে ছেলের সুখ-সুবিধা দেখতে হয়। ঘরের ছাউনি পচে গেছে, হোগলা দিয়ে নতুন করে ছেয়ে দাও।

নফর হা-হা করে হাসে: এই কথা! হোগলা কেন সোনা দিয়ে ছেয়ে দিলেও

ছেলে আর ঘরে থাকছে না। মন উড়ু উড়ু বাইরের টান—

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, ঘাটে মাঠে থাকতে দিয়েছিলে কেন সুধামুখী? আমি তো ছিলাম না তখন। তুমি দায়ী। আর আটকানো যাবে না, দুনিয়া চিনে ফেলেছে ছেলে।

শীতকাল সামনে। এবারে কি হবে সাহেব? ঘাটে যা কনকনে শীত—ঘরে না উঠে যাবি কোথায় দেখব।

কত শীত পড়ে দেখা যাক। ডরাই নে।

সুধামুখীর কথা সাহেব কানে নেয় না। বাইরে থাকতে থাকতে এমন হয়েছে, সেই খুপরী-ঘরে পা দিতেই কেমন যেন আতঙ্ক।

ওরে সাহেব, অসুখ করবে শীতের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে যদি পড়ে থাকিস।

সাহেব বলে, শীতকাল বলে সবাই বুঝি চাল-বেড়া দেওয়া ঘরে গিয়ে উঠেছে! রাত্তিরবেলা বড়-রাস্তার ফুটপাথগুলো ঘুরে একবার দেখে এসো। এত মানুষ বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে তো তোমার সাহেবই বা অক্ষম কিসে?

মাথায় খাসা এক মতলব এসে গেছে। তাই সাহেব অকুতোভয়। ফাঁকার মধ্যেই রাত কাটাবে সে, লেপ-বিছানা লাগবে না, অথচ ঘরে শোওয়ার চেয়ে ঢের বেশি সুখ। বলুন দেখি, কী সে ব্যাপার? হেঁয়ালির মতো ঠেকছে—

পাড়াটাই বড্ড সুখের যে! অন্য পাড়ায় হবে না। শীতকালটা আদি-গঙ্গার ধারে ধারে আরও দক্ষিণে চলে যাবে। কেওড়াতলায়। কালীক্ষেত্রের মহাশ্মশান—মায়ের দয়ায় চিতার অকুলান নেই। অহোরাত্র সারি সারি জ্বলছে। দরাজ উঠানের উপর চিতার জায়গা, চতুর্দিক ঘিরে পাকা দালান। আগুনে আগুনে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে আছে। তবু যদি শীত করে, কোন এক চিতার পাশে বোস গিয়ে। পরের খরচায় গনগনে কাঠের আগুন—হাত সেঁক, পা সেঁক। তার পরে শয্যা নাও আরাম করে দালানে বা উঠানে যে জায়গায় খুশি। কেউ কিছু বলতে যাবে না।

এমন ব্যবস্থা থাকতে কোন দুঃখে সাহেব তবে হোগলার ঘরে মাথা ঢুকাতে যাবে?

সুধামুখীর সর্বক্ষণ দুঃখ, ঘরে মন বসে না—দিনে দিনে ছেলে আমার পর হয়ে গেল।

পারুল বলে, বয়স হচ্ছে কি না। বিয়ে দিলে ঠিক উল্টো হবে দেখো। কাজকর্মে বাইরে পাঠালে ছুতোনাতায় ঘরে এসে ঢুকবে।

তারপরেই পারুলের সেই পুরানো দরবার, অনেকবার যা হয়ে গেছে।

হাঁ—বলে দাও দিদি, যোগাড়-যন্তরে লেগে যাই। সামনের ফাগুনে দুহাত এক করে দেবো। তুমি ছেলেওয়ালা—তোমার তো কিছু নয়। খরচ-খরচা হাঙ্গামা-হুজ্জুত আমার।

বলে ফিকফিক করে হাসেঃ ভাল মজা হল—ছিলে দিদি, হয়ে যাবে বেয়ান। সম্পর্ক যা-ই হোক, আমি চিরকালই তোমার ছোটবোন।

সুধামুখী সস্নেহে তাড়া দিয়ে ওঠেঃ দূর পাগলী! একেবারে ছোট মানুষ

যে ওরা। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। আমার সাহেবের হাঁড়িতে তোর মেয়ে চাল দিয়ে এসে থাকে তো নিশ্চয় তা হবে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

নাছোড়বান্দা পারুল বলে, ছোট তা কি হয়েছে! সেকালে কত ছোট ছোট বর-কনের বিয়ে হত। সে বড় মজা। আমাদের গাঁয়ে দেখেছি একজোড়া। কনে-বউয়ের পুতুলের মুণ্ডু ভেঙে গেছে বরের হাত থেকে পড়ে। বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে বউ অনর্থ করে। তারপরেও আবার শাশুড়ির কাছে গিয়ে নালিশ। বাড়ি সুদ্ধ মানুষ হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে দিদি।

স্বপ্নে মেতে আছে পারুল, তাকে নিরস্ত করা দায়। সুধামুখী বলে, আসুক তো ফাগুন মাস। কিন্তু বিয়েটা কোথায় হবে শুনি? বউ নিয়ে সাহেব কোন জায়গায় উঠবে? এখানে—এই বাড়িতে? তা যেন্না!

পারুলও বুঝি সেটা ভাবে নি! বলে, তাই কখনও হয়—ছিঃ ছিঃ। ঠিক ওপারে চেতলায় একটা ঘর দেখে এসেছি, এক্ষুনি নিয়ে নেওয়া যায়। সাহেবের আড়তের খুব কাছে হবে, আমরাও যখন তখন গিয়ে দেখে আসতে পারব। সব দিক দিয়ে সুবিধা। নিয়ে নেবো ঘরটা?

সুধামুখিও ভাবছে আলাদা জায়গায় ঘর নেবার কথা। ভাবনাটা পেয়ে বসেছে তাকে। সে ঘর চেতলায় নয়, কাছাকাছি কোনখানে নয়—এই কালীঘাটের অনেক দূরে একেবারে ভিন্ন এলাকায়। এ পাড়ার চেনা মানুষ কখনও সেদিকে যাবে না। নফরকেষ্ট নয়, কেউ নয়। জীবনের এই অধ্যায়টা আদিগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুদ্ধ-স্নিগ্ধ হয়ে সাহেবের হাত ধরে মা আর ছেলে নতুন বাসায় গিয়ে উঠবে। পুরুষেরা রাত্রিবেলা মুখ ঢেকে বিবরে এসে ঢোকে। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার সেই আগেকার মানুষ—বিবরের লীলা-খেলা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে। সারা জীবনেও ফাঁস হয় না। এমনিই তো বহু—এক-শ'র ভিতরে নব্বুই। সুধামুখীরও বা কেন হবে না?

ঠাণ্ডাবাবুর কথা: জীবন মরতে চায় না কিছুতে, মেরে ফেলা বড় কঠিন। অঙ্কুর ইট-চাপা পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল—ডালে পাতায় কেমন সবুজ সুন্দর আমগাছ ঐ চেয়ে দেখ। সকালের রোদে স্নান করে পবিত্র হয়ে পাতা ঝিলমিল করছে। সুধামুখীও ঘরে ফেরার জন্য পাগল। বাপের ঘরে ঠাঁই হবে না, ছেলের ঘরে যাবে। সাহেব, তাড়াতাড়ি তুই মানুষ হয়ে যা। ছেলে, ছেলের বউ, কাঁচ কাঁচ নাতি-নাতনি—সুধামুখী কর্ত্রী সে ঘরের। এ-পাড়ার, এবং এই জীবনের তিল পরিমাণ চিহ্ন নিয়ে যাবে না। রানী সে ঘরের বউ হবে কেমন করে? ফুলের মতন মেয়ে রানী, বড় আদরের ধন, "মাসি" "মাসি" করে সুধামুখীর কাছে ঘোরে। তা বলে নতুন সংসারে বউ হতে পারে না পারুলের কলঙ্কের ফুল।

পারুলের কথা চাপা দিয়ে দেয়: ফাগুনের ঢের দেরি, তাড়াতাড়ি কিসের?

পুরুষোত্তমবাবুর আড়তে কতক্ষণ ধরে কি কাজ—কত টাকা মাইনে দেয় না

জানি। গতিক দেখে সন্দেহ আসে, সত্যিই ঐ কাজ করে কি না। আড়ত দূরবর্তী নয়, এ-পারের ঘাট থেকেই নজরে আসে। পুল পার হয়ে সাহেবের খোঁজে খোঁজে একদিন সুধামুখী গিয়ে পড়ল সেখানে। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, নেই সাহেব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখতে পেল না। তারপর আরও ক'বার গেছে। আড়তের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না—তার সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লে চাকরে সাহেব ছোট হয়ে যাবে অন্যদের কাছে, চাকরির ক্ষতি হবে।

হঠাৎ হয়তো একদিন সাহেব সুধামুখীর ঘরের মধ্যে ঢুকে খই ছড়ানোর মতো খাটের বিছানায় পয়সাকড়ি ছড়িয়ে দেয়। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুল। ইচ্ছা মতন তাকে পাওয়া যায় না, বসে দুটো কথা বলা যায় না। নিশিরাত্রে সুধামুখী আবার আগের মতন এ-ঘাট ও-ঘাট খুঁজে বেড়ায়। কার মুখে যেন শুনতে পেয়ে একদিন সে শ্মশানে চলে এলো।

সাহেবের বড় পছন্দের জায়গা, শীতের রাত কাটানোর পক্ষে সত্যি চমৎকার। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মচ্ছব, তবু কিন্তু রাত্রি যত বাড়ে মচ্ছব, আরও যেন বেশি করে জমে। কাঁধে চড়ে চড়ে দেদার লোক এসে নামছে,—নানা অঞ্চলের নানান বয়সি পুরুষলোক স্ত্রীলোক। চিতায় চিতায় এত বড় উঠানে দুটো হাত জায়গাও খালি নেই। যমরাজের রন্ধনশালার শতেক চুল্লি একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন। বিস্তর দল ঠায় বসে আছে নতুন চিতার জায়গা নেই বলে।

একটা ভারি জাঁকের মড়া এসেছে। বিশাল খাট, ফুলের পাহাড়। যে বিছানায় শুয়ে মড়াটি শ্মশানে এসেছেন, ফুলশয্যায় লোকে এমন জিনিস পায় না। জায়গা পেয়ে অবশেষে চিতা সাজিয়ে ফেলল—সে বস্তুও চেয়ে দেখবার মতো। তিন চিতার কাঠ এনেছে বেশি মূল্যে দিয়ে। তার উপরে দশ সের চন্দন কাঠ ও এক টিন ঘি।

আর একটা শিশু ছেঁড়া-মাদুরে জড়িয়ে অনতিদূরে এনে নামাল। দুজনে নিয়ে এসেছে—একজন শ্মশানের অফিসে গেছে সৎকারের ব্যবস্থায়। আর একজন মৃত শিশুর মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে বসে। দুচোখে জল গড়াচ্ছে। খাটের মড়া ইতিমধ্যে চিতায় তুলে দিয়েছে, ফুলের গাদা এদিক-সেদিক ছড়ানো। সাহেবের কী ইচ্ছা হল—দু-হাত ভরে ছড়ানো ফুল ছেঁড়া মাদুরের উপর রাখছে।

একজন খিঁচিয়ে উঠল: কার ধন কাকে দিস—আচ্ছা ছোঁড়া রে তুই! ইচ্ছে হয়, নিজের পয়সায় ফুল কিনে দিগে যা।

সুধামুখী এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আকুল হয়ে ডাকল, সাহেব।

রাত্রিবেলা এত মৃত্যুর অন্ধিসন্ধিতে ছেলেটা পাকচক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুধামুখীর সর্বদেহ শিরশির করে। ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরল: সাহেব রে—

কে যেন কাকে বলছে, সাহেব ফিরেও তাকায় না।

সুধামুখী বলে, বাসায় চল বাবা।

এবারে সাহেব কথা বলল: হাত ছেড়ে দাও—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যা-কিছু পকেটে আছে মুঠো করে দিয়ে দিল।

আমি কি টাকা চাইতে এসেছি?

আমায় নিয়ে যেতে এসেছ। আমি যাব না।

সুধামুখী কেঁদে বলে, তোর একফোঁটা মায়ামমতা নেই সাহেব। মনে মনে তুই সন্ন্যাসী। ঘরবাড়ি ভুলেছিস। টাকা-পয়সা খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিস। কালকের খরচ বলে আধলা পয়সাও রাখলি নে। ভয় করে তোর রকমসকম দেখে।

নিশ্চিন্ত অবহেলায় সাহেব বলে, খরচ যেমন আছে, ভাঁড়ারও আমার অঢেল। পয়সাকড়ি গায়ে ফোটে, না সরালে সোয়াস্তি পাইনে।

মড়াপোড়ার দুর্গন্ধে সুধামুখী নাকে কাপড় দিয়েছে। নজর পড়তে সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে: ঘেন্না করে তো দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলেছে! কাজ হয়ে গেল, বাড়ি চলে যাও।

বলেই সে আর সেখানে নেই। প্রাঙ্গণে অগণ্য চুল্লির কোনটা দাউদাউ করছে, নিভে আসে কোনটা। সাহেব তাদের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়। বহুরূপীর মতো রং বদলাচ্ছে—চিতার আলো ঝলসে ওঠে কখনো গায়ের উপর, কখনো সে আবছা অন্ধকারের ছায়ামূর্তি। এ-দলের কাছে গিয়ে কোথায় কি করতে হবে বাতলে দিয়ে আসে, ও-দলের মধ্যে গিয়ে মড়ার পরিচয় জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোন এক চিতার পাশে বসে পড়ে হয়তো বা একটু আগুন পুইয়ে নিল। কাঠ কম দিয়েছে বলে ডোমের সঙ্গে ঝগড়া করে কোন দলের হয়ে। মড়া না সরাতেই বিছানাপত্র নিয়ে টানাটানি—একটা চেলাকাঠ তুলে ভিখারিগুলোর দিকে তাড়া করে যায়। ভারি ব্যস্তসমস্ত এখন সাহেব।

সুধামুখী থ হয়ে দেখছে। সাহেবের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কোনটাই ভাল লাগে না। সাহেব কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জোরজারি করা চলবে না এ ছেলের উপর, সত্যিকার দাবিও নেই। নিশ্বাস ফেলে সে পায়ে পায়ে ফিরে চলল।

সাহেবও এক সময় খুশি মতন একটা জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে।

আরামের ঘুম। পয়সা রোজগারের ফিকিরে কনেস্টবল এসে লাঠির গুঁতো দেয় না। ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কায় পুণ্যার্থীরাও গালিগালাজ করেন না। তবু কিন্তু এক একদিন ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে শেষরাত্রে। শ্মশানে তখন এক অদ্ভুত অভিনব চেহারা। লকলকে আগুন নিভে গিয়ে গনগন করছে চারিদিককার চিতাগুলো। শ্মশানের বাসিন্দারা সব এদিক-সেদিক পড়ে আছে—কাঁথা-মাদুর কাপড়-চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছে, মড়ার সঙ্গে যা সমস্ত বিদায় করে দেয়। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে হাতের খানিকটা বেরিয়ে আছে, কারো বা কোমরের একটুখানি। কারো পায়ের গোছা, কারো বা মাথার চুল। ক্ষীণ আলোয় মনে হবে মানুষ নয়, মড়ারাই চারিদিকে ছড়ানো। টুকরো টুকরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ কেউ নয়। যেন দৈত্য এসে পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়েগুলো ছুড়িয়ে গেছে। অথবা লড়াইয়ের শেষে মৃত সৈনিক পড়ে আছে ইতস্তত। ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো—সুধামুখীর কাছে অনেকবার যা শুনেছে সাহেব। অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অহরহ অদৃশ্য নিষ্ঠুর লড়াই চলছে—অনেককে মেরে ফেলে জন কয়েকের বিজয়োৎসব। বিজয়ীরা এই রাত্রে অট্টালিকাশিখরে উষ্ণ লেপ-গদির ভিতর

মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে।

ঠান্ডাবাবু থাকলে আরও হয়তো বলত, মহাশ্মশান কেন—গোটা দেশটারই চেহারা দেখলে সাহেব এই নিশিরাত্রে। মড়ার দেশ। সে মড়াও আস্ত নয়—টুকরো টুকরো অঙ্গ ছড়ানো।

এক দুপুরে অসময়ে ছুটতে ছুটতে নফরকেষ্ট বস্তিবাড়ি ঢুকল। এসেই বাইরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ধপাস করে বসে পড়ে।

সুধামুখী ব্যস্তসমস্ত হয়ে পিছু চলে আসেঃ কি হল ?

হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, এক গ্লাস জল দাও আগে।

ঢকঢক করে পুরো গ্লাস খেয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কতকটা সুস্থির হয়েছে। সুধামুখী বলে, কে তাড়া করল—পুলিশ না পাবলিক ?

নফরকেষ্ট বলে, বাঘ। একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম।

চিড়িয়াখানার বাঘ ডাকে, নিশিরাত্রের স্তব্ধতায় এ পাড়া থেকে সুস্পষ্ট শোনা যায়। এই কিছুদিন আগে একটা বাঘ কি গতিকে বেরিয়ে পড়েছিল খাঁচা থেকে, পথের মানুষের উপর হামলা করেছিল—

নফরকেষ্ট অধীরভাবে বলে, চিড়িয়াখানার বাঘ খাঁচায় থেকে থেকে তো বিড়ালের শামিল। এ হল আসল জন্তু, সুন্দরবনের মানুষখেকো। বন থেকে সদ্য-আমদানি।

তার পর সুধামুখীর দিকে চেয়ে সকাতরে ব্যাখ্যা করে বলে, আমার বউ।

কোথায় দেখা পেলে ?

কালীবাড়ি তীর্থধর্মে এসেছিল। বউ, নিমাইকেষ্ট আরও যেন কে কে—আমার তখন চোখ তুলে তাকাবার তাগদ নেই, এই ধরে তো এই ধরে। পাঁই-পাঁই করে ছুটেছি, খুব বেঁচে এসেছি।

ভাব দেখে সুধামুখী হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলল, সেই ব্রহ্মকবচের গুণে বোধ হয়—

নফরকেষ্ট বলে, তা সত্যি। মন আনচান-করা ব্রহ্মকবচে একেবারে আরোগ্য হয়েছে। কিন্তু বউয়ের জন্য কোন্ কবচের ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি, আমার নামেই যাতে শতেক হাত ছিটকে যায় ? আগে যেমন ছিল।

সুধামুখী খিলখিল করে হেসে বলে, কবচ হলেও পারতে যাবে কে শুনি ?

নফরকেষ্টও নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলে, কোন কবচই কিছু হবে না আর এখন। লোভে পেয়ে গেছে। আমাকে তো চায় না, চায় আমার মাইনের টাকা। মানুষটার উপর যত ঘেন্নাই হোক, ধরতে পারলে ঠিক সেই কারখানার চাকরিতে নিয়ে বসাবে। মুনাফা বিস্তর। মাস গেলে পুরো মাইনেটা হাতিয়ে দেবে—একটা মানুষের পেটে-ভাতে কত আর খরচা হয় বলো।

সন্ধ্যায় কাজে বেরিয়ে সাহেবকেও বললঃ ঘটেছে দুপুরবেলা—এখনো কিন্তু আমার বুক টিবঢিব করছে। হ্যাঙ্গামের কাজে আজ যাচ্ছিনে, সোজাসুজি যদি কিছু হয়—

দিন দুয়েক পরে আবার দেখা যায়, ভীষণ ব্যাধিতে ভুগছে সে যেন। থপথপ করে পা ফেলছে বুড়োমানুষের মতো। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ফিরে চল, সাহেব, কাজকর্ম হবে না।

কি হল ?

সেই বাঘ। ভেবেছিলাম ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। তা নয়, নিমাই চুপিসারে পিছন পিছন এসে আস্তির বস্তি দেখে গেছে। আজকে যখন বেরুচ্ছি—হাওড়া থেকে অত সকালে এসে গলির মাথায় ওত পেতে ছিল। ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে।

বিপদটা কত বড়, সাহেবের সঠিক আন্দাজ নেই। নফরের অবস্থা দেখে তবু উদ্বিগ্ন হল : তা হলে ?

শাসিয়ে গেছে, আপোসে বাসায় গিয়ে যদি না উঠি, একদিন বউ নিয়ে এসে পড়বে। কী সর্বনাশ বল দিকি। যত ভাবি, হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে আমার। এমন অবস্থায় মক্কেল ফেলা যাবে না, বিপদ ঘটে যাবে।

পরের দিন নফর বলে, আজও এসেছিল। ভেবেছিলাম, বয়স হয়েছে, আর প্যাক-ছাট মারব না, যে ক'টা দিন বাঁচি একটা জায়গায় কায়েমি হয়ে থাকব। হতে দিল না কিছুতে। কপাল বড্ড খারাপ সাহেব, ভাবি এক হয়ে যায় অন্য। নিমাই শ্বশুরকে বলে সেই পুরানো কাজ ঠিকঠাক করে ফেলেছে, ধরে নিয়ে জুতে দেবে। সারা দিনমান ফার্নেসের আগুন, রাত্রে বউ। তার মধ্যে ক'দিন বাঁচব আমি বল্।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ঢোক গিলে নিয়ে বলে, পালিয়ে যাব, না পালালে রক্ষে নেই। সুধামুখীকে কিছু বলিসনে এখন। কিন্তু নফরাকে কেউ আর কলকাতা শহরে পাচ্ছে না।

নতুন কাজের নেশায় সাহেব মেতে আছে। উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বলে, আমার কি হবে ? কারিগর না হলে খোঁজদার তো হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ।

সাহেবের দিকে নফরকেষ্ট এক নজরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে : যাবি তুই ? তোর যে কত ক্ষমতা, নিজে তুই জানিস নে—আমি সব চোখে দেখছি।

উৎসাহে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, চল তাই। সুধামুখীকে টাকা পাঠাব, টাকা পেলে সে ভাবনাচিন্তা করবে না। বাপে-বেটায় মিলে দিগ্বিজয় করে বেড়াব আমরা। আমি কারিগর তুই ডেপুটি, কখনও বা আমি ডেপুটি তুই কারিগর।

ঠিক সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটে গেল। সুধামুখীর হারমোনিয়ামের গোটা দুই রীড পালটাতে দোকানে দিয়েছে, তারা আজ না কাল করছে। মহাবীর আনতে গিয়ে এইমাত্র ফিরে এলো। ঝগড়া করতে চলেছে সুধামুখী—না হয়ে থাকলে যেমন আছে ফেরত আনবে। জরুরি দরকার। আংটিবাবু কয়েকজনকে নিয়ে গান শুনতে আসবে রাত্রে, খবর পাঠিয়েছে।

সাজগোজে থাকতে হয় এই সন্ধ্যাবেলাটা। রাগে রাগে দ্রুত পা ফেলে চলেছে, নফরের দেওয়া গয়না ঝিলিক দিচ্ছে অঙ্গ ভরে। কোন দিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে সাহেব গায়ের উপর পড়ে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ সুধামুখীর হাতে গুঁজে দিল। চাপা গলায়

বলে, অনেক টাকা—নতুন হারমোনিয়াম হয়ে যাবে। বাড়ি চলে যাও ঢেকেতুকে নিয়ে।

কি রে, কোথায় পেলি এ জিনিস ?

কিন্তু বলছে কাকে ! লহমার মধ্যে সাহেব উধাও। কোন গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়েছে। সুধামুখী ভয়ে কাঁটা। কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে ফিরল।

গঙ্গার ঘাটের সদরে যাওয়া সাহেবও আজকের দিনে অনুচিত মনে করে। আস্তির বস্তির নিজস্ব খোপে এক ফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যা-রাত্রে অনেক দিন পরে এসেছে ? আলো জ্বালে নি, অন্ধকারে পড়ে রইল। আর দু-হাতে নিজের গাল চড়াচ্ছে। জীবন নাকি মরে না, অমৃত—ঠাণ্ডাবাবুর কথা। পাতা ঝিলমিল করে পাঁচিলের ধারের ঐ আমচারা সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে নাকি ভালই হতে হবে শেষ পর্যন্ত, খারাপ হওয়া চলবে না। কী সর্বনাশ ! এই যদি নিয়ম হয়, সাহেবের তবে কী উপায় ? নিয়ম ভাঙবেই, আরও জোর করে লেগে যাবে সব গাছ-ই কি এই আমচারার মতো—পোকা ধরে পাতা ঝরে গিয়ে ডালপালা আধ-শুকনো হয়ে আছেও তো কত !

গালে চড় মেরে মেরেও বুঝি রোখ মিটল না। বই-খাতা দোয়াত-কলম আছে —এক সময় বসে অন্ধকারে কলম হাতড়ে নিয়ে খাতার উপর আঁচড় কাটতে লাগল। মনে যা সব উঠছে, লিখছে খাতায়।

কী কাণ্ড এই কতক্ষণ আগে ! ট্রাম-রাস্তার উপর মস্ত বড় এক পোশাকের দোকানে সাহেব ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টও আছে—অনেকটা দূরে, একেবারে আলাদা। কেউ কাউকে জম্মে চেনে না এই রকমের ভাব। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় ও অতিরিক্ত রাঙা বলে কাজের সময়টা নফরের নীল চশমা চোখে। অঙ্গে ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা। এ-ও তার আপিসের পোশাক—এক এক অফিসে এক এক রকম। কাজ অন্তে এ সমস্ত খুলে পাট করে রেখে আট-হাতি ধুতি পরে মহানন্দে বিড়ি ধরাবে।

বাচ্চাদের পোশাক যে দিকটায়, সেখানে বড়ঘরের এক বউ। দুর্গা-প্রতিমার মতো চেহারা, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। মোমের পুতুলের মতো একটা ছোট মেয়ে বউয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে—এই মা'র মেয়ে সেটা বলে দিতে হয় না। এক ডাঁই পোশাক-আশাক নামিয়ে নিয়েছে, আরও নামাচ্ছে। মেয়ের জন্য পোশাক পছন্দ করেছে মা—বিষম খুঁতখুঁতে, পছন্দ কিছুতে আর হয় না। দোকানের দুটো ছোকরা আর এই বউটি—তিনজনে হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণের বিস্তর রকমের চেষ্টার পরে একটি জামা অবশেষে মেয়ের গায়ে পরাল। বাচ্চা মেয়ের রূপের বাহার এক-শ গুণ হয়ে ফুটল এক পলকে ঃ ছিল পদ্মকলি, পোশাক পরে যেন শতদল হয়ে পাঁপড়ি মেলল।

এমনি সময় সাহেব। ফুটফুটে ছেলে মুখ চুন করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেয়ে বউ হাত নেড়ে কাছে ডাকে। শতেক পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে ঃ কার সঙ্গে কোথায় থাকে, কে কে আছে তার, ইস্কুলে পড়াশুনা করে কি না। সাহেবও

তেমনি—বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব। নানাবিধ দুঃখের বৃত্তান্ত। বলতে বলতে জল এসে যায় চোখে। দরকার মতন এই জল নিয়ে আসা খেটেখুটে অভ্যাস করতে হয়। আর এইসব লাগসই গল্প বানানো। সাহেবের দেখাদেখি বউয়ের চোখেও জল এসে গেছে, দু-ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। কেল্লা ফতে—যা চেয়েছিল ঠিক তাই। ছেলেটার হাতে কিছু দেবে বলে বউ ব্যাগ খুঁজছে! কোথায় ব্যাগ? ব্যাগ ইতিমধ্যে লোপাট। সময় বুঝে সাহেব বাঁ-হাতের আঙুল তুলে কান চুলকে ছিল একবার। তার মানে বউঠাকরুনের বাঁ-দিকে দোকানের কাউণ্টারে বস্তুটি পড়ে আছে। খোঁজদারের কাজ এই অবধি। সে শুধু জানিয়ে দেবে মাল কোনখানটায় আছে এবং মক্কেলকে অন্যমনস্ক করে রাখবে। খবর বুঝে নফরকেষ্ট জামা দেখতে দেখতে এই দিকে এসে হাতের খেলা দেখিয়ে সরে পড়েছে। হিসাব-করা নিখুঁত কাজকর্ম, এক তিল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন। গোলমালটা তারপরেই। খোঁজ দেওয়ার পরেই খোঁজদার সরে পড়বে, এই হল বিধি। বউ ব্যাকুল হয়ে ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করছে, সাহেব কি দেখে সামনের উপর অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে? যে জামা গায়ে পরানো হয়েছে, ছোট মেয়ে কিছুতে তা খুলতে দেবে না। বউয়ের চোখে আবার জল এসে যায়—বড্ড প্যানপেনে তো বউটা! ভাল ঘরের নরম মনের মেয়ে—কে জানে, সাহেবের আসল মা-ও হয়তো এমনিধারা রাজরানী একটি। বউ দোকানের ছোকরাকে বলছে, কী করি আমি এখন! ট্যাক্সি করে না হয় বাড়ি ফিরলাম, বাড়ি গিয়ে ট্যাক্সি-ভাড়া দেব। আমার ডলির জন্মদিন আজ। পাঁচ ফুলের ডাল-ধোওয়া জলে চান করিয়ে দিলাম—সকলের আশীর্বাদ নিয়ে হাসিখুশি থাকতে হয় এই দিনটা, আনন্দ করতে হয়। আমার ভাইয়ের মেয়ের জামা পরে এসেছে—আপনাদের দোকানের তৈরি। মেয়ে বায়না ধরল, তারও ঠিক সেই জামা চাই। ভাবলাম, যাই, কতক্ষণ আর লাগবে। সাধ করে চাইল, না পেলে মুখভার করে বেড়াবে, সে হয় না। তা দেখুন, উল্টো হয়ে গেল—ছেলেমানুষের গায়ে পরিয়ে আবার খুলে নেওয়া, ওরা তো বোঝে না। আপনারাই বা কী করতে পারেন!

ভারী গলায় বলল বউটি। সাহেব হাত দিয়ে দেখে তারও চোখ ভিজে-ভিজে। কী কেলেঙ্কারি—শুনলে নফরকেষ্ট হেসে খুন হবে। যে শুনবে, সেই ছি-ছি করবে। কাজের দরকারে চোখে জল আনবে, তা বলে বেদরকারে আপনা-আপনি এসে পড়বে, এমন বেয়াড়া মন নিয়ে কাজকর্ম হয় কি করে? আর বুঝি দেখতে পারে না সাহেব, ছুটে বেরুল। এমনি করে বেরুনো ঘোরতর অন্যায়, সকলে তাকিয়ে পড়ে।

এক-ছুটে চলে গেল তাদের সেই জায়গাটিতে। নালা-পুকুর বুজিয়ে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল সাফসাফাই করে নতুন রাস্তা হচ্ছে, ড্রেনের পাইপ বসবার জন্য মাটি তুলে পাহাড় করেছে, তারই পাশে একটা নারিকেলগাছ নিশানা।

টাকায় ঠাসা ব্যাগ, নফরকেষ্টর মুখে হাসি ধরে না। ছুটে এসে সাহেব হাত বাড়িয়ে বলে, দাও—

টাকা বের করে সাহেবের সামনেই গুণেগেঁথে তার খোঁজদারির বখরা দেবে,সুকর্মের

পারিতোষিক হিসাবে বাড়তিও দেবে কিছু—কিন্তু তার আগেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব দৌড় দিল।

আবার এক অনুচিত কাজ। ব্যাগ নিয়ে পোশাকের দোকানে ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টর সেই যে গল্প—নোটের তাড়া তুলে নিয়ে ধরা পড়ে গেছে; যে ধরেছে তারই পকেটে নোটগুলো ফেলেছে আবার। সাহেবও কোন রকম কায়দা করে যার ব্যাগ তাকে দিয়ে আসবে।

কিন্তু গিয়ে পড়ে তুমুল কাণ্ড। কোথায় বা সেই বউ, আর কোথায় সেই ডলি নামের মেয়ে! দোকানের মানুষজন হৈ-হৈ করে ওঠেঃ আবার এসেছে। এরই কাজ। ধরো ছোড়াটাকে—

রে-রে—করে ধরতে আসে। সাহেবের সুন্দর চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। একবার দেখলে আর ভোলবার জো নেই। দৌড়, দৌড়—

ভাবছে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি? লাভ নেই, পিছনে ছোটা তা হলেও বন্ধ করবে না। মাঝে থেকে টাকাগুলো নষ্ট। একরাশ টাকা, সুধামুখী নতুন হারমোনিয়াম কিনব কিনব করছে কত দিন থেকে—

আংটিবাবুরা গান শুনে অনেক রাত্রে চলে গেল। পারুলের হারমোনিয়ামটা এনে কাজ চালিয়েছে। তারপর নফরকেষ্ট যথারীতি এসে পড়ল। টুলের উপর চেপে বসে বউয়ের গল্প শুরু করে দেয়। বলে, বাঘে হামলা দিয়ে ফেরে, সেই অবস্থাটা চলছে এখন সুধামুখী। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন সময় না-জানি টুঁটি চেপে ধরবে।

এই পর্যন্ত—। হুঙ্কার দিয়ে সুধামুখীই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘই বটে এই রোগাপটকা অস্থিসার রমণী। নফরকে বাঘে ধরেছে। লম্বা চুলে-ফাঁপানো এলবার্ট-টেড়ি, রাত্রে এই বিশ্রামের সময় বাবু নফরকেষ্ট কিঞ্চিৎ বাহার করে আসে। মুঠো করে ধরেছে সেই চুল—

ছেলেকে তোমার পথে নামিয়েছ?

ঠাস-ঠাস করে চড়। হঠাৎ সুধামুখী হাউ-হাউ করে কেঁদে হাত-পা ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েঃ ছেলে নিয়ে আমার যে কত সাধ! লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, দশের একজন হবে। সে ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকে এখন।

কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে। বারম্বার বলে, সর্বনাশ করেছ তুমি। ছেলে আমার কাছ থেকে কেড়ে তোমার পথে নিয়ে নিলে।

চড় খেয়ে নফরারও মেজাজ চড়েছে। বলে, কাঙালি-ভিখারির মতন চাল কুড়াত—তার চেয়ে খারাপ এ পথ?

সুধামুখী উঠে বসে বলে, মন্দ পথ, অধর্মের পথ—

নফরকেষ্ট বলে, তুমি বলো ছেলে তোমার, আমি বলি ছেলে আমার—আমাদের ঘর থেকে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বেরুবে, এই তোমার আশা? ঘেঁটুবনে চাঁপাফুল ফুটবে?

সুধামুখী বলে, ছেলে আমারও নয়, অন্য লোকের—

কথা শেষ করতে না দিয়ে নফরকেষ্ট তিক্ত স্বরে বলে, যাদের ছেলে তারা হল বড়-ঘরের অসতী মেয়ে আর বড়ঘরের বদমায়েস পুরুষ। তারা আমাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের সোজা কথাবার্তা, স্পষ্টাস্পষ্টি কাজকর্ম। তাদের বাইরে ভড়ং, ভিতরে ইতরামি—

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে—মাথার এলবার্ট-টেড়ি ভেঙে গিয়েছে, পকেটের চিরুনি বের করে নফরকেষ্ট টেড়ি কাটতে লাগল। সুধামুখী রান্নাঘরে গেছে। ভাত বেড়ে ফিরে এসে দেখে নফরকেষ্ট নেই।

ক্ষুধার্ত মানুষটা কোনদিকে গেল—হেরিকেন হাতে নিয়ে সুধামুখী খোঁজাখুঁজি করছে। সাহেবের খোপের কাছে এসে দেখে দরজা হা-হা করছে। হয়তো বা ঐখানে পড়ে আছে রাগ করে—

কেউ নেই ভিতরে। সাহেবের ক'টা কাপড়-জামা টাঙানো থাকে, তা-ও নেই।

নজর পড়ল, খাতা খোলা রয়েছে, কলমটা এক পাশে। হিজিবিজি অক্ষর খাতার পাতায়। সাহেব লিখে গেছে আত্মগ্লানির কথা: আমি ভালো, আমার কিছু হবে না। কেন ভালো হলাম? হে মা-কালী, আমায় মন্দ করে দাও। খুব মন্দ হই যেন আমি—

ছয়

রাত্রিবেলা মেলগাড়ি হু-হু করে ছুটেছে। মাঝের জংশন-স্টেশন থেকে মধুসূদন মা-বউ আর বাচ্চাছেলে নিয়ে উঠল। জুড়নপুরে সাহেব ঘুমন্ত আশালতার গায়ের গয়না চুরি করল, এই বাচ্চা তখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। এ সময় মাস পাঁচ-ছয় বয়স।

রোগা মানুষ মধুসূদন, কিন্তু অশেষ করিতকর্মা। মানুষ তুলে দিয়ে মালপত্তর গুণে গুণে তুলে সর্বশেষ নিজে উঠল। কামরার চতুর্দিকে মুহূর্তকাল নিরীক্ষণ করে দেখে। মাল ও মানুষ কোথায় কি ভাবে খাপ খাওয়াবে, মনে মনে তার নক্সা ছকে নিল। মা-কে বলে, ঐ কোণের বেঞ্চিটা নিয়ে নিলাম আমরা। দিব্যি নিরিবিলি। চলো—

আগে আগে চলল সে নিজে। ঐ তো তালপাতার সেপাই—একে ডিঙিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বোঁচকাবুচকি টিনের সুটকেস গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ঘাড়ে তুলে ও হাতে ঝুলিয়ে টুক টুক করে পছন্দ-করা জায়গায় এনে ফেলছে। গোটা বেঞ্চিখানায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে বলে, বসে পড় এইবার।

বউকে বলে, বাচ্চা কোলে কেন? ঐ কোণে শুইয়ে দাও। যত বেশি জায়গা জুড়ে নিতে পার এই সময়।

মালপত্র কোনটা বেঞ্চির তলে ঢুকিয়ে কোন কোনটা বাঙ্কের উপর তুলে দিয়ে লহমার মধ্যে গোছগাছ করে ফেলে। বউয়ের উপর খি*চিয়ে উঠল ঃ ওকি, হাত-পা গুটিয়ে অমনধারা কেন? গা-গতর ছড়িয়ে জায়গা নাও। এখন এই ফাঁকা দেখছ, এমন থাকবে না, তালতলা স্টেশনে গিয়ে বুঝবে ঠেলা। কালীপুজো গেছে কাল—পুজো দেখে কালীর মেলা সেরে মানুষজন ফিরে যাচ্ছে। কামরায় সর্ষে ফেলার জায়গা থাকবে না দেখো। বললাম যে জগদ্ধাত্রীপুজোটা কাটিয়ে যাই। মামারাও কত বলল। তা মা'র হয়েছে—একটা জায়গায় যাবার বেলা যেমন, আসার বেলাও তাই। রোখ চেপে গেলে আর রক্ষে নেই।

মধুসূদনের মা বলে ওঠেন, কর্তার ঐ অচল অবস্থা, মেয়ে দুটো পড়ে রয়েছে—মন ব্যস্ত হয় না! তোমার কি, চর্বা-চোষ্য খাওয়া আর রাজা-উজির মারতে পেলেই হল।

দিদিমাকে দেখতে মধুসূদনরা মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিল, ফিরছে এখন। মধুর মা নিজেই বুড়ো মানুষ—তাঁর মা একেবারে খুনখুনে হয়ে পড়েছেন—কবে আছেন কবে নেই। নাতি মধুসূদনের ছেলেকে একটিবার তিনি চোখে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সঙ্গে নিজের মেয়ে মধুর মা'কে দেখাও হয়ে গেল। মধুর বাপ, পক্ষাঘাতের রোগি, নড়তে চড়তে পারেন না, তিনি রয়ে গেলেন জুড়নপুরে। আশালতা শান্তিলতা দু-বোনও বাপের সঙ্গে। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে পথে বেরুনো ঠিক নয়। তা ছাড়া বোন দুটোও চলে এলে শয্যাশায়ী মানুষটাকে দেখে কে? মাত্র আটটা দশটা দিন থেকে সেই জন্যেই আরও তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরা।

বলেছে ঠিক, মধুসূদন খবরাখবর রাখে। তালতলার কাছাকাছি জঙ্গলবাড়ির শ্মশানকালী বড় জাগ্রত। কালীপুজোর সাতদিন আগে থেকে শ্মশানক্ষেত্রে মেলা বসে। পুজো অন্তে আজ সকাল থেকেই মানুষ ঘরে ফিরতে লেগেছে। পায়ে হে*টে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয়, ট্রেনে। মেলগাড়ি তালতলা স্টেশনে না পে*ছিতেই তুমুল হৈ-চৈ কানে আসে। দাঙ্গাই বেধে গেছে হয়তো বা প্লাটফরমের উপর।

মায়ের পাশটিতে মধুসূদন নির্বিঘ্ন জায়গা নিয়ে বসেছে। ঝিনুনিও এসেছিল একটু। গণ্ডগোলের সাড়া পেয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে। কামরার দেয়ালে লেখা ঃ বত্রিশ জন বসিবেক। তাড়াতাড়ি মানুষগুলো গণে নেয়। ছোট-বড়য় মিলে তেইশ। পুনশ্চ গণে নিঃসংশয় হয়, তেইশই বটে। তিন লাফে তখন দরজায় গিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গেছে। বন্যাস্রোতের মতন লোক এসে দরজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামরার ভিতর থেকে মধুসূদন বীর-মূর্তিতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। বলে খুলে দিচ্ছি—চলে আসুন। মোটমাট নয়জন। তেইশ আর বত্রিশ। তার উপরে আধখানা নয়। আধখানা কি, একটা কড়ে-আঙুল অবধি ঢোকাতে দিচ্ছিনে। আইন মোতাবেক কাজ।

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রক্তাম্বরধারী দীর্ঘদেহ একজন—কালীভক্ত মানুষ সেটা আর বলে দিতে হয় না—জঙ্গলবাড়ি কালীর মেলা থেকেই ফিরছেন। দরজার সামনে

এসে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছেন, যেতে হবে যে ভাই দুয়োরটা ছাড়।

মধুসূদন বলে, জায়গা নেই, বত্রিশ পুরে গেছে।

সাধু-মানুষটি হেসে বলেন, আমায় নিয়ে তেত্রিশ হবে। হয়ে যাবে একরকম করে। আমি আর কতটুকু জায়গা নেব। হয় কিনা, দেখিই না উঠে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে ওঠে ঃ দেখবে কী আবার ? লেখা রয়েছে বত্রিশ।

আমি যে যাবই ভাই—

বে-আইনি করে ?

রক্তাম্বর সাধু ঝকঝকে দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলেন, তুমি বুঝি আইনের বাইরে যাও না কখনও ? আমি যাই। যারা আইন করে তারাও যায়।

বচসার মধ্যে মধুর মা ওদিকে ভীত স্বরে চেঁচাচ্ছেন ঃ ওরে মধু, চলে আয় তুই। তোর তো জায়গা রয়েছে, চুপচাপ এসে বসে পড়। একবার গোঁয়ার্তুমি করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, কোনরকমে প্রাণরক্ষে হয়েছে—

গর্জে উঠে মধুসূদন মায়ের কথা ডুবিয়ে দেয় ঃ প্রাণ যায় যাবে, সে মরণে পুণ্যি আছে। লোকে বলবে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে মরেছে।

রক্তাম্বর ইতিমধ্যে পাদানির উপর উঠে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কামরার অবস্থা দেখছেন।

মধুসূদন ব্যঙ্গস্বরে বলে, ঐ উঁকি পর্যন্ত। তার উপরে হবে না। আমি থাকতে নয়। দেখই না হয় একবার চেষ্টা করে। তার চেয়ে গাড়ি ছাড়বার আগে অন্য কোনখানে চেষ্টা দেখগে।

ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তাঁকে। হঠাৎ সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। সাধুটি বাঁ-হাত আলগোছে রাখলেন মধুর গায়ের উপর। জোর করে সরিয়ে দিলেন, এমন কথা কেউ বলবে না। মন্ত্রবলে মধু আপনিই যেন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে তাকাচ্ছে ঃ এত শক্তি ধরে কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মতো সরু ঐ আঙুলগুলো।

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে কামরায় ঢুকে পড়ে মধুকে বললেন, জায়গায় গিয়ে বোসোগে। সবাই যাবে, একলা তোমার গেলে তো হবে না। এই ট্রেনে না গেলে প্লাটফরমে পড়ে সারারাত মশার কামড় খেতে হবে। পরের ট্রেন কাল দুপুরবেলা।

দরজা একেবারে মুক্ত করে দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, কম্পেটমেন্টে আরও বারো-চোদ্দ জনের জায়গা হয়। চলে আসুন, পয়লা ঘণ্টা দিয়েছে।

মধুসূদন হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে সাধু স্নিগ্ধস্বরে প্রবোধ দেন ঃ অমনধারা করে না—ছিঃ! খুলনা অবধি যাওয়া নিয়ে ব্যাপার। তারপরে এ কামরা তোমারও নয়, আমারও নয়। ক-ঘণ্টার মামলা, তার জন্যে এমন মারমুখি কেন ভাই।

দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে এক দঙ্গল ঢুকে পড়ল। পরের লোক এসে বেঞ্চিতে বসে পড়ছে, রক্তাম্বর নিজে কিন্তু জায়গা কাড়াকাড়ির মধ্যে গেলেন না। বাক্স বোঝাই জিনিষপত্র, তারই কতক ঠেলেঠুলে কায়ক্লেশে একজনের মতো একটু

জায়গা হল। রক্তাম্বর বাঙ্কের উপর উঠে গেলেন। মধুর মা-বউ বসেছেন, তাঁদেরই প্রায় মাথার উপরে।

সমস্ত হল। কিন্তু দ্বাররক্ষী মধুসূদনেরই বিপদ এখন। মায়ের পাশে যেখানটা সে বসেছিল, ছুটোছুটি করে নতুন এক ছোকরা সেই জায়গায় এসে বসে পড়েছে।

মধুসূদন হুঙ্কার দিয়ে পড়েঃ উঠে পড়ুন। আমার জায়গা এটা।

রণে পরাজিত মধুকে কে পোঁছে এখন! সেই ছোকরা খানিকক্ষণ তো কানেই শুনতে পায় না। বলে, জায়গাটা কি কিনে রেখে গেছেন মশায়?

মধুসূদন বলে, জায়গা ছেড়ে দরজায় চলে গেলাম সকলের উপকার হবে বলে।

উত্তম করলেন, পরের উপকারে পুণ্যি হয়। পরকে বসতে দিতে নিজে দাঁড়িয়ে কষ্ট করুন, আরও পুণ্যি। গাড়ি এখন স্টেশনে স্টেশনে থামবে, আপনি বরঞ্চ দুয়োর আটকে লোক খেদিয়ে সারা রাত পুণ্যি সঞ্চয় করুন। বসতে যাবেন কি জন্যে?

এই নিয়ে আবার একদফা জমে উঠেছে, ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধের ব্যাপার। ঠিক সামনের বেঞ্চিতে সাহেব আর নফরকেষ্ট। নফরকেষ্টর আপিসের পোষাক—ধবধবে জামা-কাপড়, চোখে নীলচশমা। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের জায়গা করে দেয়ঃ বসুন আপনি। সত্যিই তো, আপনার একার কিছু নয়—সকলের জন্য লড়তে গিয়েছিলেন।

মধুর মা চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে সাহেবের দিকে। দেবতার মতো রূপবান ছেলের বিনয় ও বিবেচনা দেখে গলে গেছেন একেবারে। বাধা দিয়ে বললেন, সে হয় না। জায়গা ছেড়ে দিচ্ছ, তোমাকেও তো বাছা এত পথ তাহলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মধুর হকের জায়গা অন্য একজনে জুড়ে বসে রইল, সে তো একবার নড়ে বসে না। তুমি তবে কি জন্যে উঠতে যাবে। বসে থাক যেমন আছ।

সাহেব হাসে। সরু সরু সাদা দাঁত। ছেলেপুলের দুধে-দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলতে হয়, এর বদলে তোমার দাঁত দিও ইঁদুরঃ নতুন দাঁত যেন ইঁদুরের মতো হয়। সাহেবের সেই ইদুরের দাঁত। ক্ষুদে ক্ষুদে দুই পাটি দাঁতের অপরূপ হাসি—ঐ হাসি দেখেই মানুষের আরও বেশি টান পড়ে।

হেসে সাহেব বলে, বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে মা, একটুখানি দাঁড়াই। শরীর টান টান করে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে কাল রাত্তির থেকে। বসে রাত কাটানো পোষাবে না আমার। শুতে হবে।

সাহেব বাঙ্কের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে এইবার কথাবার্তার ফুরসত। উপর থেকে রক্তবসন সাধুটি মধুসূদনের কপালে ক্ষতচিহ্নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, কী হয়েছিল ভাই?

মৃদু হেসে মধুসূদন বলে, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞাসা করবে। লুকোবার জো নেই।

তোমার ফাটা কপাল হাজার লোকের মধ্যে থাকলেও নজরে পড়ে।

মধুসূদন গর্বিত কণ্ঠে বলে, ফাটা কপাল নয়, জয়তিলক। কপালের উপর পাকা হয়ে লেখা আছে। সরকারি লোকের উপর চড়াও হয়েছিলাম। হাটে মানুষ

গিজগিজ করছে, তারই ভিতর। বাঙালিকে ভীরু বলে—অপবাদটা খণ্ডন করলাম।

কানাইলাল-ক্ষুদিরামের পর কেউ বাঙালিকে ভীরু বলে না নিতান্ত নিন্দুকে আর শত্রুপক্ষ ছাড়া। কৌতূহলে রক্তাম্বর নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেনঃ সরকারি লোক হাটের ভিতর গিয়ে কি করছিল ?

হাত-মুখ নেড়ে সেই বীরত্ব মধুসূদন সবিস্তারে বর্ণনা করে। সরকারি লোক মানে চৌকিদার। হাটের মালিক যথারীতি তোলা তুলে যায়, তারপরে চৌকিদারেরা জুটে চৌকিদারী তোলে। সুপারি একটা, পানপাতা দুটো, কাঁচালঙ্কা দুগণ্ডা, চিংড়ি-পুঁটি এক এক মুঠো, মুলো একটা, পালং একআঁটি, টো-ব্যাপারি যত আছে কারও একপয়সা কারও আধপয়সা—এমনি হল রেট। হাটের সময়টা চারিপাশের গ্রামের পাঁচ-সাতটা চৌকিদার কাক-চিলের মতো পড়ে চৌকিদারি তুলতে লেগে যায়। পরে সমস্ত এক জায়গায় নিয়ে বখরা করে। এক বুড়ো সেদিন গোটা পাঁচেক অকালের বাতাবিলেবু নিয়ে বসেছে—তারই একটা ধরেছে এসে। বুড়ো দেবে না, চৌকিদারও ছাড়বে না। টানাটানি, কাড়াকাড়ি। চৌকিদারের ছিল লম্বা দাড়ি—

কথার মাঝে নিজের বুক ঠুকে মধুসূদন বলে, এই যে মানুষটা দেখছ, অন্যায় কিছু চোখে পড়লেই মাথার মধ্যে চনমন করে ওঠে।

রক্তাম্বর মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করেনঃ কম বুদ্ধির লক্ষণ।

মধুসূদন কানেও নিল না। তেমনি দম্ভ ভরে বলে যাচ্ছে, চৌকিদারের দাড়ি ধরে পাক দিয়ে শুইয়ে ফেললাম। তারপরেই কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড। রে-রে—করে চতুর্দিক থেকে ছুটেছে। মারগুতোন শুরু হয়ে গেল—যাকে বলে হাটুরে-মার। কিল-চড়-ঘুষি—যে যতদূর কায়দার পায়, মেরে নিচ্ছে। মেরে হাতের সুখ করে।

চৌকিদারকে ?

উঁহু, তার কোমরে যে সরকারি চাপরাশ। সরকারী লোক মারার তাগত কি যার-তার থাকে। মারেছে আমাকে। হাটের মাঝে এক তালগাছ—রাগ না চণ্ডাল, সেই তালের গুঁড়ির উপর নিয়ে আমার মাথা ঠুকতে লাগল। আমি সেসব কিছু জানিনে, জ্ঞান হল হাসপাতালে গিয়ে।

রক্তাম্বর বলেন, কিন্তু রাগটা তোমার উপর কেন ? তুমি তো সকলের ভাল করতে গিয়েছিলে।

আজকেও তো তাই, বসবার জায়গাটা অবধি বেদখল। পরে যেটা শুনলাম—গ্রাম পাহারা দেয় বলে পাবলিকেই চৌকিদারি আদায় করতে বলেছে। অন্যায়টা আসলে চৌকিদারের নয়, প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েতের। সদর থেকে চৌকিদারের মাইনে আসে, প্রেসিডেণ্ট সেটা মেরে দেন। হুকুম আছেঃ এলাকার ভিতর থেকে বন্দোবস্ত করে নাওগে। উল্টে চৌকিদারই প্রেসিডেণ্টকে দিয়ে থাকে কিছু কিছু, নইলে চাকরি বজায় থাকে না। তা প্রেসিডেণ্ট মশায় থাকেন দোতলা পাকা-দালানে, হাতের মাথায় পাই কেমন করে তাঁকে ?

একটু থেমে দম নিয়ে মধুসূদন বলে, তবে কথা একই—চৌকিদারের দাড়ি ধরে

প্রেসিডেন্টের দাড়ি ধরাই হয়ে গেল। সবাই সরকারি লোক। প্রেসিডেন্ট বলে কেন, লাটসাহেবের দাড়ি—এমন কি, সমুদ্র-পারে ভারত-সম্রাটের অবধি দাড়ি ধরা হয়েছে। হয়েছে কিনা বলো ?

সম্রাটের দাড়ি ধরে এসেছে—সেই আত্মপ্রসাদে মধুসূদন চারিদিক তাকিয়ে চোখের তারা বিঘূর্ণিত করছে, আর দ্রুতবেগে পা দোলাচ্ছে।

কতক্ষণ কাটল। মেলগাড়ি সড়াক-সড়াক করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায়। শিকল ধরে সাহেব তেমনি ঝুল খেয়ে আছে। চোখ বুঁজে আসে ক্ষণে ক্ষণে, মাথা কাত হয়ে পড়ে।

নজর পড়ে মধুসূদনের মা চুকচুক করেন ঃ দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছ বাছা, পড়ে যাবে যে !

লজ্জা পেয়ে চোখ মেলে সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে বললাম মা, কাল রাত্তির থেকেই ধকল যাচ্ছে। চোখ ভেঙে আসছে ! না শুয়ে উপায় নেই দেখছি।

মা অবাক হয়ে বলেন, বসতে না পেয়ে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোথায় শোবে তুমি ?

সাহেব হেসে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা না থাক, শোওয়ার তো অঢেল জায়গা।

শোবারই ব্যবস্থা করে নিল সাহেব। একদিকের বেঞ্চিতে পাশাপাশি মধুসূদন আর নফরকেষ্ট, উল্টো দিকে মধুর মা বউ আর বাচ্চা-ছেলেটা। দুই বেঞ্চির ফাঁকে মেজের কাঠের উপর সটান সে শুয়ে পড়ল। গায়ে জামা—শীতের আমেজ বলে সাহেব জামাসুদ্ধ শুয়েছে। মোটা সুতির চেক-কাটা চাদর কাঁধে ছিল, শুয়ে পড়ে গায়ের উপর চাপাল সেটা।

মধুর মা বলেন, পায়ের কাছে এ কেমন শোওয়ার ছিরি !

সাহেব বলে, আপনার পা গায়ে লাগবে, সে তো আশীর্বাদ আমার মা।

এমন সুন্দর কথা বলে ছেলেটা—পা একটু গুটিয়ে নিলেন মধুর মা। বেঞ্চির একেবারে কোণটায় বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে বালিশ ঘিরে দিয়েছে, তার এদিকে বউটা গুটি-সুটি হয়ে পড়ে ! ঘুমিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। সামনা-সামনি বসে মধুসূদনও এক-একবার ঢুলে পড়ে, নড়েচড়ে চোখ রগড়ে খাড়া হয়ে বসে আবার। আর নীল চশমার অন্তরালে, নফরকেষ্টর চোখ বন্ধ কি খোলা, বোঝার উপায় নেই।

দুলছে গাড়ি। খট-খট খটাখট। লোহার পাটির উপর দিয়ে ছুটছে খুব জোরে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে জোনাকিপুঞ্জ গাছে গাছে যেন তারা হয়ে ফুটে আছে। কিন্তু দেখছে কে এত সব ! কামরার সমস্ত মানুষ, বসে হোক আর দাঁড়িয়েই হোক, চোখ বুজে রয়েছে। জগৎ-সংসার এখন আর চেয়ে দেখবে না, যেন প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ একবার নফরকেষ্ট ডেকে ওঠে ঃ ওরে খোকা !

সাহেব নয়, আদি-নাম গণেশও না। এমনি সব ক্ষেত্রে নতুন নামে ডাকবার বিধি। 'খোকা' নাম বুড়ো হয়ে গেলেও চলে। বিশেষ করে, বাপের যে দাবিদার, সেই মানুষের মুখে।

চোখ খুলে মধুর মা বলেন, অকাতরে ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকাডাকি কর কেন?

গাড়িতে উঠবার আগে গা-বমিবমি করছিল। এখন কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

মধুর মা চটে গিয়ে বলেন, বলিহারি তোমার আক্কেল! বমি যদি আসে, ডেকে তুলতে হবে না। আপনি উঠে বসবে। দেখতে পাচ্ছি, বড্ড হিংসুটে মানুষ তুমি। বসে বসে নিজের ঘুম হচ্ছে না, ওকেও তাই ঘুমুতে দেবে না। কী হয় তোমার?

নফরকেষ্ট বল্লে, ছেলে।

চমক খেয়ে মধুর মা তাকিয়ে পড়লেন তার দিকে: কেমন ছেলে তোমার?

সকলের যেমন হয়। পাশের মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, আপনার ছেলে যেমন ইনি।

ডেকে ডেকে ছেলেকে জ্বালাতন কর কেন? অসুখের কথা বললে, চুপচাপ তবে ঘুমুতে দাও। চোখ বুজে নিজেও বরঞ্চ ঘুমানোর চেষ্টা দেখ।

ব্যাপারটা নফরকেষ্ট যেন আগে খেয়াল করেনি, বুঝে দেখে বিষম অপ্রতিভ হয়েছে। তেমনিভাবে বলে, উতলা হয়ে পড়েছি কিনা, ছেলেটার মা নেই। আপনি ঠিক বলেছেন। ডাকাডাকি করব না, আরাম করে ঘুমোক।

গায়ের উপরের চাদর জায়গায় জায়গায় সরে গেছে। নফরকেষ্ট পরিপাটি করে ঢেকে দেয়। বেঞ্চির তলায় মধুসূদনের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ—সাহেবকে ঢাকা দিতে গিয়ে সে বস্তুটাও চাপা পড়ে যায় চাদরের নিচে।

কাল রাত্রেও গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে এক ব্যাপার। যখন যে ফ্যাশান ওঠে। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে বেড়ানোর রেওয়াজটা বড় বেশি আজকাল। হাতে দু-চার পয়সা হলেই লোকে ঐ ব্যাগ একটা কিনে ফেলবে।

কালীঘাটে, এমন কি কলকাতা শহরের উপরও নয়—আপাতত রেলের কাজ ধরবে, নফরকেষ্টরা ঠিক করে বেরিয়েছে। অতএব সকালবেলা দু-জনে চাঁদনির এক দোকানে গিয়ে ঢুকল।

মালে চাইনে, দামে সস্তা—এমনি জিনিস মশায় হপ্তা পরে খতম হলেও ক্ষতি নেই। দেখতে খুব চমকদার হবে।

অভিজ্ঞ দোকানদার ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। প্রীতি-উপহারের মাল। বাজার বুঝে সব রকম আমাদের রাখতে হয়। ঘর-ব্যাভারি থাকে, প্রীতি-উপহারও থাকে। যেমন ইচ্ছা নিয়ে নিন।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগ কিনে জঞ্জালে ভরতি করছে। যথোচিত ভারী হয় না দেখে রাস্তা থেকে গোটা কয়েক পাথুরে খোয়া নিয়ে ভিতরে ঢুকাল। বাবু নফরকেষ্ট এবং তস্য পুত্র শ্রীমান গণেশচন্দ্র নগদ টাকায় টিকিট কেটে চলেছে দেশভ্রমণে। নফরের হাতে ব্যাগ, বাড়তি দু-চারটে জিনিস চেক-কাটা চাদরে সাহেব পুঁটলি করে নিয়েছে।

গাড়িতে উঠে সাহেব জানলায় মুখ দিয়ে বাইরের শোভা দেখছে। নফরকেষ্ট ভিতরের বেঞ্চিতে। ঘুম ধরছে, ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

পাশের লোক খিঁচিয়ে ওঠে: বালিশ নাকি আমি—গায়ের উপর দিব্যি আরামে

মাথা চাপিয়ে দিয়েছেন ? খাড়া হয়ে বসুন।

মার্জনা চেয়ে নফর খাড়া হয়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ ! চোখ বুজে এবার সে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে দুলছে। হঠাৎ এক সময় সাহেব চেঁচিয়ে উঠল এই তো, এসে গেছি বাবা—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গোটা দুই কেরোসিনের আলো টিমটিম করছে, সেই কয়েক হাত জায়গা ছাড়া ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে ! হুড়মুড় করে দু-জনে নেমে পড়ল। গাড়িও ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েকটা রক্তবিন্দু—দূরবর্তী হয়ে ক্রমশ তা-ও মিলিয়ে গেল।

গেট-বাবু লণ্ঠন উঁচু করে দেখে বললেন, টিকিট যে তালতলার। এঃ মশায়, এখানে নেমে পড়েছেন ! তালতলার তো অনেক দেরি।

বিপন্ন নফরকেষ্ট বলে, কী সর্বনাশ ! ঘুম এসে গিয়েছিল, ব্যস্তবাগীশ ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। রাত্তিরবেলা অত আর বুঝে উঠতে পারলাম না—

সাহেব বলে, আমি যেন পড়লাম স্টেশনের নাম—

নফরকেষ্ট গর্জন করে ওঠেঃ তোর বাপের মাথা পড়েছিস। পিটিয়ে তুলোধোনা করব, টের পাসনি হারামজাদা।

পরক্ষণেই সকাতরে গেট-বাবুকে বলে, পরের গাড়ি কখন স্যার ?

রাতের মধ্যে নেই। কাল দিনমানে—

নফর মাথায় হাত দিয়ে পড়েঃ উপায় ?

গেট-বাবু দয়াবান। বললেন, ওয়েটিংরুমের চাবি খুলে দিচ্ছে। ঐখানে পড়ে থাকুন। আর কি হবে !

ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দরজা এঁটে দিল। প্রয়োজন ছিল না, জনমানব কোন দিকে নেই। কিন্তু গুরুবাক্যঃ কাজের মুখে নিজেকেও বিশ্বাস নেই। আয়না ধরে নিজের চেহারাটাও দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হবে, আমিই ঠিক সেই লোক কিনা।

দরজা-জানলা বন্ধ করে নফরকেষ্ট দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে ধরল। নামবার সময় ব্যাগ বদল করে এনেছে। কাজটা একেবারে নির্বিঘ্ন। ধরে ফেলল তো জিভ কেটে বলবে, তাই তো মশায়, বড্ড রক্ষে হয়ে গেল। যথাসর্বস্ব আমার ব্যাগের ভিতর —কী যে মুশকিলে পড়তাম !

কাঠি একটা শেষ হয়ে গেলে আর একটা ধরায়। সাহেবকে সতর্ক করেঃ একটা একটা করে বের কর সাহেব। যত্ন করে নামিয়ে রাখ। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মা-কালী কী জুটিয়ে এনে দিলেন, কিছু বলা যায় না। পলকা জিনিষও থাকতে পারে।

সাহেব বের করছে, ঝুঁকে পড়ে নফর দেখে। খাতা আর কাগজ। পুরানো ব্যাংলা হরফে লেখা কান-ফোঁড়া নানা রকমের দলিল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে উলটে-পালটে দেখে, কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

হায় মা-কালী, কী লীলাখেলা তোমার ! নতুন লাইনের কাজ ধরে পয়লা বউনি-মুখে এটা কি করলে ? ছেলেমানুষ কত আশায় ব্যাগ খুলেছে, তার মনটাই বা কী

রকম হয়ে গেল! কাগজপত্র ফেলে শুধু ব্যাগটাই যে নিয়ে নেবে—তলা উইয়ে খেয়েছে না কি হয়েছে, দেশি মুচি দিয়ে মোটা চামড়ার পটি দিয়েছে সেখানটা। এহেন মহামূল্য বস্তু পাছে কোনদিন পাচার হয়ে যায়, বড় বড় অক্ষরে মালিকের নাম-ঠিকানা ব্যাগের গায়ে।

ক্রুদ্ধ হতাশায় নফর গর্জন করে: শয়তান! হীরে-মুক্তো বোঝাই করে নিয়েছে, এমনিভাবে দেখাচ্ছিল। তাই তো আরও বেশি করে আমার নজর ধরল। ভাহা বেকুব বানাল আমাদের!

সাহেব বলে, মামলার দলিলপত্তর এসব। যশোরে লোকটা মামলা করতে যাচ্ছিল। দলিল তো হীরে-মুক্তোই ওর কাছে।

ব্যাগ সুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে অনুনয়ের স্বরে বলে, যাব তো ঐ দিকেই। আমি বলি, যশোরে নেমে কাগজগুলো পৌঁছে দিলেও হয়। উকিলের নাম ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের অকারণ ক্ষতি করে কি লাভ!

এ কথায় নফরকেষ্ট ক্ষেপে যায়: আমার দোকানে সেদিন ঐ কাণ্ড করলি—আবার তাই? কোন হতচ্ছাড়া দয়াময়ের ব্যাটা—এ লাইন তোর জন্যে নয়। ভলন্টিয়ার হয়ে পরের দুঃখ মোচন করে বেড়াগে যা।

ক্রোধের কারণ আছে সত্যি। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ এবং দুজনের রেলভাড়া গচ্চা গেল। কাজটায় বিপদ নেই বটে, কিন্তু কপালের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিতান্তই জুয়াখেলার মতো।

কাল রাত্রে এই হয়েছে। আজকে আর এক রকমের খেলা। রেলের কাজের বিস্তর পদ্ধতি। মধুর মায়ের সঙ্গে নফরার এত কথাবার্তা, কিন্তু বউ অথবা মধুসূদন একটিবার চোখ মেলেনি, কোনরকম সাড়া দেয়নি। সাড়া দেবার অবস্থাই নেই—নজর ফেলে বোঝা যায়। নীল-চশমার আড়াল থেকে নফরকেষ্ট সমস্ত কামরায় একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপরে পায়ের চাপ দিল ঘুমন্ত সাহেবের গায়ে। রাস্তার কাজ, ট্রাম-বাসের কাজ, রেলের কাজ—কাজ অনুযায়ী নিয়ম-কারদা সব আলাদা। আজকের এই কাজের কারিগর হয়েছে সাহেব। বয়স ও চেহারার গুণে সাহেবকেই এমনি ধারা ঘনিষ্ঠ হয়ে পায়ের কাছে শুতে দিয়েছে, অন্য কাউকে দিত না। নফরকেষ্ট চাদর গুঁজে কাজের গোছগাছ করে দিল। সেটা ডেপুটির কাজ। কিন্তু ডেপুটি না বলে এই ক্ষেত্রে সর্দার বা সেনাপতি বলাই ঠিক। নিকটে ও দূরে ভাল করে দেখে নিয়ে পায়ের চাপে সেনাপতি নিঃশব্দে হুকুম দিল: সুসময়, লেগে পড় এইবার।

ইঙ্গিত পেয়ে সাহেব গাঁট থেকে ছুরি বের করে। হরেক রকমের ছুরি সঙ্গে—চামড়া-কাটা ছুরি, টিন-কাটা ছুরি, ছাড়া কাচের টুকরো, পেরেক—তিন চারটে টাকাও। কাজের উপকরণ এই সমস্ত। টাকা রাখতে হয়—বিপদের মুখে হাতে গুঁজে দিয়ে পালাবে। সাহেবের সর্বদেহ চাদরে ঢাকা, শুধুমাত্র মুখ আলগা। সে মুখ-চোখ অঘোরে ঘুম ঘুমাচ্ছে, চাদরের নিচে দ্রুত হাতে কাজ চলছে ওদিকে। চাদর

একটুকু নড়ে না। দীঘির জলের নিচে মাছ কত খেলে বেড়াচ্ছে, উপরের জলে নাড়া লাগে না যেমন। রীতিমতো কষ্ট করে শিখতে হয়, এ বস্তু অমনি আসে না। নফরকেষ্টর সাফাই হাতের গুণগান সর্বত্র। বাপ ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছে—ছেলেকে উত্তরাধিকারী রূপে সেই গুণের খানিকটা ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ছুরিখানাই বা কী—মধুসূদনের ব্যাগ যেন চামড়ার নয়, মাখন দিয়ে তৈরি। মাখনের দলার মধ্যে ছুরি চালাচ্ছে।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগের কাজ সমাধা হল তো পাশে রয়েছে বোঁচকাবুঁচকি—ঘুমের ঘোরে চাদরের নিচের হাত বেরিয়ে এসে বোঁচকার উপর পড়ে। পায়ের আঙুলে চেপে ধরে নফরকেষ্ট চাদরের কোণ তাড়াতাড়ি সেদিকে টেনে দিল। দিয়ে চাপ দিল আবার পায়ের ঃ নির্ভাবনায় চালিয়ে যাও বাপ আমার।

নিখুঁত কাজকর্ম, তিলমাত্র ত্রুটি নেই কোনদিকে। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ—উঁহু, শেষ পরিণাম বিবেচনা করে খারাপ অদৃষ্ট বলা যাবে না। ইঞ্জিনে জোর দিয়েছে, ট্রেন বিষম দুলছে। টিনের স্যুটকেশটা মধুসূদন বাক্সের উপর রেখেছে। হুড়মুড়িয়ে সেটা নিচে এসে পড়ে—পড়বি তো পড়, সাহেবের মুখের উপরে। চোখ মেলে মধুসূদনের মা হাউমাউ করে উঠলেন ঃ ওরে কী সর্বনাশ! খুন হয়ে গেছে পরের ছেলেটা গো!

মধুসূদন তুলে ধরল স্যুটকেস। সাহেবও উঠে বসল। তোবড়ানো পুরানো জিনিস, জোড় খুলে টিন হাঁ হয়ে আছে। টিনের খোঁচা লেগেছে সাহেবের মুখের দু-তিন জায়গায়। রক্ত বেরিয়ে গেছে। বাঁ-চোখের ঠিক নিচেই একটা খোঁচা—অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে।

সোরগোল। কামরার মানুষ সকলের ঘুম ছুটে গেছে। মধুর মা আহা রে, আহা রে—করছেন। চোখে জল পড়ছে তাঁর। কে-একজন ওদিক থেকে বলে ওঠে, অসাবধানে রাখে কেউ অমন! খুব তো ফড়ফড়ানি মশায়। মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছিল—আইনে এবার কি বলবে?

মধুসূদন বেকুব হয়েছে, তবু মুখের জোর ছাড়ে না ঃ লোকটার দিকে চেয়ে জবাব দেয় ঃ সাবধানেই রাখা হয়েছিল। সাধুমশায় ঐ যে সরিয়ে-ঘুরিয়ে স্বর্গে চড়লেন, উনিই গোলমাল করেছেন। তা হয়েছে কি শুনি?

সাহেবও সেই সুরে সুর মেশায় ঃ ছড়ে গিয়েছে একটুখানি। এমন কত হয়। আমার এতে লাগে না।

মায়ের উপর মধুসূদন ধমক দেয় ঃ তুমি অমনধারা করছ কেন মা? সব তাতে বাড়াবাড়ি। যার লেগেছে সে বলে, কিছু নয়। হলেই বা কি! ব্যাগের মধ্যে এক-ডিস্পেনসারি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ—যার এক দাগ খাইয়ে কাটা-মুণ্ড জুড়ে দেওয়া যায়। তিন-চার বড়ি আর্নিকা খাইয়ে দিচ্ছি, ব্যথা-টুকুও হবে না।

বেঞ্চির তলায় গ্লাডস্টোন-ব্যাগ টেনে বের করে। এই গোলমালের মধ্যে নফরকেষ্ট কোন সময় জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। সিগন্যালের বিলম্বে গাড়িটাও লহমার জন্যে

থেমেছিল বুঝি। টুক করে সেই সময় সে নেমে পড়ল। সাহেব ব্যূহবেষ্টনীর মধ্যে। ব্যাগ টেনে এনে বেঞ্চির উপর রেখে মধুসূদন ওষুধ বের করবে। এ কি, একদিকের চামড়ায় লম্বালম্বি ফালি।

মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখেছেন। বড়মামী দিয়েছেন কোমরের নিমফল, ছোটমামী কপালের পঁটে। এই তিন দফা গয়না রুমালে একসঙ্গে বাঁধা ছিল। আরও নাকি পাঁচ টাকার নোট দুখানা। সমস্ত লোপাট।

বাঙ্কের উপরের রক্তাম্বর সাধু লম্ফ দিয়ে পড়লেন। রাগে গরগর করছেন: অ্যাঁ, ছোঁড়া তুই কোঁচড়ের ইঁদুর হয়ে কুটুর-কুটুর কাপড় কাটিস ?

বাঘের মতন পড়ে সাহেবের টুঁটি চেপে ধরলেন। আক্রোশে মধুসূদনও মারছে, কিন্তু সাধুর কাছে লাগে না। দমাদম কিল মারছেন পিঠের উপর। মুষলধারে—থামাথামি নেই। বেপরোয়া ঘুসি। কামরা-ভরা লোকের হাত নিসপিস করছে—কিন্তু সাধুই মেরে চলেছেন রকমারি কায়দায়, এদিক থেকে সেদিক থেকে পাক-চক্কোর দিয়ে। অন্যের এগোবার সাধ্য নেই তার ভিতরে। কাণ্ড দেখে সকলে থ হয়ে গেছে। যা রাগ, একেবারে মেরেই ফেলেন বুঝি !

তাঁকেই ঠেকাচ্ছে এখন সকলে মিলে: অত মার মারছেন, মরে যাবে যে ! আপনার কী এতে বাবাজী ?

যাক মরে। যাক, যাক। এরা সব মানুষ নামের কলঙ্ক, সমাজের আপদবালাই। মরে গেলে ধরিত্রী জুড়োয়।

কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে তাঁর: আমারও সর্বনাশ হয়েছিল এমনি গাড়ির কামরায়। পরিবারের গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। গয়নার দুঃখেই পরিবার শেষটা আত্মঘাতী হল। কলকে-ফুলের বীচি খেয়ে মরল। তারপর থেকে আমার এই দশা। নিকুচি করেছে সংসারে। সাধু বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে পুরানো স্মৃতিতে রাগ আবার চড়ে যায়। পা তুলে লাথি কষিয়ে দিলেন সাহেবের পিঠে।

মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন। রক্তাম্বরের উপর ক্ষেপে ওঠেন: ধর্মকর্ম কর না তুমি ? চণ্ডালের রাগ যে হার মেনে যায় তোমার কাছে।

আর এক প্যাসেঞ্জার বলে, ধর্ম না কাঁচকলা ! কাপালিক এরা—মারণ-উচাটন কাজ। পোশাকে টের পাচ্ছেন না ? নরবলি দেয়। কায়দায় পেয়েছে একটাকে। খাঁড়া-মেলতুক এখন কোথায় পায়—হাত-পা দিয়েই বলির কাজ সারছে।

জনকয়েক এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে রক্তাম্বরকে সরিয়ে দেয়: আর মারবেন না, উল্টে আপনিই কেসে পড়ে যাবেন, সাধু বলে আইনে ছাড়বে না। আমাদেরও রেহাই দেবে না পুলিস, সবসুদ্ধ হাতে দড়ি পরবে। এখন ঠাণ্ডা হন। দৌলতপুরে এসে যাচ্ছে, গাড়ি অনেকক্ষণ থামবে। রেল-পুলিসের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।

মুখ বাঁকিয়ে রক্তাম্বর বলেন, পুলিস ! বলবেন না, বলবেন না—এই বয়স অবধি পুলিস আমার ঢের ঢের দেখা হয়েছে। আপনারা এ দরজা দিয়ে বেরুলেন, পুলিসের

হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে আসামিও অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মধুসূদন বলে, পুলিস সাচ্চা হলেই বা ক্ষমতা কি তাদের! কোর্টে কেস তুলে দিলে—দু-মাসের জেল। মজাসে সরকারি খানা খেয়ে পাকা-ঘরে বসবাস করে একদিন বেরিয়ে এল জেল থেকে। এসে তখন দুনো তাগত নিয়ে কাজে লাগে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। বলে, জেল-টেল কিছু নয়—ধরে এদের ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তবে সমুচিত শিক্ষা হয়। ফাঁসির পরেও গলায় দড়ি বেঁধে গাছে টাঙিয়ে রাখা। রোদে শুকোক, কাকে ঠুকরে ঠুকরে খাক। অসৎকর্মের পরিণামটা চোখে দেখুক সর্বজন।

সাহেব হাপুসনয়নে কাঁদছে। সকলের বলাবলিতে মারগুতোন আপাতত বন্ধ। তল্লাসি চলছে কাপড়চোপড় ও জায়গাটার এদিক-সেদিক।

গয়না-টাকা কোথায় রাখলি তুই?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেব বলে, আমি নিইনি। আমি কিছু জানিনে।

মধুর মা মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: মিছামিছি তোরা মারধোর করলি। ও নেয়নি, অমন ছেলে নিতে পারে না। চেহারা দেখেও বুঝিস না তোরা—চোরের কখনো এমন দেবতার মত রূপ! নিয়ে থাকে তো গেল কোথা জিনিসগুলো—গিলে খেয়েছে মুখের ভিতর ফেলে?

মায়ের কথারই জবাব দেয় মধুসূদন সাহেবের উপর তড়পে উঠে: তোর সেই বাপটাকে দেখছিনে তো! গেল কোথায়? তাকে দিয়ে পাচার করলি।

মা ওদিকে বলেই চলেছেন, বউটা হয়েছে তেমনি আগোছালো—কোথায় কি রাখে ঠিকঠিকানা নেই। ব্যাগে না রেখে হয়তো বা স্যুটকেশে রেখেছে, স্যুটকেশটা দেখ তোরা খুঁজে। আনেইনি হয়তো মোটে। তোর বড়মামীর কাছে রাখতে দিয়েছিলি—খোঁজ নিয়ে দেখবি, সেইখানে পড়ে আছে। উঃ, বাছা তুই কার মুখ দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি রে!

চকিতে সাহেব মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। কে যেন বুকের মধ্যে বলে ওঠে, দুনিয়াময় মায়ের কোল—মায়ের কোল বাদ দিয়ে পালাবি কোনখানে হতভাগা? রেলের কামরাতেও মা। এক কাঠাও ভুঁই পাবিনে মায়ের কোল যেখানটা নেই।

মধুর বউয়ের উপর দোষ পড়েছে, বউ কথা না বলে পারে কেমন করে? বলে, আমি আগোছালো মানুষ—জিনিস না হয় ফেলে এসেছি। কিন্তু ব্যাগটা যে এমন করে কেটে ফাল-ফালা করেছে, সে মানুষটা কে?

সাহেব বলে, আমি করিনি—

বেঞ্চির তলে অনেকটা দূরে এই সময় ছুরি আবিষ্কার হল। নফরকেষ্টকে আর সব দিয়েছে, ওটা দেয়নি পাশাপাশি যেসব মাল আছে, সেই কাজের সময় লাগবে বলে। দুর্ঘটনায় আর কিছু হতে পারল না। ছুরিটা হাতে তুলে ধরে মধু বলছে, কার এটা—এল কোত্থেকে?

সাহেব বলে, আমার জিনিস নয়।

মার বন্ধ করে রক্তাম্বর ফুঁসছিলেন এতক্ষণ অজগর-সাপের মতো। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েনঃ বটে রে! একে চোর, তায় মিথ্যুক! ছবির বুঝি পাখনা হয়েছিল, উড়তে উড়তে তোর কাছে এসে গেছে?

বলেই এক ঘুসি। আবার দ্বিতীয় ঘুসি তুলেছেন, ছুটে এসে একজনে হাত চেপে ধরে। ঠেকানো কি যায়! মানুষটার গায়ে অসুরের বল—সে তো কামরায় ঢোকবার মুখেই সকলের চাক্ষুষ হয়েছে।

বললেন, দৌলতপুর-টুর নয়—শেষ জায়গা খুলনায় নিয়ে ফেলব। ওখানকার থানা কোর্ট সর্বত্র আমার খাতির। মধুবাবু খাঁটি কথাই বলেছে—এই বয়সে এত বড় বিচ্ছু—ছোঁড়ার ফাঁসি হওয়াই উচিত। পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই, কদ্দুর ঠেসে দেওয়া যায় দেখি। চুল পাকবার আগে বাছাধনের বেরুতে না হয়, সেই তদ্বির করব। বেরিয়ে এসে লাঠি ঠুকঠুক করে দশ দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াবে, অন্য কিছু করার তাগত থাকবে না।

খুলনা স্টেশনে ট্রেন তখনো ভাল করে থামেনি, রক্তাম্বর সজোরে সাহেবের ঘাড় ধাক্কা দিলেনঃ চল্—

মধুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, সত্যি সত্যি যে নিয়ে চললে বাবা?

ভগবানের নাম করি, সত্যি ছাড়া মিথ্যে এ মুখে বেরোয় না। বেরোবার উপায়ই নেই।

সাহেব আর্তনাদ করছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে তাকে প্লাটফরমে নামিয়ে ফেললেন।

লাইনের শেষ স্টেশন। সকলে নেমে পড়ছে। সাধু ডাক দিলেন, আপনাদের কেউ কেউ চলে আসুন মশায়রা।

কোথায়?

আপাতত থানায়। তার পর যখন মামলা উঠবে, কোর্টেও দিন কয়েক। ছোঁড়াটাকে এত সমাদরে নিয়ে যাচ্ছি, সাক্ষি-টাক্ষি দিয়ে কৈবল্যধামের ব্যবস্থা করবেন তো!

যে লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে, রক্তাম্বর তারই হাত চেপে ধরেনঃ আপনি একেবারে সামনের উপর ছিলেন মশায়, সমস্ত চোখে দেখেছেন। আপনি আসুন।

লোকটা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাপ করতে হবে বাবাঠাকুর। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, থানায় ছুঁলে একশ-আঠার। চশমা খোলা ছিল সে সময়টা, একেবারে কিছু দেখতে পাইনি।

মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, যাবেন এই ভদ্রলোক, যার জিনিস খোয়া গেছে। গিয়ে পড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসুন। অন্যের কি দায় পড়েছে?

মধুসূদন খিঁচিয়ে উঠলঃ তা বই কি! আমি গিয়ে থানায় উঠলাম—স্টিমার ফেল করে বাচ্চা আর দুটো মেয়েলোক সারাদিন ঘাটের উপর পটোলপোড়া হোক। যা যাবার সে তো গেছেই, গোদের উপর বিষফোড়া তুলে কাজ নেই। পা চালিয়ে

চলো মা, আমাদের স্টিমারেই বুঝি সিটি দিল ঐ।

দেখা যাচ্ছে, এত লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের উৎসাহ একজনেরও নেই। এ বলে তুমি যাও, ও বলে আপনি যান। এবং নিজ নিজ মাল ও মানুষ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে প্রত্যেকেই ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে রক্তাম্বর বলেন, না আসেন তো বয়ে গেল। থানা-স্টাফের মধ্যে আমার বিস্তর শিষ্যসেবক, কোর্টেও অনেক ভক্ত। আপনাদের কাউকে লাগবে না, আমার একার সাক্ষিতেই হয়ে যাবে। বাকি সাক্ষিসাবুদ যা লাগে, ওরাই সব গড়েপিটে নেবে।

মধুর মা তখনও বলছেন, কেউ যাবে না, তোমারই বা কী গরজ ঠাকুর! তোমার তো কানাকড়িও খোয়া যায়নি। ছেলের মুখের দিকে একটিবার তাকাও না। কিচ্ছু করেনি, এ ছেলে ভাল বই মন্দ করতে পারে না। ছেড়ে দিয়ে যাও।

সাহেবের দু-চোখ ভরে অকস্মাৎ জল নেমে আসে। নদীর জলে ভেসেআসা ছেলে—মা নেই, মাকে দেখেনি কখনো। অথচ মা যেন সর্বত্র। গর্ভধারিণী মাকে না পেয়ে ভালই হয়েছে বোধহয়। ছোট বাড়ির একখানা দু-খানা কি পাঁচখানা ঘর জুড়ে খুঁটিনাটি গৃহকর্মে ব্যস্ত একফোঁটা মা নয়—তার মা চরাচরব্যাপ্ত। যে বাড়ির যত মা এতাবৎ সে দেখে এসেছে, সকলের সঙ্গে একাসনে এক মূর্তি হয়ে তার মা-জননী। কুয়াসামগ্ন অনন্ত সমুদ্র দেখার মতো চোর-সাহেবের মনে এক বিশাল অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস। সাধু হিড়হিড় করে টেনে জনতার আগে চললেন, সাহেব মুখ ফিরিয়ে বারম্বার মধুর মাকে দেখে নিচ্ছে।

প্ল্যাটফরমের শেষ মাথায় টিকিটবাবু। রক্তাম্বর নিজের টিকিটটা দিলেন, আর সাহেবকে দেখিয়ে একটি টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে।

সাহেব বলে, টিকিট তো আছে আমার।

সাধু হেসে ফেললেন: বটে! মুফতের কারবার নয়, লগ্নি করে কাজে নেমেছিস?

টিকিটবাবুর দিকে বলেন, জমা রইল টাকাটা। মনে করে রাখবেন, পরের কোন কেসে উশুল হবে।

ফাঁকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কণ্ঠস্বর মধুমাখা হয়ে উঠেছে। মুচকি হাসি মুখে। বলেন, এত মারলাম তোকে, ব্যথা লাগে নি?

সাহেবও হেসে ফেলে: মারলে তো লাগবে! শুধু তম্বি, শুধুই আওয়াজ। কামরার মেজের ধুলোবালি কিছু গায়ে লেগেছিল, আদর করে থাবা দিয়ে সেই সমস্ত যেন ঝেড়েঝুড়ে দিলেন—আমার তাই মনে হচ্ছিল।

গলা ফাটিয়ে তুই কেঁদে উঠলি—সেই সময়টা একবার সন্দেহ হল, লেগে গেল নাকি হঠাৎ?

শতকণ্ঠে সাধুমশায় তারিপ করছেন। আমায় অবধি ধোঁকা ধরিয়ে দিস, বাহাদুর বটে তুই! সকলের মধ্যে শাট না থাকলে কাজ ভাল ভাবে নামে না। খাসা তোর শিক্ষাদীক্ষা—মুখ ফুটে বলতে হয়নি, বলবার ফুরসতও ছিল না, আপনা থেকেই

বুঝে নিলি। জোর কান্না কেঁদেছিলি বলেই তো বিনা দ্বিধায় তোকে আমার হাতে ছাড়ল। এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলি।

যেতে যেতে পরিচয় নিবিড় হচ্ছে।

আপনজন কে কে আছে তোর? বাপ বেঁচে আছে?

হুঁ—

মা?

হুঁ, হুঁ, হুঁ—। মায়ের কথায় বার তিনেক হুঁ দিয়েও সাহেবের তৃপ্তি নেই। রক্তবসনধারী এই যে পুরুষটি, ইনিও যেন মা হয়ে গেলেন তার।

ভাই-বোন আছে?

সাহেব এবারও ঘাড় নেড়ে দেয়। খুব সম্ভব মিথ্যা কথা হল না। যে দেখে সে-ই বলে, সাহেব কোন বড়মানুষের ছেলে। বড়মানুষেরা হামেশাই মরে না—কোন অভাবে মরতে যাবে? ঘর ভরভরতি থাকে তাদের, ছেলেপুলে কিলবিল করে। অতএব বাপ-মা-ভাই-বোন সবই আছে তার। পরিচয় না জানুক, আছে নিশ্চয় পৃথিবীর কোথাও। এবং সুখে আছে।

রক্তাম্বর সাধু প্রশ্ন করেন, নাম কি রে তোর? বাপের নাম কি?

'খোকা' নাম নফরের মুখে একবার বেরিয়ে গেছে, নতুন-কিছু না বলে ওটাই আপাতত চালানো যেতে পারে। এবং 'সরকারি খেয়া'—অদূরে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে, তাই থেকে উপাধিটা মনে এসে যায়।

খোকনচন্দ্র সরকার। এক কথায় বলে, কিন্তু বাপের নামে কিছু ভাবনার ব্যাপার। অগণ্য বাপ—রাজাবাহাদুর থেকে শুরু করে নফরকেষ্ট অবধি। কমবেশি সবাই কিছু কিছু বাপের কাজ করেছে। এই পল্টনের ভিতর থেকে কার নামটা পছন্দ করে বলবে, হঠাৎ কিছু মাথায় আসে না।

জবাবে না পেয়ে সাধুমশায় অন্য রকম ভাবলেন। মৃদু হেসে বলেন, পালিয়ে এসেছিস বুঝি—নাম বললেই আমি বুঝি ধরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব! ভয় করিস নে—আমি ঠিক উল্টো রকম ভাবছি। কী কাজ করে তোর বাপ?

এতক্ষণে ভাল একটি বাপ ঠিক করে ফেলেছে। চেতলায় চালের আড়তের মালিক পুরুষোত্তম সা। বিশাল মানুষটি, ভুঁড়ি ততোধিক বিশাল—গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চাকতি, হাতবাক্স-ভরা কাঁড়ি-কাঁড়ি নোট। এর চেয়ে উপযুক্ত বাপ আর হয় না।

কি করে বাপ তোর?

চালের ব্যবসা।

ব্যবসাদারের গুষ্ঠি তবে তোরা! সাধু হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তোর ব্যবসাটাও স্বচক্ষে দেখলাম। দেখে তাজ্জব। বেড়ে হাতখানা বানিয়েছিস! চাদরের নিচে গুটগুট করে কাজ করে যাচ্ছিস—ছুরি ধরা থেকে আঙুল ঘুরিয়ে ব্যাগের মাল বের করে পাচার করে দেওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন চোখের উপর ভাসছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, রুপো বাঁধিয়ে দিই অমন হাত। ছক-বাঁধা সাজানো কাজকর্ম।

নির্গোলে বেরিয়েও যেতিস ঠিক—বাক্স পড়ে বিপদ ঘটাল। দোষ তোদের নয়—নিয়তি, তার উপরে কারো হাত নেই। কাজের গোছগাছ করে দিচ্ছিল সে মানুষটাও ভাল। তাক বুঝে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল। পাকা লোক। দুয়ে মিলে খাসা দলটুকু গড়েছিস তোরা।

নদী-তীরে নৌকোঘাটে এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধকণ্ঠে সমানে তারিপ চলছে। বলছেন, হাতের চেয়েও বড় রাজপুত্রের মতো তোর এই চেহারাখানা। মরি মরি, কী চেহারা নিয়ে জন্মেছিস—চোখ ফেরানো যায় না। মা-কালী যাকে দয়া করেন, চার হাত ভরে তার উপর ঢেলে দেন। এত গুণ নষ্ট হতে দিসনে, বুঝলি? মহা-পাতক। কাজ দেখার পর থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি। এমন কাঁচা বয়সে পুলিসের হাতে না পড়ে যাস। বয়েস হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে দু-চারবার ফাটক ঘুরে এলে খারাপ হয় না—ভালই বরঞ্চ, মুখ বদলানো। পুলিস এখন থেকেই যদি পিছনে ফিঙে লাগে, সব শান্তি বরবাদ করে দেবে। সেইটে ভেবেই অমন করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নইলে, চেনা নেই জানা নেই, সবে আজ পয়লা দিনের দেখা—এত কাণ্ড করবার গরজটা কী ছিল!

ভাঁটা সরে নদীজল অনেকটা দূরে নেমে গেছে। ডান-হাতটা সাধুমশায় একটুখানি তুলেছেন কি না তুলেছেন, ঘাটে-বাঁধা এ-নৌকো ও-নৌকো থেকে পাঁচ-সাত জন মাঝি ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে ডাঙা মুখো ধাওয়া করল। কাদায় হাঁটু অবধি বসে যায় কোনখানে, কখনো বা পিছলে পড়ে যাবার গতিক—উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে তারা।

সাধু চেঁচিয়ে বলেন, অত জন কেন রে? আসতেও হবে না। যার নৌকোয় চড়ন্দার নেই, ওখান থেকে বলে দাও। আমি নেমে যাচ্ছি।

মাঝিরা কানেও নেয় না।

সাহেবের দিকে চেয়ে সাধু বলেন, যাবি রে আমার সঙ্গে?

সাহেব তখন সেই কাদামাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। কষ্ট করে—রীতিমতো শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত মনে যেন কিছুতে সোয়াস্তি আসে না। তার এই বিষম দোষ। কোন একটু উপকার পেলে প্রাণ কানায় কানায় ভরে যায়, উপকারীকে কায়ে-মনে সেটার জানান দিতে হবে। তাদের যে কাজ, সে পথের দস্তুর আলাদা। সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত, উপস্থিতবুদ্ধি—যাবতীয় গুণ রয়েছে, কিন্তু এই বদখত ভালমানুষিটা না ছাড়তে পারলে উপায় নেই।

প্রণাম সেরে উঠেই অনুতাপ। সেই আর এক দিনের মতো মাকালীর নামে সাহেবের মনে মনে আছাড়ি-পিছাড়ি: মা-কালী, মন্দমানুষ কর আমায়। খুব—খুব মন্দ। নফরকেষ্টর মতো নয়—ও মানুষটাও এক একসময় বড্ড ভাল হয়ে যায়। একেবারে নিটোল নিখুঁত মন্দ মানুষ করে দাও।

সারা জীবন ধরে সাহেব তার অজানা মা আর অজানা বাপের নামে গালিগালাজ করে এসেছে। কোন সৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আর সজ্জন পুরুষ—তাদের রক্ত থেকে এই দোষ বর্তেছে। ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—বুড়ো হয়ে মরতে

গেল সাহেব, সেদিনও এই দোষের সংশোধন হয়নি।

থাক এসব। সকলকে পিছনে ফেলে এক মাঝি ছুটতে ছুটতে রাস্তার উপর উঠল। আবদারের সুরে বলে, ঝড়ু-মাঝি সেদিন এই ঘাটে রেখে গেল, আজকে আমি ফেরত নিয়ে যাব। ঘাড় নেড়ে দিন বলাধিকারীমশায়, ওদের সব হাঁক দিয়ে বলে দিই।

ভাটিঅঞ্চলের সুবিখ্যাত বলাধিকারীমশায়—জগবন্ধু বলাধিকারী। গাড়ির মধ্যে সারাক্ষণ সাধুমানুষ হয়ে এসেছেন। কলকাতা শহরটার বাইরে সাহেব একেবারে নতুন—তখন অবধি নাম শোনেনি, কোন-কিছুই জানে না বলাধিকারী মানুষটির সম্বন্ধে। কিন্তু ঘাটের উপরে এ হেন খাতির দেখে অবাক হয়ে যায়।

মাঝি বলছে, চরণধুলো আজ আমার নৌকোয় দিতে হবে। নয়তো মাথা খুড়ব পায়ে।

জগবন্ধু হেসে বলেন, ধুলো কোথায় পাব গো? এক-পা চটচটে কাদা। তাই তোমার নৌকোয় মাখাব। কি বলবে, বলে দাও ওদের ডেকে।

পুলকিত মাঝি জলের দিকে ফিরে পিছনে অন্যদের উদ্দেশে বুড়ো-আঙুল নাচায়। অর্থাৎ কেল্লা মেরে দিয়েছি আগেভাগে ছুটে এসে, তোমাদের শুধু কাদা ভাঙাই সার।

নিজের নৌকোয় মাল্লাদের চিৎকার করে বলে, নির্মকির ঘাটে নিয়ে নৌ ধরু, ঐখানে যাচ্ছি আমরা।

এই অঞ্চলে একসময় বিস্তর নুন তৈরি হত। নুনের কোন বড় মহাজন পাকা-ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন নুনের নৌকো চলাচলের জন্য রশি দুয়েক পথ—মাঝি সেই ঘাটের কথা বলছে। সেখানে গেলে কাদা ভেঙে নৌকোয় উঠতে হবে না।

বলাধিকারী বলেন, আবার কষ্ট করে উজান ঠেলে মরবে! গাঙখালের দেশের মানুষ কাদা ভাঙতে পারব না—পা দুখানা তবে তো মোড়ক করে লোহার সিন্দুকে রেখে দিলেই হয়।

নৌকো নিয়ে যাচ্ছে সেই নির্মকির ঘাটে। ডাঙার উপরে হাঁটতে হাঁটতে এঁরা পথটুকু চলেছেন।

জগবন্ধু সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জঙ্গলবাড়ির মা ভারি জাগ্রত। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আসে, দেখলি তো তার খানিক। আমি যাই ফি বছর। সকলের যেমন—আমিও গিয়ে মানত শোধ দিই, নতুন বছরের জন্য মানত করে আসি—

বলে হাসতে লাগলেন। মাঝি ফোড়ন কেটে ওঠেঃ মস্তবড় সংসার আমাদের বলাধিকারীমশায়ের। ভালমন্দ কার কখন কি হয়, সেই জন্য মায়ের থাড়ি ধন্না দিয়ে পড়েন।

সংসার না থাকুক নিজে তো আছি। নিজের জন্য গিয়ে মানত করি।

মাঝি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনার আবার সংসার নেই! তল্লাটের মধ্যে এত

বড় সংসার কার আছে শুনি ? কার মাথায় এত দায়ঝক্কি ?

জগবন্ধু বোধকরি প্রসঙ্গটা আর এগুতে দেবেন না। কথা ঘুরিয়ে নিলেন: মেলার মানুষ তিন-চার রাত্রির মধ্যে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। নৌকোয় উঠেই মাদুর পেতে পড়ব। গাবতলির আগে আমায় কেউ ডাকবে না, তোমায় বলা রইল মাঝি। গাবতলি গিয়ে সকলে ভরপেট জলটল খেয়ে নেবে।

সাহেবকে বলেন, আকাশের উপর থেকে ভগবান নাকি দেখেন। আমারও হল তাই। বাঙ্কের উপর থেকে দেখেছি। বাঙ্কটা পেয়ে গিয়ে ভারি স্ফূর্তি হয়েছিল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমুতে মজা—মালপত্র ঠেসান দিয়ে বসে বসেই ক'দিনের বকেয়া ঘুম উশুল করে নেব। ঢুলুনিও এসেছিল। তোদের জ্বালায় হল না। হঠাৎ দেখি, কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিস ঠিক আমার নজরের নিচে। অমন একখানা মজাদার কাজের শেষ না দেখে পারি কেমন করে ? কিন্তু সেই লোকটাকে আর দেখলাম না— বাপ হয়ে যে ছেলের গায়ে চাদর গুঁজে দিচ্ছিল।

পিছন থেকে নফরকেষ্ট অমনি সাড়া দিয়ে ওঠে: আজ্ঞে, এই যে আমি—

দ্রুত সামনে চলে এসে সাহেবের মতো সে-ও বলাধিকারীর পায়ে গড় করল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত ছুঁইয়ে জগবন্ধু হেসে বললেন, খোকনচন্দ্রের যে বাপ, এমনধারা কাঁচা ব্যবস্থা তার হাতে কেন হবে ?

নফরকেষ্ট সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে ?

ভুঁড়িটা বড্ড একপেশে তোমার বাপু। একদিক চিটেপানা আর একদিকে বেঢপ মোটা। ঠিক করে নাও, ঠিক করে নাও। কত ডাক্তার কত দিকে—পেটে কী রোগ হয়েছে, কেউ হয়তো টিপে দেখতে গেল।

জামার নিচে কোমরে মাল বেঁধে নিয়েছে, ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটির মধ্যে একদিকে সেটা সরে গিয়েছে। সলজ্জে নফরকেষ্ট সামাল করে নিল।

সাহেব বলে, কী করব আমি, বলে দিন।

বলেই তো দিয়েছি। আমার সঙ্গে চল্‌। গাড়িতে গাড়িতে ছ্যাঁচড়ামির কাজ ছেড়ে দে, পিটিয়ে শেষ করবে কোনদিন। কাল রাত্রেই তো হচ্ছিল। ক্ষমতা নষ্ট হতে দিতে নেই, উচিত কাজে লাগা !

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে ফেলে আমিও কিন্তু যাব না বলাধিকারীমশায়।

সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, যাওনি ঐ গাড়ির মধ্যে ?

নফরকেষ্ট বলে, আমায় দু-ঘা মারলে তোর গায়ের ব্যথা কম হত নাকি কিছু ?

বলাধিকারী নফরকেষ্টকে সমর্থন করেন: ঠিক করেছে। কাজের এই নিয়ম। মার কি বলছিস রে, মেরে ফেললেও দলের কেউ এসে চেনার ভাব দেখাবে না। নির্বিঘ্নে কাজ নেমে গেল, সকলে একত্র হলি—আবার তখন পুরানো সম্পর্ক।

শহরের দুটো মানুষ বলাধিকারীর সঙ্গে জলের রাজ্যে চলল।

গাবতলির হাট অদূরে। সারি সারি চালা দেখা যায়। হাটবার আজকে। সূর্য

চলে এসেছে, জমজমাট এখন। গাঙের বাঁধ ধরে হাটুরে মানুষের পিলপিল করে যাওয়া-আসা চলছে।

বলাধিকারীর ঘুম নামে মাত্র। ডাকতে হয়নি, আপনিই উঠে পড়েছেন। হাটের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, শীতকালে এবারে এই জমতে শুরু করল। কি করবি, জিজ্ঞাসা করছিলি না—দেদার কাজ। ধান পেকেছে, কাজের অভাব নেই আমাদের ভাটি অঞ্চলে। দিনের কাজ আছে, রাতের কাজ আছে—কাজের আর স্ফূর্তির দিন এখন। মানুষের দরকার অঢেল। ধান কাটার মানুষ চাই, পাঠশালা বসবে তার জন্য গুরুমশাই চাই, অসুখ হলে পয়সার গরমে এখন সকলে ওষুধপত্তোর খাবে তার জন্য ডাক্তার চাই, যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই—কত মোশানমাস্টার চাই—কত মানুষের কত কাজ! এ কি তোর শহরবাজার পেলি, কাজ-কাজ করে মানুষ যেখানে চোখের জলে বুক ভাসায়?

নৌকা ততক্ষণে হাটখোলা ধরো-ধরো করেছে। একদিকে কতকগুলো পত্রহীন বাবলাগাছ। বলাধিকারী বলেন, মরশুমের মুখে এখন বাবলাবনে এক নতুন হাট বসেছে—মানুষ-হাটা। গাঙের খোল থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে গামছা পেতে সারবন্দি সব বসে আছে বিক্রি হবার জন্য। ক্ষেতেল চাষী, গুরুমশায়, ডাক্তারবাবু, গানের ছোকরা—হরেক-গুণের মানুষ। বলিস তো তোকেও ওর মধ্যে বসিয়ে দিতে পারি খোকনচন্দোর। হাটুরে মানুষ এক মরশুমের দরদাম ঠিক করে নৌকোয় নিয়ে তুলবে। এ সমস্ত হল দিনমানে সদরের উপরের কাজ, আর রাতের কাজের খবর যদি চাস—

বলাধিকারী অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসছেন। নৌকোয় মাঝিমাল্লার ব্যাপারটা যে অজানা তা নয়। তবু এ সমস্ত অপরের কান বাঁচিয়ে বলার রীতি। এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, রাতের কাজেরও মরশুম এই। পুরো মরশুম চলছে। নিশিকুটুম্বরা সব দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে বার-দশেরার পরে। দলে দলে বলবি নে—আয়োজন বৃহৎ, সেজন্য দলে দলে। বাইরে বাইরে তাদের কাজ, আমার ছুটি এই সময়টা। ছুটি বলেই জঙ্গলবাড়ি মায়ের দর্শনে যেতে পারলাম।

একেবারে হাটের নিচে এসে পড়েছে। বলাধিকারী ফিক-ফিক করে হাসেন: বিয়ে করার বাসনা যদি হয়ে থাকে, তারও মরশুম কিন্তু এই। জামাইহাটা ঐ যে—টেরি কেটে ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জামাইরা সব ঐখানে এসে বসেছে। স্বয়ম্বর-সভা। তবে কনে আসে না, আসে বাপ-দাদারা। ঘুরে ঘুরে তারা আলাপ-পরিচয় করবে, কনের দর তুলবে। বরপণ নয়, কন্যাপণ। দরে বনিবনাও হয়ে গেল, জামাইটাও নেহাৎ অপছন্দের নয়—কনেওয়ালা তখন গাঁয়ের ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে, বরকর্তা গিয়ে কনে দেখে টাকাকড়ি কিছু দাদন দিয়ে কথা পাকা করে আসবে।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলাধিকারী হেসে বলেন, কীরে, যাবি নাকি নেমে জামাই-হাটায়। তোর মতন জামাই পড়তে পাবে না, চেহারায় মেরে দিবি—খুব সস্তা পণে কনে গেঁথে ফেলবি।

হাসাহাসি চলে খানিকক্ষণ। কথা হয়েছিল, হাটে নেমে মিষ্টিমিঠাই এবং টিউবওয়েলের মিঠাজল ভরপেট খেয়ে নেবে সবাই। কিন্তু ঘাটে এসে মাঝি এখন আড় হয়ে পড়েছে: গোনের আর অল্পই আছে, দেরি করলে জোয়ার এসে যাবে। রাতও হয়ে আসে এদিকে—কোনখানে নৌকো বেঁধে গোনের আশায় সেই রাত দুপুর অবধি ঠায় বসে থাকা—ফুলহাটা পৌঁছানো তাহলে সকালের আগে নয়। পেটে ক্ষিধে সকলের—তা বেশ, একজন কেউ নেমে গিয়ে ক্ষিধের রসদ নিয়ে আসুক। যাবে আর ফিরে আসবে। তা বলে বলাধিকারীমশায় নন, ওঁর নামা হবে না।

জগবন্ধু হতাশ হয়ে বলেন, শুনলে তোমরা? আদালতের বিচার হয়ে জেল দেয়। মাঝি আমায় বিনা বিচারে আটক করল। যে কেউ তোমরা নেমে গিয়ে ঘুরেফিরে আসতে পার, আমারই কেবল পাড়ের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মানা। মনে দুঃখ লাগে কিনা বলো।

মনের দুঃখে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। নৌকার এই নতুন মানুষ দুটো সত্যিই বা সেইরকম ভেবে বসে—মাঝি তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: হ্যাঁ, অন্যায় বলে থাকি তো ধরে মারুক সকলে। আপনি নেমে পড়লে তুলে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা! হাটের মধ্যে কত দেশের কত মানুষ, কত দোকানপাট। এ দোকান থেকে ডাকবে: একটুখানি বসে যান বলাধিকারী মশায়। ও দোকানি ছুটে এসে ধরবে, পা ছুঁইয়ে যান একটিবার দোকানে। অমুক এসে শলাপরামর্শ চাইবে, তমুক এসে হাত পাতবে—একটা-দুটো টাকা দিয়ে যান। শতেক জনের হাজারো রকম দায়—হাট না ভাঙা পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেবে না।

নিজের প্রশংসায় বলাধিকারী বিরত বোধ করছেন। বাধা দিয়ে বলে ওঠেন: থাক থাক, চুপ কর দিকি। এরা ভাববে, সত্যিই বুঝি আমি দরের মানুষ। টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আর কেউ নয়—তুমিই নেমে পড় মাঝি। মুড়ি-বাতাসা আর মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। মিঠাজল এনো এক কলসি। দু-জন কুটুম্বমানুষ—মিষ্টি বেশি করে নিয়ে এসো। শহর থেকে এসেছে, পেট না ভরলে শহরে ফিরে নিন্দেমন্দ করবে।

ঘাটের উপর বোঠে পুঁতে নৌকায় কাছি করে মাঝি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে একছুটে বেরিয়ে গেল। টাকাপয়সা যায় যাক মানুষ মরে মরুক—সমস্ত সইবে, কিন্তু অকারণ গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকোর মাঝির বুকে তখন শেল বিঁধতে থাকে।

সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখছে। দুচোখ ফেরানো যায় না। ছোট্ট বয়সে কালীঘাটে নৌকার মাঝিদের কাছে এমনি সব জায়গারই গল্প শুনেছে। মন উচাটন হত চোখে দেখবার জন্যে, এতদিনে ভাগ্যে তাই ঘটল। নৌকোয় নৌকায় ঘাটের জল দেখবার উপায় নেই। বিশাল নদীর ওপারে দীর্ঘব্যাপ্ত সবুজ রেখা অস্পষ্ট নজরে আসে। জনালয় নেই ওদিকে, বাদাবন। বাঘ-সাপ-কুমিরের আরামের রাজ্য।

বলাধিকারীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়: নামটা দিয়েছে বেশ—বলাধিকারী। ঠিক ঠিক মানিয়েছে। বলের নমুনা গাড়িতে উঠবার মুখেই একটুখানি দেখালেন—মধুসূদন মানুষটাকে পোকামাকড়ের মতন আঙুলের ডগায় খুঁটে ফেলে দিলেন যেন।

জগবন্ধু বললেন, বলাধিকারী কারও দেওয়া নাম নয়—কৌলিক উপাধি। এক

বয়সে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে। নিলাম দারোগার চাকরি—সে চাকরির হল খুনি-বদমাশ চোর-ডাকাতের নামে নিরীহ ভাল ভাল মানুষ ঠেঙিয়ে দুটো পয়সার সংস্থান করা। তার জন্য গায়ের বল চাই বইকি! কিন্তু মানুষের আসল বল বুদ্ধিবল—সে বস্তু কেউ চোখে দেখে না। আমার সেদিকটা একেবারে খাটো। কারো ঘটে যখন বুদ্ধি দেখতে পাই, মানুষটাকে খাতির করি। কপর্দকহীন মানুষ, দেখিসনি, পয়সাওয়ালা কাউকে দেখলে বেসামাল হয়ে কী রকম হেঁ-হেঁ করে! জামাইআদরে নৌকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি তোকে নয় রে খোকনচন্দোর—তোর মগজের বুদ্ধি আর সুচতুর হাত-দুখানাকে।

এবং হাত ও মগজের গুণপনায় মুগ্ধ বলাধিকারী ঐ নৌকাঘাটেই বুঝসমঝ শুরু করে দিলেন।

নিম্নকণ্ঠে বলেন, আমাদের মাঝি উল্টো করে বোঠে পুঁতে গেল কেন?

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে বলে উঠলেন, তুই যে ডাঙার দেশের মানুষ, ভুলে গিয়েছিলাম। উল্টো-সোজার কি জানিস! ঠাহর করে দেখ, সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে। পোঁতবার সুবিধা, চাপ দিলেই বসে যায়। আমাদের উল্টো। মুঠোর দিকটা পোঁতা, চওড়া মাথা উঁচুতে। কেন রে?

সাহেব কি জানে, সে কি বলবে? অবোধ চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

বলাধিকারী বুঝিয়ে দিচ্ছেন: হাটখোলা জায়গা—কতজনে কত মতলব নিয়ে ঘুরছে। রাত্রিকাল সামনে। বোঠে উল্টো করে পুঁতে জানান দেওয়া হল, বাপু হে, আমরাও ঐ কাজের কাজি। পিছু নিও না কেউ আমাদের।

বলেন, দেবভাষায় এ-জিনিসের নাম চোরসংজ্ঞা। সংজ্ঞা অনেক রকম আছে। মনে কর, পিছন ধরেছে একটা দল। আমাদের নৌকো মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ ঠাহর হয় না। কাছাকাছি এসে বলবে, এক ছিলিম তামাক দাও ও মাঝি-ভাই। কিম্বা বলবে, মাছ কিনে আনলাম, আঁশ-বঁটিখানা একবার বের করো ভাই। নৌকো মারবার মুখে এই সমস্ত বলে। কি করবি তখন, সামাল দেবার উপায়টা কি!

উপায়ের কথাটা আপাতত চাপা পড়ে যায়। জলের কলসি ও মিঠাই নিয়ে মাঝি ফিরে এলো। নৌকো ছুটিয়ে দিয়েছে, হাটখোলায় সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করে নেবে।

আধখানা বাঁকও যায়নি। কে-একজন চেঁচামেচি করছে না পিছন দিকে? তেমনি একটা আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসে।

বলাধিকারী চোখের উপর দিকটায় হাত রেখে নিরীক্ষণ করেন। সন্ধ্যাবেলা চারিদিক ঘোর হয়ে এসেছে। দেখেন জেলেডিঙ্গি যেন নদীজলের উপরে তরতর করে উড়ে আসছে।

বলাধিকারী বললেন, বোঠে তুলে ধরো তোমরা। দেখা যাক। কী যেন বলছে। নৌকো রাখতে বলছে, এমনি মনে হয়।

খানিকটা কাছে এলে বলাধিকারী একগাল হেসে ফেলেন: আরে, বংশী না?

বংশীই তো বটে! মামার বাড়ী এসেছিল বোধহয়।

বংশী চেঁচাচ্ছেঃ আমি যাব, আমি যাব। নিজ হাতে বোঠে ধরে অভিনব কায়দায় জলের উপরে মারছে। বলাধিকারীর ফুলহাটা গাঁয়ের মানুষ বংশীধর। অনুগত, এবং প্রতিপাল্যও বটে! এই গাবতলির নিকটবর্তী সোনাখালিতে পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি। স্বনামধন্য ওস্তাদ পচা বাইটা। এত বড় গুণীমানুষের আপন নাতি বংশী—মেয়ের ছেলে। বাইটার মেয়ে এই একমাত্র ছেলে রেখে অনেক দিন আগে মারা গেছে।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলাধিকারী আবার সাহেবের দিকে ফিরলেনঃ বোঠের মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে বংশী। কি বলছে শোন।

সাহেব কান পেতে শোনে। আওয়াজ বিচিত্র বটে। সাধারণ বোঠে বাওয়ার মতো নয়।

কি বলে?

বোঠের তালে তালে বলাধিকারীই এবার মুখে বলেছেন, সাঙাত-সাঙাত সাঙাত-সাঙাত—তাই না? নৌকোর গায়ে জলের ছলাৎ-ছলাৎ, আর বোঠের মুখের সাঙাত-সাঙাত। সাঙাত কিনা বন্ধু। এ-ও এক চোরসংজ্ঞা। সেই যে কথা হচ্ছিল—নৌকো মারবে বলে পিছন ধরে এসে পড়েছে, রাতের অন্ধকারে কেউ কাউকে চোখে দেখছে না, তখনকার উপায়টা কি? জলের উপর বাড়ি মেরে বোঠে দিয়ে কথা বলাবি। কাঠে কথা বলানো গুণীলোক ছাড়া পারে না। সাঙাত বুঝতে পেরে তখন তোবা-তোবা করে নৌকো-মারার দল ফিরে যাবে।

পণ্ডিতমানুষ বলাধিকারী, সেকাল-একালের বিস্তর খবর তাঁর কণ্ঠাগ্রে। প্রাচীন চৌরশাস্ত্রের কথা উঠে পড়ে। সেই সূত্রে চোরসংজ্ঞা—অর্থাৎ, চোরে চোরে চেনা-জানার জন্য নানারকম গুপ্ত-সঙ্কেত। ভ্রম বশে এক চোর অন্য চোরের ক্ষতি করে বসে। কিন্তু বাইরের চতুর লোকে চোরসংজ্ঞা জেনে গিয়ে ঠিক উল্টোটাই ঘটিয়েছে অনেক সময়। রাজপুত্র বরসেনের কথায় পাওয়া যায়—চার চোর দেখতে পেয়ে তিনি চোরসংজ্ঞা করলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে তারপর তিনিই তাদের মূল্যবান চোরাই মালের উপর বাটপাড় করলেন। রাজা বিক্রমও ঠিক এমনি করেছিলেন······

জেলেডিঙি ইতিমধ্যে পাশে এসে পড়েছে। হাতের বোঠে ফেলে বংশী বলাধিকারীর নৌকায় উঠল। বলে, খুব পেয়ে গেলাম। হাটবার দেখেই মামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, হাটুরে-নৌকো ধরব এখান থেকে। তা হলে হাট ভাঙা অবধি হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হত। বাঁক ছাড়িয়ে এসে আপনাকে দেখলাম—এক নজর দেখেই বুঝেছি, বলাধিকারীমশায় ছাড়া কেউ নন। উঃ, কী টান টেনে আসতে হল।

মাল্লাদের দিকে চেয়ে বলে, গোন কিছু নষ্ট হল তোমাদের। আমি তার পূরণ করে দিচ্ছি। দাঁড়ের মুরুব্বি তামাক ধরাও তুমি এবারে। আমি খানিকটা টেনে দিই।

বুড়ো-দাঁড়ি একজন—মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে বংশী দাঁড়ে বসে গেল। লহমার মধ্যে সব কিছু আপন তার। সাহেবের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না, হাতের দাঁড় উঁচু

হয়ে থাকে। চোখ টিপে নিম্নকণ্ঠে বলে, কাণ্ডখানা কি, মেয়েছেলে হরণ করে কোথায় নিয়ে যাও তোমরা ?

রসিকতাটা ঐ বুড়ো দাঁড়ির সঙ্গে। বলাধিকারী খবরের কাগজ খুলে বসে ছিলেন। সাপ্তাহিক ঢাউশ কাগজ, মেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। যে রকম আয়তন, এক প্রান্তে উপুড় হয়ে শুয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য প্রান্ত পড়া যায়। কথা কানে পড়তে হেসে উঠলেন : শুনলি রে খোকনচন্দোর, তোকে মেয়েছেলে বলছে।

বংশী জোর দিয়ে বলে, যে দেখবে সে-ই একথা বলবে। আজেবাজে পাঁচ-খেঁদি মেয়েছেলে নয়—রাজকন্যে। চুল খাটো করে ছেঁটে চুড়ি ভেঙে হাত নাড়া করে বেটাছেলে সেজেছে। যাত্রার দলে পুরুষমানুষ গোঁফ কামিয়ে মাথায় পরচুলা গায়ে গয়না পরে মেয়েমানুষ হয়, তার উল্টো।

বুড়ো-দাঁড়ি এইবারে জবাব দিল : চাও তো রাজকন্যে তোমার ঘরেই তুলে দেওয়া যায় বংশী।

বলাধিকারী বলেন, ওরে বাবা ! রক্ষে রাখবে বংশীর বউ। পতির ধর্মপথে মতি যাবে, সেজন্য কপাল ক্ষয়ে গেল দেবতা-গোঁসাইর কাছে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। তার উপরে এই উৎপাত গিয়ে পড়লে ঠাকুর-দেবতাকে না বলে সোজাসুজি সে ঝাঁটা তুলে দাঁড়াবে।

ঘরের পরিবারের কথা, বিশেষ করে নিজের পুরুষকে ভাল করবার চেষ্টা-এই সমস্ত উঠে পড়ায় বংশীর লজ্জার অবধি নেই। সাহেবের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

বলাধিকারী হেসে বললেন, অত করে কি দেখছ—লাইনের লোক। মাল কাঁচা এখনো, কিন্তু ভারি সরেস। আপন লোক ছাড়া ডেকে নৌকোয় তুলতে যাব কেন।

একচোট হেসে নিয়ে বললেন, কে নয় লাইনের শুনি ? দুনিয়া সুদ্ধ চোর—ভীরুগুলোই বাইরে বাইরে ভড়ং দেখিয়ে বেড়ায়। একটা চোরের কথা কেউ যদি ভাল করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়। যে লেখক লিখেছে, সে নিজেও কিছু তার বাইরে নয়।

দাঁড়ের মুঠো আবার সেই বুড়োর হাতে দিয়ে বংশী সাহেবের পাশটিতে চলে গেল। বলাধিকারী কাগজ পড়ছেন। পাঠে কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটে—মৃদুস্বরে দুজনের আলাপ-পরিচয় চলে। এই যে পাশে চলে এল, কোনদিন বংশী আর আলাদা হয়নি। বুড়ো বয়সে সকলের মতো সাহেব একদিন বলশক্তি হারাল, সেদিনের আশ্রয় বংশীর বাড়িতেই। বংশী মরে গেল তো বংশীর বউ তাকে সমাদরে ঠাঁই দিল। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা, আগে বলতে যাই কেন ?

কাগজ পড়ছিলেন বলাধিকারী। কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে মুখ তুলে বংশীকে বললেন, মরে গেছে বুড়ো ?

প্রশ্নটা হঠাৎ পড়ে বংশী হকচকিয়ে যায় : কার কথা বলছেন ?

কার আবার ! পঞ্চানন বর্ধন—পচা বাইটা। যার মরার দরকার দুনিয়ার মধ্যে

সকলের চেয়ে বেশি। মামার-বাড়ি থেকেই তো ফিরছ ?

হ্যাঁ—বলে বংশী ঘাড় নাড়ে। বেদনার সুরে বলে, নতুন করে কী মরবে! এককালে মুলুক চষে বেড়িয়েছে, সেই মানুষটা আজ বাইরের দোচালা ঘরে দিনরাত পড়ে আছে। বিষ-হারানো ঢোঁড়া। বাড়ি-ভরা মানুষজন—পুতের বউ দুজনা, নাতিপুতি দুগণ্ডা আড়াই গণ্ডা—কিন্তু ভাতের থালাখানা রেখে যাওয়ার মানুষ হয় না বুড়োর ঘরে। কেউ যায় না সেদিকে—বাড়ির লোক নয়, বাইরের লোকও নয়। একটা মানুষ দেখার জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকে। মরেই গেছে বাইটা—ঘরে-বাইরে সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছে।

বলাধিকারী তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, ভাবাভাবির কি! পুরোপুরি গেলেই তো হয়। বুকের নিচের ধুকপুকানি কোন্ লোভে আর ধরে রাখা—আবার কি বয়স ফিরবে ? সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাইটামশায়কে।

একটু থেমে আবার বলেন, ভাবি অনেক সময় সেকালের অত বড় গুণী-মানুষটার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের আশা আর এখন ? একটা জবাবও দিল। বলে, গুণজ্ঞান যা-কিছু আছে ষোলআনা পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিলে মুক্তি হবে না। দুনিয়ায় কিছু দিয়ে যাব। সেই নেবার মানুষের আশা করে আছি।

বংশী এবারে আগুন হয়ে ওঠে: মুখের কথা! একবর্ণ বিশ্বাস করবেন না বলাধিকারীমশায়। কতজনা এলো গেল, কাউকে ছিটেফোঁটা দেয়নি! গুরুপদ ঢালি —তাকে দেখেছেন আপনি, গোঁফ ওঠার আগে থেকে সাগরেদি ধরেছে, গোঁফ সাদা হয়ে গেছে এখন। হুকুমের গোলাম—উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তবু কণিকাপ্রমাণ বিদ্যেও দিলেন না তাকে। আমি আপন লোক, মরা মেয়ের এক ছেলে —বড্ড ধরাধরিতে দশ-বিশটা পাখপাখালি জন্তু-জানোয়ারের ডাক শেখালেন, আসল বস্তু কিছু নয়। আপনার কথার জবাব তো চাই—ধানাই-পানাই বলে মুখ রাখেন। আসলে মহাকঞ্জুষ। হচ্ছেও তেমনি। আজামশায়ের (দাদামশায় বলে না এ তল্লাটের মানুষ—আজামশায়) কষ্ট দেখে শিয়ালটা কুকুরটা অবধি কেঁদে যায়।

বলাধিকারী বলেন, বাহাদুরি করে বেঁচে এসেছে, কিন্তু মরার বাহাদুরি দেখাতে পারল না। কষ্ট সেই দোষে।

সাহেব এর মধ্যে কথা বলে ওঠে: দোষ হল বয়সের। বয়স হলে কার না এমন হয়!

বলাধিকারী উত্তেজিত হয়ে বলেন, সেইটে হবার আগে মরে যাবে। বাঁচার জন্যে যেমন বিবেচনা আছে, মরার জন্যেও তাই। পচা বাইটা অর্ধেকটা জিতে আছে—বড় জাঁকজমকের জিত। বাকি অর্ধেকে বেদম হার তেমনি। একই মানুষের এমনিধারা দু-চেহারা কেমন করে হয়, কেন হতে দেয়, তাই ভাবি।

বংশী অবাক হয়ে বলে, মরা তো নিজের হাতে নয়। যমরাজ যেদিন নিয়ে নেবেন—

হুঙ্কার দিয়ে বলাধিকারী মুখের কথা থামিয়ে দিলেন: হাতে নয়—কি বলছ তুমি! মানুষ মারতে পারে নিজের হাতে, মরতেও পারে নিজের হাতে। জীবন-

মরণ মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেইজন্যে তো বাঁচোয়া। সেই হল মানুষের বড় শক্তি, মস্তবড় বলভরসা।

না বুঝে বংশী হাঁ করে থাকে। সাহেবেরও চমক লাগে—চমকে তাকায় বলাধিকারীর দিকে। নফরকেষ্টর কোনরকম হাঙ্গামা নেই—খাসা অভ্যাস। কাজের সময় কাজ, বাকি সময় ঘুমানো। দাঁড়ানো-বসা-শোওয়া ইত্যাদি অবস্থা এবং সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ইত্যাদি সময় নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বসে বসেই আপাতত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মউজ করে ঘুমুচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনিতে পরিচয়।

হাতের খবরের-কাগজটা তুলে ধরে বলাধিকারী বললেন, খবর বেরিয়েছে, অসমসাহসী এক ছেলে দিন দুপুরে কলকাতার চৌরঙ্গির উপর সাহেবকে গুলি করেছে। হাজার মানুষ সেখানে, তাড়া করে ময়দানের মধ্যে ধরেও ফেলল। ধরেছে কিন্তু ছেলেটিকে নয়—একটা মড়া। পকেটে বিষ ছিল, ছেলেটি মৃত্যুর ঘুলঘুলি দিয়ে সরে পড়েছে পুলিসকে কলা দেখিয়ে। এই মরার ছিদ্রটুকু আছে বলেই তো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়—অসহ্য হলে ছিদ্রপথে টুক করে বেরিয়ে পড়ব।

দম নিয়ে আবার বলেন, শুধু এই একটি ছেলেরই ব্যাপার নয়। মরামরা খেলা চলছে যেন বাংলাদেশ জুড়ে। ভুপি-দার সঙ্গে ছোটবেলা এক ইস্কুলে পড়েছি। পড়া প্যারত না বলে পণ্ডিতমশায় মেরে ভুত ভাগাতেন। হঠাৎ দেখি ভুপি-দা দেবতা—সেই পণ্ডিত গদগদ হয়ে ভুপি-দার কথা আমায় বললেন। মরার খেলায় নামজাদা খেলোয়াড় হয়েছে বলে। আজ এমনি ব্যাপার—হাতে রিভলবার বোমা একটা কিছু থাকলেই সে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। রিভলবার মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু—মৃত্যু দিতে পারে সে-মানুষ, মৃত্যু নিতেও পারে নিজের উপর। ভুপি-দার এক বুড়ি-ঝি ছিল। আপন কেউ নয়, অনেক কাল ধরে আছে এই পর্যন্ত। শিক্ষাদীক্ষাহীন পঁচাত্তর বছুরে বুড়ির কাছেও ভুপি-দা দেবতা। সেই বুড়ি-ঝির একটা গল্প বলি শোন।

বলছেন, ভুপি-দা বাড়ি নেই, বোমা আছে বাড়িতে। পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, ভোর হলেই সার্চ হবে গ্রামের মানুষ সাক্ষি ডেকে এনে। বুড়ির মনে এলো, ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয় গোলমেলে বস্তু। কী করা যায়। জিনিস পুলিসের হাতে পড়লে বাবুর তো রক্ষে রাখবে না। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল বুড়ির—দরদ থাকলে আসে মাথায় বুদ্ধি। বুড়ি করল কি—ভাত রান্নার যে উনুন, তার তলায় গর্ত খুঁড়ল খন্তা দিয়ে। বস্তুটা গর্তের ভিতর দিয়ে মাটি চাপা দিল উপরে। তার উপরে ছাই। রান্নাবান্না হয়ে গিয়ে উনুনে যেন ছাই জমে আছে। একবার ভেবেছিল, ছাইয়ের উপর গনগনে আগুন কিছু থাকলে কেমন হয়! বিচার করে দেখে, রান্না তো সেই সন্ধ্যারাত্রে হয়ে গেছে, সকাল অবধি আগুন থাকে কি করে? ভাগ্যিস দেয়নি আগুন—বোমা ফেটে তাহলে কী কাণ্ড হয়ে যেত! ভুপি-দা হাসতে হাসতে একদিন এই গল্প করেছিল। কলেজে পড়ি তখনও আমি।

এবার বলাধিকারী বংশীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার মাতামহ চতুর মানুষ বটে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি। বয়সকালে বুদ্ধির খেলা খেলে বেড়িয়েছে, কিন্তু বয়স কাটিয়ে এসে উপর দিককার মুক্তির ঘুলঘুলিটা দেখতে পায় না। তাহলে এত হেনস্তা সইত

না, কবে এদ্দিন পালিয়ে বেরুত। মরা জিনিসটাই বোঝে না বাইটামশায়। ভারি ভারি কাজ হাসিল করেছে—মরা দুরস্থান, একটা আঁচড় পর্যন্ত কারো গায়ে লাগে নি। না নিজের, না কোন মক্কেলের। সে বটে কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। বড়ভাইটা যেমন ছিল, ছোটভাইও প্রায় তাই। বেচা মল্লিক, শুনতে পাই, ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় পরেছিল।

বংশী চুপচাপ এতক্ষণ। বলাধিকারীর কথাবার্তা কানে ঢুকেছে ঠিকই—অন্য কানের ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল। বলল, আজামশায় সাগরেদ চায়। আপনাকে বলেছে, আপনিই তবে আমার নামটা উত্থাপন করে দিন। আপনার খাতিরে যদি নরম হয়। নয়তো যা গতিক—সকল গুণজ্ঞান বুড়োর সঙ্গে এক চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কাতর হয়ে বলে, দুই মামা আমার দুই পথের পথিক—কেউ কিছু নিতে গেল না। একমাত্র নাতি আমিই তাহলে লোকত ধর্মত ষোলআনা হকদার। বলুন তাই কিনা? এদ্দিন ধরে আঁকুপাঁকু করে বেড়াচ্ছি—এবারও মামার-বাড়ি সেই মতলব নিয়ে যাওয়া। তা সে-কথার আঁচ দিতে গেলে বুড়ো তেড়ে মারতে আসে। বলে, শিয়াল-কুকুরের ডাক শিখিয়েছি—সেই তো ঢের।

বলাধিকারী হো-হো করে হেসে উঠেন: যা বলেছি, বাইটা মশায়ের নজরটা খাটো কিন্তু বুদ্ধি ঝকঝকে পরিষ্কার। গুণ-জ্ঞান তোমায় দিতে যাবে কেন? ময়লা ঘটিতে ভাল দুধ রাখলেও কেটে যায়। তুমি পেলে সে জিনিস কাজে আসবে না, পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুবে। নাতিকে ভালরকম জানে কিনা—কুকুর-শিয়ালের ডাকগুলো দিয়েছে, জন্তুটন্তু ভাবে হয়তো।

বংশীর অপ্রতিভ মুখ দেখে বলাধিকারী কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেন: গুণজ্ঞান নিয়ে কী-ই বা করবে তুমি? ছিটেফোঁটা যা আছে তা নিয়েই তো বউয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ কোন্দল।

বংশী বলে, বউ কিছু টের পাবে না। মেয়েমানুষ জাত, ঠকাতে কি! আবার তা-ও বলি—এখন স্যাকরার সানানা ঠুকঠাক, টাকাটা সিকেটার ব্যাপার জাতই যায়, পেট ভরে না। জাত-কামারের মত ভারী ভারী ঘা মারতে পারি যদি কখনো এক এক ঘায়ে এক-শ দু-শ ছিটকে এসে পড়ে—সেদিন ঐ বউই দেখতে পাবেন সোহাগে গলে গলে পড়ছে।

আকাশ-ছোঁয়া ঝাউয়ের সারি নজরে আসে। ফুলহাটা এসে গেল। বড়গাঙ ছেড়ে খালে ঢুকবে, মোহানার উপর নীলকুঠি। নীলকর সাহেবরা সারি সারি ঝাউগাছ পুঁতে কুঠির বাহার বাড়িয়েছিল—কত কালের সাক্ষি সুদীর্ঘ বিশাল গাছগুলো।

কুঠির কাছাকাছি এসে বলাধিকারীর মুখে আবার মৃত্যুর কথা। ঐ ভাবনায় আজ পেয়ে বসেছে। হাত তুলে সাহেবকে দেখান: ছাতের কার্নিশের সেই জায়গাটা রাত্রিবেলা দেখা যাচ্ছে না। একদিন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে দোতালার উপর তুলে ভাল করে দেখিয়ে আনব। মৃত্যুর সঙ্গে ওখানটা মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। চোখ-মুখ বাঁধা, পা বাঁধা—বিশ্ব-সংসার কিছুই আমার কাছে নেই। দু-খানা হাতের

জোরে কার্নিশ ধরে ঝুলছি, দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরে আছি জীবনটা। বন্ধ চোখ বলেই মৃত্যুর চেহারাটা সামনের উপর পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তার পরে এক সময় হাত ছেড়ে দিয়েছি। সবাই ভাবে, বাধ্য হয়ে ছেড়েছি, শক্তিতে আর কুলোয় নি বলেই। কিন্তু ধারণা ভুল। ঠিক সেই ক্ষণের অনুভূতিটা এখনো আমি স্পষ্ট ভাবতে পারি। মৃত্যুর সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়ে ব্যাকুল আনন্দে হাত ছেড়েছিলাম—মৃত্যু কোল পেতে ধরবে বলে। পরিচয় করে না বলেই তো মৃত্যু নিয়ে লোকের অকারণ ভয়।

সাত

ঘাটে নেমে বংশী নিজের বাড়ি চলল। নৌকায় এই পথটুকুর মধ্যেই ভাব জমে গেছে সাহেবের সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে ফিরে আসে আবার, সাহেবের কানে কানে উপদেশ দেয়। ঠিক এই কথাগুলোই ইতিমধ্যে আরও অনেকবার হয়ে গেছে: মানুষ ভাল বলাধিকারীমশায়। মস্তবড় মহাজন। পাকসাট মেরো না, ঠাণ্ডা হয়ে থেকো। যা বলবেন, হেঁ-হেঁ করে যাবে। কাজ করতে বললে মুখের কথা মুখে থাকতে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শ্বশুরবাড়ি মেয়ে পাঠানোর সময় মা-খুড়ি-পিসি যেমন বলে দেন। বলে, সব জায়গায় বলাধিকারীর খাতির। ঐ মানুষের নজর ধরেছে, কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমিও রইলাম—এই গাঁয়ের মানুষ, শতেক বার দেখা হবে। সকালবেলাই যাব। সকালে না পেরে উঠি তো বিকালে।

খুলনার নৌকাঘাটা থেকেই বলাধিকারীর খাতির দেখতে দেখতে আসছে। কিন্তু বাড়ীর উঠানে এসে সাহেবের ভক্তি চটে যায়। পেট-মোটা প্রকাণ্ড আয়তনের গোলা, পিছন দিকটায় খান তিন-চার মেটে-দেয়ালের ঘর। এই মাত্র। ওর মধ্যে একটি বৈঠকখানা। তক্তাপোশ জুড়ে ফরাস—ফরাসের উপরে চাদর জোটেনি, শুধুই মাদুর। নিয়মমাফিক হাতবাক্স ফরাসের প্রান্তে—বাক্সের উপরে কাগজপত্র রেখে হিসাব লেখা হয়, ভিতরে টাকাপয়সা। পেরেক ঠুকে ঠুকে হাতবাক্সের সর্বঅঙ্গে যেন কুষ্ঠব্যাধি।

কী কাজে এসেছে একটা লোক, তক্তাপোশের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। এবং রোগা লম্বাটে একজন কান-ফোঁড়া খাতায় হিসাব টুকছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—জগবন্ধু বলাধিকারী নাম বলে দিলেন। ক্ষুদিরাম হাতবাক্স থেকে টাকা-রেজকি বের করে থাক দিয়ে লোকটার সামনে রাখে, গণে নিয়ে থলিতে ভরে লোকটা চলে যায়। অতএব গোমস্তা ও ক্যাশিয়ার হল ক্ষুদিরাম। চেতলার পুরুষোত্তম সা'র গদিতে এমনি ছিল। পাখনার কলম নিয়ে হাতবাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে সমস্ত দিন বসে বসে লিখত।

কুষ্টগ্রস্ত হাতবাক্সের মহিমা সাহেব পরে একদিন শুনেছিল ক্ষুদিরামের কাছে। মন্দ

লোকের রিপোর্ট পেয়ে সদর থেকে খোদপুলিসসাহেবের হঠাৎ জুতার ধুলো পড়ল এই ঘরে। খাতাপত্তর দেখে বাক্স উলটেপালটে টাকাপয়সা গুণেগেঁথে দেখে—আনায়-গণ্ডায় মিল। আরে বাপু থাকেই যদি কিছু, তুই ধরবি সাহেবের পো! পুলিশের কর্তা যতই চতুর হোক, জগবন্ধু বলাধিকারীর চেয়ে বেশি নয় কখনো। হাতবাক্সটা বড় পয়মন্ত—কাঠ বদলে কবজা-পতর পালটে তালি দিতে দিতে আদি জিনিসের প্রায় কিছুই বজায় নেই। তবু ফেলা যাবে না।

জগবন্ধু বললেন, পাকশাকের ব্যবস্থা করে ফেলুন ভটচাজমশায়। ও-বেলা ভাত পেটে পড়েনি। এই দু-জনের চাল বেশি করে নেবেন আজ থেকে। থাকবে এখানে। কাজকর্মে লাগিয়ে দেব বলে টেনে নিয়ে এলাম। কাজলীবালাকে দেখছিনে, শুয়ে পড়ল নাকি?

সাহেব ও নফরকেষ্টর আপাদমস্তক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বারম্বার নিরীক্ষণ করে। আগন্তুক দুটির প্রতি অঙ্গ বুঝি মুখস্থ করে নিচ্ছে। গোমস্তা ও ক্যাসিয়ার ছাড়া ভট্টাচার্যের অতএব আর কি পরিচয়—পাচক। দু-পাঁচ দিনেই অবশ্য জানা গেল, এ সমস্ত বাইরের চেহারা, ভুয়ো পরিচয়। মানুষ যা-কিছু কামনা করে সমস্ত আছে এই ক্ষুদিরামের। অশীতিপর বাপ-মা এখনো বর্তমান। ভাইরা সকলেই কৃতী। স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও বুঝি গোটা দুই। নিজেও ক্ষুদিরাম মূর্খ নয়—এককালে বাড়িতে টোল ছিল, সেই রেওয়াজে বাপ এই কনিষ্ঠ ছেলেকে সংস্কৃত পড়তে দিয়েছিলেন। সকলকে নিয়ে জমজমাট একান্নবর্তী সংসার, ক্ষুদিরামই কেবল ভাঁটি অঞ্চলে নোনা জল খেয়ে এইভাবে পড়ে থাকে। সর্বস্ব ছেড়ে এসেও বংশ-গরিমা ছাড়তে পারেনি, যার তার হাতের রান্না চলে না। রান্নাঘরে সেই গরজে ঢুকে পড়তে হয়।

দেখাদেখি বলাধিকারীও যান কখনো কখনো। কিন্তু ক্ষুদিরাম থাকতে হবে না, হাতা-খুন্তি কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয়। কী আর করবেন, মনো-দুঃখে নিজ ঘরে ঢুকে পড়ে তখন। সে ঘর বইয়ে ঠাসা। স্ত্রী নেই, দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মহানন্দে সংসারধর্ম করছে—ত্রিসংসারের মধ্যে বলতে গেলে আছে কেবল বই। অবসর পেলেই জগবন্ধু বইয়ের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রী থাকতে ঠাকুরদেবতারা এবং প্রচুর জপতপ ছিল। সমস্ত গিয়ে এখন তেত্রিশ কোটির মধ্যে শুধুমাত্র মা-কালীতে এসে ঠেকেছে। তা-ও যে কতখানি ভক্তির বশে আর কতটা কাজকর্মের গরজে, ঠিক করে বলা যায় না।

না, ভুল বলা হল। মেয়ে যে আরও একটি—কাজলীবালা। শুয়ে পড়ল নাকি কাজলীবালা—ক্ষুদিরামকে বলাধিকারী জিজ্ঞাসা করলেন। বলতে বলতে কাজলী-বালা এসে পড়ল।

বলাধিকারী বললেন, তাড়াতাড়ি যোগাড়যন্তর করে দাও কাজলী। ভটচাজমশায় রান্না চাপাবেন।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জানিস রে খোকনচন্দোর, এই হল কাজলীবালা। আমার মেয়ে।

কটকটে কালো রং, উদ্দাম দাঁতের ছড়া ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিত কুদর্শন। কোমল-মধুর স্বরে তার পরিচয় দিচ্ছেন। এই কণ্ঠ যেন বলাধিকারীর নয়, বুকের ভিতরে থেকে অন্য কেউ বলছে। বললেন, ছোট মেয়েটাও বিয়ে হয়ে চলে গেল, এই মেয়ে তখন ফাঁকা ঘরে এসে উঠল। ঘর আমার ভরে রেখেছে। বড্ড সৎ—

হেসে উঠলেন: বোকা কিম্বা ভীরু—তারাই সৎ হয়। কাজলী আমার ভীরু একটুও নয়, বোকা। জীবনে এত পোড় খেয়েও বুদ্ধি কিছুতে জন্মাল না—সৎ রয়ে গেল।

কাজলী কলকল করে বলে, সামনের উপর সদাসর্বদা আপনাকে দেখি, অসৎ হই কী করে? ইচ্ছে হলেও তো পেরে উঠিনে।

রান্নার যোগাড়ে দ্রুত সে রান্নাঘরে ছুটল। হাসিমুখে ক্ষুদিরাম খুব উপভোগ করছে। বলে, হল তো? মুখের উপর কেমন জবাবটা দিয়ে গেল? অসৎ বলে দেমাক করতে যান, এমন যে কাজলীবালা সে পর্যন্ত মানে না।

নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী বলেন, কি জানি! সৎই ছিলাম বটে একদিন। ফুল শুকিয়ে গিয়ে এখন কটুফল। ফলের চুড়োয় আধশুকনো ফুল একটু যদি থাকে, দায়ী তার জন্যে ঐ কাজলীবালা। শুকিয়ে একেবারে নিঃশেষ হতে দেয় না।

সাহেবকে এনে যখন ফেলেছেন, কাজকর্মে ঠিক লাগিয়ে দেবেন। সঙ্গী নফরকেষ্টও বঞ্চিত হবে না। দেবেন বলাধিকারী ঠিকই—দুটো দিন আগে আর পরে। সে-কাজ ধান-কাটা কিম্বা ডাক্তারি অথবা গুরুগিরি নয়, তা-ও বুঝতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে সাহেবকে একান্তে ডেকে নিয়ে স্ফূর্তি দেন: শহরে দেখে এসেছিস বাঁধা নিয়মের কাজকর্ম—পাঁচটা সাতটা দশটা রাস্তার মধ্যে। এখানে এলাহি কাণ্ডকারখানা—অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কপালে জয়পত্র এঁটে ডাঙা-ডহর ভেঙে ছুটোছুটি। তোরও একদিন জয়জয়াকার পড়ে যাবে। দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। রোজগারের কথা ধরিনে—দোকানদার-অফিসার ফড়ে-চাষা রোজগার সবাই করে থাকে। নামযশ পাবি অঢেল—সেকালে যেমন ছিল পচা বাইটা, একালের যেমন কেনা মল্লিক। চাই কি ছাড়িয়েও যেতে পারিস ওদের। কার ভিতরে কতখানি বস্তু, কাজে না পড়লে সঠিক নিরিখ হয় না।

কাজ হবে-হবে করছেন, এমনিভাবে মাসখানেক কেটে গেল। শুয়ে বসে সাহেবের দিন কাটে না, ছোঁক ছোঁক বেড়ায়, অধীর হয়ে এক এক সময় বলাধিকারীর কাছে গিয়ে পড়ে। নফরকেষ্টর মহৎ গুণ, ঘুম জাগরণ একেবারে তার হাত-ধরা। কাজ পড়ে গেল তো পাঁচ-দশটা অহোরাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কাজ নেই তো সারাদিন ও সমস্ত রাত অবিরাম ঘুমোয়। ফুলহাটায় এসে মনের সাধে সে ঘুমোচ্ছে। দুপুরের আহার শেষ হতে না হতে ঘুমে ঢলে পড়ে, মাঝে একবার রাত্রিবেলা ভাতের থালাটা সামনে এনে ঠেলেঠুলে তুলে দিতে হয়—একটু ক্ষণের ঐ

বিরতি। নফরকেষ্টর সময় কাটানোর অসুবিধা নেই।

বলাধিকারী বলেন, ছটফট করিস কেন, জলে পড়ে যাসনি তো! দেখে-শুনে হাসিস্ফূর্তি করে বেড়া। ছুটকো-ছাটকা যদি কিছু মেলে সেই সন্ধানে আছি। তার বেশি এবারে হয়ে উঠবে না। সামনের মরশুমটা আসতে দে না—লুফে নেবে তোর মতন ছেলে।

চুকচুক আওয়াজ তুলে বলেন, দুটো মাসও আগে যদি পেতাম! কেনা মল্লিককে বললে সোনা হেন মুখ করে কোন একটা দলের সঙ্গে রওনা করে দিত। নতুন বলে হাতে কাজ করতে দিত না, তাহলেও ধারাটা দেখে বুঝে আসতিস। এ মরশুমে কিছু হবে না, কারিগরলোক সব বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ায়পাড়ায় ঘুরে দেখ—বুড়ো বাচ্চা আর মেয়েলোক। সমর্থ জোয়ানপুরুষ কদাচিৎ এক-আধটা।

ঘুরে ফিরে একটা নাম কেবলই আসে—কেনা মল্লিক। কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। কেনার নামে সকলে তটস্থ। ভরা মরশুমে মল্লিকের দলবল চতুর্দিকে এখন রে-রে করে বেড়াচ্ছে। কাপ্তেন নিজেও ঘরে বসে থাকে না, আলাদা পানসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বিজয়া দশমীর ঠিক পরের দিন। শরৎকাল দিগ্বিজয়ে বেরুনোর সময়। রাজ-রাজড়াদের সেই পুরোনো রীতি কেনা মল্লিক এবং তার আগে বেচারাম মল্লিক ভাঁটি-অঞ্চলে বজায় রেখে আসছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বংশী এসে ডাকে: চল সাহেব, একটা জায়গায় ঘুরে আসিগে।

সাহেব অর্থভরা হাসি হাসে: সত্যি রে?

বংশী কিন্তু গম্ভীর। বলে, রাতে বেরুনোর কথা আমাদের মুখে শুনলেই লোকে ভিন্ন রকম ভেবে নেয়। তুমি পর্যন্ত। বিয়ে করতে যাব, সেইদিন সকালেও এক স্যাঙাত বলছে, সত্যি কথাটা ভাঙ দিকি ভাই—কোথায়? যেন দুনিয়ায় আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই—সুখসর্বস্ব যা কিছু ঐ। কাজ অষ্টরম্ভা, নামটা আছে কিন্তু আমার। পচা বাইটার নাতি, সেই সুবাদে। এ নাম একবার রটলে সাগরের জল ঢেলেও ধুয়ে ফেলা যায় না।

সাহেব বলে, কী এমন বললাম যে একগাল কথা শোনাচ্ছ! কোন তীর্থধর্মে যাওয়া হবে, তাই জানতে চেয়েছি শুধু।

বংশী বলে, ইস্কুলবাড়িতে—ছোটমামা যেখানটা আস্তানা নিয়েছে। ধর্মের জায়গা বানিয়ে তুলেছে, ফেরার সময় পুণ্যি অনেকটা জড়িয়ে আসবে দেখো।

ছোটমামা মুকুন্দ। মুকুন্দ বর্ধন—সোনাখালির পচা বাইটার কথা হয়ে থাকে, তার ছোটছেলে। মুকুন্দকে নিয়ে বংশী যখন তখন গালিগালাজ করে। বলে, পাকা মানুষ হয়েও আজামশাই ভুল করে বসলেন—পণ্ডিত বানাতে গেলেন ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে। উচিত প্রতিফল তার। জন্মদাতা পিতার নামে নাক সিঁটকায়। সোনাখালির এমন ঘরবাড়ি ছেড়ে ইস্কুলে পড়ে থাকে। বর্ধনকুলের মুশল।

সাহেব বলে হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু পাপী দৈত্য, প্রহ্লাদ মহাভক্ত। বাপ বেটায় ধুন্দুমার—

বংশী লুফে নিয়ে বলে, ঠিক তাই। ছোটমামার ঐ মতিগতি, তার উপর জুটল এসে ছোটমামীটা। সে এক পোঁটাচুন্নির বেটি পদ্মবিলাসী। গায়ে একটু চিকন ছটা, সেই দেমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে। পাপের ছোঁয়া লেগে না যায়। ঘরের বউ পুরুষকে কোথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে—সে-ই আরো বেশি করে বিগড়ে দিল ছোটমামাকে।

একলা মুকুন্দকে নয়, ঐ সঙ্গে তার বউকে জুড়ে বংশী নিন্দেমন্দ করে। পচা বাইটার নামে সাহেবের আগ্রহ, তার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে চায়। বাইটার ঘরসংসারের যাবতীয় কথা। গুণী মানুষটা বয়স হয়ে গিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে। যার জন্য বলাধিকারী বুড়োকে মরতে বলেন। মরেছে কি বেঁচে আছে, উঁকি দিয়ে দেখে না বাড়ির লোক। তেষ্টায় চিঁ চিঁ করছে, জলটুকু এগিয়ে দেবার পিত্যেশ নেই। বড়ছেলে মুরারি জমিদারি সেরেস্তার নায়েব। জমিদারের কাজ এবং নিজেদের যে সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। বড়বউয়ের এক গাদা ছেলেপুলে, কাঁধের উপর সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি। কিন্তু বাঁজা-মানুষ ছোট ঠাকরুনের ঝক্কি-ঝামেলা নেই, ফুলেল তেল মেখে গতর দুলিয়ে বাহার করে বেড়াবে—

একফোঁটা মেয়ে সুভদ্রা বউ হয়ে এল, পচা বাইটা তখনও শক্তসমর্থ। মুকুন্দ একটা পাশ দিল সেবার। বাইটার ছেলে হয়ে হেন কাণ্ড করে বসল, লোকে তাজ্জব বনে গেছে। পাশ-করা বরের বউ হয়ে সুভদ্রারও মাটিতে পা পড়ে না। আর কিছুকাল পরে বউ খানিকটা সোমত্ত হয়ে বরের কানে বিষমন্তোর দেয়ঃ তুমি বিদ্বান হলে, কিন্তু বাড়ির নিন্দে গেল না। চোরের বাড়ি বলে মানুষ আঙুল দেখায়। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠে চোর-শ্বশুরের মুখ দেখতে হয়। বাইরের কোথাও কাজ-কর্ম দেখ। দু-জনে বাসা করে ধর্মভাবে থাকা যাবে।

সত্যি সত্যি এই বলেছিল কিনা, ধর্ম জানেন। কিন্তু লোকে বলে। সুভদ্রার নাক-সিঁটকানো দেখে বিশ্বাসও হয় তাই। গোড়ার দিকে ফিসফিসানি। বয়সের সঙ্গে গলা চড়তে চড়তে ক্রমশ রুদ্রমূর্তি। দিশা না পেয়ে মুকুন্দ ফুলহাটায় ভাগনে বংশীর বাড়ি এসে উঠল। বাইটার নাতি, এবং সেই পথের পথিক বলে বংশীরও অল্পসল্প নাম হতে শুরু হয়েছে। লোকে বলে, বাইটার বেটা লেখাপড়া শিখে নতুন কায়দায় কাজ ধরবে। পীঠস্থানে এসে পড়েছে—মাথার উপরে বলাধিকারী, পেছনে বংশীধর। অতএব তাড়াতাড়ি সে মাইনর ইস্কুলের এই মাষ্টারি কাজ জুটিয়ে নিয়ে বংশীর বাড়ি ছাড়ল। কলঙ্ক মোচন করল। সেই থেকে আছে। স্বামী-স্ত্রী ধর্মবাসা বানিয়ে একত্রে থাকবে, আজও সেটা ঘটে ওঠেনি। গোড়ায় পনের টাকায় ঢুকেছিল, এখন শোনা যায় পঁচিশ। ইস্কুলের মাইনের কথা ঠিকঠাক বলবার জো নেই—খাতায় লেখে হয়তো পঞ্চাশ। যত বড় সাধু মাস্টার হও, এটুকু করতে হবে। সবাই করে সকলে জানে। যে ইন্সপেক্টরকে দেখাবার জন্য করতে হয়, সে ভদ্রলোকও জানে নিশ্চয়। এই মাইনেয় ধর্মবাসা হয় না। ছোটবউ অগত্যা

চোর-শ্বশুর এবং নায়েব-ভাসুরের ভাতেই পড়ে আছে। মরমে মরে থেকে দু-বেলা দুই থালা অন্ন কোন গতিকে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

সন্ধ্যারাত্রে বংশী এসে বলল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, এখানে দু-জনে বসে ভুটুরভুটুর করে কি হবে? সে তো রোজই আছে। ইস্কুল-বাড়ি যাচ্ছি, তুমি চল।

সাহেব বলে, মতলব কি, বউয়ের তাড়ায় আবার ক-খ-ঠ শুরু করবে নাকি? সুবিধেও রয়েছে, তোমার ছোটমামা নিজে মাষ্টার—

সে কি আর এই বয়সে! সময় থাকতে তুমি যা-হোক খানকটা করে নিয়েছ।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু বউ বলছে লেখাপড়া না হোক, ভাল হওয়া নাকি সব বয়সেই চলে। বলি, এমনি তবু দু-চার পয়সা আসে, ভাল হয়ে গেলে খাব কি শুনি? মেয়েমানুষ জাত, হিসেবজ্ঞান নেই—আদাজল খেয়ে ঘাড়ে লেগেছে। তা ভাবলাম একটা দিনেই কিছু আর ভাল হয়ে যাচ্ছিনে, দেখেই আসি না কেমন। খানিক পথ গিয়ে মনে হল, একলা না গিয়ে দোসর নেওয়া ভাল—একা না বোকা। তোমার কাছে চলে এসেছি।

বংশীর ভাব দেখে না হেসে পারা যায় না। হেসে উঠে সাহেব বলে, কী ব্যাপার ইস্কুলবাড়িতে?

একলা পড়ে থাকে ছোটমামা—দিনমানে ইস্কুল, সন্ধ্যার পর কি করে? কিছু-দিন থেকে তাই পাঠ ধরেছে। গীতা-পাঠ হত গোড়ায়, সে কটোমটো জিনিষ শোনার মানুষ হয় না। গীতা ছেড়ে আজ ক'দিন ধরে রামায়ণ ধরেছে। খুব জমেছে নাকি, নিত্যিদিন বউ সেখানে যায়। আমায় যেতে বলে। আজকে বড্ড শাসিয়ে গেছে।

বিরস মুখে বলে, সীতা বনে গেলেন রামের পেছন ধরে। কলির সীতার উল্টো ফরমাস, তার পিছন ধরে আমায় গিয়ে রামায়ণে বসতে হবে। আসরে না দেখতে পেলে বাড়ি ফিরে আজ মুণ্ডু থেঁতো করবে, সতীলক্ষ্মী বলে গেছে।

অগত্যা সাহেবকে উঠে পড়তে হয়। বলে রামায়ণ গান দিয়ে গৃহস্থ ভূত তাড়ায় শুনেছি। আমার মতন জ্যান্ত ভূত সেইখানে নিয়ে চললে বংশী—

বংশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, এই কথায় হেসে ফেলেঃ সে বটে এক সময় ছিল ক্ষুদিরাম ভটচাজের গান। ইঁদুরে খাওয়া হারমোনিয়াম আছে একটা, তার বাজনা। বাজনা বলে আমায় দেখ, গান বলে আমায়। ইদানীং আর শুনিনে। রামায়ণ তো রামায়ণ—ওঝার মন্তোরও তার কাছে লাগে না, ভূতের ঠাকুরদাদা বেহ্মদত্যি অবধি পৈতে ছিঁড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। ছোটমামার পাঠ তেমন নয়—শুনেছি খুব মিষ্টি। আমার বউ একটা দিন গিয়েই জমে গেল। সন্ধ্যে হলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে গিয়ে পড়বে।

সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'এই দেখ, ভয় ধরিয়ে দিলে। আমিও যদি জমে যাই—শখ করে এক দিন গিয়ে রোজ রোজ যেতে হয় যদি। বলা যায় না

কিছু—শেষটা হয়তো ভস্ম মেখে সোঁদালফলের মত ছড়া ছড়া জটা ঝুলিয়ে সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সে নাকি বড় কষ্ট—ভক্তদের ঘি-দুধের সেবায় যা-কিছু রক্ত হল, মশা-ছারপোকায় তার ডবল টেনে নেয়। খাস কালীঘাটের আসল সাধুর মুখে শুনেছি।

হেসে ওঠে সাহেব, সে হাসিতে বংশী যোগ দিল না। বলে সাধু হলে একটা দিক বড় বাঁচোয়া। একদিন দেখি, থানার বড়বাবু ঘাড় নিচু করে ছোটমামার গীতা-পাঠ শুনছে। হিংসা হচ্ছিল—মামার কাছে কেঁচো হয়ে বসেছে, আমার কাছে সেই মানুষ বাঘ। কষ্ট ছোটমামার যা-ই হোক, চৌকিদার-দারোগার চোখ-রাঙানি নেই। ঐ লোভে এক এক সময় সাধু হতে ইচ্ছে করে।

আসরের একটা কোণ নিয়ে দুজনে বসে পড়ল। মুকুন্দ মাস্টারের অভিপ্রায় ছিল, সৎপ্রসঙ্গ করে ছাত্রের নৈতিক চরিত্রের বনিয়াদ গড়বে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পড়া মুখস্থ না করে কোন ছেলে পাঠ শুনতে আসবে? গার্জেনেরও ঘোরতর আপত্তিঃ লেখাপড়া করে আখেরের ব্যবস্থা করুক এখন, ধর্মকথা শোনার সময় অনেক পরে—বুড়ো হয়ে পড়লে। আসর তবু দিব্যি জমেছে। ছেলে না পাঠিয়ে ছেলের মা-বাপ মাসি-পিসিরা আসে। যাদের ছেলেপুলে পড়ে না, তারাও সব আসে। মরসুম পড়ে বাড়ির জোয়ানমরদেরা বাইরের কাজে চলে যাবার পর ভিড় অতিরিক্ত রকম বেড়েছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকেও এসে জোটে। জলচৌকির উপরে পাঠের আসন। সামনের পিতলের ফেরোয় সিঁদুর ও আম্রপল্লব দিয়ে ঘটস্থাপনা হয়েছে। পাঠের আগে ও পরে সেই ঘটের সামনে গড় হয়ে বিড়বিড় করে সকলে কামনা জানায়ঃ কাজকর্ম খুব ভাল হয় যেন ঠাকুর, থলি-ভরা টাকা নিয়ে ঘরের মানুষরা সুভালাভালি ঘরে চলে আসে। যত দিন তারা না ফিরছে তল্লাটের মানুষ কোন রকম ধর্মকর্ম বাদ দেবে না। তাদের পাপে এদের পুণ্যে কাটাকাটি। ভক্ত শ্রোতা পেয়ে মুকুন্দও প্রাণ ভরে লেগে যায়।

বংশী ফিসফিসিয়ে বলে, ঐ দেখ আমার বউ। ঘোমটার ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আড়ে লম্বায় চৌকো মাপের ঐ যে বউটা। অবাক হবার কি আছে—আমি সরু বলে বউয়ের বুঝি মোটা হতে নেই। আঃ, আঙুল দিয়ে দেখিও না, রেগে যাবে।

থতমত খেয়ে সাহেব হাত নামিয়ে নেয়ঃ তা বটে! ভুতপেত্নি বাঘ আর স্ত্রীলোককে আঙুল দেখাতে নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

বংশী হেসে ফেললঃ কি জানি বাবা, বাঘ ভুতপেত্নি সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু ঐ যে দেখছ গদগদ হয়ে পাঠ শুনছে, বাড়ির উঠোনে পা দিলেই মারমূর্তি। গাছের কুল পাড়ার মতো আমায় যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঝাঁকায়।

হাসির ছলে প্রথম দিন সাহেব যা বলেছিল, সত্যি বুঝি তাই খেটে যায়। খাসা পাঠ মুকুন্দর, প্রাণ কেড়ে নেয়। খানিকটা বুঝি নেশা ধরে গেল, প্রায়ই সে আসে।

বংশীই বরঞ্চ পাকসাট মারতে চায়, ঠেলেঠুলে সে-ই আনে বংশীকে। আসর সুদ্ধ লোক ঘন ঘন সাহেবের দিকে তাকায়। তার চেহারার গুণে। গুণ নয়, অভিশাপ—চেহারাটার উপরে যত মানুষের নজরগুলোর অবিরাম খোঁচাখুঁচি। অস্বস্তি লাগে। তবে এখানে এই আসরে বসে একটা নতুন উপলব্ধি—পাঠ আরম্ভ হতেই ভিন্ন লোকে চলে যায় সে যেন। অন্যে কি করছে, খেয়াল থাকে না।

রাম-বনবাসের জায়গাটা হচ্ছে সেদিন। সাহেব তদগত হয়ে শুনছে। রামচন্দ্রের মতন তারও বনবাস। কোন রাজবাড়িতে জন্ম হল তার—সাতমহল অট্টালিকা, অগুণতি দাসদাসী, হীরা-মাণিকের ছড়াছড়ি—সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে পুরী থেকে নির্বাসন দিল। বারো বছর কবে পার হয়ে গেছে, দুই বারো হতে যায়—ফেরার দিন কই আসে না। কোন দিনই আসবে না। ঠিকানাই জানে না কোথায় তার অযোধ্যাপুরী। ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যে নিশিরাত্রে চুপি চুপি পুঁটলিতে পুরে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিল। ঘুমে অচেতন পুরবাসী, কেউ কিছু জানলই না—কেমন করে আকুল হয়ে রামের পিছন ধরে ছুটবে? পুত্রশোকে রাজা দশরথ কাঁদিতে কাঁদিতে মারা গেছেন—অথবা আপদ চুকিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন, তাই বা কে বলতে পারে!

বংশী হঠাৎ গায়ে ঠেলা দেয়ঃ কী হচ্ছে সাহেব? সাহেব নামটা চালু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বলছে, এই সাহেব, চোখ মুছে ফেল। চল, বাড়ি যাইঃ

সম্বিত ছিল না সাহেবের। জাগ্রত হয়ে বুঝতে পারে, দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কেলেঙ্কারি! সকলের দৃষ্টি তার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে পালিয়ে যাবে, কিন্তু মুকুন্দ মাস্টারও দেখে ফেলেছে। পাঠের মধ্যেই হাতের ইসারায় তাকে বসতে বলল। নিরুপায় হয়ে বসতে হয়। অধ্যায়টা শেষ করে মুকুন্দ বই বন্ধ করল। বলে, আজকে এই পর্যন্ত।

হরিধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা উঠে পড়ে। সাহেবও উঠছিল সকলের সঙ্গে, মুকুন্দ মানা করেঃ আমার ঘরে চল একটুখানি। নিয়ে এস বংশী, আলাপ করি। বলাধিকারী-মশায়ের ওখানে আছ, সেটা শুনেছি। ক-দিন থাকবে এখানে ভাই?

'ভাই' বলে ডাকলেন অমন মান্যগণ্য মানুষটি। কম্পাউণ্ডের একদিকে খোড়োঘরে মুকুন্দ মাস্টারের বাসা। অদূরে ঐ রকম আরও খান দুই ঘরে পুরানো দপ্তরি রজনী বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। পাঠের আসর ইস্কুলের বড়-বারাণ্ডায়।

সাহেবকে সামনে বসিয়ে মুকুন্দ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। বলে, সাধুসন্তের চেহারার মধ্যে পুণ্যের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। তোমারও সেইরকম ভাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবের মানুষ, ভক্ত মানুষ, সংসারে বড় কম। পাঠের আসরে এসো তুমি যে ক'টা দিন আছ।

ঐ চোখের জলের কাণ্ড—তারই সঙ্গে মিলেছে চেহারা। লজ্জা—কী লজ্জা! গ্রাম সুদ্ধ মানুষ—তাই বা কেন, কত গাঁয়ের কত মানুষ আসে, সকলে দেখে গেল। ফুলহাটায় থাকাই তো চলে না এর পর। পুরুষ-মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাবেঃ ঐ যে —দেখ, দেখ, সেই ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়াটা।

নানা কথায় রাতটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। মুকুন্দ উনুন ধরাবে এবার। বলে, চিঁড়ে ফুরিয়ে গেছে, নয়তো হ্যাঙ্গামে যেতাম না। যাক গে, চাল ফুটিয়ে ফ্যানসা-ভাত ঘুটে নিই। কতক্ষণ লাগবে!

বংশী বলে, নিজে কেন হাত পুড়িয়ে খাও ছোটমামা? আমি খারাপ, আমার আজামশায় খারাপ— আমাদের ভাত না-ই খেলে। রজনীরা পাশে আছে, ওর বউ চাট্টি রেঁধে দিতে পারে না?

মুকুন্দ বলে, রজনী নিজে থেকেই বলেছে কতবার। এমনি তাদের পাঁচ-ছটা ছেলে-পুলে, তার উপর আমি গিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাইনে।

ফেরার পথে বংশী বলে, অর্ধেক দিনই উপোস ছোটমামার। আজ ঠিক ঝাঁঝালো ক্ষিধে, গরজ করে তাই উনুন ধরাতে গেল। রজনী দপ্তরির সঙ্গে হলে খাও না খাও বাঁধা খরচা দিয়ে যেতে হবে। সেই জন্যে এগোয় না, কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে খায়।

কঞ্জুষ বুঝি?

দায়ে পড়ে হতে হয়েছে। পেটে না খেয়ে দুঃখধান্দা করে পয়সা বাঁচায়—বাসা করে ছোটমামীকেও পাপের সংসার থেকে উদ্ধার করে আনবে। সে আর এ জন্মে নয়। দেহ থাকলে অসুখবিসুখ আছে, লোকালয়ে থাকলে দায়বেদায় আছে। টাকাটা সিকিটা পয়সাটা জমিয়ে জমিয়ে যা করল, এক ঝোঁকে সব লোপাট। বছর আস্টেক তো হয়ে গেল, রাই কুড়িয়ে বেল আর হয় না। ভেবেচিন্তে দুটো পয়সা রোজগার বাড়াবে, সে ইচ্ছেও তো নয়। সাঁজের বেলাটা পুঁথি না পড়ে তিনটে ছেলে পড়ালে কোন না দশটা টাকা আসে! আলাদা ধাঁচের মানুষ—মাথা খারাপ, বলাধিকারী বলেন। নিঝের মাথা নিয়ে চুপচাপ থাকলে কথা ছিল না, পুঁথিপত্তর শুনিয়ে আরও যে দশটা ভাল মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমার বউয়ের তাই করছে। 'ভাল হও ভাল হও' দিনরাত বউ কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে। আগে অমন ছিল না, ছোটমামার পাঠ শুনে শুনে হয়েছে।

এর পর সাহেবের নিজের কথা উঠে পড়ল। বংশী বলে, আজামশায়ের গুণজ্ঞান আছে, তার বেটা ছোটমামাও দেখছি গুণ করে ফেলতে পারে। ভিন্ন রকমের গুণ— উল্টো দিকে। আমার বউকে করেছে। তুমি বিদেশি মানুষ, বলাধিকারী আশায় আশায় কোন মুলুক থেকে টেনে এনে বাড়ির উপর ঠাঁই দিয়েছেন—তোমার চোখেও জল বের করে ছাড়ল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে সাহেব চাপা দিতে চায়ঃ না না, উনি কি করলেন! পাঠ শুনে কেমন হয়ে গেল—জেগে জেগেই যেন দুঃখের স্বপ্ন দেখলাম একটা—

বংশী প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, পাঠ তো আমিও শুনলাম। আগেও কত দিন শুনেছি। আমার তো কই লঙ্কার গুঁড়ো চোখে ঠেসেও একফোঁটা জল বের করা যায় না। ছোটমামা তবে খাঁটি কথাই বলেছে—ওদেরই ভাবের মানুষ তুমি। ভক্ত মানুষ। বলাধিকারীর আশায় ছাই। ভুল মানুষ নিয়ে এসেছেন।

সাহেব সভয়ে বলে, খবরদার বংশী বলাধিকারীমশায়ের কানে না যায়। হাসবেন, ঠাট্টা করবেন। তাড়িয়ে দেবেন হয়তো দূর-দূর করে। তোমার ছোটমামার এই

পোড়া ইস্কুলে আর আসব না।

মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, কোন দিন আর আসছি নে। সর্বনেশে জায়গা। যা বললে—গুণেই সত্যি। মনটা ভিজিয়ে জোলো করে দেয়। বুড়ো-বুড়িরা হাঁ করে শুনছিল, তাদের পোষায়—পুঁথি শুনেবে, তারপর বাড়ি ফিরে বসে বসে ঝিমোবে।

মুখে এই বলল, মনে মনেও সাহেব সর্বক্ষণ নিজেকে এবং অজানা বাপ-মায়ের নামে ধিক্কার দিচ্ছে। বাপ অথবা মা—দুয়ের মধ্যে একজন। কথায় কথায় কেঁদে ভাসানো নিশ্চয় একের স্বভাব। বাপই হয়তো। নির্দোষ অবোধ সন্তান বিসর্জনের ব্যাপারটা কোমলপ্রাণ বাপ হয়তো জানত না কিছু, শয়তানী মা চুপিচুপি আত্মকলঙ্ক ভাসিয়ে দিয়েছে। দিয়ে সতী হয়েছে দশের মাঝে। অথবা হতে পারে, প্রসবকালে অচেতন মায়ের অজ্ঞাত দানব বাপ নিজের দায়দায়িত্ব নিশ্চিহ্ন করে গেছে—মা তারপরে কেঁদেছে কত। আজও হয়তো কাঁদে। এত বড় ভুবনের মধ্যে কোন কিছুই দিল না তারা, পিতৃমাতৃ-পরিচয়টুকুও নয়—উত্তরাধিকার শুধুমাত্র সেই অপরিচিত অপদার্থ মানুষের প্যাচপেচে কাদার মতো মন। প্রতি পদে যা নিয়ে অপদস্থ হতে হচ্ছে।

নেশা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। দিনে দিনে বেড়েই চলল। খাতির বাড়ছে—মুকুন্দ ভাই বলে, সাহেব ডাকে ছোড়দা। সন্ধ্যা হলেই মন উসখুস করে আসরে গিয়ে বসবার জন্য। হঠাৎ এর মধ্যে বংশীর বউ ভেদবমি হয়ে কাহিল হয়ে পড়ল। বংশীর যাওয়া বন্ধ। ঘোমটার মধ্য দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গতিবিধি দেখবার মানুষটা নেই, কোন দায়ে আসরে হাত-পা কোলে করে বসে থাকবে? সাহেব যায় একা একা।

বংশীর কাছেও সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা। আজেবাজে বলে কাটান দেয়। বলে, হাটে গিয়েছিলাম। কোন হাটে রে? দিশা না পেয়ে ভুল এক গাঁয়ের নাম করে দেয়, ঐ বারের হাট সে গাঁয়ে নয়। ধরে ফেলে বংশী হেসে খুন। সন্ত্রস্ত হয়ে সাহেব বারবার বলে, বলবে না কাউকে, দোহাই! বলাধিকারীমশায় টের না পান।

আসরে বিশ গণ্ডা চোখের উপর জানাজানি হয়ে পড়ছে, আসরের বাইরে ভিন্ন সময় এখন সে ছোড়দার কাছে গিয়ে বসে। এক একদিন অপরাহ্ণে ইস্কুলের ছুটির পর খালধারে বেড়ায় দু-জনে। কায়দা পেলেই সাহেব মহাগুণী পচা বাইটার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আদায় হয় না কিছুই। মন্ত্রগুপ্তির মতো মুকুন্দ বাপের কথা চাপা দিয়ে ভগবান নিয়ে পড়ে। বেড়ানোর মুখেও ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনে যেতে হয়। নিতান্ত যে খারাপ লাগে, তা নয়।

ঘরে ফেরার সময় সাহেব অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সারাপথ মনে মনে মা-কালীর পায়ে মাথা খোঁড়ে: অনেক দূরে তুমি আছ মাগো, তবু কি আর দেখতে পাচ্ছ না? বলাধিকারীমশায়ের অনেক আশা আমার উপর, সব বুঝি বরবাদ হয়ে যায়। সর্বনেশে ধার্মিক ঐ ছোড়দা—কোনদিন তার কাছে যেন না আসি। চোখ দুটো খুঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা জল যেন না বেরোয়। মন্দ করে দাও আমায় মা-জননী—যার চেয়ে মন্দমানুষ কোনদিন কোথাও হয়নি।

বংশী বলেনি কিছু। বলাধিকারীর তবু টের পেতে বাকি নেই। বৈঠকখানা-ঘরে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য আর সাহেব—সেইখানে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন: মুকুন্দ মাস্টারের কাছে বড্ড যে আনাগোনা! ব্যাপার কি?

পাকা লোক ওয়াকিবহাল হয়েই বলছেন, অস্বীকার করে লাভ নেই। তাচ্ছিল্যের ভাবে সাহেব বলে, পাঠ করেন নেহাৎ মন্দ নয়। কাজকর্ম নেই, সন্ধ্যাবেলা বসেছি গিয়ে দু'এক দিন।

ঘৃণা ভরে বলাধিকারী বলে উঠলেন, বোকা ছাগল! ছাগলের মতন নুরও রেখেছে একটু। এক একটা মানুষ হয় এই রকম। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলেন, ভূত নয়, ভগবান। দুটোর মধ্যে বড় বেশি তফাৎ নেই। হায় রে হায়, পচা বাইটার মতো গুণীর বেটা শেষকালে ভগবানের কিল খেয়ে মরছে!

সাহেব ফস করে বলে বসল, হয়তো বা বাইটামশায়ের পরিণাম দেখে। পাপের শাস্তি—বলছিলেন একদিন মাস্টারমশায়।

'ছোড়দা'—সাহেবের মুখে এসে গিয়েছিল আর কি! মাস্টারমশায় বলে সামাল দিল। বলাধিকারীর গায়ে যেন আগুনের সেঁক লাগে। খিঁচিয়ে উঠলেন: পাপ-পুণ্যের কথা এর মধ্যে আসে কিসে? বুড়ো হয়ে কোন মানুষটা বিছানা নেবে না, জোয়ান-যুবোর মতো পাকচক্কোর মেরে বেড়াবে, বল দিকি সেই কথাটা! মুকুন্দ ঐ যে মহান্ত হয়ে সদাচারে আছে, লম্বালম্বা বচন ঝেড়ে আড়কাঠির মতন তোদের ভালোর দলে টানছে—বুড়ো হলে তারও ঠিক বাইটার গতি। গীতা-রামায়নে ঠেকিয়ে দেবে না।

ক্ষুদিরাম হেঁট হয়ে খাতায় একটা যোগ দিচ্ছিল, ঘাড় তুলে এইবার বলে, দল ভারি করার ব্যাপার আসলে। গাঁজার নেশা একলা জমে না। চুরি বলুন সাধুগিরি বলুন, সব নেশার ঐ এক নিয়ম। খুলনা শহরে পাদ্রি সাহেবরা রাস্তার মোড়ে টুলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচায়: পাপের চাপে নরকে তলিয়ে যাবে, শিগগির আমাদের খোয়াড়ে চলে এসো। কাঠমোল্লাদেরও ঐ কথা। যাবেন কোথা? অজাঙ্গ পাড়াগাঁয়ে পটুয়ারা পট দেখিয়ে পালা শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়—মরার পরে যমদূতেরা—ঢেঁকির পাড় দিয়ে অসতী নারীকে চিঁড়ে কুটছে, ঘানিগাছের মধ্যে চোর-ডাকাত পিষে তেল বের করছে—সেখানেও সেই পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়।

বলাধিকারী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, যে-বাড়ি ভিক্ষে করতে গেছে সেই মানুষটাই হয়তো শঠতা-বঞ্চনায় টাকার পাহাড় জমিয়েছে। তার পরিণাম কিন্তু পটে লেখে না।

ক্ষুদিরাম সহাস্যে বলে, তা-ও আছে। শাস্তি নয়, পুরস্কার। ফকির-বোষ্টম অতিথি-ভিখারি অন্ধ-আতুরকে দিয়েছে বলে বৈকুণ্ঠধামে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে হীরা-মুক্তো খাওয়াচ্ছে তাকে। বুঝলেন মশায়, ভালোর দলের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। ওদের তোড়জোড় টাকাকড়ি সাজ-সরঞ্জাম অনেক।

পচা বাইটায় কথাটা ঘুরছে ক্রমাগত বলাধিকারীর মনে। বললেন, বাইটামশায়ের

শাস্তি পাপের দায়ে নয়, বুদ্ধির দোষে। যা-কিছু রোজগার বিষয়আশয় ঘরবাড়িতে লগ্নি করে ফেলল। তা-ও বেনামি—সরকার কবে কোনটা বাজেয়াপ্ত করে বসে, সেই ভয়ে। কিন্তু বিষ না-ই থাকুক কুলোপানা চক্কোরে দোষটা কি ছিল? ভাব দেখাবে, এত খরচখরচা করেও আছে এখনো অঢেল। সেই মেজাজে চলবে। রাত্রে দুয়োরে খিল দিয়ে দুটো পাঁচটা টাকা নিয়ে টুংটাং করে নখে বাজিয়ে যাবে—কবাটের বাইরে নিশ্বাস বন্ধ করে বাড়ির লোকে গুণবে দু-শ পাঁচ-শ টাকা। পরের দিন সকালে দুয়োর খুলতে না খুলতে দেখবে চরণ সেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। টাকা না-ই বা থাকল, টাকার ঝাঁঝ থাকলেও কাজ চলে যায়। এইটুকু কেন যে ঘটে এলো না বাইটার! মুকুন্দ বর্ধনের এই দুর্গতি শেষ বয়সে, যদি না হাতে-গাঁটে পয়সা জমিয়ে রাখে। সে আর হয়েছে! অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ—দিন চলে না এখনই এই জোয়ান বয়সে।

সাহেব এই ক-দিনেই সেটা বুঝেছে। মুকুন্দর জন্য মায়া পড়ে গেছে মনে মনে। বলে, আড়কাটি যদি বলেন, সে মাস্টারমশায় নয়—আমি। আমিই ওঁকে ভাগিয়ে নিয়ে আসব ভালোর পথ থেকে। নয়তো সত্যি সত্যি উনি মারা পড়বেন।

ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম বলে, পাঁড় নেশাখোর বাপু পেরে উঠবে না। কাজলী-বালাকে পারা গেল? আর, এই যে ইনি—

বলাধিকারীর দিকে চেয়েও হয়তো অনুরূপ কিছু বলত। তার আগেই বলাধিকারী বলেন, পাঁড়-সাধু আমিও ছিলাম রে। অমন-চারটি মুকুন্দ-মাস্টার গুলে খেতে পারতাম। সত্যমেব জয়তে জপ করতাম, সত্য ছাড়া এক চুল এদিক-ওদিক হব না—সঙ্কল্প ছিল আমার। আপনার তো সবই জানা ভটচাজ্জমশায়। সোনার পাথরের বাটি নাকি হয় না, কাঁঠালের আমসত্ত বললে নাকি লোকে হাসে—আমি কিন্তু তাই হয়ে ছিলাম। সাধু-দারোগা। এদেশ-সেদেশ আমায় ঐ নামে বলত। বলত—আর এখন বুঝতে পারি, হাসত মুখ টিপে টিপে। গরব করত কেবল আমার স্ত্রী। সেই গরবের দায়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল তাকে।

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলাধিকারী চুপ হয়ে গেলেন।

আট

তখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে লোকে দারোগা হতে চাইত। (এবং খোদ জমিদার না হয়ে কোন একটা মহালের নায়েব, হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার) দারোগা মানে শাহান-শা সেই এলাকার। খাওয়ার ব্যাপারে যে কোন বস্তুর বাঞ্ছা হোক, বেড়াতে বেড়াতে হাটে কনেষ্টবলকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া। কারো ঘাড়ে একটি বই দুটো মাথা নেই যে দাম চাইবে। পরার ব্যাপারে তাই। সর্বব্যাপারেই। সদরে যাবেন হয়তো দারোগাবাবু, খবর দেওয়া হয়েছে, একলা মানুষটির জন্য পুরো

সতরঞ্চি খালি রেখে শেয়ারের নৌকো থানার ঘাটে এনে বেঁধেছে। শোনা গেল, দুপুরের গুরুভোজনের পর নিদ্রা দিচ্ছেন দারোগাবাবু। ডেকে তুলে খবরটা দেবে, এত বড় তাগত কারো নেই। গোন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর পরে সমস্ত পথ উজানে গুণ টেনে মরতে হবে, ছইয়ের নিচে ঠাসাঠাসি মানুষগুলো গরমে গলে জল হয়ে যাবার যোগাড়। তবু না মাঝিমাল্লা না প্যাসেঞ্জার—মুখে কেউ রা কাড়ে না। নিস্তব্ধ ধ্যানমূর্তি সব—কথাবার্তার আওয়াজ ডাঙার উপর গিয়ে দারোগাবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়।

জগবন্ধু দারোগাই কেবল সৃষ্টিছাড়া। হাটে বাজারে নিজে কখনো যান না। বাইরের মানুষ পাঠিয়ে সওদা করেন, দারোগার লোক বুঝতে পারলে পাছে কেউ কম দাম নেয়। কোথাও যেতে হলে বিনা খবরে ঘাটে এসে শেয়ারের নৌকোয় অপর দশ-জনের পাশে ছেঁড়া-মাদুরে বসে পড়েন। যেমন চিরদিন হয়ে আসছে—দায়ে-বেদায়ে কেউ হয়তো হাসি-হাসি মুখ করে ভেট নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—জগবন্ধু দারোগা এই মারেন তো সেই মারেন। মানুষটাকে থানার সীমানা পার করে দিয়ে তবে সোয়াস্তি। পুলিসের মানুষ হয়ে এমন পরমহংসের স্বভাব, কোন আহাম্মক সেটা বিশ্বাস করে? ভাবছে, ভেটের পরিমাণ যথোচিত হয়নি বলেই রাগ। দুনো তেদুনো আয়োজন নিয়ে আসে আবার, তাড়া খেয়ে চলে যায়।

ইতর-ভদ্র ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। অমুক কাজের তদ্বিরে এই রকম দিতে হয়, অমুক কাজের তদ্বিরে ঐ রকম—একটা অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। সকলেই মোটামুটি সেটা জানে। কালাপাহাড়ের মতো বনেদি নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছে ধর্মধ্বজী দারোগা। ভেঙে আর কোন নিয়ম বহাল হল, ঘুণাক্ষরে জানা যাচ্ছে না। হতবুদ্ধি জনসাধারণ। পাশাপাশি থানাগুলোর রাগ—বিশেষ করে একেবারে পাশে ঝিনুকপোতার বড়বাবু অনাদি সরকারের। এই নিয়ম-রীতি সর্বত্র যদি চালু হয়ে যায়, শুখো মাইনের কয়েকটি টাকা ছাড়া আর কিছুই লভ্য থাকবে না। ঐটুকুর জন্যেই কি ঘর-বাড়ি ছেড়ে চোর-ডাকাত ঠগ বোম্বেটে ঠেঙিয়ে নোনা রাজ্যে পড়ে আছে? জগবন্ধুর নিজ থানায় অন্য যে সব কর্মচারী, তারা অবধি বিরক্ত। সাহস করে বড়বাবুর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না।

আজকের দিনের সুবিখ্যাত কেনা মল্লিকের বড়ভাই বেচারামের দিন-কাল তখন। চালনা-বন্দরের নিচে থেকে দরিয়া-পর্যন্ত দলবল নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করে বেড়ায়। জগবন্ধু বলাধিকারীর বিদঘুটে চালচলতি বেচারাম একেবারে বিশ্বাস করে না। বলে দূর! কড়া দেবতা শনিঠাকুর কিম্বা খাণ্ডারণী মা-কালী অবধি পুজো পেলে বর দিয়ে যান। পুজো দিয়ে ঠাণ্ডা করছি, দাঁড়াও।

বিপন্ন কারিগরেরা ধরে বসেঃ সকলের মাথার উপরে তুমি কাপ্তেন মশায়। মানুষটা জলে ডাঙার বেয়াড়া রকম চোখ ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কাজ হবে কেমন করে?

বেচারাম কথা দিলঃ এনে দিচ্ছি ওটাকে মুঠোয় ভরে। বন্দোবস্ত হয়ে যাক। তারপর যেমন ইচ্ছে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িও।

জগবন্ধুর ছোটমেয়ের বিয়ে। থানার লাগোয়া কোয়ার্টার, বিয়ে সেইখান থেকে হবে। সামুদ্রিকাচার্য ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাসা অতি নিকটে—একখানা মাঠের এপার-ওপার। বাড়ির দরজায় প্রাচীন এক সাইনবোর্ডে উপাধি সহ ভট্টাচার্যের নাম লেখা। হাত-দেখা স্ফোটক-বিচার শান্তিস্বস্ত্যয়ন তান্ত্রিক-কবচ এবং আরও বিস্তর পণ্যের ফিরিস্তি ছিল, অনেক বছরের রোদবৃষ্টি খেয়ে অস্পষ্ট অবোধ্য হয়ে গেছে, কাছে গিয়ে নজর খাটিয়েও এই ক'টির বেশি পড়তে পারা যায় না।

থানার পরম সুহৃৎ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে থানার লোকের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—সে লোক চাই কি খোদ বড়বাবু হোন, অথবা মুন্সি বা থানার কোয়ার্টারে জল-তোলা চাকর। ভট্টাচার্যের বাসায় সকাল-সন্ধ্যা মানুষের ভিড় —ভাগ্য-গণনার ব্যাপারে আসে যৎসামান্য, প্রায় সকলেই অন্য দশ রকমের দায়গ্রস্ত মানুষ। থানার কাছে তাদের হয়ে দরবার করতে হবে, সেই জন্যে এসে ধরেছে। পরের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ ক্ষুদিরামও অমনি লেগে পড়ে যায়। বরাবর এই নিয়মে চলে এসেছে, কেবল হতচ্ছাড়া এই সাধু-দারোগা বাগ মানে না কিছুতে।

ভাঁটিঅঞ্চলের যেখানে যত থানা, আশেপাশে এই ধরনের একজন দু-জন সুহৃৎ থাকে। থাকে তাই ইতরজনের সুবিধা। কেউ ডাক্তারি করে, কেউ ঠিকেদার, কেউ ইস্কুলের মাস্টার, কেউ বা একেবারে কিছুই না। থানার বিয়েথাওয়া-অন্নপ্রাসনে কোমরে গামছা বেঁধে দিন নেই রাত নেই খাটাখাটনিতে লেগে পড়ে। অথবা থানার বাবুদের বুড়োহাবড়া কোন আত্মীয় টেঁসে যাবার দাখিল—সুহৃদমশায়ের কোমরের গামছা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে উঠে যায়। আপনজনেরা ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে—শ্মশান-বন্ধুর যথাযোগ্য সাজ নিয়ে এই ব্যক্তি রাত্রি জেগে সতর্ক প্রহরায় রয়েছে, বুকের ধুকধুকানিটুকু থামলেই হরিধ্বনিতে থানা মাত করে সকলকে ডেকে তুলে মড়া খাটিয়ায় চড়াবে। দেরি করিয়ে দিচ্ছেন বলে ধৈর্য হারিয়ে বিড়বিড় করে গালও পাড়ে মুমূর্ষুর উদ্দেশে: কী মায়া রে বাবা! এতকাল ধরে ভোগসুখ করলি, তবু লালসার নিবৃত্তি নেই! খাবি খেয়ে খেয়ে কেন খামোকা কষ্ট পাচ্ছিস, দেবচক্ষু হয়ে পড় এবারে। ভোগান্তি আর সহ্য হয় না, একটা কাজ নিয়ে কাঁহাতক দিবা-নিশি এমন পড়ে থাকা যায়।

এমনি সুহৃৎ একজন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। জগবন্ধু পাত্তা দেন না বলে তাঁকে এড়িয়ে খিড়কির পথে কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর পিতামহ ছিলেন সিদ্ধ-পুরুষ—সেই ধারা খানিকটা চলে আসছে। স্বামী-মেয়ে ছাড়াও একদঙ্গল ঠাকুর-দেবতা তাঁর সংসারে। থানার মতো জায়গাতেও কালী মহাদেব গণেশ লক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ সঙ্কীর্ণ একটু তাকের উপরে গাদাগাদি হয়ে নিয়মিত নিত্যসেবা পেয়ে আসছেন। ক্ষুদিরাম টোলে পড়ে নানা শাস্ত্র শিখে এসেছে, জমিয়ে নিতে অতএব দেরী হয় না।

ভুবনেশ্বরী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে ধরেন: বলুন ভটচাজ্জিমশায়, কি দেখতে পান?

ক্ষুদিরাম কল্পতরু এ সময়টা। আয়ু থেকে আরম্ভ করে ধনদৌলত স্বামী ও

মেয়েদুটোর সুখশান্তি—সংসারে যা কিছু কামনার বস্তু থাকতে পারে, একনাগাড়ে মুষলধারে বর্ষণ করে। এত প্রাপ্তির পরেও ভক্ত না হয়ে কেমন করে পারবে! ক্রমশ এমন হয়ে দাঁড়াল—কোন তিথিতে কি খেতে নেই ক্ষুদিরাম পাঁজি দেখে বলে দেবে, ভুবনেশ্বরী বঁটি পেতে তবে আনাজ কুটতে বসবেন।

এমনি চলছিল। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ করে জগবন্ধুর সঙ্গে এবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়ে গেল। বরের কোষ্ঠি কনের কোষ্ঠি মিলিয়ে ক্ষুদিরাম যোটক-বিচার করল, গণ-রাশি হিসাব করে শুভকর্মের দিনক্ষণ ঠিক করে দিল। পাকাদেখার দিন পাত্র-আশীর্বাদ করে এলো জগবন্ধুর সঙ্গে পাত্রের বাড়ি গিয়ে।

নদী-খালে বান ডেকে সারা অঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। জল সরে গিয়ে এখন অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা। জেলে খবর দিয়ে আনা হয়েছে, মন তিন-চার পোনামাছের সরবরাহ দেবে। কিন্তু বায়না নিতে তারা আগুপিছু করে! বানের জলের সঙ্গে মাছও বেরিয়ে গেছে। জালে যদি মাছ না পড়ে তখন যে জাত যাওয়ার ব্যাপার।

বলে, যার পুকুরে হুকুম হবে, হুজুরের নজরের সামনে দড়াজাল নামাব, যতক্ষণ যে ভাবে বলেন টেনে যাব। কিন্তু চুক্তির বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে ভরসা পাইনে।

ক্ষুদিরামকে পেয়ে ছোট-দারোগা চোখ টিপে টিপ্পনী কাটেঃ শুনেছেন ভটচাজ-মশায়? দিনে দিনে কী অরাজক অবস্থা হল, বুঝুন একবার! জেলের পুত থানার উপর দাঁড়িয়ে বলে কিনা বায়না নেবো না। কালী বিশ্বাসের আমল হলে ঐ কথার পরে উঠে আর বাড়িঘরে যেতে হত না, রোদের মধ্যে চোদ্দ-পোয়া হয়ে বেলান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দশেধর্মে চোখে দেখে সামাল হত।

জগবন্ধুর ঠিক আগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালী বিশ্বাস ছিলেন বড়বাবু। তুলনাটা তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ছোটবাবু যত যা-ই বলুক, হেন অবস্থায় ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মরে গেলেও হাঁ-না কিছু জবাব দেবে না। কোন কথা কার কানে কি ভাবে হাজির হবে—কথা খুব ওজন করে বলতে হয়। একেবারে না বলাই ভাল। ছোটবাবুও বোঝে সেটা, উত্তরের প্রত্যাশা করে না। একজন কাউকে সামনে রেখে মনের গরম খানিকটা বের করে দেওয়া।

বলছে, ঘাড় নেড়ে যাবার সাহসই হত না, বাপ-বাপ বলে বায়না নিত, সাগর সেঁচে মাছ এনে দিত। হেঁ-হেঁ, সে হল কালী বিশ্বাস—লোকে তো কালী বিশ্বাস বলত না, বলত কলি বিশ্বাস। নরদেহে সাক্ষাৎ কলিঠাকুর।

ক্ষুদিরামকে মধ্যস্থ মেনে বলে, সেই দেখেছেন আর এ-ও দেখুন। দেখে দেখে চক্ষু সার্থক করুন। কলি উল্টে সত্যযুগের উদয় আমাদের থানার উপর। কী করব—আমরাও সব হাত-পা গুটিয়ে ধ্যান-নেত্র হয়ে বসে আছি। আমরা অধার্মিক লোক, আমাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু আপনি হেন কীরিত-কর্মা ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে মাছের কথা আপনাকেও একবার বলা হল না। সকলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞি হবে, চৌকিদার দফাদার বেটারা করে দেবে। করুক তাই। শেষ অবধি—দক্ষযজ্ঞ—চক্ষু মেলে মজা করে দেখে যাব আমরা।

কথা ঠিক বটে! এসব কাজে চিরকাল ক্ষুদিরামকেই হাঁকডাক করতে হয়।

এবারে দফাদার-চৌকিদারের ডাক পড়েছে। অপমান বই কি! ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম ছোটবাবুর কথা স্বীকার নেয়। এবং সম্ভবত অপমানের জ্বলুনিতেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

দ্রুতপদে মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সুঁড়িপথে অদৃশ্য হয়। ঘুরে এসে খিড়কির পথে টিপিটিপি জগবন্ধুর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। যে পথে বারবার ভুবনেশ্বরীর কাছে আসা-যাওয়া। জগবন্ধুকে অভয় দিয়ে বলে, মাছের চিন্তা নেই বড়বাবু। আমার দায়িত্ব রইল।

হেসে বলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে আকাশের বেয়াড়া গ্রহগুলো অবধি বাগিয়ে নিয়ে আসি, আর জলের ক'টা মাছ তুলতে পারব না! পুকুর কতকগুলো দেখে রেখেছি, পনের-বিশ সের করে এক-একটা মাছ—চার মন তো নস্যি। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা জাল-দাঁড় নিয়ে এসে পড়বে, নিজে আমি সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকব।

কাজকর্মের মধ্যে ক্ষুদিরামকে জড়াবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় এখন জগবন্ধুকে রাজি হতে হল। আশ্বস্ত হলেন। বললেন, বাজার হিসাবে যা ন্যায্য দাম, পুকুরওয়ালারা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। সিকি পয়সার তঞ্চকতা না হয়। এ দায়িত্বও আপনার উপর।

যে আজ্ঞে, তাই হবে।

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম আবার বলে, আমি আজকের মানুষ নই বড়বাবু। এ থানায় কতজনাই তো এসে গেলেন, এমন ধনুক-ভাঙা পণ কারো দেখিনি।

আমার তাই। পরের দয়া নিয়ে কিম্বা পরকে ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব না। মেয়ের তাতে কল্যাণ হবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে উঠল: আহা, হাটের মধ্যে ঢোলসহরৎ করে বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। দশেধর্মে শুনুক। ক'জনে বোঝেন এতখানি—ক্ষমতা হাতে পেলেই তো গরিব মারবেন। আপনি আমায় ডাকেন নি বড়বাবু, অসুবিধার কথা কানে শুনে উপযাচক হয়ে ছুটেছি। পরসেবা, বিশেষ করে সজ্জনের সেবা মহাপুণ্য। আমার চিরকালের নেশা বড়বাবু। এক বয়সে মাসের পর মাস রাত জেগে অঞ্চল পাহারা দিয়ে বেড়াতাম, আমি ছিলাম দলপতি। আপনার আগে কালী বিশ্বাস ছিলেন এখানে। অতি খচ্চর। ট্যারা চোখ, বাঁ-হাতের ছ'টা আঙুল—খুঁতো মানুষগুলো হয় ঐ রকম। আমার সঙ্গে বনত না! দারোগা আছ, চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভয় করবে—সত্যপথের পথিক, আমি কেন খাতির করতে যাব? বলুন।

সত্যের পথিক পরসেবী মানুষটির সম্বন্ধে জগবন্ধু কিন্তু উল্টোটাই শুনেছেন। আবার এ-ও শুনেছেন, অতিশয় কাজের মানুষ। আগের কথার জের ধরে ক্ষুদিরাম বলে, দাম দিলে নেবে না কেন বড়বাবু? কালী বিশ্বাস দিত না। ঐ আসনে বসে ক'জনে বা দেয়! না পেয়ে পেয়ে সেইটেই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে। জলে বাস করে কুমির ক্ষেপানো তো ভাল কথা নয়।

জগবন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলেন, যত শয়তান জুটে সরকারের নামে কলঙ্ক দিয়েছে। চোর ধরবার চাকরি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় চোর কোথায় আছে?

চারখানা গ্রামের মধ্যে গোটা আষ্টেক পুকুর ঠিক করে রেখেছে ক্ষুদিরাম। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা দড়াজাল নামাল। মাছ ধরার নামে বিস্তর লোক জুটে যায়। সকলের চোখের সামনে জাল টানছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম নানা রকমে নানান কায়দায় টানে। চার-চারটে গ্রাম ঘুরল, মাছের একখানা আঁশ পর্যন্ত ওঠে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে ক্ষুদিরাম। এবং খবর পেয়ে বলাধিকারীও।

জেলেরা বলে, জানতাম আমরা ভটচাজমশায় জলের উপরটা দেখে তলার খোঁজ বলে দিতে পারি। ভাতভিত্তি যে আমাদের। কথাটা বলেছিলাম, মিলিয়ে দেখে নিন এবার। শুধ-শুধু নাজেহাল হলাম।

বেইজ্জতি ব্যাপার। দধি-মৎস্যাদির আয়োজন করিব, আপনারাও কবিবেন—' লগ্নপত্রের এই চিরকালের বয়ান। বিয়ের ভোজে মাছ বাদ—বিধবারা মাছ খায় না, তেমনি একটা অলক্ষুণে যোগাযোগ মনে এসে যায়। নিমন্ত্রিতেরাই বা কি বলবে? এত বড় থানার উপর বসে থেকে অঞ্চলে চুঁড়ে মাছ মিলল না, এ কি বিশ্বাস হবার মতো কথা!

কী হল ভটচাজমশায়? শুনেছিলাম, অত্যন্ত দক্ষ লোক আপনি, কাজে নেমে কখনো হারেন না—

মুখ চুন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের, তা বলে মুশড়ে পড়বার পাত্র নয়। বলে, হেরে গিয়েছি কি করে বলি। মাঝরাত্রে লগ্ন—বারোটার পর। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী বিয়ের পরেই না হয় ভোজে বসবে। উচিতও তাই। কাজের আগে কেউ খেতে চায় না। সে খায় কলকাতা শহরে। খেয়ে পানের খিলি মুঠোয় ট্রাম ধরতে ছোটে।

জগবন্ধু ভরসা পান না। বলেন বিকাল পর্যন্ত বেয়ে স্রেফ ঝাঁঝি আর পাটা-শেওলা তুলে বেড়াল। কোথায় কে মাছ জিইয়ে রেখেছে—এই তিন-চার ঘণ্টায় চার মন মাছ হয়ে যাবে? হবার হলে দিনমানেই হত।

ক্ষুদিরাম অবিচলিত কণ্ঠে বলে, দেখাই যাক।

জেলেরা তো বাড়ি চলে গেল। পারবেও না তারা—সারাদিন যা খেটেছে, নড়ে বসবার তাগদ নেই। কারা যাচ্ছে এবারে মাছ ধরতে?

জিভ কেটে হাতদুটি জোড় করে ক্ষুদিরাম বলে, ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না বড়বাবু। সঠিক আমিও জানিনে। একটু-আধটু যা জানি, বলা যাবে না আপনার কাছে। তবে ভার দিলে কাজ তুলে দেবে, মনে করি। কী হুকুম হয়, বলুন। সময় নেই, বুঝতে পারছেন।

জগবন্ধু গুম হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বলেন, উপায় নেই, যা করবার করুন গে। কিন্তু আমার কথা, দাম ষোলআনা নেবে তারা। রাত্রিবেলার খাটনি—ষোলআনার উপরেও কিছু নেবে।

অবস্থাটা চট করে ভেবে নিলেন। কি ভাবে কোথা থেকে মাছ এলো এই দারোগা-গিরি মেয়ের বিয়ের মুখে একটা দিন না-ই বা করলেন! শাস্ত্রের উক্তি মূল্য

দিলেই দ্রব্যের দোষ শোধন হয়। হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দেবেন তিনি। সকলের মুকাবেলা।

দ্বিধাভরে বলেন, সারাদিনে লবডঙ্কা। অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে কি হবে আমি কোন ভরসা দেখছিনে ভটচাজমশায়।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে বলে, দত্যিদানোর কাজ অন্ধকারেই খোলে ভালো। তৈরি হয়ে আছে সব। বলে কি জানেন বড়বাবু, পুকুরের মাছ তো হাতের মুঠোর জিনিস—হুকুম হলে বাদা থেকে বাঘের দুধ দুয়ে এনে দিই। সেই দুধে দিদিমণির বিয়ের পায়েস হবে। অন্য রাঁধাবাড়া হয়ে যাক, মাছ এসে পড়লেই কুটে ভেজে চড়িয়ে দেবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সাঁ করে বন্দোবস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রহরখানেক রাত। বড় একদল বরযাত্রী এসে উঠল নৌকাঘাটা থেকে। জগবন্ধু আব্বৃত্তিতে বসেছিলেন, খানিকটা সেরে কুটুম্বদের আদর-অভ্যর্থনায় ছুটলেন। বরের আসর গমগম করছে।

এমনি সময় ক্ষুদিরামের আবির্ভাব। ফিসফিস করে বলে, একটু ইদিকে আসবেন বড়বাবু।

সশঙ্কে জগবন্ধু বলেন, খবর কি?

কী আবার! মাছ। বলেছি তো, হারিনে আমি কোন কাজে। একটিবার এসে চোখে দেখুন।

দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত করে বলে, মাছ নয়—এই বড় বড় রাজপুত্তুর। দেখে যান।

একটুখানি ফাঁক কাটিয়ে জগবন্ধু হেরিকেন লণ্ঠন হাতে ক্ষুদিরামের পিছু পিছু চললেন। থানার সীমানাটা ছাড়িয়ে বাদামতলার অন্ধকারে মাছ এনে গাদা করে গেছে। এনেছে বেশিক্ষণ নয়—লেজের ঝটপটি এখনো দু-চারটের।

একটা মাছের কানকোয় হাত ঢুকিয়ে ক্ষুদিরাম তুলে ধরল ভাল করে দেখানোর জন্য। মাছের ভারে মানুষটাই যেন নুয়ে যাচ্ছে। হেরিকেন উঁচু করে জগবন্ধু দেখে নিলেন, দেখে ভারি প্রসন্ন। রাজপুত্র বলে বর্ণনা দিল—ল্যালচে রঙের সুপুষ্ট রুইমাছ, পুচ্ছ লাল, উপমা কিছুমাত্র বেমানান নয়। মাছ জিইয়ে রাখা ছিল কোন খানাখন্দে, হুকুম পাওয়া মাত্র তুলে দিয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম বলে, রান্নার দিকটাও আমি দেখছি। আপনি একবার চোখে দেখে গেলেন, দেখে খুশি হলেন—ব্যস!

জগবন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সমস্তটা দিন জাল টেনে টেনে মরল, এত মাছ কোন পুকুরে ছিল তাই ভাবছি।

জেলে-বেটাদের কথা আর বললেন না! বক্র হাসি হেসে ক্ষুদিরাম বলে, হাটে হাটে হাতে কেটে ট্যাংরা-পুঁটি বেচে বেড়ায়, কতটুকু মানুষ ওরা—দুনিয়ার খবর কী জানবে! সে জানেন এক অন্তর্যামী ভগবান, আর ঐ দত্যিদানোগুলো। ডাকতে

হাঁকতে বরাবর ওরাই এসে পড়ে, থানার লোকের কোন দায় ঠেকতে হয় না। এবারে নতুন নিয়ম করতে গিয়েই মুশকিল হল। সে যাক গে। শেষ রক্ষে হয়ে গেছে—এখন আর ভাবনা কি ?

দেখছি না তো তাদের কাউকে। মাছ ফেলে দিয়েই পালাল। আমার যে নগদ টাকা হাতে হাতে দেবার বন্দোবস্ত।

ক্ষুদিরাম বলে, আপনার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে, তবেই হয়েছে ! পাইতক্কের মধ্যে অতবড় বুকের পাটা কারো নেই। তবে আমি আগে থেকে চুক্তি করে নিয়েছি, দাম কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে আব্দার শোনা হবে না। ভাববেন না বড়বাবু। আপোষে না নিতে চায় তো মানুষ চিনিয়ে দেব আমি—কনেস্টবল-চৌকিদারে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে থানার উঠানে এনে ফেলবে, বাপের সুপুত্তুর হয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুভকর্মের মধ্যে এ নিয়ে মাথা গরম করবেন না, খুশি মনে কন্যা-সম্প্রদান করুন গে। আমি রান্নার তদারকে যাচ্ছি।

এই ছাড়া কী ব্যবস্থাই বা হতে পারে এখন ! জগবন্ধু কড়া হয়ে বললেন, দাঁড়ি-পাল্লা ধরে মাছের সঠিক ওজন নিয়ে নিন এক্ষুনি ! জলের মাছ জল-মরা বলে পাঁচ-দশ সের বাদ—এসব ধানাই-পানাই আমার কাজে করতে যাবেন না। পোয়া-ছটাক অবধি হিসাব করে দাম কষে ফেলুন। তারপরে কোটা-বাছা, তারপরে রাঁধাবাড়া। এই কাজটা শেষ করে তবে আপনি নড়বেন।

হুকুম দিয়ে জগবন্ধু চললেন। মনে মনে প্রবোধ নিচ্ছেন : অত দেখতে গেলে হয় না। বাজার থেকে কতই তো কেনাকাটা করি, কোন সূত্রে কোন বস্তুটা এল তাই নিয়ে কে খোঁজাখুঁজি করতে যায় ? ন্যায্য পরিমাণ দাম দিয়ে দিলেই বিবেকের কাছে দায় থাকল না।

সূত্র জগবন্ধুকে খুঁজতে হয়নি, পরের দিন থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পেতে লাগল। বুধবার, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের তারিখ যেদিন, রাত্রিবেলা পুকুরের মাছ চুরি হয়েছে। সে পুকুর একটি দুটি নয়—এজাহারের পর এজাহার আসছে গোণাগুণতি ছাড়িয়ে যাবে এমনি গতিক। এবং শুধুমাত্র এই থানায় নয়, পাশের থানা ঝিনুক-পোতার এলাকার ভিতরেও। সর্বনেশে কাণ্ড করেছে বেটারা—যেখানে যত ভাল পুকুর, সর্বত্র জাল ছেঁকে বেড়িয়েছে।

ঝিনুকপোতার বড়-দারোগা অনাদি সরকার হাসিমস্করা করছে, খবর কানে এসে গেল। লোকজনের মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে বলে, জগবন্ধু দারোগার কন্যাদায়—ব্যাপার সামান্য নয়। নিজের এলাকায় কুলালো না, তা মুখের কথাটা বললে আমিই সংগ্রহ করে দিতাম। তাতে বুঝি ইজ্জতে বাধে—তারও বড়, পয়সা খরচ হয়। তার চেয়ে রাতের কুটুম্ব পাঠিয়ে সোজাসুজি কাজ হাসিল করে নিয়ে গেল।

নিঃসাড়ে যেন মন্ত্রবলে কাজ সেরে গেছে। প্রতি পুকুরে জলের মধ্যে বোঝা বোঝা পালা—অর্থাৎ গাছের ডালপালা ও কাঁটা ইত্যাদি। হঠাৎ এসে কেউ জালের খেওন না দিতে পারে। জাল ফেলবার আগে পালা তুলে ফেলে সমস্ত পুকুর সাফসাফাই করে

নিতে হবে। জলে নেমে পড়ে তাই করেছে, তাপরে জাল নামিয়েছে আট-দশখানা গাঁয়ের পনের-বিশটা পুকুরে। সন্ধ্যার পরে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময়ের ভিতর। লগ্নের মুখেই মাছ এসে পড়ল। বাছাই-করা সারের সার মাছ—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের উপমায় রাজপুত্তুর। কতগুলো জাল নিয়ে কত মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল রে বাবা! এত বড় কাণ্ড টুঁ শব্দটি নেই—পাকা হাতের পরিপাটি কাজ। সকালে উঠে ডাঙার উপর পালো এবং পুকুরপাড়ে জাল ঝাড়ার চিহ্ন দেখেই মাছ-চুরির ব্যাপার মালুম হল। ভদ্র মানুষজন দশের মধ্যে অবশ্য নিন্দে-মন্দ করে, কিন্তু মনে মনে চমৎকৃত হচ্ছে।

এক পুকুরের মালিক বলল, পুকুর ঠিক উঠোনের উপর বলেই জালের শব্দ একটু-খানি কানে গিয়েছিল। কিন্তু বেরুতে গিয়ে দেখে, বাইরে থেকে শিকল আঁটা। শিকল এঁটে বন্দী করে মাছ ধরেছে। চেঁচানি দিল একটা। ঝটিতি বউ এসে মুখ চেপে ধরে: ঘরের মধ্যে ঢুকে গলা দুইখণ্ড করে দিয়ে যাবে। এক হাত মুখে চাপা দিয়েছে, আর এক হাত দরজায় খিল হুড়কো একের পর এক এঁটে দেয়। কথা বের হতে দিল না, বেরুতেও দিল না ঘর থেকে।

ঝিনুকপোতার দারোগা বলে বেড়াচ্ছে, সর্বপক্ষী মাছ খায়, নামটি কেবল মাছরাঙার!

সেই আসরে কে-একজন নাকি টিপ্পনী কেটেছে: মাছরাঙা তো চেলা-পুঁটি খায় বড়বাবু, বলাধিকারী খান তিমি। মাছের রাজা তিমি খেয়ে খেয়ে উনি তিমিঙ্গিল হয়েছেন।

বন্ধু লোকেরা আছে—তাদের কাজ ও-থানার কথা এ-থানায় এসে বলে যাওয়া। যত শোনেন, জগবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এত-তলিয়ে দেখেন নি। এখন যে মুখ দেখানোর উপায় থাকে না আপন-পর কারো কাছে। ধর্মের কাছেই বা জবাবদিহি কি?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নির্বিকার। বলে, এই দেখুন, মুখ দেখানোর মুশকিল কি হল? অনাদি সরকার এত বলে বেড়াচ্ছে, তার বউয়ের গলার নেকলেশটা লক্ষ্য করে দেখেছেন? খুকির বিয়ের নেমন্তন্নে নেকলেশটা পরে এসেছিল। শুধুমাত্র দারোগা-গিরি করে হীরে-বসানো এমন জিনিস দেওয়া যায়? বলুন। পুকুরচুরি করে ওঁরা সব জিতে যাচ্ছেন, এ তো পুকুরের ক'টা মাছ। তা-ও লোকগুলো নিজের বুদ্ধিতে করেছে, আপনি কিছু বলতে যান নি। আবার তা-ও বলি, তড়িঘড়ির কাজকর্ম—বলে-কয়ে অনুমতি নেবার সময় কোথা? পায়তারা কষতে গেলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ঐ কথাটা যা বললেন—

একটু দম নিয়ে বলে, ধর্ম কিছু আর পালিয়ে যায় নি একটা-দুটো দিনের মধ্যে। ধর্ম এখনো রাখা যায়। পুকুরে মাছ পোষে বিক্রি করে দুটো পয়সা পাবে বলে। পয়সা পেলেই চুকে-বুকে গেল। এই কথাটা আপনি তো গোড়া থেকে বলে আসছেন।

জগবন্ধু অধীর হয়ে বলেন, পুকুরওয়ালাদের ডেকে আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা

করে দিন ভটচাজমশায়। আজকে যদি হয়ে যায়, কাল অবধি সবুর করবেন না।

সেইমাত্র একটা এজাহারের শেষ হল ছোট-দারোগার কাছে। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষুদিরাম ডেকে এনে জগবন্ধুর সামনে হাজির করল।

লোকটা ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদেঃ ছা-পোষা গৃহস্থ বড়বাবু, বেটারা সর্বনাশ করে গেছে। মাছগুলো বুক-বুক করে রেখেছিলাম—একসঙ্গে বেচে দিয়ে বিঘে দুই ধানজমি করব।

কি পরিমাণ গেছে, আন্দাজ করতে পারো?

লোকটা বলে, জলের মাছ—সঠিক বলি কেমন করে। চান করবার জো ছিল না, গায়ে ঠোক্কর দিত। একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেন, তবু বলবে তো একটা-কিছু?

তাড়া খেয়ে লোকটা বিড়বিড় করে দ্রুত হিসাব করে নেয়ঃ গুণে সেবারে একশ বাছাই রুই ছাড়লাম। অর্ধেকও যদি মবেহেজে গিয়ে থাকে—

ক্ষুদিরাম প্রশ্ন করে ওঠেঃ কত বড় হয়েছিল?

সের পাঁচেক করে ধরে নিন। যাকগে যাক, আরও কিছু ছাড় করে দিয়ে গড়ে চার সের করেই হল—

রুই ছাড়া অন্য মাছও কিছু থাকবে তো পুকুরে। কাতলা মৃগেল বাটা সরপুঁটি—

আজ্ঞে হ্যা, ছিল বইকি! অঢেল ছিল।

লোকটা চলে গেলে ক্ষুদিরাম বলল, নিন, হল তো! শুধু রুইমাছই পাঁচ মন। তাছাড়া কাতলা গেল—আরও শত শত রকমের। অঢেল ছিল সেসব।

বলাধিকারী আঁতকে উঠলেনঃ কী সর্বনাশ! আমাদের তো মোটমাট চার মন। তারও কতজন ভাগিদার। ডাহা মিথ্যেকথা বলে গেল লোকটা।

ক্ষুদিরাম হেসে বলে, এই লোক বলে কেন—যার কাছে বলবেন, হিসাব এমনিধারাই দেবে। এখন এই। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচটা টাকাও যদি কাউকে দিয়েছেন, এজাহারের ঠেলায় ছোটবাবু অস্থির হয়ে যাবেন, সরকারি খাতা হু-হু করে ভরাট হয়ে যাবে। পুকুর ডোবা খানাখন্দ যার একটা আছে, কেউ আর বাদ পড়ে থাকবে না।

ছি-ছি! জগবন্ধুর মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না।

ক্ষুদিরাম বলে, আরও আছে বড়বাবু। হাতে-হাতে ক্ষতিপূরণ মানে চুরি দায় ঘাড় পেতে নেওয়া হল। ভেবে দেখবেন এদিকটা। চোরাই মাছে বিয়ের ভোজ হয়েছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির হয়ে গেল।

স্তম্ভিত জগবন্ধু। বলেন, কী জগৎ! সত্যি কথা, সৎ কাজকর্মের ধার দিয়েও কেউ যাবে না!

ক্ষুদিরাম নিরীহ ভাবে বলে, বিদ্যাসাগরমশায় এটা করে গেলেন।

কী করলেন তিনি—অমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি?

দ্বিতীয় ভাগে লিখে গেলেন—'সদা সত্য কথা বলিবে। আরও বিস্তর ভাল ভাল

কথা লিখলেন—'রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না।' ছেলেপ্লে না দৌড়ে কি ছায়ায় বসে বসে আফিংখোরের মতো ঝিমোবে? ঐ বয়স থেকেই ব্ঝে নিয়েছে, বইয়ে থাকে এ সমস্ত—বানান করতে হয় মানে শিখতে হয়, কাজে খাটাতে নেই। যেদিকে তাকাবেন এই। সত্য নিয়ে কারও শিরঃপীড়া নেই। এক-আধজন যদি দৈবাৎ মেলে, গবেট বলে তামাসা করবে তাকে লোকে।

আজও বলাধিকারী ক্ষ্দিরামকে বলে থাকেন, প্রথমপাঠ আপনার কাছেই পেয়েছি ভটচাজমশায়। গ্রুমান্য আপনার প্রাপ্য। চমক লেগেছিল বড্ড সেদিন। ন্যায়নীতি কোন এক কালে নিশ্চয় ছিল। কিন্তু রকমারি সমাজ-পদ্ধতির সঙ্গে এটির বিলয় ঘটেছে। একশ'র মধ্যে নিরানব্বই জনই যা মানে না, তাকে আর ধর্ম বলা যায় কি করে? ইতিহাসের মাটি খ্ড়ে বিল্প্ত বহ্ জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় লাগে, জীবনধারণের কাজে আসে না। ন্যায়ধর্মের যা সম্প্র্ণ বিপরীত, সেই রীতিগ্লোই সমাজ আজকে ধরে রেখেছে।

ক্ষ্দিরাম ছোট্ট একটু প্রতিবাদ করেঃ শতের মধ্যে নিরানব্বয়ের হিসাবটা ঠিক হল না বলাধিকারীমশায়। হাজারে ন-শ নিরানব্বই বলাও বেশি হয়ে যায়।

বলাধিকারী বলেন, সত্য-ন্যায়ের একটা পাতলা পোশাক শ্ধ্ ঢাকা দেওয়া। সেই পোশাকের নিচের চেহারাটা সবাই জানে। নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম থেকেই ব্ঝতে পারে। বাইরে অবশ্যই চাই ওটা, তবে পোশাকটুকু অতি-জীর্ণ হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন থাকছে না।

এসব এখনকার কথা। বলাধিকারী ও ক্ষ্দিরাম ভট্টাচার্যের মধ্যে হাস্য-পরিহাস চলে এমনিভাবে। সেদিনের জগবন্ধ্ আলাদা মান্ষ। অন্য কোন উপায় না দেখে চার মন মাছের দাম হিসাব করে তিনি ক্ষ্দিরামের হাতে দিলেন। দাম শোধ না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। টাকাটা দিয়ে, থানার বড়বাব্ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষ্দিরাম ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরলেনঃ আশাসুখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। অজান্তে অন্যের উপর জ্ল্ম হল, আঙ্ল ভেঙে তারা শাপ-শাপান্ত করবে, কিছ্তে এটা সহ্য হচ্ছে না। ধর্মভার আপনার উপরে—টাকাপয়সা কারো কাছে ঋণ না থাকে দেখবেন।

ক্ষ্দিরাম ঘাড় নেড়ে অভয় দেয়ঃ যারা মাছ ধরেছে, প্রো টাকা তাদের হাতে পে'ছে দেব। কার প্কুরের কত মাছ তারাই জানে, ঠিকমতো বাঁটোয়ারা করে দেবে। একটা জিনিস জানবেন, চুরি কর্ক যা-ই কর্ক ধর্ম রেখে কাজ করে তারাই। ছ্যাচড়ামি ঘেন্নার বস্তু। কথা দিল তো কিছ্তে তার নড়চড় হবে না। আমার কাছে কথা দিয়েছিল, বড়বাব্র মানের হানি হয় কিছ্তে সেটা হতে দেবে না। তাই করল কিনা বল্ন। যে ভাবেই হোক, কাজ ঠিক তুলে দিল।

ম্ল্য যথাযোগ্য স্থানে গিয়ে পড়বে, এত কথাবার্তার পরেও জগবন্ধ্র প্রোপ্রি বিশ্বাস হয় না। সান্ত্বনাঃ তিনি অন্তত ম্ল্য শোধ করে দিয়েছেন। এবং মনে মনে কঠোর সঙ্কল্প করলেন, এমন অনিশ্চিত সন্দেহ-সংকুল, কাজের মধ্যে কোনদিন আর

যাবেন না। মরে গেলেও নয়। যা হল এখানেই শেষ।

তবু কিন্তু শেষ হয় না। মাসখানেক পরে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি এল। থানার সেই কোয়ার্টারে। হাটবার সেদিন। চাকর সঙ্গে নিয়ে জগবন্ধু নিজে হাট করে আনলেন। রাত প্রহরখানেক। রান্নাঘরে ভুবনেশ্বরী রান্নাবান্না করছেন. খোলা দরজায় টুক করে কি এসে পড়ল পিছন দিকে। আর একটু হলে গায়ের উপর পড়ত। মানকচুর পাতায় কলার ছোটো দিয়ে সযত্নে বাঁধা পুঁটুলি।

খুলে দেখে অবাক। কচুপাতায় মাংস বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বাইরের ঘরে গল্পসল্প করছিলেন নতুন জামাইয়ের-সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী ডাকিয়ে আনলেন। দেখ কী কাণ্ড!

পাড়াগাঁ জায়গায় মাংস এমনি বিক্রি হয় না। একজন কেউ উদ্যোগী হয়ে পাঁঠা-খাসি মারে। যার যেমন প্রয়োজন—কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বা এক টাকার মতন ভাগ নিয়ে নেয়। জগবন্ধু তাই করবেন। সুপুষ্ট খাসি একটা ঠিক করে এসেছেন—রাত্রিবেলা মাছ ইত্যাদি হোক, দিনমানে কাল খাসির ঘাড়ে কোপ পড়বে। কিন্তু কোন সব অলক্ষ্য আত্মীয়জনেরা রয়েছে, জামাই-সমাদরের এতটুকু খুঁত তারা হতে দেবে না। এই রাত্রে ছাগল কেটে মাংসের ব্যবস্থা করেছে। হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না, এতদূরে স্বজন তারা।

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করেন, কে দিয়ে গেল বল তো?

আবার কে! বিয়ের মাছ যারা দিয়েছিল। এমন নিঃসাড়ে এসে ফেলে দিয়ে যাওয়া ঐসব গুণী লোক ছাড়া পারবে না।

ভুবনেশ্বরী বলেন, মাংস রাঁধতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিসের মাংস, কে জানে? চোখে দেখে তো চিনবার জো নেই—শিয়াল কুকুর কেটেও দিয়ে যেতে পারে।

জগবন্ধু বললেন, আমারও ঠিক সেই মত। এ মাংস জামাইয়ের পাতে দেওয়া যাবে না। কুকুর-শিয়ালের নয়, সেটা বলতে পারি। তার চেয়েও খারাপ। কার ঘরে ঢুকে সর্বনাশ করে এসেছে। মাংস আস্তাকুড়ে ফেলে দাও তুমি।

এতদূর করলেন না অবশ্য ভুবনেশ্বরী। এখন চাপিয়ে দিয়ে মাংস রান্না হতে রাত তো পুইয়ে আসবে। রেখে দেওয়া যাক, কাল দিনমানে দেখেশুনে রান্নাবান্না করা অথবা কাউকে দেওয়া—যা হোক কিছু করবেন।

পরের দিন রোদ উঠবার আগেই জানা গেল, জগবন্ধুর অনুমান খাঁটি। ডাকের রানার রাখহরি পুঁইয়ের বুড়ি-মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আধক্রোশ পথ ভেঙে থানায় এসে কেঁদে পড়ল: দারোগাবাবু আমার রাঙি ছাগলটা চুরি গেছে কাল রাত্রে। গোয়ালের একটা পাশ ছাগলের জন্য শক্ত করে ঘিরে দিয়েছি—সকালে দেখি, ঝাঁপ খোলা, ছাগল নেই। কেঁদো কি শিয়ালে নিয়েছে ভাবলাম। তারপরে দেখি, কচু-পাতায় বাঁধা মাংস। আমার রাঙিকে কেটেকুটে গৃহস্থর ভাগ রেখে গেছে।

হাপুসনয়নে কাঁদছে বুড়ি। ছাগল নয়, যেন পুত্রশোকের কান্না। চুরি-করা খাদ্য-বস্তুর ভাগ গৃহস্থকে দিলে শাপ অর্শায় না, চৌরশাস্ত্রের বিধান এই। আর

গৃহস্থকে যদি সেই বস্তু খাওয়ানো যায়, উল্টে তখন পুণ্যলাভ। রাঙির মাংস চোর তাই রাখহরির বাড়িতেও কিছু দিয়েছে।

যথারীতি এজাহার লিখিয়ে বুড়ি ফিরে যাচ্ছে। কান্না দেখে জগবন্ধু বিচলিত হয়েছেন। একটা কনেস্টবল দিয়ে বুড়িকে ডাকিয়ে আনলেন।

বুড়োমানুষ কষ্ট করে পুষেছিলে, কত দাম হতে পারে তোমার ছাগলের ?

সরল সাদাসিদে স্ত্রীলোক, কথায় কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলে, ব্যাপারি এসে ন-সিকে বলেছিল শীতকালে। দিইনি। বলি, এত ছোট খাসি না-ই বেচলাম। বড় হোক।

জগবন্ধু তিনটে টাকা তার হাতে দিলেন। বিবেক-দংশন অনেকটা শীতল হল।

বুড়ি অবাক হয়ে গেছে। থানার মানুষ হাত উপুড় করে টাকা দিচ্ছে! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগের মধ্যে বোধকরি এই প্রথম। এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে শুধুমাত্র এই থানায়।

বিস্ময়ের ধকল খানিকটা সামলে নিয়ে বুড়ি বলে, দাম আপনি কেন দেন বড়বাবু ? আপনার কোন দায় পড়ল ?

আমতা-আমতা করে জগবন্ধু অকস্মাৎ এক কৈফিয়ৎ খাড়া করে ফেলেন : ছেলের অকালমৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ এসে রাজা রামচন্দ্রকে গালি পাড়ে। শম্বুক বধ করে তবে নিষ্কৃতি। নিয়মই তাই। যার রাজত্বে বসবাস, প্রজার অমঙ্গলের দায় তারই উপর বর্তায়। থানার উপর বসে মাস মাস সরকারের মাইনে খাচ্ছি—মুল্লুকের চোরডাকাত যতদিন না শাসন হচ্ছে, লোকের ক্ষতিলোকসান ন্যায়ত ধর্মত আমাদেরই পূরণ করা উচিত।

বুড়ির এত সমস্ত বোঝার গরজ নেই। টাকা ক'টি আঁচলের মুড়োয় গিঁট দিয়ে পরমানন্দে চলে গেল।

বাসায় ফিরে জগবন্ধু স্ত্রীকে বললেন, মাংস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে বলছিলাম। দিয়েছ নাকি ?

রাখহরি মা'র খাসি-চুরির বৃত্তান্তটা ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরীর কানেও পেঁছে গেছে। বললেন, ফেলিনি ভাগ্যিস। রেখে দিয়েছি, এইবার চাপাব।

জগবন্ধু কঠিন কণ্ঠে বললেন, না। খুঁড়ে মাটি চাপা দেব। কাক-কুকুরের মুখেও যেন না যায়।

আবার কি হল ? ভুবনেশ্বরী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন : সন্দেহ তো মিটে গেছে। ছাগলেরই মাংস—বুড়ির পোষা খাসির। পুরো খাসির দামও তুমি দিয়ে দিলে—

জগবন্ধু বললেন, ঠিক ঐ জন্যেই। এ যাত্রা জামাই মাংস খাবে না, মাংসের নামগন্ধও উঠবে না বাড়িতে। কাল কিম্বা পরশুও যদি তুমি মাংস রাঁধতে বসো, ওধারে ছোটবাবুরা থাকে—খবর চেপে রাখতে দেবে না। বলবে, বুড়ি হৈ-হৈ করে পড়েছিল বলে মাংস সাঁতলে সাঁতলে কদিন রেখে দিয়েছে।

এত করেও কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ রইল না। পুঁইপাড়ার এক বেওয়া স্ত্রীলোক

মাঝে মাঝে ভুবনেশ্বরীর কাছে মজা-সুপুরি বেচতে আসে। তার মুখে ভুবনেশ্বরী প্রথম শুনতে পেলেন। পরে অন্যখানেও শুনলেন। রাখহরি পুঁই বলেছে, জগবন্ধু দারোগার জামাই এসেছে, খবর আগে টের পাইনি যে! মাকে তা হলে বলে দিতাম, রাঙিছাগল গোয়ালে না রেখে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। ঘরের দুয়ারে হুড়কো দিয়ে সর্বক্ষণ যেন জেগে বসে থাকে। খবর পাইনি, সমঝে দিতে পারিনি—দারোগার ভুত-প্রেতগুলো খাসি নিয়ে ঠিক সেই জামাইয়ের ভোগে লাগাল।

রাখহরি পুঁই যাদের ভুতপ্রেত বলছে এবং ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দৈত্যদানো বলেছিলেন, অদৃশ্য থাকলেও নিতান্ত অজানা নেই তারা এখন। বেচা মল্লিকের দল বল। বেচারাম নাকি জাঁক করে বেড়াচ্ছে: একদিন বাগানের এক কাঁদি মর্তমান-কলা পাঠিয়েছিলাম, কাঁদি ধরে উঠানে ছুঁড়ে দিল। এবারে যে গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুর তোলপাড়, মানুষের গোয়ালে খাসি-পাঁঠা থাকবার জো নেই।

জগবন্ধু যত শোনেন, ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের দাম হিসাব করে সমস্ত মিটিয়ে দিয়েছেন ?

আলবৎ!

প্রশ্ন করে শুনে নিতে হল, ক্ষুদিরাম সেজন্য মর্মাহত হয়েছে। বলে, টাকা-আনা-পাই পর্যন্ত হিসাব শোধ। এখন আর বলতে দোষ কি—বেচারামের নিজের হাত দিয়েই।

খাসির দামও আমি দিয়ে দিয়েছি। বুড়ি নিজ মুখে যা বলল, তারও কিছু বেশি ধরে দিলাম। সেই বেচারাম তবে আবার এসব রটায় কেন ?

দুর্জন লোক, সাচ্চা কাজকর্ম বরদাস্ত করতে পারে না। এমনধারা বড় একটা দেখে না তো চোখে। কানেও শোনে না। আমাদের ভাটিঅঞ্চলে নিতান্ত আজব ব্যাপার।

আজকের দিনে হলে জগবন্ধু সজোরে সায় দিয়ে উঠতেন: শুধু ভাটিঅঞ্চল কেন, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। কিন্তু সেদিনের সাধু-দারোগা আলাদা মানুষ। বিবেচনার ভুলে দুর্জনের নাগালের ভিতর গিয়ে পড়েছেন, মনে মনে শতেকবার সেজন্য কানমলা খাচ্ছেন। তুমিও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য চিজটি বড় কম নও। যোগসাজস তোমার সঙ্গেও। জেলেদের সম্ভবত টিপে দিয়েছিলে—সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করে জাল নিয়ে তারা ডাঙায় উঠল আমাকেই জালে আটকাবার জন্যে।

কিন্তু মনের এই কথা মুখে প্রকাশ করা চলে না। সৎপথে চলেন বলে দেশসুদ্ধ শত্রু। তার মধ্যে এই মানুষটা সুহৃদরূপে সামনে ঘোরাফেরা করে, তাকে বিগড়ে দিয়ে আরও একটা শত্রু বাড়ানো কাজের কথা নয়। সতর্কভাবে খোসামুদির সুরে জগবন্ধু বলেন, আপনার চোখ দুটোয় কিছুই এড়াবার জো নেই ভটচাজমশায়। মনের কথা বলি একটা। সারাক্ষণ সেই যে জাল বেয়ে একটি ঝেঁয়া-পুঁটি অবধি পড়ল না, হতে পারে জেলেদের শয়তানি। হতে পারে, ইচ্ছে করে ছেঁড়া জাল নামিয়েছিল। অথবা টানবার সময় জলে ভার বাঁধেনি, জাল উপরে ভাসিয়ে এনেছে।

কথা না পড়তে ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে বসে আছেঃ সবই হতে পারে বড়বাবু। হতে পারে কি, নিশ্চয় তাই। বেচারাম কলকাঠি টিপছিল দূর থেকে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবল একটুখানি। খাপছাড়া ভাবে বলে, তার দিকটাও দেখতে হবে বইকি! দোষ আমাদেরও বলাধিকারীমশায়। এতদূর আমরাই জমিয়ে তুলেছি।

বলাধিকারী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন। ক্ষুদিরাম বলে, মাছের দাম যদি না দিতাম, খাসি মেরে তবে আর মাংস দিতে আসত না। মাংসের দামও দিয়েছেন, আবার কি এসে পড়ে দেখুন। যতবার ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, ততবার একটি করে চাপান দিয়ে যাবে। থানার মালিক আপনি—আপনার মেয়েজামাই-এর নাম করে কিছু যদি দিয়ে যায়, আপনি তার দাম শোধ করতে ব্যস্ত। বেচারাম সেটা অপমান জ্ঞান করে। নতুন নয়, বরাবরের নিয়ম এই তার। অগস্তিসাহেবের মতো বাঘা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘোল খাইয়েছে—নিতে হল তাঁকে বাধ্য হয়ে।

জগবন্ধু চমকে উঠে বললেন, ঘুস নিলেন অগস্তি?

বেচারাম বলে ভেট—যতক্ষণ তার রাগের কারণ না ঘটে। খুব মান্য করেই দেয়। আপনারা ঘুস মনে করলে সে কি করবে বলুন।

অগস্তিসাহেবকে যারা জানে, ঘুষ হোক, আর ভেটই হোক, সে দরবারে গিয়ে পেঁছেছে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শীতক্যালে হাকিমরা তখন মফস্বলে গিয়ে তাঁবু ফেলতেন। খোদ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বড়-মেজ-ছোট সকল রকমের হাকিম। শাসন-বিচার হত উকিল-মোক্তারের আরজির-সওয়াল বাদ দিয়ে। আমলারাও অনেকে যেত হাকিমের সহযাত্রী হয়ে। বড্ড মজা সেই দিনগুলো। আহারাদির নিত্য-নূতন রাজসূয়ো আয়োজন—এক পয়সা খরচা নেই সেই বাবদে। আশেপাশের যাবতীয় জমিদার-তালুকদার গাঁতিদার-চকদার সিধা পেঁছে দিয়ে যাচ্ছে সকাল-বিকাল। এই নিয়ে পাল্লাপাল্লি—অমুক এই সাইজের গলদাচিংড়ি দিয়ে গেছে তো অঞ্চল চুঁড়ে দেখ, তার চেয়ে বড় কোথায় মেলে। এমনি ব্যাপার। কোন আমলা এবারে কোন হাকিমের সঙ্গে যাবে, তাই নিয়ে দস্তুরমতো তদ্বির চলত সদরে।

বেচারামও বরাবর ভেট পাঠিয়ে আসছে। দুনিয়ার উপর এক কাঠা জায়গাজমি নাই, ইজ্জত তবু জমিদারেরই। তার আয়োজনই সকলের চেয়ে বিপুল। দুর্জন লোক বলে কেউ তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যায় না।

অগস্তি এলেন জেলার কর্তা হয়ে। বিষম নামডাক, বাঘে-গরুতে জল খায় তাঁর প্রতাপে। পৌষমাসে ফুলহাটার অনতিদূরে মাঠের মধ্যে তিনি তাঁবু ফেললেন। সদরের গোটা অফিসটাই যাচ্ছে—বড় তাঁবু ঘিরে পাঁচ-সাতটা ছোট তাঁবু।

যথানিয়মে বেচারামের সিধা গিয়ে পড়েছে। দূর-দূর—করে হাঁকিয়ে দিলেন অগস্তি। জিনিষপত্র কিনেকেটে এনে খাবে, রায়তের কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত কারও নেওয়া চলবে না।

চারজন লোক গিয়েছিল, ফিরে এসে কাপ্তেনের সামনে ধামাঝুড়িগুলো নামাল। অবমানিত বেচারামের মুখের উপর দাউদাউ করে যেন আগুন জ্বলে। এলাকার মধ্যে বসে ভেট ফিরিয়ে দেয়—তার-ই চিরকালের অধিকারে হস্তক্ষেপ। হোক তাই কিনে-

কেটে এনেই খাওয়াদাওয়া করুক।

সরকারি লোক যে দোকানে যায়, মাল নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে গন্ডগোল—মাল বেচে কোন বিপদে পড়বে। সরিয়ে ফেলেছে। তিন ক্রোশ দূরের বড় গঞ্জ থেকে চাল-ডাল আনিয়ে তাঁবুর লোকের রান্নাবান্না হল। তিন-চার দিন চলে এই ভাবে, তারপর সেখানেও বন্ধ। পুরো একদিন শুধুমাত্র পুকুরের জল খেয়ে অগস্তি-সাহেব সদরে চলে যান। কী নাকি জরুরী ব্যাপার সেখানে, এস-ডি-ও আসছেন অগস্তির জায়গায়।

আমলারা ব্যাকুল হয়ে গিয়ে পড়েঃ আমাদের উপায় কি করে যাচ্ছেন হুজুর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে থাকব কেমন করে?

মেজাজ হারিয়ে অগস্তি খিঁচিয়ে ওঠেনঃ কে দিচ্ছে, তোমরা কে নিলে সদর থেকে আমি কি দেখতে আসব এখানে? খবরদার, আমার কানে কখনো যেন না পেঁছিয়! তাহলে রক্ষে রাখব না।

আমলারা চোখ তাকাতাকি করেঃ পথে এসো বাপধন। বেচারামও শুনল—আমলাদেরই কেউ গিয়ে বলে থাকবে। আগেরবার চারজনকে পাঠিয়েছিল, এবারে তার ডবল—আট জন। ধামা-ঝুড়ি মাথায় দিনদুপুরে হৈ-চৈ করে তারা ভেট নিয়ে চলল।

জগবন্ধু দারোগার ব্যাপার কিন্তু এই জায়গাটুকুর মধ্যে নয়, আরও বহুদূর গড়িয়েছে। সদর অবধি। ক্রমশ সেটা প্রকাশ পেতে লাগল সদরে। পুলিশসাহেবের কাছে বেনামি চিঠি যাচ্ছেঃ দারোগা পাইকারি হারে উৎকোচ লইতেছে, যত চোর-ডাকাত তাহার শিষ্যসাগরেদ, প্রজাসাধারণ বিপন্ন—

দুর্গম ভাটিঅঞ্চলে এটা নতুন ব্যাপার নয়। নিয়মই বরঞ্চ এই। দুর্জনদের হাতে রেখে খানিকটা তোয়াজ করেই কাজকর্ম চলে। ভাবখানা হল—তোমায় আমি বেশি ঘাঁটাব না, তুমিও উৎপাত বেশি করবে না। নিতান্ত নিয়মরক্ষায় যেটুকু লাগে—সরাসরি ইজ্জত এবং আইনকানুনের মর্যাদা মোটামুটি বজায় রাখবার মতো। এসব বৃত্তান্ত সদরে একেবারেই যে না পেঁছিয় এমন নয়। কিন্তু কেউ মাথা গলায় না। গলাতে গেলে সেই মাথা কাঁধ থেকে নেমে পড়ারই অধিক সম্ভাবনা। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে জানিনে-জানিনে করে কাজকর্ম চলে যায়।

এবারে অভিনব ব্যাপার। চিঠির মারফত সবিস্তারে খবর আসছে। একটা চিঠি গুটিয়ে পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলতে না ফেলতে পুনশ্চ চিঠি। ধাপধাড়া জায়গাতেও পোস্টাপিস বসিয়ে সরকার এই সর্বনাশটি করিয়েছেন। এক পয়সা, খুব বেশি তো দুটো পয়সার মাশুলে খবর কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যায়। বেচা মল্লিকের কাজ নয়—সে এত লেখাজোখার ধার ধারে না। রঙ্গক্ষেত্রে অন্যেরা এসে পড়েছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার জাতীয় লোকেরা।

—দারোগার জন্যই প্রজাদের ধনসম্পত্তি সহ বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জগবন্ধুর মেয়ের বিয়ের উল্লেখঃ শিষ্যসাগরেদ পাঠাইয়া একরাত্রে

এই অঞ্চলের যাবতীয় পুকুরের মাছ তুলিয়া আনিল। তাহাতেই দায় উদ্ধার হইল। মাছ চুরির এজাহার পড়িয়াছে, সেই তারিখের সহিত দারোগার কন্যার বিবাহের তারিখ মিলাইয়া দেখিলেই হুজুরের বোধগম্য হইবে। ইহার পর অধিক তদন্তের কি আবশ্যক থাকিতে পারে ?

ক্রুদ্ধ বেচা মল্লিকও এদিকে হৈ-চৈ লাগিয়েছে। হাঁকডাক করে বলছে, আধলা পয়সা ঘুস নেবে না বড় মুখ করে বলত। সেই মুখ রইল কোথা ? বলি কালী-দুর্গা কেষ্ট-মহাদেবের চেয়ে দারোগা কিছু বড়-দেবতা নয়। তাঁরা অবধি বিনা ঘুসে নড়ে বসে না—পুজোআচ্চা সিন্নি-মানত ঘুসেরই রকমফের। পুজো পেয়ে তুষ্ট হয়ে তবে একটা কাজ করে দেন। আর জগবন্ধু দারোগা, তোমার অত ডাঁট কিসের হে ? অবিশ্যি, পুজোর কায়দাটা বুঝে নিতে হয় ভাল করে—কি ফুলে কি মন্ত্রে কি রকম নৈবেদ্যে কোন দেবতার পুজো। বাঁধাধরা এক নিয়মে সকল পুজো হয় না। সংসারের যত-কিছু গণ্ডগোল ঠিক জায়গায় ঠিক পুজোটি বসাতে পারে না বলেই।

কাপ্তেনের হাসাহাসি নানা সূত্রে জগবন্ধুর কানে আসে। বাদার হরিণ মেরে ঝিনুকপোতা থানার কোন মক্কেল দিয়ে গেছে। দারোগা অনাদি সরকার সেই উপলক্ষে জগবন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। খেতে খেতে তিনিও বললেন কথাটা। যথাযথ দরদ দিয়ে বললেন : নোংরা কথাগুলো আপনার নাম ধরে বলে বটে, কিন্তু ঝোঁকটা সমগ্র পুলিস-সমাজের উপর এসে পড়ে। চুপচাপ থেকেই আসকারা পাচ্ছে, রীতিমত শাসন হওয়ার দরকার।

সহানুভূতি ও দুঃখে টগবগ করে ফুটছেন তিনি। কিন্তু জগবন্ধু লক্ষ্য করেছেন ঠোঁটের আড়ালে হাসিটুকু। হাসি যেন বলছে, কি হে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির, আমাদের কথা লোকে ঠারেঠোরে বলে, তোমায় নিয়ে যে জগঝম্প পেটাচ্ছে আকাশ-পাতাল জুড়ে।

ক্ষেপে যাচ্ছেন জগবন্ধু। ভালো থাকতে গিয়ে এই পরিণাম। ভালোকে মন্দের খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে যেন মানুষের সোয়াস্তি।

ক্ষুদিরামকে একদিন বললেন, শুনেছেন ?

ক্ষুদিরাম বলে, রেখেঢেকে তো বলে না, কেন শুনব না ? এক্তিয়ারের মানুষ নয়, মুখে চাবি আঁটারও জো নেই।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও জগবন্ধু ইতিমধ্যে অনেক জেনেছেন। পরগাছা বিশেষ—যে যখন দারোগা হয়ে থানায় আসে, তাকেই আঁকড়ে ধরে। এই থানায় আসার প্রথম দিনটা মনে পড়ে। জগবন্ধু এলেন, কালী বিশ্বাস কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ক্ষুদিরাম ঢুকবার পথে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করল। সে-ই যেন গৃহকর্তা, জগবন্ধু অতিথি। কালী বিশ্বাসের দিকে চেয়ে একটা সাধারণ বাক্যেরও কার্পণ্য তখন। নতুন দারোগার মনস্তুষ্টি হবে বলে কালী বিশ্বাসের ট্যারা চোখ নিয়ে রসিকতাও করে একটু : বিশ্বাসমশায় তাকালেন চোরটার দিকে—চোর ভাবে, গাছের উপরের পাখি দেখছেন কথাবার্তাও তাই, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। কালী বিশ্বাসের কানে না যায়, লজ্জিত জগবন্ধু তাড়াতাড়ি এটা-ওটা বলে কথা চাপা

দিলেন। অথচ জানা গেল, ঐ কালী বিশ্বাসের দিনেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দারোগার প্রধান অমাত্য এবং সর্বকর্মে দক্ষিণহস্ত। টাকার জন্য করে, তা নয়। ক্ষুদিরামের বাড়ির অবস্থা ভালো, টাকার কোন স্পৃহা নেই। আরও একটা কথা সবাই বলে, মানুষটা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাকে যখন সুহৃৎ বলে মেনে নেবে, প্রাণ ঢেলে দেবে তার কাজে। স্বভাবই এই রকম বিচিত্র।

এমনি ভাবে আর চলে না। জগবন্ধু ঠিক করলেন, ক্ষুদিরামের হাতের পুতুল না হয়ে কাপ্তেন বেচামল্লিককেই শাসন করবেন সোজাসুজি। এই প্রতিজ্ঞা। মুখে চাবি আঁটার জো নেই, ক্ষুদিরাম বলে। জেলের ঘরে চাবি এঁটেই বেচারামের মুখ বন্ধ করে দেবেন। সুযোগও চমৎকার জুটে গেল—দুঃসাহসিক ডাকাতি।

নয়

দুঃসাহসিক ডাকাতি। গাবতলির যে হাট দেখে এসেছি, তার অদূরে মাঝনদীর উপর। হাটবার, নদীর এপারে-ওপারে হাজার হাজার হাট-ফিরতি মানুষ জড় হয়েছে। তারই মধ্যে সকলের চোখের উপর কাজ সমাধা করে সরে পড়ল—এত দক্ষতা আর এমন সাহস কাপ্তেন বেচারাম, নিতান্ত পক্ষে তার বাছাই শিষ্যসাগরেদ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না। যে না সে-ই বলবে এই কথা।

মুশকিল হল, গাবতলি জায়গাটা জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে না। ঝিনুক-পোতার এলাকায়—অনাদি সরকার সেখানকার বড়-দারোগা। অনাদি উৎসাহ দেখাবে না, সেটা বেশ জানা আছে। ভয় করে বেচা মল্লিককে। তা ছাড়াও অন্যবিধ গোপন কারণ আছে অনুমান করা যায়।

গাঙের উপর জমিদারি কাছারি? কাছারির ঘাটে ডিঙিনৌকো বেঁধে জন দশেকের একটা দল নেমে পড়ল। অনেক দূর উত্তরের ডাঙাঅঞ্চলে ঘর তাদের, বাদাবনে চাক কাটতে গিয়েছিল। দুই ক্যানেস্তারা মধু পাইকারকে মেপে দিয়ে দেশে ফিরছে। নৌকোয় জলের কলসি একেবারে খালি, জলের অভাবে দুপুরে রাঁধাবাড়া হয়নি। তেষ্টার জলও নেই। রাজকাছারিতে এসে অতিথি হল তাই।

বলে, আপনাদের কোন দায় ঠেকাতে হবে না নায়েবমশায়। চাল-ডাল আনাজপত্তর সমস্ত নৌকায় আছে। গাছতলায় শুকনো ডালপালা দু-চার খানা কুড়িয়ে নেব। কাছারির মিঠে-জলের পুকুরের বড্ড নাম, ঐ জলের নামে উঠে পড়েছি। কোন একটু আচ্ছাদন দেখিয়ে দেন, খান আষ্টেক ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিই। চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়েই চলে যাচ্ছি আমরা।

এইটুকু প্রার্থনা না শোনার হেতু নেই। একেবারে গাঙের কিনারে চালাঘর, বাবুদের নিজস্ব হাঙরমুখো পালকিখানা থাকে যেখানে। সেই ঘরের এক প্রান্তে রান্না চাপিয়েছে। ভাত কেবল ফুটে উঠেছে—রান্নাবান্না ফেলে হুড়মুড়িয়ে সকলে ডিঙিতে

উঠে পড়ল। চক্ষের পলকে ডিঙি খুলে দেয়। ইটের উনুনে ভাত ফুটতে লাগল টগবগ করে।

গাঙের উপর সেই সময়টা বড় এক সাঙড়-নৌকা ধান-বোঝাই করে হাটে গিয়েছিল, ফিরে যাচ্ছে। এর অনেক পরে জগবন্ধু দারোগা নিজে কাছারিবাড়িতে এসেছিলেন ঃ ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বকর্ণে শুনবার জন্য। আত্মপরিচয় দেননি, কে না কে এসে পড়েছে। দারোয়ান রামকৃপাল গল্পটা বলল—মামলা উঠলে লোকটা আদালতেও সাক্ষি দিয়েছিল। চালাঘরে রান্না চাপিয়েছে, রামকৃপাল কলকের আগুন নিতে এসেছে তাদের উনুনে। সাঙড়-নৌকো দেখেই তড়াক করে উঠে সবসুদ্ধ ঘাটে ছুটেছে—

রামকৃপাল জিজ্ঞাসা করে, কি হল গো?

দলের কর্তাব্যক্তিটি জবাব দিল ঐ নৌকোয় ব্যাপারি যাচ্ছে, মানুষটা প্রত্যন্ত প্যাজি। এক গাদা টাকা কর্জ নিয়ে পলাপালি খেলছে। কাল রাত্তির থেকে তক্কে-তক্কে আছি। পালাচ্ছে কি রকম, চেয়ে দেখ না—

কথা এই ক'টি—তাও কি শেষ করে বলল! বলতে বলতে লম্ফ দিয়ে পড়ল ডিঙির উপর। ছয়খানা বোঠে ঝপঝপ করে পড়ে। আলগোছে জল ছুঁয়ে—কিম্বা জল একেবারে না ছুঁয়েই বাতাসে উড়ে চলছে বুঝি ডিঙি।

জগবন্ধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কর্তা মানুষের চেহারা জিজ্ঞাসা করেন। লম্বা দশাসই জোয়ানপুরুষ কিনা?—হ্যাঁ। উপর ঠোঁটে শ্বেতি আছে কিনা? জবাবে রামকৃপাল একবার বলে হ্যাঁ, একবার বলে না। মোটের উপর প্রমাণ হয় না কিছুই। শ্বেতির দাগ থাকলেও বেচা মল্লিক হতে পারে। অনেক ছলাকলা ওদের ঠোঁটের সাদার উপর রং চাপিয়ে গাত্রবর্ণের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া দশাসই লম্বা মানুষ বেছে বেছে নিয়েই তো দল, বেচা মল্লিক ছাড়াও দশাসই জোয়ানপুরুষ বিস্তর আছে। তবে কাজকর্মের ধারা দেখে প্রত্যয় আসে, কাপ্তেন বেচা স্বয়ং হাজির ছিল সেদিন ঐ ডিঙিতে।

এপার-ওপার দুপার দিয়েই হাটের ফেরত মানুষজন যাচ্ছে। হাজার দেড় হাজার মানুষ তো বটেই। চোখের সুমুখে এত বড় কাণ্ডটা চলেছে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব। সাঙড়ের কাছাকাছি হয়েছে ডিঙি, মাঝে তবু হাত দশেক ফাঁক। সবুর না মেনে—সে এক তাজ্জব কাণ্ড!—ডিঙি থেকে তিড়িং তিড়িং করে এরা সাঙড়ের উপর পড়ছে। বানরে যেমন এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফ দিয়ে পড়ে। কতক আগ-নৌকায়, কতক ছইয়ের উপরে, কতক বা পাছগলুয়ে। কী শিক্ষা গো বাবুমশায়! পলকের মধ্যে ঘটে গেল, পাড়ের উপর আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

ভর সন্ধ্যায় তোলপাড় পড়ে গেল। ফাঁকা নদীর উপর তখনো বেশ আলো, সুমুখজ্যোৎস্না বলে আলো বহুক্ষণ থাকবে। ডাঙার উপর থেকে সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রামকৃপাল দেখছে, সেই হাজার মানুষ চোখ মেলে দেখছে। ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা মেরে সাঙড়নৌকোর মাল্লাগুলোকে টপাটপ জলে ফেলে দিল। ডালের উপর উঠে এক-হাতে যেমন পেয়ারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে সেইরকম। তারপরে আওয়াজ পাওয়া যায়, দমাদম কুড়াল মারছে ছইয়ের ভিতরে। ব্যাপারটা সঠিক বোঝা যায়নি

গোড়ায়। কেউ ভাবছে, কুড়াল পেড়ে নৌকোর কাঠে, নৌকো কেটে চেলা-চেলা করছে। কেউ ভাবে, মানুষের মাথায় পড়ছে—যে ক'জন আটকে পড়ছে, খুলি চুরমার করে দিচ্ছে তাদের। পরে আসল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। নৌকোর মধ্যে লোহার সিন্দুক—মোটা শিকলে গুড়োর সঙ্গে বাঁধা, ধানাবাঁকির যাবতীয় টাকা সেই সিন্দুকে। লোহার উপর কুড়ুল মেরে মেরে শিকল কাটছে। সহজে কাটবার বস্তু নয়—দশ-বারো কোপ পড়ার পরে মুল-ব্যাপারি বলরাম সাঁই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। শিকল বুকে জড়িয়ে ধরে লম্বালম্বি হয়ে পড়ল তার উপর। পাড়ের মানুষ যা-ই ভাবুক, মানুষের মাথায় সত্যি সত্যি কুড়াল চালানো যায় না। বেচারাম লুঠেরা বটে, কিন্তু খুনি নয়। মানুষ খুন করা মহাপাপ ওদের নীতিশাস্ত্র মতে। কাজের মধ্যে দৈবাৎ খুন হয়ে গেলেও নিন্দে রটে যায় খুনি বলে, সমাজে সে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে টাকাকড়ি সোনারুপো মানুষের অর্জিত বস্তু, খোয়া গেলে কোন-একদিন পূরণ হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রাণ ফেরত আসে না। যে বস্তু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি হরণ করবে কোন বিবেচনায় ?

বলরাম শিকল আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তো কুড়াল ফেলে লাঠি ধরল এবার এরা। পিঠের উপর দমাদম মারছে। তিলেক নড়াচড়া নেই বলরামের—ধানের বস্তার উপর লাঠি পিটে ধুলো ঝাড়ছে যেন। এই ঘটনা পরে একদিন বেচারামই বলাধিকারীর কাছে বলেছিল। মার খেতে পারে বটে বলরাম লোকটা ! নির্বিকারে মার খাওয়া দেখে মনে হয় কুম্ভযোগ করে দেহের খোলে বাতাস পুরে ফেলেছে। ফুটবলের মতো। এত বড় তাগদ তো ধান বওয়াবয়ি করে মরে কেন ? শুধু এই গুনের জন্যই অনায়াসে তাকে কোন একটা দলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। এইসব কথা মনে হয়েছিল তখন কাপ্তেন বেচা মল্লিকের।

নদীর উত্তর তীরে এদিকে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেছে। যত হাটুরে নৌকো এই মুখো বেয়ে আসছে। হাটখোলা অবধি খবর হয়ে গেছে—সে ঘাট থেকে বিস্তর নৌকো খুলে দিয়েছে, দাঁড়-বোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটেছে, এসে ঘিরে ধরবে। এতক্ষণে সাহস পেয়ে এ-পার ও-পারের অনেক বীরপুরুষে ঝপাঝপ জলে পড়ে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। সময় নেই, মুহূর্ত আর দেরি সইবে না—

বেচারাম কোন দিকে ছিল—মারে কিছু হয় না তো ছুটে এসে খ্যাচ করে শড়কি বসিয়ে দিল বলরাম ব্যাপারির হাতের চেটোয়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে, শিকলের উপরের হাত আপনি আলগা হয়ে যায়। তখন আর কি ! শিকল চুরমার হয়ে গেছে, মরদেরা ধরাধরি করে সিন্দুক ডিঙিতে নিয়ে ফেলে। নৌকোর উপরে নিয়ে বেড়ায় বলে সিন্দুক আয়তনে ছোট। তবু ডিঙি কাত হয়ে জল উঠে গেল খানিক। কাজ হাসিল করে মরদেরাও লাফিয়ে পড়েছে। হাতে হাতে বৈঠা—ঝপাঝপ বৈঠা মেরে সকলের চোখের উপর ডিঙি ছুটে পালাচ্ছে।

পাড়ের মানুষ উদ্দাম হয়ে ধর্ ধর্ করে চেঁচায়। বোঠে-দাঁড়ের তাড়নায় আর সাঁতারু মানুষের দাপাদাপিতে জল তোলপাড়। বিশ-পঁচিশটা নৌকো এসে নানান দিকে ঘিরে ধরেছে। ফাঁকা নদী, আড়াল-আবরু নেই। দুই তীরে মানুষ গিজগিজ

করছে—ডাঙায় উঠতে হবে না যাদুমণিরা, যাবে কোন দিকে।

এমনি সময় দুড়ুম-দাড়াম—বন্দুকের দেওড়। বন্দুকও রয়েছে সঙ্গে। থাকবে তো বটেই। হাটের জনতার মুখোমুখি এসে কাজে নেমেছে, আয়োজনে খুঁত রেখে আসেনি। দেশি কামারের লোহা-পেটা বন্দুক, বুলেট হল জালের কাঠি। রাইফেল অবধি কত সময় হার খেয়ে যায়। পুলিস ধুন্দুমার লাগিয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাটি অঞ্চলে এখনো এই বস্তু প্রচুর। মানুষ মারা নিয়ন নয়, তাই বলে বিপদের মুখে হাত বাড়িয়ে এসে ধরা দেবে এমন অহিংস প্রতিজ্ঞা নিয়েও বেরোয় না কেউ বাড়ি থেকে। যত নৌকা তাড়া করে এসেছে, বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে দাঁড় তুলে দাঁড়াল। যারা সাঁতরে আসছিল, পাক খেয়ে উল্টো মুখো ঘুরল। পাড়ের মানুষ এত যে জব্বার দিচ্ছিল, নিঃশব্দ তারা এখন। যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে, বন্দুক তাদের দিকে তাক করে না বসে। এক ফালি চাঁদ কখন আকাশে উঠে গেছে, নদীজল ঝিলমিল করছে। জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ তুলে ডাকাতের ডিঙি পলকের মধ্যে অদৃশ্য।

ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো গাঙ-খাল। খালেরই বা কত শাখা-প্রশাখা ধানক্ষেতের মধ্যে, পতিত জলা ও জঙ্গলের মধ্যে, মানুষের বসতির আনাচে-কানাচে। তারই কোন একটায় ঢুকে পড়েছে, আবার কি! ধরা অসম্ভব। ধরতে যাওয়াও গোয়ার্তুমি। কোথায় কোন অন্তরালে ওত পেতে আছে—যে-ই না কাছে গিয়েছে, দিল ঘাড়ে লাঠির বাড়ি। কিম্বা শড়কির খোঁচা।

জগবন্ধু বন্যাধিকারী কাছারির দারোয়ান রামকৃপালের মুখ থেকে এই সমস্ত শুনে এসেছেন। কিন্তু ধুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ করেন না। ক্ষুদিরামকে বাজিয়ে দেখছেন। কাছাকাছি এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, বহুদর্শী সুহৃদের পরামর্শ চাইছেন যেন তিনি ঃ কী করা যায় বলুন ভটচাজমশায়, আমাদের কি কর্তব্য?

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেয় ঃ একেবারে কিছু নয়—বেশ খানিকটা সর্ষের তেল নাকে ঢেলে ঘুমান। কী দরকার বলুন ব্রণ চুলকে ঘা করবার? বুঝুকগে অনাদি-দারোগা, যার এলাকায় ঘটেছে।

জগবন্ধু জেদ ধরে বলেন, কপালক্রমে সুযোগ এসে গেছে, এ আমি ছাড়ব না। দলসুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে দেব, অকথা-কুকথা রটানোর শোধ তুলব। যতই হোক, বিদেশি মানুষ আমি। আপনি অনেককাল ধরে আছেন, অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। আপনাকে সহায় হতে হবে, সেইজন্যে বলছি। অনাদি সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কেস গোলমাল করে দিতে পারে। নির্ঘাৎ সেই চেষ্টা করবে। যাতে না পারে, আমাদের দেখতে হবে সেটা।

ক্ষুদিরাম বলে, সেটা হবে কিন্তু বিড়াল কাঁধে নিয়ে ইঁদুর-শিকারের মতো। বিড়াল ঠেকাতেই জ্বালাতন হয়ে উঠবেন। দরকারটা কি, বুঝিনে। বেচা মল্লিক রেগে গিয়ে এটা-ওটা হয়তো বলছে, কিন্তু মানুষটা আসলে খারাপ নয়। মন বড় দরাজ। মেয়ের বিয়ের দিন তার কিছু পরিচয় দেখলেন। আমি গিয়ে শরণ নিলাম,

লোকজন লাগিয়ে রাত্তিরবেলা দায় উম্ধার করে দিয়ে গেল। রাজাবাদশার মেজাজ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাও শুনুন তবে।

ক্ষুদিরাম তখন খুলনা শহরে। গ্রাম ছেড়ে শহরের উপর আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছে। বাপ চেষ্টাচরিত্র করে আদালতের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। চাকরি করে, আর সকাল-সন্ধ্যা জ্যোতিষের চর্চা করে। নামও হয়েছে কিছু। শোনা গেল, কাপ্তেন বেচা মল্লিক কী একটা কাজে খুলনায় এসেছে।

ক্ষুদিরামেরই এক মক্কেল খবরটা এনে দিল। অনেক দিন থেকেই মল্লিকের কাছে যাবার ইচ্ছা। সুযোগ পেয়ে ক্ষুদিরাম তার বাসায় গিয়ে পড়ল।

কপাল-ভরা চন্দন, নগ্ন দেহে ধবধবে সুস্পষ্ট উপবীত। একজনে পরিচয় বলে দিল, সামুদ্রিকাচার্য মশায়—

বেচা মল্লিক তাড়াতাড়ি পদধূলি নেয়। জিনের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা নোট একখানা ক্ষুদিরামের হাতে দিল ঃ

ক্ষুদিরাম তটস্থ হয়ে বলে, এ কী! টাকার জন্য আসিনি আপনার কাছে।

বেচা মল্লিক বলে, ব্রাহ্মণের পায়ে শুখো প্রণাম চলে না। নিয়ে নিন, ফেরত দেবেন না।

দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ কথাটুকু অনুনয় কি তর্জন বোঝা যায় না। নোটখানা ক্ষুদিরাম ভয়ে ভয়ে গাঁটে গুঁজে ফেলল।

বাড়ি ফিরে দেখে এক-শ টাকার নম্বরি নোট (এক-শ টাকার তখন অনেক দাম, এখনকার সঙ্গে তুলনা করবেন না)। ভুল করে দিয়েছে নিশ্চয়। হন্তদন্ত হয়ে ক্ষুদিরাম আবার ছুটল।

বেচা মল্লিক দেখে বলে, কম হল এবারে, তা জানি। এর পরে এসে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো। হাতও দেখাব তখন।

কম কি বলছেন? নোট এক-শ টাকার।

তাই নাকি? দু-পকেটে দুই রকমের নোট। বড়খানা তবে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। অসুবিধা হবে খুব—কিছু কেনাকাটার গরজ ছিল, এবারে আর হবে না।

ক্ষুদিরাম বলে, নোট ফেরত দিতে এসেছি। ছোট যা আছে, তাই না হয় একটা দিয়ে দিন আমায়।

আপনার অদৃষ্টে গেছে। একবার হাত থেকে বেরুলে মল্লিক সে জিনিস আর ছোঁয় না। বাড়ি চলে যান ঠাকুর, ভ্যানর-ভ্যানর করবেন না।

সেই উগ্র কণ্ঠ। ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

বলাধিকারীকে বলছে, মল্লিক লোকটার মনে যেন আলাদা আলাদা দুই কুঠুরি। ভালোয় মন্দয় মিশাল সাধারণ দশজনার মতো সে নয়। ভালো যখন, অতখানি ভালো কেউ হয় না। অশ্বত্থের মতো ছায়া দিয়ে রাখবে, গায়ে আঁচ পড়তে দেবে না। মন্দ হল তো আসল কালকেউটে। মেরে একেবারে সাবাড় করতে পারেন তো

করুন। খুব ভালো সেটা, লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু খবরদার, ঘাঁটা দিয়ে রাখবেন না। আপনি আমায় ভালবাসেন বড়বাবু, মা-ঠাকরুনও বিশেষ খাতির করেন। সকলের মুখ চেয়ে মানা করছি।

কথাটা মনে ধরেনি, বলাধিকারীর মুখ দেখে বলা যায়। ক্ষুদিরাম নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনাকে আমি কি বুদ্ধি দিতে পারি! পূর্বাপর দেখুন সমস্ত ভেবে। যা করবেন সাথেসঙ্গে আছি, কেনা-গোলাম বিবেচনা করবেন আমায়।

জগবন্ধু যত ভাবছেন, জেদ আরও চেপে যাচ্ছে। আর একটা খবর বলেননি ক্ষুদিরামের কাছে। কারো কাছে প্রকাশ করে বলবার নয়। এমন কি ভুবনেশ্বরীর কাছেও বলতে ইচ্ছে করে না। সদরে ডি-এস-পি ও এস-পি'র কাছে বিস্তর বেনামি চিঠি গেছে তাঁর বিরুদ্ধে—এসব পুরানো কথা। এখন জানা গেল, কলকাতায় ইন্সপেক্টর-জেনারেল অবধি চলে গেছে চিঠি। যদু-মধুর দ্বারা এত দূর হয় না, দস্তুরমতো পাকা লোক পিছনে। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকারই সম্ভবত। এতকাল মনের আনন্দে এক-একটা থানা সরোবরে হংস হয়ে মৃণাল তুলে খেয়ে এসেছে, দলের ভিতর একটা বক এসে পড়ে বাঁধা-নিয়মের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দিল। জগবন্ধু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছেন, এনকোয়ারির তোড়জোড় হচ্ছে ঐসব চিঠির অভিযোগ সম্পর্কে। সেই অবধি যদি গড়ায়, ফল যে রকমই হোক—মান-প্রতিপত্তি আর ধর্মপথের অহঙ্কার নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন না আর তিনি। উপরওয়ালার সন্দেহ অঙ্কুরে বিনাশ করবেন বেচা মল্লিককে জেলে পুরে। মেয়ের বিয়ের সময় যে ভুল করেছেন, সেই কলঙ্ক ধুয়েমুছে যাবে। অদৃষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে এই সঙ্গিন সময়টায়। এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।

আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল। গাবতলি জায়গাটা ঝিনুকপোতার বটে, কিন্তু বলরাম ব্যাপারির বাড়ি জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে। পথঘাটের খোঁজ নেওয়া হল। অতিশয় দুর্গম গ্রাম—দূরেও বটে। গাঙ-খাল নেই যে নৌকা চেপে যাবেন। ডাঙার পথও নেই। ধান কেটে-নেওয়া দিকচিহ্নহীন ক্ষেত—ক্ষেতের সরু আলপথ এবং খানিকটা বা গরু-চলাচলের পথ ধরে বিস্তর কষ্টে যেতে হয়।

বলরামের পাত্তা নেই সেই ঘটনার পর থেকে। ফেরারি। সাঙড়-নৌকো মাঝি বিহনে ভাসতে ভাসতে বাঁকের মুখে চড়ার উপর উঠে গেছে, পাটার উপর বলরাম আহত হাত চেপে ধরে আর্তনাদ করছে, এমনি সময় হাট-ফিরতি কোন এক আত্মীয়জন দেখতে পেয়ে তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল। হাঙ্গামা চুকেবুকে যাওয়ার পর জমিদারি-কাছারি পাইক-বরকন্দাজ নৌকার খোঁজ করে কাছারির নিচে এনে নোঙর করে রাখল। পরের দিন ঝিনুকমারির ছোটবাবু এবং সিপাহিরা তদন্তে এসে মাল্লা একটিকে পেয়ে গেল। কিন্তু আসল জন—বলরাম ব্যাপারিই গায়েব। ডাকাতি তার উপরে যেন হয়নি, সে-ই যেন ডাকাত।

তা-ও ঠিক নয়। ডাকাত এসে একদফা লুঠেপুটে নিয়ে গেছে, তার উপরে আবার দ্বিতীয় দফা ডাকাতির আতঙ্ক। থানা-পুলিস অনেক বড় ডাকাত, বেচা মল্লিক কোথায় লাগে! ডাকাতির পদ্ধতিটা কিছু স্বতন্ত্র। যে মাল্লাটাকে পেয়ে গেছে, খোদ অনাদি

সরকার সমারোহে চলে গেলেন তার বাড়ি। ঘোড়ার পিঠে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার খোরাকি সহিসের খরচা সিপাহির বারবরদারি এবং বড়বাবুর প্রণামি—একগণ্ডা হাঁস বিক্রি করে দায় মেটাতে হল। একটা দিনেই শেষ হল না, চলবে তো এই এখন। ভিটেমাটি বন্ধক পড়বার গতিক। সামান্য এক মাল্লামানুষ নিয়ে এই, মূল-ব্যাপারিকে পেয়ে গেলে কী কাণ্ড করবে ভেবে হৃৎকম্প হয়। টাকাকড়ি গেছে—ব্যবসায়-বাণিজ্য করে সামলে উঠবে হয়তো একদিন। হাতখানা জখম হয়ে গেছে, তা-ও সারবে। কিন্তু পুলিসের কবলে পড়লে যা-কিছু আছে সে তো যাবেই, তার উপরে কাজকর্ম ছেড়ে থানা-আদালত করে বেড়াও কমপক্ষে এখন দুটি বছর। একলা বলরাম ব্যাপারি নয়, অঞ্চলের যাবতীয় মানুষের মোটামুটি মনোভাব এই। চাপাচাপি কর তো যমালয়ে যেতে রাজি আছে, থানার পথে কদাপি নয়।

জগবন্ধুরও জেদ চেপেছে। চুপিচুপি বলরামের গাঁয়ে চললেন। সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দুটি কনেস্টবল। সামান্য সাধারণ লোক যেন, সাদা পোশাক সকলের। ঘোড়া নিলেন না—ঘোড়ায় চেপে দারোগাবাবু চলেছেন, সাড়া পড়ে যাবে। মড়ক লাগলে যেমন হয়, মুখে মুখে ছুটবে দুঃসংবাদ। বলরাম যেখানেই থাক, টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে।

কত কষ্টে যে পৌঁছলেন, সে জানেন জগবন্ধু দারোগা আর তাঁর অন্তর্যামী। কনেস্টবল দুটো দীঘির পাড়ে ঘাসের উপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো। ক্ষুদিরামের কাঁধে লাঠি। লাঠির মাথায় তালি-দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আজেবাজে খাতা ও ছাপা কাগজপত্র সেই ব্যাগে। গ্রামে এসে বলরামের বাড়িরও খোঁজ হয়েছে। দুজনে ঢুকে পড়লেন।

বলরাম সাঁইয়ের বাড়ি এটা ?

একটি লোক ছুটে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। পরিচয় পাওয়া গেল, সম্পর্কে বলরামের মামা।

কিছুদিন আগে সেটেলমেণ্টের মাপজোক হয়ে গেছে। ক্ষুদিরামের কাঁধের ব্যাগ খুলে কিছু কাগজপত্র নেড়েচেড়ে জগবন্ধু বললেন, জরিপের লোক আমরা, বলরাম সাঁইয়ের খোঁজে এসেছি। তোমায় দিয়ে হবে না তো মাতুল মশায়, বলরামকে ডাকো। তার কাছে দরকার।

মামা বলে, কোথায় বলরাম, আমরা কেউ জানি নে। তাকে পাওয়া যাবে না।

একটা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে পেন্সিলের টানে জগবন্ধু খচখচ করে কয়েক ছত্র কাটলেন। লিখলেনও কি খানিকটা। মামা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জগবন্ধুই বলে দিলেন, পর্চা থেকে নাম কাটা গেল। কেউ তোমরা ক্ষেতখামারে যাবে না। ধান যা আছে, মলে ডলে জমিদারি-কাছারির গোলাজাত হয়ে থাকুক। বুজরাতের আগে বোঝাপড়া হবে না।

বাড়ির বাচ্চাগুলো অবধি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীলোকেরা অন্তরালে। মামা বলে, কেন, আমাদের ধান কাছারির গোলায় কি জন্যে উঠবে ? জমির খাজনা-সেস হাল সন অবধি শোধ। ধারদেনা ভাগ্যে আমার বরদাস্ত করতে পারে না।

জগবন্ধু বলেন, সে বুঝলাম, কিন্তু ভাগ্নেই তো ফেঁাত। আমাদের আপিসে খবর হল, ডাকাতে কেটে দুই খণ্ড করে গাঙের জলে ফেলে দিয়েছে। তদন্তে এসেও তাই দেখছি। পর্চার নাম না কেটে কি করি। জমির ধান আপাতত উপরের মালিকের জিম্মায় থাকবে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয়ে কাগজপত্রের সংশোধন হোক, তারপরে জমির দখল।

চাষা-মানুষের জমি তো দেহের অঙ্গ। ভিতরে যারা উৎকর্ণ হয়ে আছে, ছটফটানি লেগে গেছে তাদের মধ্যেও। একবার সেদিক থেকে ঘুরে এসে মামা সকাতরে বলে, ভুল খবর পেয়ে এসেছেন বাবুমশায়রা। কাছারি থেকেই রটাচ্ছে হয়তো। ভাগ্নে আমার আছে।

জগবন্ধু গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখাও তবে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত রায় উল্টাতে পারি নে।

মামা ছুটোছুটি করে দুখানা জলচৌকি এনে দিল। বলে, যাবেন না হুজুরগণ, একটুখানি বসুন।

জগবন্ধু স্মিতদৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, অষুধ ধরেছে। কি বলেন ভটচাজ ?

ক্ষুদিরাম বলে, গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

শলাপরামর্শ হচ্ছে সকলের সঙ্গে। বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। দেরি বলেই ভরসা। এক কথায় কেটে দেবার হলে তাড়াতাড়ি ফিরত।

ঠিক তাই। ফিরে এসে মামা লোকটা আমতা আমতা করেঃ থানায় টের পাবে না তো হুজুর ?

জগবন্ধু সাহস দিচ্ছেনঃ কি আশ্চর্য! তোমরা ভাবো সরকারি লোক হলেই বুঝি এক-দেহ এক-দিল ? ঠিক উল্টো। সরকারের হাজার-লাখো ডিপার্টমেণ্ট— আদায়-কাঁচকলায় পরস্পর। ঘুস খেয়ে খেয়ে থানার ইঁদুরগুলোর অবধি ঐরাবতের সাইজ। ওদের উপর টেক্কা মারব বলেই তো এসেছি। আমাদের কাগজপত্র নির্ভুল হয়ে থাক, আর থানাওয়ালারা বেকুব হোক, অপদার্থ বলে বদনাম রটুক, সেইটেই তো চাচ্ছি আমরা।

বিস্তর বলাবলি এবং বহু রকমের প্রতিশ্রুতির পর মামা বলে, আসুন তবে হুজুরগণ। এ বাড়ি নেই, খানিকটা দূর হবে—

পাড়ার মধ্যেও নয়—ভিন্ন পাড়ায় একজনের গোয়ালঘরে কাঠকুটো রাখার মাচা, তার উপরে বলরাম গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। পাড়াগাঁয়ে চলিত পাতা-মুঠোর চিকিৎসা—নানা রকম পাতা ও শিকড় বাকড় বেটে ঘায়ের উপর লাগিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে রেখেছে। এ চিকিৎসায় সারে না যে এমন নয়—

জগবন্ধু অমায়িক সুরে প্রশ্ন করেন, কেমন আছ বলরাম ? হাত সারল ভাল করে ?

গায়ে জ্বর খুব। ন্যাকড়া খুলে ঘায়ের অবস্থাও দেখলেন। দেখে শিউরে ওঠেনঃ কী সর্বনাশ! হাসপাতালে না গিয়ে বড় অন্যায় করেছ বলরাম। এক

পয়সা তো খরচা নেই। সরকার হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছে লোকে যাতে মাংনা চিকিচ্ছে পায়।

ন্যাকড়া তুলতে গিয়ে কিছু আঘাত লেগে থাকবে। বলরাম উঃ-আঃ—করছে। জবাবটা মামাই দিয়ে দেয়ঃ ঘা চিকিচ্ছে হয়ে তারপরে কি বাড়ি ফিরতে দিত হুজুর? থানা-পুলিশ হাকিম-আদালতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলত। হাতের যন্ত্রনার চেয়ে ঢের ঢের বেশি যন্ত্রনা। গেরোর ফের—নয়তো ভালমানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়দলের বন্দরে ফিরছে, পথের মাঝে এমনধারা হতে যাবে কেন?

ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। বন্দোবস্ত তাই। ক্লান্ত সেই দুই পথিক দীঘির ধারে পুঁটলি মাথায় শুয়ে ছিল, তড়াক করে উঠে পুঁটলি খুলে পাগড়ি-পোশাক পরে দস্তুরমতো কনেস্টবল। ক্ষুদিরামের পিছন পিছন হুড়মুড় করে সেই গোয়ালঘরে তারা ঢুকে পড়ল।

মামা বলছে, ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এক অঙ্গে জখম নিয়ে ফিরে এল, এর পর আবার যদি পুলিসের হাতে পড়ে প্রাণটুকুও থাকবে না। পুলিসে না টের পায় সেইটে দয়া করবেন হুজুর।

জগবন্ধু এইবার আত্মপ্রকাশ করলেনঃ আমিই পুলিস। প্রমাণ-স্বরূপ কনেস্টবল দুটিকে দেখিয়ে দিলেন। ভাগ্নে ও মামা যুগপৎ আর্তনাদ করে উঠল, নৌকোয় ডাকাত পড়বার সময় যেমনধারা করেছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ এবার।

মামা সাঁ করে ছুটে বেরিয়েছে। বলরামও নেমে পড়ল মাচা থেকে। জখমি হাতটা অন্য হাতে চেপে ধরে জগবন্ধুর পায়ে মাথা কুটছেঃ বড়বাবু আমায় রক্ষে করুন। আপনি ধর্মবাপ।

জগবন্ধু কিছুতে শান্ত করতে পারেন না। এমনি সময় মামাও ঢুকে পড়ে পায়ের উপর দণ্ডবৎ। হকচকিয়ে গেলেন জগবন্ধু। উঠে পড়তে দেখা গেল পাঁচটা রুপোর টাকা পদতলে সাজানো রয়েছে।

জগবন্ধু ভ্রূকুটি করলেনঃ কী এ সব?

এই নিয়ে ক্ষমা দিয়ে যান। ভাগ্নে হাসপাতালে যাবে না বড়বাবু, এমনি এমনি ভাল হয়ে যাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগবন্ধু টাকা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তার গায়ে। ব্যাকুল হয়ে মামা দিব্যিদিশেলা করেঃ এই পাঁচের উপর যদি আধেলা পয়সাও ঘরে থাকে তো বাপের হাড়। বাপের নাম নিয়ে দিব্যি করলাম বড়বাবু, বিশ্বাস করুন। কড়ার রইল, আরও পাঁচটা টাকা শ্রীচরণে নিবেদন করে আসব। এই মাসের ভিতরেই। কথার যদি খেলাপ হয়, মাস অন্তে শুধু ভাগ্নে কেন আমায় অবধি হাতে-দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবেন। ফাটকে হোক, হাসপাতালে হোক যেখানে খুশি পুরে দেবেন—কথাটি বলব না।

জগবন্ধু কঠিন হয়ে বললেন, লক্ষ টাকা গুণে দিলেও হবে না। শত্রুরা যাই রটাক, লোভ দেখিয়ে আমায় কেউ সত্যপথ থেকে টলাতে পারবে না। কথা দিচ্ছি, এতটুকু ঝামেলা পোহাতে হবে না তোমাদের, একটি পয়সা খরচ হবে না। সরকার

সমস্ত দেবে ; তার বাইরে যদি কিছু লাগে, আমি দেব নিজের পকেট থেকে। হাসপাতালের বড়-ডাক্তার চিকিচ্ছে করবে, তাজা মানুষ হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ফিরবে বলরাম। আর বেচা মল্লিকের কাপ্তেনি ঘুচিয়ে নাকে-খত দেওয়াব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। লোকের হাড় জুড়োবে। যা করবার, আমরাই সব করব সরকারের তরফ থেকে,—তুমি শুধু সাক্ষি দিয়ে আসবে বলরাম। প্রধান সাক্ষি বলরাম সাঁই। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না, গড়েপিটে সাক্ষি বানাতে আমি দিইনে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল, সেই কথা কটা বলে তুমি খালাস।

মাপ হল না কিছুতে। বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে গেল। ডুলিতে তুলে দুই পাশে দুই সিপাহি দিয়ে বলরামকে খুলনা সদরের হাসপাতালে নিয়ে চলল।

জগবন্ধুর জেদ চেপে গেছে। মামলার তদ্বির ষোলআনা নিজের হাতে রেখেছেন। আদালতের দেয়ালের টিকটিকিটা অবধি হাঁ করে আছে, যথোচিত বন্দোবস্তে হাঁ বন্ধ হয়ে গেলে মামলা ফাঁসাতে উঠে পড়ে লাগে। সে সুযোগ হতে দেবেন না বলাধিকারী। সরকার বাদি, সেজন্য পাবলিক-প্রসিকিউটার আছেন। অধিক সতর্কতা হিসাবে ঝানু মোক্তার হারাধন হালদারকে বলরামের তরফে মোক্তারনামা দেওয়া হল। সে খরচা জগবন্ধু যোগাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, বেচারামকে অঞ্চল-ছাড়া করবেনই এবার, অসৎ কাজে চিরকালের জন্য যাতে ইস্তফা দেয় তাই করে ছাড়বেন।

এই হারাধন মোক্তারের বাসায় কাজলীবালাকে পেলেন। সে এক স্বতন্ত্র গল্প। ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে হারাধন বলেন, পুরানো ঝি ফিরে এসেছে—বাড়তি এটাকে কদ্দিন বইতে পারি বলুন। ছুড়ে ফেলে দিলে কে ঠেকায়—কিন্তু আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডাও তো সেই সঙ্গে বরবাদ। যাবেই বা কোথা, বয়সটা খারাপ হয়ে মুশকিল হয়েছে। হতভাগী ইচ্ছে করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। এক একটা মানুষ থাকে এই রকম সৃষ্টিছাড়া।

গল্পটা এগুচ্ছে। আর জগবন্ধু একবার পান একবার জল একবার বা তামাক—এমনি সব ফরমাস করছেন। কাজলীবালা সামনে আসুক এই সমস্ত কাজে। আসছেও তাই। জগবন্ধু সেই সময় বারবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। কুদর্শন নিরক্ষর এই মেয়ে কালোকোলো রোগা দেহটার মধ্যে এত তেজ কেমন করে ধরে রেখেছে, তাই যেন নিরিখ করে চোখে দেখতে চান। বাইরের চেহারায় চিহ্ন মেলে না, তাই এমন বারম্বার ডাকছেন।

মোক্তারমশায় বলছেন, এক একটা মানুষ এই রকম, গোঁয়ার্তুমি করে আখের নষ্ট করে। নিজের হিত বোঝে না। এ-ও বোধ হয় পাগলামির মধ্যে পড়ে। পাগলের ডাক্তার আছেন এ শহরে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।

হারাধন চোখ তুলে এক একবার জগবন্ধুকে দেখছেন। তাঁকেও বুঝি ঐ পাগলের দলে ফেলতে চান। সেটা খুব মিথ্যা হবে না। কাজলীবালা পাগল হলে তিনিও তাই। এত কালে সত্যি সত্যি একটা দলের মানুষ পাওয়া গেল, মনে হচ্ছে।

কাজলীবালার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বরে নেয় না। একবার গিয়ে পড়ে ঝগড়াঝাটি

করে চলে এসেছে। বাইরের এক মেয়েলোক সেই সংসারের কর্তা। কাজলীবালা মরে গেলেও যাবে না আর সেখানে। খুলনায়, ঠিক শহরের উপরে নয়—পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে বোন-ভগ্নিপতি থাকে, তাদের কাছে রয়েছে। ভগ্নিপতি ঘরামির কাজ করে। বোনও লোকের বাড়ি গাই দোয় ধান ভানে চিঁড়ে কোটে, যখন যেটা দরকার পড়ে করে দেয়। কষ্টের সংসার চলে এমনি ভাবে। কাজলীবালাও বসে থাকবার মেয়ে নয়—বোনের ছেলেপুলেগুলোর ভার নিয়েছে, আবার বোনের সঙ্গে জুড়িদার হয়ে বাইরের কাজেও যায়।

সেকালে বিস্তর নিমকির কারখানা ছিল ভাঁটি অঞ্চলে। ভৈরবনদের অসংখ্য বাঁক ঘুরে নুনের নৌকোর খুলনায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। সেই জন্য, শোনা যায়, রূপ সাহা নামে এক সওদাগর অনেক অর্থব্যয়ে খাল কেটে সোজাসুজি ভৈরবে এনে মিশিয়ে দিলেন। কেটেছিলেন সরু এক খাল—কিন্তু জলস্রোত সোজা পথ পেয়ে ধেয়ে চলল, ভৈরব এদিকটা মজে এল ক্রমশ। সেই খাল আজ বিশাল এক নদী, এ-পার ও-পার দেখা দুষ্কর। কীর্তিমান রূপ সাহার নামে রূপসা এ নদীর নাম।

রূপসা যেখানটা ভৈরবে এসে মিশল সেই সংগমের উপর প্রাচীন প্রকাণ্ড বাগান একটা। বাগানের ভিতর লম্বা-চওড়ায় সমান মাপের চৌকো পুকুর—পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জলটুঙি অর্থাৎ পাকাদালান জলের উপরে। সাঁকো বেয়ে জলটুঙিতে যেতে হয়। শৌখিন বাগান ছিল, এখন কিছু নেই, গাছপালা কেটেকুটে নিয়ে গেছে —পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা। পাড় ভেঙে ভেঙে পুকুরও এখন রূপসার সঙ্গে এক হয়ে গেছে—জোয়ারে টইটম্বুর, ভাটায় কাদা বেরিয়ে পড়ে—এখানে ওখানে অল্পসল্প জল। বাসা থেকে সামান্য দূরে জায়গাটা—পুকুরের আটকা জলে কাজলী-বালা মাছের সন্ধান পেয়েছে। ফ্যাসা-চাঁদা-কুচো-চিংড়ি জাতীয় সামান্য মাছ। ভাঁটার শেষে বোনের ছেলেটাকে নিয়ে চলে যায় পুকুরে। মাসি আর বোনপো কাদা ভেঙে ভেঙে গামছা ছাকনা দেয়।

এক সকালবেলা গিয়েছে অমনি। জলটুঙির সাঁকোর ধারে কী একটা বস্তু চকচক করছে—তুলে নিল ছোঁ মেরে। গয়না একটা গলায় পরবার। নেকলেশ এর নাম, পরে জানা গেল।

হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছে সুঁড়িপথ ধরে। এদিকে সেদিকে চালাঘরে ভাড়াটে পরিবার—খাস শহরের উপর থাকবার সংগতি নেই, সেই সব লোক একটাকা দু-টাকা ভাড়ায় এই অঞ্চলে থাকে। যাচ্ছে কাজলীবালা ও বোনপো—এক ঘরের গিন্নি ডাকলেন, কাজলী নাকি। শোন, কাল তোরা এসে ঘরের ডোয়া গেঁথে দিয়ে যাবি, এলি না কেন রে?

কাজলী বলে, দিদি চিঁড়ে কুটতে গিয়েছিল রায়বাহাদুরদের বাড়ি। ধান ভিজিয়ে ফেলেছিল তারা, চাকর পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিন্নি—ফুটিঠাকরুন বলে সবাই—করকর করে ওঠেন: আমরা বুঝি মাংনা খাটাতাম রে! আজকে আসবি, অবিশ্যি করে কিন্তু আসবি। বলবি গিয়ে তোর বোনকে—। হাতের মুঠোয় কি রে কাজলী? দেখি, দেখি—বাঃ, দেখতে তো খাসা।

বস্তুটা দু-হাতে ছড়িয়ে ধরে ফুপিঠাকরুনের কণ্ঠ মধুর হল: রথের বাজারে দেখেছিলাম এই জিনিস। কিনব কিনব করে ভুলে এলাম। পিতলের জিনিস, কাচ বসানো। করে কিন্তু ভাল। তুই কি করবি কাজলী? আট আনার পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে। নাতনীটিকে পরাব।

পুরো একটা আধুলি—আচমকা এমনি লম্বা মুনাফার কথায় কাজলীবালা দোমনা হল। দেবো কি দেবো না ভাবছে। বোনপো বলে, বাড়ি চল মাসি—

কাজলীবালা বলে, দিদিকে একবার দেখিয়ে এক্ষুনি দিয়ে যাব। থাকো তুমি ঠাকরুন, এক ছুটে এসে দিয়ে যাচ্ছি।

ছুটেই হয়তো দিত। দেখে, ওদিককার বেড়ার অন্তরাল থেকে নিরু-বউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফিসফিস করে বলে, ও কাজলী, কি করে পেলি? দেখি একবার জিনিসটা।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লুব্ধ কণ্ঠে বলে, পিতল হোক যাই হোক, বড় খাসা জিনিস। আমায় দে কাজলী, দুটো টাকা দিচ্ছি।

আঁচলে টাকা বাঁধা, নগদ টাকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার হাঁ বললেই খুলে দিয়ে দেবে। কাজলীবালা ইতিমধ্যে মন ঠিক করে ফেলেছে, বোনকে না দেখিয়ে দেবে না।

নিরু-বউ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, তিন টাকাই দিচ্ছি। তাই আছে আমার কাছে। বড্ড পছন্দের জিনিসটা। সোনা তো কেউ দিল না জীবনে, পিতল হোক কেমিকেল হোক তাই পরে সাধ মেটাই। ও কি, চললি যে ফরফর করে! শোন্, পাঁচটা টাকাই দেবো। আমার সর্বস্ব।

কাজলীবালা বলে, দিদিকে না জানিয়ে দিতে পারব না বউদি।

নিরু-বউ কাতর হয়ে বলে, আর নেই, সত্যি বলছি কাজলী। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে পারি। থাকলে দিয়ে দিতাম।

চোখ দুটো তার যেন জ্বলজ্বল করছে গয়নার দিকে তাকিয়ে।

একআনা দু-পয়সা করে জমিয়ে জমিয়ে এই দাঁড়িয়েছে। যে মানুষের ঘর করি, জানিস তো তোরা—ঐ একআনা দু-পয়সার জন্যেও এক-শ গণ্ডা কৈফিয়ৎ। জিনিসটা দিস আমায়। গলায় চিরকাল মাদুলির বোঝা বয়ে গেলাম। কবে কখন মরে যাই, তার আগে গয়না বলে পরে নিই কিছু। তা সে যেমন গয়নাই হোক।

কাজলীবালার মনটা বড় নরম, চোখ ছলছল করে আসে। বলে, তোমাকেই দিয়ে যাব বউদি। বোন-ভগ্নিপতির হিল্লেয় থাকি, তাদের না বলে কিছু করলে রাগ করবে।

বোন তখন বাড়িতে নেই। রাহাবাড়ির চিঁড়ে কোটা কাল শেষ হয়নি, সকালেই বোধহয় ঢেঁকিশালে গিয়ে পড়েছে। অনেক বেলায় ফিরল। ফিরে এসেই প্রথম কথা: কোথায় নাকি পড়ে পেয়েছিস তুই—বেশ ভাল একটা গয়না?

ভাল জিনিস কি ফেলে কেউ কখনো? পিতলের ঝুটো-গয়না—তবে দেখতে ভাল। তুমি কোথায় শুনলে দিদি?

গিয়েছিলাম ফুশিটঠাকরুনের কাছে। ডোয়া গাঁথা আজও হবে না, সেই কথা বলতে। পাড়ার মধ্যে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বের কর তো দেখি কেমন।

নেকলেশ এনে কাজলীবালা বোনের হাতে দিল। বোন বলে, ঝুটো বলে তো মনে হয় না। এত লোকের গরজ তবে কেন? এখন কিছু করে কাজ নেই। মানুষটা আসুক, সে-ই বা কী বলে শোনা যাক।

মানুষটা, অর্থাৎ ভগ্নিপতি শম্ভুরাম। সারাক্ষণ চালের উপর বসে কাজ করে দুপুরের পর ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি এল। বৃত্তান্ত শুনে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কাজলীর উপর খিঁচিয়ে ওঠে একবারঃ একটু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে! ফুশিটঠাকরুনকে কেন দেখাতে যাস? তাকে বলা মানে তো খুলনা শহরে ঢোলসহরৎ করে জানান দেওয়া। দামি জিনিস যদি হয়, এ-কান সে-কান হতে হতে খাঁটি মালিকের কানে পেঁছে যাবে। সে লোক তো হায়-হায় করছে, ছুটে এসে পড়বে তক্ষুনি। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে না, না দিলে পুলিস আনবে। কলা খেও তুমি তখন। এসব জিনিস হাতে চিত করে নাচিয়ে আনে কেউ?

বকাবকি চলছে, কাজলীবালা তার মধ্যে চমক খেয়ে আর একটা কথা ভাবে। গয়না হারিয়ে ফেলেছে, সেই অসাবধান মালিকটির কথা। সত্যি যদি দামি জিনিস হয়, সে তো পাগলিনী হয়ে বেড়াচ্ছে। আহা, টের পেয়ে যাক সেই মানুষ, গয়না ফেরত নিয়ে গলায় পরুক। কাজলীবালা যদি খোঁজটা পেত, ছুটে গিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে আসত।

গোটা খুলনা শহর না হোক, যা ছড়িয়েছে সে-ও বড় কম নয়। সন্ধ্যাবেলা নীলু স্যাকরা চলে এসেছে। শম্ভুরাম তার বাড়ির ঘর ছেয়ে দিয়ে এসেছে। বলে, বাড়ি আছ শম্ভুরাম? দেখি একবার জিনিসটা।

শম্ভুরাম আকাশ থেকে পড়েঃ কোন জিনিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারিনে তো।

নীলু হি-হি করে হাসেঃ বুঝতে ঠিকই পারছ বাপু? আজ সকালে যা কুড়িয়ে পেয়েছে। আমাকে দেখানোয় গণ্ডগোল নেই। বলি, মাটিতে পুঁতে রাখবার জিনিস তো নয়। গয়না পরে বউও তোমার ডোয়ামাটি লেপতে যাবে না। পরলে লোকে নানান রকম রটাবে। ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে—তা আমি লোকটা কি দোষ করলাম? সোনা-রুপোর কাজ আমার—টিপেটাপে এমনি বন্দোবস্ত করব, কাক-পক্ষী জানতে পাবে না।

শম্ভুরাম ভেবেচিন্তে দেখছে। করতে হবে কিছু, তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। বাড়ি বয়ে এসেছে, কি বলে শোনা যাক।

নেকলেশ বের করে দেখাল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে নীলু স্যাকরা মিইয়ে যায়, রেখে দাও, দিনমানে একসময় এসে ভাল করে দেখা যাবে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শম্ভুরাম বলে, কি দেখলেন?

সোনা যদি হয়, তবে মরা-সোনা। না কষে সঠিক বলা যাচ্ছে না। পাথর নিয়ে এসে দেখব।

ঘণ্টা কয়েক পরে গভীর রাত্রে দরজায় টোকা। শম্ভুরামের নাম ধরে ডাকছে। ঘুম ভেঙে শম্ভুরাম ধড়মড় করে উঠল। মুখ শুকিয়েছে। কিন্তু সে-ভাব না দেখিয়ে শান্তভাবে গিয়ে দরজা খোলে। শম্ভুরামের বউও উঠে পড়ে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়েছে। পিছনে গা ঘেঁষে কাজলীবালা।

কে ডাকে?

হরি, হরি—সে-ই নীলু স্যাকরা যে। আর-একদিন দেখবে বলে অবহেলা ভরে উঠে চলে গিয়েছিল, রাতটুকু পুইয়ে দিনও পড়তে দিল না।

সঙ্গে সুবেশ এক ভদ্রলোক। নীলু বলে, চেনো এঁকে? গৌরীপতিবাবু। ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম।

জহুরী গৌরীপতি, মণি-রত্নের কারবারি। অতবড় মানুষটা নিশিরাত্রে শম্ভুরামের ঘরের দাওয়ায়। গয়নার কাচ ক'খানার ব্যাপারেই এসেছেন উনি। ঝুটো কাচ নয় তবে, গৌরীপতির এলাকার ভিতরের কিছু! শম্ভুরামের অতএব দেমাক দেখানোর সময় এইবার।

গৌরীপতি বলেন, বের করো একবার, দেখি।

জিনিস বাড়ি নেই বাবু। বিস্তর মানুষ আসছেন যাচ্ছেন, সেইজন্যে সরিয়ে দিলাম।

এই কষ্ট করে এলাম। দেখ দিকি—। গৌরীপতি গজর-গজর করলেন ঃ নিজের কোট থেকে কোথায় সরাতে গেলে?

শম্ভুরাম চুপচাপ আছে।

গৌরীপতি বলেন, তা-ও বটে, আমি কি জন্যে জিজ্ঞাসা করতে যাই, আমায় কেন বলতে যাবে? তবে একটা কথা—গৌরীপতি এই একজনই, ষোলআনা ন্যায্য দাম আমি ছাড়া কেউ দেবে না। যেখানে সরিয়ে থাকো, সম্ভব হলে একবারটি এনে দেখিয়ে দাও। বড়-রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি, গাড়িতে গিয়ে বসছি আমরা। গাড়িতে নিয়ে দেখাতে পার, অথবা খবর দিলে আবার এখানে আসব।

হেলাফেলার গয়না নয়, এবারে সঠিক বোঝা গেল। গৌরীপতির মতো মানুষ এই রাত্রে তা হলে গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন না। কাচগুলো সম্ভবত হীরে। স্যাকরার পো ঘুঘুলোক—এখানে উদাসীন ভাব দেখিয়ে গৌরীপতির কাছে চলে গিয়েছে। বাড়িতে নেই সেটা মিছে কথা। তবে বাক্সপেটরার ভিতরে নেই। চালের মধ্যে গুঁজে রেখেছে ভিতর দিক দিয়ে। চোর-ডাকাত কিম্বা পুলিস অথবা গয়নার মালিক যত খোঁজাখুঁজি করুক, মই দিয়ে চালে উঠে ছাউনির কুটো সরিয়ে দেখতে যাবে না।

গৌরীপতিকে ডেকে নিয়ে এলো রাস্তার উপরের গাড়ি থেকে। টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখলেন। কষ্টিপাথর নীলুর হাতে, কিন্তু পাথর ঠুকতে গেলেন না তিনি। বললেন, জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। জিনিস ধরে রেখো না হে। ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত, তার উপর কিছু বেশি করে বলছি আমি। দিয়ে দাও।

শম্ভুরাম তাকিয়ে আছে। হীরের দামের তো লেখাজোখা নেই। গৌরীপতি ফিস ফিস করে নীলুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করেন। নীলু ঘাড় নাড়ল।

গলা খাঁকারি দিয়ে গৌরীপতি বললেন, তিন-শ সাড়ে তিন-শর বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি পাঁচ-শ দেবো। এক-শ টাকার করকরে নোট পাঁচখানা। এক্ষুনি দেবো—নগদ নগদ !

ঘরের চালের উপর সারাদিন খাটাখাটনি করে শম্ভুরাম রোজ পায় একটাকা পাঁচসিকে। সেই মানুষ আপাতত একটি লাটবেলাট ! হীরের দাম শোনা যায় তো অঢেল। এমন হীরেও আছে, এখানকার মুল্যে রাজার রাজত্ব বিকিয়ে যায়। শম্ভুরাম গম্ভীরভাবে গৌরীপতির কথা শুনে গেল।

নীলু স্যাকরা বলে, দিয়ে দিচ্ছ তা হলে।

উঁহু। শম্ভুরাম ঘাড় নাড়ল : আর একজন এসে ছ-শ টাকা দর দিয়ে গেছে।

কোন আহম্মক আছে, ছ-শ টাকা বলবে এই জিনিসের দাম ? টাকা তো খোলামকুচি নয়।

নীলু বলে, আছে বাবু এক রকমের লোক, দর তুলে মাথা খারাপ করে দিয়ে যায়। সত্যি সত্যি কেনে না। চোখে দেখে গিয়ে সেই লোক আবার থানায় এজাহার দেয়, অমুক জিনিসটা আমার চুরি হয়ে গেছে। কত রকমের ছ্যাঁচড়া মানুষ আছে দুনিয়ার উপর।

আবার বলে, শম্ভু মানুষটা বড় ভাল। আমার বিশেষ চেনা। তারই উপকারের জন্যে টেনে এনে কষ্ট দিলাম বাবু। কদর বুঝল না। আর কি হবে চলুন—

কিন্তু গৌরীপতির যাওয়ার তত মন নেই। এক-পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলেন, পছন্দের ব্যাপার তো—হতেও পারে। চোখে ধরলে তখন আর মানুষের হিসাবজ্ঞান থাকে না। আমি না-হয় দিচ্ছি সেই ছ-শ টাকা। এসেছি যখন, শুধু-হাতে ফিরব না।

শম্ভুরামও মনস্থির করে ফেলেছে। এক ধাপ্পায় যখন এক-শ টাকা উঠে গেল, না-জানি কত এর দাম ! আরও সে চটে গেছে নীলু স্যাকরার ভয়-দেখানো কথায়। কাঁচা-ছেলে কেউ নয় রে বাপু—পুলিসের বাবাও সন্ধান পাবে না, গয়না এমনি জায়গায় সেরেছে।

নিয়ে নাও টাকাটা—

শম্ভুরাম সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে না। যে-মানুষ আগে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এই দামে দিতে হয় তো তাঁকেই দেব।

গৌরীপতি চটে উঠলেন এবার : খুলনা শহরে আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে—নামটা কি শুনি ?

নাম বলতে পারব না আজ্ঞে। সেই রকম কথা তাঁর সঙ্গে। কথা ভাঙব না।

বেশ, আমি যদি তার উপরে আরও পঞ্চাশ ধরে দিই।

নীলু স্যাকরা চোখ বড়-বড় করে বলে, রাগের বশে এটা কি করলেন বাবু ! জিনিস কেনা কি লোকসান দিয়ে মরবার জন্যে ?

গৌরীপতি কানেও তুললেন না। বলেন, সাড়ে-ছয় পেয়ে যাচ্ছ। কি বল এবার ?

শম্ভুরামের মাথার মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। আরও এখন চেপে থাকার দরকার। দাম নিশ্চয় অনেক বেশি। অনেক—অনেক—অনেক—

বলে, তা হলেও একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি খবর দেবো আপনাকে।

চলে যাবার মুখে গৌরীপতি বলেন, পুরো সাত-শ যদি দিই ?

তিনিও তো উঠতে পারেন—সেই আগের মানুষ ? আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু—

দরজা বন্ধ করে এলো। এর পরে ঘুম আসে না চোখে, কেউ শুতে যায় না। শম্ভুরামের বউ হেসে মাথার উপরের ফুটো চালের দিকে চেয়ে বলে, যাক রে বাবা। দু-দুটো বর্ষা জলে ভাসছি, এবারে ছাওয়া-ঘরে শুয়ে বাঁচব।

ঘরামি মানুষ শম্ভুরাম—দশজনের ঘর মেরামত করে বেড়ায়, অথচ নিজের ঘরের চালে কুটো নেই। বউ বলে বলে হয়রান। জবাব দেয়ঃ আগে খাওয়া, তারপর তো শোওয়া। পরের চালে উঠে উঠে খোরাকির জোগাড়টা হয়, নিজের চালে উঠতে গেলে সেটা যে বাদ পড়ে যাবে। দু-দিকের দুই হাঙ্গামা—একলা মানুষ সামাল দিই কেমন করে ? বউয়ের আজ সকলের আগে সেই কথাটা মনে এলো, বর্ষার রাত্রে জল বাঁচানোর জন্যে বিছানাপত্র একবার এখানে একবার ওখানে টানাটানি করতে হবে না। হোক না বৃষ্টি ঝুপঝুপ করে, একঘুমে রাত কাবার।

বলছি তাই, নতুন ছাউনির ঘরে আরাম করে ঘুমিয়ে বাঁচব রে বাবা।

শম্ভু বলে, ঘর ছাইতে কে যাচ্ছে ?

তবে কি মাঠে থাকব ? রুয়ো-আটন খসে খসে পড়ে যাবে এবারের বর্ষায়।

শম্ভু উল্লাস ভরে বলে, ঘর ভেঙে দালান হবে। সাত-শ আট-শ সে যে একগাদা টাকা !

কাজলীবালা এদের মধ্যে একটি কথাও বলে না। সে-ও জেগে। সে ভাবছে, এই মূল্যবান জিনিসটা যে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে, তার অবস্থা। সকলে গঞ্জনা দিচ্ছে তাকে হয়তো। গল্প শুনেছে, কোন এক বউ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল গয়না হারানোর দুঃখে।

পরের দিন শম্ভুরাম কাজে গেল না। ঘরামিগিরি করবে কি—বড়লোক এখন। দাম অর্ধেক হাজারের উপরে উঠে গেছে। পুরো হাজার ঠিক উঠবে। চাই কি বেশিও উঠতে পারে—কতদূর উঠবে, কিছুই প্রথম বলা যায় না। শম্ভুরামের এক পরম বন্ধু খানিকটা লেখাপড়া জানে—তার কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। বাড়ি ডেকে নিয়ে এসে চুপিচুপি তাকে দেখাল জিনিসটা। সে একেবারে আকাশে তুলে দেয়। কলকাতার সাহেব-জুয়েলার্সের বানানো জিনিস, নাম খোদাই আছে সেই ফার্মের। ছ্যাঁচড়া কাজ করে না সে ফার্ম, বড়মানুষ ছাড়া সেখানে যায় না। ভালো রকম যাচাই করে দেখে তবে জিনিস ছেড়ো, এই এক জিনিসে কপাল ফিরে যাবে। কলকাতায় চলে যাও না হে—শহরের রাজা কলকাতা। কালোবাজার, সাদাবাজার, সাচ্চা কারবারি, ঝুটো কারবারি—সব রকম সেখানে।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা, শলা-পরামর্শে কেটেছে। কলকাতায় যাওয়াই ভালো।

অসংখ্য খদ্দের—উচিত মূল্যে মিলবে। বন্ধুটিও সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। তার আগে এ-জায়গার সবচেয়ে বড় দোকান স্বর্ণভবন—পায়ে পায়ে শম্ভুরাম সেখানে চলে গেল। তারাই বা কি বলে শোনা যাক।

কি চাই?

মালিকমশায়ের সঙ্গে কথা বলব একটু।

কর্মচারিটী চকিত হয়ে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। এই ধরণের মানুষ—ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো, তৈলহীন রুক্ষ চুল, নাপিতের পয়সার অভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কিন্তু মানুষটা ছেঁড়া জামার পকেটে হয়তো সাত রাজার ধন নিয়ে ঘুরছে। নগদ পাঁচ-দশ টাকা হলেই দিয়ে চলে যাবে।

সসম্ভ্রমে সে আহ্বান করল: এই যে—পাশের ঘরে চলে আসুন।

মালিকমশায় বৈষ্ণবদাস খুব খাতির করে বসালেন: জিনিস আছে বুঝি?

শম্ভুরাম বলে, কুড়িয়ে পেয়েছে বাড়ির একজন।

হেসে বৈষ্ণবদাস বলেন, কুড়িয়ে পেয়েছে কি অন্য কোন ভাবে এসেছে তাতে আমার গরজ কি? দামের সেজন্য ইতরবিশেষ হবে না। এনেছেন?

সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার জিনিস নয়—গর্বভরে শম্ভুরাম বলল, দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে হবে আমার বাড়ি। তাই সকলে দিচ্ছেন।

বটে! বাড়ি কোথায় আপনার? কারা সব গিয়েছে?

শহরের সেরা যারা, তাঁদেরই দু-তিন জন। হেজিপেজিরা গিয়ে কি করবে?

বৈষ্ণবদাস গম্ভীর হয়ে বলেন, দর কি রকম বলে?

শম্ভুরাম বলে, বলুনগে যা খুশি। আমি দু-হাজারের নিচে নামতে পারব না মশায়।

সবিস্ময়ে বৈষ্ণবদাস চোখ তাকিয়ে পড়লেন: এমন জিনিস?

দেখতে পাবেন যদি যান দয়া করে। সাহেববাড়ির জিনিস—হীরেই তো আট-দশখানা।

রাত্রে ভাল ঠাহর হয় না। কাল ভোরবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। কতটুকু আর পথ? তবে আগে মাল যেন বেহাত না হয়। এই কথা রইল।

বুড়োমানুষ বৈষ্ণবদাস সকাল না হতেই হন্তদন্ত হয়ে শম্ভুরামের বাড়ি হাজির হয়েছেন। কিন্তু নেকলেশ সরে গেছে—চালের কুটোর মধ্যে নেই সেই জায়গায়। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে শম্ভুরাম। বউ কপাল চাপড়াচ্ছে।

কাজলীবালাও নেই।

আগের দিন শম্ভুরাম যখন স্বর্ণভবনে গেছে, এদিকে এক রহস্যময় ব্যাপার। কাজলীবালা বাড়ির গলিতে ঢুকছে, মুখের উপর ঘোমটা-ঢাকা অচেনা একজন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তুমি কাজলীবালা তো? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, শুনে যাও।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, আমি তো জানিনা আপনাকে—

ঘোমটা এখন কমেছে কিছু। অপরূপ সুন্দরী, কাজলীর দিদির বয়সি হবেন। বড়ঘরের বউ নিশ্চয়—ভালভাবে থাকেন, ভরভরন্ত গড়ন।

কাজলীবালা বলে, আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বউ বলে, গরজ বলেই চিনতে হয়েছে। নেকলেশ কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি তুমি, অনেকের মুখে তোমার নাম।

আরও একটি খদ্দের—সন্দেহ নেই। ভাগাড়ে মরা-গরু পড়লে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে হয় না—কাক-শকুন-শিয়ালের মধ্যে আপনি খবর পড়ে যায়। তেমনি সব এসে খোঁজাখুঁজি করছে।

কাজলীবালার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বলে, বিক্রি করব না। গোড়ায় সামান্য জিনিস ভেবেছিলাম, তখন এত বুঝে দেখিনি। পরের জিনিস বিক্রি করে টাকা নেওয়া—সে তো চুরি। গরীব-দুঃখী আছি, চোর কেন হতে যাব? যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দেব।

বউ বলে, সে মানুষ পাবে কোথায় খুঁজে?

তারই বেশি গরজ। কানে পড়লে খোঁজে খোঁজে চলে আসবে—এই যেমন আপনি এসেছেন। খবরের কাগজে ছেপে দিলে নাকি অনেকের চোখে পড়ে। পয়সা থাকলে তাই করতাম।

বউ শিউরে উঠে বলে, ওসব করতে যেও না, কখনো না। যার জিনিস তাকে খুঁজে পাবে না। পণ্ডশ্রম। সে মানুষ ধরা দেবে না।

কেন?

কি জানি—। বউ ইতস্তত করে যেন এক মুহূর্ত। বলে, হয়তো প্রকাশ হতে দিতে চায় না ঐ জায়গায় সে গিয়েছিল। গহনা হারানোর জন্য কোন গল্প রটনা করে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

তীক্ষ্মদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে কাজলীবালা বলে, আপনি জানলেন কি করে?

অনুমান—

কাতর হয়ে বউ বলে উঠল, চারিদিকে বড্ড চাউর হয়ে যাচ্ছে, ওটা আমায় দিয়ে দাও। বিক্রি করতে চাও না, দামও আমিও দেবো না। কাপড়চোপড় কিনো, মিষ্টি-মিঠাই খেও, সেইজন্য কিছু ধরে দিচ্ছি।

যা ভেবেছিল—খদ্দেরই ইনি। কিছুমাত্র আর সন্দেহ নেই। চালাক খদ্দের—সস্তায় নেবার জন্য কায়দা করে ভিন্ন ভাবে কথা বলছে।

কাজলীবালা বিরক্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, কথা একই বিক্রির রকমফের। আমি দেবো না।

তবে ফেলে দিয়ে এসো গাঙের জলে। আমায় না দাও, দু-জনে এক সঙ্গে গিয়ে জলে ফেলে আসি।

মহিলাকে অগ্রাহ্য করে কাজলীবালা ঘাড় ফিরিয়ে ফরফর করে সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ল। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দিকে খবরটা চাউর হয়ে যাচ্ছে, শম্ভুরামও সেজন্য বিচলিত। বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা রওনা হবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—সেটা কাল কিংবা পরশু তার ওদিকে নয়। রাত থাকতেই কাজলীবালা নেকলেশ চুপিসারে বের করে নিয়ে থানায় চলল। সকলের মাথার উপর সরকার বাহাদুর—তাঁদের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত। খবরের-কাগজে ছেপে কিম্বা যেভাবে হোক মালিকের খোঁজ করে দিনগে তারা। পরের জিনিষ বাড়ি এনে কাজলীবালা মহাপাপ করেছিল, সেই পাপের মোচন হয়ে গেল!

সেটা হয়তো হল, কিন্তু কাজলীবালার ছাড় হয় না। এই চেহারা এই পোশাক—তার মুঠোর ভিতরে এমন দামী জিনিসটা! থানাওয়ালারা তোলপাড় লাগিয়েছে॥ কোথায় পেয়েছিস, বল্ সত্যি কথা। এমন জিনিসটা হারিয়ে ফেলে মালিক লোকটা থানায় এজাহার দিল না বললেই অমনি বিশ্বাস করব? কোন মুলুক থেকে চুরি করে এনেছিস, তাই বল্। সাঁড়াশি দিয়ে পেটের ভিতরের কথা আমরা টেনে বের করতে জানি। নিজের ইচ্ছেয় কদ্দুর কি বলিস, শুনে নিই আগে—সে পথ তারপরে তো আছেই। সরকার মাইনে দিয়ে এমনি-এমনি থানার উপর পোষে না আমাদের।

পুলিসের একটা দল কাজলীবালাকে নিয়ে শম্ভুরামের বাড়ি চলল। মজার গন্ধ পেয়ে পথের মানুষও জুটেছে। এমনিতরো আরও কিছু জিনিস মেলে কিনা দেখবে তল্লাসি করে। কাজলীবালা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছেঃ ও দিদি, ও দাদাবাবু, আমায় আটকে রাখবে। মারধোর দেবে। জামিনের ব্যবস্থা কর, জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আন। জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে জমা দিতে গেয়েছি—আমি তো মন্দ কিছু করিনি।

শম্ভুরাম শুনতে পায় না, কানে বোধ হয় ছিপি-আঁটা। শম্ভুরামের বউ বলছে, আমরা কিছু জানিনে হুজুরমশায়রা। বোন একরকম বটে, কিন্তু আমার সংসারের কেউ নয়। রীতচরিত্রের দোষে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে—না খেয়ে ভিখারির হাল হয়ে এসেছিল, দয়া করে ঠাঁই দিয়েছি। দেওয়া খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। দিন আনি দিন খাই, ঝঞ্ঝাটঝামেলায় যেতে পারব না। যা ইচ্ছে আপনারা করুন গে।

আবার তাকে থানায় নিয়ে তুলল। যা গতিক, বাড়ি রেখে গেলেও খেঁটিয়ে বের করে দিত। কাজলীবালা হাপুস নয়নে কাঁদছে। হারাধন মোক্তার কি কাজে এই সময়টা থানায় গিয়েছেন। কী ব্যাপার, মেয়েটা কাঁদে কেন? করুণা হল মোক্তার মশায়ের। বললেন, জামিন হয়ে সইসাবুদ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চল্।

হারাধন তারপর নিজে শম্ভুরামকে বলেকয়ে দেখেছেন। কাজলীর নাম শুনলেই বোন-ভগ্নিপতি মার-মার করে ওঠে। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এত বড় মুনাফা ফসকে গেল মেয়েটার দুর্বুদ্ধির জন্য। ঘরামি শম্ভুরামের জীবনে তাহলে আর চালের উপর উঠতে হত না, পায়ের উপর পা রেখে বাবুমানুষের মতো দিব্যি দিন কেটে যেত।

বলে যাচ্ছেন হারাধন মোক্তার—বলাধিকারী তদগত হয়ে শুনছেন। নানান-

ফরমাসে বারম্বার সামনে ডাকেন মেয়েটাকে। তালপাতার সেপাই—আঙুলের টোকায় বোধকরি মাটিতে লুটাবে। সেই মেয়ের মনের এমন বল অত টাকার লোভ অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে দিল।

হারাধন-মোক্তার বলেন, সাহেব-বাড়ির গয়নার শেষ গতিটা শুনবেন না? সেই নেকলেশ অনাদি সরকারের বউয়ের গলায়। সরকারমশায় তখন সদর থানায়। প্রোমোশান পেয়ে তারপরে আপনারই পাশে ঝিনুকপোতায় চলে গেলেন। ঝিনুকপোতার বড়বাবু। তাঁর বউয়ের গলায় উঁকি মেরে দেখবেন, হীরের নেকলেশ ঝিকঝিক করছে। আপনার ছোট মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে তিনিও তো গিয়েছিলেন—আপনি না দেখে থাকেন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁরা ঠিক দেখেছেন।

সরকারী নিয়মানুযায়ী কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—মূল্যবান নেকলেশ পাওয়া গিয়াছে, মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দর্শাইয়া লইয়া যাউন। নোটিশ লটকে দেওয়া হল সমস্ত সদর জায়গায়। মাসের পর মাস যায়। একটা মানুষ এসে হুঁ-হা করল না।

কী করা যায়?

কোর্ট হুকুম দিল, নিলামে তোলা হোক বস্তুটা। বিক্রির টাকা সরকারে জমা হবে। এইবারে অনাদি সরকারের তাঁম্বর। সে যে কী ব্যাপার, বর্ণনায় বোঝানো যাবে না? সমুদ্র-মন্থনে জলের আলোড়ন হয়েছিল—অনাদি সরকার জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তাঁম্বরের ব্যাপারে। যে তাঁম্বরের শক্তিতে বি, এ, এম, এ, পাশদের টপাটপ ডিঙিয়ে ঝিনুকপোতার মতো থানায় সে বড়বাবু। অনাদি বলল, শখের জিনিষটা পায়ে হেঁটে একবার যখন থানায় উঠেছে, ফেরত যেতে দিচ্ছিনে।

যা বলল, ঠিক তাই। যথারীতি নিলাম হয়ে সর্বোচ্চ ডাক আড়াই-শ টাকায় শৈলবালা দেবী জিনিষটা পেলেন। শৈলবালা হলেন অনাদি সরকারের বাড়ির পুরানো রাঁধুনী—ভাল কাপড়চোপড় পরিয়ে টাকা হাতে দিয়ে তাকে নিলাম ডাকতে পাঠাল। এছাড়া আরও দুটি খদ্দের ছিলেন, ডাকাডাকি করে দর বাড়ালেন। দুজনেই মহিলা। মহিলা ছাড়া এই বাজারে নগদ টাকা বের করে গয়না কিনতে যাবে কে? তাঁরা হলেন উমাশশী ভড় আর বীণা চক্রবর্তী। উমাশশী অনাদির বাড়ির চাকরানি, আর বীণা চক্রবর্তী হলেন অনাদির পরম অনুগত জমাদার হেমন্ত চক্রবর্তীর বউ। বীণা ডাক পেলেও বস্তুটা অনাদির বাসায় আসত।

কেস তো কিছুই নয়—কাজলীবালা জামিনে মুক্ত ছিল, এইবারে সম্পূর্ণ ছাড় হয়ে গেল। অধিকন্তু সদাশয় হাকিম নেকলেশের মূল্য থেকে দশ টাকা তাকে দিতে বললেন। হারাধন মোক্তারের উপরে কৃতজ্ঞতার অবধি নেই—জামিন হওয়া থেকে শেষ অবধি মামলা চালানো তিনিই করেছেন। টাকা এনে কাজলীবালা তাঁর হাতে দিল। কিন্তু মোক্তারি ফী এবং আনুষঙ্গিক খরচ-খরচায় পাওনা তো বিস্তর—দশটা টাকায় কি হবে? পুরানো ঝি দেশে চলে যাওয়ায় কাজলীবালা তার জায়গায় কাজ করেছে,—সেই কয়েক মাসের মাইনে যোগ দিয়েও অনেক বাকি থেকে যায়! পুরানো ঝি এসে গেছে, কাজলীবালাকে দরকার নেই—কিন্তু পাওনা আদায়ের কি হবে, তাই ভেবে হারাধন ইতস্তত করছেন।

ছোটমেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে জগবন্ধুর বাসা ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি তবু কাজকর্মে বাইরে বাইরে থাকেন, ভুবনেশ্বরীর একলা ঘরে মন টেঁকে না। কথাটা হারাধন মোক্তারের কানে গেছে! তিনি তাই প্রস্তাব করলেন : দরকার থাকে তো আপনি নিয়ে যান বলাধিকারীমশায়। এমনি ভাল, ঝিয়ের কাজ ভালই করবে। আমার প্রাপ্যটা দিয়ে যান, মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করে নেবেন।

না—। বলে জগবন্ধু সজোরে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, ঐ জাতের মেয়েকে ঝি করে রাখব এত বড় শক্তি আমার নেই, বড়বউয়েরও নেই—

পরক্ষণে বলে উঠলেন, রাখব, রাখব। ঝি মানে তো মেয়ে। মেয়ে ক'টির বিয়ে হয়ে গেল—কাছেপিঠে আর এক মেয়ে ঘুরেফিরে বেড়াবে। বোঁচকাবিড়ে বেঁধে নে, কাজলীবালা, নিজের বাসায় যেতে হবে।

হাসপাতালে নিয়ে তুলেছে বলরামকে। হাকিম এসে জবানবন্দি নিয়ে গেলেন। কাপ্তেন বেচারামের নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেল। হুলিয়া অমন কতবার বেরুল। ইচ্ছে হল তো হঠাৎ একদিন বেচারাম গটগট করে আদালতে ঢুকে হাকিমের সামনে নমস্কার করে দাঁড়ায়। নিজের পরিচয় দেয়। দু-চার কথার পরেই হাকিম চেয়ার দিতে বলেন আসামীকে। মহাশয়-লোক কাপ্তেন মল্লিক, খাসা কথাবার্তা। অপরাধ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় না। তদ্বিরে অতি নিখুঁত বন্দোবস্ত, ছাড়া পেয়ে সে বেরিয়ে আসে। বুড়ো হয়ে তো মরতে চলল, এতকালের মধ্যে জেলে গিয়েছে দু-বার কি তিনবার। অথচ এই বেচারামের অনেক চ্যাংড়া সাগরেদ ও পাঁচ-সাত-দশবার ঘুরে এসেছে। দু-তিনবার কাপ্তেন যা গিয়েছে—তা-ও নাকি নিতান্ত শখের যাওয়া। বউয়ের উদ্বেগ ঠান্ডা করবার জন্য। বড়বউ মাথার দিব্যি দিয়েছিল : শরীরগতিক খারাপ হয়ে যাচ্ছে, জিরান নাও কিছুদিন। একটা মরশুম চুপচাপ বসে থাক। এত সব দায়দায়িত্ব—বাড়িতে থেকে জিরান নেওয়া অসম্ভব। লোকে তা হতে দেবে না। অতএব রাজকীয় আশ্রয় নিতে হয়। সেকালের রাজারা গুণিজন প্রতিপালন করতেন। একালেও করেন। উঁচু পাঁচিলের ঘেরে লাল ইটে-গাঁথা ঝকঝকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছেন গুণীদের আহার ও বিশ্রামের জন্য। বার দুই-তিন সেখান থেকে বেচারাম দেহ মেরামত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এবারে আর তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নিখোঁজ বেচারাম। দেহঘটিত অস্বাস্থ্য নেই, বড়বউ নিশ্চয় কিছু বলেনি। তা বলে জগবন্ধু শুনছেন না। সুযোগ যখন মিলেছে, নল ধরে উৎখাত করবেনই তিনি। যত রকমে পারেন, চেষ্টা করেছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন বটে, থাকতে হয় তাই আছেন—তাঁর তরফের চাড় কিছু দেখা যায় না। জগবন্ধুকে সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেন : আমাদের হল সরকারী চাকরি, আপন নিয়ে চাকা ঘুরে প্রমোশান। কাজ করলে যা, না করলেও তাই। চাকরি রক্ষে করতে যেটুকু হৈচৈ-এর দরকার, তাই করুন মশায়। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে আখেরে পস্তাবেন।

জগবন্ধু কানে নেন না, ঘৃণায় রি-রি করে সর্বদেহ। ঘুসেল লোক এরা, বউয়ের

গলায় হীরে নেকলেশ পরিয়ে তাই আবার জাঁক করে দেখায়। সরকারের বদনাম এই সব অসৎ অফিসারদের জন্য। অনাদির সাহায্যের পরোয়া না করে একাই লড়ে যাবেন তিনি। বেচারামের খোঁজ হয়নি, তবে সাথী-সাগরেদ কয়েকটা ধরা পড়েছে। বেচারামের অনুপস্থিতিতে এই ক'জনকে নিয়ে বিচার চলবে। বলরামটা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কাঠগোড়ায় দাঁড়ানোর অপেক্ষা। চেষ্টা হচ্ছে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবার। হাসপাতালে দোতলার আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে সতর্ক প্রহরায়।

জগবন্ধুর পক্ষে একনাগাড়ে ছেড়ে থাকা চলে না—থানা আর সদর করে বেড়াচ্ছেন। ক্ষুদিরাম সদরেই পড়ে আছে। মানুষটা এদিক দিয়ে বড় সাচ্চা। কাজ একটা ঘাড় পেতে নিলে তখন আর তঞ্চকতা করবে না। রূপকথার দৈত্যের মতো—দৈত্য, তুমি কার? কাল ছিলাম অমুকের, এখন তোমার। হুকুম হলে বিনা প্রশ্নে সেই মনিবের ঘাড় ভেঙে এনে দেবে। ক্ষুদিরাম তাই। বেচা মল্লিকের বিপক্ষে মামলা সাজানোর যা সব কল-কৌশল খাটাচ্ছে, বাঘা-বাঘা উকিলের তাক লেগে যায়। উকিল হাঁ হয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম মুচকি হেসে বলে, আদালতের আমলা ছিলাম যে! আদালত বাড়ির টিকটিকিটাকে জিজ্ঞাসা করুন না—টিকটিক করে সে-ও মামলায় যুক্তি দিয়ে দেবে।

এজলাসে রীতিমতো একটা জাঁকালো মামলা উঠেছে অনেক দিনের পর। কিন্তু আশায় ছাই—খানিকটা সুস্থ হয়ে বলরাম হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। ক্ষুদিরাম হায়-হায় করে জগবন্ধুর থানায় এসে পড়ল। কোর্টে দাঁড়াবার আতঙ্কে দোতলার বারান্ডা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালাল, অথবা বেচা মল্লিকই কোন কৌশলে নিয়ে বের করেছে, সঠিক বলবার জো নেই।

মূল-আসামি ফেরারি, তার উপরে মূল-সাক্ষি পলাতক। এত কষ্টে গড়ে-তোলা মামলার পরিণাম যা হবে, বুঝতে বাকি থাকে না। কপালে ঘা দিয়ে জগবন্ধু হন্তদন্ত হয়ে সদরে ছুটলেন। হাকিমের কাছে অবস্থা নিবেদন করে লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর থানায় ফিরবেন, না বলরামদের সেই গাঁয়ে সোজাসুজি গিয়ে উঠবেন, তোলা-পাড়া করেন মনে মনে। হবে না কিছুই—'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই নিয়মে খোঁজাখুঁজি করা শেষবারের মতন।

সদরে এসে জগবন্ধু হারাধন মোক্তারের বাসায় ওঠেন। কী একটু আত্মীয়তা আছে বুঝি তাঁর সঙ্গে। চুপিচুপি হারাধনকে বলে নৌকাঘাটের অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন জগবন্ধু। এই অবধি জানা। তারপরে আর কোন সন্ধান নেই।

মূল-আসামি এবং মূল-সাক্ষি গায়েব, তার উপরে সরকার-পক্ষের যিনি প্রধান তদ্বিরকারক, তিনিও নিরুদ্দেশ হলেন। অনাদি রটাচ্ছেন: গা-ঢাকা দিয়েছেন ভদ্রলোক ইচ্ছা করে। এ রকম হবে, আগেই জানতাম। সেই জন্য খুব বেশি গা করিনি।

বলাবলি হচ্ছে: মানুষটি রাঘববোয়াল তো! অন্যের সঙ্গে বিশ-পঞ্চাশে হয়ে যায়, ওঁর গর্ত ভরাট করতে পাহাড়-পর্বত লাগে। মেয়ের বিয়ের সময় দশেধর্মে

দেখেছে। এবারের এত তোড়জোড় আর ছুটোছুটি—সে কেবল দর বাড়ানোর জন্য। বন্দোবস্ত একদিনে সারা, বেচা মল্লিকের সঙ্গে দরে পটে গেছে। এখন আর জগবন্ধু দারোগাকে পাবে কোথা? চুক্তিই যে তাই।

পাওয়া গেল জগবন্ধুর থানা থেকে একবেলার পথ এই ফুলহাটা গ্রামে। নীল-কুঠির ভাঙাচোরা অট্টালিকায়, অট্টালিকার ছাতের উপরে।

চলো একদিন দেখে আসা যাক কুঠিবাড়ির ভিতর গিয়ে।

দশ

একদিন সাহেব আর নফরকেষ্ট নীলকুঠিতে ঢুকে পড়ল। কত বাহার ছিল এই জায়গায়! ফুলহাটা ইণ্ডিগো-কনসারনের নাম সমুদ্র পার হয়ে চলে গিয়েছিল। বিশেষ বিশেষ পালপার্বণে আশপাশের সকল কুঠি থেকে সাহেব-মেমরা এসে জমত, আমোদস্ফূর্তি হত। নাচ হত বলে তক্তার মেজে নিচের হলঘরটায়। তক্তা উই ধরে নষ্ট হয়ে গেছে, কতক বা লোকে খুলে নিয়ে এ-কাজে সে-কাজে লাগিয়েছে। কিম্বা উনুনে পুড়িয়েছে। বড় বড় বট-অশ্বত্থ তেঁতুল ও আমগাছ, ডালে ডালে জড়াজড়ি। দিন-দুপুরেই রাত দুপুরের মতো লাগে।

যেতে যেতে নফরকেষ্ট সহসা থমকে দাঁড়ায়, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়ে: ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দেহখানা পাথর করে ফেললাম। কাজ নাকি নেই! হায় রে হায়, এ রকম আহা-মরি জায়গা থাকতে কাজ খুঁজে পাইনে।

তাকিয়ে আছে অট্টালিকার দিকে নয়, অট্টালিকার লাগোয়া প্রাচীন দীঘির দিকে। কুঠির-দীঘি যার নাম। ঘাটের চিহ্নমাত্র নেই, কসাড় জঙ্গল চতুর্দিকে। হঠাৎ দেখে ভ্রম হবে—দীঘিই নয়, পতিত মাঠ একটা। গরু ছেড়ে দিলে বোধকরি মাঠের উপর চরে খাবার জন্যে নেমে পড়বে।

নফরকেষ্ট বলে, ছিপে মাছ ধরব এখানে।

মাছ ধরতে জান তুমি?

মাছ কেন, মানুষ অবধি ধরিনি? সুধামুখী জানে সব, তুইও কি আর জানিসনে! অমন যে বেয়াড়া বউ, টোপ গেঁথেই তো হিড় হিড় করে টেনে আনলাম।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, ডাঙায় তুলে—থুড়ি, শহরে এনে তুলে তখন পস্তাই। মাছ নয়, মেয়েমানুষও তো নয়—কামট। কামট জানিসনে—কুচ করে অঙ্গ কেটে নেয়, সাড় হবে জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়লে তখন। ভয় হয়ে গেল। রোজ রাত্রে শোবার সময় ভাবতাম, সকালে উঠে যদি দেখি একখানা হাত কি পা কিম্বা মুণ্ডুটাই কেটে নিয়েছে। ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে দেখতাম, সবগুলো অঙ্গ ঠিক আছে কিনা।

জঙ্গলের ভেতর গুঁড়ি মেরে দীঘির একেবারে কিনারা অবধি চলে গেল! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। দামে এঁটে গিয়ে জল বড় চোখে পড়ে না। তার মধ্যে যা দেখবার দেখে নিয়ে সাহেবকে বলে, হয়ে গেছে।

কি?

ভারী ভারী সোলমাছ। পোনা ছেড়েছে। সোল-মারা ছিপ বানিয়ে নেবো। কাউকে কিছু আগেভাগে বলবিনে। খেয়েদেয়ে সকলকে দেখিয়ে শুয়ে পড়ব, তারপরে টিপি-টিপি বেরুব দুজনে। সোল ধরা বড্ড সোজা রে—জলের রাজ্যে অমন হাঁদারাম মাছ আর একটা যদি থাকে! তোকে শিখিয়ে নিতে একটা বেলাও লাগবে না।

ঢোক গিলে নিয়ে বলে, অন্য কাজে যেমন হয়েছে—আমায় ছাড়িয়ে উপরে চলে যাবি। অনেক উপরে। আমি তাতে খুশিই।

শেওলার ভিতরে এক এক জায়গায় সোলের পোনা কিলবিল করছে। ভাসে মুখ তুলে, পলকে ডুবে যায়, আবার ভাসে—এই খেলা। এক ধাড়ির যত পোনা সমস্ত এক জায়গায়, ধাড়ি মাছ পাহারায় আছে। কিন্তু হলে হবে কি—পোনা ছাড়ার পর ধাড়ি লোভী ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। টোপ সামনে পেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তক্ষুনি গিলবে।

মাছ হোক আর না-ই হোক, সাহেব পরোয়া করে না। নিশাকালে সকলকে চুরি করে বেরুনোটাই লোভের ব্যাপার। বেরিয়ে এসে কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে ভাঙা অট্টালিকায় জন্তুজানোয়ারের আস্তানার পাশে কাঁটাঝিটকে-কালকাসুন্দে ভাঁট আশশ্যাওড়া সন্তর্পণে সরিয়ে সরিয়ে লম্বা ছিপ হাতে পাড়ের উপর নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। প্রাচীন মহীরুহেরা ডালে-ডালে আকাশ ঢেকে আছে। নীচের স্তূপীকৃত অন্ধকারের উপরে জোনাকির ফিনকি ফুটছে। তেঁতুলগাছের চূড়ায় পেঁচা ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। তক্ষক ডাকে নাচঘরের কড়িকাঠের কোটরে। বাদুড় উড়ে উড়ে দীঘির এপার ওপার করছে। বড় মজা, বড় মজা!

সাহেব মেতে উঠল। নফরকেষ্টর সঙ্গে তলতাবাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে ঘুরে পছন্দসই ছিপ কাটে। হাটে গিয়ে সুতো-বড়শি পছন্দ করে কিনল। টোপ সংগ্রহ করে। নফরকেষ্ট বারম্বার সামাল করে দেয়ঃ কারো কাছে বলবিনে কিন্তু সাহেব। মাছ হলে রাত্রিবেলা ডেকে জাঁক করব। না হলে তো বেকুব—লোকের ঠাট্টাতামাসা কেন সইতে যাব?

রাত দুপুর। আলো নেই, জনমানবের শব্দসাড়া নেই। বড় সোলমাছ গাঁথে এই সময়। তলতাবাঁশের ছিপ বেধড়ক লম্বা—আঠার-বিশ হাত অন্তত। সুতো খুব মোটা—সোলো সুতা নাম হয়েছে সোলমাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনে পাকানো এই সুতোর। বড়শিও রীতিমতো মোটা। ভাঁড় ভরতি টোপ জোগাড় করে রেখেছে—ক্ষুদে-বেঙ। একটা করে বেঙ বড়শিতে গেঁথে ছুঁড়ে দিচ্ছে যতখানি দূরে যায়। জলের উপর দিয়ে তরতর করে আলগোছে টেনে নিয়ে আসে কাছের দিকে। নাচিয়েই যাচ্ছে বেঙ, আরাম-বিরাম নেই, হাত টনটন করছে, মাছ কিছুতে লাগে না, কি হল? বিড়বিড় করে চলতি ছড়া বলে মাছ ডাকছেঃ আমার নাম ইলসে, টপাস করে গিলসেঃ

অনেকক্ষণ ধরে এমনি করতে করতে হুড়ুম করে দূরের জলে আফালি। দয়া হল তবে মাছের বেটার, টোপ নজরে পড়ল? হাতের টনটনানি কোথায় উপে যায়—মস্ত হস্তির জোর ডান-হাতখানায়। টোপ ছুঁড়ে দেয়, কাছে টেনে টেনে আনে। ফেলছে আর তুলছে। জীবন্ত বেঙ চাই—একটা বেঙ যেই মরে গেল, ফেলে দিয়ে নতুন একটা গাঁথে। চলে এমনি? হঠাৎ বাঘের আক্রমণের মতো দামের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে বড়শি সুদ্ধ বেঙ গিলে ফেলল। অসহ্য পুলকে সাহেব দু-হাতে টান দেয়। সুতো ছিঁড়বার শঙ্কা নেই—কিছুতেই না। খলখল করে মাছ আসে টানের সঙ্গে। আসতে কী চায়, কী জোর সোলমাছের গায়! এই কিস্তু হয়ে গেল—এই জায়গায় কিম্বা আশে-পাশে আজ আর মাছ উঠবে না। যত মাছ সামাল হয়ে গেল। গরজও নেই, চলে যাবে সাহেব এইবার।

খানিকটা দূরে ডাইনের জঙ্গল থেকে মানুষের গলা। আরে, বংশীর গলা যে—মাছ মারতে সে-ও জঙ্গলে ঢুকে আছে। হলে, উঠে গেল ডাঙায়?

এক অপরিচিত কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ের দিক থেকে। কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না—বংশীর দেখাদেখি সে মানুষটাও বলে উঠল, কতবড় মাছ রে বাবা, দত্যিদানোর মতো হুল্লোড় লাগিয়েছে—

সোলমাছ পোনা ছেড়েছে, ধরবার এই মহেন্দ্রক্ষণ—ব্যাপারটা নফরকেষ্ট একলাই দেখেনি। ডাইনে-বাঁয়ের এই দুটি এবং দীঘির চতুর্দিকে জঙ্গলের অন্ধকারে আরও কত জনা ঘাপটি মেরে আছে, ঠিক কি! কথা বলা মছুড়ের পক্ষে অপরাধ, মরে যাবে তবু টুঁ শব্দটি হবে না। কথাবার্তায় মাছ সরে যায়। সে ক্ষতি একলা তোমার নয়, যত এসে ছিপ হাতে বসেছে সকলের। বংশী এবং বাঁ-দিকের লোকটা দীর্ঘক্ষণ বসে নিরাশ হয়ে উঠি উঠি করছে, এমনি সময় সাহেবের মাছ ধরার আওয়াজে দেহমন দাউ দাউ করে উঠল। ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মাছুড়ের নিয়ম ভেঙে সশব্দে বলে, উঃ, কত বড় মাছ!

বংশী এবং সেই লোকটা ছিপ গুটিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সাহেবের কাছে সত্যিই মাছ দেখতে এল: দেখি গো, দেখি। ওজনে কী দাঁড়াবে, মনে হয়?

বংশী বলে, কপাল বটে তোমার সাহেব! খাসা মাছখানা গেঁথেছ। বিস্তর পুরানো—সাহেব-মেমরা দীঘির জলে ঝাঁপাঝাঁপি করত, তাদের গায়ের তেল-সাবান খেয়েই এই চেহারা।

উঠবে নাকি, না দেরি আছে তোমার? নফরকেষ্টর উদ্দেশে সাহেব ডাক দেয়। দু-জনে একসঙ্গে বেরিয়েছে—দীঘির পাড়ে পেঁছানোর পর আর তখন সম্পর্ক নেই। যে যার পছন্দমত জায়গা নিয়ে নিল।

সাহেব পুনশ্চ ডাকে: আমি চললাম, যাবে তো এসো। নফরকেষ্টর জবাব নেই। ছোঁড়াটাকে আজকেই ছিপ ধরাল—হাতে মাছ ঝুলিয়ে সে এবার ড্যাং-ড্যাং করে বাসায় ফিরবে, নফরা পিছু পিছু শূন্য হাতে যায় কোন্ লজ্জায়? চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও এখন সাড়া দেবে না। মাছ না পেলে সকাল অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেঙ নাচাবে।

যেতে যেতে বংশী সঙ্গের মানুষটির পরিচয় দেয়ঃ তুষ্টুচরণকে দেখনি তুমি সাহেব! এই ফুলহাটার লোক। গাঁয়ে থাকে না, আজকেই এলো। বলাধিকারীমশায় কেবল তো আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন—তুষ্টুকে বলছিলাম, নিয়ে আয় দেখি জুত মতন একটা কাজের খবর।

পয়লা দিনই মাছ পেয়ে সাহেবের স্ফূর্তি ধরে না। রোজই আসে। নফর-কেষ্টকে বরঞ্চ এক এক রাত্রে ঘুমে পেয়ে যায়। সে আসে না, সাহেব একলাই আসে তখন। একটা হেরিকেন হয়তো হাতে করে এলো। দীঘির পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে দেয়। খুব জোর কমিয়ে—আলো আছে কি না আছে। আলোর রেশ বাইরে না আসে—জলের মাছ কিম্বা জঙ্গলের মাছুড়ে কেউ বুঝতে না পারে।

রাত্রিবেলার কাজটা হল ভালই। দিনমানে আছে মুকুন্দ মাস্টার। মুকুন্দের সঙ্গে ভাব আরও জমেছে—সাহেব বলে ছোড়দা, মুকুন্দ বলে সাহেব-ভাই।

ইস্কুলের এক ছুটির দিন দুজনে বেলাবেলি বেরিয়েছে। যাবে হাটখোলা অবধি। হাটের দিন নয়, কিছু চাল-ডাল নুন-তেল কেনাকাটা আছে মুকুন্দর নিজের জন্য। সাহেব বলে, চলুন না, আমি কাঁধে বয়ে আনব।

মুকুন্দ কিন্তু-কিন্তু করে। সাহেব অভিমান ভরে বলে, তবে আর ছোট ভাই কিসের? ওটা মুখের কথা আপনার। ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে ঘাড়ে চালের বস্তা—লোকে দেখে কি মনে করবে?

এর উপর আপত্তি চলে না। যেতে যেতে সাহেব আবার বলে, দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্তা যত-কিছু এমনি পথের উপরে ছোড়দা। আপনার আসরে আর যাব না, যাবার উপায় নেই, নিন্দে হচ্ছে।

মুকুন্দ বুঝল অন্য রকম। মরমে মরে গিয়ে বলে, জানি সাহেব-ভাই। এত সদাচারে থাকি, পিতৃপাপের তবু প্রায়শ্চিত্ত হল না। জন্মের উপর কারো হাত নেই, এটা মানষ বুঝে দেখে না।

সাহেব হেসে ফেলেঃ তাই বুঝি বললাম! পাপ যদি কিছু থাকে, সে সদাচারের। মনে-প্রাণে ভালো আপনি—আপনার আসরে হরবখত বসে আপনার পাঠ শুনে শুনে আমিও নাকি ভালো হয়ে যেতে বসেছি, সেই নিন্দের রটনা।

মুকুন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, নিন্দে তো মন্দের নামে রটে। ভালো যদি হও, তাই নিয়ে নিন্দে হবে কেন?

আপনারা ভালো কিনা ছোড়দা, আপনাদের কাছে মন্দর নিন্দে। আমরা মন্দরা ভালোর নিন্দে করি। দল হল দুটো—ভালোর দল আর মন্দর দল। আপনি ভালোর দলে বলে মন্দর নিন্দে কানে যায়। শুনে ভাবেন, এই বুঝি সমস্ত। আপনাদের ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ ভালো হবার জন্য পাগল, নিজেদের দিয়ে বিচার করেন। একপেশে বিচার। ইচ্ছাসুখে উভয় দলে পড়বারই মানুষ আছে।

পরক্ষণে সংশোধন করে নিয়ে বলে, ভুল হল ছোড়দা। আরও একটা দল আছে, গুণতিতে তারাই ভারী। মন্দকে বাপান্ত করে ভালোর গুণ গায়। মনে মনে বলে

ঠিক উল্টো ঃ কাজের মানুষ মন্দরা, ভালোগুলো অপদার্থ।

মুকুন্দ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে ঃ নতুন নতুন কথা বলছ সাহেব-ভাই।

থাকি যে বলাধিকারীমশায়ের কাছে। ভালো পথ মন্দ পথ—দু-দিকের হদ্দমুদ্দ দেখা আছে তাঁর। আপনারা একচক্ষু হরিণ হয়ে একটা পথই দেখেন শুধু। ভিন্ন পথের হলে গালি দিয়ে ভূত ভাগাবেন। নিজের বাপ বলেও রেহাই নাই।

পচা বাইটার নিন্দায় সাহেব ক্রুদ্ধ হয়েছে, এতক্ষণে সেইটে ফুটে বেরুল। বলে, বাপের লজ্জায় মাথা কাটা যায়, বাপের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়েছেন আপনি —আবার কতজন আছে বাবা-বাবা করে দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এত ঘেন্না করেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতটুকু জানেন আপনি সেই বাপ-মানুষটার ?

বিরক্ত হয়ে মুকুন্দ সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ঃ তবে তো চোর হতে হয়। চোর না হয়ে চোরকে জানব কি করে ?

পাশাপাশি হেলতে দুলতে যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ সাহেব দ্রুত পা চালালে।

মুকুন্দ ডাকে ঃ রাগ করলে নাকি সাহেব-ভাই ? বাপ আমারে—আমি যেটুকু জানি, তুমি তো তা-ও জান না। তোমার রাগের কারণটা কি ?

জবাব না দিয়ে সাহেব গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। মকুন্দ অনেকটা পিছনে।

বটে ! ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে মুকুন্দ হেসে ফেলে ঃ খোঁড়া-মানুষ ভাবলে নাকি আমায়—ধরতে পারব না ?

লহমার মধ্যে মুকুন্দ সাহেবের পাশে চলে এলো। সগর্বে বলছে, ইস্কুলে পড়ার সময় দৌড়ে ফার্স্ট হতাম আমি ; কোন ছেলে আমার সঙ্গে পারত না। অনেকদিন অভ্যাস নেই—তা হলেও নিতান্ত হ্যাক-থুঃ করবার নয়। দেখলে তো !

বিনাবাক্যে এবার সাহেব দৌড় দিল—হাঁটনা নয়, পুরোপুরি দৌড়। মুকুন্দরও রোখ চেপে যায় কেমন। মাইনর-ইস্কুলের মান্যগণ্য শিক্ষক, সে কথা মনে রইল না। আবার যেন ছাত্র হয়ে একশ গজের রেস দৌড়াচ্ছে। সাহেব প্রতিযোগী—তাকে হারিয়ে দিতে হবে। হারিয়ে প্রাইজ নেবে। তীর-বেগে দৌড়াচ্ছে। সাহেবও মরীয়া, তবু তাকে হার মানতে হয়। দৌড়াতে জানে বটে মুকুন্দ, বিস্তর আগে চলে গেছে।

অকস্মাৎ সাহেব এক কাণ্ড করে বসল। চোর—চোর—বলে চিৎকার ঃ টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে চোর—

এই সময়টা এক বিদেশি যাত্রা-দল মাঠ ভেঙে রাস্তার উপর উঠল। জন কুড়িক হবে। সাহেবের চিৎকারটা বোধকরি তাদের দেখেই। রে—রে—করে দলসুদ্ধ ছুটে আসে। হতভম্ব মুকুন্দ আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ধান-কাটার মানুষ তখনো মাঠে। গরু-ছাগল নিয়ে রাখালদেরও ঘরে ফিরবার সময় এই। দেখতে দেখতে লোকারণ্য। চোরের উপর জনতার কিছু প্রাথমিক কর্তব্য থাকে, সেই লোভে এত লোক কাজকর্ম ফেলে ছুটেছে। অল্পসল্প সে ব্যাপার হয়েও থাকবে ইতিমধ্যে। আরও হত— সাহেব এসে পড়ে হি-হি করে হাসে ঃ ঠাট্টা রে ভাই, সত্যি-চোর কেন হতে যাবেন ! চোর বলে ছোড়দাকে চমক দিয়ে দিলাম।

তা-ও কি শুনেতে চায় ? আশাভঙ্গ হয়ে লোকে তখন সাহেবের উপর মারমুখি : মিথ্যে বলে ঠেকিয়ে দিচ্ছ, চালাকির জায়গা পাও না ! বেশ তো, উনি চোর না হলেন —ওঁর মারটা তুমিই খেয়ে দাও তবে।

রক্ষে হল, চাষী-রাখালের কয়েক জন চিনতে পারল মুকুন্দকে : আরে মাস্টারমশায় যে ! উনি কখনো চোর হতে পারেন—ছিঃ ছিঃ !

কেন পারবেন না, হতে বাধাটা কি ? হাত-পা থাকলে যে কেউ যা-খুশি হতে পারে। লোকটা যাত্রা দলে ভীম-রাবণ সেজে প্রতি আসরে লড়াই করে বেড়ায়—কিছুতে নিরস্ত হবে না। বলে, হাত দুটো নুলো আর পা দু-খানা খোঁড়া—তারাই শুধু পারে না। তাই তো করতে যাচ্ছিলাম—সবাই মিলে বাগড়া দিচ্ছ, হবে কেমন করে ?

মজা নেই, ভিড় সরে গেল ক্রমশ। দু-জনে নিঃশব্দে চলেছে। এক সময় মুকুন্দ বোমার মতো ফেটে পড়ে : কী রকমের ঠাট্টা হল শুনি ?

সাহেব অবিচল কন্ঠে বলে, পিতৃনিন্দা মহাপাতক, চোর হয়ে সেই পাপেই একটু-খানি শাস্তি নিলেন। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন। বেয়াড়া মন আমার—মমতা এসে গেল যে—প্রায়শ্চিত্তটা পুরোপুরি হতে পারল না।

রাগ করে মুকুন্দ আর একটা কথা বলে নি সমস্ত পথের মধ্যে।

বলাধিকারী একদিন সাহেবকে ডেকে মাছ ধরার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সাহেব বর্ণনা দেয়। শুনে বলাধিকারী পিঠ ঠুকে দেন : এ-ও দিব্যি রাতের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোদের। আলোর সঙ্গে শত্রুতা। এই কায়দাগুলোই ভাল করে রপ্ত করে রাখ, আসল কাজে দরকার পড়বে। মরশুমের সময় রাত্রি হলেই বিনি আলোয় ঘুট-ঘুট করে ঘুরতে হবে, বুঝলি ?

এক রাত্রে সাহেব অমনিধারা ছিপে বেঙ নাচাচ্ছে। ঠাণ্ডাহিম এক বস্তু পায়ের পাতায় উঠল। সড়সড় করে সরছে। সাপ তাতে সন্দেহ নেই। অনড় একটা কাঠের খুঁটির মতন সাহেব দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্বাসটাও বুঝি বইছে না। মানুষ বুঝলেই গর্জে উঠে ফণা তুলে দেবে ছোবল। দীর্ঘ দেহটা ধীরে ধীরে পার করে নিয়ে সাপ চলে গেল। আবার সেইসময় একটা আওয়াজ পাওয়া গেল জলে। মাছ এসেছে, এখন কিছুতে জায়গা ছেড়ে নড়া যায় না। যেমন ছিল ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়ে বেঙ ছুঁড়ে দেয় দূরে, কাছে টেনে আনে। আবার ছুঁড়ে দেয়, আবার টেনে আনে কোন-কিছুই হয়নি যেন, মিনিটখানেক মাত্র চুপচাপ ছিল। বহুক্ষণ এমনিধারা বেঙ নাচিয়ে মাছ ধরে নিয়ে শেষরাতের দিকে বাসায় ফিরল।

এই খবর কী করে জগবন্ধুর কানে গেছে। কেউটেসাপ পায়ের উপর উঠেছে, একচুল তবু নড়ে নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে একটুখানি তাকিয়ে থেকে সাহেবের মাথায় তিনি হাত রাখলেন। বলেন, তাজ্জব হলাম রে সাহেব। লেগে থাক, খুব বড় হবি তুই। দেহের উপর আর মনের উপর যার পুরো আধিপত্য, বড় চোর সে-ই কেবল হতে পারে। বড় সাধু হবার জন্যেও ঠিক এই উপদেশ। চোর হোস আর সাধুই হোস,

সাধন-পথের খুব বেশি তফাত নেই।

আরও অনেক কথা বললেন এইদিন। চোরের সমাজে দুটো পাপের ক্ষমা নেই—মিথ্যাচার আর নারীঘটিত অপরাধ। দল থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াবে, গায়ে থুতু দেবে দলের লোক। সর্বকালের এই বিধি। সমরাদিত্য-সংক্ষেপের সেই যে গল্প: চোর-গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিচ্ছেন—চুক্তি হল, কদাপি সে মিথ্যা বলবে না। কিন্তু গুরুবাক্য না মেনে দৈবাৎ সে মিথ্যা বলে বসেছে। তারপর যে-ই মাত্র ঘরে ঢোকা, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

বলাধিকারীর কথা দৈববাণীর মতো ফলেছিল। সাহেব কত বড় বড় কাজ করল জীবনে। জুড়নপুরের আশালতার কবলে পড়েছিল এরই কিছুকাল পরে। সাপের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার। সাপে পেঁচিয়ে ধরলে শুধুমাত্র নিশ্বাস চেপে নিঃসাড় হয়ে থেকে বিপদ কাটে, ঘুমন্ত রমণীর কবল কাটিয়ে বেরুনোর জন্য সাড়া জাগিয়ে চঞ্চল হয়ে কাজ করতে হবে। সেই রমণী যেমনটা চায়, তারই সঙ্গে মিল রেখে। এবং সেই সঙ্গে চৌরকর্মও সারতে হবে। কেউটে সাপ কোন ছার এর তুলনায়! সাহেব তাই নিখুঁতভাবে করেছিল ওস্তাদ পচা বাইটার শিক্ষায় আর মহাজন জগবন্ধু বলাধিকারীর আশীর্বাদের জোরে।

যাক সে কথা। ছিপ নিয়ে কুঠির দীঘিতে আসা সাহেবের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যত রাত বাড়ে, মন চনমন করতে থাকে, বাসার কামরায় চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে না। রীতিরক্ষার মতো নফরকেষ্টকে একবার দু-বার ডাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন আরও বিষম কাণ্ড। অদূরে অন্ধকার নাটবাগানের দিকে কচরমচর করে কি যেন চিবাচ্ছে—শব্দটা কানে এল সাহেবের। একঝোঁক বাতাস এল সেই দিক থেকে—বাতাসে দুর্গন্ধ। দীঘির পাড় ছেড়ে চলে যেতে পারে না—চলতে গিয়ে গাছপালা নড়বে, শব্দ হবে একটুখানি নিশ্চয়। অনেকক্ষণ সেই একটা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একসময় বেরিয়ে এলো। এবং পরের দিন শোনা গেল, গোবাঘার ভুক্তাবশেষ খানিকটা নাটবাগানে পড়ে আছে। তবু কিন্তু সেই পরের রাত্রেও যেতে হবে। মস্তবড় দায়িত্বের কাজ যেন, কামাই দেবার উপায় নেই।

ক্বচিৎ কখনো মস্করার ব্যাপারও ঘটে। মস্করা যাঁরা করেন, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না, বাতাসে অদৃশ্যরূপে থাকেন। সাহেব এত সমস্ত জানত না, তিলমাত্র সন্দেহ হয় নি। তেমনভাবে লক্ষ্যও করেনি একটা দিন ছাড়া। সেই রাত্রে বড্ড বেশি ঘটতে লাগল। বড়শিতে বেঙ গেঁথে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে সাহেব যথারীতি টেনে টেনে আনছে। ছরুর্ করে অদ্ভুত একটা শব্দ—তার পরে বেঙ আর নেই, খালি বড়শি। একবার দু-বার হলে না হয় বলা যেত, বড়শি থেকে বেঙ খুলে পড়ে গেছে। যতবার গেঁথে ফেলছে ঐ এক ব্যাপার! সে রাত্রে কিছুই হল না, পণ্ডশ্রম। বড় আশ্চর্য লাগে।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক। দূর-আকাশের অদৃশ্য অজ্ঞাত

গ্রহনক্ষত্র নিয়ে কারকারবার, সেই মানুষ এই ব্যাপারের হয়তো কিছু হদিশ দিতে পারবে। হল তাই। সাহেবের মুখে শুনে ক্ষুদিরাম চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়ে। কী সর্বনাশ, এর পরেও ছিলে তুমি সেখানে, নতুন বেঙ গেঁথে গেঁথে ফেলতে লাগলে? অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুত। তা-ই উচিত। বেঙ নিয়ে মজা করতে করতে, ধরো, তোমার মুণ্ডুখানা ছিঁড়ে দীঘির দামের নিচে ঠেস শেষ মজাটা করলেন। ওঁদের কি—মতলব একটা এসে গেলেই হল।

সেই রসিকবর্গের কিছু পরিচয় না শুনে নিয়ে সাহেব নড়বে না। ক্ষুদিরাম অবাক: কী আশ্চর্য, খবর রাখ না এদ্দিন এখানে আছ? গুণতিতে ওঁরা তো একটি-দুটি নন—জানাও নেই সকলের কথা। কেউ জানে না। কুঠির দীঘি আর পাড়ের পুরানো তেঁতুলগাছটার যদি বাকশক্তি থাকত তারাই সব বলতে পারত। এক মাতাল সাহেব এখানকার এক কাওরা মেয়ের সঙ্গে প্রণয় জমিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। বিলেত থেকে মেমসাহেব এসে পড়ল। সাঁতারের নামে সাহেব তাকে ডুবিয়ে মারতে গেল: মেমটাও তেমনি দুঁদে, গায়ে অসুরের মতো বল। নিজে গেল, গলা জড়িয়ে ধরে সাহেবটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে করে। মেয়ে নিয়ে আরও একটা ব্যাপার আমার চোখের উপরেই ঘটল। বেচা মল্লিকের প্রণয়িনী মুক্তাময়ী। ভাল ঘরের পরম রূপসী মেয়ে—কী দেখে মজল জানিনে। পরিণাম হল, দুর্গাপূজার পদ্ম তুলতে গিয়ে লোকজন দেখল, মুক্তাময়ী মড়া হয়ে ভাসছে। পেট ফুলে ঢোল। আরও কত আছে, ক'টাই বা বাইরে প্রকাশ পায়? অপঘাতে গিয়ে তাঁরাই এখন জমিয়ে আছেন, ফুর্তিফার্তি করেন রাতবিরেতে?

সাহেব বলাধিকারীর কথা তোলে। কুঠিবাড়ির ভাঙা অট্টালিকায় তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বলে, অল্পের জন্য বেঁচে এসেছেন। মেরে ফেলে তাকেও তো ঐ রকম দামের ভিতর চালান দিত।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ে: ক্ষেপেছ? অমন গুনীজ্ঞানী মানুষ কেন মারতে যাবে? বেঁচেবর্তে থেকে এখন কত কাজ দিচ্ছেন! বেচারাম কি বোকা? বোকা হলে অত বড় কাপ্তেন হওয়া যায় না। মারবার তো কতই কায়দা ছিল, সেই মুখ-বাঁধা অবস্থায় ধাক্কা দিতে পারলে ছাতের উপর থেকে, টু শব্দটি হত না। ঝুলিয়ে রাখতে যাবে কি জন্য?

হেসে বলে, একদিন সঙ্গে করে নিয়ে জায়গাটা দেখাব। চোখে দেখলে বুঝবে।

মুচকি হেসে বলে, আমি ছাড়া অন্য কেউ পারবে না। খোদ বলাধিকারী-মশায়ও না। চোখ-মুখ বাঁধা তাঁর সেই সময়। তার পরেই তো অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিল।

সাহেব একদিন নফরকেষ্টকে চেপে ধরে: রেলগাড়ির রোজগারের ভাগ পেলাম কই?

নফরকেষ্ট বলে, পাচ্ছিস বই কি! দরকার হলেই তো পাস। হরবখত এই যে হাটে গিয়ে এটা-ওটা জিনিস, মিষ্টিমিঠাই খাস—খরচা আমিই তো দিয়ে থাকি। বল

সেটা—আমি, না অন্য কেউ ?

আবার বলে, এখন কোন্ খরচের দরকার বল্। চেয়েই দেখ একবার, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাস কিনা।

সাহেব জেদ ধরে বলে, ওসব জানিনে। নিত্যিদিন কেন চাইতে যাব ? কেন হাত পাতব তোমার কাছে ? ভিক্ষে নয়, যা আমার ন্যায্য বখরা, হিসাবপত্তর করে মিটিয়ে দাও। চুকে গেল।

নফরকেষ্ট আহত স্বরে বলে, আমি হাতে করে দিলে সেটা বুঝি ভিক্ষে হয়ে গেল ? এত বড় কথা বলতে পারলি তুই ! মাথার উপরে বড় যারা থাকে, তাদের সঙ্গে বখরা করতে হয় না। গরজের সময় বুঝেসমঝে তারা দিয়ে দেয়।

কী কারণে সাহেবের মেজাজটা আজ চড়া। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, মানুষ তো ডেপুটি—কারিগরের সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে বেড়ানো তোমার কাজ। মাথার উপরে কে তোমায় চড়িয়ে দিল শুনি? বড়ই বা হলে কিসে? ও সমস্ত না দেবার ফিকির। টাকা গেঁথে গেঁথে তুমি ঠিক পালানোর মতলবে আছ। ফিরে টোপ ফেলে বেড়াবে, এতকাল যেমনধারা করে এসেছ।

নফরকেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে যায়ঃ মাথার উপর আমি কি নতুন চড়েছি, বড় কি এই আজকে থেকে ? ফাঁকি-মেকির বড় হওয়া নয়, বাপ হই তোর—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। দু-দিনের বাচ্চা, সুধামুখীর আঙুলের মধু চুকচুক করে খাচ্ছিলি, তখন থেকেই বাপের দাবিদার। সুধামুখী জানে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিস, আর জিজ্ঞাসা করবি কর্পোরেশন-ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের। তাঁরা তো মরে যাননি। মরলেও খাতাখানা রয়েছে—আপিসের এই মোটা কালো খাতা। পড়ে দেখিস, বাবা তোর কে ? মুখে না বললেই উড়ে গেলাম আর কি ? টের পাসনি ছোঁড়া, মামলা করে হাকিমের কাছ থেকে 'বাবা' বলবার রায় নিয়ে আসব।

রাগের বশে আবোল-তাবোল বকে যায় নফরকেষ্ট। সাহেব চুপ করে শোনে। তারপর প্রবীণোচিত ভঙ্গিতে বলে, হাকিমের রায়ে কি বাপ হওয়া যায় ? কত আসল বাপই দেখগে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে বাপ হয়ে থাকার কায়দা জানে না বলে। আমার এত কষ্টের কারিগরি বখরা যদি বাপ সেজে গাপ করে ফেল, তোমার সঙ্গে কোন কাজে আর আমায় পাবে না। থাকবই না একসঙ্গে। চোখের উপর বলাধিকারীমশায়ের ব্যবস্থাটা দেখ। কাজ একখানা নেমে গেলে হিসাবের পাইপয়সা অবধি সঙ্গে সঙ্গে হাতে গুঁজে দেবেন। কাজের মধ্যে শুধু কাজেরই সম্পর্ক। দশরকম ধানাই-পানাই করলে বিশ্বাস নড়ে যায় তখন, কাজের কোন জোর থাকে না।

বলাধিকারীই মধ্যবর্তী হয়ে সাহেবের প্রাপ্য হিসাব ধরে তাকে দিয়ে দিলেন। এই কাজে তাঁর জুড়ি নেই। সামান্য কয়েক টুকরো সোনা আর রুপো এদের—এত তুচ্ছ জিনিস বলাধিকারীর মতো মহাজন আঙুলে স্পর্শ করেন না। সামনে এনে ধরতেই সাহস করবে না অন্য কেউ। সাহেবকে কী চোখে দেখছেন, তার কথায় দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। কিন্তু নফরকেষ্ট ভেবে পাচ্ছে না, সাহেবের হঠাৎ কী

এত টাকার গরজ পড়ে গেল। সে গরজ এমনি যে নফরকেষ্টর হাত দিয়ে খরচ হলে হবে না। মরে গেলেও নফরের কাছে তা প্রকাশ করা চলবে না। ফড় নামে যে জুয়াখেলা, তারই দু-তিনটে দল হাটে হাটে খেলতে আসে। ফড়ে জিতে সেই টাকা খরচ করে আসবার এবং ফড়ে হেরে মনোদুঃখ নিবারণেরও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা না আছে এমন নয়। মনে দুর্ভাবনা, তেমনি কোথাও জমে পড়ল নাকি সাহেব ?

টাকাকড়ি নিয়ে সাহেব ভাঁটিঅঞ্চলের সব চেয়ে বড় হাট বড়দলে চলে গেল। এবং তারই কয়েকটা দিন পরে চোখে পড়ে, হাতবাক্স খুলে বলাধিকারী তাকে পয়সা দিচ্ছেন।

নফরকেষ্টর সর্বদেহ হিম হয়ে যায়। ছেলের বাপের বোধকরি এমনিটাই হয়ে থাকে। যে শঙ্কা করেছে, মিথ্যা নয় তবে তো! সাহেবকে এক সময় একান্তে ধরে ফেলল: কিসের পয়সা দিলেন বলাধিকারী ?

সাহেব বলে, দেখে ফেলেছ ? তোমায়, আর বোধহয় মা-কালীকেও লুকিয়ে কিছু হবার জো নেই। শুধু আমায় কেন, বলাধিকারী এমনি অনেক জনকে দিয়ে থাকেন। নইলে মহাজন কিসের! দাদনের পয়সা, কাজকর্ম করে শোধ হবে।

কিন্তু সেদিন যে এতগুলো টাকা গুণে নিলি। টাকা আনা পয়সা অবধি হিসাব করে।

সাহেব হি-হি করে হাসে: টাকা-আনা-পয়সা সমস্ত লোপাট। থলিটা অবধি। বড়দলের হাটের মধ্যে কোথায় পড়ে গেল, হাটুরে মানুষ নিয়ে নিয়েছে। বেশি নয়, চার গণ্ডা পয়সা—শুধু-হাতে থাকতে নেই, বলাধিকারীমশায়ের কাছ থেকে তাই নিয়ে নিলাম।

মনের কথা নফরকেষ্ট স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারে না। বললেই তো বচসা বেধে যায়। অন্য দিক দিয়ে গেল: আমি সামনের উপর থাকতে চার আনার জন্যেও অন্যের কাছে হাত পাতবি ?

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে যাকগে, আমি একটা মানুষ—আমার আবার মান-অপমান! কিন্তু সুধামুখী বলে আর-একজন বর্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হবেই। আজ না-হোক কাল না-হোক, হবে তো একদিন দেখা! বুক ফুলিয়ে ছেলে নিয়ে বেরুলাম, ছেলের ভালমন্দ কিছু দেখিনি সুধামুখী যখন বলবে, কী জবাব আমার তার কাছে ?

কালীঘাটের ফণী আডিডর বস্তিতে সুধামুখী দাসীর নামে মনিঅর্ডার। পাঠাচ্ছে নফরকৃষ্ণ পাল, বড়দল নামক পোস্টাপিসের সিলমোহর। জেলা খুলনা, কষ্টেসৃষ্টে পড়া গেল একরকম। কিন্তু জায়গাটা কোথায়, সঠিক কেউ হদিস দিতে পারে না। নফরকেষ্ট গিয়ে সেই অঞ্চলে জুটেছে। সাহেবকেও সে নিয়ে বের করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই বড়দল জায়গায় দুজনে যদি একত্রে থাকে, তবু অনেকখানি

নিশ্চিন্ত। পুলিসের খাতায় দাগি বটে, কিন্তু আসলে নফরা মানুষটি ভালো। সরল, স্নেহময়—এবং পাহাড়ের মতো দেহ থাকা সত্ত্বেও করুণার পাত্র। কী এমন সম্পর্ক মানুষটার সঙ্গে। তবু দেখ, সুধামুখীর অচল অবস্থা বুঝে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কুপনে অনেক কথা লেখা যায়, টাকার সঙ্গে ফাউস্বরূপ চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা ডাকের কর্তারা করে দিয়েছে। কিন্তু এই কুপনখানায় শুধুমাত্র নফরকৃষ্ণ পালের নাম, আর টাকার অঙ্ক। নিজের কথা নাই লিখল, "সাহেব ভাল আছে"—কথা কটা লিখতেও এত আলস্য?

আর একটা জিনিস অবাক করেছে! কুপনে লেখা শুধুমাত্র টাকায় নয়—আনাও টাকার সঙ্গে। কোন-একটা হিসাব করেছে বুঝি তার সম্বন্ধে—টাকা—আনায় পুরো-পুরি হিসাব শোধ। পয়সার মনি অর্ডার চলে না, পয়সা পাঠাতে পারেনি সেজন্য।

ভেবেচিন্তে সুধামুখী একখানা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে খুলনা জেলার বড়দল নামক পোস্টাপিসে নফরকৃষ্ণ পালের নামে ঃ

সাহেব কেমন আছে, সেই সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবে। টাকা চাহি না। মা-কালীর পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, তৎপ্রসাদাৎ যেভাবে হউক কাটিয়া যাইবে। সাহেবকে লইয়া পত্র পাঠ মাত্র চলিয়া আইস, তাহার জন্য পাগলিনীপ্রায় হইয়া আছি।

পারুল এল এমনি সময়। বলে, নফরকেষ্টর নিন্দে করতে দিদি। টাকাকড়ি কেড়েকুড়ে রেখে তবে নাকি তার ভালবাসা বজায় রাখতে হয়। সে কথা কত মিথ্যা, বোঝ এইবারে। মনিঅর্ডার করেছে—বিদেশে গিয়ে চাকরে বর যেমনধারা বউয়ের নামে টাকা পাঠায়।

চিঠি লেখা বন্ধ করে সুধামুখী কলম রেখে দিল। কলকণ্ঠে পারুল বলে ওঠে, বরকে বুঝি লিখছিলে? ওমা আমার কী হবে, প্রেমপত্তর পোস্টকার্ডে লেখে নাকি কেউ?

সুধামুখী বলে, প্রেমপত্তরে পাঠ কি দিলাম শুনবি নে? হাড়মাস-কালি করা নফরকালি আমার—

যাও। একগাদা টাকা পাঠাল, ঐসব তুমি লিখতে যাচ্ছ! পাঠ শুনে কি হবে, কাজের কথা কি লিখেছ, তাই একটু পড়ো—

হাসতে হাসতে বলে, ছোটবোনের যেটুকু শোনা যায়, তেমনি করে রেখে-ঢেকে বলো। সুবিধা আছে—ছোট-বোন নিজে পড়তে পারবে না।

নিশ্বাস পড়ল সুধামুখীর। ধ্বক করে মনে পড়ে যায়, সেই কতকাল আগে বেলেঘাটার বাড়ির ছোটবোনগুলোরে কথা। বর যেন তার জগৎ-পারের অজানা মৃত্যুলোকে নয়—সুদূর বিদেশে নিরুদ্দেশে আছে, সেখান থেকে মনিঅর্ডার করেছে হঠাৎ। সুধামুখী বরকে চিঠি লিখতে বসেছে, একটা বোন সকৌতুকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—দেখবে একটুখানি প্রেমপত্র। সে আমলে বান্ধবীদের বাড়ি কত এমন দেখেছে, তার জীবনে হবারই বা কী বাধা ছিল? হল না।

নিশ্বাস ফেলে চিঠিখানা তুলে নিয়ে সুধামুখী বলে, মাত্র এইটুকু লিখেছি শোন—

শুনে পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকা চাও না—এটা তুমি কি লিখলে দিদি? কত বড় দায়ের সময় টাকাটা এসে গেল। নইলে কী হত বল দিকি, জনে জনের কাছে হাত

পেতে বেড়াতে হত। আর এমন দায়বিপদ লেগেই তো আছে আজকাল।

সুধামুখী বলে, লিখেছি বলেই বিশ্বাস করবে, তবে আর কী প্রেমের মানুষ! পাঠিয়েছে তো নিজে গরজ করে, চাইতে হয়নি। আবার যদি ইচ্ছে হয়, চাইনে লিখলেও পাঠাবে। মানা শুনবে না।

দু-চোখে হঠাৎ ঝরঝর করে জল নামে: প্রাণের টানে কেউ কিছু দিয়েছে, এ-জিনিস আমার কাছে নতুন। একেবারে নতুন। তোকেই বলছি বোন—মান-অভিমানের এই-চিঠি লেখা—খেলিয়ে রসিয়ে আরও খানিকটা ভোগ করব বলেই। এ আমি কোনদিন পাইনি। মনি অর্ডারের মতলব নফরকেষ্টর নিরেট মাথায় এসেছে, আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়। সাহেব আছে ওর সঙ্গে, ভাল আছে—বড় সান্ত্বনা এইটে আমার।

পারুল উঠে গেলে চিঠিটুকু শেষ করে ফেলল:

এক কাণ্ড হইয়াছে। কাল সকালবেলা তোমার সেই মেমসাহেব বউ এখানে আসিয়া উপস্থিত। তোমার ভাই নিমাইকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়াছিল। তোমাকে ধরিবার জন্য। না পাইয়া আমার উপর যত রাগ ঝাড়িল। আমিও কম দজ্জাল নহি। খুব শক্ত শক্ত শুনাইয়া দিয়াছি। লজ্জা থাকিলে আর কখনো আসিবে না।

সকালবেলা দেওর আর ভাজ সুধামুখীর ঘরের সামনে উঠানের উপর এসে দাঁড়ায়। বউটা সত্যি সত্যি রূপসী। মেমসাহেবের তুলনা দিত নফরকেষ্ট—তাদের মতন শ্বেতকুষ্ঠ রোগীর চেহারা নয়। এর রং যেন দুধে-আলতায়। গোবরে পদ্মফুল ফোটে—একেবারে সেই ব্যাপার।

নিমাইকেষ্ট বলে, দাদা কি শুয়ে আছেন?

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলে, গঙ্গাস্নানে এসেছি। বউদি বললেন, আসা গেছে যখন এদিকে—

নফরার বউ শেষ করতে দেয় না। তীক্ষ্ম স্বরে বলে, এসেছি মানুষটাকে ধরতে। কোথায় পালায় আজ দেখি। ঠাকুরপো একদিন এসে ঘাঁটি দেখে গিয়েছিল। আঁস্তাকুড়-আবর্জনায় পা দিয়েছি গঙ্গাস্নান তো করতেই হবে। ফিরে গিয়ে করব। থুঃ-থুঃ—

সুধামুখী বলে, পথের উপরটা নোঙরা করবেন না, মানুষ চলাচল করে। থুতু ফেলতে হয়, ওধারে গিয়ে ফেলে আসুন।

বউ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, তোমার মুখে ফেলব।

নিমাইকেষ্ট শশব্যস্ত হয়ে ওঠে: আহা, এর উপরে চটছ কেন বউদি, এ কি করবে? দোকান পেতে আছে, মানুষ ঘরে এলে কি দোর এঁটে দেবে? দোষ দাদার, চাকরি-বাকরি ঘর-সংসার কোন-কিছুই মনে ধরল না তার—

রূপসী বউ বলে চলেছে, বছরের পর বছর নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে—ভাবতাম, সে-মোহিনী না-জানি কেমন! নাকের দড়ি গলায় তুলে দিলেই তো চুকেবুকে যেত, এ-দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হত না।

ফনী আড্ডির বস্তিবাড়িতে হেন দৃশ্য একেবারে অভিনব। ভিড় জমে উঠেছে।

সুধামুখী শান্ত স্বরে বলল, ঘরে আসুন, এখানে নয়।

ঐ ঘরে? হোক তাই। একেন পাপ, শতেন পাপ। গঙ্গাস্নান করতেই হবে—যে জাহান্নমে যেতে হয় চলো। আমরা গিয়ে বাবুর ঘুম ভাঙাব।

শব্দসাড়া করেই ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বউ বলে, কোথা?

হি-হি করে সুধামুখী হাসে, হাসিতে ভেঙে যেন শতখান হচ্ছে। বলে, এই সকালে অন্দুর থেকে আসা—শেষরাত্রে বেরুতে হয়েছে। আপনাদের সব কষ্ট মিছে হয়ে গেল।

নিমাইকেষ্ট প্রশ্ন করে, দাদা আসেন নি?

নেই তো শহরে। আসবে কবে? থাকলে ঠিক আসত।

উৎকট প্রতিহিংসায় পেয়ে বসেছে সুধামুখীকে। মণিঅর্ডারের কুপনখানা বের করে এনে দেখায়। নফরকৃষ্ণ পাল, মাথায় টাকার অঙ্ক।

বলে, বাইরে আছে। টাকাকড়ি পাঠায় মাসে মাসে।

নফরার বউ বোমার মতো ফেটে পড়েঃ আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের নোয়ার জোর যদি থাকে, ফিরবে সে একদিন। ফিরে এসে আমার কাছেই যাবে। ডাকিনী-হাকিনী তুই কদ্দিন গুণ করে রাখতে পারিস, দেখে নেবো।

সুধামুখী খলখল করে হাসেঃ সে-ও যে উল্টো তাগা-কবচ পরে বসে আছে। নোয়ার জোর খাটাতে দেবে না—

সচকিত হয়ে নিমাইকেষ্ট জিজ্ঞাসা করে, তাগা কি?

পেত্নি-শাকচুন্নির যার উপর নজর পরে, ওঝায় মন্তর পড়ে তার হাতে সুতো পরিয়ে দেয়। তাকে বলে তাগা, অপদেবতা সেই মানুষের কাছ ঘেঁষতে পারে না। আপনার বৌদির আঁচল কেটে এনে পাড়টুকু নফরকেষ্ট হাতে পরে থাকে—তাগারই মতন কাজ দেয় নাকি। যেই একটু টানের ভাব দেখা দিল, তাগার দিকে তাকাবে। যার শাড়ি, সেই মানুষটাকে মনে পড়ে যায়। মন তখন শতেক হাত ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

রাগে নফরার বউ'র কথাই বেরোয় না ক্ষণকাল! সামলে নিয়ে বলল, বাড়ি চলো ঠাকুরপো।

সুধামুখী সোজাসুজি তার মুখে তাকিয়ে বলে, আমাকেই দুষে গেলে, কিন্তু নিজের কথাটাও একদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। নিজের চরিত্র, আলাপ-ব্যবহার। তুমি মেয়েমানুষ, আমি মেয়েমানুষ, সেইজন্যে বলছি। রূপ দিয়ে টানা যায় হয়তো, কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না। এবারে যখন এলো—চাকরি ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে যেন আগুনের চুল্লি থেকে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে এসে যেখানে ঠাণ্ডা ছায়া পায়, সেখানে গড়িয়ে পড়ে। সে-জায়গা নোঙরা কি ফুল-বিছানো, খতিয়ে দেখবার হুঁশ থাকে না।

নিমাইকেষ্টরা চলে গেল। সেই একটা জায়গায় সুধামুখী ঝিম হয়ে বসে আছে। কতক্ষণ আছে এমনি বসে, পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখে পারুল।

পারুল বলে, নফরকেষ্টর বউ এসেছিল নাকি? টের পাইনি—তাহলে চোখে দেখে যেতাম। ওরা বলাবলি করছে, খুব রূপের বউ নাকি?

সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমায় গালমন্দ করে গেল দিদি?

চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, সুধামুখী বুঝতে পারেনি। পাশে বসে পারুল

আঁচলে মুছে দিল। বলে, তোমায় কি বোঝাব দিদি। গালমন্দ অঙ্গের ভূষণ তো আমাদের। ওতে মন খারাপ করলে চলে না।

সুধামুখী একটু হাসল। বলে, গাল দিয়ে নতুন কথা কি শোনাবে? বলছিল, থুতু দেবে আমার মুখে। ওদের আর কতটুকু ঘৃণা! বিশ্বাস কর ভাই পারুল, নিজের মুখে যে নিজে থুতু দেওয়া যায় না, পারলে আমিই থুতুতে সারামুখ ভরে দিতাম।

পারুলের কথা যোগায় না। নিঃশব্দ বসে রইল। সুধামুখী আবার বলে, এক সময়ে সহমরণের প্রথা চালু ছিল। স্বামী মরলে বউকে সেইসঙ্গে চিতায় পোড়াত। চেঁচিয়ে দাপাদাপি করছে হয়তো, কিন্তু চতুর্দিকের ঢাক-ঢোল উলু-শাঁখ আর সতী-মায়ের জয়ধ্বনির মধ্যে সে চেঁচানি কারো কানে যায় না—

পারুল শিউরে উঠে বলে, কী পাষণ্ড ছিল সেকালের মানুষ—

সুধামুখী বলে, দরদী দয়ালু মানুষ তারা, চিতায় পুড়িয়ে কয়েক মিনিটে শেষ করে দিত! সে রীতি বাতিল হয়ে গিয়ে এখন তুষানলের ব্যবস্থা। জীবন ভোর ধিকিধিকি জ্বলে-পুড়ে মরা। চোখের সামনে ঘরে ঘরে হাজার হাজার মেয়ে স্বামীপুত্র শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘরকন্না করছে। আনন্দে হাসে, দুঃখে ব্যথায় চোখের জল ফেলে। তাই দেখে আমারও যদি কোনদিন নিশ্বাস পড়ে থাকে, সে দোষ আমায় দিবিনে—দোষ সেই বিধাতাপুরুষের, বিধবা জেনেও সে দেহ ভরে যৌবন বইয়ে দেয়, মনের মধ্যে ঝড় তোলে। সেকালে আত্মরক্ষার বড় উপায় ছিল ঈশ্বর আর পরজন্মে অবিচল বিশ্বাস। আজকে আমাদের চোখ-মন খোলা থেকেই বিপদ হয়েছে—দুনিয়ার সব সমাজের সকল রকম রীতি-নীতি আপনাআপনি কানে এসে পৌঁছয়। পুরানো বিশ্বাসের বর্ম পরে টিকে থাকার উপায় নেই। হাজারো দিন সহ্য করে কোন একটা মুহূর্তে হঠাৎ যদি একবার অনিয়ম হয়ে গেল, সে দোষের খণ্ডন নেই। পিছন-জীবনের কথা ভাবি। ভাল বংশের বিদ্বান বাপের মেয়ে আমি। আজকের এমনি দিনের অবস্থা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি! বাঁচবার আমি অনেক চেষ্টা করেছি পারুল, হবার উপায় নেই। অক্টোপাসের মতো আটখানা হাতে আঁকড়ে ধরে অনিয়ম আমায় ঠেলতে ঠেলতে পাতালের নীচে নামিয়ে দিল।

বলেই চলেছে সুধামুখী। যার কাছে বলছে সে মানুষের কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি দৃকপাত নেই।

বলেই, অনেক পুরানো পচা অভিযোগ এইসব। কিন্তু পুরানো বলেই মিথ্যা হয়ে যায় না। আমি একজনকে জানি—ঠিক আমারই অপরাধ তার। কাশী থেকে প্রসব হয়ে এসে গর্ভের মেয়েকে পালিত বলে নিজের কাছে রেখেছে। তারপরে পড়াশুনো করে একটা পাশ দিয়ে টাইপ করা শিখে নিয়ে আফিসের টাইপিস্ট। এক কামরা ঘর ভাড়া করে খাসা আছে মা আর মেয়ে, এক বুড়ি পিসিও আছেন তাদের সংসারে। আত্মীয়স্বজনে সমস্ত জানে—তারা চোখ-টেপাটেপি করে, কিন্তু বয়ে গেল। আমি একদিন গিয়ে ওদের সুখের সংসার দেখেছিলাম।

বলতে বলতে সুধামুখী ভেঙে পড়ে। আবার কান্না। বলে, আমার সেই একদিনের খুকুকে যদি থাকতে দিত, পুড়তে জ্বলতে আসতাম না কক্ষনো পারুল।

আমি অন্য মানুষ হতাম, মেয়ের মা হয়ে থাকতাম।

পারুলেরও চোখ ভরে জল আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কী হয়েছে! মেয়ের মা না থেকে ছেলের মা হয়েছ। সাহেবের মা। আমার রানীকে নিয়ে নিলে ছেলে মেয়ে দুই-ই হবে তখন।

নানান পোস্টাপিসের বিস্তর সিলমোহরের আঘাত খেয়ে সুধামুখীর পোস্টকার্ড মাসখানেক পরে আবার ফিরে এল। বড়দলে নফরকৃষ্ণ পাল নামে কেউ নেই। মস্তবড় হাট—হাটের দিনে পাঁচ-সাত হাজার লোক জমে। নফরকেষ্ট যদি সেই হাটুরের একজন হয়, সে মানুষের খোঁজ কেমন করে হবে?

জগবন্ধু বলাধিকারীকে শেষ করে ফেলবে, এমন ইচ্ছা বেচা মল্লিকের নয়। ঠগ-ফাঁসুড়ের মতো এরা মানুষ মারে না। দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে সমাজে নিন্দা রটে, অক্ষম অপদার্থ বলে সকলে নিচু চোখে তাকায়। তার উপরে বলাধিকারীর মতো গুণীজ্ঞানী ধর্মভীরু মানুষ। তবে বাগে পেলে কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছা।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ভূয়োভূয়ঃ সামাল করে দিয়েছে: সাত চোরের এক চোর হয়ে চলাফেরা করবেন বড়বাবু। সাপের গায়ে খোঁচা দিয়েছেন। নানান ফিকির ওদের, গণ্ডা পঞ্চাশেক চোখ।

আছেন জগবন্ধু সদাসতর্ক। সদর থেকে ফিরছেন। সঙ্গে পরম বিশ্বাসী সেই সিপাহী দুটি। আর একটি বড় সহায় রয়েছে পিস্তল—কাপড়ের নিচে! কেউ সরকারি পোশাকে নয়—সিপাহি দুজনকে মনে হচ্ছে কোন জমিদার-কাছারির পাইক-বরকন্দাজ। জগবন্ধুকেও গলাবন্ধ জিনের কোট, সাদা উড়ানি এবং খাটো মাপের ধুতিতে সেই কাছারির নায়েব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। যাতায়াত নৌকোয়। তিনজনে গাঙের ঘাটে এসে নৌকো খুঁজছেন।

আলাদা নৌকো ভাড়া করবেন না। বিশাল সাঙড়নৌকো হাটের অত লোক থাকা সত্ত্বেও সকলের চোখের উপর মেরে দিল, সে গাঙের উপর দিয়ে আলাদা নৌকোয় যাবেন কোন সাহসে? ঠিক করেছেন, গয়নার নৌকোয় যাবেন তাঁরা। গয়নার নৌকো অর্থাৎ শেয়ারের নৌকো—অনেক যাত্রী একসঙ্গে যায় এইসব নৌকোয়—ভাড়া দূরে হিসাবে এক আনা থেকে চার আনা। যার যেখানে গরজ নেমে চলে যায়, নতুন মানুষও ওঠে পথের মাঝে। কমপক্ষে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন চড়নদার—নিতান্তই সাধারণের একজন হয়ে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে চলে যাবেন। বেশি মানুষ থলেই নিরাপদ।

খান আষ্টেক গয়নার নৌকো। ভাটা ধরেছে নদীতে, ছাড়বার সময় হল। মাঝিরা তারস্বরে চড়ন্দার ডাকাডাকি করছে। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার কয়েক চক্কোর দিয়ে জগবন্ধু একটা নৌকো ওর ভিতরে পছন্দ করে ফেললেন। সবচেয়ে বেশি লোক সেই নৌকোয়—মেয়েলোক প্রচুর, বাচ্চা-ছেলেপুলেও আছে। অন্য সকলে ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে, এ নৌকোর মাঝি ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে। কে-একজন তামাক কিনতে গিয়েছিল—হাঁক দিয়ে বলছে, ছুটে আয়, ছুটে আয়। যাত্রী আর

তুলছে না, ঐ মানুষটা এসে পড়লেই ছেড়ে দেবে।

কারণ অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—এত ভিড় কেন এই নৌকোটায়, মাঝির এমন দেমাক কেন। গেরুয়া আলখাল্লা-পরা এক ছেলেমানুষ বৈরাগী গোপীযন্ত্র বাজিয়ে হরিনাম গান করছে পাছ-নৌকোয় বসে। গানের সুরে যেন মধু গলে পড়ে। মানুষের গাদাগাদি বৈরাগীকে ঘিরে। গান শুনবার লোভেই যত মানুষ এই নৌকোয় উঠতে চাচ্ছে। সব গয়নার নৌকোর ভাড়া একই রকম, এমন মধুর হরিনাম এবং তজ্জনিত পুণ্য এই নৌকোয় উপরি লাভ। চড়ন্দার সেইজন্য এত ঝুঁকেছে। কিন্তু যেতে চাইলেই অমনি তো নৌকোয় তোলা যায় না। বড় বড় ভয়াল নদী সামনে, পয়সার লোভে অগুন্তি বোঝাই দিয়ে মাঝনদীতে শেষটা ভরাডুবি ঘটাবে নাকি? মানুষ দেখে দেখে কে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তুলছে। বেশির ভাগই কাছাকাছি যাবার মানুষ। বড়-নদীতে পড়বার আগে তারা নেমে গিয়ে নৌকো ভারমুক্ত হবে, এই বোধকরি অভিপ্রায়। চাষাভুষো শ্রেণীর প্রায় সমস্ত।

জগবন্ধু সঙ্গী দুজন নিয়ে মাঝির কাছে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে-মাঝি। বুঝেছে জমিদারের লোক। জমিদারের এলাকার নিচে দিয়ে সদাসর্বদা আনাগোনা, মাঝি মাত্রেই সেজন্য খাতির করে। বলে, যাবেন তো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন নায়েবমশায়। দেরি করবেন না। আর নয়তো পরে ঐসব নৌকোয় যেতে পারবেন।

চলেছে সেই গয়নার নৌকো—চলেছে। নামতে নামতে দশ-বারো চড়ন্দার রইল শেষ অবধি। বাচ্চা কোলে বউমানুষও একটি আছে। বৈরাগী বড্ড জমিয়েছে—কৃষ্ণলীলা চলেছে। বিপ্রলব্ধা রাই দুঃখ আর অভিমানের দহনে ছটফট করছেন, সেই জায়গা।

বড়-গাঙে এবার। সুতীব্র স্রোত আর পিঠেন বাতাস পেয়ে নৌকো তীরের বেগে ছুটছে। গান শুনতে শুনতে ধর্মপ্রাণ জগবন্ধু তন্গত হয়ে পড়েছেন, চোখের কোণে প্রেমাশ্রু—

কী কাণ্ড লহমার মধ্যে! চড়ন্দারেরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জগবন্ধুর উপর। দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলে তাদের সঙ্গে এসে জুটেছে। সকলের আগে দু-পাশের সিপাহী দুটোকে লাথি মেরে মাঝনদীতে ফেলল—সাঁতার দিয়ে কূলে উঠতে পারে তো আপত্তি নেই। কিন্তু জগবন্ধুকে ছেড়ে দেবে না। টুঁটি চেপে ধরেছে তাঁর। চোখ আর মুখ বেঁধে ফেলল কাপড় দিয়ে। দেখতে পান না আর কিছু। এমন শক্ত বাঁধনে বেঁধেছে, খুলে দিলেও বোধকরি বহুক্ষণ ঐ দুটো ইন্দ্রিয়ের সাড় হবে না। এবারে হাত দুটো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধে, চোখ-মুখের বাঁধন খোলার একটু যে চেষ্টা করবেন সে উপায় রইল না। চোখ বাঁধার মুহূর্তটিতে বড় সিঁদুরফোঁটা-বউটাকে এক নজর দেখতে পেয়েছিলেন—কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরে গেছে তার। আর সেই যখন চেঁচানি দিলেন, ভক্তপ্রবর বৈরাগী সঙ্গে সঙ্গে গানের গিটকিরি দিয়ে উঠল। চড়ন্দার কজন জগবন্ধুর মুখে কাপড় গুঁজে দ্রুতহাতে বাঁধাছাঁদা করছে, আর সুরলয়ে সুললিত দোয়ারকি করে চলেছে। খোল-কত্তালও ছিল নৌকোর

পাটার নিচে বের করে এনে তুমুল বাজনা শুরু করল সেই সঙ্গে। মাতামাতি ব্যাপার —তার ভিতরে জগবন্ধুর আর্তনাদটুকু একেবারে তলিয়ে গেল। প্রতিক্ষণ তিনি ভাবছেন, সিপাহিদুটোর মতো তাঁকেও দেবে এইবার এক ধাক্কা। সাঁতরে জলের উপর ভাসবেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে সুযোগ হবে না। নদীতলে ভবের খেলার ইতি।

কিন্তু জগবন্ধু সামান্য ব্যক্তি নন, একটা থানার বড়বাবু। সিপাহিদের মতো অত সহজে তাঁর রেহাই নেই। নৌকো জোরে ছুটিয়ে দিল। গীতবাদ্য স্তব্ধ। দাঁড় তো আছেই, তার উপরে বোঠে পড়ছে অনেকগুলো। দাঁড়ে-বোঠেয় মিলে জলের উপর আলোড়ন তুলে নৌকো এই যেন একবার আকাশে উঠে যায়, আবার তখনই পাতালে নামে।

হঠাৎ মনে হয়, বড়-গাঙে নেই আর, সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় নিয়ে চলল—চোখ-বাঁধা অবস্থায় জগবন্ধু আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

এগারো

মাছ ধরায় বড় স্ফূর্তি সাহেবের। কিসে বা নয়? দিনকে দিন সে স্ফূর্তি বেড়েই চলছে। কত কায়দাকানুন কত রকম বুদ্ধি খেলানো। নফরকেষ্ট ইদানীং বড় একটা যায় না। মেজাজ আলাদা, একটা কাজ বেশি দিন ধরে থাকা পোষায় না তার। একাই যায় সাহেব, নফরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বংশীর সঙ্গে প্রায়ই জঙ্গলের মধ্যে দেখা হয়ে যায়। দু-একবার তুষ্টু ডোমকেও দেখেছে।

ছিপ বড় হতে হতে আস্ত এক তলতাবাঁশে দাঁড়াল। ছিপের মাথা দীঘির অনেক দূর অবধি যায়। এত বড় ছিপ অন্য কারো নয়। টোনের সুতো পাকিয়ে গাবের জলে ভিজিয়ে নিয়েছে, আড়াই-পেঁচ জোড়া-বড়শি তার সঙ্গে পুঁটলি-করা। মাছ তো মাছ, এ হেন ছিপে কুমির গেঁথে তোলাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। আর, আশ্চর্য সাহেবের কান দুটো। কত দূরে হিঞ্চেকলমির দামের নিচে কিম্বা হোগলার বনে ক্ষীণ একটু শব্দ—মাছ কি অন্য-কিছু নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়ে সেখানে ছিপ ফেলবে।

সকালবেলা বলাধিকারী ঘুম ভেঙে উঠলে কাজলীবালা ঝুড়িতে মাছ ঢেলে এনে দেখায়ঃ কাল রাত্রের এইগুলো—

চেহারা কী মাছের! কালো কুঁদ। ভাঙাচোরা ঘাটের ইটের গায়ে যেমন, মাছের গায়েও তেমনি যেন যুগযুগান্তরের শেওলা জমেছে। সেকালের নীলকরদের আমল থেকেই বোধকরি বছর বছর পোনা ছেড়ে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঘরসংসার করছিল, সাহেব এতদিনে জল থেকে টেনে টেনে তুলছে।

বলাধিকারী বলেন, কোথায় সাহেব?

কাজলীবালা বলে, ফিরেছে ভোররাত্রে। খুব আহ্লাদ হয়েছে তো—ডেকে তুলে দেখায়ঃ চেয়ে দেখ বুনীড (বোনটি), মাছ তো নয়—দত্যি-দানো। ঘুমুচ্ছে এখনো ঠিক।

বলতে বলতে সাহেবই এসে উপস্থিত। একা নয়—এত সকালেও বংশী তার সঙ্গে। এবং আরও একজন—সেই তুষ্টু ডোম।

সাহেব বলে, ইচ্ছে তো ছিল ঘুমোবার। ঘুমোতে দিল কই! কাল সন্ধ্যায় তুষ্টু গাঁয়ে এসেছে। দীঘি থেকে ফিরল না, সোজা এইখানে এসে বসে আছে।

বলাধিকারীর দিকে চেয়ে বলে, আপনার কাছে এসেছে। খবর বলছে।

বংশী পরমোৎসাহে বলে, ভাল একখানা ফসলের ক্ষেত—

সাহেব বলে, হুকুম দিয়ে দেন, দেখে আসি। ফসল কিছু তুলে এনে দিই।

বলাধিকারীর সেই স্তোক দেওয়া কথা: হবে, হবে। ধৈর্য ধরে থাক, জলে পড়ে যাস নি তো। হুটকো কাজে বিপদ বেশি, হুট করে যেতে নেই।

সাহেব অধীর কণ্ঠে বলে, বিনি কাজে হাঁটুতে কনুয়ে মরচে ধরে গেল যে! হাত-পা নাড়তে গেলে এরপর কড়কড় করে উঠবে, ভেঙে যাবে।

বলাধিকারী তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তুষ্টু আনল খবর, সেই খবরের উপর বেরুতে চাস?

তুষ্টুর মুখে নজর পড়ে বলাধিকারী শিউরে ওঠেন। আরে সর্বনাশ! সাংঘাতিক কেটে গেছে তো! কেমন করে কাটল তুষ্টু?

ইট মেরেছিল মনিবঠাকরুন।

জগবন্ধু চুকচুক করেন: চোখটা খুব বেঁচে গেছে। ঘা অমনভাবে থাকতে দিসনে, অষুধপত্তর কর কিছু। চক্ষু বিনে জগৎ অন্ধকার।

কিন্তু চোখের জন্য তুষ্টু আপাতত উদ্বিগ্ন নয়। আগের কথা ধরে আহত কণ্ঠে বলে, আমার কথায় বেরুনো যাবে না—আমি কি ঝুটো খবর এনে দিই বলাধিকারীমশায়?

ঝুটো কে বলছে? কিন্তু অমন আজামোজা খবরে লাভ তেমন কিছু হয় না। বিপদই হয়। খবর জোগাড়ের পদ্ধতি আছে রীতিমতো। কঠিন কাজ। খবর এক ভাবের একটা এসে গেল—তার পরে ঠিক কোন খবরটা চাই, তার পরেই বা কি—ধাপে ধাপে এমনি সাজিয়ে যেতে হয়। খবর সাজানো যদি ঠিকমতো হয়, কারিগরের যদি খানিকটা হুঁশ আর হাত থাকে কাজ নির্গোলে নেমে যাবে। সেই জন্যে দেখতে পাও না ভালো খুঁজিয়ালের দেমাক কত! খোঁজ পেঁছে দিয়ে নবাব-বাদশার মতো ঘরে শুয়ে নাক ডাকছে—কমালের একখানা বখরা আগেভাগে তার নামে আলাদা করে রেখে তারপর ভাগাভাগি। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বেলা একআনাতেও হবে না, বাড়তি আরও আধআনা। কাজের গুণে খুশি হয়ে দেয়। এর জন্য শিক্ষা তো আছেই, সকলের বড় গুণ হল মাথা খেলানো। ভালোমন্দের যতটুকু সেখানে ঘটতে পারে, ভটচাজমশায় ছক ধরে সব বলে দেয়।

তুষ্টু নাছোড়বান্দা: ভটচাজমশায় না হল, আপনি একবার অবধান করুন। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না!

তবু নয়। তুষ্টুকে অগ্রাহ্য করে বলাধিকারী আবার সেই মাছ মারার প্রসঙ্গ

তুললেন। সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, যা কাণ্ড আরম্ভ করেছিস সাহেব, আর কিছু দিন পরে শেওলা-ঝাঁঝি ছাড়া থাকতে দিবি না দীঘির জলে।

রসান দেয় বংশী : আর যা কান-চোখ-নাক-বুদ্ধি-সাহস সাহেবের, কাজে একবার নেমে পড়লে লোকের ঘরেও হাঁড়িকলসি ছাড়া অন্য কিছু থাকতে দেবে না।

হাসাহাসি খানিকটা। হাসিমুখে সাহেব প্রশংসা পরিপাক করে নেয়। তুষ্টু কেবল গুম হয়ে আছে।

সাহেব বলে, কুঠিবাড়ির বাগবাগিচা দেখলাম তো ঘুরে ঘুরে। দীঘির অন্ধিসন্ধি নাড়িনক্ষত্র দেখে নিয়েছি। মূলবাড়িটা কিন্তু আজও দেখি নি বলাধিকারীমশায়।

বংশী বলে, ঢোক নি দালানকোঠায় ?

কাজলীবালা তাড়াতাড়ি বলে, না ঢুকে ভাল করেছে। ভেঙেচুরে যা হয়ে আছে। কেউটে-কালাজ বাঘ-শুয়োর কোন জন্তুটা যে নেই ওখানে, কেউ জানে না।

সাহেব হেসে বলে, তার জন্যে ভেবো না বুনডি। আমি এক জন্তু—গেলেই আমাদের মুখ-শোঁকাশুঁকি হবে, যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। ভয়ে যাই নি, সে কথা নয়। বলাধিকারীমশায়কে নিয়ে একসঙ্গে যাবার বাসনা। জায়গা দেখতে দেখতে আর ওঁর কথা শুনতে শুনতে যাব। উনি আমায় ভরসা দিয়ে রেখেছেন।

বলাধিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে, একলা যাইনি কোন-একদিন আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে বলে। চোখ বেঁধে নিয়ে ফেলল হঠাৎ সেই জায়গায়। সেই গল্প আপনার মুখে শুনতে শুনতে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠব। ভাঙা ছাতে গিয়ে দাঁড়াব। আগেভাগে দেখা হয়ে গেলে গল্পের সে রস পাবো না। আশায় আশায় ধৈর্য ধরে আছি। নইলে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের সঙ্গেও চলে যাওয়া যেত। আমি গরজ করি নি।

শোন হে, সাহেব কি বলছে শোন তোমরা। বড় প্রীত হয়েছেন বলাধিকারী। বলেন, কবিমানুষ না হলে এমন বলতে পারে না। বিদ্যেসাধ্যি ভাল রকম থাকলে সাহেব বসে বসে পদ্য লিখত। না-ই লিখুক কাগজে, মুখে মুখে ঠিক পদ্য বানায়। গাঁয়ে গাঁয়ে এমন কত আছে—সাহেব আমাদের কবি চোর।

হাসতে হাসতে বলেন, এই যা-সব বলল—পদ্যই। ছন্দ-মিল না-ই থাকল, ভাবের কথা। সিঁধ কেটে এক চোর মহারাজ ভোজের প্রাসাদে ঢুকেছে। বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তখন চোরবিদ্যা শিখে চুরি করত। গুণের মানুষ অনেক থাকত তাদের মধ্যে। এই চোর হল কবি। ভোজরাজাও কবি। চোর একেবারে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—

অন্য কথা এসে পড়ে। সেকালে একালে তুলনা। বলেন, পূর্বাপর ভেবে দেখি আমি। একই ধারা চলে আসছে—চেহারাটা কিছু বদলেছে একালে। বিদ্বান বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত মানুষ আজও অনেকে জাঁদরেল চোর। সামান্য সাধারণ যারা সিঁধকাঠি নিয়ে বেড়ায়, ছিঁচকে-চোর তারা। চোরের মধ্যে ছোটজাত। দেশের যারা মাথা, সমাজের যারা নেতা, দু-দশ টাকা তাঁরা ছুতে যান না—লাখ লাখের কারবারি।

নৈকষ্য-কুলীন তাঁরাই, চোরের মধ্যে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ।

গল্প বুঝি ফেঁসে যায়। সাহেব মনে করিয়ে দিল: রাজা ভোজের ঘরে চোর ঢুকে আছে কিন্তু বলাধিকারীমশায়।

বলাধিকারী বলতে লাগলেন, ভোজরাজা মস্তবড় কবি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, গবাক্ষে বসে কবিতা লিখছেন চাঁদের সম্বন্ধে। সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে সেখানে। রাজাকে দেখে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে পড়ল। রাজা এক লাইন লিখছেন, আর আবৃত্তি করছেন সেটা। চোর তার চৌরকর্ম ছেড়ে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। এক জায়গায় এসে আটকে গেল, লাগসই কথা হাতড়ে পান না রাজা। চোর কবিলোক, আত্মবিস্মৃত হয়ে সে পরের লাইন আবৃত্তি করে উঠল ছন্দ-অর্থ যথাযথ মিলিয়ে।

কে ওখানে—কে, কে? বিষম হৈ-চৈ, রাজবাড়িতে চোর ঢুকেছে। হাতকড়া দিয়ে চোরকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পরদিন বিচার। বড় কঠিন শাস্তি তখনকার দিনে—সরকারি খরচায় খানাপিনা ও বাসের ব্যবস্থা নয়। শূলে চড়াত চোরকে, অথবা হাত কেটে দিত। শাস্তির বদলে রাজা দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন পাদপূরণের পারিশ্রমিক। কবিসম্মান দিলেন।

ঠিক হল, আজকেই—আজ বিকালে কুঠিবাড়ির অট্টালিকায় যাবেন সকলে। সাহেব ও বংশী যাবে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকেও বলা হবে। জগবন্ধু নিয়ে যাবেন সকলকে। তাঁর জীবনের উপাখ্যান পুঁথিপুরাণের ঠিক উল্টো—পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়। তাঁর মুখেই সব শোনা যাবে।

নদী থেকে একটা খাল ঢুকে পড়েছে গ্রামবসতির ভিতর। খাল মজে আসছে দিনকে দিন। মরা-ভাঁটিতে এমনও হয়, নিতান্ত ডিঙিনৌকো কাদায় আটকে পড়ে। খালের কিনারে অতিকায় আম-কাঁঠাল বট-তেঁতুলের ছায়ায় জঙ্গলে-ঢাকা ভাঙাচোরা অট্টালিকা—অতীতের নীলকুঠি। কুঠি বানানোর আগে থেকেই ঐসব গাছ, চেহারা দেখে সংশয় থাকে না। নৌকো ও গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে আঁটি আঁটি নীল এনে ফেলত। ওজন হত কাঁটা খাটিয়ে। গোমস্তা ওজন টুকে রাখত খেরো-বাঁধা প্রকাণ্ড খাতায়। বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতর নীলের আঁটি নিয়ে ফেলত। কপিকলে খালের জল তুলে চৌবাচ্চা ভরত, নীল পচান দেওয়া থাকত জলের মধ্যে। সমস্ত এইসব গাছের তলায়। অনতিদূরে কাছারিঘর—রাবিশে ভরতি হয়ে একেবারে অগম্য এখন। ঐখানে ফরাসের উপর খাতার হিসাব দেখে কুঠির দেওয়ান খাজাঞ্চিকে বলে দিত—আঙুলে টুংটাং টাকা বাজিয়ে দাম শোধ করে নিয়ে যেত ক্ষেতেলরা। গাছ-গুলো চেয়ে চেয়ে দেখেছে। নীলকর সাহেবেরা হাঁটুভর কাদা ভেঙে ক্ষেতে ক্ষেতে চাষ দেখে বেড়াত, দিনে দিনে তারপর লাটবেলাট হয়ে উঠল এক একজন। তেতলা অট্টালিকা উঠল। সাগর-পারের নীলনয়না মেমসাহেবও দু-চারটি থেকে গেছে ভাঁটি-অঞ্চলের এই দুর্গম পাড়াগাঁ জায়গায়। সমস্ত জলুষ তারপরে অস্তগত হল একদিন। মানুষজন কতক মরেহেজে গেল, কতক বা এখানে সেখানে ছিটকে পড়ল বেমালুম হয়ে। মহাবৃদ্ধ গাছগুলো পাতা ঝিলমিল করে সমস্ত দেখেছে।

জগবন্ধু দারোগাকে নিয়ে নৌকো সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল পায়ে এসে লাগে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় আকাশপাতাল ভাবছেন তিনি। নৌকো বেঁধে অনেকে এইবার ধরাধরি করে কাঁধের উপর তাঁকে তুলে নেয়। নিয়ে চলল কোথায় না জানি। ধপাস করে এনে ফেলে ইটে-বাঁধানো জায়গার উপর। ভারী বস্তু দূর-দূরান্তর থেকে বয়ে এনে কাঁধ থেকে ফেলে লোকে যেমন সোয়াস্তি পায়। সেকালে শ্রান্ত মুটেরা বোধ-করি নীলের বোঝা এমনি এনে ফেলত। কাঁটাঝোপ জায়গাটায়, জগবন্ধুর সর্বাঙ্গ ছড়ে গেল। জোড়-হাতে ভর দিয়ে কোন গতিকে উঠে তিনি জবুথবু হয়ে বসলেন। অনেকগুলো গলা পাওয়া যাচ্ছে। নৌকোর সবগুলো মরদ এসেছে, বাড়তিও বুঝি ছিল বসে এখানে।

সকলকে নিয়ে বলাধিকারী এইবার অট্টালিকার সামনে রোয়াকের উপর উঠলেন। বললেন, এমন কসাড় জঙ্গল তখন হয়নি। কয়েকটা কাঁটাঝিটকের গাছ—সেই কাঁটা গায়ে বিঁধছিল। লোক চলাচল কিছু কিছু ছিল, বেচা মল্লিকের খাস যে দল, তাদের ওঠা-বসার আড্ডা এখানে। বিচারের জন্য আমায় এনে ফেলল। ঠিক কোনখানটি বলুন দিকি ভটচাজমশায়। আমার চোখ বাঁধা তখন। পৈঠা থেকে উঠেই রোয়াকের এই জায়গা, আমার মনে হয়। আপনি সঠিক বলতে পারবেন।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ঘাড় কাত করে বলে, হ্যাঁ জায়গা এখানেই।

সাহেবের দিকে চেয়ে হেসে ক্ষুদিরাম বলল, আমিও ছিলাম দলের মধ্যে বসে। একটা কথা বলিনি, কথা শুনলেই বলাধিকারীমশায় টের পেয়ে যাবেন। সিঁদুর-পরা যে মেয়েলোক উনি নৌকোয় দেখে এলেন—ভাল ঘরের মেয়ে, নামটাও ভাল—মৃন্ময়ী। দৈবচক্রে দলে এসে পড়েছিল। বিষম সাহসী, ঘরবাড়ি ছেড়ে নৌকোয় নৌকোয় বেচা মল্লিকের সঙ্গে ঘুরত। সর্বনেশে নিয়তি তার, ভাবলে আজও কষ্ট হয়। সেই মেয়ে একদিন চালান হয়ে গেল—রটনা আছে, দীঘির ধাপের নিচে—রাতে রাতে যেখানে মাছ ধরে বেড়াও তুমি সাহেব। প্রণয়ের শেষ পরিণাম। সে এক ভিন্ন উপাখ্যান। আর সেই যে গেরুয়া-পরা মধুকণ্ঠ বৈরাগী—এখনো সে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের সঙ্গে কাজকর্ম করে। একটা হাত নেই বলে হাত-কাটা বৈরাগী নাম হয়েছে। ভক্ত মানুষও বটে, ভগবৎ-কথায় দরদর করে অশ্রু পড়ে। এমনি সব রকমারি মানুষ দলের মধ্যে রেখে কাজ হাসিলের সুবিধা হয়। এসব তোমায় শেখাতে হবে না—কাঁটার মুখ ঘষে ধার করতে হয় না, তুমি নিজেই একদিন শিখেবুঝে নেবে সাহেব।

জগবন্ধুর বিচার বসল এখানে, এই রোয়াকের উপর। চোখ-মুখ-হাত বেঁধেছে কিন্তু কান দুটো খোলা রেখে দিয়েছে—আসামি স্বকর্ণে বিচার শুনতে পাবে।

কোন ব্যবস্থা উচিত হবে, মতামত নিচ্ছে সকলের।

কেউ বলছে, সড়কি মেরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করো। কেউ বলে, মেলতুক দিয়ে চামুণ্ডার নামে বলি দাও—মহাভোগে মা প্রসন্ন হোন। আবার কেউ বলছে, মাটির নিচে পুঁতে ফেল—পচে গোবর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, বাইরে এতটুকু গন্ধ আসবে না। মানুষটা যে দুনিয়ার উপর ছিল, কোনদিন নিশানা হবে না তার।

প্রতিটি প্রস্তাব জগবন্ধু শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁকে শোনাবার জন্যেই বলা।

শেষটা ভারী গলায় একজন বলে—পরে জেনেছেন, কাপ্তেন বেচারাম সেই মানুষটা—বেচা মল্লিক বলল, এটা কি বলছ—মানুষে টের পাবে না, তবে আর শাস্তিটা কি হল! কত থানাই তো আছে—থানার উপরে দারোগাও এই নতুন আসেনি। মানিয়ে-গুছিয়ে চিরদিন কাজকর্ম হয়ে আসছে। শয়তান এই লোকটা। মেয়ের বিয়ের সময় ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম, বিনি খবরে জামাই এসে পড়লে ছুটোছুটি করে তারও সুরাহা করে দিই। উপকার মনে না রেখে উল্টে ফেউ হয়ে পিছনে লেগে আছে। নেমক-হারামির পরিণামটা লোকে জানবে না, শিক্ষা হবে তবে কিসে?

বেচারাম চুপ করল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। হুঁকো দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে কেউ, গুড়ুক টানার আওয়াজ শুধু। শাস্তিটা কোন পদ্ধতিতে হবে, তামাকের সঙ্গে তারই বোধহয় ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

আবার একজন বলে ওঠে, ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যাক তবে। গাছে ডালে ঝুলুক। কোম্পানি বাহাদুর তিতুমীরের মানুষদের যেমন করেছিল। কাকে ঠুকরে ঠুকরে চক্ষু দুটো খেয়ে ফেলবে আগে। রোদ্দুরে ধড় শুকিয়ে কাঠ হবে। তাবৎ লোক দলে দলে এসে দেখবে।

ফড়ফড় করে অবিরত হুঁকোর টান। যে যা ইচ্ছা বলে যেতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বেচারামের। হুঁকো নামিয়ে এইবারে সেটা উচ্চারিত হবে। বলল, নরহত্যা মহাপাপ, ওস্তাদের নিষেধ। সে কাজ ঠগীদের, আমাদের নয়। দেবী চামুণ্ডা তাদের উপর সেই ভার দিয়েছেন, মানুষ মেরে তারা দেবীর কাজ করে দেয়। আমরা আলাদা।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বলে, তবে যদি কেউ নিজের ইচ্ছেয় মারা পড়ে, আমরা তার কি করতে পারি? তাই একটা মতলব ঠিক করলাম। দারোগার মরণ-বাঁচন তারই নিজের এক্তিয়ারে থাকবে, মরে তো আমরা সেজন্যে দায়ী হব না। অথচ মরবেই নির্ঘাৎ, বাঁচবার কোন উপায় নেই।

জগবন্ধু বলাধিকারীর মুখ বেঁধেছে, চোখ বেঁধেছে, তবু যদি হাত দুটো ছাড়া থাকত কানের ছিদ্র আঙুলে আটকে দিতেন। বিচার তা হলে শুনতে হত না। যেটা ওরা করতে চায়, হঠাৎ অজান্তে ঘটে যেত। এমন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না! কী মতলব করেছে, তারাই জানে। চোখ ঠারাঠারি হয়ে থাকবে নিজেদের মধ্যে। নিয়ে চলল এইবারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে—

আজ জগবন্ধুও সেই পথে সিঁড়ি বেয়ে সাহেবদের উপরে নিয়ে চললেন। ঘরদোর প্রায় সমস্ত ভাঙা, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে তত বেশি অসুবিধা হয় না।

সাহেব বলে, এ যে রাবণের সিঁড়ি। শেষ নেই। যেন স্বর্গধামে উঠে যাচ্ছি।

বলাধিকারী বলেন, আমার ঠিক উল্টোরকম মনে হচ্ছিল সেদিন। সিঁড়ির শেষ যেন না হয়। এ জায়গায় আসিনি তার আগে, গ্রামটাও জানতাম না। হাত-বাঁধা দড়ি টেনে একজন আগে আগে উঠছে, পিছন পিছন ঠেলে দিচ্ছে ক'জনা। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চোখে দেখবার উপায় নেই, প্রতিক্ষণে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল, ছাতে উঠে পড়লাম। ছাদে তুলে নিয়ে—তারপর কোন মতলব

করেছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না কি করবে, কাপ্তেন কিছু তো বলল না! দেবী চামুণ্ডার কাছে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি: এত অঘটন ঘটাও তুমি মা, একটা করে এই ধাপ উঠছি উপর দিকে ধাপ একটা সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ে যায়। অনন্ত কাল উঠেও কখনো ছাদে পৌঁছব না। মা-চামুণ্ডার উপর পুরো ভরসা না করে, নিজেও যতটা পারি ঠিকিয়ে ঠিকিয়ে চলেছি। জীবনের মেয়াদ কোন না বিশ মিনিট আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে এই কৌশলে।

উপরের লোকটা, হাতের দড়ি ধরে যে টানছে, বিরক্ত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে: বলি সারা-রাত্তির লাগাবে নাকি এই কটা সিঁড়ি উঠতে? আপসে না যাবে তো বলো, কোমরে কাছি বেঁধে তুলে দিই।

মুখ তো জবর রকমে বেধে দিয়েছে, তবু আমায় জবাব দিতে বলছে। জবাব না পেয়ে চটেমটে গেল বোধহয়। ঠিক কাছি না বাঁধলেও প্রায় তার কাছাকাছি বটে—নিচের মানুষ উপরের মানুষ বল লোফালুফি করতে লাগল যেন আমায় নিয়ে। ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছি। কত উঁচুতে নিয়ে তুলল রে বাবা—হাত বাড়ালে আকাশে ঠেকে যাবে, এমনিতরো মনে হচ্ছে। অবশেষে থামল এক সময়। পা বুলিয়ে বুলিয়ে বোঝা গেল, সমতল জায়গা। ছাদে এসে গেছি। মনের মতলব কাপ্তেন বলবে এবারে।

সেদিন চোখ বেঁধে ধাক্কাধাক্কি করে নিয়ে এসেছিল। আজকে জগবন্ধু খোলা চোখে সেই ছাদে উঠে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখাচ্ছেন। দেখ অবস্থা তোমরা, এক-মানুষ সমান উলুঘাস—গরু-বাছুর ছাতে উঠে চরে খেতে পারে না, ঘাসের তাই এমন বাড়বৃদ্ধি। যজ্ঞডুমুরের ডাল ঘিরে গয়না পরার মতো কত ফল ধরে আছে—ভাল কথায় যার নাম যজ্ঞডুমুর। দেয়ালের ভিতর শিকড় ঢুকিয়ে বটের চারা মাথা তুলছে—বটফল কাকে মুখে করে আনে, বীজ পড়ে গাছ হয় শুকনো ইট-চুন-সুরকির ভিতরেও। জীবন কোথায় যে নেই—যা-হোক একটু আশ্রয় পেলেই ডালপালা মেলে ধরবার জন্য মুখিয়ে থাকে জীবন।

সে রাত্রে এই ছাতে জগবন্ধুকে তুলে নিয়ে এলো। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ, লোকগুলো জিরিয়ে নিচ্ছে। একটা অতি-কর্কশ কণ্ঠ তারপরে অনুমতি চাইল: বলো কাপ্তেন এবারে—

কাপ্তেন বেচারাম ভরাট গলায় বলে, হাতে দড়ি খুলে পা দুটো বেঁধে ফেল ঐ দড়িতে। আলসের ওধারে নিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

সেই ব্যবস্থা হতে লাগল। জগবন্ধুকে সোজাসুজি ডেকে বেচারাম এবার বলে, ও সাধু-দারোগা, শুনে নাও। মানুষ আমরা মারিনে। ওস্তাদের মানা, কাজেরও বদনাম হয়। এত শত্রুতা করেছ, দুটো হাত তবু ছাড়া রইল। ছাতে আলসের মাথা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাক। বাদুড় ঝুলে থাকে, চামচিকে ঝুলে থাকে, তুমি কেন পারবে না হে? তাদের চেয়ে অক্ষম কিসে? কপালে থাকলে পথ-চলতি মানুষে ঘাড় উঁচু করে দেখে উদ্ধার করবে। শক্ত করে ধরে থাক, হাত সরে না যায়। কতগুলো সিঁড়ি ভেঙে কত উঁচুতে উঠেছ, আন্দাজ আছে তো? পড়ে গেলে ছাতু-ছাতু হয়ে যাবে কিন্তু। সে মরার জন্য ধর্মের কাছে আমরা দায়ী হব না।

গল্প হতে হতে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে জগবন্ধু হেসে ওঠেন: আর এই ভট্টাচাজমশায়ের ব্যাপার দেখ। এত বড় বন্ধুলোক সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে রয়েছেন একটি কথা বলছেন না আমার দিক হয়ে। সুহৃদের যন্ত্রনা চুপচাপ চোখে দেখে যাচ্ছেন।

ক্ষুদিরাম বলে, বিপদ কোথায় হল যন্ত্রণাই বা কিসের? আপনার উদ্ধারের জন্য শলাপরামর্শ করেই আমরা নেমেছি। কাপ্তেন থেকে চুনোপুঁটি অবধি সকলে। চোখ বাঁধা বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কথাগুলো কেবল শুনে যাচ্ছেন। মুখে রুক্ষ কঠিন কথা, কিন্তু মুখের উপরে হাসি।

সাহেবকে ক্ষুদিরাম বলে, বেচারাম নিজে আমায় বলল, দারোগাবাবুকে এনে ফেল দলের মধ্যে। এমন সাচ্চা মানুষটা অপথ-বিপথ ঘুরে নষ্ট হয়ে যাবেন, সেটা ঠিক হবে না। ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই। সদরের পথে সুবিধা হয় না তো অন্দরে আগে পশার জমালাম।

সাহেব বলে, সাচ্চা মানুষ সৎপথেই তো ছিলেন, নষ্ট হবার কথা এলো কিসে?

ক্ষুদিরাম বলে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কথা জানিনে, কিন্তু যাকে সৎপথ বলছ সেই পথ ধরে থাকলে এ-যুগে সকলে আঙুল দিয়ে দেখায়—

সাহেব বলল, আঙুল দেখিয়ে বলে, মহৎ মানুষ—আদর্শ মানুষ—

শুনিয়ে শুনিয়ে তাই হয়তো বলে। কিন্তু মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, হাঁদারাম। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের যে আলাদা মতিগতি। মানুষকে মিথ্যাবাদী শঠ ফেরেব্বাজ বলো, সেটা গালি হয় না আজকের দিনে। শুনে কেউ অবাক হয় না, ঘৃণা করে না। কেননা নিয়মই এই দাঁড়িয়েছে—শতকরা সাড়ে নিরানব্বুয়ের এই নিয়ম। বাকি যে আধজন রইল, ধর্মধ্বজী বলে হাসতে হাসতে তাদের আঙুল দিয়ে দেখায়! বাড়ির বুড়োহাবড়া মানুষ সম্পর্কে একটা প্রশ্রয়ের হাসি থাকে, সেই রকম। ক'দিন আর আছেন, যা করছেন করুনগে যান। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যা মুছে যাচ্ছে, তাকে অবহেলা করাই ভালো। কিন্তু বলাধিকারীমশায়ের মতো মানুষকে ওরা তেমন হতে দেবে না—

বলাধিকারী বললেন, ভটচাজমশায় যখন তখন আমায় জপাতেন, তাঁর যে একটা স্থির উদ্দেশ্য ছিল ধরতে পারি নি। "সদা সত্য কথা বলিবে" "চুরি করা বড় দোষ" —এমনি সব সাধুবাক্য একফোঁটা বয়স থেকে ছেলেদের আমরা পড়াই, বানান করে মানে শেখে তারা। কিন্তু মন অবধি কি পোঁছায়, সত্যি কোন কাজে আসে কী জীবনে? যে মাস্টার পড়ান, তিনিও একবর্ণ বিশ্বাস করেন না। এই সমস্ত শোনাতেন আমায় ভটচাজমশায়।

বলাধিকারী আবার বলেন, কত দিনের কত সব কথা! কোন এক কালে এসবের জীবন্ত অর্থ হয়তো ছিল, আজকে একেবারেই নেই। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু এ বড় দুরন্ত পাপচক্র। একটা মানুষের সাধ্য কি চক্রের বাইরে থাকতে পারে? পুরোনো যুগের মৃত্যু না-ও যদি স্বীকার করো, শতসহস্র ক্ষতে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে সে যুগ। ধুঁকছে, কোন অঙ্গের তিল পরিমাণ অংশ সুস্থ নেই। বৃহৎ বনস্পতি ভুশায়ী হয়ে পচে গলে যাচ্ছে, তার দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল, আপত্তি করব না। কিন্তু

বাঁচিয়ে তুলে আবার পরসঞ্চার ঘটাবে, নিতান্তই পণ্ডশ্রম সেটা। এমনি চেষ্টা করতে যায়, বোকা বলে হাস্যাস্পদ হয়। যে বস্তু জীবনের বাইরে চলে গেছে, শতকরা একজনকেও ধারণ করছে না—জোর করে বললেই সেটা ধর্ম হয়ে যায় না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে হাস্যমুখে বলাধিকারী বলেন, এমনি সব বলতেন আপনি, মনে পড়ে?

ক্ষুদিরাম ঘাড় কাত করে স্বীকার করে নেয়। বলে, সাচ্চা মানুষের সর্বক্ষেত্র দরকার। আমাদের কাজকর্মে তো বেশি করে লাগে। চোরের সমাজে সকলের বড় গুণ, সাধু হতে হবে। বলাধিকারীমশায়ের উপর কাপ্তেনের তাই অত রোখ। ফলও এখন দেখছে সর্বজনা। বলাধিকারীমশায় গ্যাঁট হয়ে ঘরে বসে থাকেন—কত কত কাপ্তেন কাজকর্ম নিয়ে পায়ের কাছে ধর্না দিয়ে এসে পড়ে। মহাজন-থলেদারের অন্ত নেই- -গণ্ডা গণ্ডা নানান দিকে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আর বলাধিকারীমশায় দেখ, কাজ ঠেলে কূল পান না। নেবো না নেবো না করে মাথা ভাঙলেও রেহাইদেবে না।

বলাধিকারী বলেন, ইষ্টমন্ত্র সকলের আগে এই ভটচাজমশায় আমার কানে দিলেন। সেই নাম জপ করে চলেছি। এ পথের দীক্ষাগুরু—ওঁকে তাই সকলের বড় মান্য দিই।

জগবন্ধু হাত ছেড়ে দিয়ে যদি পড়েই যান, সে কারণে বেচারামের দল ধর্মের কাছে দায়ী হবে না ধর্ম তরিয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে সকলে নিচে চলে গেল। ছাতের আলসে ধরে জগবন্ধু ঝুলতে লাগলেন। খবর রাখে, রীতিমতো জিমনাস্টিক-করা মানুষ তিনি। রাখবে না কেন—ক্ষুদিরামই রোজ সকালবেলা তাঁকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে দেখেছে। হাতের বদলে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে, পায়ের সাহায্য নিয়ে কৌশলে ছাতের উপর যাতে উঠে আসতে না পারেন। ঝুলতে লাগলেন বলাধিকারী সেই অদ্ভুত অবস্থায়।

এক হাতে একটুখানি ঝুলে থেকে অন্য হাতে মুখের বাঁধন খোলা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখছেন। অসম্ভব। সে বাঁধন ছুরি দিয়ে না কাটলে হবে না। তা ছাড়া একখানা হাতের উপর এত বড় দেহের ভার—গেলেন বুঝি এই পড়ে—হাত ত্রিশেক নিচে। দুটো হাতে তাড়াতাড়ি আলসে চেপে আপাতত আত্মরক্ষা করলেন। ঝিঁঝির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দূরের ভূমিতলে, তক্ষক ডাকছে পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে। নৌকো ভাসিয়ে দস্যুদল এতক্ষণ চলে গেল কাঁহা-কাঁহা মুলুক। উজ্জ্বল সিঁদুর-পরা সেই দুর্বৃত্ত রূপসী হয়তো খলখল করে হাসছে, মধুকণ্ঠী বৈরাগী কর্মসিদ্ধির আনন্দে আরও মধুর ভক্তিরসের গান ধরেছে। কত রাত্রি এখন না জানি—কতক্ষণে রাত পোহাবে! পথের মানুষ দৈবক্রমে উপরমুখো তাকিয়ে আজব কাণ্ড দেখবে—লাউয়ের মাচায় ফলন্ত লাউ যেমন ঝোলে, একটি মানুষ তেমনি ছাতের আলসে ধরে ঝুলে আছে।

কিন্তু দুটো হাতেও তো দেহভার রাখা যায় না, হাত টনটন করছে। মরীয়া হয়ে জোড়া-পায়ের একটা দোলন দিতে কার্নিশ পায়ে ঠেকল। আলসের খানিকটা নিচে দিব্যি উঁচু কার্নিশ। পা দুটোর আশ্রয় হল, খানিকক্ষণ তবে যুঝে থাকা যাবে। জগবন্ধু ঝুলছেন না আর এখন—আলসের মধ্যে দু-হাতে আঁকড়ানো, পা

কার্নিশের খাঁজে, ধনুকের মতো দুমড়ে রয়েছেন। জীবনকে যেন প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছেন কার্নিশ আর আলসের মাঝের জায়গাটুকুতে। কিন্তু কতক্ষণ আর! মা-চামুণ্ডা, তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে সকাল করে দাও মানুষ ঘুম ভেঙে বেরিয়ে চলাচল শুরু করুক।

পোহাল রাত অবশেষে। চামুণ্ডার দয়ায় তাড়াতাড়ি পুইয়েছে, তা নয়। বরঞ্চ উল্টো। মা যেন রাতটাকে টেনে টেনে বেধড়ক লম্বা করে সন্তানের ধৈর্যের পরীক্ষা করলেন। কাকপক্ষী ডাকছে, মানুষের কথাবার্তাও একটু বুঝি কানে পাওয়া যায়। রোদ চড়ে উঠল, সেঁক লাগছে গায়ে। হে মা-কালী, মানুষজনের উঁচুমুখো নজর তুলে দাও, কেউ না কেউ দেখে ফেলুক।

কি নিয়ে তর্ক করতে করতে জনকয়েক একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। নিরাশ হয়ে পড়লেন জগবন্ধু। জীবন আঁকড়ে ধরা আছে কয়েকটা মাত্র আঙুলের ডগায়। প্রাণপণে ধরে আছেন—কিন্তু কতক্ষণ আর! হাত দুটো খসে যাবে কোন মুহূর্তে। গলা ফাটিয়ে মানুষের উদ্দেশে শোনাতে চান: শোন, শুনছ গো তোমরা? পা-ফেলে-চলা মাটিটুকুই সব নয়, মাথার উপরেও আছে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখ।

হায় রে, বাঁধা-মুখে আওয়াজ বেরোয় না। মানুষ ঘুরবে ফিরবে সারাদিন, দিন গিয়ে সন্ধ্যা হবে, রাত্রি হবে। আকাশমুখো কেউ তাকাবে না।

এমনি অবস্থায় নতুন দৃষ্টির যেন উন্মেষ হচ্ছে। সদাচার ও সাধুতার কথা মুখে বলা ভাল। কিন্তু জীবনে যারা সত্যি সত্যি প্রয়োগ করতে যায়, আহাম্মক বই তারা কিছু নয়। সৃষ্টিছাড়া হতে গিয়েই এই বিপত্তি। আর একবার বাঁচার সুযোগ যদি পাওয়া যেত, নতুন পথ ভেবে দেখতেন। কিন্তু সে আশা আকাশকুসুম বই কিছু নয়।

পিছনের অনেকগুলো দিন দ্রুত মনের উপর দিয়ে ছুটেছে—শিশু থেকে এই জোয়ানযুবো হয়েছেন, তার বহু ঘটনা। হঠাৎ মনে হল ঝুলছেন না তিনি, শূন্য-লোকে ভাসছেন রাজা ত্রিশঙ্কু হয়ে—স্বর্গেও নেই, মর্ত্যেও নেই। গভীর কালো তরলিত ছায়া নিম্নদেশে। হু হু করে পড়ে যাচ্ছেন তিনি সেখানে—আবর্তময় ভয়াল ছায়ানদীতে। ধারাস্রোত প্রবল এক পাক দিয়ে উল্কার বেগে নিয়ে চলল তাঁকে, লহমার মধ্যে পারাবারে পেঁছে দিল। পুরানো দিনের চেনা কণ্ঠধ্বনি অনেক কানে আসে, যেসব মানুষ বেঁচে নেই বলে জানেন। কিন্তু কঠিন ভাবে চোখ বাঁধা বলে দেখা যায় না কোন-কিছু। মুখ বাঁধা বলে ডাকতে পারেন না কারও নাম ধরে। পা-বাঁধা বলে সাঁতরে কাছে যাবেন, সে উপায় নেই। হাত দুটোই শুধু খোলা আছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন সে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাদের ধরবার অভিপ্রায়ে ……তারপর আর কিছু মনে পড়ে না, খানিকটা সময় এর পরে একেবারে ফাঁকা। চেতনা অসাড় করে দিয়ে ডাক্তার অপারেশন করে, চেতনা ফিরে পেয়ে রোগি কিছুতে মাঝের অবস্থা মনে করতে পারে না। জগবন্ধুরও ঠিক তাই—হাত ছেড়ে দেবার পরে অনেকখানি সময় মুছে রয়েছে তাঁর মনে, জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

মরেননি বলাধিকারী। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ঘড়ির হিসাব করে-ছিলেন। সর্বসাকুল্যে ঘণ্টা ছয়েক ছিলেন বোধকরি ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু কষ্টটা ছয় কিম্বা ছ-শ বছরের।

তেতলার ছাতে এনে তুলেছিল, ছাতের উপর ঐ যে চিলেকোঠা—। জগবন্ধু চিলেকোঠার আলসে দেখিয়ে দিলেন সাহেবদের। ক্ষুদিরাম সেই সময়টা মুখে হাত চাপা দিয়ে খিকখিক করে হাসছে। জগবন্ধুকে জানানো হয়েছিল ঃ আলসের বাইরের দিকে তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছে—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত নিচে মাটি। আসলে ঝুল খাচ্ছিলেন তিনি চিলেকোঠার আলসে ধরে। কার্নিশে পা রেখে ধনুকের মতন দুমড়ে ছিলেন, সরলরেখায় থাকলে পা থেকে ছাত দেড়-হাত দু-হাতের বেশি নয়। একটা বাচ্চা ছেলেও সেটুকু নিরাপদে লাফিয়ে পড়তে পারে। অথচ আতঙ্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যমযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মরার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থেকেও হাজার বার মরণ হয়ে গেল। হাত অবশ হয়ে পড়ে গেলেন একসময়—পতন মাত্র হাত দেড়েক নিচু ছাদে। গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, তবু কিন্তু অচেতন হয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। চোখ মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আরও অনেকক্ষণ পরে সম্বিত পেয়ে চোখ মেলে চারিদিক দেখেন। কাপ্তেন বেচারাম কৌতুক করে গেছে—এত বড় বেকুবি কারো কাছে প্রকাশ করে বলার নয়।

সে দিনের এই মনোভাব। এখন লজ্জা ভেঙে গিয়ে বলাধিকারী হাঁকডাক করে সকলকে সেই বিচিত্র উপলব্ধির কথা বলেন ঃ চোখের উপর মৃত্যুর স্পষ্ট চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে জীবন্তের মধ্যে ফিরে এসেছি আবার। মৃত্যুভয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ বলেই প্রত্যয় আমার দৃঢ়। জীবন উত্তাল উদ্বেগময়, মৃত্যু শান্ত নিরুত্তাপ নিরুপদ্রব। মৃত্যুতে নয়, মৃত্যু-ভয়েরই যন্ত্রণা। সে ভয়ের কিছুমাত্র ভিত্তিভূমি নেই।

বারো

ধুঁকতে ধুঁকতে জগবন্ধু থানায় ফিরে দেখলেন, সাধুতার আরও পুরস্কার অপেক্ষা করছে তার জন্য। সরকারের সুনাম ও প্রজাসাধারণের কল্যাণ বিবেচনা করে ডি-আই-জি সাসপেণ্ড করেছেন তাঁকে। তদন্ত হবে অভিযোগগুলোর সম্পর্কে। চাকরি বজায় থাকবে কিনা তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আপাতত ছোটবাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ।

জগবন্ধু হেসে বলছেন, পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়—তার একেবারে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আজকে উল্টো পথে চলে প্রতিষ্ঠা শতগুণ বেড়ে গেছে। বৃত্তিটা আমার গোপন কিছু নয়—মুখ ফুটে না বললেও জানতে কারো বাকি নেই। ছেলেছোকরারা তামাক খায় বুড়োদের আড়াল করে, বুড়ো চোখে দেখেও না দেখার ভান করে। এখানেও ঠিক তাই। পুরানো ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মোটামুটি বাতিল করে দিয়ে বাইরে আমরা একটু আবরু রেখে চলি এই পর্যন্ত।

কিন্তু জগবন্ধু যা-ই ভাবুন, ভুবনেশ্বরী একেবারে অবিচল। ধার্মিক পরিবারের মেয়ে তিনি—পিতামহ সিদ্ধপুরুষ। পুরোপুরি তেত্রিশ কোটি না হলেও সেই বাড়িতে বিগ্রহের সংখ্যা গুণতিতে আসে না। শিশু বয়স থেকে এই ঠাকুরদেবতার মাঝখানে মানুষ তিনি। জগবন্ধুর চিরকাল পড়াশুনোর অভ্যাস—দারোগার চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। বিয়ের পরে এক সময় ঝোঁক চাপল পুলিসের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করবে কোথাও। নিষ্পাপ নিরীহ পুণ্যকর্ম। ভুবনেশ্বরী নিরস্ত করলেন তাঁকে। এই চাকরী খারাপ হল কিসে? বহুজনকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব। মূর্খ লোভী প্রবঞ্চকেরা জুটেছে বলেই পুলিসের দুর্নাম। শিক্ষিত সজ্জনদেরই অতএব দলে দলে গিয়ে পড়া উচিত। চাকরী ছেড়ে চলে আসা কাপুরুষতা।

ভুবনেশ্বরীর কথায় বল পেতেন জগবন্ধু। চাকরি হল জনসেবা, মাইনেটা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকবার সম্বল—এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। চুরি-ডাকাতি যে আজকেই ঘটছে, তা নয়। ঋগ্বেদে পর্যন্ত চোরের কথা। বাইবেলেও চোর-জোচ্চোরের প্রসঙ্গ। তাদের মনস্তত্ত্ব বিচার করা উচিত সহৃদয়তার সঙ্গে। শুধুমাত্র শাসনে এ বৃত্তি উৎখাত হবার নয়—তা হলে ইতিহাসের আদিযুগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তখনকার দিনে অতিশয় কড়া শাসন—চোরকে শূলে চড়াত, হাত কেটে দিত জলজ্যান্ত মানুষটার। সন্দেহের বশে প্রাণ হনন করাও হত। এই রকম অবিচারের বিরুদ্ধে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে মনু সতর্ক করে দিচ্ছেন: ন্যায়বান রাজা বমাল সমেত না পেলে কোন চোরের মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, চোরাই মাল ও সরঞ্জাম সব হাতে-নাতে ধরলে তবেই চরম সাজা দেওয়া যেতে পারে। শাসনের কড়াকড়ির ফলে বরঞ্চ উল্টো-উৎপত্তি হয়ে দাঁড়াল—চোরের ইজ্জত বাড়ল, সংঘ গড়ে উঠল চোরেদের। চৌর্যধর্মের শাস্ত্র হল—চৌরচর্যা, ষন্মুখকল্প। খণ্ডিতভাবেও পুঁথিপুরাণ আছে—বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরও অনেক। বিরাট বিপুল মহাবিদ্যা। চোরকর্মের অধিদেবতাটিও সামান্য পুরুষ নন—দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয়। প্রাচীন শাস্ত্রমতে চৌরপন্থতির প্রবর্তক তিনিই। বাংলাদেশের পুঁথিপত্রে আর এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁর—'নিশিকালী মহাকালী উম্মত্তকালী নাম।' নিজে তিনি ভক্তদের চুরিবিদ্যা শিখিয়ে বেড়ান। চৌরশাস্ত্রের সকলের বড় ঋষি বোধ হয় ভগবান কনকশক্তি। অপর এক জাঁদরেল শাস্ত্রকার মূলদেব। (নিজেও মহাগুণী তস্কর—শুধুই শাস্ত্র-বচন নয়, কায়দাগুলো হাতেকলমে প্রয়োগের শক্তি ধরেন।) শাস্ত্রের ভাষ্যকার ভাস্করনন্দী। চৌষট্টি কলার একমত রূপে এই বিদ্যা বন্দিত হতে লাগল। দশকুমারচরিতে রয়েছে, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও রাজকুমারের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল না যতক্ষণ না চৌরশাস্ত্র সম্যক অধিগত হচ্ছে।

ইজ্জত কত চোরের! রৌহিনেয় জাঁক করছে—তার বাপ ঘুঘু-চোর, মা-ও তাই। পিতৃকুল মাতৃকুল কোনটাই হেলাফেলার নয়। চোরসমাজে অতএব নৈকষ্যকুলীন বলতে হবে তাকে। বাপ পাখির মতন ফুড়ুত করে যে-কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারে, আর রৌহিনেয় নিজে বিশেষ করে নানা পাখি ও পশুর ডাক আয়ত্ত করেছে চৌরকর্মে যার

সদাসর্বদা দরকার পড়ে। এ হেন কৃতী পিতা শয্যায় মরে পড়ে আছেন, বিধবা মা সেই অবস্থায় রোহিনেয়র উপর কুলধর্মের ভার দিচ্ছেন কপালে সপ্তশিখার প্রদীপ ঠেকিয়ে। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্রের যেমন অভিষেক হয়। রাজগণের মধ্যে সকলের বড় রাজচক্রবর্তী চোরের মধ্যেও তেমনি চোরচক্রবর্তী। পুঁথিতে পুঁথিতে চোরচক্রবর্তীর বিচিত্র দিগ্বিজয়-কথা। কতরকম মন্ত্রতন্ত্র, নীতি-নিয়ম। আয়ুর্বেদের মতো গাছ-গাছড়ারও ব্যবহার। বহুকাল ধরে গুণীদের কাজের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে রীতিমতো একটা পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে। জগবন্ধু গোড়ার দিকে কৌতুকের মন নিয়ে অবহেলার ভাবে পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। যত পড়েন অবাক হয়ে যান। প্রাচীন নিয়মকানুনগুলো আজকের দিনেও চলে আসছে অল্পসল্প রদ-বদল হয়ে। আমাদের পরিচিত সংসারের গায়ে গায়ে যেন এক বিচিত্র জগতের আবিষ্কার। আমাদের দিনমানের জগৎ, তাদের নিশিরাত্রির জগৎ। গতানুগতিক পথে এর মূলোচ্ছেদ হবে না। রোগই যদি বলতে হয়, সেই রোগের মূল ধরে টান পাড়তে হবে। সেই ব্রত বলাধিকারীর।

কিন্তু যত দিন যায়, কাজের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। অবস্থা ক্রমশ বুঝতে পারছেন। সারাদিন যথানিয়ম চোর তাড়িয়ে অবসর সময়ে ঘরের মধ্যে বসে যত কিছু পড়াশুনা ও ভাবনাচিন্তা করতে পার, কিন্তু হাতে করবার কিছু নেই। জটিল শাসন-যন্ত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক একটা নাট-বল্টু ছাড়া কিছুই নন তাঁরা। ঝিনুকপোতার দারোগার এ বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা : বলেছে কে বাপু মূলোচ্ছেদ করতে? বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে ঠোকাঠুকি—কখনো লড়াইয়ে নেমে পড়ি, কখনো সন্ধিস্থাপন করি। ওরা করে খাচ্ছে, আমরাও করে খাচ্ছি—দিব্যি তো আছি। উচ্ছেদ হয়ে গেলে সরকার কি পুষবে আমাদের তখন ?

একা ঝিনুকপোতা কেন, সব থানাওয়ালাই ভাবে এইরকম। সকলের থেকে আলাদা হতে গিয়েই জগবন্ধু ঘোর বিপাকে পড়ে গেছেন।

তদন্ত চলল অনেকদিন ধরে। সত্যপথের পথিক জগবন্ধু অবস্থা বিবেচনায় শুধুমাত্র সততার উপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ছুটোছুটি করছেন। এবং ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়াচ্ছেন। দারোগা হওয়া সত্ত্বেও টাকা করতে পারেন নি, সামান্য সঞ্চয় দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। ভুবনেশ্বরীর মুখের হাসি কিন্তু একদিনের তরে মলিন হল না। নিজ হাতে একটা একটা করে গায়ের গয়না খুলে দিচ্ছেন—দু-হাতে শাঁখা এবং বাঁ-হাতে লোহাগাছি মাত্র রইল তাঁর। সাসপেণ্ড হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার কোয়ার্টার ছাড়তে হল। কিন্তু মোকাম ছাড়েন নি, তদন্তের সাক্ষিসাবুদ জোগাড়ে অসুবিধা ঘটবে। এবং ভুবনেশ্বরীও সেটা হতে দেবেন না—লোকে হাসিতামাসা করবে লেজ গুটিয়ে পালাল বলে। পাপ যখন নেই, কিসের ভয়? নানারকম কুৎসা আসত ভুবনেশ্বরীর কানে। রাগ করতেন না তিনি, হাসতেন : সত্য প্রকাশ হবে একদিন সূর্যের আলোর মতো, অন্ধকারের এইসব পেঁচার তখন নিশানা পাওয়া যাবে না।

দোষের প্রমাণ হল না তদন্তে। বলাধিকারী কিন্তু সত্যের জয় বলে স্বীকার

করেন না। প্রচুর ঘুষঘাষ দিয়ে সাক্ষ্য বানচাল করা হয়েছিল, জয় যদি বলতে হয় শুধুমাত্র সেই কারণে। তা সত্ত্বেও উপরওয়ালাদের আস্থা হয়নি, দেখা গেল। থানা থেকে সরিয়ে তাঁর উপরে একটা-ছোট চৌকির ভার দেওয়া হয়েছে।

ভুবনেশ্বরীকে জগবন্ধু বলেন, এবারে যাবে তো ?

ভুবনেশ্বরী উদাস কণ্ঠে বলেন, রায় দিয়ে দিয়েছে। আর এখন বাধা কি ? লেজ গুটিয়ে পালানো আর কেউ বলবে না।

জগবন্ধু আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ জায়গা থেকে সে জায়গা—বদলি তো সকলেরই হয়ে থাকে। পুলিসের চাকরির দস্তুরই এই।

ভুবনেশ্বরী একটু হাসলেন : থানা থেকে চৌকিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, কে-ই বা জানতে যাচ্ছে ? আমরা তো বলছি নে কাউকে !

জগবন্ধুও সায় দিলেন : চলে যাবার পরে জানল তো বয়েই গেল। আর ফিরব না এখানে।

যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—অনেক দূরে কোন ধাপধাড়া জায়গার চৌকিতে। এক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখলেন, কাজলীবালা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। জগবন্ধুকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়ল : মা কেমনধারা করছে, দেখ এসে।

ভুবনেশ্বরী মাটিতে পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মুখে ফেনা উঠছে। কী বলতে গেলেন স্বামীকে দেখে। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও বলতে পারলেন না। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে। তারপরেই পূর্ণ অচেতন হলেন।

উঠানে কলকে-ফুলের গাছ। কলকে-ফুলের-বীচি বেটে খেয়েছেন তিনি। শিলের উপর বাটনার কিছু অবশিষ্ট পাওয়া গেল। বড় বিষাক্ত জিনিস। বমি করিয়ে উগরে ফেলার অনেকরকম চেষ্টা হল। মাছ-ধোওয়া আঁশ-জল খাইয়ে দেখলেন। আরও নানাবিধ মুষ্টিযোগ। কিন্তু মৃত্যু ফসকে না যায়, সেজন্য অনেকটা খেয়ে নিয়েছেন তিনি। কিছুতে কিছু হল না। দূরের কোন চৌকিতে যাবার কথা—অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন। দুনিয়াতেই আর ফিরবেন না।

ভুবনেশ্বরী চোখের জলে যে কথা বলতে গিয়ে পেরে উঠলেন না, তা-ও জগবন্ধু বুঝতে পারেন এখন। সিদ্ধপুরুষ পিতামহের রক্ত তাঁর দেহে, শৈশব থেকে সততা ও পুণ্যের সংসারে বড় হয়েছেন। জীবনভোর যা-কিছু জেনেবুঝে এসেছেন, হঠাৎ একদিন সমস্ত অলীক ও অর্থহীন হয়ে উঠল। চেনা ভুবন একেবারে অন্ধকার—বাসের অযোগ্য। স্বভাব বশে কবে মৃত্যু আসবে, ততদিন সবুর রইল না। সকলের অজান্তে এমনি কি কাজলীবালারও চোখ ফাঁকি দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে চলে গেলেন। নিদারুণ ঘৃণায় পৃথিবী ছাড়লেন।

প্রথম পর্ব শেষ

[উপন্যাস]

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সুহৃদ্বরেষু

ডুম-ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোল বাজাচ্ছে প্রফুল্লর লোক। জানিয়ে দিচ্ছে, ইতিহাসে জ্বল-জ্বল করবে আজকার তারিখ—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। কত সংগ্রামের পর এই দিনে পৌঁছলাম! পথের শেষ নয়—নূতন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আরও দুস্তর পথে যাত্রা।

উৎসব-সভায় লোক হচ্ছে না? হবে, হবে বই কি! কত কষ্ট করে শহর থেকে তোমরা এসেছ, লোক না হলে ছাড়বে প্রফুল্ল? ব্যস্ত হোয়ো না, অনেক দেরি এখনো। ইস্কুলের মাঠে পাকুড়তলায় সভার জায়গা। হাঃ-রে, পোড়া ইস্কুল-ঘরে আবার লোক গিসগিস করছে। তোমাদের মতো নামজাদা মানুষরাও থাকবে তার মধ্যে! চল, এগুনো যাক পায়ে পায়ে।

মেলা দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন শহরে। এই যে স্বাধীন হয়েছি, এর পূর্বাপর ইতিহাস ছবি দিয়ে গেঁথে রেখেছিল মেলার এক ঘরের মধ্যে। তুমি লেখক-মানুষ নিশিকান্ত—ভেবেচিন্তে দেখো তো আমাদের জয়রামপুর নিয়ে কিছু লেখা চলে কিনা। কত মিথ্যে কথাই রসিয়ে রাঙিয়ে লিখে থাক, এখানকার সত্যি মানুষদের নিয়ে লেখ না একবার। তোমার কলমের জোরে তারা বেঁচে উঠুক স্বাধীন ভাগ্যবান দেশবাসীর মর্মে।

মস্তবড় গ্রাম আমাদের। নূতন মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। শুনছি শিগগিরই কৃষ্ণপক্ষে কয়েকটা রাস্তার মোড়ে কেরোসিনের আলো জ্বলবে। ছ'টা বড় বড় পাড়া। দস্তুরমতো কৌলীন্য আছে এই জয়রামপুরের—সাহেব-ঘেঁসা আমরা চিরকাল। সাদা সাহেবের এ অঞ্চলে যাতায়াত সুদূর অতীতকাল থেকে। একটা পাড়ার নামই আছে সাহেব-পাড়া। বাঁশবনটা ছাড়িয়ে পড়ব সেখানে। পাকা রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে। সাহেবরাই নিজেদের গরজে তৈরি করেছিল এ রাস্তা। এখন আরও কয়েকটা হয়েছে, কিন্তু এইটে আদিতম। এই সেদিন অবধি বাঘে-গরুতে জল খেত সাহেবদের প্রতাপে। বড় বড় বাংলো তৈরি করে রাজার হালে তারা থাকত। আজকে শামুক-ভাঙা কেউটের আস্তানা সে-জায়গায়।

বহুবিস্তৃত বাঁশবন। ঝাড়ের যেন অন্ত নেই, মাইলখানেক জায়গা জুড়ে আছে। একটা দিনের কথা বলি, বারো-তেরো বছর বয়স হবে আমার। ঘোর হয়ে গেছে, গরু আসেনি গোয়ালে। দুধাল গরু—ঠাকুরমা ঘর-বার করছেন। তখন বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই গরু খুঁজে আনবার মতো। আমি বললাম, ব্যস্ত হোয়ো না ঠাকুরমা, প্রফুল্লদের গরুর সঙ্গে চরতে দেখেছি, তাদের খামার-বাড়ি হয়তো ঢুকে পড়েছে। দেখে আসি।

ঐ যে ডানদিকের ফাঁকা জায়গাটা নিশিকান্ত, ক'টা ছেলে গুল-দাড়ি খেলা করছে—ঐখানে ছিল প্রফুল্লদের খামার-বাড়ি। এখন প্রফুল্ল ক্ষ্যাপলার মা'র বাড়ির আমবাগান কাটিয়ে বিশাল অট্টালিকা তুলছে। পথের ধারেই পড়বে, দেখাব তোমায়।

ভর সন্ধ্যেবেলা গরুর খোঁজে দুটো পাড়া অতিক্রম করে এই এত দূর এলাম। এসে শুনি—শুঁটকি আমাদের সত্যিই খামারে ঢুকে পোয়াল-গাদা থেকে পোয়াল টেনে টেনে খাচ্ছিল, ওরা দেখতে পেয়ে বেহদ্দ পিটুনি দিয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁশতলার এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মনে হল—ঐ তো সাদা মতো··· শুঁটকিই। বড্ড রাগ হল, শিঙে একবার দড়ি পরাতে পারলে হয়। ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান হচ্ছি, আর হতভাগা গরু শুয়ে পড়ে দিব্যি জাবর কাটছে ওখানে।

জায়গাটায় এসে দেখি, কিছু নয়—ঝাড়ের ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে, সেইটে গরুর মত মনে হচ্ছে দূর থেকে। ডাকছি, শুঁটকি-ই-ই। সামনের দিকে কি-একটা নড়ে উঠল—শুঁটকি না হয়ে যায় না···ছায়া দেখে দেখে এমনি অনেকটা এগিয়ে গেছি নিশিকান্ত, হঠাৎ জোরে বাতাস এল, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল বাঁশঝাড়ে। সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠল। ছেলেমানুষ পেয়ে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অশরীরী বহু জন, চেপে ধরবে বুঝি বাঁশের আগা দিয়ে। রাস্তার দিকে দৌড় দিই। ঝাড়ে ঝাড়ে যেন ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে, বাঁশ নুয়ে নুয়ে পড়ছে আমার পথ আটকে—এই একবার মাটি ছোঁবার উপক্রম, পরক্ষণে আবার সটান উপরে উঠে যাচ্ছে। চাবুকের মতো সপাং করে কঞ্চির বাড়ি লাগল মুখের উপর। বাঁশপাতা ঝরছে, মুঠো মুঠো বাঁশপাতা যেন আমার গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় পড়েও ছুটছি। বাঁশবনের আওয়াজ কানে আসে। এক ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের গল্প শুনেছিলাম, তারাই শাসাচ্ছে যেন আমায়। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়ে স্বস্থির হলাম, লণ্ঠন নিয়ে আমার খোঁজে আসছিলেন। বললেন, শুঁটকি এসে গেছে রে। ছড়কোর ধারে এসে শিং নাড়ছিল, তাকে গোয়ালে তুলে তোকে ডাকতে বেরিয়েছি।

রাতে শুয়ে পড়ে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রামজয় ঠাকুরকে দেখেছ তুমি—সেই যিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন ?

কিন্তু ঠাকুরমা কেন—তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ শশিকান্ত নাকি হামাগুড়ি দিতেন সেই সময়। অথচ গল্পটা ঠাকুরমা এমন গড়-গড় করে বলে যান যেন আগাগোড়া চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন তিনি।

নিশিকান্ত, যাবে নাকি বাঁশবনের ভিতর খানিকটা এগিয়ে, রামজয় ঠাকুরের আসন দেখতে? এই সুঁড়িপথের ছায়ায় ছায়ায় স্বচ্ছন্দে নদীর-ধারে হাটখোলা অবধি চলে যেতে পার। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দিক দিয়ে, পথ অনেক কম—কিন্তু গ্রামের মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঁশবনে ঢোকে না। রাত-বিরেতে সহজে মাড়াতে চায় না এদিককার পথ।

পঞ্চবটীতলা—এখন একটা নিমগাছ মাত্র। ভারি জাগ্রত স্থান ছিল এটা, দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসত। দেখ, বাঁশঝাড় চারিদিকে চেপে ধরেছে নিমগাছটাকে—আসল গাছ অনেকদিন মরে গেছে, খান-দুই ডাল বেঁচে রয়েছে কোন প্রকারে, আর ক-বছর পরে চিহ্ন থাকবে না এ গাছের। ঠাকুরমার গল্পে শুনেছি, রামজয় ঠাকুর স্নান-আহ্নিক সেরে দেড়প্রহর রাত্রে এই গাছতলায় এসে বসতেন, শিষ্য-সেবকেরা সেই সময় চারিদিকে ঘিরে এসে বসত।

কোম্পানির তখন প্রথম আমল। ঠাকুর তো আস্তানা গেড়ে নিশ্চিন্ত আছেন। বাঁশবাগান নয় এটা তখন, ভদ্রার প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। দো-চালা খোড়ো-ঘর বেঁধে সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হল সকলের আগে। তার চারিদিকে সংখ্যাতীত কুঁড়ে উঠল আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগত সাধুসজ্জনের থাকার জন্য। মাঠের মাঝখানে গ্রাম গড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তালুকদার এল একটা নিরিখ সাব্যস্ত করে বন্দোবস্ত দিতে, পঞ্চায়েত-চৌকিদার ট্যাক্সর তাগাদায় এল। ঠাকুর বলে দিলেন, রাজার প্রজা নই, সাধুরও খাতক নই। দেবীর কিঙ্কর—খসে পড় বাপধনেরা।

গ্রাম আরও জেঁকে উঠছে, নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। ঢেঁকি-ঢেঁকিশাল তাঁত চরকা হাপর-নেহাই—যা কিছু মানুষের দরকারে পড়ে। জয়রামপুরের বিলের মধ্যে বিস্তীর্ণ ধানবনের বেশির ভাগই সে-আমলে কারকিত করত ঠাকুরের লোকজন। এক খোলাটে ধান এনে তুলত, ঝেড়ে উড়িয়ে তুলে দিত ধর্মগোলায়। ট্যাক্স-খাজনার ধার ধারত না, দিব্যি ছিল।

আগরহাটি সবে তখন চৌকি বসেছে। সে এখান থেকে আট-দশ-ক্রোশ দূর, দুর্গম পথ-ঘাট। এক বিকালে ঘোড়ায় চেপে দারোগা এল। পাকা রাস্তা না হওয়া অবধি ও-অঞ্চল থেকে আসা-যাওয়া বড় কষ্টকর ছিল। রাত থাকতে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে তা-ও প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল পৌঁছতে। গাঙে-খালে তিনটে পারাপার—ঘাটে এসে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। মানুষ পার হলেও ঘোড়া পার করে আনা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারোগা এসে গড় হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। ঠাকুর পুজার নির্মাল্য জবাফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাথরের বাটিতে ঘোল আর রেকাবিতে

করে খানকয়েক বাতাসা দিয়ে গেল একজন। খেয়ে দারোগা ঠাণ্ডা হল। তারপর বলে, ট্যাক্স চাইতে এসেছিল, আপনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানির রাজ্য জানেন এটা ?

না বাবা, সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর রাজ্য। কারো তিনি ইজারা দিয়ে দেন নি পৃথিবীর জায়গা-জমি। বাজে কথা রাখ, অতিথি এসেছ—খাও-দাও থাক, দু-চারদিন—মায়ের নাম কর, আরাম পাবে। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখিনে, কারো সঙ্গে গোলমাল করতে যাই নে। আমাদের কেন এসে জ্বালাতন করছ বাবা ?

দারোগা দিন পাঁচ-ছয় রইল সেখানে। ঠাকুরমা বলেন, চর্বচোষ্য খেয়ে দিব্যি মজায় ছিল। গিয়ে কিন্তু সদরে রিপোর্ট পাঠাল, জবরদস্তি করে আটকে রেখেছিল তাকে। গ্রামে এদিকে সোরগোল পড়েছে, চওড়া পরিখা কাটা হচ্ছে চারদিক ঘিরে। আস্ত বাঁশ পুঁতে পুঁতে প্রাচীর তৈরি হল—পর পর তিনটে প্রাচীর—দস্তুরমতো এক কেল্লা। আর ওদিকে অনিবার্য ভাবে যা ঘটবার কথা—এক দল গোরা সৈন্য এসে পড়ল।

লম্বা-চওড়া ইয়া দশাসই জোয়ান, রক্তাম্বর-পরা—এই নাকি ছিল ঠাকুরের চেহারা। বুক ফুলিয়ে খালি গায়ে সৈন্যদের বন্দুকের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তারা অবাক হল। ঠাকুর বলেন, কেন গণ্ডগোল করতে এসেছিস ? ঘরের ছেলেরা ঘরে চলে যা। আমরা তো বাছা থুতু ফেলতেও যাই নে তোদের দেশে-ঘরে।

কিন্তু ফিরে যেতে আসে নি তারা। বন্দুক ছোঁড়ে—ফাঁকা আওয়াজ, ভয় দেখাবার জন্য। ফলে উল্টা-উৎপত্তি হল। প্রথমটা সকলের ভয় হয়েছিল—ভেবেছিল, ঠাকুর মরে পড়ে আছেন বুঝি নূতন-কাটা পরিখার ভিতর। কিন্তু হাসতে হাসতে ঠাকুর কেল্লায় এসে ঢুকলেন। লোহার গুলি তাঁর গায়ে লেগে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। হবে না কেন—ধর্ম সহায়, কারও উপর অন্যায় করতে যান না তো তাঁরা—নিজের জায়গায় চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

বাঁশের কেল্লা দেখে খুব হাসছে গোরা-সৈন্যরা। এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে তারা প্রাচীরের খানকয়েক বাঁশ খুলে ফেলল। সেই সময় এক কাণ্ড—পাকা মন্দির হবে, তার জন্য পাঁজা ভেঙে ইট স্তূপীকৃত করে রেখেছে, ঠাকুরের লোক আক্রোশে দমাদম সেই ইট-বৃষ্টি করতে লাগল সৈন্যদের উপর। মাথায় লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠাকুর মরলেন বন্দুকের গুলিতে, আরও

ষাট-সত্তর জন মারা গেল। কেল্লায় আগুন দিল, দাউ দাউ করে সারা দিনরাত জ্বলল, ফট-ফট করে বাঁশের গিরা ফুটতে লাগল। বিয়াল্লিশ সনে ইস্কুল-বাড়ি জ্বলতে দেখেছি নিশিকান্ত। তার আগেও একবার জ্বলেছে নোনাখোলায় ভলন্টিয়ারদের আস্তানা। এসব থেকে সেকালের ছবিটা আন্দাজ করে নিই। একই ইতিহাসের রকমফের শুধু। ঠাকুরের অত দিনের অত আয়োজন নিশ্চিহ্ন হল দেখতে দেখতে। একটুখানি কেবল স্মৃতি আছে—এই বাঁশবন। কেল্লার প্রাচীরে কতকগুলো যে গোড়ার বাঁশ পোঁতা ছিল, তাই থেকে নূতন নূতন বাঁশ জন্মেছে শতাব্দীকাল ধরে। কলাড় বাঁশবন এখন এই জায়গায়।

ঠাকুরের অসমাপ্ত মন্দিরের কিন্তু এতটুকু চিহ্ন নেই বাঁশবনে অথবা গ্রামের অন্য কোথাও। নাটার ঝোপে আচ্ছন্ন ইটের স্তূপ—মন্দির নয়, সাহেবপাড়া ঐ সামনে—নীলকুঠির ফটক ছিল ওটা। ক'দিনের বা ব্যাপার—আমার ঠাকুরমা নূতন বউ হয়ে এলেন, তখন হেলি সাহেবের দাপটে ইতর-ভদ্র সকলে তটস্থ। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। হেলি বলে নয়, সব সাহেবকে ক্রমশ বিদায় নিতে হয়েছে জাহাজ ভাসিয়ে। নীলকর সাহেবদের উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কিন্তু বাঁশের কেল্লার কথায় প্রবীণজনেরা ঘাড় নেড়ে বলেন, গাঁজাখুরি গল্প—এই কি হতে পারে, কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঁশ আর ইটের টুকরোয় লড়াই? সামান্য একটু গ্রাম্য ঘটনা লোকের মুখে মুখে এই রকমটা দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা নিশিকান্ত, রামজয় ঠাকুরের কথা এতই কি অবিশ্বাস্য পরবর্তী ঘটনাগুলোর তুলনায়? জয়রামপুরের এক এক ফোঁটা ছেলে—আমাদের কানু-বানু অবধি কী তাজ্জব দেখিয়ে গেল! পুরানো কাহিনী আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখলে।

প্রবীণেরা যা-ই বলুন, ঠাকুরমার মুখে শোনা প্রতিটি কথা আমার শিশু-মনে গেঁথে গিয়েছিল। রামজয় ঠাকুরের মন্দিরের ইট রয়েছে নিশ্চয় বাঁশবনে কোনখানে চাপা পড়ে, সেইসব মড়ার হাড়-পাঁজরা ধুলো হয়ে বাতাসে উড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। অহরহ বাঁশবনে কটর-কট আওয়াজ ওঠে—ছেলেবেলা আমার মনে হত, রামজয় ঠাকুরের রক্তাক্ত সেই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বাঁশের আগায় আগায় পা ফেলে শূন্যমার্গে চলাচল করছেন। শুধু তাঁরাই নন—বিদেশি নীলকর পরিবারের প্রেতাত্মাগুলিও। বুড়ি মেমের কুঠির পিছনে ভদ্রার কূলে বাউইলতায় ঢাকা কবরখানা রয়েছে, আতঙ্ক সেই জন্য আরও বেড়েছিল।

ছেলেমানুষ বলে নয়—বুড়োরাও নিতান্ত দরকার ছাড়া ঢুকতে চায় না বাঁশবনে। কেউ আসে না নিশিকান্ত। দিনদুপুরে শিয়াল চরে বেড়ায়,

খরগোস ছোটে দু-কান উঁচু করে, বাদুড় ঘুমোয় নিচেমুখো মাথা ঝুলিয়ে। তলায় এখানে-ওখানে উলুঘাস, হ্যাড়াসেজি ও শেয়াকুলের ঝোপ। কে আসতে যাচ্ছে বল এদিকে, কার দায় পড়েছে।

দায় পড়েছিল আমাদের—মুশকিলে পড়েছিলাম সেবার বিয়াল্লিশ সনের শেষাশেষি সময়টায়। ঘরে ঘরে পুলিশের দল হানা দিচ্ছিল, পাড়ার মধ্যে থাকা অসম্ভব হয়েছিল শেষের মাসকয়েক। আজকে নিশিকান্ত, ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি—সেদিন ঐ সব ঝোপঝাপের আড়ালে পাকা বাঁশপাতার উপর আমাদের কায়েমি বিছানা হয়েছিল। শান্তি-বউদি তাকিয়া দিচ্ছিল মাথায় দেবার জন্য। তাকিয়ার বদলে একটা পাস-বালিশ নিয়ে এলাম—ঐ এক পাশ-বালিসে এদিক-ওদিক মাথা রেখে অনেক লোকের শোওয়া চলে। ছিলাম মন্দ নয় নিশিকান্ত। রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে ডেকে চুপ করত, তখনই উৎসব পড়ে যেত ঘরে ঘরে। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎসব। ছায়ার মতো এক এক জন আমরা ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, দুয়োর খুলে তাড়াতাড়ি আপনজনেরা বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া—আমার দু-বছরের খুকি মাস তিনেকের মধ্যে কোনদিন আমায় দেখতে পায় নি—চারু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে আসত, আমি দু-চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে একটু আদর করে চলে যেতাম। সকাল হবার অনেক আগেই ঢুকতাম আবার বাঁশবনে। বরাবরই যে এখানে ছিলাম, তা নয়। সময় সময় ছোট-লাইন ধরে দূরের কোন স্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপতাম, আবার ফিরে আসতাম। এদিককার কাজের ভার আমাদের উপর, অঞ্চল ছেড়ে পালাবার জো ছিল না। রোজই যে ঘরে এসে খেয়ে যেতে পারতাম, তা নয়। এক-একদিন অচেনা মানুষ দেখা যেত গ্রামে, শাঁখ বেজে উঠত এ বাড়ি-ও বাড়ি। শঙ্খ বাজানো ছিল সঙ্কেত। সে রাতে নিরম্বু উপোস যেত। কাছাকাছি খেজুরবনে ভাঁড় পেতেছে, কিন্তু বেরিয়ে এসে খেজুর-রস খেয়ে যাব, তাতেও বড্ড কড়া রকমের মানা ছিল।

নীলকুঠির অনেক গল্প ঠাকুরমা বলতেন। বউমানুষ নিজে কী-ই বা দেখেছেন—তাঁরও অন্যের মুখে শোনা। একটা তার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে মনে। অপরূপ নাটকীয়তার জন্যই সম্ভবত।

ভদ্রা নদী দেখছ, নিশিকান্ত। স্রোতোহীন নদীর আজকে এমন অবস্থা যে কেউটেফণার ঝাড়গুলোকেও ভাসিয়ে নিতে পারছে না, পাড়ের কাছে বছরের পর বছর জমে এঁটে একশা হয়েছে—দেখলে মনে হবে, উর্বর মাঠের উপর সতেজ সবুজ ফসল ফলে আছে। পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে ঘাট তৈরি

করে নিয়েছে। শেওলা-পচা পাঁক, পা দিলে হাঁটু অবধি ডুবে যায়, পা তোলা মুশকিল হয় তারপর। তাই বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে তার উপর বাখারির চালি ফেলা হয়েছে নদী-বিস্তারের প্রায় সিকি অবধি। বউ-ঝিরা ঐ অতদূরে গিয়ে চালির প্রান্তে বসে বাসন মাজে, কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। স্নানের সময় ছেলেরা লাফিয়ে পড়ে এখান থেকে নদীর গর্ভে।

আজকের এই মজা নদী অতি-দুর্দান্ত ছিল সে আমলে। শীতকালটা ছাড়া ভদ্রার ভদ্র চেহারা দেখা যেত না। নদীর কূলে বিস্তর নীলকুঠি। আউশ ধানের চাষ না করে চাষীরা ক্ষেতে নীলের বীজ ছড়াত। নীলগাছ কেটে নৌকো বোঝাই করে নানা গাঙ-খালের পথে অবশেষে ভদ্রায় এসে পড়ত। সারি সারি দাঁড় বেয়ে অথবা বাদামি রঙের পাল খাটিয়ে যেত নীলখোলার দিকে। পাথরঘাটার ঘাটে এসে তারা নোঙর করত।

পাথর এ অঞ্চলে কোনখানে নেই, ঘাটের নাম তবু পাথরঘাটা। এগিয়ে চল নিশিকান্ত, বাঁকের মুখে কেয়ার ঘন জঙ্গল দেখতে পাবে। পাথরঘাটা বলে জায়গাটাকে। এখন ঘাট নেই, পাথর তো নেই-ই। সে-আমলে নাকি চাটগাঁ-থেকে-আনা পাথর পুঁতে ঘাট চিহ্নিত করা ছিল, দেশবিদেশের ভরা এসে লাগত। এখন গালগল্প বলে মনে হয়।

ঐ সাদা দালান—বুড়ি-মেয়ের কুঠি ওর পুরাণো নাম। আগে খড়ের চালে ঢাকা ছিল। পুরাণো চাল পচে নষ্ট হয়ে যায়। দরজা-জানলা এবং দেয়ালের কোন কোন অংশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মেজেয় হাঁটুভর উলুঘাস জন্মেছিল। তারপর দরজা-জানলা পালটে কড়ি-বরগা বসিয়ে পাকা ছাত হল। বাবলার পিটানি দিয়ে দশ-বারো জনে ছাত পেটাল মাসখানেক ধরে, নদী থেকে শেওলা এনে ঢেকে দিল। এই তো বছর চারেক আগেকার কথা। প্রফুল্লর টাকায় হয়েছে এসব। ঘর মেরামত করে এখানে সে ছোটখাট এক হাসপাতাল করে দিয়েছে। প্রফুল্লর বিধবা বোন হাসি সকাল-বিকাল এসে দেখাশুনা করে। তার সতর্ক পাহারায় ভাল চলছে হাসপাতালের কাজকর্ম—মফঃস্বলের আর-দশটা হাসপাতালের মতো নয়। মোটা থপথপে চেহারা, গলায় সরু হার—হাসিকে দেখতে পাবে আজকের সভায়। হয়তো সভারম্ভে গান গাইতে হবে তাকে। ভাল মেয়ে—বড্ড কোমল মন। দশের কাজে সব সময় সে অগ্রবর্তী।

কত রকম নক্সা খোদাই করা ছিল বুড়ি-মেয়ের কুঠির কবাটে! ময়ূরে সাপ ধরেছে, পালকি চড়ে চলেছে বর, ঘন জঙ্গলে হাতীর পিঠে বন্দুক হাতে শিকারি যাচ্ছে বাঘ মারতে। এ হেন শৌখিন ঘরের উপরে বাঁশের চাল,

বেতের বাঁধন, উলুখড়ে ছাওয়া। চালের আড়া-খাউনিতেই বা কত মূর্তি, বেতের বাঁধনগুলোয় কত রঙের বাহার! পাকা ছাদের অন্তত দশগুণ খরচ হয়েছিল এই চাল বাঁধতে। টুইডির স্ত্রীর ইচ্ছাক্রমেই এই রকম হয়েছিল—স্বামী আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে এই ঘরে তিনি সংসার পেতেছিলেন। টুইডিকে তিনি বলেছিলেন, উলুর ছাউনি দেখতে ভাল আর বেশ ঠাণ্ডা থাকে চোত-বোশেখের দিনেও। গাঁয়ের লোকদের মতো খোড়ো-ঘরে আমরা থাকব।

দালানের পিছনে পাশাপাশি দুটো জামরুলগাছের নিচে সেকেলে কবর-খানা। বুড়ি-মেম অর্থাৎ মিসেস টুইডির কবর ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন। ফেলিশিয়ার কবর কিন্তু অবিকৃত আছে, মর্মর-ফলকের উপর লেখাগুলি সুস্পষ্ট পড়া যায়। টুইডি-দম্পতির বুড়া বয়সের একমাত্র সন্তান ফেলিসিয়া আঠার বছর বয়সে মারা যায়। নীলকমল মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিককার এই নির্জন নদীর ধারে এককালে অনেক ঘুরেছি। তখন কাঁচা বয়স—কবরের লেখা পড়তে পড়তে মন কেমন করে উঠত নিশিকান্ত। সমুদ্র-পারের নীল-নয়না স্বর্ণকেশী এক কিশোরী মায়ের কোলের কাছে শান্ত জামরুল-ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। কত সংঘর্ষের ঢেউ বয়ে গেল বারংবার, ইংরেজের ভুবন-জোড়া সাম্রাজ্য চুরমার হল, ফেলিসিয়া কিন্তু গ্রামপ্রান্তে তেমনি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে বাংলার নীলের খ্যাতি। সাত-সমুদ্র পার হয়ে এক এক দল আসে, নীলের কারবার করে ক'বছরের মধ্যে লাল হয়ে যায়। দেখে শুনে সমুদ্র-পারের দেশে দেশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মধুলোভী মৌমাছির মতো জাহাজের পর জাহাজ আসছে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কুঠি বসতে লাগল।

বাণ্ডিলের দাম চড়ল, চাষীরা দু-পয়সা পাচ্ছে। বীজ সংগ্রহের জন্য কুঠিতে কুঠিতে ঘুরে নিজের গরজেই তারা নীল বোনে। গাছ কাটা হলে গরুর গাড়ি বা নৌকা যোগে নীলখোলায় মাল পৌঁছে দেয়। তৈরি আছে ওজনদার—শিকলে বেঁধে পাল্লায় তুলে সঙ্গে সঙ্গে ওজন হয়ে যায়। মুটেরা নীল বয়ে বয়ে বড় চৌবাচ্চায় ফেলে, কপিকলে কলসি কলসি নদীর জল তুলে গাছ পচান দেয়। নগদ টাকা বাজিয়ে নিয়ে বড়-সাহেব দেওয়ান-গোমস্তা আমিন-তাইদগির সকলকে যথাযোগ্য সেলাম ও প্রণাম করে হাসিমুখে চাষী বাড়ি ফিরে যায় আগামী মরশুমে আবার দেখা হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

তারপর কুঠিয়ালদের টনক নড়ল। পেটে-ভাতে থাকবার জন্য কি এতদূর এসেছে তারা? আইন পাশ করবার কথা হল—একটা কুঠি যেখানে আছে, তার দশ মাইলের মধ্যে নূতন কুঠি বসবে না প্রতিযোগিতার অভাবে তা

হলে বাণ্ডিলের দর পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যত কুঠি বসে গেছে ? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেদিকে খুশি গিয়ে দেখগে নিশিকান্ত, কত কনসার্নের ধ্বংসচিহ্ন। অক্টোপাশের মতো একদা ওরা শতপাকে জড়িয়ে ধরেছিল এ অঞ্চলের গ্রামগুলি।

সব কুঠিয়াল মিলে ঠিক করল, বাণ্ডিল প্রতি চার আনার বেশি দেওয়া হবে না কোন ক্রমে। চাষীরা বিগড়ে গেল তখন—লাভ পড়ে মরুক, এ দরে পড়তা পোষায় না। নীল আর বুনবে না কেউ ক্ষেতে। লাঙল-গরু নিয়ে তারা ধান ও পাটের কারকিতে লেগে যায়। সাদা রং ও রাজার গোষ্ঠী বলে ভয় পায় না। মোরা নীল বুনব না—এই রব সর্বত্র।

এই গণ্ডগোলের মুখে টুইডি সাহেব আমাদের জয়রামপুর কবলা করে নিলেন নামখানার চৌধুরিদের কাছ থেকে। রেজেষ্ট্রি-দলিল আমি নিজের চোখে দেখেছি। হাসপাতাল স্থাপনার সময় কুঠিবাড়ির দখল নিয়ে প্রফুল্লর সঙ্গে চৌধুরিদের মামলা বাধবার উপক্রম হয়েছিল, তখন লারমোর সাহেবের পুরোণো কর্মচারী নকুলেশ্বর গুঁই অনেক খুঁজেপেতে মূল-দলিল বের করে দিয়েছিলেন। সেকেলে গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ভোগদখল করবার স্বত্ব টুইডি সাহেবের। কোথায় সেই টুইডির দল আজকে! বিদায় নেবার দিনে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলের জন্য জমি তাঁরা ইংলণ্ডে তুলে নিয়ে যেতে পারেননি, যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে, ভাঁট আশশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দর জঙ্গলে ঢেকে গেছে। সেই মূল্যবান দলিল এখন মহারাণীর মুখাঙ্কিত কাগজের উপর কতকগুলি দুর্বোধ্য অক্ষরের সমাবেশ মাত্র—নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন, ঐতিহাসিকের হয়তো কিছু কাজে লাগবে স্বাধীন-ভারতের ইতিহাস লিখবার সময়।

গ্রামের মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গে টুইডি আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। একেবারে মাটির মানুষ। চাষীদের বলেন, জমাজমি নিয়ে বসত করছি এখন তোমাদের সঙ্গে, তোমরা যে আমিও সেই। আলাদা করে ফেলে রেখো না বাপু সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে। যে ঝড় আসন্ন হয়েছিল, আপাতত তা স্থগিত হল এইভাবে। গ্রামের কোন বাড়ি বিয়ে-থাওয়া বা ঐ রকম কোন অনুষ্ঠান হলে গৃহকর্তা টুইডির কুঠিতে এসে নিমন্ত্রণ করে যেত। সাহেব বুড়ি-মেমকে নিয়ে বিয়েবাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন, জোলাদের তাঁতে-বোনা শাড়ি আর ফেনি-বাতাসা সাজিয়ে আইবুড়োভাত পাঠাতেন। রথের বাজারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কুমোরের গড়া হাঁড়িবাঁশী কিনে উপহার দিতেন। কোন বাড়ি যাত্রা হলে আসরে উবু হয়ে বসে গান শুনতেন।

গোঁফ-কামানো পরচুল ও ঘাঘরা-পরা সখী নাচতে নাচতে শ্রোতাদের ডিঙিয়ে এসে নাচত সাহেবের সামনে। ঘুরে ঘুরে নাচত, বেহালাদার এগিয়ে আসত সখীর পিছু পিছু। নাছোড়বান্দা। টুইডি মুখ ফেরাতেন হাসতে হাসতে, সখী ঘুরপাক দিয়ে আবার গিয়ে সামনে দাঁড়াত। বেহালায় বোল উঠছে, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—

দাও পয়সা, দাও পয়সা, পয়সা দাও—

টুইডি পয়সা নয়—ঝনাৎ করে আধুলি ফেলে দিতেন মাটিতে। সখী নাচের ভঙ্গিতে তুলে নিত, ঘুরে গিয়ে সেলাম দিত সাহেবকে। সারা রাত্রি জেগে সাহেব যাত্রা শুনতেন, সকালবেলা চোখ লাল করে উঠে যেতেন আসর থেকে।

দয়াবান ছিলেন সাহেব। কেউ কোন মুশকিলে পড়েছে শুনলে ছুটে যেতেন তার বাড়ি। সদরে সাহেব-ডাক্তার ছিল—জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি এবং এ অঞ্চলের গোটা পনের কনসারনের সাহেব-মেমদের তিনি চিকিৎসা করতেন। ঘোড়ার পিঠে এবং কখন কখন পালকিতে ডাক্তারকে দূর-দূরান্তর যেতে হত চিকিৎসা-ব্যাপারে। পাগলা টুইডির কাণ্ড—কতবার তিনি চিঠি লিখে চাষাভুষোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাহেব-ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ঔষধ-পত্র দিতেন, টুইডির নামে হিসাব লেখা থাকত। চৈত্রমাসে সালতামামির মুখে টুইডি নিজে গিয়ে সমস্ত হিসাব মিটিয়ে আসতেন।

ফেলিসিয়া বুড়া বয়সের দুলালী। দু-তিনটা ছেলেমেয়ে শৈশব অবস্থায় মারা গিয়েছিল—ফেলিসিয়াকে তাঁরা তাই চোখে হারাতেন। এই পাড়াগাঁয়ের মধ্যেও মেয়ের গান-বাজনার লেখাপড়া ঘোড়ায়-চড়া—কোন ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নি। বাংলা পড়াবার জন্য আগরহাটি থানার দারোগার সুপারিশক্রমে পীতাম্বর চাটুজ্জেকে নিযুক্ত করলেন। পীতাম্বর পাঠশালার পণ্ডিতি করতেন, বুড়ো হয়ে আর পেরে উঠছিলেন না, এমনি সময়ে অভাবিত ভাবে নীলকুঠির কাজটা পেয়ে গেলেন। পণ্ডিতের সহজ সারল্যে টুইডি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন চাটুজ্জে পরিবারের উৎকট ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বেও। মেয়েও কতকটা বাপ-মায়ের স্বভাব পেয়েছিল, গ্রামের লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় করত। প্রায়ই সে চাটুজ্জে-বাড়ি বেড়াতে যেত, পীতাম্বরের ছোট মেয়ে দুর্গার সঙ্গে তার বড় ভাব। শাড়ি পরে খালি পায়ে যথাসম্ভব দেশী সাজসজ্জা করে বেরুত সে এই সময়টা। পীতাম্বরের বউ সারদা সাগ্রহে তাকে আহ্বান করতেন। তবু ফেলিসিয়া দালানে উঠত না, উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত। দুর্গা ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে দু-জনে ঢেঁকিশালে কিংবা পুকুর-ঘাটে গিয়ে গল্প-গুজব করত। ফেলিসিয়া বাংলা বুঝত, বলতেও শিখেছিল

মোটামুটি। এমনি সারদার এত বাছবিচার, কিন্তু ফেলিসিয়ার সম্পর্কে কড়াকড়ি ছিল না। বলতেন, আর-জন্মে ফেলিসিয়া ভাল বামুনের মেয়ে ছিল, কপাল-দোষে ম্লেচ্ছ-ঘরে জন্মালেও আচারে-বিচারে পূর্বজন্মের ছাপ রয়ে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও নরম তরিবৎ দেখেই তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু লোকে বলাবলি করত, ভাত জুটছে টুইডির দয়ায়—তাঁর মেয়ের ম্লেচ্ছদোষ খণ্ডে যাবে, এ আর বেশি কথা কি!

দুর্গা ফেলিসিয়ার চেয়ে তিন বছরের বড়। সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে এটি, পীতাম্বর শখ করে কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছেন, শুভঙ্করী এবং সমগ্র পাটিগণিতখানা শেষ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের কোন উপায় করা যাচ্ছে না। বড় দু'টিকে অনেক কষ্টে পার করা গেছে, এখন এইটিতেই এসে ঠেকেছে। নৈকষ্যকুলীন বংশ—পালটি ঘর খুঁজে পাত্রস্থ করা সোজা নয়। সেরকম সঙ্গতি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। এর উপর আর-এক উপসর্গ—মা হয়ে সারদাই অসুবিধা ঘটাচ্ছেন সব চেয়ে বেশি। অতবড় মেয়ে আইবুড় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—পীতাম্বরের মুখের হাসি চোখের ঘুম ঘুচে যাবার উপক্রম, কিন্তু সারদা ধনুকভাঙা পণ করে আছেন, যে সে ঘরে তিনি মেয়ে দিতে দেবেন না।

একটা পাত্র হাতের কাছে আছে—উত্তরপাড়ার কেশব। কুলশীল গাঁইগোত্র মেলপ্রবর খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হয়তো নয়, কিন্তু একটা বড় সুবিধা এই যে মাথার উপর অভিভাবক না থাকায় টাকা-পয়সা নিয়ে দরদস্তুর হবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এরই উপর ভরসা করে পীতাম্বর আগে তেমন চাড় করেন নি। স্বচ্ছন্দে মেয়ে এত বড় হয়েছে। ছেলেবয়সে তাঁর পাঠশালায় পড়েছে। একটা ক্ষমতা ছিল—সে বিষম মার খেতে পারত। পীতাম্বর হরদম পিটাতেন। বেতের চোটে কালসিটে পড়ে গিয়েছিল, নিরিখ করে দেখলে এত কাল পরেও অস্পষ্ট দাগ মিলতে পারে। পিঠ কেটে চৌচির হয়ে যেত, তবু দশমিক ভগ্নাংশ কিছুতেই তার মাথায় ঢুকত না। কায়ক্লেশে বছর তিন-চার কাটিয়ে অবশেষে পীতাম্বরের দাপটেই পড়াশুনায় তাকে ইস্তফা দিতে হল।

তবু কেশব সুশীল ছেলে—এত মার খাওয়া সত্ত্বেও পীতাম্বরকে সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বয়সের সঙ্গে ভক্তি বেড়েছে আরও। নানা কাজকর্মে পীতাম্বরের বাড়ি আসে। সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে পীতাম্বর সুপ্রাচীন দোতলার জীর্ণ-ঝুল-বারান্দার প্রান্তে মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়েন, ঘরের ভিতর মিটি-মিটি রেড়ির তেলের দীপ জ্বলে। প্রদীপ উসকে দিয়ে কেশব অভিনিবিষ্ট হয়ে শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষে। মাঝে মাঝে পীতাম্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তন্দ্রার ঘোরে

পীতাম্বর যা-হোক একরকম জবাব দিয়ে যান। এ নিয়েও কথা উঠেছে পাড়ার মধ্যে।

হেঁ-হে, আসে কি আর পীতাম্বর পণ্ডিতের কাছে ?

সারদা বিরক্ত। বলেন, কি জন্য আসে যখন-তখন ? মেয়ে বড় হয়েছে, মানা করে দিও।

পীতাম্বর বলেন, দশমিক ভগ্নাংশ বুঝে নিতে আসে। এদ্দিনে মনে ঘেন্না হয়েছে। দুগ্‌গার সঙ্গে দশমিক নিয়ে আলোচনা করে, লক্ষ্য করে দেখেছি।

সারদা বলেন, থাক তো তুমি চোখ বুজে। কি করে দেখ ?

পীতাম্বর তিলমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেন, চোখে না দেখি, কান আমার খাড়া থাকে। যা ওরা বলাবলি করে, সমস্ত কেবল পাটীগণিতের কথা।

অবশেষে একদিন মনের অভিপ্রায় সসঙ্কোচে তিনি সারদার কাছে ব্যক্ত করলেন।

কি রকম হয় তা হলে ?

সারদা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে ? বরং আমি মেয়ের হাত-পা বেঁধে ভদ্রার জলে ফেলে দেব। গাঁজা-গুলি খেয়ে বেড়ায়—ঠাউরেছ চমৎকার !

কেশব গাঁজা-গুলি খায়, এর কোন প্রমাণ নেই। তামাকটা অবশ্য খায় খুব। কিন্তু গুরু স্থানীয়দের বিশেষ সমীহ করে; পীতাম্বর বা সারদা এতটুকু বেচাল কোন দিন দেখতে পান নি। বর্ষার সময় একদিন সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি-বাদলা বড় চেপে পড়ল। চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে উত্তরপাড়া ক্রোশখানেক হবে। পীতাম্বর প্রস্তাব করলেন, কি হবে বাবা এই ভন্নার মধ্যে বাড়ি গিয়ে ? খিচুড়ি খেয়ে বৈঠকখানার ফরাসে আমার পাশে পড়ে থাক। তোর মাকে বল দুগ্‌গা, চাদর পেতে ছোট মশারিটা খাটিয়ে দিয়ে যেতে।

কেশবের ইচ্ছা নয়, পণ্ডিতমশায়ের পাশে ঐ ভাবে টনটনে হয়ে পড়ে থাকা। কিন্তু উপায় নেই তা ছাড়া। অবিশ্রান্ত জল হচ্ছে।

পীতাম্বরের ঘন ঘন তামাক খাওয়া অভ্যাস! গন্ধকের কাঠি আর আগুনের মালসা সাজানো থাকে তাঁর শয্যার পাশে—অনেক রাত্রে উঠে প্রদীপ ধরিয়ে তিনি তামাকে সাজাতে বসলেন। আলো চোখে পড়ে কেশবেরও ঘুম ভেঙেছে। মশারির ভিতর থেকে লোলুপ চোখে দেখছে, পরম আরামে পীতাম্বর মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করে চলেছেন। দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, মশা ঢুকেছে নাকি বাবা ?

আজ্ঞে না।

বাঁ-হাতের থাবা দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশব অনুভব করল, হুঁকো তার গায়ে ঠেকেছে। বিবেচনা আছে পণ্ডিত-মশায়ের। আলো নিভিয়ে ইজ্জত অক্ষুণ্ণ রেখে মশারি উঁচু করে ছাত্রের দিকে হুঁকো এগিয়ে ধরেছেন। কেশবের বড় ইচ্ছা করে, অন্ধকারে তখনই একবার পীতাম্বরের পায়ের ধুলো নেয়।

রাতের মধ্যে আরও তিন-চার বার এই রকম চলল। প্রত্যেক বারই পণ্ডিত মশায়ের প্রসাদী তামাক নির্ঝঞ্ঝাটে মুখের কাছে এসে পৌঁচেছে।

সকালবেলা সারদা বিছানা তুলতে এসে দেখলেন, নূতন মশারির তিন-চার জায়গায় পুড়ে গোলাকার ছিদ্র হয়েছে। আয়েস করে টানতে টানতে জ্বলন্ত টিকের কুচি পড়ে গেছে, ঘুমের ঘোরে কেশব টের পায় নি। পীতাম্বরের উপর তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, খবরদার বলছি—কখনো তুমি আস্কারা দেবে না, গেঁজেল ছোঁড়াটাকে। কোনদিন সে যেন আর এ বাড়িমুখো না হয়।

গ্রহ এমনি, একটু পরেই কেশব মুখোমুখি পড়ে গেল। সারদা বললেন, দুগ্‌গা ছোটটি নেই—কেন বাছা তুমি এত আসা-যাওয়া কর? আর এস না —খবরদার।

সারদা বেঁকে বসেছেন, পাহাড় নড়ে তো তাঁকে নাড়ানো যাবে না। অগত্যা কেশবের আশা ছেড়ে দিয়ে পীতাম্বর একদিন মহিষখোলায় সম্বন্ধ দেখতে গেলেন।

নীলখোলায় বড় ভিড়। প্রজারা দরবার করতে এসেছে। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে কেশবও ঐ দলের মধ্যে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বিষম গরম। খালি-গা টুইডি সাহেব ডাবের জল খেতে খেতে যে যা বলছে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। বাণ্ডিলের দাম বাড়িয়ে দেবার কথায় আঁতকে উঠলেন তিনি। সর্বনাশ, জাত-ভায়েরা তা হলে একঘরে করবে আমাকে। এমনই কত কি বলাবলি করে! দর বাড়ানো একলা আমার ইচ্ছেয় হবে না। যেখানে যত কুঠি আছে সকলকে নিয়ে টান পড়বে, সকলের মত দরকার।

ব্যাপার তাই বটে। দেশের অবস্থা খুব খাপাপ হয়ে পড়েছে। নীল-চাষে রায়তদের বিতৃষ্ণা। কুঠিয়ালেরা কৌশল ও জবরদস্তি করে নীল বুনতে বাধ্য করাচ্ছে, তার ফলে কয়েক জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়ে গেছে। জয়রামপুর এলাকায় কোন গোলযোগ ঘটে নি। পাগলা বলে টুইডির সম্পর্কে প্লান্টার-সমাজের অবজ্ঞা আছে, দেশি লোকের সঙ্গে এত মেলামেশা সাহেবরা ভাল চোখে

দেখে না। এখন দেখা যাচ্ছে, তাঁর কোম্পানির কুঠিগুলোই মোটের উপর ভাল চলছে। তবে ঢেউ আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার পরিচয় চাষীদের এই দরবার করতে আসা।

টুইডি কোমল কণ্ঠে বললেন, ও কথা থাক। দশের ব্যাপার—আমার একলার কিছু করবার নেই। তোমরা এসেছ আমার কাছে—তোমাদের কার কি অসুবিধা হচ্ছে, তাই বল। গেল-বর্ষায় সারা জেলায় কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল, জয়রামপুরে কারো বাড়ি একবেলার জন্যেও উনুন নিভে থাকেনি। এবারও সেই রকম হবে। বলে ফেল, কে কি চাও।

অপ্রতিভ হয়ে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সত্যিই তো, কত জনে কত দিন সাহেবের দাক্ষিণ্য মুঠো ভরে নিয়ে গেছে। হাত পাতলেই টাকা—তখন এ ভাবে দল বেঁধে টুইডির মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো উচিত হয়নি।

পীতাম্বর ফেলিসিয়াকে পড়িয়ে ফিরছিলেন। ভিড় দেখে কৌতুহলী হয়ে দাঁড়ালেন। টুইডির নজর পড়ল, ডাক দিলেন, শোন পণ্ডিত—

সকলের সব ব্যাপারে সাহেবের আগ্রহ। কিংবা হয়তো চাষীদের কথাবার্তা থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন। বললেন, কি হল—সেই যে কোথায় সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলে?

দুগ্‌গাকে সোমবারে দেখতে আসবে।

টুইডি পাত্রপক্ষের পরিচয় নিতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কেশব ইতিমধ্যে চলে গেছে। আর সকলেও দুয়ে-একে ক্রমশ চলল। তাদের গমনপথের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে টুইডি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লোক মহিষখোলার তারা? অবস্থা কেমন?

পীতাম্বর বলতে লাগলেন, তালুক-মুলুক আছে। চক-মিলানো বাড়ি। চার ভাই, এটি হল মেজো—

তারপর উচ্ছ্বাস থামিয়ে বললেন, মেয়ে যদি পছন্দ হয় আর দাবিদাওয়ায় না আটকায়, কাজটা হয়ে যেতে পারে।

টুইডি বললেন, আমায় নিমন্ত্রণ করে যাও পণ্ডিত, আমি থাকবো মেয়ে-দেখানোর সময়। পছন্দ যাতে করে আর দাবিদাওয়ার জন্য না আটকায়—সে ভার আমার উপর।

কি ভেবে বললেন, কে জানে! যথাসময়ে গিয়ে সাহেব পীতাম্বরের বৈঠকখানায় ফরশা চাদর-পাতা ফরাসের উপর চেপে বসলেন। কুঠি থেকে তাঁর ফুরসিটা আনা হয়েছে, তামাক টানছেন আর আলাপ জমানোর চেষ্টা করছেন পাত্রপক্ষীয়দের সঙ্গে। জুত হচ্ছে না, তারা সসঙ্কোচে একপাশে চুপচাপ

বসে আছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে নিতান্ত না বললে নয় এমনি দুটো-একটা কথার জবাব দিচ্ছে।

উঁকি দিয়ে এক নজর দেখে সারদা পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঝাঁক বেঁধে এসেছে যে। অতগুলো কারা?

বরের খুড়ো এসেছেন, ছোটভাই এসেছে। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ক'জন আছেন। তার উপর পুরুতঠাকুর, সেরেস্তার লোক একটি···জমিদারি ঠসক, বুঝলে না?

সারদা বললেন, যাই বল, বরকে আমি একটু দেখতে পারি—তার ব্যবস্থা কর। তোমায় বিশ্বাস নেই, তারার বেলা যা হয়েছিল, তা আমি কখনো হতে দেব না।

তারা হল বড় মেয়ে। বিয়ের দশ-বারো বছর পরে হাঁপানি রোগ হয়েছে বড় জামাইটির। সারদা বলেন, রোগ পূর্বাবধি ছিল, পীতাম্বর অবহেলা করে বিয়ের আগে যথেষ্ট খোঁজখবর নেননি।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পীতাম্বর বললেন, তা হলে চল মহিষখোলার বাড়ি। কি বৃত্তান্ত? না শাশুড়ি এসেছেন হবু-জামাই পছন্দ করতে।

সারদা রাগ করে বলেন, যাবার কথা বলছি নাকি আমি? কিন্তু তুমি যে, যাকে সামনে পাবে, ধরে এনে তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দেবে—সে আমি আর হতে দিচ্ছি নে।

পীতাম্বর বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, মহিষখোলার গাঙ্গুলি—তারা যে সে মানুষ হল? ফটকের পাশে আগে হাতী বাঁধা থাকত। পিলখানা রয়েছে এখনো। তেমহলায় থাকে, মোণ্ডামিঠাই খায়, সোনাদানা পরে, রোগপীড়া সে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে না। বর না হল, বরের ছোটভাইকে দেখে নাও। দুই ভাই প্রায় এক রকম। ওর থেকে আন্দাজ করতে পারবে।

সারদা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌টি বল তো?

কোঁকড়া চুল, গলায় সোনার হার, গরদের পিরান গায়ে দিয়ে এসেছে—

উৎসাহের আতিশয্যে সারদা বৈঠকখানার কানাচে চললেন। পাতিনেবুর ডাল সরিয়ে সন্তর্পণে জানলার ফাঁকে স্বামীর বর্ণনার মতো দেখলেন বরের ছোটভাইকে।

পীতাম্বর তখন বৈঠকখানায় আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন। আবার তাঁকে ডাকিয়ে আনলেন। মুখ কালো করে বললেন, অত আর খোশামুদি করতে হবে না। সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

পীতাম্বর আকাশ থেকে পড়লেন।

হল কি হঠাৎ?

সারদা বললেন, ঐ যদি ছোটভাই হয়, পাত্রের বয়স তবে তো তোমার কাছাকাছি হবে। বুড়োর সঙ্গে দুগ্‌গার বিয়ে দেব না।

পীতাম্বর বোঝাবার চেষ্টা করেন, বড়মানুষ—টাকার আণ্ডিলের উপর বসে রয়েছে, দেদার খাচ্ছে, তাই ঐ রকম মুটিয়ে গিয়েছে। দূর থেকে দেখেছ, বয়সের আন্দাজ করতে পার নি!

সারদা ঘাড় নেড়ে আরও প্রবল কণ্ঠে বলেন, কালোর গুষ্টি ওরা। ভাইকে দেখলাম, খুড়োকেও দেখলাম। হাতির মতো মোটা, হাঁড়ির তলার মতো কালো—মেয়ে আমার ভয়েই মারা পড়বে ওদের বাড়ি গেলে।

ভবতারিণী পীতাম্বরের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় বোন—এই বাড়িরই লাগোয়া ভাইপোর সংসারে থাকেন। তিনি এসেছেন। সারদার কথায় তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

এ কি আধিক্যেতা বউ? মেয়ে যতক্ষণ ঘাড়ের উপর, অমন কথা কখনো মুখে আনবি নে, খবরদার। একটু গায়ে-গতরে হবে না তো কি পাকাটির মতো জামাই করতে চাস? রং কালো তো বয়ে গেল—ছেলে কালো আর ধান কালো!

বাড়িসুদ্ধ সবাই বিপক্ষে, প্রাণপণে বোঝাতে চাচ্ছে। তখন সারদা মেয়ে নিয়ে দোতলার কুঠুরিতে খিল এঁটে দিলেন।

পীতাম্বর ব্যাকুল হয়ে দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছেন।

কী পাগলামি করছ, ভদ্রলোকেরা কি মনে করবেন বল তো? বিয়ে ওখানে না দিতে চাও, মেয়ে দেখতে দিলে ক্ষতিটা কি?

অনুরোধ ঝগড়াঝাটি—কোন রকমে দরজা খোলানো গেল না? বিষম একগুঁয়ে সারদা—কেউ তাঁকে বাগ মানাতে পারে না। পীতম্বর তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বৈঠকখানায় এসে বললেন, মেয়ে হঠাৎ কেন জানি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, জল ঢালাঢালি হচ্ছে, কখন সেরে উঠবে ঠিক নেই। নিজ-গুণে মাপ করে নেবেন আপনারা।

ভদ্রলোকদের সামনে ঠাস-ঠাস করে পণ্ডিত নিজের গাল চড়াতে লাগলেন।

নৌকা যাচ্ছে ভাঁটার টানে মন্থরগতিতে। একখানা একেবারে ঘাটের কাছে এসে পড়েছে, ছপ-ছপ করে বোঠে বাইছে—বোঠের জলের ছিটে

লাগল দুর্গার গায়ে। পিছন ফিরে কুটুম্বদের এঁটো-বাসন মাজছিল, রাগ করে সে মুখ ঘোরাল। তখন আর রাগ রইল না, হাসির আভা মুখের উপর। ডিঙির মাথায় কেশব মাঝি হয়ে বসেছে, নীলের ভরা নিয়ে যাচ্ছে।

দশমিক ছেড়ে হাল হাতে নিয়েছ? ঠিক হয়েছে, যাকে যা মানায়!

কেশব হেসে বলে, পণ্ডিতমশায় বরাবর বলতেন, গোবর-পোরা মাথা—. চাষার ঘরে জন্মালি নে কেন হতভাগা? গুরুজনের ইচ্ছে—বামুনের ঘরে জন্মেও শেষ পর্যন্ত সেই চাষা হতে হল।

ভ্রূ কুঁচকে দুর্গা বলে, ধরলে কিনা নীলের চাষ!

কেশব বলে, হাঙ্গামা কম, খদ্দেরের জন্য ভাবতে হয় না। দুটো পেট আমাদের—বেশ চলে যায়। দরবার করে ফল হয়েছে, বাণ্ডিলের দর বেড়ে যাবে শুনছি টুইডির চেষ্টায়।

তারপর দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে সহসা জিজ্ঞাসা করল, তুই যে এখানে! ছেড়ে দিল এর মধ্যে?

প্রশ্ন কানে না গিয়ে দুর্গা বলল, নীলখোলায় যাচ্ছ—তা উজান বেয়ে মরছ কেন এদ্দূর উল্টো এসে?

কেশব বলে, যাচ্ছি—ধীরেসুস্থে গিয়ে পৌঁছব। এই ক'টি মাল মোটে—সন্ধ্যের মধ্যে গিয়ে ওজন ধরিয়ে দিলেই হল। কাজ চাই তো একটা—কি করি বসে বসে সমস্ত বিকালবেলা! বোঠে বেয়ে বেয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছি।

আবার প্রশ্ন করে, কুটুম্বরা চলে গেছে? সাজগোজ করিস নি, চুল বাঁধিস নি, কপালে সিঁদুরের টিপও দিস নি—

মুখ টিপে হেসে দুর্গা বলে, সাজগোজের দরকার হল না। এমনিতেই পছন্দ করে গেছে।

বলিস কি?

চারিদিক দেখে নিয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুর্গা বলল, তাই তো বলল। খু—উ—ব পছন্দ ওদের।

বকিস নে। দুর্গার মুখের উপর আবার একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে কেশব বলল, কি আছে তোর চেহারায় পছন্দ করবার?

আচ্ছা, দেখতে পাবে এই শ্রাবণে—

আশ্চর্য হয়ে কেশব বলে, আমার মতো গাধা আরও আছে তা হলে দুনিয়ায়?

গাধা নয়, মহিষ। বলতে বলতে দুর্গা হেসে ফেলল। বলে, মা বলছিল, মহিষখোলা থেকে একদল মহিষ নেমতন্ন করে এনেছেন বাবা। কালো কুঁদ আর এই মোটা—

মুখভঙ্গি করে দু-হাতে দুর্গা স্থূলত্বের যে পরিমাণ দেখাল, তাতে হো-হো করে হেসে ওঠে কেশব। বলে, তাই—আসবে দেখিস ঐ রকম সব দু-পেয়ে জন্তু-জানোয়ার। এ জন্মে কলাতলায় তোকে যেতে হবে না, এই একটা কথা বলে দিলাম।

আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, মশারি পুড়িয়ে দিয়েছি—ভাল মুখে বললেই হত, একখানার জায়গায় দু-খানা আমি কিনে দিতাম। তা নয়—বাড়ি ঢুকতে মানা হয়ে গেল। মনে বড্ড দাগা দিয়েছেন সত্যি তোর মা।

পরদিন পীতাম্বর কুঠিতে গেলে টুইডি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে কেমন আছে পণ্ডিত? সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলে ঐ রকম ফিট হয়ে পড়া ভাল কথা নয়। আমি বরং চিঠি লিখে দিচ্ছি ডাক্তার টমসনের কাছে, মেয়েকে একদিন সদরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনো।

একটু ইতস্তত করে অবশেষে পীতাম্বর সমস্ত খুলে বললেন। দুঃখিত স্বরে বললেন, আমি দেখছি সাহেব, বিয়ে দুর্গার অদৃষ্টে নেই। সর্বাংশে সুন্দর পাত্র আমাদের মতো অবস্থার লোকে কেমন করে যোগাড় করবে?

টুইডি হেসে আকুল। সরল প্রাণখোলা হাসি। বলেন, ফরসা ছেলে না হলে পছন্দ নয় তোমার স্ত্রীর? আমাদের হেলির সঙ্গে হয় তো বল। বরকর্তা হয়ে জাঁকিয়ে বসে একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি। আমার গায়ের রং দেখে নিশ্চয় দুয়ারে খিল এঁটে দেবেন না তোমার স্ত্রী।

একটুখানি থেমে বলেন, সে তো হবার জো নেই। তোমাদের পালটি ঘর নয়—রং পছন্দ হলেও কুলে শীলে মিলবে না যে!

ডেনিস হেলি টুইডির ভাগিনেয় সম্পর্কীয়। ছোকরা মানুষ—ভারি তুখড়, আগরহাটি কনসারনের ম্যানেজার। প্রতি রবিবার সকালবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসে জয়রামপুরের গির্জায় প্রার্থনা করতে। সমস্ত দিন থেকে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। মাছ-ধরার শখ আছে, ছিপ নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে। ফেলিসিয়া উপকরণ যোগাড় করে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে, তারপর এক সময়ে ছায়ার মতো বসে পড়ে তার পাশটিতে। চারের মাছ পালিয়ে যাবে সেজন্য কথাবার্তা বলবার উপায় নেই। একবার সজোরে ছিপে টান দিয়ে ব্যর্থতার লজ্জায় হেলি যখন ফেলিসার দিকে তাকাত, ফেলিসিয়া তখনও একটা কথা বলত না, দেখা যেত তার চোখ দুটো হাসছে শুধু। শীতকালের দুপুরে মাছ ধরতে না বসে কখন কখন তারা দু-জনে দুই বন্দুক নিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে পাখি শিকার করে বেড়াত। গ্রামের মধ্যে গিয়ে পীতাম্বর পণ্ডিতের হুড়কোর ধারে গিয়ে দাঁড়াত হয়তো কোন দিন। পীতাম্বর সসম্ভ্রমে ডেকে বসাতেন, ডাব

আর খেজুর-চিনি খেতে দিতেন। এমনি করে হেলির সঙ্গেও পীতাম্বর-পরিবারের জানাশোনা হয়েছিল।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই সময়ে এক বিপর্যয় ঘটল, নিশিকান্ত। ওলাউঠায় ফেলিসিয়া মারা গেল। টুইডি এর পর বেঁচে রইলেন বটে—কিন্তু কাজকর্ম দেখেন না, ঘর থেকে বেরোনই না মোটে। ষাট বৎসর বয়স, দেহ এতটুকু বাঁকাতে পারে নি, কুঠিবাড়ির ঐ প্রাচীন দেবদারুগাছটির মতোই বরাবর তিনি খাড়া ছিলেন। দুর্ঘটনার পর সেই মানুষ রাতারাতি অথর্ব বুড়ো হয়ে পড়লেন।

আগরহাটি থেকে হেলিকে নিয়ে এসে টুইডি জয়রামপুরের সদর-কুঠিতে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। আর কিছুদিন পরে এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি জাহাজে চড়লেন, ছায়াচ্ছন্ন জামরুল তলায় ভদ্রার কূলে আদরের মেয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা দুটো করে ক্রমশ সকল নীলকুঠির এলাকায় গোলযোগ প্রবল হয়ে উঠল। অশান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে জয়রামপুরেও। টুইডি তাঁর সহৃদয়তার বাঁধ দিয়ে এতদিন আন্দোলন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি চলে যাবার পর হেলির পক্ষে সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বয়স কম হেলির—কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপ। টুইডির আমলের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আগাগোড়া উল্টে গেছে। কতকটা কোম্পানির ইচ্ছায় কতকটা হেলির নিজের বুদ্ধিতে। বুড়ো টুইডির যে-কোন ব্যবস্থা ইণ্ডিগো-কোম্পানি চোখ বুজে অনুমোদন করত, হেলির আমলে সেটা আর সম্ভব নয়। প্রজারা হাত পাতলেই আর টাকা পায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়, নায়েব-গোমস্তার তোয়াজ করতে হয়, বাজে-খরচও করতে হয় প্রচুর। আর দেখা গেল, টুইডি সাহেব যত সদাশয়ই হোন, যাকে যা দিয়েছেন সমস্ত পাকা-খাতায় লেখা রয়েছে, সিকি পয়সার হেরফের হয় নি।

হেলি মারমুখি হয়ে বলে, কোম্পানির টাকা দাদন নিয়ে বসে আছে—চালাকি নাকি? না পোষায় টাকাকড়ি শোধ করে জায়গা-জমি ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ছেড়ে সব চলে যাক। নিজে-আবাদি চাষ করব, ওদের ভিটের উপর নীল বুনব আমি।

পীতাম্বরের সম্পর্কে অনুগ্রহ পূর্বাবর বজায় আছে। টুইডি কিছু বলে গিয়েছিলেন কিনা কে জানে—হেলি একদিন কুঠির তাইদগিরকে দিয়ে পণ্ডিতকে ডেকে পাঠাল।

দেখতে পাওয়া যায় না পণ্ডিতমশায়কে। কেনই বা আসবেন—যাকে পড়াতে আসতেন, সেই যখন চলে গেল।

হেলির গলার স্বর ভারি। কি লিখছিল—মিনিটখানেক খস-খস-করে লিখে চলল। তারপর মুখ তুলে পীতাম্বরের দিকে চেয়ে বলল, ফেলিসিয়ার শিক্ষক আপনি। আঙ্কলের প্রতিশ্রুতি আমি বর্ণে বর্ণে পালন করব। মেয়ের বিয়ের যোগাড়ে লেগে যান, কোন রকম ভাবনা করবেন না।

পীতাম্বর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে কুঠি থেকে ফিরলেন। এমন সদাশয় আশ্রিত-প্রতিপালকদের বিরুদ্ধে লোকে জোট বাঁধছে! ভদ্রসন্তানরাও নাকি জুটছে পিছনে। একটিকে তো দেখেছেন তিনি—কেশব টুইডির কাছে দরবার করতে এসেছিল চাষাভুষোর সঙ্গে। এরাই সব পরামর্শ দেয়, খবরের কাগজে চিঠি ছাপায়। এদের আশকারা পেয়েই তো সাহেবের চোখরাঙানিতে ভয় পায় না আর রায়তেরা। শোনা যাচ্ছে, সদরে অনেক দরখাস্ত পড়েছে কুঠিয়ালদের নামে। কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, আবার জলেও বাস করবে—দুটো একসঙ্গে কি করে চলবে, সে ঐ মন্ত্রণাদাতা বুদ্ধিমন্তর দল জানে!—

হেলির কাছ থেকে স্পষ্ট ভরসা পেয়ে পীতাম্বর আবার নব উদ্যমে পাত্র খুঁজতে লাগলেন! নিশ্চেষ্ট কোন দিনই ছিলেন না! এখন সারদা গত হয়েছেন—যে সম্বন্ধই আসুন, তা নিয়ে খুঁত-খুঁত করবার মানুষ নেই। অনেক দেখে শুনে বড়-আশা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের সংস্থান আছে, এমনি যেমন-তেমন একটা পাত্র জুটলেই কন্যাদায়ের পাথর গলা থেকে নামিয়ে রেহাই পান। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। আগে হয়নি সারদার জন্য, এখন যে কার জন্য—কে এমন সজাগ সতর্ক থেকে শত্রুতা সাধছে, সঠিক সেটা ধরা যাচ্ছে না। ধরতে পারলে পীতাম্বর পণ্ডিত তার কাঁচা মুণ্ডু চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন।

প্রায়ই কুটুম্ব আসছে দুর্গাকে দেখতে। এসে খেয়েদেয়ে রকমারি ভদ্রতার কথা বলে চলে যায়। এর জন্য এতদিনে যা খরচপত্র হল, তাতে বোধকরি তিন-চারটে মেয়ে পার হতে পারে। ঘুরে ফিরে কেশবের কথাও উঠেছিল, কিন্তু এখন পীতাম্বরই সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আগরহাটি থানার দারোগা মধুসূদন সরকার—পীতাম্বরের পুরুষানুক্রমিক শিষ্য। বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তিনি পীতাম্বরকে। কুঠিয়ালদের সঙ্গে মধুসূদনের খুব দহরম-মহরম, কাজের গরজেই পরস্পর খাতির জমেছে। তিনি অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ করলেন কেশবের সম্বন্ধে। অত্যন্ত ভয়ানক কথা, লাঠি-সোঁটা ঢাল-শড়কির ব্যাপার। শুনে পীতাম্বর শতহস্ত পিছিয়ে এলেন। সে যাক গে—যে পাতে খাওয়া হবে না, তা কুকুরে চাটুক। মোটের উপর আরও তিন বছরের অবিরত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কিছু সুবিধা হচ্ছে না। এক হতে পারে, বয়স বেড়ে যাওয়ার দরুন

দুর্গার চেহারায় লালিত্য নষ্ট হয়েছে। অন্য কারণও আছে বলে পীতাম্বরের প্রবল সন্দেহ। কিন্তু সেটার ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না কোন রকমে।

দুধপুকুরের রায়-বাড়িতে কথাবার্তা চলছে। ঘনশ্যাম রায় মেয়ে দেখতে রওনা হবেন, এমনি সময় উড়োচিঠি এসে উপস্থিত। অচেনা কে-একজন হাটুরে মানুষের হাতে এই চিঠি দিয়ে রায়বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছে। লিখেছে —ভাল মেয়ে নয়। কুঠির সাহেব অঢেল টাকা খরচ করতে রাজি এই মেয়ের বিয়ের—তবু যে বিয়ে হচ্ছে না, ভিতরে 'কিন্তু' আছে বলেই।

চিঠিটা হাতে করে ঘনশ্যাম স্ত্রীর কাছে এলেন।

কাণ্ড দেখ। কত রকমের শত্রুতা মানুষ যে করে!

গিন্নি বললেন, সত্যিও তো হতে পারে? আমাদের অত কি মাথাব্যথা— মেয়ের কিছু মন্বন্তর হয়নি। বেরুচ্ছ—বেশ তো, ওখানে না গিয়ে কাশিমপুরে পাকাপাকি করে এসোগে।

দিন চার-পাঁচের মধ্যেও ঘনশ্যামের সাড়াশব্দ মিলল না, তখন পীতাম্বর নিজে চলে এলেন ভাইপো সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে।

খবর কি রায়মশায়?

বড় লজ্জিত আছি ভায়া। কাশিমপুরের ওঁরা এসে পড়েছিলেন। আর গিন্নিরও একান্ত ইচ্ছে—ওঁর মামার বাড়ির সম্বন্ধের মধ্যে পড়ে যায় কিনা! ঐখানে দিনক্ষণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

রাস্তায় এসে পীতাম্বর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

ছোটলোক—পাজির পা-ঝাড়া। বাঁদর নাচাচ্ছে যেন বেটারা আমায় নিয়ে এই তিন বচ্ছর। বুড়োমানুষ বলে দয়ামায়া নেই। কথাবার্তা ঠিকঠাক— তার মধ্যে কাশিমপুর হঠাৎ এসে পড়ল কি করে?

সুখময় একটু ভেবে বলে, কেউ ভাঙচি দিয়েছে কিনা দেখুন।

হুঁ—আমিও ছাড়ছি নে। চল থানায়।

সুখময় বিস্মিত হয়ে বলে, থানায় কি হবে?

মধুসূদনের কাছে—

সুখময় বলে, এই দেখুন—মশা মারতে কামান দাগা বলে একে। দারোগা-পুলিস না করে গাঁয়ের দশজনের সামনে আচ্ছা করে দুটো দাবড়ি দিয়ে দিন যার উপর আপনার সন্দেহ হয়।

সন্দেহ কাকে করি, কেউ আমার শত্রু নয়—

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভিজে ওঠে। বললেন, কারো কোন ক্ষতি করিনি জীবনে—কেন যে লোকে পিছনে লাগে! থানায় যাচ্ছি বাবা এজাহার

দিতে নয়। মরে গেলেও ওসব তালে যাব না। খুব এক ভাল সম্বন্ধ—কাল মধুসূদন খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

সম্বন্ধ আগরহাটি কনসারনের নায়েব পশুপতি চক্রবর্তীর সঙ্গে। পদবী নায়েব বটে, আসলে ম্যানেজার সে-ই। বুদ্ধিমান কর্মঠ যুবা, হেলির অত্যন্ত প্রিয়। জয়রামপুরে চলে আসবার সময় হেলি তারই উপর ওখানকার ভার দিয়ে এসেছে। ইণ্ডিগো-কোম্পানির ডিরেক্টররা এখনো ইতস্তত করছেন দেশি লোককে পুরোপুরি ম্যানেজারের পদে বসাতে। সেইজন্য নায়েব নামে সে বহাল হয়েছে। কিন্তু দিন দিন অবস্থা যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে সাহেবরা এ-ও ভাবছেন অতঃপর নিজেরা পিছনে থেকে দেশি লোকদের কর্তা করে সামনে বসাবেন কি না। গণ্ডগোল বাধে তো ওরা নিজেরা মাথা ফাটাফাটি করে মরবে, কুঠিয়ালের গায়ে আঁচড় পড়বে না। এই রকম নানা বিবেচনায় হেলির জায়গায় নূতন কাউকে আনা হয় নি, পশুপতিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিখুঁতভাবে চালাচ্ছে —হেলির চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়।

সাহেবসুবোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পশুপতির চেহারাও খুলেছে প্রায় তাদের মতো। সুখময়ের তো চোখে পলক পড়ে না। বলে, আর ঘোরাঘুরি নয় খুড়োমশায়, এইখানেই লাগাতে হবে। জোর কপাল দুর্গার, এদ্দিন তাই তার বিয়ে হয়ে যায় নি। লাখে একটা মেলে না এমন পাত্র।

রূপ ও স্বাস্থ্য শুধু নয়—বিদ্যাও অগাধ। সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে অনর্গল ইংরেজি বলে যেতে পারে। মধুসূদন দারোগা শতকণ্ঠে সেইসব গল্প করতে লাগলেন। বললেন, ওদের বাসায় চলুন ঠাকুরমশায়, জুত করে আলাপ-সালাপ করবেন। তখন বুঝবেন, বাড়িয়ে বলেছি কিনা আমি। বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ-মুখ দিয়ে। আপনাকে কষ্ট দিয়ে এতদূর কি অমনি অমনি নিয়ে এলাম।

বাসায় গিয়ে চাক্ষুষ পরিচয়ের পর পীতাম্বর কোনক্রমে আর ভরসা রাখতে পারেন না। সুখময়কে বলেন, কত হেঁকে বসবে তার ঠিক কি! হেলি সাহায্য করবে বলেছে—কিন্তু আমি তো আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলতে পারি নে তাকে। তোর সমবয়সি আছে—হাসি-মস্করার ভিতর দিয়ে দেখ দিকি ছোকরাকে একটুখানি বাজিয়ে।

পশুপতির সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে তিনি বাইরে গিয়ে বসলেন। বসে স্থির থাকতে পারেন না, চোখ ইসারায় সুখময়কে ডেকে আবার বলে দিলেন, চেষ্টা করে দেখ তুই। না হয় ঘরবাড়ি জায়গা-জমি যা কিছু আছে, বিক্রি করে দেব। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেলে আর আমার দায়টা কিসের? এমন ছেলের জন্য দু-পাঁচ শ বেশি যদি যায়, সে টাকা জলে পড়বে না।

ঘরের ভিতর সুখময় পশুপতির সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। পীতাম্বর বারাণ্ডায় বসে স্বভাবের শোভা দেখছেন, আর উৎকর্ণ হয়ে আছেন ওদের প্রতিটি কথা শোনবার জন্য।

সুখময় পশুপতির হাত জড়িয়ে ধরল। পশুপতি রাঙা হয়ে ওঠে।

ছিঃ-ছিঃ! অমন করে বলছেন কেন? এক সময় টোল ছিল আমাদের দেশের বাড়িতে, আমার বড়-ঠাকুরদা সারাজীবন টোলে পড়িয়ে গেছেন, শিক্ষা-ব্রতীর সম্মান আমরা জানি। বড়লোকের বাবু-মেয়ের চেয়ে শিক্ষকের হাতে-গড়া মেয়ে সংসারে বেশি সুখশান্তি আনবে। বুঝিয়ে বলতে হবে না আমায় কিছু।

মেয়ের রং একটু চাপা শুনে পশুপতি জবাব দিল, আহা সোজাসুজি বলুন না কেন—কালো মেয়ে। তাতে সঙ্কোচের কি আছে? কালো মেয়ের বিয়ে হবে না—পড়ে থাকে নাকি? আমার মতো রাঙা-মুলোগুলোই বুঝি কেবল মানুষ—রং ময়লা হলে মানুষ বলবেন না তাদের? দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি—আমায় কিছু বলতে হবে না। মাকে আপনারা ভাল করে বলুন। তা হলে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

তারপর খুড়ো-ভাইপোয় আবার যুক্তি-পরামর্শ হল। সুখময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, আমার মনে হচ্ছে খুড়োমশায়, হেলির টিপ রয়েছে পিছনে। মধু-দারোগাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তো। নইলে একেবারে গঙ্গাজল—কথা না পড়তে হাঁ-হাঁ করে উঠছে—পিছনের চাপাচাপি না থাকলে এমনটা হয় না।

পীতাম্বর অতিমাত্রায় চটে উঠলেন।

তোদের পাপ-মন—সব জিনিসের পিছনে উদ্দেশ্য খুঁজিস।

পশুপতির মা'র কাছে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে তিনি একেবারে বেহান বলে ডেকে বসলেন। বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা—তবু ঠিক সামনে এলেন না, কপাটের আড়াল থেকে কথাবার্তা চলতে লাগল। পীতাম্বর বললেন, মেয়েটার মা নেই, মেয়ে বলে আপনাকে নিতেই হবে বেহান ঠাকরুন—

হেসে রসিকতার ভাবে আবার বললেন, পাদপদ্মে এনে রেখে যাব। কেমন তুলে না নেন দেখব।

বেহান কিন্তু ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন না, সকল রকম খবর নিলেন। নীলকুঠির সঙ্গে পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। শুনে একটুখানি কি ভাবলেন। বললেন মেয়ের জন্য আটকাবে না। পশুপতি আমার

ফরসা আছে, ছেলেপিলে হতকুচ্ছিৎ হবে না। গহনা-বরশয্যাও যা আপনার সাধ্যে কুলোয় দেবেন—

আনন্দে পীতাম্বরের বাকরোধ হয়ে আসছে। সত্যযুগের মানুষদের সামনে এসে পড়েছেন নাকি দৈবাৎ?

একটুখানি কিন্তু গোলযোগ আছে পণ্ডিতমশায়, আগে ভাগে খুলে বলা উচিত। আমরা শ্রোত্রিয়, আপনার কুল ভেঙে যাবে। রাজি আছেন? সাত পাক ঘুরে গেলে চৌদ্দ পাকেও আর তা খুলবে না। ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখুন বাড়ি গিয়ে। আমাদেরও তো শুধু দারোগাবাবুর মুখে শোনা—আর কিছু খবরাখবর নিই।

প্রচুর আদর-আপ্যায়ন হল। গুরুভোজনের পর বিছানায় গড়াতে গড়াতে সুখময় বলল, কি ঠিক করলেন খুড়োমশায়?

তাই ভাবছি বাবা।

আর যা ভাবুন, কিন্তু ছেলে নেই-- কুলের ভাবনা ভাবতে যাবেন কার জন্য? মেয়ে ভাল থাকবে, তা হলেই হল। এমন পাত্র কদাচ হাতছাড়া হতে দেবেন না।

বটেই তো! বলে পীতাম্বর চুপ করলেন। আবার বললেন, বুঝলি সুখময়, বাড়ি গিয়ে বউমাকে লাগাতে হবে, তিনি যেন দুর্গার সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে—তার ইচ্ছেটাও শোনা উচিত। বিয়ে নিয়ে ওর মায়ের খুঁতখুঁতানি ছিল। সে নেই—এখন একলা আমি ঝাঁ করে কিছু করে বসতে ভরসা পাই নে। বউমাকে বলবি, বেশ কায়দা করে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

যাবার মুখে ঝি আর-এক দফা পান এনে দিল। ঘরের ভিতর থেকে পশুপতির মা বললেন, মা-লক্ষ্মীকে এইখানে এনে দেখিয়ে যেতে হবে। মেয়েমানুষ আমি—আপনাদের ওখানে যেতে পারব না তো!

পীতাম্বর বিরক্ত হলেন, এ প্রস্তাবে। তবু মেয়ের বাবা। হাসিমুখে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, মা-লক্ষ্মীও তো মেয়ে বেহানঠাকরুন। এদ্দূর তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে?

পশুপতির মা দৃঢ়কণ্ঠে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করলেন, মেয়ে চোখে না দেখা পর্যন্ত পাকা-কথা দেওয়া যাচ্ছে না। মাঘ মাসে কাজ করতে চান তো দু-দশ দিনের মধ্যে মেয়ে-দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

সুখময় বকবক করে পাত্রের গুণপনা এবং পাত্রপক্ষের আপ্যায়নের প্রশংসা করছে, পীতাম্বর চুপচাপ আগে আগে চলেছেন। বরাবর সদররাস্তা ধরে যাবার

কথা—তা নয় ডাইনে বেঁকে নদীর ঘাটে এসে তিনি মাঝির সঙ্গে দরদস্তুর করতে লাগলেন।

সুখময় বলে, আবার কোথা ?

চিনেটোলায় একটা খবর আছে।

এটার কি হল ?

নিরাসক্তভাবে পীতাম্বর বললেন, এটা তো রয়েছেই—

সুখময় বিরক্ত হয়ে বলে, একনাগাড়ে পাত্র ঠিক করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ে সাকুল্যে একটা।

পীতাম্বর বললেন, আজ অবধি যত পাত্র দেখেছি—একুন করলে দেড় কুড়ি পৌণে-দু'কুড়ি পৌঁছয়। ক'টা তার মধ্যে গেঁথেছে বল দিকি বাবা ? পোড়া অদৃষ্টে শেষ অবধি সমস্ত ফসকে যায়। সাধ করে কি এদেশ-ওদেশ ঘোড়দৌড় করে মরি ?

একটু থেমে আবার বললেন, শ্রোত্রিয়ের ঘরে না-হয় কাজ করলাম, কিন্তু আবদার শুনলে তো, মেয়ে তুলে এনে ওঁদের দেখিয়ে যেতে হবে। দুগ্‌গাও তার মায়ের মতো—শুনে যদি একবার বেঁকে বসে, খুন করে ফেললেও এক পা নড়ানো যাবে না। মুশকিল আমার সকল দিকে।

চিনেটোলায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গেল। পাত্রের বাপের তালুক আছে, সাতশ' সাতাম টাকা সেস দেয়। বাড়ি-ঘরদোরও ভাল। কিন্তু ছেলে কাজকর্ম কিছু করে না। একেবারে কিছু করে না, তা নয়—তবলা বাজায়, আর এক টাট্টু ঘোড়া আছে, তার খেদমত করে। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় এগ্রাম-সেগ্রাম।

পীতাম্বর সুখময়কে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন রে ?

ভালই তো মনে হয়—

যা দেখিস, সবই তোর কাছে ভাল। শুনলি তো, ছেলে কিছু করে না—

সুখময় বলে, করে বই কি ! ঘোড়া ছুটায়, তবলায় তেহাই দেয়। আর কিছু করতে যাবে কোন দুঃখে ? আমাদের বাপের তালুক থাকলে আমরাও করতাম না ওর বেশি কিছু।

পীতাম্বর তবু ইতস্তত করছেন দেখে বলল, চোখ বুঁজে পাকা-কথা বলে বাড়ি চলুন। এরাও কিছু কম যায় না—মেয়ে দেখে পছন্দ করলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দেবেন। বেশি খুঁতখুঁত করেই তো মুশকিল বাধাচ্ছেন। বেশি যে বাছে, তার শাকে পোকা বেরোয়।

দু-দু জায়গায় কথাবার্তা বলে অনেকটা সুস্থির হয়ে পীতাম্বর বাড়ি ফিরলেন। সুখময়কে পই-পই করে সামাল করে দেন, কোন রকম উচ্চবাচ্য না হয় এ নিয়ে।

চিনেটোলার কুটুম্বরা আসছেন, বিশেষ রকম হাট-বাজার করবার দরকার। সন্ধ্যার পর হাট যে সময় ভাঙো-ভাঙো, পাড়ার সকলের চোখ বাঁচিয়ে খুড়ো-ভাইপো চুপিচুপি হাটে চললেন।

কুটুম্বরা দু-জন আসছেন। অন্ধকারে পথের আন্দাজ পাচ্ছেন না—ডেকে সাড়া নিচ্ছেন, পীতাম্বর চাটুজ্জে মশায়ের বাড়িটা কোন দিকে?

কাঁঠালতলার দিকে থেকে দ্রুতপদে একজন চলে এল। খাতির করে বলে, পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি যাবেন? চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

যেতে যেতে বলে, মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন বুঝি? তা এদ্দুর এসেছেন যখন দেখে যাবেন বই কি! নিশ্চয় দেখবেন।

পাত্রের বাপ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন? কেন?

গ্রামের কুমারী মেয়ে—বলা আমার উচিত হবে না। পণ্ডিতমশায় আহ্বান করে এনেছেন, ধরতে গেলে গ্রামেরই অতিথি আপনারা।

বউ করে ঘরে তুলতে যাচ্ছি, খবরাখবর জানব না? বলতেই হবে মশায়?

অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে লোকটি বলল, মেয়ের গায়ে শ্বেতি আছে। তা আবার আপনারা দেখতেও প্যাবেন না, হাঁটুর উপরটায় কিনা। গ্রামের মেয়ে বলে ছোটবেলা থেকে আমরা জানি। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

প্রবীণ ভদ্রলোক এবারে তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। থামবেন না মশায়, সমস্ত খুলে বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত বলতেই হল। দুগ্গার মাথামাথি আছে গ্রামের কেশব নামক এক ছোকরার সঙ্গে।

শুনে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। লাল-ভেরেণ্ডার বেড়ায় ঘেরা বাড়ি সামনে। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, চলে যান—ঐ যে আলো জ্বলছে।

চলেই যাব। অনেক ঘুর-পথে এসেছি। পাথরঘাটা পৌঁছবার সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেন যদি দয়া করে—

সে কি, রাত্রিরবেলা যাবেন কোথা? গ্রামের অপমান হবে যে তা হলে। পণ্ডিতমশায়ের মনে কি রকমটা হবে, ভাবুন দিকি?

খুড়ো-ভাইপো ঠিক সেই সময়টা হাটবেসাতি করে ফিরছেন।

কারা?

ভদ্রলোকেরা উত্তর দিলেন, বিদেশি মানুষ। পাথরঘাটায় যাব, আমাদের পানসি আছে সেখানে।

পীতাম্বর কাছে এসে দেখে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন। আসুন—আসতে

আজ্ঞা হয়। ওরে সুখময়, দৌড়ে আলো এনে হুড়কোর কাছে ধর্—

মাপ করবেন। এই জোয়ারে ফিরে যেতে হবে।

স্তম্ভিত পীতাম্বর প্রশ্ন করলেন, কেন? করজোড়ে তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ালেন। দোষটা কি হয়েছে বলে যেতে হবে।

জোচ্চ্ুরি করে শ্বেতিওয়ালা মেয়ে গছাতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু পাত্রের বাপ প্রবীণ ভদ্রলোকটি ধমক দিয়ে মুখফোঁড় সহগামীর কথা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, কিছু নয় চাটুজ্জেমশায়। কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলে আমরা কি জন্য নিমিত্তের ভাগী হতে যাব? আপনাদের গ্রামের লোক উনিই বললেন—

পিছন ফিরে দেখলেন, লোকটি ইতিমধ্যে সরে পড়েছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাত দুপুরের মতো নির্জন নিস্তব্ধ গ্রাম। কেশব সেই সময় চাষা-পাড়া থেকে বাড়ি ফিরল। পুকুর-ঘাটে খেজুর-গুড়িতে পা ঘষে ঘষে কাদা ধুল। উঠানে এসে হাঁক পাড়ল, পিসিমা—

দূর-সম্পর্কীয় এক পিসি তার বাড়ি থাকেন। তিনি রাঁধাবাড়া করে দেন। তেলের ভাঁড় নিয়ে পিসি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কেশব বলে, ভাত বেড়ে ফেল পিসিমা।

খানিকটা তেল মাথায় থাবড়ে গামছা ও খড়মজোড়া নিয়ে আবার পুকুরে গেল। গোটা কয়েক ডুব দিয়ে গা মুছে গামছা পরে পরনের কাপড়টা কেচে নিয়ে খড়ম পায়ে দিতে যাচ্ছে, দুর্গা কোন্ দিক দিয়ে ঝড়ের মতো এসে পায়ের আঘাতে খড়ম একগাছা ছুঁড়ে দিল ঘাটের দিকে।

কেশব মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে।

খড়ম ফেললে কেন?

মারা উচিত ছিল। সেটা যে পেরে উঠলাম না।

বলতে বলতে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দুর্গার কপাল বেয়ে। কেশবের যে রাগ হয়েছিল তা ঐ সঙ্গে জল হয়ে গেল।

ব্যাপার কি?

জান না?

আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টিতে দুর্গা তার দিকে তাকাল। কেশব চঞ্চল হয়ে ওঠে, দৃষ্টি যেন দগ্ধ করছে তাকে।

আমি জানি। তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে এসেছি, ওসব করে লাভ কিছু হবে না।

কেশবের কণ্ঠস্বর সহসা কাতর হয়ে উঠল।

কিসে লাভ হবে, সেটাও বলে যাও তা হলে।

এ জন্মে হবে না। শত্রুতায় হবে না, কেঁদে-ককিয়েও হবে না। মিথ্যুক শঠ কোথাকার! ঘেন্না করি তোমাকে। বাবাকে এখনো বলিনি, বললে তোমায় খুন করে ফেলবেন।

এত গালিগালাজ কেশবের কানেই যাচ্ছে না যেন। বরঞ্চ হাসির আভা মুখে। বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কে মিথ্যে করে আমার নামে কি বলেছে।

কেউ বলেনি, জানবে কে? সাক্ষি রেখে করবার মতো কাঁচা লোক কি তুমি?

কেশব হেসে বলে, সেইটে মনে রেখো—কাঁচা লোক আমি নই। যা করছি আর যা করব, একজনও তার সাক্ষি থাকবে না।

কেমন এক রহস্যপূর্ণ ভাবে কেশব তাকায়। এ দৃষ্টি আজকালই তার চোখে দেখতে পাচ্ছে। দুর্গা দু'টি চোখের স্বচ্ছ আয়নায় চিরদিনের চেনা গুড়ুকখোর নিরেট-মস্তিষ্ক কেশবের নূতন মূর্তি দেখে।

সারা অঞ্চলে গোলমাল। নীলচাষের ভয়ে চাষীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। পাগলা টুইডির জয়রামপুর—এ গ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। পালাবার নাম কেউ মুখে আনে না এখানে। ইণ্ডিগো কোম্পানি গ্রামের পত্তনিদার—তার উপর টুইডি যাকে যা দিয়েছিলেন, দীর্ঘকাল পরে হেলির আমলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসমেত সমস্ত টাকার সুখত দিতে হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও কালবৈশাখীর ঝড়ে এবার যখন চালের পচা ছাউনি উড়ে গেল, আর হুঁশ হল—খোরাকি ধান আইরির তলায় এসে ঠেকেছে, নির্লজ্জ চাষীরা তখন আবার দলে দলে নীলকুঠিতে গিয়ে হাত পাততে লাগল। হেলি বিমুখ করল না কাউকে—নীলের জন্য দাদন নিচ্ছে, এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখিয়ে আবার টাকা দিল। পাঁচ আনা মন হিসাবে দাম কেটে নিয়ে পরিমাণ-মতো নীলের বীজও দিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। সদরে প্লাণ্টার্স ক্লাবে হেলি দেমাক করে বলে এল, আর যেখানে যা-ই হোক, তার এলাকায় চাষ অনেক বেশি হবে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায়। সত্যই চাষ ভাল এবার—গোণ পেয়ে চাষীরা বিষম খাটছে। হেলি মাঝে মাঝে মাঠে গিয়ে প্রশন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাষ দেখে।

চাষ হল, বীজ ছড়াল, অঙ্কুরোদ্গম হল—আরে আরে, কি সর্বনাশ! নীল তো নয়, আউশধান।

গেঁয়ো চাষীর এত সাহস? হেলি হেন ব্যক্তিকে তাহা বেকুব বানিয়ে

দিল! ক্লাবে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। অন্যের দুর্দশায় আনন্দ করবার মতো মনের সুখ এখন কোন কুঠিয়ালের নেই। হেলির কিন্তু নিশ্চিত ধারণা, অন্য কনসারনের লোকেরা মুখ টিপে হাসে তাকে দেখলে। যত ভাবে, ততই সে ক্ষেপে যায়। কুঠির লোক দিয়ে একদিন ধানবনে হৈ-হল্লা করে লাঙল দেওয়াল। কচি ধান-চারা ফলার মুখে উপড়ে নিশ্চিহ্ন হল জলে-কাদায়। কিন্তু এলাকা জুড়ে এই চালাকি করছে, কাঁহাতক লাঙল চষে চষে জমি ভেঙে বেড়ানো যায়? ক'টাকে কয়েদখানায় পুরবে, লাঠি দিয়ে ঠেঙাবে? তাতে তো নীলের চারা গজাবে না ক্ষেতে। মরশুমটা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে গেল।

প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে দেখা গেল উলটো-উৎপত্তি ঘটছে। সাহেবের সামনে দৈবাৎ এসে পড়লে আগে যারা থরহরি কাঁপত, তারাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মুই নীল বুনব না। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল. এতে তবু ইজ্জত বজায় থাকে —কিন্তু ভয় ভেঙে যারা মরীয়া হয়েছে তাদের নিয়ে উপায় কি এখন?

মধুসূদন পীতাম্বরকে বলেছিলেন, ভদ্রঘরের মাথাওয়ালা কুলাঙ্গার কতকগুলো দলে জুটেছে, পিছন থেকে তারা উসকে দেয়। নইলে ওদের ক্ষমতা কতটুকু —দু-দিনের ভিতর ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত।

দুর্গা শুনেছে সমস্ত। মাথাওয়ালা দলের ভিতর কেশবেরও নাম বেরিয়েছে, এর চেয়ে হাস্যকর কি আছে? কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি সে। কিন্তু আজকে কেশবের সঙ্গে কথাবার্তায় সহসা তার মনে হল, বাজে গুজব বলে কোন খবর উড়িয়ে দেবার নয় এ সময়ে; কেমন যেন ভয় হতে লাগল কেশবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে।

কেশব হাসতে হাসতে বলল, গ্রামের মেয়ে—তার উপর পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে—যার তার হাতে পড়ে কষ্ট না পাও, সেইজন্য আঁকুপাঁকু করি। নইলে আমার কি যায় আসে বল।

কিছু আসে যায় না তোমার?

না, কিছু নয়। পণ্ডিত মশায় সোজা মানুষ—যে সম্বন্ধটা আসে, তাতেই নেচে ওঠেন। ভাবেন, এমন পাত্র ভূ-ভারতে নেই।

দুর্গা বলল, সুপাত্র তুমি একলা-ই ভূ-ভারতে?

ম্লান হেসে কেশব বলে, আমার কথা আর কেন? আমি তো সকল বিবেচনার বাইরে। কথা দিচ্ছি দুর্গা, ভাল ছেলে আসুক—সময়ে যদি কুলোয় নিজে আমি বরের চারদিকে কনের পিঁড়ি ঘোরাব।

সময়ে যদি কুলোয়—বড় ব্যস্ত আজকাল তুমি বুঝি?

এ প্রশ্ন কানে না নিয়ে কেশব বলতে লাগল, চিনেটোলার ছোঁড়াটাকে

জানি। এক নম্বর হতচ্ছাড়া। সকল রকম নেশা করে। জেগে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। তার জন্য দুঃখ পাওয়া কিংবা আমাকে ঘেন্না করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু সত্যি সত্যি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। আগরহাটি যাচ্ছি, বাবা আর আমি। অমন পাত্র তপস্যা করে মেলে না—সুখময়-দা ব্যাখ্যান করছিলেন।

কেশব সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে।

দুর্গা বলতে লাগল, যাচ্ছি—যদি দয়া করে পছন্দ করেন। দিন আষ্টেক আজ মুখে বেসম আর সর ঘষছি, খুব ঘষামাজা করছি—কালোর উপর যদি একটু চিকন আভা খোলে। পাত্রের কুলমর্যাদা নেই—সুখময়-দা'র বউকে দিয়ে সেই সম্বন্ধে বাবা আমার মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। আমি খুশি মনে মত দিয়েছি।

কেশব জিজ্ঞাসা করে, আগরহাটির পাত্র—কে বল দিকি?

পশুপতি চক্রবর্তী। নিশ্চয় চেন তুমি। তোমার যা কাজ, একে না চিনে উপায় নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে কেশব বলে, চিনেছি। কুলমর্যাদা কেন, কোন মর্যাদাই নেই তার। ওর চেয়ে চিনেটোলার পাত্র ভাল। নেশা করে করে একদিন সে নিজে মরবে, কিন্তু পশুপতির মতো দেশসুদ্ধকে মেরে যাবে না।

দুর্গা সভয়ে বলে, আবার তুমি বাগড়া দেবে নাকি? খবরদার!

কেশব বলে, কুঠিবাড়ির পাকা-দালানে উঠবার সত্যি সাধ হয়েছে? তাই হোক—একটা কথাও আমি বলতে যাচ্ছি নে। কি দরকার? ক'দিন পরে কোন পাত্তাই হয় তো পাবে না আর আমার।

কোথায় যাবে?

কেশব হেসে উঠল।

কুঠির নায়েবের বউ হচ্ছ—কেন তোমায় সাক্ষি রাখতে যাব?

খড়ম কুড়িয়ে পায়ে পরে ধীরে ধীরে সে রান্নাঘরের দিকে চলল।

তার পরেও দুর্গা অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাগ হচ্ছে, হিংসা হচ্ছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে কেশব চিরদিনই নিচে। কত লোকে তাকে ঠাট্টা-তামাসা করেছে দুর্গার সঙ্গে তুলনা দিয়ে। আজকে কেশব তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অনেক উপরে—নাগালের বাইরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলে আজকাল উঁচু ঢঙে, যেন কত দূরের মানুষ!

শেষ রাত্রে পীতাম্বর গরুর গাড়ি নিয়ে এলেন। এসে রুখে উঠলেন মেয়ের উপর।

পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস এখনো—ঘুম আসে এ অবস্থায় ?

জেগে আছি।

চুপচাপ পড়ে আছিস তবে কোন আক্কেলে ? পায়ে মল পরেছিস কই ? খোঁপা কই ?

তিন-চার দিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে, এই প্রথম দুর্গা আপত্তি করল। ক্রন্দনোচ্ছল কণ্ঠে বলে, আমি যাব না বাবা।

পীতাম্বর ক্ষেপে উঠে বলেন, যাবি নে কিরে ? সবে তো শুরু—গাঁয়ে গাঁয়ে তোকে ফিরি করে নিয়ে বেড়াব। ভেবেছিস কি ?

গাড়ির চালার উপর বসে পীতাম্বর গজর-গজর করতে লাগলেন, অপমানজ্ঞান তোরই আছে, মন বলে আমার কোন পদার্থ নেই ? এক কাজ করিস, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিস একদিন। তখন আর কিছু বলব না, কোথাও নিয়ে যেতে চাইব না।

আকাশে শুকতারা দপদপ করছে, সেই সময় তারা রওনা হল। সমস্ত গ্রাম অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কেশবের নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় গভীর নিঃশ্বাস ফেলল দুর্গা। কোথায় চলে যাবে সে আর ক'দিন পরে! সত্যিকার আপন জন কেউ থাকলে যাবার কথা বলতে পারত কি অমন করে ? যেতে কি দিত তারা ?

বাসায় একলা পশুপতির মা। আজ তিনি সামনে বেরিয়ে এলেন।

এই মেয়ে ?

তারপর অন্ধকার মুখে তিনি আহ্বান করলেন, এস বাছা। ওরে, বাইরের ঘরটা খুলে বসতে দে এঁদের।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজী ?

বেরিয়ে গেছে। বড্ড গোলমাল।

থানার জমাদার ঐ-দিক দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ছুটে যাচ্ছিল। পশুপতির মা ডাকলেন।

বড্ড যে ঢাকের বাজনা। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। পরব-টরব নাকি, নটবর ?

নটবর এই পাড়ারই—অবসর-মতো এঁদের ফাইফরমাশ খেটে কিছু রোজগারও করে। কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে সে বলল, ঢাক-বাড়ি করেছে মা, রসকেমুচির গোয়াল ঘরে। রাজ্যের ঢাকঢোল এনে জড় করেছে। কুঠির পাইকবরকন্দাজ বেরুলে ঢাকে কাঠি পড়ে, গাঁয়ের মানুষ সামাল হয়ে যায়।

থামছে না তো মোটে! ভোরবেলা থেকে ভ্যাডাং-ভ্যাডাং বেজে চলেছে।

নটবর বলে, বিষম কাণ্ড আজকে। দল বেঁধে যত চাষী ঢাল-সড়কি নিয়ে

রসকের উঠোনে নাচছে ঢাকের তালে তালে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা সমস্ত বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পশুপতির মা বললেন, সর্বনাশ! পশুপতি আমার খানিক আগে বেরিয়ে গেল যে!

বেরুতে পারেন নি। থানা অবধি গিয়ে আটকে গেছেন। নেচেকুঁদে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে, করবে কচু। ভয় নেই মা, সদর থেকে সিপাহি এসে পড়ল বলে, দু-দিনে সব ঠাণ্ডা করে দেবে। এই দেখ—আস্পর্ধা দেখ হারামজাদাদের—এই দেয়ালেও কি সব লিখেছে দেখ—

সবাই একসঙ্গে মুখ ফেরালেন। দেয়ালের বালির জমাটে কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কবিতা লিখেছে—

আগরহাটির লম্বা লাঠি
পশুপতির মুণ্ডু কাটি

আবার লিখেছে—

জমির শত্তুর নীল
মাছের শত্তুর চিল
পশুপতির কানজা ধরে
পিঠি মারি কিল।

ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে মানুষের কোলাহল কানে আসছে এবার। অনেক লোক মিলিত কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে। কেঁচোর মতো নগণ্য মানুষের দল সাপ হয়ে ফণা তুলেছে। গা শিরশির করে উঠল দুর্গার। কেশব আছে কি ওর মধ্যে? এখানে না থাকলেও আছে নিশ্চয় কোন-না-কোনখানে, রায়তদলের ভিতর। দেয়ালের লেখাগুলো—হ্যাঁ, কেশবের হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের মতোই মনে হয়। কেশব এতদূর এই আগরহাটি এসে জুটেছে—এ অনুমান হয়তো ঠিক নয়। তবুও যেখানে গণ্ডগোল, দুর্গা মনে মনে সেইখানে কেশবের অস্তিত্ব ধরে নেয়।

পীতাম্বরের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। বললেন, আপনার মন ভাল নেই বেহান। আজকে ফিরে যাওয়া যাক, কি বলেন? আপনার কনে দেখা তো একরকম হয়ে গেল। হাঙ্গামা মিটে যাক। বাবাজী এরপর যেদিন জয়রামপুরের কুঠিতে যাবেন, আমাদের বাড়িতে যান যেন একটিবার।

গরুর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে। পশুপতির মা সহসা ডেকে বললেন, মিথ্যে আশায় ঘোরাতে চাই নে পণ্ডিত মশাই—ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। পশুপতি যাবে না।

পীতাম্বর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্যামবর্ণ বলছিলেন—এ তো কালো। চুল পাকিয়ে ফেললেন, কাকে কোন রং বলে জানেন না? এই ধিঙ্গি মেয়ে—চাঁনদিদির মতো দেখাবে যে আমার পশুপতির পাশে!

একবার ঢোক গিলে বললেন, বুড়ো মানুষ বার বার আসছেন, তাই খোলসা কথা বলে দিচ্ছি। হেলি সাহেব এসেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে আমার ছেলেকে করতেই হবে এ বিয়ে। আর এই কালো মেয়ে ফরসার কদরে বিকোবে, এমন সাহায্য এ দুঃসময়ে হেলি আপনাকে করতে পারবেন না। আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন পণ্ডিত মশাই।

দুর্গা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। চোখে জল টলমল করছে, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। মেয়ের দিকে চেয়ে পীতাম্বরের মন স্নেহে গলে গেল। গায়ের রং একটু ময়লা হতে পারে, কিন্তু কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে! দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন, চোখ নেই—কানা মা মাগিটা। ছেলের দেমাকে আমার মেয়ের দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল না।

কিন্তু যোগাযোগ এমনি, এরই দিন পাঁচেক পরে পশুপতি পায়ে হেঁটে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি উপস্থিত।

পণ্ডিতের বাড়ির দক্ষিণে বড় রাস্তার লাগোয়া প্রকাণ্ড বিল। আষাঢ় মাস—ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, অবিশ্রান্ত বেঙের ডাক। ধানবনে জল জমেছে। রাত্রি শেষ প্রহর। অভ্যাসমতো পীতাম্বর তামাক খেতে উঠেছিলেন, মানুষের আর্তনাদের মতো কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। বৃষ্টির একটানা আওয়াজের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে নিঃসন্দেহ হলেন—মানুষই। দরজার খিল খুলতে দড়াম করে দুটো কবাট দু'দিকে আছড়ে পড়ল, বাতাসে মেটে প্রদীপ নিভে গেল। বাইরে কি দুর্যোগ চলছে, দরজা না খোলা পর্যন্ত সঠিক আন্দাজ হয় নি।

জলে-কাদায় মাথামাখি—টলতে টলতে এক মূর্তি এসে ঘরে ঢুকল। আর হাঁটবার জো নেই—প্রাণের টানেই কেবল এতদূরে চলে এসেছে। এসেই মেজের উপর ধপ করে বসে পড়ল, এগিয়ে ফরাস অবধি যাবার সবুর সইল না।

কে তুমি?

অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

পিছন দিককার দরজা খুলে পীতাম্বর চেঁচামেচি করতে লাগলেন, শিগগির উঠে আয় সুখময়, শিগগির—

আবার প্রদীপ ধরিয়ে চিনতে পারা গেল। পশুপতি। কাপড়চোপড়ে রক্তের দাগ—আট-দশটা পানি-জোঁক সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরেছে। খানিক সামলে নিয়ে পশুপতি দুটো-একটা কথা যা বলল—পীতাম্বর বুঝলেন, শোলা-ঝাড়ের ভিতর যে জায়গায় সে লাফিয়ে পড়েছিল, এখান থেকে সেটা ক্রোশ দেড়েকের কম নয়। একগলা ধানবনের ভিতর দিয়ে জলকাদা ভেঙে এই দেড় ক্রোশ পথ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন ভাবে সে চলে এসেছে। ভাগ্য ভাল যে বেঁচে আসতে পেরেছে।

খুব কাঁপিয়ে জ্বর এল। সুখময় আর পীতাম্বর দু-জনে ধরাধরি করে দোতলার ঘরে তুলে খাটের উপর তাকে শুইয়ে দিলেন। পুরো দুটো দিন একটা রাত্রি বেহুঁশ তারপর। প্রবল জ্বরে কেবল উঃ-আঃ করছে। গা এত গরম যে মনে হচ্ছে ধান রেখে দিলে খই হয়ে ফুটে উঠবে। পীতাম্বরের ভয় হল, অথচ বাইরের কাউকে কিছু বলতে ভরসা হয় না। দেশের অবস্থা আর মানুষের মতিগতি আশ্চর্য রকম বদলে গেছে। কুঠির লোকের নাম শুনলে মানুষ যেন ক্ষেপে যায়, তাদের সঙ্গে অতি-সাধারণ সামাজিকতাটুকুও সন্দেহের চক্ষে দেখে। বাষট্টি বৎসরের জীবনে পীতাম্বর স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এ সমস্ত।

ভোগ বেশি হল না, এই বাঁচোয়া। দিন-চারেকের মধ্যে পশুপতির জ্বর ছেড়ে গেল। বোঝা গেল, তারও ইচ্ছা নয়—সে কোথায় আছে, জানাজানি হতে দিতে। এমন কি মধুসূদন দারোগাকেও জানাতে মানা করল। শুধু কয়েক ছত্রের এক চিঠি সুখময় একদিন চুপিচুপি তার মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে এল। এক তাজ্জব গল্প করল পশুপতি—বিচারের জন্য কোন গোপন আদালতে নাকি হাকিমেরা নথিপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রায়তদের ধরে ধরে তারা যেমন সাহেব-কুঠিয়ালদের কাছে হাজির করে, সেই রকমটা আর কি! তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পিতৃপুরুষের পুণ্যে প্রাণ নিয়ে কোন গতিকে পালিয়ে এসেছে।

বনবিষ্টুপুর কতদূর এ জায়গা থেকে?

নিকটেই—দুর্গা অবধি জানে গ্রামটার নাম। বর্ষাকালে খাল-বিল ঘুরে যেতে কিছু বেশি সময় লাগে, শুকনার সময় সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে পথ অনেক কম।

বনবিষ্টুপুরে গিয়েছিল পশুপতি। রায়তেরা পালিয়েছে। একটা পাড়ার ঘর-বাড়ি সব পুড়ে গেছে। লোকে বলে, কুঠির বরকন্দাজেরা রাত্রিবেলা আগুন দিয়েছিল। এর অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। পশুপতি গিয়েছিল—ওখানে

খাস চাষ হবে, সেই ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি কাজ শেষ করে ডিঙি নিয়ে সে সদর-কুঠিতে ফিরছিল। পাইক-বরকন্দাজদের গ্রামে মোতায়েন করে এসেছে, আমিন আছে শুধু সঙ্গে। মাঝি ছপছপ করে বৈঠা বাইছে, আর দু-জন মাল্লা গুণ টেনে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। উজান কেটে দুলে দুলে চলছে নৌকা। একটা মানুষ নেই কোন দিকে, যেন মৃতপুরী। খালের জল কলকল করে নদীতে পড়ছে, কেবল তারই আওয়াজ।

আমিনের কাছে বন্দুক—টোটা পোরা আছে। চারদিক তাকিয়ে তারপর বন্দুকের দিকে পশুপতির নজর পড়ল। বন্দুক রয়েছে, তখন ভয় কিসের? বিরক্ত হয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, কত দেরি আর জোয়ারের? কত আর তোমরা গুণ টেনে মরবে?

এই যে—জল থমথমে হয়ে গেছে। টান ফিরবে এবার।

মানুষের গলা পাওয়া গেল এতক্ষণে। কাশবন—মানুষ দেখা যাচ্ছে না, হাঁক শোনা যায়।

নৌকো কার?

বদন সামন্ত আমার নাম। সাকিম বনবিষ্টুপুর।

ঘাটে ধর। ও-পার যাব—

পশুপতি ক্ষেপে উঠল।

ওরে আমার নবাবের নাতি! হুকুম ঝাড়ছেন, ঘাটে ধর। কক্ষনো নয়—চালাও।

বদন মাঝি সকাতরে বলে, এই আমাদের রেওয়াজ হুজুর, পারে যেতে চাইলে 'না' বলবার নিয়ম নেই। আর এ অঞ্চলের এরা লোক সুবিধের নয়। হামেশা চলাচল করতে হয়, এদের চটিয়ে রাখতে সাহস পাই নে।

পশুপতি বলে, করবে কি, আমি তো রয়েছি—

আপনি আজকে রয়েছেন হুজুর, কতক্ষণ আর থাকবেন! তার পরে?

সমস্ত ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—রোসো। তোমার গ্রামের ব্যাপার দেখলে তো? এখন ঐ চলল—অমনি হবে সব জায়গায়।

কিন্তু পশুপতির কথা কানে নিল না মাঝি—কাশবন ছাড়িয়ে ডিঙি কূলের কাছাকাছি যেতে হুড়মুড় করে জনা পাঁচেক লোক লাফিয়ে উঠল।

রুক্ষ স্বরে পশুপতি বলে, নৌকা ডুবিয়ে দিবি নাকি রে তোরা? আমিনের বন্দুকের দিকে সে তাকাল আর একবার!

আগন্তুকদলের অগ্রবর্তী লোকটি অতিশয় বিনয়ী। হাতজোড় করে সে বলল, দেওয়ানজি নাকি। আমরা নেংড়ের হাটখোলায় যাচ্ছি। এইটুকুন গিয়ে

নেমে যাব। ক'খানা বোঠে আছে তোমার মাঝি? দাও হাতে হাতে বেয়ে তাড়াতাড়ি হুজুরকে পৌঁছে দিই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ছইয়ের উপরে-রাখা আর তিনটে বোঠে ও দু-খানা লগি তারা তুলে নিল। বাইছে। মুহূর্ত পরে বিষম কাণ্ড। লগি ফেলে দু-জনে জাপটে ধরল বন্দুকধারী আমিনকে। বন্দুক কেড়ে নিল, গুণের দড়ি কেটে দিল। নৌকা গাঙের মাঝখানে। একজন পাঁঠা-কাটা মেলতুক নিয়ে এসেছিল দেখা যাচ্ছে গায়ের চাদরের নিচে। সে সেই মেলতুক ঘোরাতে লাগল, আমিন আর বদর মাঝির মাথার উপরে।

নাম্, নেমে পড়্ এক্ষুনি, নইলে কেটে কুচি-কুচি করব।

গোপন যোগসাজশ ছিল বলে পশুপতির সন্দেহ। বদন মাঝি এবং তারপর আমিনও ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ল নদীতে। জোয়ার এসেছে, মাঝির জায়গায় ওদেরই একজন বোঠে ধরে বসেছে। খরস্রোতে পাক খেয়ে ডিঙি খালের ভিতর গিয়ে উঠল।

সেই বিনয়ী লোকটা বলল, মিছে চেঁচাচ্ছেন হুজুর, গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ এদিকে আসবে না।

অপর একজন মন্তব্য করল, আর এলেও বাঁচাতে আসবে না তো? উল্টে দুটো চড়-চাপড় দিয়ে, কি অকথা-কুকথা বলে অপমান করে বসবে। কাজ কি —চুপচাপ থাকুন।

নিরুপায় পশুপতি প্রশ্ন করে, কি চাও তোমরা?

চার বোঠের তাড়নায় ডিঙি যেন উড়ে চলেছে। কেউ জবাব দিল না। নিবিড় অন্ধকার, আকাশ-ভরা কালো মেঘ।

কাতর কণ্ঠে পশুপতি বলে, আমার কি দোষ ভাইসব? চাকরি করি— উপরওয়ালার হুকুমে সব করতে হয়।

গ্রাম জ্বালাতে হয়? গৃহস্থের মেয়ে-বউ পথে তুলে দিতে হয়? উপর-ওয়ালারাও রেহাই পাবে না। এখনো বাগে পাইনি তাই। মহারানীর স্বজাতি বলে বাঁচতে পারবে না।

আবার একসময় পশুপতি বলে উঠল, ছেড়ে দাও আমায়—

ছাড়বার এখতিয়ার নেই। পঞ্চায়েতে বিচার হবে। ছেড়ে দেবেন কি দেবেন না— তাঁরাই ঠিক করবেন বিচারের পর। আমাদের গ্রেপ্তার করে পৌঁছে দেবার হুকুম, তাই করছি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামল! কনুয়ে মাথা রেখে পশুপতি শুয়ে ছিল। ঘুমোবার মতো ভাব। হঠাৎ উঠে খালের পাড়ে লাফিয়ে পড়ল। সে-ও লোক সোজা

নয়—নইলে কম বয়সে এত উন্নতি করতে পারত না সাহেবি কনসারনে। ওই এক চালাকি খেলল ওদের উপর। ভেবেছিল, শোলার ঝাড়ের ভিতর শুকনো ডাঙায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু জল সেখানেও—জুতো-জামাসুদ্ধ জলে পড়ে গেল। তবু সুবিধে হল—দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানবন চারিদিকে। মাথা নিচু করে এঁকে বেঁকে ধানবন দিয়ে চললে দিন-দুপুরেই খুঁজে পাওয়া যায় না—এ তো অন্ধকার রাত্রি। জলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে তবে পশুপতি গ্রাম পেয়েছে। ভাগ্যক্রমে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি এসে গেছে।

অন্নপথ্য সাত দিনের দিন। সকালবেলা দুর্গা বাটিতে করে গরম দুধ নিয়ে এসেছে। পশুপতি মুখ ভার করে বলে, আমি খাব না।

দুর্গা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়। পশুপতি যত সুস্থ হচ্ছে, ততই যেন ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশুপতি বলল, অসুখে অচৈতন্য ছিলাম—যা মুখে দিয়েছ খেয়েছি। তোমার ঘৃণার দেওয়া এই সব এখন আর খেতে যাব কেন?

দুর্গা ভালমন্দ কিছু বলে না, যেন সে বুঝতেই পারছে না তার কথা।

পশুপতি বলতে লাগল, নানারকম রটনা হচ্ছে আমার নামে। আমি নাকি মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছি ওদের কনসারনের, যা বলি হেলি তাতেই ঘাড় নাড়ে। রায়তেরা পেরে উঠলে চিঁড়ের মতো আমায় দাঁতে পিশে ফেলত। সবাই ঘৃণা করে! তোমরাও ভাবো ঐ রকম নিশ্চয়। নিতান্ত ঘাড়ে এসে পড়েছি, ফেলতে পারছ না—কি করবে? কিন্তু একটা কথা বলি দুর্গা—

প্রতিবাদ প্রত্যাশা করেছিল দুর্গার কাছ থেকে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে কৈফিয়তের সুরে পশুপতি বলতে লাগল, ব্যাপার হল—আমার উন্নতি দেখে সকলের চোখ টাটায়। সাহেবি কনসারনের ম্যানেজার হতে যাচ্ছি—ধর, এতদিনের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। জাতসুদ্ধ এতে খুশি হওয়া উচিত—তা নয়, এ পোড়া দেশে পিছনে লাগতে আসে। কি করছে এরা বল তো? কোম্পানির রাজ্যে থেকে নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া? লাঠি-সড়কি সমস্ত বন্দুকের গুলিতে ঠাণ্ডা করে দেবে। সদরে নালিশ করেই বা করবে কি, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি—ভাই-ব্রাদার ওরা সব। জাতভাইয়ের স্বার্থ না দেখে তারা কি রায়তের পক্ষে রায় দিতে যাবে?

এত কথার একটিও কানে যাচ্ছিল না দুর্গার। ঘৃণা করে বলে পশুপতি অনুযোগ জানাল, সেইটাই শুধু মনের মধ্যে বারংবার আনাগোনা করছে। কেশবকে একদিন সে-ই বলেছিল এমনি ঘৃণা করবার কথা। দুর্গার চোখে জল

এসে পড়ে। কথার মাঝখানে সে বলে উঠল, ঘৃণা আমি করি না। মিথ্যে কথা। আপনাকে না, কাউকে না। গর্ব করবার কি আছে যে অন্যকে ঘৃণা করতে যাব?

পশুপতি সামনে বসে, কিন্তু বলছে যেন অনেক দূরের আর কাকে উদ্দেশ্য করে।

পশুপতির মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলে, সে জানি। এই কথাটাই শুনতে চাচ্ছিলাম তোমার মুখ দিয়ে। ঘৃণা থাকলে এমন দরদ দিয়ে কেউ সেবা করতে পারে? মাকে বাদ দিলে এই বাড়ির তোমরাই শুধু সত্যি সত্যি আমায় ভালবাস। এত বড় কনসারনের এলাকায় এই একটা মাত্র জায়গা আমার কাছে সকলের চেয়ে নিরাপদ। কুঠির মাইনে-খাওয়া লোকজনকেও প্রাণ খুলে এমন বিশ্বাস করতে পারি নে।

তক্তাপোশের প্রান্ত দেখিয়ে বলে, বোসো দুর্গা—ঘৃণা কর না যখন, বোসো এই—এখানে।

দুর্গা বসে পড়ল।

কথা বল একটা-কিছু। শুয়ে পড়ে আছি। দিনরাত কাজকর্মে হৈ-হল্লার মধ্যে থাকা অভ্যাস—বড্ড কষ্ট হয় চুপচাপ থাকতে।

ক্ষীণকণ্ঠে দুর্গা বলে, কি কথা বলব?

সেটা আমি শিখিয়ে দেব?

স্পষ্ট অভিমানের সুর পশুপতির কণ্ঠে। বলে, যাকগে—কষ্ট করতে হবে না তোমার। আমিই বলছি কথা। কথা না বলে বলে মরে যাচ্ছি এই ক'দিন।

বলতে লাগল তার দুর্দৈবের কথা। রেখে ঢেকে বাইরে যতটুকু বলা যায় এই মেয়েটির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য। একেবারে নির্দোষ তার উপর নির্মম ষড়যন্ত্রের মনগড়া একটা কাহিনী সে বলে যেতে লাগল।

হঠাৎ দেখে দুর্গা ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে। পশুপতি চুপ করল।

বলুন—

তুমি শুনছ না, মিছে বকে মরছি।

শুনছি।

গলার স্বর অস্বাভাবিক মনে হল পশুপতির কাছে। রোগী এখন সে—এক কাণ্ড করে বসল—হাত বাড়িয়ে হঠাৎ দুর্গার মুখ ফেরাল তার দিকে। ঝরঝর করে দুর্গার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আর সে গোপন করল না, ঘনপক্ষ্ম সজল দু'টি চোখ তুলে নিঃশব্দে বসে রইল।

ক্ষণপরে ধীরে ধীরে পশুপতি বলে, মা কি-সব বলেছেন শুনেছি। কিন্তু সে জন্য আমায় দোষী করো না, আমার উপর বিরূপ হোয়ো না দুর্গা। নিয়তি অসহায় অবস্থায় তোমাদের আশ্রয়ে এনে ফেলেছে। তাই এত কথা মুখ ফুটে বলতে পারছি। তোমায় না পেলে জীবন আমার নিষ্ফল হয়ে যাবে।

দুর্গার বুকের ভিতর কাঁপে। কি করে বলে ফেলল, সে জানে না—বলল, আমি কালো-কুৎসিত—

কালো হতে পার—হাঁ, কালো নিশ্চয়ই, কিন্তু কুৎসিত কখনো নও। কুৎসিত কেউ এমনি করে মন বাঁধতে পারে? কাল সারারাত তোমার কথা ভেবেছি, সারারাত ঘুমোই নি। এর পরেও মা আপত্তি করলে আমাকে অবাধ্যপনা করতে হবে।

তারপর হেসে উঠে বলল, তার দরকার হবে না। তোমরা আমার জীবন দিয়েছ। আমি জানি—খুশি হয়েই মা মত দেবেন।

চলে যাবার দিন পশুপতি সুখময়কে বলে গেল, পাকা-দেখা দেখতে আসবে এই মাসের মধ্যেই। মধুসূদনবাবু আসবেন, আশীর্বাদ যা পাঠাবার—মা তাঁর হাত দিয়ে পাঠাবেন।

হেসে বলে, হেলি কি ছাড়বে? সে-ও এসে তার মামার মতো গ্যাঁট হয়ে ফরাশে চেপে বসবে। এসব কাজে তার উৎসাহ খুব—

কথা রাখল পশুপতি। মাসের ভিতরেই মধুসূদন দারোগা এসে পড়লেন। পশুপতি নিজেও আছে। হেলি এসে জুটল দলে। আরও বিস্তর লোক, বিষম সমারোহ। এসে পৌঁচেছে শেষ রাতে, এখন অবধি পীতাম্বরের বাড়ি আসবার ফুরসৎ হয় নি! উত্তরপাড়ায় আছে। খবর পাঠিয়েছে—সন্ধ্যার দিকে আসবে, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকে যেন দু-তিন জনের মতো। রাতটুকু এবাড়িতে থেকেও যেতে পারে, জানিয়ে দিয়েছে।

বিষম কাণ্ড উত্তরপাড়ায়, ভয়ানক দাঙ্গা। কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য করে তুলেছে ও-পাড়ার বাড়িঘর—মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সকলে মরিয়া। প্রথম মহড়ায় সড়কি এসে বেঁধে মধুসূদন দারোগার পায়ে। ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে তাঁকে সদরে পাঠিয়েছে। অতঃপর ক্ষেপে গেল থানার পুলিশ আর কুঠির বরকন্দাজের দল। খবর পেয়ে ও-পক্ষেও আশেপাশের গ্রাম থেকে পিঁপড়ের সারের মতো অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে। হঠবার পাত্র কেউ নয়—লড়াই দস্তুরমতো। খবর পাওয়া গেছে, ঐ যে পঞ্চায়েত-আদালতের কথা শোনা যায়, সে-আদালত নাকি কেশবেরই বাড়িতে। কিন্তু সে অবধি

পৌঁছবে, সাধ্য কার? বল্লম হাতে বটগাছে চড়ে কেশব নিজে বিপক্ষদলের গতিবিধি দেখছে, আর সেখান থেকে উৎসাহ দিচ্ছে রায়তদের।

দুর্গা ব্যাকুল হয়ে ঘর-বাহির করছে। নানা খবর আসছে মুহুর্মুহু। টোটার বন্দুক চালাচ্ছে হেলি বারবার। বিকেলবেলা শোনা গেল, রণ-জয় হয়েছে হেলির, গুলি খেয়ে কেশব মারা গেছে। মাতব্বর রায়তদের ধরে তালা-চাবি দিয়ে রেখেছে, কেশবেরই শোবার ঘরের ভিতর। যে বাড়ি থেকে যার যে জিনিস ইচ্ছা, টেনে দিয়ে ফেলছে, ছড়াচ্ছে, ভাঙছে—কিছুমাত্র বাধা নেই। নানারকম গুজব জনতার মুখে মুখে—রাত্রি হলে নাকি আরও নানাবিধ কাণ্ড হবে। সমস্ত গ্রামে আর যে ক'জন পুরুষ আছে, তাদেরও নিয়ে আটকাবে। তারপর নিঃসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে···এসব অবশ্য অনুমানের কথা। কিন্তু নৃশংসতার নমুনা দেখে সত্যি এবার ভয় পেয়ে গেছে জয়রামপুরের মানুষজন।

এরই মধ্যে একটু আনন্দের খবর একজনে দিয়ে গেল। কেশবের মৃতদেহের সন্ধান ওরা পায় নি, সুকৌশলে সরিয়ে নদীকূলে কেয়াবনে ঢুকিয়ে রেখেছে। গভীর রাত্রে চারিদিক নিশুতি হলে চুপিচুপি দাহ করবে। এত ভালবাসে তাকে সকলে, কিন্তু তার শেষকৃত্যে হরিধ্বনিও দেওয়া চলবে না একটিবার।

প্রহরখানেক রাত্রি। অতল নিস্তব্ধতা, দিনের তুমুল উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। উত্তরপাড়ার পথে পথে বল্লম হাতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সতর্ক বরকন্দাজের দল। এতক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পশুপতি পীতাম্বরের বাড়ি এল। একা নয়—হেলি সাহেবকে নিয়ে এসেছে। আর ক'জন বরকন্দাজ এসেছে, তারা বাড়ি ঢুকল না—হুড়কোর বাইরে বকুলতলায় দাঁড়াল। ঐখান থেকে পাহারা দেবে যতক্ষণ এঁরা আছেন এখানে।

সাড়া পেয়ে পীতাম্বর বেরিয়ে এলেন। প্যাংশুমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। গলা কাঠ হয়ে গেছে, ভালমন্দ একটি কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

হেলি বলল, তোমার বাড়ি এলাম পণ্ডিত। অতিথি। রাতে আবার বেরুতে হবে কি-না। কাজ আছে। তাই আর কুঠি অবধি ফিরে গেলাম না।

বলে সে বাঁকাহাসি হাসল।

দুর্গাকে ডাক দিয়ে পশুপতি বলল, বড্ড কষ্ট হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। খাবার দাও।

হেলিকে দেখিয়ে বলে, আর একঘটি গরম জল নিয়ে এস দিকি তাড়াতাড়ি। সাহেব হাত-পা ধোবেন।

দুর্গা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়।

পীতাম্বর বিপন্নভাবে চুপিচুপি মেয়েকে বললেন, সত্যি যে এসে উঠল। কি করি বল্‌তো এখন ?

আপনার লোক বলে জানে, তাই এসেছে—

সংক্ষেপে বাপের কথার জবাব সেরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈঠকখানায় এল। পশুপতির দিকে চেয়ে কলকণ্ঠে বলল, বীরসজ্জা ছাড়ুন। ভাল হয়ে বসবেন চলুন উপরের ঘরে।

নড়বড়ে ভাঙা সিঁড়ি, দোতলার সঙ্কীর্ণ ঘর, আমের ডাল নুয়ে পড়েছে জানলার কাছে। দু-জনকে বসিয়ে সেই যে দুর্গা চলে গেছে, আর দেখা নেই। দুপুরে গোলমালের মধ্যে নাওয়া-খাওয়া হয় নি। স্বপ্নেও ভাবে নি, এত হাঙ্গামা পোয়াতে হবে এইটুকু একপাড়া শাসন করতে এসে। কিন্তু এত দেরি করে কেন দুর্গা ? খাবার তৈরি করে নিয়ে আসছে ? হয়তো তাই। আগে আগে খবর পাঠিয়েছে অবশ্য, কিন্তু সমস্ত দিন যে ঝড় গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তাতে মাথার ঠিক থাকে কারো ? তাদের নিজেদেরই ছিল না, আর এরা তো নিরীহ নির্বিরোধী সেকেলে-পণ্ডিতের পরিবার।

আমগাছে বাদুড় ঝটপট করছে। হু-হু করে হাওয়া বয়ে গেল, পুরানো জীর্ণ চাটুজ্জে-বাড়ি সহস্র পদশব্দে বেজে উঠল যেন। আমডালের অন্ধকারের দিকে চেয়ে পশুপতির রোম খাড়া হয়ে ওঠে, দাঙ্গায় আহত মানুষগুলোর আর্তনাদ নিঃশব্দতার মধ্যে যেন কানে ভেসে আসছে।

এতক্ষণে কিন্তু দুর্গার আসা উচিত। নাড়ি হজম হয়ে যাবার যোগাড়— আর সে যোড়শোপচারে আয়োজন করছে নিশ্চয় বসে বসে। কুঠির সাহেব বাড়িতে বসে খাবে, এদের পক্ষে এ স্বপ্নাতীত ব্যাপার। হেলিকে এনেই মুশকিল হয়েছে, মনের মত করে না সাজিয়ে তার সামনে থালা আনবে না কিছুতেই। এলে পশুপতি মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কথা বলবে না দুর্গার সঙ্গে। খিদেয় টলে পড়ে যাচ্ছি, দেখে গেলে—তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না কি তোমার ?

পায়ের শব্দ। কান পেতে শুনছে পশুপতি। সিঁড়ি বেয়ে শব্দ উঠে আসছে ধীরে ধীরে। দু-চোখের উদগ্র দৃষ্টি স্থাপিত করে সে তাকাল। হাঁ, দুর্গাই। এতক্ষণের ভেবে-রাখা অভিমানের কোন কথাই এল না পশুপতির মুখে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, এলে ?

হ্যাঁ—

ঘরে এলো দুর্গা। কুলুঙ্গির প্রদীপটা উঁচু করে ধরল সিঁড়ির দিকে।

আলো পড়ে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে তার কালো মুখে। সিঁড়িতে অনেক লোক। এদের দেখিয়ে দেয়, এই যে—সেবারের পালানো আসামী। আর সেই সাহেব, কেশব-দাকে যে খুন করেছে—

এর পরের কথা সঠিক কিছু বলতে পারব না নিশিকান্ত। এ-ও যা বললাম নিতান্তই গল্প, ঠাকুমার কাছে শুনেছি। গ্রামের যে-কোন মুরুব্বীর মুখে শুনতে পাবে মোটামুটি এই কাহিনী। উত্তরপাড়া আছে আজও। চাটুজ্জে—বাড়ি বলতে লোকে একটা উঁচু ঢিবি দেখিয়ে দেয়। দলিলপত্রে পাওয়া যায়, নীল-বিদ্রোহের পরেই ইণ্ডিগো-কোম্পানি নামমাত্র মূল্যে জয়রামপুরের কনসারন বিক্রি করে দেন নামখানার চৌধুরীদের কাছে। চৌধুরীরা চালাতে পারলেন না। কনসারনের সমস্ত কুঠি বন্ধ হয়ে গেল বছর চার-পাঁচের মধ্যে।

কাজকর্মে ও লোকজনের যাতায়াতে নীলখোলা সমস্তটা দিন সরগরম থাকত—আর আজকে দেখলে নিশিকান্ত তার অবস্থা। নাটা বৈঁচি ও কালকাসুন্দের জঙ্গল, দেয়ালের ফাটলে সাপের আস্তানা, জঙ্গলে লাঠি পিটলে বুনো-শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেরিয়ে পালায়। কোথায় সেই টুইডির দল! ঠাকুরমার মুখে এবং এর-তার মুখে শোনা গল্পের টুকরো সাজিয়ে গুছিয়ে দিব্যি তোমার কাছে গড়গড় করে বলে গেলাম। যেন নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু গল্প গল্পই। কেশব বলে একজন ছিল বটে, কিন্তু দুর্গার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল—না-ও হতে পারে এমনটা। সেকালের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই—তখনকার কালের মানুষগুলোকে আন্দাজি পুরানো ছকে ফেলে গল্প জমাই। তবে এটা ঠিক, নীলকরদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার গ্রাম্য রায়ত রুখে দাঁড়িয়েছিল, সাদা সাহেব বলে আতঙ্ক ঘুচে গিয়েছিল সেই দূর অতীতেই। তাদের এমন জমিয়ে-তোলা ব্যবসা অসম্ভব করে তুলেছিল। শুধু জয়রামপুরের এই একটা মাত্র নয়—এক এক করে বাংলার সমস্ত কনসারন এদেশী ধনীদের কাছে বিক্রি করে তারা বিদায় নিতে লাগল। খরিদ্দার অভাবে তালা পড়ল কোন কোন কুঠিতে। জার্মান ল্যাবরেটারির সস্তা নীল এসে পড়ায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেল—এমনি একটা কথা সাহেবরা রটনা করে নিজেদের মুখরক্ষার জন্য। কিন্তু বুঝে দেখ নিশিকান্ত, জার্মানিকে নির্গোলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থ নেবে—তেমনি পাত্র কি ওরা? একালের ছেলেরা নীল-চাষের কথা বইয়ে পড়ে থাকে, চোখে দেখেনি। বিলুপ্ত ম্যামথের কঙ্কালের মতো এগ্রামে-ওগ্রামে ছড়ানো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষগুলো না থাকলে তাদের বিশ্বাস করানো শক্ত হয়ে দাঁড়াত নীলকুঠি ও নীলবিদ্রোহের কাহিনী। তেমনি

আমার মনে হয়, আর এক শ' বছর পরে আগামী কালের ভাগ্যবান ছেলেরা ভারতবর্ষে ইংরেজ-প্রভুত্বের ইতিহাস পড়া কাহিনীও বিশ্বাস করতে চাইবে না; এখনকাব এই বিক্ষুব্ধ দিনের কণামাত্র ছায়া পড়বে না তাদের শান্ত কিশোর মনের উপর।

নীলের ব্যবসা বন্ধ হলেও সাহেবদের আনাগোনা বন্ধ হয়নি কখনো জয়রামপুরে। টুইডির আমলে গ্রাম পত্তনি নেওয়া ছিল—কুঠির হাতায় একটা ঘরে কাছারি বসিয়ে নায়েব-গোমস্তা রেখে কিস্তিতে কিস্তিতে খাজনা আদায় হত। পৌষ-কিস্তির সময় বেশি জমজমাট হত কাছারি। ধানকাটার মুখে বাদায় অনেক পাখি এসে পড়ত, শহর থেকে সাহেবরা দল বেঁধে আসত পাখি শিকার করতে। দুধ-মাছ তরিতরকারি প্রচুর মিলত ঐ সময়টায়। কুঠিবাড়িতে অহরহ মেলা জমে থাকত।

শুধু এই সামান্য সম্পত্তির ব্যাপারে এতদূর টানা-পোড়েন পোষায় না। লারমোর নামে একজন নূতন সাহেব ব্যবসা ফেঁদে বসল। নীলের চাষ গিয়ে পাট-চাষের বেশি চলন হয়েছে—হাটখোলার পাশে ভদ্রার ধারে টিনের ঘর বেঁধে লারমোরের পাটের গুদাম হল। লারমোরকে লালমোহন-সাহেব বলত চাষা-ভূষা সকলে। পাটের মরসুমে লারমোর নিজে এসে চেপে বসত। প্রচুর পাট কিনে গাঁইট বাঁধা হত, পরে কলকাতায় চালান দিত মনের মতো দর পেলে। ভদ্রা মজে আসছিল। এই সময় ছোট-লাইন বসল, লারমোরের ব্যবসার সুবিধা হল এতে। শুধু নৌকাযোগে নয় স্থলপথে খুব অল্পসময়ে পাট চালান যেতে লাগল।

রেলগাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে জয়রামপুরের ভিতর দিয়ে প্রথম যেদিন স্টেশনে এসে দাঁড়াল, গ্রামবাসী সকলের কি উৎসাহ আর উত্তেজনা! নিতান্ত ছেলে-মানুষ আমি তখন। গোড়ায় একখানা মাত্র গাড়ি দিয়েছিল—সেইটে সকাল-বেলা ছুটত শোলাদানা অভিমুখে, বিকেলে আবার আগরহাটি ফিরে যেত। শোলাদানা নোনা জায়গা—মাছের সায়র ছিল, সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক মাছ আমদানি হত ওখানে। ঐ মাছ এবং মধ্যবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে পাট ও মাদুর চালান যাবে, এই ভরসায় এক বিলাতি কোম্পানি লাইন খুলেছিল। আমাদের জয়রামপুরে রেলের ওয়ার্কশপ হল। এই উপলক্ষে অনেক ফিরিঙ্গি কর্মচারী সপরিবারে এসে উঠল পুরানো সাহেবপাড়ায়। অনেক নূতন বাংলো উঠল, পাড়ার শ্রী ফিরল। হাটও খুব জাঁকিয়ে উঠল লাইন খোলার পর থেকে। গাড়ি অনেকক্ষণ থাকত এখানকার স্টেশনে, মানুষ ও বিস্তর মালপত্রের ওঠা নামা হত।

কার্জন বাংলাদেশকে দু-টুকরো করেছে, তাই নিয়ে আমাদের গ্রামেও সোরগোল। তখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি। বছর ঘুরে আবার তিরিশে আশ্বিন এল—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের তারিখ। পাঁজিতে পর্বদিনের নির্ঘণ্টের ভিতর ছেপে দিয়েছে—জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন। ভারাক্রান্ত মনে ইস্কুলে গিয়েছি। পাঠশালায় পর্যন্ত ছুটি—আমাদের ইস্কুল খোলা আছে, ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট লারমোর সাহেব ঐদিন ইস্কুল পরিদর্শনে আসছেন বলে।

নীলকমল দাস আমাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন। ফর্শা রং, লম্ব-চওড়া চেহারা, মাথার সামনে টাক। ফরিদপুরের দিকে কোথায় বাড়ি, চাকরির ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে জয়রামপুরে এসে পড়েন। চমৎকার পড়াতেন, অল্পদিনেই ছেলে-মহলে খুব নাম হল। তখনকার দিনে একখানা ইতিহাস পড়তে হত—'ভারতে ইংরেজের কার্যাবলী' এই গোছের নাম। ইতিহাস আদপেই নয়—ইংরেজ আমাদের আধা-অসভ্য ভারতবর্ষে রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ পোস্ট-অফিস ইত্যাদি সহযোগে স্বরলোক রচনা করেছে, আগাগোড়া তারই ফিরিস্তি। নীলকমল মাস্টারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর গম-গম করে ক্লাসের মধ্যে বাজত, এক সেকেণ্ড ফাঁকি দিতেন না তিনি। সমস্ত ঘণ্টা পড়িয়ে অবশেষে মন্তব্য করতেন, যা পড়ালাম—আগাগোড়া মিথ্যা কথা। পেটের দায়ে ইংরেজ এসেছিল এদেশে, ছল-চাতুরী করে এখন অধীশ্বর হয়ে বসেছে। যা-কিছু করেছে, সমস্ত নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার সুবিধা হবে বলেই। পেটের দায়ে আমাদের এই আজগুবি ইতিহাস পড়িয়ে যেতে হচ্ছে। তোমরাও মুখস্থ করছ ভবিষ্যতে পেট চালানোর সুবিধা হবে বলে।

বলে তিনি হেসে উঠতেন।

সেদিন তাঁর ক্লাস। কিন্তু মুখে হাস্যলেশ নেই। ইতিহাসের বই না খুলে বাংলাদেশের একখানা ম্যাপ এনে দেওয়ালে টাঙালেন। আমাদের একজনের কাছ থেকে একটা রুল নিয়ে ম্যাপের উপরে সেটা দিয়ে দুই বাংলার সীমানা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আজকের দিনে বিশেষভাবে উপলব্ধি কর—কি দশা করেছে আমাদের। সোনার বাংলা কেটে দু-ভাগ করেছে বাঙালীর প্রাণশক্তি বিচূর্ণিত করবার জন্য।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, উদ্গত অশ্রু সামলে নিচ্ছেন যেন। তাঁর বুকখানাই চিরে দু-ভাগ করেছে, ভাব দেখে এমনি মনে হল। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল আমাদের।

বারাণ্ডার দিক থেকে হেডমাস্টারের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। চিৎকার করে হুকুম দিলেন, ফটক বন্ধ করে দাও। এই দিকেই আসছেন তিনি, জুতার

মসমস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলকমল মাস্টার তাড়াতাড়ি দেওয়ালে
ম্যাপ গুটিয়ে একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলেন। গোড়া থেকে
শেষ অবধি উলটিয়ে যান, আবার গোড়ায় আসেন। একটি কথাও বেরুচ্ছে না
মুখ দিয়ে। রাস্তায় মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্-ধ্বনি। সবাই আমরা কৌতূহলী কিন্তু
হেডমাস্টারের আতঙ্কে গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাবারও সাহস নেই। লক্ষ্মণ
বাইরে গিয়েছিল—তোমাদের আজকের সভার সভাপতি লক্ষ্মণ মাইতি,
আমাদেরই সহপাঠী সে। ছুটতে ছুটতে সে এসে ঘরে ঢুকল।

নীলকমল মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ওদিকে?

লক্ষ্মণ বলল, বড্ড মারধোর করছে। প্রফুল্ল-দার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।
রাস্তার পগারে অজ্ঞান হয়ে তিনি পড়ে গেছেন।

কোন প্রফুল্ল বুঝতে পারলে নিশিকান্ত? বুড়ি-মেমের কুঠিতে যে হাসপাতাল
করে দিয়েছে, আজকের উৎসব-সভার প্রধান উদ্যোক্তা। চাল সাপ্লাইয়ের
কাজে ইদানিং তার প্রচুর টাকা। নূতন যে বাড়িটা করেছে, এ অঞ্চলে তেমন
বাড়ি আর নেই। সেই যে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তার শতগুণ পুরস্কার
মিলেছে জীবনে! ফাটা-মাথার দৌলতে সে এখন এসেম্বলির মেম্বর। অচিরেই
স্বাধীন দেশের মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন হবে, এই রকম শোনা যাচ্ছে। আমাদের
দু-ক্লাস উপরে পড়ত প্রফুল্ল, সেই তিরিশে আশ্বিন তারিখে সে ইস্কুলে আসে
নি। ভোরবেলা দল বেঁধে ভদ্রায় স্নান করে তারপর এর-ওর হাতে হলদে
রাখি পরিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর বিলাতি কাপড় সংগ্রহ করে স্তূপাকার করছিল—
বিকালবেলা হাটখোলায় নিয়ে আগুন দেওয়া হবে সকলের সামনে। বাবার
চোখ এড়িয়ে আমিও একবার ওদের সঙ্গে খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি। প্রফুল্লর
সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করছিলাম। বাবার কড়া শাসন না থাকলে আমিও কি
চুপচাপ ক্লাসে এসে বসতাম আজকের দিনে? এই যে শোনা গেল, মার খেয়ে
সে ধরাশায়ী হয়ে আছে—এর জন্যও হিংসা হচ্ছে প্রফুল্লর উপর।

নীলকমল মাস্টার বইয়ের পাতা উলটানো বন্ধ রেখে মুহূর্তকাল টেবিলের
দিকে চেয়ে রইলেন। কি ভাবছিলেন কে জানে। তারপর আমাদের দিকে
দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন, বন্দেমাতরম্ বলা বেআইনী হয়ে গেছে।
রাস্তাঘাটে চেঁচামেচি করে খবরদার কেউ ডেপোমি করতে যাস নে।

চেয়ার থেকে উঠে সামনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, এত
গণ্ডগোলে পড়াশুনা হয়? অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। চুপ কর তোমরা
এইবার।

আমি বললাম, চুপচাপ বসে থাকি। আজকে আর পড়াবেন না।

ভ্রুকুটি করে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন।

বাইরে তুমুল কাণ্ড। দুয়োর এঁটে শান্তমনে পড়াশুনোর সময় কি এখন? নীলকমল মাস্টার বললেন, বড় লড়াইয়ের ভিতর কারখানা এক মিনিটও বন্ধ রাখা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় মাপ মিলিয়ে কারিগর বারুদ-গোলাগুলি তৈরি করে।

একটি ছেলে বলল, আমরা বুঝি গোলাগুলি মাস্টার মশাই? ইস্কুল কারখানা?

গোলা-বারুদের চেয়ে ঢের বেশি জোরালো অস্ত্র তোমরা। দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, সেদিনও ইস্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা যাবে না একটা দিনের জন্য।

আর একটা কথাও না বলে তিনি ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের অধ্যায় পড়ালেন। যা পড়াচ্ছেন, ছাপা-বইয়ের সঙ্গে তা মেলে না। সেই একটা দিন পড়লাম বটে নীলকমল মাস্টারের কাছে, আজকে বুড়ো বয়সেও তার স্মৃতি ভুলতে পারি নি। স্বাধীনতার জন্য এই যে আমরা সংগ্রাম করে চলেছি, সেদিন তারই যেন এক পশ্চাৎপট আমাদের কিশোর মনের উপরে তিনি এঁকে দিলেন, ভারতের প্রথম ইংরেজ-বিতাড়ন চেষ্টায় ব্যর্থ ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা করে। তাঁর মাস্টারি-জীবনের সেদিন শেষ পড়ানো—কোন দৈবশক্তির বলে যেন টের পেয়েছিলেন, তাই তিনি অমন প্রাণ ঢেলে পড়ালেন।

ঘণ্টা শেষ হয় নি, হেডমাস্টারের লিখিত হুকুম এল—সকলকে মাঠে যেতে হবে তখনই। প্রেসিডেন্টের সামনে ইস্কুলের সমস্ত ছেলে একসঙ্গে ড্রিল করবে, ক'দিন থেকে তার তোড়জোড় চলছিল। ড্রিলের পর সাহেব ছেলেদের সম্বোধন করে দু-চারটে উপদেশ দেবেন। কিন্তু সে তো এখন নয়, প্রেসিডেন্ট ঘুরে ঘুরে ক্লাস পরিদর্শন করবেন—তারপর। আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

গিয়ে দেখলাম, কানু গাঙ্গুলি, আমাদের অনেক নিচে পড়ে—তাকে নিয়ে ব্যাপার। লারমোর সাহেব আর হেডমাস্টার মাঠের প্রান্তে পাশাপাশি দু-খানা চেয়ারে বসেছেন। ইস্কুলের দারোয়ান তাঁদের ঠিক সামনে দৃঢ়মুষ্টিতে কানাই-এর হাত ধরে আছে। হেডমাস্টারের মুখে-চোখে যেন আগুনের হল্কা-বেরুচ্ছে। সকল ছাত্র হাজির হলে তাদের সামনে খুব জাঁকালো রকমের শাস্তি দেবেন—এইজন্যে বহু কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে আছেন।

কানু—আমাদের কানাই। ফুটফুটে অতি সুন্দর চেহারা বলে ইস্কুলসুদ্ধ সবাই ভালবাসত কানুকে। ক-বছর আগেকার কথা—প্রথম যেবার কানু

ভরতি হল। তখন তার আরও কম বয়স। এই নীলকমল মাস্টারই ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, কানু শুকনো মুখে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নীলকমল হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ফাঁকি দিয়ে এখানে বেড়াচ্ছিস যে তুই ?

ভাল লাগে না মাস্টার মশাই।

তার কোমল স্বরে মুহূর্তে নীলকমল মাস্টারের রাগ জল হয়ে গেল। ছোট শিশু, মা-ভাই-বোনের কাছ-ছাড়া হয়ে এসেছে—ইস্কুলের এত ছেলে, মাস্টার ও নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত একলা মনে করছে। গলা নামিয়ে তিনি বললেন, তা বারান্দায় বেড়াস নে ও-রকম, হেডমাস্টার দেখলে রক্ষে রাখবে না। বেড়া গলে বেরিয়ে যা বাঁশতলা দিয়ে। কুমোরেরা ঐদিকে হাঁড়ি-মালসা পোড়াচ্ছে, দেখে আয়।

নীলকমলের মতো রাশভারি মাস্টার আমাদের সকলের সামনে অবলীলাক্রমে এই একফোঁটা ছেলেকে ইস্কুল পালাতে পরামর্শ দিলেন। সেই নিরীহ শিশুর ইতিমধ্যে এমন উন্নতি হয়েছে যে, তার শাস্তি-গ্রহণের সাক্ষি হবার জন্য শিক্ষক-ছাত্র সকলে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে আছি কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে। আমরা সবিস্ময়ে বলাবলি করি—হাবা ছেলেটা কি কাণ্ড করে বসেছে না জানি, যার জন্যে কচি মাথার উপর বজ্র নিক্ষেপের এই আয়োজন।

অবশেষে অপরাধ জানা গেল। কানুর ক্লাশের একটি ছেলে চুপি চুপি বলল। লারমোর হেডমাস্টারের সঙ্গে ক্লাস পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। কানুদের ক্লাসে গিয়ে সদুপদেশ দান করছিলেন, ছেলেরা এই যে 'বন্দে মাতরম্' বলে হল্লা করে বেড়াচ্ছে ধামা-ধামা বিলাতি নুন এনে পুকুরের জলে ঢালছে, বিলাতি কাপড়ে আগুন দিচ্ছে—এ সমস্ত অত্যন্ত অনুচিত, ছাত্রদের শুধু একমনে পড়াশুনা করাই কর্তব্য। সুরেন বাঁড়ুজ্যের নামে খুব গালিগালাজ করলেন এই প্রসঙ্গে। কানু উঠে সাহেবের কাছে এল। তার নধর সুন্দর চেহারা দেখে প্রসন্ন হাসি ফুটল সাহেবের মুখে, কি চাই—বলে সস্নেহে তাকে প্রশ্ন করলেন। কানু মুখে কিছু না বলে একগাছি হলদে রাখি পরাতে গেল সাহেবের হাতে। পরাতে পারে নি, সাহেব ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলেন।

সকলে সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছি। একবার কানুর দিকে আর একবার হেডমাস্টার ও লারমোর সাহেবের দিকে তাকাই। হেডমাস্টার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সকলের সামনে সাহেবের পা ধরে মাপ চা, নয় তো রক্ষে নেই। নিজের কান নিজে মল্। বল্, আর কক্ষণো এমন করব না।

কানু জবাব দেয় না, ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডমাস্টার এক থাপ্পড়

কষিয়ে দিলেন তার গালে। কান্থ পড়তে পড়তে সামলে নিল। তেমনি স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি অফিস-ঘর থেকে বেত নিয়ে এসে সপাসপ কান্থর পিঠে মারতে লাগলেন।

নীলকমল মাস্টার ছুটে গিয়ে কান্থকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকুল পক্ষীমাতা যেমন পালক দিয়ে ঢাকে শাবককে।

হেডমাস্টার বললেন, সরে যান নীলকমলবাবু। এত বড় শয়তানের উপর দয়া দেখাতে চান ?

নীলকমল বললেন, সাহেব ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট—আমাদের আপনার লোক। তাই একটা রাখি পরাতে গিয়েছিল। এই সামান্য ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়েছেন কেন আপনারা ?

হেডমাস্টার বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, সরে যেতে বলছি, আপনি তা শুনবেন না ? বুঝতে পারি না, আপনি কি করে উৎসাহ দেন এ ব্যাপারে।

নীলকমল দাস সৎকাজে ছেলেদের চিরদিনই উৎসাহ দিয়ে এসেছে।

লারমোরের রোষদৃষ্টি কিংবা হেডমাস্টারের আস্ফালনে কিছুমাত্র দৃকপাত না করে কান্থর হাত ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডমাস্টার চেঁচিয়ে বললেন, আর ঢুকবেন না কোনদিন ও-ফটক দিয়ে। প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে আপনাকে বরখাস্ত করা হল।

নীলকমল বললেন, ইস্কুলটাকে আপনারা জল্লাদখানা করে তুলেছেন। কচি ছেলেপুলের উপর জল্লাদ-বৃত্তি করা পোষাবে না আমারও।

নীলকমল আর ইস্কুলে ঢোকেননি। ক'টি ছেলে পড়াতেন, আর খাতা লিখতেন হাটখোলায় এক মহাজনের গদিতে। একলা মানুষ—নিজে রান্না করে খেতেন—এতেই চলে যেত। কিন্তু কান্থ ফিরেছিল। তার বাবা মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ এ অঞ্চলের সর্বশ্রদ্ধেয়। সাহেবপাড়াতেও তাঁর খাতির ছিল। একবার এই লারমোরের জন্যই বহু আয়োজনে তিনি তিনদিনব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিলেন। কান্থর বৃত্তান্ত কানে গেলে সেই বিকালেই ন্যায়তীর্থ মশায় ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে এনে হেডমাস্টারের সামনে হাজির করলেন। লারমোর তখনো চলে যাননি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করজোড়ে কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন। তাঁর বড় ছেলে এই ইস্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পাশ করেছে, এখনো সে সাহেবসুবো ও পূজ্যজনের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করে না। আর এই একফোঁটা ছেলের এই রকম দুষ্প্রবৃত্তি—নিশ্চয় কুসঙ্গে পড়ে এমনটা হয়েছে। ন্যায়তীর্থ মশায় হায়-হায় করতে লাগলেন।

কানুর অপরাধের মার্জনা হল। যথারীতি সে ইস্কুলে পড়াশুনা করতে লাগল। কিন্তু কুসঙ্গ ছাড়াতে পারলেন না হেডমাস্টার বা ন্যায়তীর্থ মশায় অহরহ সতর্ক দৃষ্টি রেখেও।

ক্লাসের দেয়ালে হঠাৎ একদিন একখানা কাগজ আঁটা দেখলাম—

লারমোর ও তাঁহার তাঁবেদার ঐ হেডমাস্টার ত্রৈলোক্য গড়গড়িকে আমরা চক্ষের পলকে শেষ করিতে পারি। কিন্তু মশা মারিবার জন্য তোপের অপব্যয় করিব না। অস্ত্রবলে ইংরেজকে দূর করিব, তাহারই বিরাট আয়োজন হইতেছে। আমরা তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছি। যে-কেহ আত্মদান করিতে চাও, অতি সহজে সন্ধান পাইবে।

সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি, কানু ও আরও অনেক। অস্ত্রের বিরাট আয়োজনই বটে। ইস্পাতের নয়—সর্বত্যাগী শত শত বীর কিশোরের দেশপ্রেম ও বীর্যের অস্ত্র।

হাল ফ্যাসানের বাড়িটা দেখছ বুঝি অবাক হয়ে! পল্লীগ্রামে এমন বাড়ি দুর্লভ। প্রফুল্ল তৈরি করেছে—এরই কথা বলছিলাম নিশিকান্ত। বিয়াল্লিশ সালে আমরা জেলে ছিলাম, তখন মিলিটারি সাপ্লাইয়ে এবং পরের বছর দুর্ভিক্ষের সময় চাল ধরে রেখে সে দেদার টাকা কামিয়েছে। বেনামি ব্যবসা—কাগজ পত্রে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া পাবে না। সব্যসাচী নাম দেওয়া চলে প্রফুল্লর—অর্থার্জন আর দেশসেবা একসঙ্গে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে শেষবার জেলে গিয়েছি। শেষবার বলা ঠিক হল না হয়তো। স্বাধীন-ভারত হলে কি হয়, আমাদের কথা বলবার জো নেই। গাজনের সন্ন্যাসীর অবস্থা হয়েছে, ঢাকের বাজনা শুনলেই পিঠ সুড়সুড় করে ওঠে। ইংরেজদের সঙ্গে অসম-সংগ্রামে দীর্ঘকাল লাঞ্ছনা-নির্যাতন সয়ে সয়ে বড় স্পর্শকাতর হয়ে আছি আমরা। কানুর কথা, প্রভাস মহারাজের কথা আরও কতজনের কত কথা মনে আসে। তাদের নিষ্ঠার মধ্যে একতিল ফাঁকি ছিল না—তেমনি তাদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে একবিন্দু মালিন্য সহ্য হবে না আমাদের। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে কতদিন চলতে পারব প্রফুল্লদের সঙ্গে?

কিন্তু থাক এ সব। এক বছরের জেল হয়েছিল, সে তো আমাদের কাছে একদিনের সর্দিজ্বরের সামিল। জেল থেকে বেরিয়ে কিছুকাল এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে গ্রামে এসেছি। প্রফুল্ল এল দেখা করতে। কেন জানি না, আমায় সে অত্যন্ত খাতির করে। অথচ নির্বিরোধী মানুষ আমি, চালের

কারবারের তথ্য উদ্‌ঘাটনে লেগে যাব—এমন আতঙ্ক নিশ্চয়ই তার নেই আমার সম্পর্কে। ইংরেজ ছাড়া কেউ কোনদিন আমার শত্রু নয়। ইংরেজও আর শত্রু থাকবে না যদি সরল মনে সত্যি সত্যি নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় এদেশের সঙ্গে—নাক ঢুকিয়ে ফের শয়তানি করতে না আসে।

প্রফুল্ল বলল, ভাল হয়েছে—তুমি এসে গেছ। শুনেছ বোধহয় ন্যাপলার মা'র বাড়ির জায়গাটা কিনে আমি বাড়ি তোলবার ব্যবস্থা করছি। হাসি কি করে টের পেয়ে গেছে কান্নুর সমস্ত বৃত্তান্ত।

আজকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রফুল্ল আমাদের সেকালের গোপন কাহিনী জাহির করে বেড়াবে। তাতে তার পশার বাড়বে, আখেরের সুবিধা হবে। কিন্তু সেদিন স্বাধীনতা আসে নি। তাই চারিদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে চুপি-চুপি প্রফুল্ল বলল, একসময় গিয়ে জায়গাটা নিরিখ করে দিয়ে এস। আমি পেরে উঠলাম না। জায়গা সাব্যস্ত হলে আলাদা করে ঘিরে সেখানে কান্নুর স্মৃতিস্তম্ভ গেঁথে দেব।

দু-একদিন অন্তর এসে ঐ কথা তোলে। তাগিদ দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলল। শেষকালে একদিন কোদাল আর কয়েকটি ছেলে নিয়ে চলে এলাম এখানে। সেকালের মতো এখনকারও কিশোর একদল আমায় ভালবাসে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যা বলি তখনই তামিল করে।

খোঁড় দিকি এই জায়গায়। হাত তিনেক খুঁড়লেই বোঝা যাবে। খোঁড় আচ্ছা, আর খানিক দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়—যতক্ষণ না পাস, এমনি খুঁড়তে খুঁড়তে চলে যা। নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

খুঁড়ছে তারা। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

একজনে প্রশ্ন করল, গুপ্তধন আছে নাকি দাদা এখানে ?

সে কি আজকের ব্যাপার নিশিকান্ত ? জোয়ান-যুবা ছিলাম, এখন বুড়ো হয়েছি—ছেলেদের কথায় হাসি পায়। সত্যি, গুপ্তধনই বটে! এমন মণি-মাণিক্য ক'টা জাত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে ?

হাসিমুখে আমি জায়গার নির্দেশ দিচ্ছি—উঁহু, এদিকটায় আর নয়। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে আমবাগান। এখানে হবে কি করে ?···কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন ? তোমাদের ওধারেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে কি অবস্থা হয়েছে দেখুন দাদা—

যার দিকে চেয়ে বলছিলাম, সে হাত মেলে দেখাল। টুকটুকে ফরসা

বড়লোকের ছেলে—কোদালের মুঠো জীবনে ধরে নি। হাত রাঙা হয়ে গেছে।

এত কষ্ট দিচ্ছি ওদের, তার জন্য অপ্রতিভ হই। বললাম, কি করব—ধরতে পারছি না যে, তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল, বাগিচা, ন্যাপলার মা'র দো-চালা কুঁড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রি—তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা রাখা হয় নি, আর সময়ও ছিল না তাই। আবার কোনদিন যে খুঁড়ে দেখবার দিন আসবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন?

উৎসাহ দিয়ে বলি, খোঁড়—খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে পেয়ে যাবে একটা কলসি। সোনার নয়, পিতলের নয়, মাটির কলসি।

কলসির ভিতর?

সেই ফরসা বাবু-ছেলেটি বলল, সোনার মোহর—

আর একটি ছেলে বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা—

বড়লোকেরা দিত। টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি করে?

আমি বললাম, দিত কি সাধ করে রে ভাই।

সেই পুরানো কালের কথা ভেবে কষ্ট হয়। কত শক্তি, উদ্যোগ ও জীবন নষ্ট হয়েছে টাকা-সংগ্রহের ব্যাপারে! তরুণেরা প্রাণ দিতে অকুণ্ঠে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু টাকার সিন্দুক আগলে ছিল বড়লোকেরা। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, মহা-শক্তিধর ইংরেজকে বিদায় নিতে হবে অদূরকালে, সর্বরিক্ত স্বপ্নবিলাসী আমাদেরই দল জয়যুক্ত হবে।

একটি ছেলে আমার কথার পরিপূরণ দিল, দিত না বলেই তো এঁরা ডাকাতি করে আনতেন।

আমি হেসে বলি, ডাকাতি কখনো স্বীকার করি নি। বলে আসা হত, দেশের কাজে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, স্বাধীন-ভারতে সুদ সমেত পরিশোধ করা হবে। সেই সব উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারীরা জাতীয়-ঋণ বলে স্বচ্ছন্দে টাকার দাবি করতে পারে আজকের গবর্নমেণ্টের কাছে। দেশের কাজেই লেগেছিল সে টাকা পুরোপুরি। এক একটা রিভলভারেরই জন্য লাগল পাঁচ-শ' থেকে হাজার। কী রকম খরচ তা হলে বোঝ।

গাছতলায় ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। নজরের সে জোর নেই। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছি, এইরকম মনে হচ্ছে। গাছপালা-বিহীন এই সুপ্রশস্ত জায়গা, আশে পাশে উদ্ধত আধুনিক বাড়ি কয়েকটা—

সেকালের সঙ্গে কিছুতেই এদের যোগ ঘটাতে পারে নি। দু-তিন বছর পরে এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে নূতন পরিচয় শুরু করি—ভাল চেনা-জানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে আটকে রাখে।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। ডাক্তার যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছে। দু-হাতে রোজগার করছে সে-ও, তাকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। মানইজ্জত খুব। প্রফুল্লর হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তো আছেই—তা ছাড়া গবর্নমেন্টের পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছে এই জয়রামপুরে থাকা সত্ত্বেও। আর বেশিদিন এখানে থাকবে না জানি, কলকাতায় গিয়ে উঠল বলে ভাল সরকারি চাকরি নিয়ে।

তিন বার গিয়ে রাত্রি সাড়ে-নটায় ডাক্তারের দেখা পেলাম। মোটরসাইকেল কিনেছে, সাইকেল চাকরের জিম্মায় দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল, আমাকে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এল।

চোখে আজকাল কম দেখছি অমূল্য ভাই, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে।

কোন জায়গা ?

মনে পড়ছে না ? ন্যাপলার মা'র বাড়িতে সেই যে রাত্রিবেলা—

অনেক দিনের কথা, মনে না পড়ার জন্য অমূল্যকে দোষ দেওয়া যায় না। অবশেষে তার মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, আমাকে আর ও-সবের মধ্যে কেন দাদা ? ও. বি. ই. টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

বললাম, ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। বেড়াচ্ছ না বেড়াচ্ছ—কে দেখছে অত সকালে ? ছেলেরা আজ সমস্তটা দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

কবে কে আমার হাত এড়াতে পেরেছে বল নিশিকান্ত ? এখনই দেখছ তো—তোমাদের এমন জরুরি মিটিং, তবু কাজকর্ম ফেলে গল্প শুনে বেড়াচ্ছ তুমি এই বুড়োর সঙ্গে। অমূল্য ডাক্তারকে এইখানে এনে তবে ছাড়লাম। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেও হয়—সেই সময়ে দুজনে এসেছি। আমবাগান কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনে ঢেলেছে গাড়ি-গাড়ি, খোয়া ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে। অমূল্যর চোখ চকচক করে উঠল।

উঃ—বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো এতটা জমি নিয়ে! এদিকে আজকাল বড় একটা আসা হয় না—এতবড় ব্যাপার, তা জানতাম না।

ঘুরে ঘুরে সন্ধান করছে, কিন্তু মন তার ওদিকে। আবার বলতে লাগল, অ্যাসেম্বলির মেম্বর—মোটা মাইনে-ভাতা, তার উপর সাপ্লাইতে কম টাকা পিটেছে! ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে নামলে মুনাফা অনেক বেশি ছিল দেখছি আর আমার সুযোগ ছিল—আধাআধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

অবশেষে সন্ধান হল জায়গাটার। অমূল্যই দেখাল।

কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ বলে দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের গোড়া নিশানা করে খুঁড়তে বলবেন ওদের। খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, খড়ি দিয়ে দেগে দিয়ে গেছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ!

অমূল্য দেরি করল না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হল।

ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, শুনে আরও ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের ডেকে নিয়ে এলাম। প্রফুল্লর এত হাঁটাহাঁটি তো এই ভয়েই—কবরের উপর পাছে বাড়ি তুলে বসে।

খোঁড়—

মিস্ত্রি-মজুরেরা হাঁ-হাঁ করে এল। এখানে কি মশাই? আরে যেখানে যা ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর কোদাল চালাতে দেব না।

বললাম, তোমাদের বাবুকে খবর দাও গিয়ে। তার কাছ থেকে শুনে এস, সেই-বা কি বলে।

ছুটে চলল তারা। কাজ বন্ধ করি নি, ছেলেরা খুঁড়ে চলেছে। কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। পরে সরকার বাবুর মুখে শুনেছিলাম ওদের যা কথাবার্তা হয়েছিল প্রফুল্লর সঙ্গে। প্রফুল্ল অবহেলার ভাবে জবাব দিল, যাকগে, বুড়োমানুষ যা করছেন করতে দাও—

সরকার আশ্চর্য হয়ে বলল, এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল—আজকে যেখানটায় আরম্ভ করছেন, তাতে আমাদের প্ল্যান মতো কাজ করা কোন মতেই আর চলবে না।

প্রফুল্ল বলল, প্ল্যান বদলাতে হবে তা হলে। চুপচাপ দু-চারদিন তোমরা বসে থাক গে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার, উনি করে চলে যান।

দু-চার দিনের আর দরকার হয় নি নিশিকান্ত, কলসি সেইদিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ হল কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে ক'টি ছেলের সঙ্গে আমি গল্পগুজব করছিলাম। ক্ষীণ শব্দ শুনে ছুটে এলাম সেই জায়গায়।

বেরিয়েছে? ইস, কানায় কোপ ঝেড়ে দফাটি সেরে দিয়েছিস একেবারে? কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছিল কোদালের কোপ লেগে। ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে কি আছে ওর ভিতর, যার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছি ঐ কলসি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই—সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে তো ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি বের করে দেখবে তার আগেই আমি এসে পড়েছি।

হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একটা খোঁটা পুঁতে রাখ ঐখানটায়। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কি না—

কলসি উপরে নিয়ে এল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছি। ছেলেরা চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিঃশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। তারা মনে করছে, কী তাজ্জব জিনিস না জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মানিক। মাটি বের করে যাচ্ছি আমি, কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে?···তারপর পেয়ে গেলাম। আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে ছেলেদের বলি, হ্যাঁ—এই বটে!

মুঠো খুলে তাদের দেখালাম—কড়ি কতকগুলো। বললাম, পাওয়া গেছে রে—এ সেই জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে রেখে আয় ওখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার চোখে সহসা জল আসবার মতো হল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম, খোঁটার আগায় নিশান উড়িয়ে দে। কানু গাঙ্গুলির কবর এখানটায়।

কানু গাঙ্গুলির কবর—বলেন কি?

মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ মশায়ের ছেলে।

বুড়ো হয়ে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে নিশিকান্ত, অতি নিকটের জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পাই নে। মনের দৃষ্টি কিন্তু পরিচ্ছন্ন আছে। বরঞ্চ বুড়ো হয়ে যেন স্বচ্ছতর হচ্ছে দিন দিন, দূর-কালের ঘটনা জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। যেন এখন—এই মুহূর্তে ঘটেছে সমস্ত চোখের উপর। আজকে জয়রামপুরের সমৃদ্ধি বেড়েছে; মিউনিসিপ্যালিটি বসেছে, অনেকগুলো পাকা-রাস্তা। তখন একটা মাত্র পাকা-রাস্তা ছিল সাহেবপাড়া থেকে আগরহাটির গঞ্জ অবধি। তারপর মিটার-গেজের লাইন বসল পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে, রাস্তারই একটা অংশ দখল করে। ভদ্রার কূলে সাহেবপাড়ার প্রান্তে রেলের

ওয়ার্কশপ। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে; সাহেব-কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল। এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোট-রেলের কোনই চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে যুদ্ধের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন দস্তুরমতো যুবাপুরুষ আমি—বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপি-টিপি চলেছি। আজকের স্বনামধন্য প্রফুল্ল মজুমদার এম.এল.এ. মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লর বাড়ি থেকেই সব রওনা হয়েছি। প্রফুল্লর বোন হাসি। মোটা থপথপে বিধবা মেয়েটা তখন ছিল নিতান্ত ছেলেমানুষ। কী রকম সন্দেহ হয়েছিল বুঝি তার—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ খাইয়ে দিল কানুকে। কানু কিছুতেই খাবে না, তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে সেই প্রথম সে তার হাত ধরল—গা শিরশির করে উঠেছিল কি-না বলতে পারিনে সে-দিনের কুমারী মেয়ে হাসির।

অন্ধকার বর্ষারাতে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছি। নীলরতন মাস্টার ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছেন, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে তাঁর কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে। হ্যাঁ—দেয়ালে আঁটা সেই কাগজের লেখকের সন্ধান করতে করতে নীলরতন মাস্টার মশায়ের নতুন পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। ফেরারি হয়ে ছদ্মনামে জয়রামপুরে এসেছিলেন। বছর চারেক পরে আবার একদিন সহসা অদৃশ্য হয়ে যান।

ওয়ার্কশপের কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে আর খানিকটা গিয়ে সাহেবপাড়ায় পা দিলে মনে হয়, নন্দনকাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো পরিচ্ছন্ন লনের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে ওড়ে। রাত্রে জোরালো পেট্রোমাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তার অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেবপাড়ায় কি দেখে এল সেই গল্পগুজব করে, দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে—তাদের কাছে সগর্বে ঐ সব কাহিনী বলে।

খবর এসেছিল, লালমোর সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সদর থেকে এসেছেন। মরশুম এসে পড়েছে—পাট কিনবার জন্য এখন হপ্তায় হপ্তায় টাকা আসবে কলকাতার হেড-অফিস থেকে। গাড়ি আজ লেট ছিল, সন্ধ্যার পরে এসে পৌঁচেছেন, সমস্ত টাকা সাহেব নিজের কোয়ার্টারে আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, অফিসের আয়রন-সেফে রাখেন নি—এ অঞ্চল অনেক দিনের চেনা-জানা—টাকাকড়ি সম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক হবার প্রয়োজনও মনে করেন নি।

একটা কথা জেনে রাখ নিশিকান্ত, সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি সারা তুনিয়ায় নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে, লবণ সত্যাগ্রহে কিংবা আগস্ট-আন্দোলনের সময় বহুক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর সবাই দেখেছে—আর আজকে আমার কাছ থেকে শোন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দাদের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয় সিলিণ্ডার রিভলবার হাতে রয়েছে, কিন্তু লারমোর সাহেব ট্রিগার টিপলেন না, কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তাঁর মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়। দলের একজন তুজন করে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, সম্রাটের জ্ঞাতিগোষ্ঠি অতগুলো প্রাণীর তাতেই মূর্ছা'র অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

বেরিয়ে চলে আসছি—সাহেবরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিছু করেনি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধলে। বাহাতুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সে-ই। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, আর অব্যর্থ টিপ—কানু মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে এই গোলযোগে কুলিবস্তি থেকে পিল-পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবদের হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। পাশে বসে একটুখানি দেখব, রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করব—সে উপায় নেই। পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে, বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

আজ বলে নয়—চিরদিনই সাফ বুদ্ধি প্রফুল্লর, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্য তিন-চার জনে মিলে উল্টোমুখো পাকা-রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেব ক'জন পিছু ছুটেছে। বকুলতলার অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সুযোগের অপেক্ষায়। সবাই খুব খানিকটা এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি জাঙালের ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌছলাম।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা ভাল করে একবার দেখবার চেষ্টা করলাম—যে মুখে ওরা লাথি মেরে গেছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে। সাহেবরা প্রফুল্লর পিছু-পিছু যখন ছুটছিল, বকুলতলা থেকে ওদের টর্চের আলোয় দেখলাম—ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে

কান্থ—পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে আমি দেখলাম, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

ঝান্থকে নিয়ে এলাম ঐ যে বিশাল কম্পাউণ্ড—ওরই ভিতর। তখন প্রকাণ্ড আমবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত—ন্যাপলার মা বলে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতাম আমরা, মা ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্ঝাট পোহাত! রাতবিরেতে যখনই দায় পড়ত, আমরা চলে আসতাম ন্যাপলার মা'র ওখানে। ন্যাপলার মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্রও নেই,—কতদিন আমাদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষি ছিল সে। দশ বাড়ি ধান ভেনে গোবর মাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে করতে কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি! কিন্তু আশ্চর্য, কখনো কোন অবস্থায় আমাদের বিষয়ে একটা কথা বুড়ি উচ্চারণ করে নি।

ন্যাপলার মা'র ঘরের ভিতর তো এসে নামালাম কান্থকে। টেমি জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে। কান্থর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প। অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার মা সজল চোখে—বাসনপত্র তো নেই—নারিকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। কান্থকে নামিয়ে রেখে আমি ছুটে বেরিয়েছি ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল—ঐ অমূল্য-সরকার। তাকে খবর দেওয়ার অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য, ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। প্লুরিসির মতো হয়—মাস ছয়েক তাই গ্রামে থেকে বিশ্রাম করছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না। অতএব অমূল্যের চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায়?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের একখানা চৌরিঘরে সে শুত, আমার জানা ছিল। দরজায় টোকা দিলাম, ঘুম ভাঙল না। তখন ছ্যাচা-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিসফিস করে ডাকতে লাগলাম, অমূল্য! অমূল্য! সে পাশ ফিরে শুল। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কি!

চুপ! বেরিয়ে এসো—

মেঘ জমে আছে আকাশে, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বললাম, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগগির চল।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশনের যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে। যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোন রকম ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে, খুঁজে-পেতে, ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সের মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে আমার সঙ্গে চলল।

গিয়ে অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টরটর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প কয়ছে, কেমন করে ধোঁকা দিয়ে দলসুদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁ করে দৌড় দিল পাটক্ষেতের দিকে—পুরো দমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে? এ ক্ষেত থেকে সে ক্ষেত—শেষকালে চারিদিকে দেখে-শুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্য। হাসিতে উদ্ভাসিত কানুর মুখ, প্রফুল্লর গল্প সে খুব উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্ত বন্ধ হয়নি, যন্ত্রণায় মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে, হাসির প্রলেপ কিন্তু তার ঠোঁট দু-খানার উপর।

টেমির আলোয় তিন দিক ভাল করে ঢেকে দেওয়া হল, কানুর দেহ ছাড়া বাইরে কোন দিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর আমি দু-পাশে তৈরি হয়ে বসেছি, কানু ইসারায় মানা করল—ধরবার প্রয়োজন হবে না তাকে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নূতন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে এমনভাবে চিরতে লাগল যে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল। এ বীভৎস ব্যাপার চোখ মেলে দেখা যায় না—কাজ সেরে টেমি নেভাতে পারলে বেঁচে যাই।

কিন্তু কোন লাভ হল না নিশিকান্ত, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আছে। একবার দেশলাই জেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে আমরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছি। শ্যাপলার মা জল গরম করবার জন্য মাচার উপর থেকে টেনে শুকনো নারিকেলপাতা বের করছে। প্রফুল্ল ডেকে বলল—থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানেই বসে পড়ল হ্যাপলার মা।

আমগাছের বাসা থেকে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে আমরা চমকে উঠলাম—রাত আছে মোট ঘণ্টা দেড়েক। ন্যায়তীর্থ মশায় গত হয়েছেন—প্রফুল্ল ছুটল কানুর দাদা বলরামের কাছে—একটিবার শেষ দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ নিশিকান্ত, রায়সাহেব বলরাম গাঙ্গুলী, ডাকনাম ছিল বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে? এমনি সর্বত্র—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোসামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে হয়তো দেখতে পাবে, ইংরেজদের প্রবলতম শত্রু তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা ফাটানো যায়, কিন্তু মনের মাথায় যে লাঠি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজদের নিরাপদ ভূমি এক টুকরোও ছিল না—কেউ ভাল চোখে দেখত না ওদের! কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমতলায় নাটার ঝোপের আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমন সময় রায়সাহেব এলেন, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস চেপে নিলেন।

বলরামকে বললাম, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলী মশাই, আপনার মাকে নিয়ে এলেন না কেন? তিনিও একটু দেখে যেতেন।

বলরাম বিচলিতভাবে না-না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ইদানীং বেড়াচ্ছিল সেইভাবে,—একদিন এক পলক দেখা গেল তো মাসখানেক আর পাত্তা নেই। না-না, মাকে আর এর মধ্যে টানাটানি করতে যেও না। এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—বাড়িসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুরঝুর করে আমি আর অমূল্য গুঁড়ো-মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছি দেহের চারিদিকে। প্রফুল্ল চলে গেছে আজকের ব্যাপারে টাকাকড়ি যা পাওয়া গেছে, তার বিলিব্যবস্থা করতে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে সহসা রায়সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে তোমরা?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে গেলে জানাজানি হয়ে পড়বে, এ ছাড়া উপায় কি? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে!

বলে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

আমি বললাম, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে বখরার হিসাব কষে, তাদের কাছে! লড়াইয়ের মুখে জাত-বেজাতের হিসাব থাকে না রায়সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নধর গায়ে চাপাতে কেমন মায়া লাগছিল, তার মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় মাটি গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ফেলেছি। ন্যাপলার মা এই সময়ে মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা, এ সব ওর সঙ্গে দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে।

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—যা এত বছর তার নিঃশেষিত দেহ-চিহ্নের নিশানা হয়ে রয়েছে ভূমি-গর্তে।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশের চেলা সাজিয়ে ঢেকে দিলাম। এইসব কাঠ-পাতা যেন অনেকদিন ধরেই এই রকম পড়ে আছে—কেউ যাতে তিলমাত্র সন্দেহ করতে না পারে!

সন্দেহ কেউ করে নি! অমূল্য বড় ডাক্তার—সরকার মহলে অনেক নাম। রায়সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায়বাহাদুর-রূপে কিছুকাল আগে রিটায়ার করেছেন। আমাদের প্রফুল্ল এম. এল. এ. হয়ে সরকারি চালসাপ্লাইয়ের কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। ন্যাপলার মা বুড়ি কোন্ কালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশেপাশের অনেক জমি নিয়ে অপরূপ বাগানবাড়ি প্রফুল্লর।

কানুর স্মৃতিস্তম্ভ আজও হয়ে ওঠে নি! কিন্তু এবারে স্বাধীন-ভারতে নিশ্চয় প্রফুল্ল গেঁথে দেবে—আর টালবাহনা করবে না। বছরের একটা দিন বিশ-পঞ্চাশ জন জমায়েত হয়ে সভা করেও যাবে হয়তো এখানে কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সেকালের সেই প্রফুল্ল আর নেই। কজনই বা মনে রেখেছে কানুকে! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম কেউ দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর! কিংবা··· ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা হাসির ভাবটা কেমন কেমন!

নাছোড়বান্দা তার কাছে একদিন অবশেষে বলে ফেলেছিলাম আগাগোড়া এই কাহিনী। আমা হেন লোক—আমারও মুখ খুলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ মেয়েটার কাছে! হাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে-গেলে কোথায় গেলে তোমরা তারপর দাদা? কানু গেল কোথায়? মিথ্যা বলা আমাদের অনেক সাধনা করে অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিস-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে কত মিথ্যা বলে গিয়েছি, কিন্তু সজল-চোখ

মেয়েটার সামনে মুখ দিয়ে কিছুতেই আমার মিথ্যা বেরুল না। হাসির চেহারা দেখে তোমার হাসি পাবে হয়তো। ঐ স্থূলবপুর নিচে একটি বেদনা-খিন্ন মন আছে, বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু চুপিচুপি বলি নিশিকান্ত, আমার মুখে কান্থুর কাহিনী শুনে বিধবা মেয়েটা আকুল হয়ে কেঁদেছিল সারা বেলা ধরে।

দেশব্যাপী কি ঝড় উঠেছিল, ভাবতে গেলে এখন তাজ্জব লাগে। আশার ক্ষীণতম আলো ছিল না সেদিন চোখের সামনে, তবু প্রাণ দেবার মানুষের অভাব হয় নি। বরঞ্চ এর জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না, অনেক সময় বাজি ফেলে ঠিক করতে হয় কে কোন্ অ্যাক্‌শনে যাবে। মরে মরে তারা মরার ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেল, তাদেরই মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি উঠেছে। কিন্তু শুধুই বা তাদের কথা বলি কেন? নীলকর-আমলের গরিব রায়তদল কিংবা বিয়াল্লিশের আগস্টের অনামী আত্মত্যাগীরা কি নয়? শুধু এই এক জয়রামপুরের সংগ্রামীদের কথা আজকে পুরো দিনটা ধরে বললেও বোধহয় ফুরোয় না। এমনি দেশের সর্বত্র! তার ক'টা ঘটনাই বা জানি আমরা? মোটের উপর—অত্যাচার যত কঠোর হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ততই ছড়িয়ে পড়েছে গণমানুষের মধ্যে। জালিয়ানওয়ালাবাগে দশ মিনিটে ষোল শ' গুলি ছুঁড়ে মহাবীর ডায়ার অন্তত ষোল শ'গুণ বাড়িয়ে দিল আন্দোলনের গতিবেগ।

আরও অনেক বছর কেটেছে তারপর। মুক্তি-রথের সারথি গান্ধিজী। নানাকাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকি। গ্রামে এলে চাষীরা ঘিরে ফেলে, গান্ধিরাজার খবর কি?

একদিন, মনে আছে নিশিকান্ত, খেজুরবনের মধ্যে বসে পড়তে হয়েছিল তাদের আগ্রহাতিশয্যে। সাড়া পড়ে গেছে সমস্ত বিলে, লাঙল ছেড়ে একে দুয়ে এসে জড় হচ্ছে। বোঁদার আগুন কল্কেয় ভেঙে দিয়ে কাদা-মাখা পা ছড়িয়ে আমায় ঘিরে বসেছে।

লড়াইয়ের খবর বল। কে জিতছে? কোম্পানি না গান্ধিরাজা?

অনেক দূরে—ঠিক কোন্ জায়গায় সঠিক আন্দাজ নেই, এই দেশেরই কোন প্রান্তে ঘটছে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ। অমিত পরাক্রম গান্ধিরাজার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৈন্য, বিপুল অস্ত্রসম্ভার। ইংরেজ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

লোকালয় অনেক দূরে, বিলের বাতাস হু হু করে বইছিল। চষা ক্ষেতের মাটি চাংড়ার উপর বসে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করেছিলাম আমি। সে ছবি আজও মনে করতে পারি নিশিকান্ত। তারা বুঝবে না, কিছুতে বিশ্বাস করবে না—ইংরেজের প্রবল প্রতিপক্ষ সেই মহারাজার হাঁটুর নিচে কাপড় জোটে

না। সসৈন্যে আক্রমণ করতে চলেছেন গান্ধিরাজা, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা গোনা উনআশি জন। আরও পরমাশ্চর্য ব্যাপার—না রাজা না সৈন্য কারো হাতে অস্ত্র নেই—গরু তাড়ানোর পাচনবাড়ির মতো একটুকরা লাঠিও নেই। ঘোড়ার পিঠে নয়, রেলগাড়ি বা মোটরগাড়িতে নয়—সবরমতী থেকে ডাণ্ডি এই দুশ-মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা। তাতেই থরহরি কম্পমান ইংরেজ সরকার।

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, একেবারে অরণ্যে রোদন হচ্ছে, কেউ একবর্ণ বিশ্বাস করছে না আমার কথা। গান্ধি-রাজার মহৈশ্বর্যময় সিংহাসনের উপর অর্ধনগ্ন ফকিরকে আরোপ করতে তাদের অন্তরাত্মা সায় দিচ্ছে না।

অবশেষে একদিন গান্ধি-রাজার সৈন্য আমাদের জয়রামপুর অবধি হানা দিল। তিনজন মাত্র তারা। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা কিছু ভাল রাজার চেয়ে। মাথায় সাদা টুপি, গা ঢাকা আছে জামা দিয়ে।

গান্ধি-মহারাজের জয়!

সকালবেলা তিন কণ্ঠে সমবেত জয়াকার দিয়ে তারা গ্রামে ঢুকল। যত দিন যাচ্ছে, ততই প্রবল হচ্ছে জয়ধ্বনি। গান্ধি-রাজার সৈন্যে গ্রাম ভরে গেল দেখতে দেখতে, তিনটি মাত্র ছেলের জায়গায় শ'তিনেক হয়েছে—সারা অঞ্চল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা।

নোনাখোলা বলে একটা জায়গা আছে নিশিকান্ত; আর খানিকটা এগিয়ে ডাইনের দিকে। উঁচু টিলা—অনতিদূরে মজা খাল। চারিপাশের দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অনুর্বর শ্বেতাভ টিলার মাটি, একটা দুর্বাঘাসও জন্মে না এমন ভয়ানক নোনা। মাটির কণিকা জিভে দিলেও নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। কোদালি দিয়ে সেই মাটি তুলে নিয়ে জলে গোলা হল। আর ওদিকে আমাদেরই দু-জন আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে ছুটল আগরহাটি থানায় খবর দিতে।

দারোগা বললেন, নুন তৈরি করছেন, তালগাছ কেটে কেটে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পিছনে এমন করে লেগেছেন কেন বলুন তো? কেশবপুরে মদের দোকানের সামনে লাঠি পেটা করে এই সবে এসে দাঁড়িয়েছি মশায়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর-এক দফা নিমন্ত্রণ। এক গ্লাস জল খেয়ে ঠাণ্ডা হব, কি টের পাই নি বলে দুটো জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখব—তাও আপনারা উপায় রাখেন না। আমাদের মেরে ফেলবেন নাকি দৌড়ঝাঁপ করিয়ে?

সংবাদবাহকেরা হেসে উঠল।

দারোগা আগুন হয়ে বললেন, চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে মরছি—হাসবেন বই কি আপনারা! কিন্তু থাকবে না ও-হাসি। নিংড়ে মুছে দেব। লাঠি মেরে হবে না, মার খেয়ে খেয়ে চামড়া পুরু হয়ে গেছে—বন্দুক দিয়ে ঘায়েল করব।

দারোগা সেদিন অবশ্য ভয় দেখানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু ক্ষণে-অক্ষণে কথা পড়ে যায় নিশিকান্ত। এর কিছুকাল পরে গ্রামের লোকেরা চৌকিদারি-ট্যাক্স বন্ধ করল। ট্যাক্সের দায়ে গরু-বাছুর থালা-ঘটি-বাটি টেনে-টুনে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে স্ফূর্তি করে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাচ্ছে সকলে পাড়ায় পাড়ায়! সেই চরম উত্তেজনার সময় পুলিসের গুলিতে সত্যিই মারা পড়ল আমাদের বাসু। বাসুর নাম আছে দেখো আজকের সভায় যারা শহীদ-পদক পাবে তাদের তালিকার মধ্যে। লক্ষ্মণ কম্পমান হাতে পদক তুলে আমাদের নাম পড়বে।

কিন্তু যা বলছিলাম। দুপুর-রোদে তেতেপুড়ে দারোগা দলবল নিয়ে হাজির হলেন নোনাখোলায়। টগবগ করে ফুটছে নোনাজল। লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি ভাঙল, উনুন নিভে গেল জল পড়ে।

কিন্তু গান্ধি-রাজার সৈন্য কেউ পালায় না থানার মানুষ দেখে। সরল সাদাসিধে কথা। আমাদের গাঁয়ের মাটিতে ঈশ্বরের দেওয়া নুন আপনি ফুটে বেরিয়েছে, তুলে খাব আমরা। স্বাভাবিক অতি-সাধারণ এর অধিকার।

জয়রামপুরের গৃহস্থ-চাষী মেয়ে পুরুষ মন্ত্রের জোরে সহসা নূতন আত্মমর্যাদা পেয়েছে। নিচু মাথা সবল সমুন্নত হয়েছে, বজ্রদৃঢ় হয়েছে শিরদাঁড়া। গান্ধি-রাজার সম্পর্কে কত অলৌকিক আজগুবি কাহিনী চলিত ছিল—হঠাৎ সবাই উপলব্ধি করল, কোন সময়ে তারাও গান্ধি-রাজার সৈন্য হয়ে গেছে।

বাসুর কথা বলছিলাম। এসো, এই ভাঙা চাতালটার উপর বসি। গল্পটা আগে শোন, তারপর একটি প্রশ্ন করব তোমার কাছে। ইদানীং প্রায়ই একটা সন্দেহ জেগে উঠে মনকে পীড়িত করে—জেলের মধ্যে অনেক ভেবেছি, তারপর বেরিয়ে এসে শান্তি-বউদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাসুর কথা নয় —তার পাষণ্ড বাপ যতীন-দার কথা। কিন্তু শান্তি জবাব দেয় না। স্তব্ধ হয়ে পায়ের নখে রাস্তার ধুলোর দাগ কাটে। আমার প্রশ্ন যেন কানেই যাচ্ছে না —সে ঘুরে-ফিরে কেবলই বাসুর কথা তোলে। তার মানে যতীন-দার প্রসঙ্গে লজ্জা পায়, লোকে যতীন-দার কথা ভুলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন বউদি। এই ঘাটে কাল শান্তি-বউদি আছড়ে আছড়ে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় কাচছিল। দশের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বাসুর পদকখানা নিতে হবে তো, তাই বউদি কাপড় কেচে সাফসাফাই করে নিয়েছে।

বাসুকে যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, নিশিকান্ত। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গলায় কারে-বাঁধা রূপোর কবচ—তার ভেতর নারায়ণের তুলসী, যাতে কোনরকম বিপদ-আপদ না ছুঁতে পারে। দু তিনটে মরে যাবার পর এই

ছেলে—সর্বক্ষণ বউদির মন পড়ে থাকত তার উপর, তিলেক সে চোখের আড়াল হলে বউদি অস্থির হয়ে উঠত।

বাসুর সঙ্গে পেরে উঠা সোজা কথা? হাটবারে গ্রামের পাশ দিয়ে সারবন্দি বোঝাই গরুর গাড়ি যেত। কতদিন দেখেছি, বাসু পিছন দিক দিয়ে কোন্ ফাঁকে তার একটায় উঠে গুটিসুঁটি হয়ে বসে আছে। লক্ষ্য নীলখোলার বৈঁচিবন —পায়ে হেঁটে যাবার কষ্টটুকু এড়াতে চাইত এমনি করে। আজকে দেখছ নিশিকান্ত, ভাঙাচোরা এক-খানা দু-খানা ঘর আর পোড়ো-ভিটে। সে-আমলে মনে আছে, এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর উঠান পার হয়ে আমাদের পাড়ার ভিতর ঢুকতে হত। গোলকধাঁধা বিশেষ—ঢুকে পড়ে নূতন লোকের পক্ষে মুশকিল হত বেরিয়ে যাওয়া। ভিটের ওপর দেখো, এখানেও কসাড় বৈঁচির জঙ্গল এঁটে বসেছে। বাসু থাকলে সুবিধা হত, কি বল—কষ্ট করে আর তাকে নীলখোলা অবধি যেতে হত না।

একটা তাজ্জব কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে নিশিকান্ত, এইখানে এসে যখন বসে থাকি। এক লহমার মধ্যে কি হয়ে যায়—চোখের উপর স্পষ্ট দেখি, এই পুকুরের চারপাশে চারটে ঘাট—খেজুরগুঁড়ি দিয়ে বাঁধা, ঠিক যেমনটি দেখে এসেছি ছেলেবয়স থেকে। পাড়ার মধ্যে একটিমাত্র পুকুর—আমাদের বেটাছেলেদের ভারি মুশকিল ছিল, খানিক বেলা না হলে আসবার উপায় ছিল না কোন ঘাটে। দেখো, নূতন বউ ওদিকে পানকৌড়ির মতো ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে, জল ঝাড়বার জন্য এলোচুলে দিচ্ছে গামছার বাড়ি, জলকণা রোদে ঝিলমিল করছে। দেখো, দক্ষিণ-ঘাটে ঝকঝকে পিতলের কলসি-কাঁখে শান্তি-বউদি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, একরাশ এঁটোবাসন নিয়ে ঘাট জুড়ে আছে অন্ন—সেখানে পা ফেলবার উপায় নেই—দুখি কাল মুক্তেশ্বরের মেলা থেকে এসেছে, বাসন ফেলে রেখে হাঁ করে গিলছে তার কথা। শান্তি-বউদিকে দেখে বলল, এই হয়ে গেছে, দিদি দাঁড়াও—এই ক'খানা ধুয়ে নিয়ে উঠছি আমি। থালার উপর মাজনি দিয়ে জোরে জোরে সে ঘষতে লাগল। আর গাবতলার ঘাটে যেন ডাকাত পড়েছে, দাপাদাপি করছে একপাল ছেলে-মেয়ে, সাঁতার কাটার মুরোদ নেই—খোঁটা ধরে পা ছুঁড়ছে। মুক্তোপিসি স্নান করতে এসে এদের কাণ্ড দেখে জ্বলে উঠলেন।

ঘুলিয়ে জল দই-দই করে ফেলল হতচ্ছাড়ারা? ওঠ এক্ষুণি—নয়তো কান ধরে ধরে সব উঠিয়ে দেব।

উঠতে তাদের বয়ে গেছে। মুক্তোপিসিকে জানে—উল্টে পিসির গায়েই জল ছিটাতে লাগল। ক্ষেপে গেছে মুক্তোপিসি, হাতের কাছে যা পাচ্ছে

ছুঁড়ছে আর গালিগালাজ করছে, মরিস নে কেন তোরা ? মরে যা—হাড় জুড়োক পাড়াটার।

শান্তি-বউদি কলসি নামিয়ে রেখে দ্রুত ও-ঘাটে গেল। ঠিকই ভেবেছে, তার বাসুও ওর মধ্যে।

পাজি ছেলে—ফুলো কঞ্চি দিয়ে তোমায় আগা-পান্তলা পেটাব। আয়—আয় উঠে।

উনিশ কুড়ি বছর হতে চলল তো নিশিকান্ত, কিন্তু একেবারে সেদিনের কথা বলে মনে হয়। দেখ—কাঁটাঝিটকের ঝোপে কোন্ জায়গায় ঘাট ছিল বোঝবারই জো নেই, খেজুরগুঁড়িগুলো পচে বর্ষার জলে ভেসে গেছে। কাল শান্তি-বউদি আমার কাছে বলতে লাগল সেই সব দিনের কথা। বলবার কি আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওসব পোড়ো ভিটে নয়—ভিটের উপর ঘর-দুয়োর মানুষ-জন গরু-বাছুর। এতটুকু বয়স থেকে দেখে এসেছি নিশিকান্ত, সব একেবারে মুখস্থ হয়ে আছে—পুলিসের অত্যাচারে পাড়ার মানুষ ঘরদুয়োর ছেড়ে সেদিন পথে এসে দাঁড়াল, কিন্তু মাথা নোয়াল না—সেই তখন অবধি। চুপ করে দু-দণ্ড বসলে সমস্ত চোখের সামনে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, কেবল যখন জল এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয় সেই সময়টা ছাড়া। চোখের জলের একটা ওষুধ বাতলে দিতে পার নিশিকান্ত ?

বাসুর কথা বলতে ডেকে বসাইনি কিন্তু। সবাই তা জানেন, খবরের কাগজে পর্যন্ত উঠেছে। তোমাদের মিটিঙেও তার সম্বন্ধে কত বক্তৃতা হবে শহীদ পদক দেবার সময়। আমি সেই দলের মধ্যে ছিলাম, সমস্ত জানি। তুমুল কাণ্ড, পাড়ায় পুলিস এসে পড়েছে, পুলিস সাহেব খোদ হ্যামিল্টন সেই দলের প্রথমে। নিরস্ত্র জনতার সামনে ওদের বীরত্বের তুলনা নেই। এই হ্যামিল্টনেরই পাশাপাশি মনে পড়ছে, আর একদিন এক ফোঁটা কাসুর সামনে লারমোরের সে কি থরহরি কম্পমান অবস্থা ! তার হাতে অস্ত্র ছিল, সেই জন্যই।

সব বাড়ির জিনিসপত্র টেনেটুনে দমাদম রাস্তায় এনে ফেলেছিল। নিলাম হবে—কিন্তু খরিদ্দার নেই। সদরে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু গরুর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না স্টেশনে পৌঁছে দেবার, কোন নৌকার মাঝিও নিয়ে যেতে রাজি হয় না। হ্যামিল্টন সাহেবের চোখমুখ আগুনের মতো রাঙা হয়েছে—রোদে পুড়ে আর রাগে ঝাঁঝে। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে। বাড়ি বাড়ি ঝাঁজ-ঘণ্টা বাজাচ্ছে, দাঁত বের করে হাসছে লোকগুলো, আর হ্যামিল্টন ততই ক্ষেপে গিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। নিজের বুকেই বা গুলি করে বসে, এই রকম ভাব।

দারোগা-কনস্টবলরা এখন ভাতের হাঁড়ি ভাঙছে রান্নাঘরে ঢুকে, দুধের কড়াই আঁস্তাকুড়ে আছড়ে ফেলছে, ট্যা-ট্যা করে কাঁদছে ছেলেপিলে, কাঁজ-ঘণ্টার আওয়াজে কান্না ডুবে যাচ্ছে। এর ওপর আবার উলু দিতে আরম্ভ করল এবার মেয়েরা। মুংলি জিওলগাছে বাঁধা ছিল। একজন চৌকিদার দড়ি খুলে তাকে রাস্তার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে ক্রোক-করা অন্যান্য মালপত্র গাদা করে রেখেছে। আর-একজন দমাদম পিঠে লাঠির বাড়ি মারছে যেতে চায় না বলে। মুংলি হাম্বা রবে ডেকে উঠল।

কোথায় ছিল মুক্তোপিসি—হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। বনকাটা তার। ঘোষাল-বাড়ি গাই দুইত—কাটিঘায়ে গাই মরে গেল, তখন রোগা মরণোন্মুখ বাছুরটাকে সে চেয়ে নিয়েছিল ঘোষাল-গিন্নির কাছ থেকে। তৈলচিক্কন নধর চেহারা এখন মুংলির—মুক্তোপিসি দাড় ধরে মাঠে মাঠে ঘাস খাইয়ে বেড়ায়, এর-তার বাড়ি থেকে পোয়াল-বিচালি চেয়ে-চিন্তে পরম যত্নে জাবনা মেখে দেয়। নিঃস্ব বিধবার সন্তানের মতো হয়েছে ঐ মুংলি।

মুক্তোপিসি বাঘের মতো এসে পড়ল চৌকিদারের উপর।

কোন্ সাহসে মুংলিকে মারিস নচ্ছার হারামজাদারা? মানুষ পিটে পিটে হাতের সুখ বেড়ে গেছে—না? তোদের সাহেব-বাবাকে বল্ গিয়ে, মুক্তো বেওয়া কারো ধেরে খায় নি, আধলা পয়সা টেক্স দেয় না মহারানীকে।

এমনি নির্ভেজাল স্বদেশী গালিগালাজ করতে করতে পিসি একটানে গরুর দড়ি নিয়ে নিল। নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের সে ধার ধারে না। চৌকিদারী ট্যাক্স তাকে দিতে হয় না, একথাও ঠিক। ঘর-বাড়ি নেই, ট্যাক্স ধার্য হবে কিসের উপর? এর বাড়ি ধান ভেনে ওর বাড়ি চিঁড়ে কুটে দিন চালায়। রাত্রে আমাদের কাঠকুটো-রাখা চালাঘরের মাচার নিচে শোয়। মুংলি থাকে আমাদের গোয়ালে।

বিষম সোরগোল উঠল! হ্যামিল্টন ছুটে এসে দেখে, গরু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চৌকিদারের হাত থেকে। বন্দুক তুলল জনতার দিকে—ভয় দেখাতে কি সত্যি সত্যি গুলি করতে, বলতে পারি নে। কিন্তু বাসু এই সময় এক কাণ্ড করে বসল। ঐটুকু ছেলে, তার সাহসটা বোঝ—পাখির মতো যেন উড়ে এসে হ্যামিল্টনের হাতের বন্দুক কেড়ে নিল। এবার আর দ্বিধা নয়, কোমরের রিভলভার টেনে বাসুর উপর তাক করল সাহেব। আওয়াজ হল, মুখ থুবড়ে পড়ল বারো বছর বয়সের কালো-কালো ছেলেটা।

দেখলাম মুক্তোপিসিকে। বকনা ছেড়ে দিয়ে এই পুকুর থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল নিয়ে এল। এক বেটা কনেস্টবল পথ আটকাল, পিসি এমন করে তার দিকে

তাকাল সে সুড়সুড় করে সে রাস্তার দিকে চলে গেল! বাসু হাঁ করছিল—মুক্তো-পিসি আঁচল নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল তার মুখে। আর সে কি তুমুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি চারিদিকে! এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল, একজন কেউ পালায় নি—বাসুর নির্ভীকতা ঢেউ তুলেছে সকলের বুকের ভিতর। আচ্ছা, হ্যামিল্টনের খবর কিছু জানো নিশিকান্ত? ফট ফট করে শিমুল বনে ফল ফাটার সময়ের মতো গুলি চালিয়ে রামদাস মোড়লের বারান্দায় উঠে হাতটা ধুয়ে মোড়ার উপর বসে দিব্যি সিগারেট ধরাল—হিম্মত আছে সাহেবের। এর অনেকদিন পরে জয়রামপুরের এই গণ্ডগোলের ব্যাপারে তদন্ত হয়েছিল, তদন্ত কমিটির সামনেও নাকি খুব চোখা-চোখা জবাব দিয়েছিল হ্যামিল্টন।

বাসু পড়ে গেলে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন নি কেন? আপনার লঞ্চে করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন, ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত তা হলে।

হ্যামিল্টন জবাব দিয়েছিল, সেটা আমার কাজ নয়। গ্রামের লোক ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারত। খুব সম্ভব আমি বাধা দিতাম না···

কলকাতার ইংরেজ-মেয়েরা নাকি অনেক টাকা তুলে ভোজে আপ্যায়িত করেছিল এই হ্যামিল্টনকে, এক বড় সাহেবী ফার্ম থেকে অনেক টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল তার কর্মক্ষমতার জন্য। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচিয়েছিল সে বহু ক্ষেত্রে এমনি বীরত্ব প্রদর্শন করে। একা বাসু নয়—এই রকম অনেক—অনেক নাকি মরেছে তার হাতে। কোথায় আছে আজকাল হ্যামিল্টন বলতে পার? বিলেত চলে গেছে? তার সাধের সাম্রাজ্যের পরিণাম দেখে জানতে ইচ্ছা করে, আজকের দিনে কি ভাবছে সে মনে মনে।

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছি—পাকুড়তলায় তোমরা মিটিং করছ, লক্ষণ মাইতি নিজে হাতে করে সবাইকে মেডেল দেবে। লক্ষণের কাছ থেকে হাত পেতে মেডেল নেওয়া ভারি গৌরবের কথা। শান্তি-বউদি কাপড়-চোপড় ফরসা করে তৈরী হয়ে আছে, এই আজ সকালেও সে বাসুর কথা বলছিল আমার সঙ্গে। সে কাঁদছে না, সত্যি বলছি—অনেক বড় বড় কথা বলছিল, নভেলে যে রকম লেখা থাকে। আচ্ছা—আমাদের জয়রামপুরেই এই সেদিন অবধি যা সব ঘটেছে, সে তো নভেলকে হার মানিয়ে দেয়। সে যুগে আমাদের গোপন আস্তানায় নীলকমল মাস্টার শিখ আর রাজপুতের ইতিহাস থেকে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গল্প শোনাতেন—কোথায় পড়ে থাকে এদের কাছে ইতিহাসের মরা কাহিনী! কত লোকে কতই তো লিখেছে নিশিকান্ত, এই সব সত্যি ব্যাপার নিয়ে তোমরা নভেল লেখ এইবার।

কেবলি অন্য কথা এসে যাচ্ছে। যতীন-দার কথা বলব বলে বসালাম

তোমায়। সবাই তাকে ঘৃণা করি। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর উচিত শাস্তি দিয়েছেন—এই কথা বলে বেড়ায় সকলে। বাসুকে যারা মেরে ফেলল, বাপ হয়ে সেই দলের অত খোশামুদি করা—ঘৃণা হয় না কার বলো? বলতে কি—নিজে আমি থুথু দিয়ে এসেছি যতীন-দার গায়ে। থুথু দিয়ে মনে মনে দেমাক হয়েছিল, খুব একটা বীরত্বের কাজ করলাম। যতীন-দা যদি চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে থাকত সেই রাত্রে! শান্তি-বউদি তো স্রেফ বেকবুল গিয়েছিল, বাড়ি নেই, যতীন মিস্তিরি, ঘোষগাঁতি কুটুম্বর বাড়ি গেছে। ওরাও বিশ্বাস করে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় যতীন-দা বেরিয়ে এল। এসে বলে আছি আমি হুজুর। বউ মিছে কথা বলেছে, মনের অবস্থা বিবেচনা করে ওকে মাপ করুন। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ না হলে—হুজুরেরা বিপদে পড়েছেন, এ সময় মিথ্যে বলে এমন এড়াবার চেষ্টা করে?

সত্যি, যতীন-দা না বেরুলে বৈদ্যনাথ আর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সে বিপদের পার ছিল না। পরের দিনও সম্ভবত বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে জয়রামপুরে তাঁদের বন্দী হয়ে থাকতে হত। যে-সে মানুষ নন সিরাজউদ্দিন-বৈদ্যনাথ—হ্যামিল্টনের ডান-হাত বাঁ-হাত। কে ডান-হাত আর কে বাঁ-হাত ঠিক করে বলা শক্ত—এ নিয়ে কিছু রেষারেষিও ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী কাজের সময় একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। মীটিঙে বৈদ্যনাথকে দেখতে পাবে নিশিকান্ত, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিষম গান্ধিভক্ত হয়েছেন—গান্ধিটুপি মাথায় দিয়ে ঘোড়া পায়ে তদারক করে বেড়াচ্ছেন, অনুষ্ঠানের অন্যতম মাতব্বর তিনি। আর-স্বাধীন ভারত চোখে দেখবার জন্য বেঁচে নেই যে সিরাজউদ্দিন—থাকলে তিনিও নিশ্চয় দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতেন এমনি কোনখানে।

একেবারে রাস্তার উপর ঐ যে ক'টা ভিটে—ঐ ছিল আমাদের বাড়ি। আমার আর যতীন-দার এক উঠোনের দক্ষিণ পোঁতা আর পশ্চিম পোঁতা। সম্পর্কে আমরা ভাই হই। ঘরে শুয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়, তা পর্যন্ত কানে পৌঁছয়।

বাসু মারা পড়ল, তারপর কি হল শান্তি-বউদির—চল্লিশের কাছে, তবু একেবারে নূতন বউয়ের অধম হয়ে উঠেছে। যতীন-দাকে নিয়ে সদাই ব্যস্ত—কোলের ছেলেটার প্রতিও তেমন আর মনোযোগ নেই। রাতে ভাল করে ঘুমুতে পারে না, ঘন ঘন উঠে বসে, যতীন-দার কোঁচার খুঁটের সঙ্গে শাড়ির আঁচল বেঁধে রাখে। তাতেও সোয়াস্তি নেই, যদি কোন ফাঁকে খুঁট খুলে উঠে গিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে আবার ভালমানুষ হয়ে এসে শুয়ে থাকে! দরজা বন্ধ করে শোবার আগে একটুকরো কাগজ চুপিচুপি

হুড়কোর সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, যতীন-দা লুকিয়ে যদি হুড়কো খুলে বেরোয়, অজান্তে কাগজের টুকরো পড়ে যাবে নিশ্চয়। সকালবেলা শান্তি-বউদি মেজেয় ঠাউরে ঠাউরে দেখে, বেরিয়ে যাবার চিহ্ন আছে কিনা কোথাও। ঘুমন্ত যতীন-দার পায়ের তলা দেখে, পা ধুয়ে শুয়েছিল—রাতে বেরিয়ে থাকে তো ধুলো-মাটির দাগ আছে। নানা কৌশল করেও শান্তি বউদি আবিষ্কার করতে পারে না স্বদেশি দলের সঙ্গে যতীন-দার যোগাযোগ আছে। রাগ বেড়ে যায় আরও নিজের উপর, রাগ হয় ঘুমের উপর। জেরা করে যতীন-দাকে, হঠাৎ বা ক্ষেপে উঠে গালিগালাজ শুরু করে দেয়।

বেরিয়েছিলে তুমি। ঐ ও-ঘরের চারু বললে যে! মিথ্যুক তুমি—মিথ্যে বলে আমাকে ভুলোও।

চারু আমার স্ত্রী। বউমানুষ—তার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, যতীন-দা ভাদ্রবধূ-সম্পর্কীয়ার সঙ্গে কথাটা আস্কারা করতে যাবে না—শান্তি-বউদি তাই অবাধে তার নামটা করে দিল। চারু এঘরে শুনতে পেয়ে রাগ করে।

দেখ কাণ্ড! ভাসুর ঠাকুরের কাছে ডাহা মিথ্যে লাগাচ্ছে আমার নামে।

অনেক করে চারুকে আমি ঠাণ্ডা করি। শান্তি-বউদি এমনি সব জলজ্যান্ত সাক্ষি-সাবুদের নামোল্লেখ করত—ভাঁওতা দিয়ে যতীন-দার মুখ থেকে আদায় করতে পারে যদি কিছু। কিন্তু কিছুই পারে না. শান্তি-বউদি ক্ষেপে যায় আরও; চোখ দিয়ে যেন অগ্নি-জ্বালা ছিটকে বেরোয়। বাইশ-তেইশ বছর এক সঙ্গে ঘর করার পর শেষকালে ওদের দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে একেবারে।

একদিন রাত একটা-দেড়টা হবে তখন নিশিকান্ত, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। অনেকগুলো মানুষ এল আমাদের উঠানে দুমদাম করে, তারা যতীন দার দাওয়ায় উঠল।

যতীন, যতীন মিস্তিরি!

আমি আর আমার গা ঘেঁষে চারু—জানলার একখানা কবাট খুলে উঁকি দিচ্ছি। যা ভেবেছি, থানার মানুষ—সেই পোশাক, সেই চালচলন।

শান্তি-বউদি বলল, না—বাড়ি নেই তো উনি।

দোর খুলে সঙ্গে সঙ্গে যতীন-দা বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা দেখতে লাগলাম।

ইদিকে এস তো মিস্তিরি, দেখে যাও··

ভাষাটা অনুরোধের, কিন্তু হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে গেল যেন সে খুনি আসামি। সবাই উঠানে নেমে এসেছি। যতীন-দার আগে পিছে জন-আষ্টেক কনেস্টবল—হাতে দড়ি দেয়নি এই যা—হাত ধরে দ্রুত নিয়ে চলেছে।

তা হলে বোধ হচ্ছে যতীন-দা একটা কিছু করে বসেছে গোপনে গোপনে—আমরাও যা জানি নে—শান্তি-বউদির সন্দেহ মিথ্যা নয় একেবারে। রাত থমথম করছে। এ অবস্থায় এখন কি করব ভেবে পাই নে। রামদাস কাশছে ওদের টিনের ঘরে, কাশির আওয়াজ বিশ গুণ হয়ে বাইরে আসে। শান্তি-বৌদি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

রামদাস হাঁক দিচ্ছে, ও যতীন হল কি? কান্না কেন তোমাদের বাড়ি?

একজন দু-জন করে ভিড় জমে গেল। রামদাস জিজ্ঞাসা করে, কি করেছিল বল তো? করেছে নিশ্চয় কিছু—নইলে শুধু-শুধু ধরতে যাবে কেন? বুকের জ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিল, বাইরে কিছু টের পাওয়া যায়নি।

আ-হা-হা! বলে সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলে কাশতে কাশতে রামদাস বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু নিয়ে গেল কোথায় এইরাত্রে? এগিয়ে মোড় অবধি গিয়ে দেখি, ফিরে আসছে। সঙ্গে অনেক পুলিস। খানাতল্লাসি করতে সঙ্গে নিয়ে আসছে নাকি?

যতীন-দা আগে আগে—দলসুদ্ধ সে রামদাসের বাড়ি নিয়ে তুলল। ডেকে বলে, রাত্তিরটুকু সিরাজউদ্দিন সাহেব এখানে থাকবেন। বদ্যিনাথবাবু আর সিরাজউদ্দিন সাহেবের নাম শুনেছ—এই যে এঁরাই। বনবিষ্টুপুর চলেছেন। টিনের বেড়া-দেওয়া ভাল ঘর—তাই তোমার এখানে ব্যবস্থা করলাম। দোর খুলে দাও শিগগির, বিছানাপত্তোর কি আছে নিয়ে এস।

হাঁকডাকে বাড়িসুদ্ধ তোলপাড় করে তুলছে। সেই কাণ্ডের পর থেকে হ্যামিল্টন আর সদর ছেড়ে এখানে আসে না। হয়তো বা সদরই ছেড়েছে। ইতিমধ্যে এই দুইজনের নাম জেলাময় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জয়রামপুরে শুভাগমন হয়েছে—মহাপ্রভু দু'টিকে একবার চোখে না দেখে পারি নে। গাবতলায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি। যতীন-দা তখন বলছে, খাওয়া-দাওয়ার কি হবে হুজুর? ভাত চলবে, না লুচি-টুচি?

বৈদ্যনাথ তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বললেন, এখন আর হাঙ্গামে দরকার নেই মিস্তিরি, ভরপেট আমরা খাবার খেয়ে রওনা হয়েছি।

সে কি কথা হুজুর, কত ভাগ্যে অতিথি হয়েছেন আমাদের পাড়ায়! ঘাড় নেড়ে আরও জোর গলায় বলল, আজ্ঞে না, সে হবে না—কক্ষণো হতে পারে না—

সিরাজউদ্দিন দেখি চোখ কট-মট করছেন বৈদ্যনাথের উপর। বিপুল দেহ—ভাব দেখে মনে হয়, নিদারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। বৈদ্যনাথ ফিসফিস করে তাঁকে কি বললেন। কি বললেন না শুনেও আন্দাজ করতে পারি। মনে মনে বেশ

জানেন, লোকে কি চোখে দেখে ওঁদের! রাত্রিবেলা অজানা জায়গায় খাবারের সঙ্গে বিষ-টিষ মিশিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়।

বৈদ্যনাথ বললেন, কাজকর্ম চুকে যাক—সময় থাকে তো বরঞ্চ সকালবেলার দিকে দেখা যাবে। পার তো আমাদের সিরাজউদ্দিন সাহেবকে একটা ডাব খাইয়ে দাও। শোবার আগে ওঁর ডাবের জল খাওয়া অভ্যাস। আর ধকলটা কি রকম দেখছ তো—সকলেরই তেষ্টা পেয়ে গেছে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—অভ্যাস আছে যখন সাহেবের—

সেই দুপুর রাত্রে লোকাভাবে নিজেই যতীন-দা নারকেলগাছের মাথায় চড়ে কাঁদির পর কাঁদি কাটল, নেমে এসে ডাব কেটে কেটে ওদের সামনে ধরতে লাগল। শাঁসে-জলে পুরো এক গণ্ডা নিঃশেষ করে সিরাজউদ্দিন সাহেব তবে শান্ত হলেন। বৈদ্যনাথ খেলেন একটি মাত্র—তাও শুধু শাঁস। সর্দির ধাত, রাত্রি জেগে তার উপর কাজের তদারক করতে হবে—ডাবের জল সহ্য হবে না এ অবস্থায়।

অবাক হয়ে যতীন-দার কাণ্ড দেখছি। ঐ কনেস্টবলগুলোর কেউ কেউ হ্যামিল্টনের পাশে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে পারলাম। যতীন-দা ডাব কেটে সকলের মুখে ধরছে। তারপর সিরাজউদ্দিন দালানের দরজা দিলেন, জানলার প্রত্যেকটি কবাট এঁটে পরখ করে দেখলেন, একটা কনেস্টবলকে সশস্ত্র মোতায়েন থাকতে হুকুম দিলেন দোরগোড়ায়।

এই সব চুকিয়ে আসতে যতীন-দার দেরি হচ্ছে। অনেক—অনেক দেরি। শান্তি-বউদি তার অপেক্ষায় হুড়কোর ধারে দাঁড়িয়ে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, আঁচলটা তুলে দিয়েছে মাথায়। আমি অভয় দিচ্ছি, কিছু ভাবনা নেই বউদি, যা খোশামুদি করছে দেখে এলাম—

যতীন-দা আসতেই শান্তি-বউদি এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। আমি সামনে রয়েছি, তা বলে সঙ্কোচ নেই। এক্ষুণি যেন সে পালিয়ে যাবে, এমনি ভাবে ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

যতীন-দা বলে, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘা লেগে ওদের মোটরটা জখম হয়েছে। মুশকিলে পড়ে গেছে। আমায় ঠিক করে দিতে বলল।

শান্তি-বউদির মুখের উপর হাসি চিক-চিক করে উঠল এতক্ষণে। যতীনদার দিকে চোখদুটো তুলে বলে, গাড়ি এমন করে দাও, কক্ষণো আর না চলে—

যতীন-দা সবিস্ময়ে বলে, তুমি বলছ এই কথা? রাত-দিন ঝগড়াঝাঁটি করে মরছ, ছেলে গেছে আবার আমি যাতে গণ্ডগোলের মধ্যে না যাই—

তা বলে গোলামি নিতে বলেছি ওদের?

ভালই তো! তুমি নিশ্চিন্ত, আমিও।

শান্তি-বউদি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল যতীন-দার। যতীন-দা হাসতে লাগল। হাসি আমারও বিশ্রী লাগছিল! শান্তি-বউদি ফিরেও আর না চেয়ে দাওয়ায় উঠে গেল। এদের প্রতি রাত্রের দাম্পত্য কলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, আজকে চুপচাপ। শান্তি-বউদি কথাবার্তাই বন্ধ করেছে। ভাবলাম, বেশ হয়েছে—রাতটুকু নিরুপদ্রবে ঘুমানো যাবে।

কিন্তু ঘুমানো গেল না ভিন্ন এক কারণে। চারু আমার গা ঝাঁকাচ্ছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকছে, ওঠ- ওঠ, আগুন লেগেছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল আলোকিত আকাশ। উঠানে লাফিয়ে পড়লাম। যতীন-দাও উঠেছে, টেমি জ্বেলে দাওয়ায় নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ভুড়ুৎ-ভুড়ুৎ করে হুঁকো টানছে।

দেখতে পাচ্ছ না?

যতীন-দা বলল, হাঁ, আমায় ডেকে তুলে দিয়ে গেল—কাজে লাগব এইবার তার আগে বুদ্ধির গোড়ায় একটুখানি ধোঁয়া দিয়ে নিচ্ছি। আরে আরে, তুই চললি কোথারে?

রূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে একনজর চেয়ে ছুটলাম। যখন ফিরে আসছি, দেখি —যতীন-দা গজেন্দ্রগতিতে চলেছে।

জান? আগুন লাগিয়েছে ওরাই।

যতীন-দা হা-হা করে হেসে উঠল: বুদ্ধি করেছে ভাল। চাঁদ ডুবে গেছে, কোথায় কার বাড়ি লণ্ঠন খুঁজে বেড়াবে? জোরালো আলোয় মোটর মেরামত হবে, আর আঁধারে-আঁধারে নোনাখোলায় আবার কেউ আইনভঙ্গ করতে না পারে—তারও পাহারা দেওয়া চলবে।

ভলাণ্টিয়ারদের চালা পুড়ছে।

সেই-তো ভাল রে। তোর আমার ঘর পুড়ল না, এক তিল জিনিসের অপচয় হল না। ওদের তো এক একটা গামছার পুঁটুলি সম্বল—সেইটে বগলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চালার আগুনে খনিকক্ষণ গা-হাত-পা সেঁকে নিয়ে আর কোনখানে সরে পড়ুক।

আবার বলে, বদ্যিনাথবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে গেল। বনবিষ্টুপুরে হাট জমবার আগে দলবল সুদ্ধ গিয়ে পড়তে হবে বিলাতি কাপড় আর মদের দোকান সামাল দিতে। গাড়ি তাড়াতাড়ি সেরে দিতে হবে।

তখনও ভাবছি, মুখে যা-ই বলুক—বয়ে গেছে যতীন-দার গাড়ি মেরামত করে দিতে! দায়ে পড়ে স্বীকার করেছে, যা হোক একটা জবুথবু করে দেবে

শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেলা না উঠতেই খবর নিয়ে এল, বিগড়ানো ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে আবার। মায়াবী যতীন-দা— কলকব্জা যেন তার পোষা জানোয়ার —হাতের একটু স্পর্শ কি দুটো থাবড়া খেলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবেগে অমনি কাজে লেগে যায়।

বৈদ্যনাথ ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছিলেন। যতীন-দার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকালেন।

সাবাস! খুব বাহাদুর তুমি মিস্তিরি—

দশ টাকার নোট একখানা বের করলেন। দু-হাত পেতে বকশিশ নিয়ে যতীন-দা মাথা নিচু করে নমস্কার করল।

পুলকিত বৈদ্যনাথ সিরাজউদ্দিন সাহেবকে খবর দিতে ছুটলেন। ফিরলেন তখনই। বললেন, এদিকে তো হল—বিপদ হয়েছে এখন ড্রাইভারকে নিয়ে। তার বেশি লাগে নি ভেবেছিলাম, এখন দেখছি হাঁটুর মালা ফুলে গোদ হয়েছে, পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে বেটা। ইয়ে হয়েছে, ড্রাইভ করতে নিশ্চয় জানো তুমি মিস্তিরি—

যতীন-দা বলল, খাস কলকাতার লাইসেন্স আমার হুজুর। বারো বছর এই লাইনে বাস চালিয়ে এসেছি, সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এখন এইসব গণ্ডগোলে লাইন বন্ধ—আর ধরুন গে, সেই আমার ছেলের ব্যাপারের পর মন-মেজাজও ভাল ছিল না—

এ সমস্ত আমাদের চরের মুখে শোনা। শুনে রাগে ফুলতে লাগলাম। রওনা হতে কিন্তু ওদের দেরি হয়ে গেল। সিরাজউদ্দিন একেবারে বেঁকে বসলেন, রাতে উপোস গেছে— খাওয়া-দাওয়া না করে এক-পা নড়বেন না এ জায়গা থেকে। বনবিষ্টুপুর গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, ঠিক কি ? আর এখানে ভুরিভোজনে অসুবিধা কিছু নেই, সিকি পয়সা খরচও হবে না। ক্ষেত থেকে খুশিমতো তরকারি তুলে আন, চাল-ডাল হুকুম কর যে কোন গৃহস্থের বাড়ি, মাছ খাবার ইচ্ছে হলে যে পুকুরে ইচ্ছা জাল নামিয়ে দাও—মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করবার গরজ নেই কারও কাছে। সিরাজউদ্দিনের যুক্তি সবাই প্রণিধান করল, রামদাসের গোয়াল ঘরে উনুন খুঁড়ে কনেস্টবলরা রান্না চাপাল। রাজসিক ব্যাপার—এর ওর বাড়ি থেকে ডেগচি-কলসি থালা-বাসন চেয়ে এনেছে।

যতীন-দা এক ফাঁকে বাড়ি এসে বলল, আর ভয় রইল না তো তোমার। গোলমাল যদি কিছু হয়, থানায় খবর দিও—থানাসুদ্ধ ছুটে আসবে দেখো। আমার খাতিরে। ওঁরাই মুরুব্বি হলেন আমাদের, সুনজরে দেখছেন।

শান্তি-বউদি তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

দেখছি, আর রাগে ফুলছি আমরা। গাড়ি ঘাটের ধারে এইখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে। পেট্রোলের খালি টিনে জল এনে ইঞ্জিনে ঢালছে। গর্জন করছে ইঞ্জিন, আক্রোশে কাঁপছে থরথর করে, যেন এক বিপুলকায় দৈত্য নখ-দাঁত উদ্যত করে তৈরি হয়েছে। ক্রোশ চারেক দূরে বনবিষ্টুপুরের গঞ্জে রুক্ষ-চুল বিবর্ণ দেহ ছেলেমেয়েদের দল দোকানের পথের উপর শুয়ে পড়ে আছে—মহাজাতির নৈতিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না কোনক্রমে, আর দেশের সম্পদ নিয়ে যেতে দেবে না সমুদ্রপারে, অমোঘ সঙ্কল্প আর আত্মপ্রত্যয় জনে জনের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় রেখায়—সেইখানে ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরতে হবে তাদের। পলকে রক্তাক্ত হয়ে যাবে গঞ্জের পথমৃত্তিকা।

আর দেখ, ষ্টিয়ারিঙের চাকা ধরে বোধ করি আমাদের দিকেই চেয়ে কি-রকম হাসছে যতীন-দা!

মাথার মধ্যে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল, আমি থাকতে পারলাম না নিশিকান্ত। দৌড়ে যতীন-দার কাছে গিয়ে থুতু দিলাম তার গায়ে। হৈ-হৈ রব উঠল। বৈদ্যনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, জাপটে ধরল আমায় তিন-চারটে কনেস্টবল, দু-চারটে কিল-চড়ও খেলাম। যতীন-দা তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিল।

আমার খুড়তুত ভাই হয়। আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। আমি একদিন জিওলের ডাল দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে পিটেছিলাম, তারই কিছু শোধ দিয়ে গেল। আপনাদের কোন ব্যাপার নয়। ছেড়ে দিতে বলুন।

ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিল, বাঁচিয়ে দিল—তা বলে কৃতজ্ঞতা বোধ করি নি নিশিকান্ত। এটুকু লাঞ্ছনা ভাত-কাপড়ের সামিল আমাদের, এতে মনে খারাপ হয় না, ফাঁক কাটাতে পারলে আনন্দও হয় না তার জন্য। মোটর বেরিয়ে গেল ভকভক করে পেছনের নলে ধোঁয়া ছেড়ে—যেন উপহাস করে আমাদের। যতীন-দা হাসতে হাসতে গেল। হাত নিসপিস করছিল—থুতুতে কি হবে, থুতু গায়ে লাগে—মন অবধি পৌঁছয় না ওদের। থুতু না দিয়ে অন্তত একটা ঘুসি যদি ঝেড়ে দিতাম, তাহলেও গায়ের ব্যথা মারতে একটা দিন সময় লাগত, কিছু পরিমাণে শান্তি হত।

তা আমাদের হাতে না হোক, শাস্তি এড়াতে পারল না যতীন-দা, ভয়ানক শাস্তি—আমরা এর সিকির সিকি কল্পনা করতে পারতাম না। দিন কয়েক পরে খবর এল, যতীন-দা মারা গেছে। এখান থেকে ক্রোশ চারেক দূরে ন-হাটা বলে গ্রাম—সদলবলে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছে সেখানে। গাড়ি নিয়ে পুলের উপর উঠতে গিয়ে উলট-পালট খেতে খেতে একেবারে খালের গর্তে।

দিন দুপুর—তামাক ছাড়া কোন রকম নেশাও করত না যতীন-দা—কেমন করে হল, সঠিক কেউ বলতে পারে না।

গরুর-গাড়ি করে শান্তি-বউদিকে নিয়ে গেলাম ন-হাটায়। কোল-মোছা ছেলেটাকে বুকে করে শান্তি-বউদি চলল আমার সঙ্গে। বৈদ্যনাথও ছিলেন যতীন-দার সেই গাড়িতে, তারপর হাসপাতালে গেছেন। প্রাণে বেঁচে যাবেন, কিন্তু একখানা পা কেটে ফেলতে হয়েছে, খোঁড়া অবস্থায় ল্যাং-ল্যাং করতে হবে চিরকাল। রজনী দফাদার যতীন-দার পাশে ছিল, কপাল জোরে প্রায় অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচেছে। সে বলতে লাগল, কাঁধে যেন ভূত চেপেছিল মিস্তিরির। গাড়ি ছুটছে—জোর দিচ্ছে, কেবলি জোর দিচ্ছে, হু-উ উ-উ করে আওয়াজ হচ্ছে—ভাবতে গা শির-শির করে মশায়, আর ঐ যে হাসত কথায় কথায়—সেই রকম হাসতে লাগল চাকায় হাতটা রেখে। আমি বলছি, সামাল মিস্তিরি—পুল ঐ সামনে অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হবে। বলতে বলতেই গাড়ি পাক খেয়ে পড়ল। নিতান্ত গুরুবল ছিল—আমি লাফিয়ে পড়লাম। তারপর উঠে দেখি, আগুন ধরে গেছে, দাউ-দাউ করে জ্বলছে গাড়ি, পেট্রোলের গন্ধ আর কালো ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়—

যতীন-দাকে দেখলাম—বলে দিল, তাই ধরে নিলাম এই যতীন-দা। আধপোড়া বীভৎস মূর্তি—মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। পুলিসের দল ন-হাটার কাজ চুকিয়ে বিদায় হয়ে গেছে, বৈদ্যনাথকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার লাগিদেই এত তাড়াতাড়ি তারা গ্রাম ছেড়েছে। মানুষজন পাওয়া গেল না—যারা গ্রাম জব্দ করতে এসেছিল, কে আসবে বল তাদের মড়া পোড়াতে? আড়ালে খুব তারা হাসাহাসি করছে, অনুমানে বুঝলাম। কাঠ-কুটোরও যোগাড় হল না। রজনী দফাদারের সাহায্যে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে খালের কলমিদামের নিচে কোন গতিকে ঠেলে দিলাম মৃতদেহ। আর একটা ব্যাপার নিশিকান্ত—শান্তি-বউদি চোখের উপর সমস্ত দেখল, যতই হোক স্বামী তো! কিন্তু একটু বিচলিত হতে তাকে দেখলাম না, একবিন্দু চোখের জল পড়ল না।

রাত দুপুর অবধি গলদঘর্ম হয়ে চুকিয়ে-বুকিয়ে এলাম। রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা ফিরে যাচ্ছি। খাল-ধার দিয়ে পথ। দেখি শিয়ালে এরই মধ্যে ডাঙায় তুলেছে, কুকুর আর শকুনে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। জেলের মধ্যে এই ছবি মাঝে মাঝে আমার মনে উঠত, আর বড় কষ্ট হত নিশিকান্ত। হোক দেশদ্রোহী—বাহুর বাবা আমাদের যতীন-দা তো!

কত দিনের ঘটনা এসব! তারপর অনেক সময় বেড়েছে, বুড়ো হয়েছি।

এখন নূতন করে ভাবি সেই সব সে-কালের কথা। দুঃখ হয় যতীন-দার জন্য। সর্বনিন্দিত হয়ে মারা গেল। মরেও নিষ্কৃতি নেই, শবদেহ ছিঁড়ে খেল শিয়াল-শকুনে। জেলের মধ্যে হঠাৎ একদিন মনে উঠল, মতলব করে মরেনি সে তো? ঘুঘু-বৈদ্যনাথটাকে নির্ঘাৎ সঙ্গে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হবে কেন? আগস্ট-আন্দোলনের সময়ে এই জয়রামপুরেই আর এক দফা ইংরেজের নিমকের মর্যাদা রেখে সরকারি মেডেল পাওয়া এবং স্বাধীনতালাভের মুখে সেই মেডেল প্রত্যর্পণ করে দেশপ্রেমী রূপে মাতব্বরি করা তাঁর ভাগ্যের লিখন— শুধু একটা পা খুইয়ে তিনি বেঁচে রয়ে গেলেন। গান্ধিটুপির নিচে পূর্বতন সকল দুষ্কৃতি চাপা দিয়ে সভায় ঘোরাঘুরি করতে দেখবে বৈদ্যনাথকে। রিটায়ার করবার পর এখনো জয়রামপুর আঁকড়ে আছেন। প্রফুল্লর ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরই মন্ত্রণামতো চলে—তাঁর বড় মুরুব্বি প্রফুল্ল।

কিন্তু আর সন্দেহ যাচাই করি কার কাছে নিশিকান্ত? গোপন অভিপ্রায় কাউকে তো বলে যায়নি যতীন-দা! তোমাদের উৎসব-সভায় ভুলেও কেউ তার নাম করবে না। আর দৈবাৎ যদি উঠে পড়ে, সমস্ত শ্রোতা—শান্তি-বউদি অবধি লজ্জায় মুখ ফেরাবে।

এই যে সভার জায়গা। পৌঁছলাম এতক্ষণে। খাসা সাজিয়েছে! প্রফুল্লর কাজে খুঁত থাকে না, বরাবর দেখেছি। পাকুড়গাছ শাখা বিস্তার করে আছে, রোদ লাগবে না মানুষ-জনের গায়ে। শেয়াকুল আর ন্যাড়াসেজির ঝাড় সাফ-সাফাই হয়ে গেছে; স্বাধীন-ভারতের নিশান টাঙিয়েছে ইস্কুল-বাড়ির সামনে। এই ইস্কুলে পড়েছি আমরা, আমাদের নীলকমল মাস্টার মশায়ের স্মৃতিপবিত্র ইস্কুল। আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন মাস্টার মশায়, তারপর আর কোন খবর পাইনি। হয়তো কোন গ্রামপ্রান্তে সকলের অজান্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন তিনি। আরও কত জনে এমনি গেছেন।

বিয়াল্লিশ সনে আট-দশ গ্রামের মানুষ মিলে এক নিশান বেঁধে দিয়েছিল ঐ ইস্কুল বাড়ির ছাতে। সে নিশান কিন্তু এত বড় ছিল না, আর উড়ে ছিল বড় জোর পাঁচটা কি ছ'টা দিন। সেবারের পরাহত পতাকা, দেখি নিশিকান্ত, প্রসন্ন আলোয় মাথা তুলে হাসছে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে।

লক্ষ্মণ মাইতি সভাপতি—তার জায়গা তক্তাপোষের উপর? তবেই হয়েছে! খুব ভাল জানি তাকে, ক্লাসে পাঁচ বছর পাশাপাশি বসে পড়েছি। খ্যাপাটে মানুষ—চিরকালের ধর্মভীরু। পরমহংসদেবের মানস-শিষ্য—ঠাট্টার ছলেও একটা মিথ্যা কথা বলে না। লক্ষ্মণের ছেলে প্রভাস—বাপের ছেলে সে,

বাপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সদাচরণে। বাপ বা ছেলে—কোন দিন ওদের উঁচুতে বসতে দেখিনি দশজন থেকে আলাদা হয়ে। লক্ষ্মণ কিছুতে বসবে না দেখো ঐ উঁচু সভাপতির আসনে।

শহীদ-বেদি ঐ ? বেদির গায়ে নাম লেখানো হচ্ছে কেন বাহাদুরি করে ? ক'টা নাম জান, কতটুকু খবর রাখ ? আমাদের যতীন-দার নাম লিখবে কি বেদির উপর ? দুর্গা আর নীলকমল মাস্টার মহাশয়ের নাম ? আদিকাল থেকে প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কত জনে প্রাণ দিয়েছে—আমাদের এই এক জয়রাম-পুরের কথাই ধর না—সংখ্যায় তারা কি একজন দু'জন ? নিজেরাই জানত না, সভ্যতার রথরজ্জু টানছে তারা, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও মমতা সঞ্চয়ন করছে উত্তরপুরুষের জন্য। আজকে ঐ স্বাধীন-পতাকার নিচে শুভ্র খদ্দরে ঢাকা বেদি গাত্র থেকে কতজনের স্থানচ্যুতি ঘটবে—তার চেয়ে নামে একটাও লিখো না তোমরা, লিখে রাখ—'সর্বযুগের শহীদজনের স্মৃতিতে।'

অত ফুল—শহীদ-বেদিতে ঢালবে ? কিন্তু কতক্ষণ থাকবে বল নিশিকান্ত ? বাতাসে ঝুরঝুর করে পাকা পাতা ঝরে তোমাদের ফুলসজ্জা তলিয়ে দেবে। এই তো ক'বছর আগে রক্তের ছোপে রাঙা হয়েছিল ওখানটা। আরও কতবার রক্তে ভেসেছে আমাদের দেশ—আমাদের এই গ্রামটুকুও। সারা দেশের মাটি খুঁজে দেখ, এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই কোনখানে। লোকের মনে একটু-আধটু যা আছে তা-ও মিলিয়ে যাবে আর কয়েক বছরে বিপুল জীবনোল্লাসের মধ্যে। দোষ দিই না—স্বাধীন দেশের ভাগ্যবান নরনারী, সামনে এগোবার তাগিদে—পিছনে ফিরে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কতটুকু ?

শপ এনে এনে জড় করছে। শপের কি দরকার ? শুকনো পাতা স্তূপাকার হয়ে আছে—ওরই কতক এনে গড়িয়ে দাও, গদির মত হবে, দিব্যি আরাম করে সকলে বসবে। কতদিন আমরা পাতার বিছানায় ঘুমিয়েছি—সে জায়গা দেখিয়ে এলাম নিশিকান্ত। প্রভাসের কথা ভাবছি। প্রভাস—আমাদের প্রভাস মহারাজ! ইস্কুলের মাঠে উৎসব-সভা—এমন দিনে সে নেই! এই মাঠ থেকে একদা নিশিরাত্রে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সঙ্কল্প নিয়ে পথে পথে বেরিয়েছিলাম আমরা, প্রভাস আর ফেরেনি। কাঠখোট্টা চেহারা, কদম-ছাঁটা চুল, গেরুয়া পরত না বটে—কিন্তু হাঁটুর নিচে কখনো কাপড় নামতে দেখিনি। বছর পনেরো নিরামিষ ধরেছিল, তার মধ্যে নুন ছুঁত না বছর পাঁচেক—ছেলেরা প্রভাস মহারাজ বলে ডাকত। কিন্তু মনে তার স্ফূর্তির জোয়ার—সেই ফেরারি অবস্থায় মসগুল করে রাখত সে সকলকে। এক টুকরো বাঁশের গোড়া আতার ছোটায় বেঁধে ঝুলিয়ে দোলনার মতো করে নিয়েছিল আমাদের

বাঁশবনের আশ্রয়ে। যেদিন পেটে ভাত পড়ত না, দোল খাওয়ার শখ বেড়ে যেত প্রভাসের সেই দিন।

পোড়া ইস্কুল-ঘরে আজ কত মানুষের আনাগোনা! এ দালান পুড়িয়ে দিয়েছিল সেবার। দরজা-জানালা পুড়ে গিয়ে ঘর হা-হা করত, আবার তার চেহারা ফিরেছে। একপাশে বিজলী-ডাক্তার খাবার জল আর তুলো-আইডিন নিয়ে হাসপাতাল সাজিয়ে বসে আছে আজকের দিনটার জন্ত। পাশের ঘেরা-বারাণ্ডায় একটুখানি বিছানা করা আছে, সভাপতি লক্ষ্মণ যদি বিশ্রামের দরকার মনে করে অতদূর এসে পৌঁছবার পর। বুড়োমানুষ, তার উপর শরীরের এই হাল—লোকে নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলেই সভা করে বেড়াতে হচ্ছে এখানে-ওখানে। কি দেখেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়, কিংবা লক্ষ্মণের জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর! তার নামে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও মানুষজন ভোরবেলা চাল-চিঁড়ে নিয়ে বেরিয়েছে। বক্তৃতা করতে পারে না লক্ষ্মণ, দুটো কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কালঘাম ছুটে যায়, অ্যা-অ্যা করে। সেই সময় পাশ থেকে কথা জুগিয়ে দিতে হয়। অথচ তার এত জনপ্রিয়তা! কিন্তু এবারে উবে গেল নাকি? প্রফুল্ল-বৈত্তনাথেরা বিশেষ উদ্যোগী বলেই হয়তো মানুষজনের চাড় দেখা যাচ্ছে না তেমনি। কিন্তু প্রফুল্লও ছাড়বার পাত্র নয়, হাজির করবে দেখো সকলকে ঠিক সময়ে। হাত ধরবে মাতব্বরদের, না আসে তো ট্যাক্স বাড়াবার ভয় দেখাবে। কাজকর্ম ফেলে মীটিঙে ছুটতে দিশা পাবে না তখন চাষীরা। আজই সকালবেলা রামদাস তুলেছিল এই প্রসঙ্গ। আমি তাকে উপদেশ দিলাম, কান খাড়া রেখো শঙ্খ বাজবে লক্ষ্মণের গলায় মালা দেবার সময়। তখন গিয়ে হাজির হোয়ো—তা হলেই চলবে।

লক্ষ্মণের সঙ্গে এবার একই দিনে আমি জেল থেকে বেরোই। গাঁয়ে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—কোন জায়গায় ঘরবাড়ি ছিল, চিনে উঠতে পারে না। আর আমার ঠিক উল্টো অবস্থা—চারিদিকে খাঁ-খাঁ করছে, তবু সমস্ত যেন জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সেই আগের মতোই তারা চলে-ফিরে বেড়ায়। যতীন-দাকে দেখি, কানুকে দেখি, প্রদীপ্তমুখ প্রভাস মহারাজকে দেখতে পাই। জেলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। রোগের শেষ যায় নি, এখনো অনেকের সন্দেহ। আমি কিন্তু নিজে কোন রোগের লক্ষণ একবিন্দু টের পাই নি। অতীতের প্রিয় মানুষগুলি রাতদিন যেন আমায় ঘিরে বসে থাকত, ভারি আনন্দে ছিলাম। বরং মনে হয়, পাগল ঐ বুড়ো লক্ষ্মণ। কোনদিন ওর রোগ নিরাময় হবে না। দেখলে মনে হবে, অমন সুখী লোক ভূ-ভারতে নেই। জেল থেকে বেরিয়ে ঘর সে আর নূতন করে বাঁধল না। বললে হাসে। হেসে হেসে

বলে, কি দরকার বল ভাই? কথা মিথ্যা নয়—ঘরের কি দরকার লক্ষ্মণ মাইতির? নিজে তো আজ এখানে কাল সেখানে—এই করে বেড়াচ্ছে। বউ জলে ডুবে মরেছে, জলের তলে জ্বালা জুড়িয়েছে হতভাগীর। দুটি ছেলের মধ্যে প্রভাস ফাঁসিতে গেছে, আর একটি জেল থেকে নানা জটিল রোগ নিয়ে এসেছে—হাসপাতালের একরকম কায়েমি বাসিন্দা তাকে বলা যায়। লক্ষ্মণ কেন মিছে ঘর-বাঁধার হাঙ্গামা করতে যাবে?

প্রভাসের কথা শোন। বারটা মনে হচ্ছে—বিষ্যুৎবার। হাট বসেছিল সেদিন, হাটবার ছিল—তাই মনে আছে বারটা। সকালবেলা টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রভাসকে ধরল, হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলল। হাঁটু অবধি খদ্দর-পরা মুখে প্রশান্ত হাসি আমাদের প্রভাস মহারাজ—তার হাতে দড়ি না দিলেও চলত নিশিকান্ত। ইস্কুল-ঘর দখল করে নিয়ে পুলিস ওখানে ঘাঁটি করেছিল। সামান্য এই পথটুকু নিয়ে আসার মধ্যে আসামি পালিয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পালাবার হলে অপেক্ষা করত কি সে বাড়ি বসে? কত জনে সে বুদ্ধি দিয়েছিল, সে যায় নি। ওরা এলে প্রভাস বেরিয়ে এসে হাত দু-খানা এগিয়েই দিল একরকম। হাতে হাতকড়ি পরাল, কোমরেও এই মোটা এক দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। সোজাপথে না নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে হাটখোলা অবধি তাকে নিয়ে বেড়াল। তার মানে, সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে নিক ওদের প্রতাপ। কাল হল এই প্রতাপকে দেখাতে গিয়েই। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে মানুষ জমতে লাগল, সকলের মুখে ঐ এক কথা। ভোরবেলা ওরা যে যার ঘরের মধ্যে ছিল, থানার লোক যেন ফাঁক বুঝে সেই সময় জুতো মেরেছে একা প্রভাসকে নয়—অঞ্চলসুদ্ধ মানুষের মুখে। প্রভাসকে এমনি ভালবাসত সবাই। বাসবে না কেন নিশিকান্ত, সর্বত্যাগী হয়ে কে এমন ভালবেসেছে দেশের মানুষদের? বারাণ্ডায় ঐ যে আধ-পোড়া শাল-খুঁটি, ঐখানে ঠিক-দুপুরে প্রভাসকে বসিয়ে রেখেছিল। মালসায় করে গুড়-মুড়ি খেতে দিয়েছে, তা সে খায় নি। প্রহরখানেক একটানা জেরা করে ক্লান্ত বৈদ্যনাথ সবেমাত্র খেতে গেছেন, খেয়ে দেয়ে এসে নব উদ্যমে আবার এক দফা চেষ্টা চলবে, তারপর পাঁচটার গাড়িতে সবসুদ্ধ আগরহাটি হয়ে সদরে রওনা হয়ে যাবেন, এই সাব্যস্ত আছে। কাণ্ডটা ঘটল এই সময়। আশ-পাশ আট-দশখানা গ্রামের বিস্তর লোক দলে দলে মিছিল করে এসে পড়ল। শত শত নিশান উড়ছে, গর্জমান জনতরঙ্গ অধীর হয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—

ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। খাওয়া হল না বৈদ্যনাথের—এঁটো-হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটলেন। হাটুরে মানুষও যে যা পেয়েছে

হাতে নিয়ে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। প্রভাসের হাতকড়ি ভেঙে কোমরের দড়ি কেটে কাঁধে তুলে লাফাতে লাফাতে তারা নিয়ে গেল। জনতার নজর এড়িয়ে বৈদ্যনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এঁদোপুকুরের কচুবনের ভিতরে গিয়ে বসেছিলেন, চাঁদ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল নাকি তাঁকে। সত্যি, তাজ্জব ঘটে গেল নিশিকান্ত—এক মুহূর্ত আগে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রভাসকে শুধু ছাড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—জমাদার-কনেস্টবল উর্দি-চাপরাস ফেলে 'বাপ' 'বাপ' বলে পালিয়েছে, তাদেরই দু'জনকে ধরে তালাবদ্ধ করে রাখল ঐ পাশের কামরায়। তে-রাঙা নিশান পতপত করে উড়ছে ইস্কুল ঘরের ছাতে। পাঁচ রাত চার দিন উড়েছিল ঐ ভাবে।

রাত্রি প্রহরখানেক অবধি এই সমস্ত চলল তো নিশিকান্ত, তারপর চারিদিক স্তব্ধ হলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবছি, এ কী হয়ে গেল—ঠিক এমনটা চাই নি, আশাও করি নি এত সহজে এমন দখলে এসে যাবে সমস্ত। কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ি—সে ব্যাপারও এইরকমটা নাকি? হঠাৎ বিজয় হয়ে যায়, যত মানুষ মরবে আর যত গোলাগুলি চলবে বলে আস্ফালন করা হয় আসলে তার সিকির সিকিও লাগে না। এর পরবর্তী অধ্যায়ের আঁচ করছি, এ ব্যাপার অবশ্য এখানেই চুকবে না। আমরা, বয়স যাদের বেশি, সাব্যস্ত করতে পারি নে কি করতে হবে অতঃপর আমাদের। কিন্তু, জোয়ান ছেলেগুলো বেপরোয়া, তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, হাসি-স্ফূর্তির অবধি নেই—খবর নিয়ে আসে, শুধু একটা জায়গা নয়—সর্বত্র প্রায় একই অবস্থা। সাম্রাজ্যের হাজার ছিদ্র, সামলাবে ওরা আর ক'দিকে? কত মানুষ আছে শুনি, কত হাতিয়ার? আর হাতিয়ার হাতে পেয়ে কোন্ দিকে তাক করবে, তারই বা ঠিক কি? ওদের নিজের ঘরের ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে বেঁকে বসছে ক্রমে। শহর থেকে ফিরে এসে একজন গল্প করছে, সাদা সৈন্যের ব্যারাকের সামনে দিয়ে জনতা জকার দিতে দিতে যাচ্ছিল, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়। সৈন্যদেরই একজন নাকি দরজায় বেরিয়ে হাসিমুখে জবাব দিল, ফর গড্‌স্ সেক—ঈশ্বরের দোহাই, ভারত ছেড়ে দেশে ফিরতে দাও আমাদের। ছেলেগুলো মুখ নেড়ে নেড়ে আমাদেরই উপদেশ দিতে আসে, অত ভাবছেন কি দাদা? চালাও হুকুম এবার নেতার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পোস্ট-অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজ বন্ধ। ছেলেরা বলে, ভাল হয়েছে—বানানো গল্প আর সুকৌশলে পিছু হঠার বাহাদুরি পড়তে হবে না এখন আর। কাগজ আসছে না, তা বলে খবরের প্রচার কিন্তু বন্ধ নেই। গাছে গাছে অলক্ষ্যে এঁটে দিয়ে যাচ্ছে সাইক্লোস্টাইল-করা খবর। হুলস্থুল কাণ্ড। বিদেশে ফৌজ গড়েছে আমাদের। আসছে, তারা এসে গেল বলে। পথ তৈরি কর তাদের জন্য।

রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে ফেলেছে, পগার কেটেছে দশ-বিশ হাত অন্তর। খেয়া-নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে! ছোট রেললাইনও একেবারে বেমালুম মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ-সাত জায়গায়। সদর থেকে সৈন্য নিয়ে আসা সহজ

হবে না আর এখন। রোজই নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা দিন গুণছি নিশিকান্ত—খবর নিচ্ছি, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে কি আগুন? আগাপাস্তলায় আগুন লেগে গেলে জল ঢালবে তখন কোন দিকে?

কিন্তু আটকানো গেল না নিশিকান্ত। রাস্তায় নূতন মাটি ফেলে গাছ সরিয়ে মেটে রঙের সারবন্দি ট্রাক এসে পড়ল, আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত্রি জন চারেক আমরা একবার রানায়ের মোহানা অবধি গিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দূরের জায়গায় বেশি বিপদ। সবদিকে ডামাডোল চলছে, অচেনা লোক দেখলে সবাই কেমন এক ভাবে তাকায়। মুশকিলের কথা বলব কি—সারাদিনের মধ্যে একমুঠো ভাত কি চিঁড়ে জোটাতে পারলাম না, সকলে চোখ কটমট করে চায়। অনেকে নূতন মানুষ দেখে সন্দেহ করছে পুলিসের চর আমরা। কে পুলিস আর কে কর্মী আলাদা করার উপায় ছিল না, পুলিসই ভলান্টিয়ার সেজে খোঁজখবর নিত সময় সময়। অবস্থা দেখে আমাদের আতঙ্ক হল, দিনের বেলা এই রকম—রাত্রে নিশ্চয় ধরে পিটুনি। অথচ আত্মপরিচয় দিতেও ভরসা হয় না। যত ঢাকাঢাকি করছি, সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে সকলের।

চুপিচুপি বলি তা হলে নিশিকান্ত, জেলে গিয়ে যেন সোয়াস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম ছ-সাত মাস পর। নিশ্চিন্ত। মাথা খারাপ হল শুনে তোমরা হায়-হায় করতে, আমার তার জন্য কিন্তু এতটুকু কষ্ট ছিল না। এক বিচিত্র অনুভূতি স্বপ্নের মতো এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মোটা মোটা গরাদে আর উঁচু পাঁচিলে যেন লোহার কেল্লা গড়ে রাজাধিরাজ হয়ে নিঃশঙ্কে ছিলাম। পথের কুকুরের মতো আর তাড়া খেয়ে ঘুরতে হত না।

প্রভাসকে শেষ দেখেছিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। সে দেখে নি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল তখন। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে সেলের ভিতরটা অবারিত। ওয়ার্ডার পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ফাঁসি-কাঠে কালো বার্নিশ লাগিয়েছে, চর্বি দিয়ে মেজেছে। প্রভাসেরই ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে সকালবেলা। তারা তৈরি!

ঘুমুচ্ছিল, রাতের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে ঘণ্টার আওয়াজ এল। শোনা কথা অবশ্য—ধড়মড়িয়ে উঠে সে বলেছিল, স্নান করব, পুণ্যকর্মে যাচ্ছি, শুচি-স্নাত হয়ে যেতে চাই।

উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, শেষ রাত্রের নির্মল আকাশে অজস্র হীরার কুচির মতো তারা দপদপ করছে—সেই সময় ঘুম ভেঙে বসে শুনতে পাচ্ছি, যার কাছে যে দোষ করেছি, মাপ চেয়ে যাচ্ছি ভাই। শুনতে পাও বা না পাও, আমায় মাপ কোরো তোমরা—

চোখে দেখি নি, কিন্তু ছবিটা আন্দাজ করতে পারি নিশিকান্ত। পবিত্র আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখ, ফাঁসির মঞ্চে অচঞ্চল উঠে দাঁড়াল আমাদের প্রভাস মহারাজ।

যে সময় বিচার চলছিল, একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মারতে পার তুমি? সত্যি কি মেরেছিলে?

খানিক হাসিমুখে তাকিয়ে থেমে সে বলেছিল, মানুষ কি মারা যায়? জানোয়ার মরেছিল কি-না খবর রাখি নে। তারপর একটু স্তব্ধ থেকে বলল, একটা কাজ কোরো ভাই দয়া করে। মহাত্মাজী বেরিয়ে এলে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ কর মহাত্মাজী।

তুমি সেই ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছ, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও উপলব্ধি করবে এ তারই দেশ; দেশের পরিগঠনে তাদের মতামতও কার্যকর হবে। সেই ভারতে উচ্চ-নীচ সমাজ-বিভেদ থাকবে না, সর্বসম্প্রদায় পরস্পর প্রীতিমান হয়ে বাস করবে। অস্পৃশ্যতা থাকবে না, মাদক-সেবন থাকবে না, নারী পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে। তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষের এই ছবি এঁকে দিয়েছ আমাদের মনে।

এই সভাক্ষেত্র শেষ নয় জয়রামপুরের। দুর্গম পথ এবার। ঐ নাবাল বিলের প্রান্তে চাষীদের বসতি—প্রায় আড়াই শ' ঘর হবে। তাদের কেউ এখনো সভায় আসেনি। তাকিয়ে দেখ নিশিকান্ত, রুক্ষ বিল নবাঙ্কুরে হরিৎশ্রী ধারণ করেছে। সারবন্দী চাষীরা ক্ষেত নিড়াচ্ছে এই পড়ন্ত বেলাতেও। ক্ষেতে বড় গোন। টিলার উপর বাঁশ ফাড়ছে ফটফট আওয়াজে—জাঙালের দু-ধার ঘিরে দেবে, গরুতে মুখ বাড়িয়ে যাতে ধানচারা না খেতে পারে। দেখ চেঁচোঘাসের বোঝা এনে এনে জাঙালে ফেলছে—বাড়ি ফিরবার সময় নিয়ে যাবে, রাত্রে কুঁড়োর সঙ্গে মেখে জাবনা হবে গরুবাছুরের। ঘাড় উঁচু করে একবার ওরা তাকিয়েও দেখছে না এদিককার এ উৎসবের আয়োজন। ইতিহাসের এমন একটা স্মরণীয় দিন—তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারো।

রাগ কোরো না, ওরা খবর পায়নি। খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে যে স্বাধীনতা এসে গেল—আর ছাপার অক্ষরে দিনের পর দিন মিথ্যা কথাই বা লিখবে কেন? কিন্তু আমাদের জয়রামপুর অবধি এসে পৌঁছবার দেরি আছে। বিয়াল্লিশ সনে লাইন উপড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে রেলগাড়ি চলে না। ভদ্রা মজে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে একটা ছোট্ট ডিঙি আনতে গেলেও কলমির দামের ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে অনেক কষ্টে নিয়ে আসতে হয়। দিল্লী-করাচির স্বাধীনতা চট করে কি পৌঁছতে পারে এতদূর?

প্রফুল্লদের গাফিলতি নেই। হাটে দু-হপ্তা ধরে কাড়া দিচ্ছে। তোমাদের সকলের নাম দিয়ে হাণ্ডবিল বিলি করছে—পতাকা উত্তোলন হবে, মস্ত বড় সভা হবে, শহীদ-বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি ও শহীদ-পদক দেওয়া হবে, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। এসব সত্ত্বেও খবর পায়নি ওরা। যেমন গ্রাম-গ্রামান্তে বিনা তারে খবর হয়েছিল দূর-অতীতে নীল-বিদ্রোহের দিনে, কিংবা এই সেদিন লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগস্ট বিপ্লবের সময়।

ওদের কাছে খবর পৌঁছবার উপায় কর নিশিকান্ত। প্রফুল্লদের সাধ্য নেই। কালোরা সাদার আসনে বসেছে, সেই আনন্দে মশগুল ; হুকুম-হাকাম চালাচ্ছে, যতদূর পারছে পকেট ভরে নিচ্ছে। এই অবধি পারে প্রফুল্লরা, অনেক সাধনায় বক্তৃতামঞ্চের উপর মনের হাসি গোপন করে অশ্রু নিঃসরণের কায়দাটা শিখেছে। কর্তৃত্বের সকল কারচুপি নখমুকুরে। আজ ইংরেজ গবর্নমেন্ট—সেলাম, আমরা সঙ্গে আছি হুজুর। এসেছে, স্বরাজ—জয় হিন্দ, এই যে হাজির আমরা।

ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির দুর্গে বসবাস করে নির্বিঘ্ন মনে করছে নিজেদের। স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, চাষীপাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে আর এক রকম হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল-বৈদ্যনাথের তদ্বিরে সভার জায়গা শেষ অবধি নিশ্চয় ভবে যাবে নিশিকান্ত—বুড়োরা আসবে আমাদের পাড়ার দিককার অনেকে আসবে, কিন্তু ঐ ছোকরাদের আসবে না প্রায় কেউ। একালের ওরা মাথা নিচু করে বেড়ায় না আর ভক্তিমান ভাবে, জুতো খেয়ে পিঠের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চোখের জল ফেলে না। কারুরও দয়ার প্রত্যাশী নয় ওরা। কেমন করে লোভ ঢুকে পড়েছে মনে—প্রফুল্লদের মতো দালান-কোঠায় শোবে এলাক-পোশাক হবে ঐ রকম। কালীতলায় ঢাক বাজে না আগেকার মতো, ঢাকের তালে নেচে মাটিতে লুটায় না ভক্তের দল। পুজোর কাছে ওদের বেশি আনাগোনা দেখা যায় পাঁঠাবলির সময়টা। অবিশ্বাসী ওরা—বুড়োরা বলে নরকেও জায়গা হবে না। বলিপর্ব শেষ হতে না হতে ছাল ছাড়াতে লেগে যায়, অগৌণে মহপ্রসাদের মাংস পেঁয়াজ রসুন সহযোগে চাপিয়ে দেয় উনুনের উপর। পুরুত বিষ্ণু চক্রবর্তী অভিসম্পাত করেন এই নাস্তিকদের জন্য। ওরা হাসে। চাষীপাড়ার পৌরোহিত্য ছেড়ে দেবেন বলে তিনি শাসিয়েছেন অনেকবার, এরা পদানত হননি। অবশেষে অনেক বিবেচনা করে পুরুতঠাকুরই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমা করেছেন।

ঘন গিরাওয়ালা বাঁশের লাঠি কেটেছে ওরা, বেতের ঢাল বানিয়েছে। যখন স্বাধীন দেশের সৈন্য নেওয়া হবে—ওদের পাড়ায় তখন লোক পাঠিও, সৈন্যদল আধাআধি তৈরি হয়ে আছে ওখানে। ও-পাড়ার শিশুরা সকালে নারিকেল-গামড়ার গরু বানিয়ে খেলা করত, এখন খেজুর-ডাসের গোড়া চেঁচে-ছুলে নিয়ে বন্দুক বন্দুক খেলে। কি করে বলতে পারি না—জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর নানা দেশের অনেক গুহ্য খবর, প্রফুল্লরা কিছুতেই যা ফাঁস করতে চায় না। নিজেদের আর অসহায় দুর্বল মনে করে না ওরা কেউ। ঐ যে শত শত বাঁশের ঘর, কঞ্চির বেড়া—বাঁশের কেল্লা ওগুলো, রামজয় ঠাকুরের একটার জায়গায় দেশব্যাপী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ—

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

তাজ্জব দেখুন। পিকিন-হোটেলে গান্ধি-জয়ন্তী। রাত আছে তখনো—প্রখর শীত। কলে গরম জল আসে নি। তা হোক—ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকলে হবে না। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরই মধ্যে নেয়ে ধুয়ে নিচে ছুটেছি।

গুটিকয়েক মানুষ—আয়োজন নগণ্য। গান্ধিজীর ছোট ছবি—দরিদ্র অর্ধনগ্ন ভারতের কঠিন ত্যাগ আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প চিত্রায়িত ঐ নরমূর্তিতে। সত্তর বছরের ক্ষীণদেহ নগ্নপাদ খদ্দরধারী রবিশঙ্কর মহারাজ গোটা চারেক বাক্যে করজোড়ে গান্ধিজীর কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করলেন। সাঁইত্রিশটা দেশের তিন শো আটাত্তর জন প্রতিনিধি ও দর্শক আজ থেকে আমরা এক ঘরে একটা ছাতের নিচে শান্তি-সম্মেলনে বসব—একশো-ষাট কোটি মানুষের মুখপাত্র হয়ে। তাবৎ ভুবন নিঃশব্দ বাক্যে বুঝি আকুতি জানাচ্ছে—দেখো তোমরা, মানুষের রক্ত আর যেন না ঝরে মাটির উপর, কলঙ্কের পাঁক গায়ে আর মাখতে না হয়।

মিনিট দশেকেই অনুষ্ঠান শেষ। আন্তর্জাতিক বিরাট সম্মেলন—তারই এই অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা। ক্ষুদ্র হলেও সামান্য নয়। নতুন পৃথিবীতে গান্ধিজীর মতো জীবন দিয়ে কে লড়েছেন শান্তির জন্য? ছবির একদিকে চতুর্নারায়ণ মালবীয়—ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান, ইদানীং পার্লামেন্টের এক কংগ্রেসি মেম্বার। অন্য দিকে গোপালন—ইনিও পার্লামেন্টের মেম্বার, কমিউনিস্ট দলের নেতা। পার্লামেন্টে মুখোমুখি মুখ উঁচিয়ে থাকেন, বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়েন না। আজকে দেখুন, নিস্তব্ধ পরম শান্ত তাঁরা—অতি-মধুর এক প্রত্যাশা অনুরণিত তাঁদের এবং সকলের মনে মনে।

ঘরে ঘরে শান্তি-সম্মেলনের কাগজপত্র এসে পড়ল—সবুজ ফাইল, সোনালি কপোত-আঁকা চমৎকার পকেট-বই, প্যাড-পেন্সিল, অভ্রের খাপের ভিতর নম্বর-সমন্বিত ডেলিগেট-কার্ড। ছোট-বড় কত সভাসমিতি দেখেছি এর আগে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আয়োজনের নমুনা দেখে ইতিমধ্যেই মেজাজ

চড়ে উঠেছে। নিখিল বিশ্বভুবনের মালিক যেন আমরাই···না, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত আর মেনে নেওয়া হবে না, আমরা পৌনে চারশ বিচারক এজলাসে গিয়ে বসেছি, ক দিন ধরে সাক্ষিসাবুদ নিয়ে রণদৈত্যের নির্বাসন-দণ্ড বিধান করব মর্ত্যালোক থেকে।

বিকাল তিনটায় সম্মেলন শুরু। ইয়ং ও তার চেলাচামুণ্ডারা তাড়িয়ে-ভুড়িয়ে সকলকে লনে এনে জড় করেছে। গজরাচ্ছে সারবন্দি বাস—মানুষগুলো উদরস্থ করেই দেবে ছুট। কার্তিককে ভোলেন নি নিশ্চয়—বিড়-বিড় করে বকতে বকতে সে দ্রুত পদচারণা করছে গঙ্গাস্নান অন্তে বুড়োমানুষের স্তোত্র পড়তে পড়তে পথ চলার মতো।

ব্যাপার কি হে ?

নম্বরটা রপ্ত করে নিচ্ছি। ডেলিগেট-কার্ড, ধরুন, খোওয়া গেল। নম্বর ঠিক থাকলে তবু অনেকখানি সুরাহা। নইলে যা শোনা যাচ্ছে—সে তো এক সমুদ্রবিশেষ।

কনফারেন্স-হল। পরশু এইখানে সরাসরি ভোজ হয়েছিল। ভোল বদলে ফেলেছে একটা দিনের মধ্যে। প্লাটফরমের পিছনে শিল্পী পিকাসোর বিরাট পারাবত, পারাবতের দু-পাশে সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা—এ সব সেদিন ছিল, আজও আছে। আজকের বাড়তি, প্লাটফর্মের উপর তিন সারি চেয়ার সভাপতি মশায়দের। একটি দুটি নন, গুণতিতে তেষট্টি হলেন তাঁরা। কোনও দেশ বড বাদ নেই। পয়লা দিনের কাজকর্মের জন্য পাঁচ জন বাছাই হলেন—সান ইয়াৎ-সেনের বিধবা সুং চিং-লিং, ডক্টর কিচলু, পাকিস্তানের মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, জাপানের হিরোসি মিনামি আর কোস্টারিকার এডুয়ার্ডো মোরা ভালভার্দে।

আসন নিলেন সভাপতিরা। টবে সাজানো অজস্র চারা, তারই ফাঁকে ফাঁকে বসেছেন। আর, ফুল—ফুলে ফুলে কি অপরূপ সাজিয়েছে ! হঠাৎ মনে হবে, কুসুমোদ্যানে আরামসে তারা জমিয়ে বসে আছেন।

বক্তৃতার জায়গাটা কিছু এগিয়ে। চারটে মাইক এদিক-ওদিকে। সিকি-খানা শব্দও হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। বক্তার ডান দিকে কাচের কুজোয় জল ও গেলাস। দুই কোণে সিনেমেটোগ্রাফ-যন্ত্র উদ্যত—যেন বৃহৎ দুটো কামান পেতে রেখেছে। রঙিন সিনেমা-ছবি তোলার বন্দোবস্ত। সেই কামানের মুখ মাঝে মাঝে ঘুরছে আসরের দিকে—দপ করে জোরালো

আলোগুলো জ্বলে উঠেছে, আমাদের ইতরজনদেরও অর্ধেক হাত ইঞ্চি দুয়েক মুখ্যকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে ছবিতে।

নিচের আমাদের আসরেরও একটু বর্ণনা দিই। পরশুর ভোজ-সভায় সেই টানা-টানা টেবিল নেই! তার বদলে প্রতি জনের আলাদা চেয়ার-টেবিল। এক-এক দেশের মানুষ এক-একটা দিকে। ভারতীয় আমরা দলে ভারী সকলের চেয়ে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উনষাট। মাঝখানে পাঁচ-ছয়টা সারি নিয়ে আমাদের জায়গা। অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকা সাঁটা রয়েছে সেখানে —রোমক হরপে 'ইণ্ডিয়া' লেখা। দলের মধ্যে যত্রতত্র বসে পড়বেন, সে জো নেই—ডেলিগেট-নম্বর-ওয়ারি জায়গার ব্যবস্থা। চলাচলের পথ এক দিকে —কার্তিক এবং অন্য এক মহাশয়, দেখলাম, উশখুশ করছেন ঐ পথের কিনারে বসবার জন্য; জায়গা বদলাবদলির বিশেষ প্রকার তদ্বির করছেন। ব্যাপার বুঝলেন? ছবি উঠবে ভাল, ফাঁকার মধ্যে ওঁদের আলাদা ভাবে চেনা যাবে। দেশে ফিরে সেই সব ছবি দেখিয়ে জাঁক করবেন, আমরা কি দরের মানুষ বোঝ!

কার্তিক এবং সেই ব্যক্তি—ফোটো তোলার ব্যাপারে আশ্চর্য প্রতিভা ওঁদের। কেমন যেন গন্ধ শুঁকে টের পান, কখন কোন দিকে ক্যামেরার মুখ ঘুরবে। সেখানে ঠিক জেঁকে বসে আছেন। কনফারেন্স-হলের পিছন দিককার মাঠেও বিরাম সময়ে ইনি-উনি ছবি তুলতেন। ছবি তোলবার সময়টা ঠাহর পান নি—কিন্তু ছবি হয়ে গেলে ঠিক দেখতে পাবেন, সকলের মাঝখানে সর্বপ্রধান জায়গা নিয়ে ওঁরা দুটি দাঁড়িয়ে। বিক্রির জন্য এইরকম অনেক ছবি থাকত হোটেলের নিচের তলায়; এ-দোকানে ও-দোকানে পথের ধারেও টাঙিয়ে রাখত। ওঁরা দু-জনে আঙুল দিয়ে দেখাতেন, এই যে আমি, —ঐ যে আমি ···। কিচলু দলপতি—কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় চাপা পড়ে থাকতেন ঐ যুগলের দাপটে।

যাক গে, পয়লা দিনের কথায় আসি আবার। সভাপতি মশায়রা তো জেঁকে বসলেন প্লাটফরমের কুঞ্জবনে। বাজনা বেজে উঠল—কোন অলক্ষ্য লোক থেকে সুগম্ভীর মন্দ্র। পিছন দরজা গেল খুলে। উল্লাসের কলধ্বনি —জোয়ারের ঢেউ যেন এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। ফুলের তোড়া দিতে যাচ্ছে তরুণ আর তরুণীরা। চলেছে প্লাটফরমের দিকে। স্বাস্থ্য আর হাসিতে ঝলমল, সেই হাস্যোল্লাস ছিটকে দিয়ে যাচ্ছে গতির বীর্যভঙ্গিমায়। চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উঠল প্লাটফরমের উপর—এক-এক জনে তোড়া দিল

এক-এক সভাপতিকে। তারপরে শেকহ্যাণ্ড। আরে আরে—কি কাণ্ড, কোণের ঐ টাক মাথা প্রবীণ মানুষটি আনন্দ-আবেগে আলিঙ্গন করেছেন তাঁর নাতনির বয়সি মেয়েটাকে। অজানা অচেনা কত সমুদ্রের পারবর্তী বুড়ো থুত্থুড়ে এক জন আর নূতন কালের ওই আনকোরা আধুনিকা—এতগুলো মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু বিকার নেই কারো মনে। কেউ মুখ বাঁকাচ্ছে না। ও-সব হল অন্ধকার কোণচরদের রীতি—এই আলোর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনের ঘৃণ্য বীভৎস কীটগুলো। তারপরে হাততালি—ঘর ফেটে যায় বুঝি-বা! সভাপতি মশায়রা সবাই তো বয়স্ক মানুষ—তাঁরা ঘেমে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছি, আনন্দোন্মাদ জোয়ান ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—এমনিতরো অবস্থা। করুণ চোখে ওদের দিকে চেয়ে কোন গতিকে তাল ঠেকিয়ে যাচ্ছেন। হাততালি বন্ধ হল শেষ পর্যন্ত, নাচুনে ছেলেমেয়েগুলো নেচে চলেছে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতো। পথের পাশের লোকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে যাচ্ছে তীরগতিতে—সেকেণ্ডে খান পাঁচ-সাত হাতের সঙ্গে। অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। বাজনা বন্ধ।

কাজ শুরু এবারে। চুপ করুন। কলম-পেন্সিল বাগিয়ে বসেছি।

অধোদেশে আমাদের চিত্রটাও আন্দাজ করে নিন একটু। শিবের মাথায় সাপ পেঁচিয়ে থাকে, সেই গোছের এক-এক হেডফোন শিরে ধারণ করে আছি। টেবিলের গায়ে সুইচ-বোর্ড—আটটা ফুটো বোর্ডে। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্প্যানিশ এবং বক্তৃতার মূলভাষা—তা ছাড়া আর তিনটে ফাউ। ঐ চারটে ভাষার একটা অন্তত আপনি জানেন, তবে আর কোনই অসুবিধে নেই। বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, চোখের সামনে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন—আর যে ভাষা আপনার পছন্দ, সেই ছিদ্রে প্লাগ ঢুকিয়ে মহানন্দে কথা শুনে যান। আদি অকৃত্রিম বক্তৃতা শুনবেন তো তারও ব্যবস্থা রয়েছে—ঐ মূলভাষার ছিদ্র। এইগুলো ছাড়া অন্য ভাষায় যদি প্রচার-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তারই জন্য বাড়তি ফুটো তিনটে। আপাতত নিঃশব্দ এগুলো।

কায়দাটা বুঝলেন? যা মুখে এলো, এলোপাতাড়ি বলে যাওয়া নয়—আগে থেকে তৈরি-করা প্রত্যেকটি বক্তৃতা। একটা কপি পূর্বাহ্ণে জমা দিতে হয়। ওঁরা চারটে ভাষায় তার অনুবাদ করে রেখেছেন—মূল বক্তৃতার সঙ্গে একই সময় একই তালে ছাড়ছেন। নিখুঁত ব্যবস্থা—ধরা মুশকিল, বক্তার আসল ভাষা কোনটা।

শ্রোতৃবর্গ পরম গম্ভীর—ব্যস্তসমস্ত হয়ে টোকাটুকি করেছেন। কি অত টোকেন, আমি কিন্তু ভেবে পাইনে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলেছে; টেবিলের উপর টাইপ-করা পুরো বক্তৃতার কপি এসে যাচ্ছে অনতিপরেই। পরের দিন দশটা না বাজতেই বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের রকমারি ছবি সহ ইংরেজি, রুশীয়, স্প্যানিশও চীনা—চারটে ভাষায় পরিচ্ছন্ন সচিত্র মুদ্রণে তাবৎ ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। সমস্ত দায় ওঁরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমাদের কাজ তো দেখছি —পা ছড়িয়ে বসে বসে বক্তৃতা শোনা, বিরাম-সময়ে ঘুরে ঘুরে আলাপ জমানো আর যথাভীষ্ট পানাহারে ওঁদের অনুগৃহীত করা।

টুকে যাচ্ছি আমিও বটে! বক্তৃতার এক বর্ণ নয়—চতুর্দিকে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি। টুকে রেখেছিলাম, তাই তো প্রাণ খুলে বলতে পারছি। জুত মতো টেবিল-চেয়ার পেয়ে ভারি সুবিধা হয়েছে। স্মৃতি হাতড়ে যে লেখা বেরোয়, জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শুকনো বিবরণের বাণ্ডিল—প্রাতঃকালের সংবাদপত্র। সবজান্তা হওয়া যায়, কিন্তু মনের মধ্যে ঢেউ তোলে না। যাক গে, যাক গে—কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল ঐ যে!

পয়লা বক্তৃতা সুং-চিং-লিঙের। ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের ছবি তো যত্রতত্র, ছবির মুখে কথা পাইনে—কথার সুধা আর কথার আগুন এই শুনতে পাচ্ছি তাঁর স্ত্রী মুখে। মাঞ্চু-রাজার গ্রাস থেকে মহাচীনকে ছিনিয়ে এনেছিলেন ওঁরাই। সেই থেকে গণরাজার রাজত্ব বহাল। তার পরে চল্লিশ বছর কেটে গেল, কত ছেলেমানুষ বুড়ো হয়ে গেল, মাদামের কিন্তু বয়স বাড়ল না। একটি চুল পাকে নি—মুখে একটি কুঞ্চন রেখা নেই, নব তারুণ্যের ঝলকিত হাসি খেলে বেড়াচ্ছে তথায়। কথা যে কটি বললেন—বৈদগ্ধ্যে বিচিত্র নয়, কিন্তু আশায় সমুজ্জ্বল।

'শান্তি যারা চায়; তাদের শক্তি অসীম হয়ে উঠেছে দিনকে-দিন। হতেই হবে। লড়াই বন্ধ হবে পৃথিবীতে—ঝগড়া-বিবাদের আপোস-নিষ্পত্তি। মারণাস্ত্র তৈরি আর চলবে না—ওটা মহা অপরাধ বলে ঘোষিত হোক। অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্য চলবে সকল দেশের মধ্যে, সাংস্কৃতিক বন্ধনে এক হবে নানান জাতের মানুষ···'

সভা চালাচ্ছেন এখন ডক্টর কিচলু। মাও সে-তুং অভিনন্দন জানিয়েছেন, পড়া হল সেটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে সকলে—কতক্ষণ কেটে গেল,

উল্লাস থামবার লক্ষণ দেখিনে। বাণী পাঠিয়েছেন—জোলিও কুরি, ইকুওয়াকা, পাবলো নেরুদা, পল রবসন—এমনি সব জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ।

তার পর বিরাম। ঘণ্টা দেড়েক ধরে বিস্তর ধকল গেল—খানাপিনা হোক পিছনদিককার চার-পাঁচটা ঘরে, প্রকাণ্ড উঠানে চরে-ফিরে বেড়ান, আলাপ-পরিচয় গল্পগুজব করুন। ঘণ্টা বাজলে আবার এসে বসবেন।

ঘণ্টা বাজল। মিঞা ইকতিকারউদ্দিন এবারের সভাপতি। হাসিখুশির মানুষ—কথায় কথায় রঙ্গ-রসিকতা। দুরন্ত প্রাণাবেগ—একটি জায়গায় বসে থাকা বড় শক্ত মানুষটির পক্ষে। কংগ্রেসের সত্যযুগীয় আমলে ইনিও এক চাঁই ছিলেন। তখন নাম শোনা ছিল, পিকিনে এসে কাছাকাছি পরিচয় পেলাম।

বক্তৃতার স্রোত চলল অতঃপর। একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছেন। গেব্রিয়েল-দ্য-অরকুশিয়ের—বিশ্বশান্তি পরিষদের এক কর্মকর্তা। জাপানের অধ্যাপক হিরোশি মিনামি। আমাদের ডক্টর কিচলু। পাকিস্তানের দলপতি পীর মানকি-শরিফ। ব্রেজিলের আবেল চেরম। ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন্স-এর ই. থর্নটন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানন মেনার্ড। ব্রিটিশ লেবার পার্টির জন বার্নস।

নানারকম হিতবাক্য, নিজ নিজ দেশের সমস্যা, তাবং বিশ্ববাসী সম্পর্কে ক্ষোভ-বেদনা ও প্রত্যাশার বাণী। অধিবেশন শেষ হতে সন্ধ্যা। পয়লা দিন, তাড়া কিসের! এর বেশি আর নয়। দশদিন ধরে চলবে এই রকম—কত কি শুনতে পাবেন।

বলে কি অধিবেশন নাকি দশ-দশটা দিন ধরে! এত কথা বলবার আছে, এত ভাবনা ভাববার আছে, এত সঙ্কল্প ঘোষণার রয়েছে। তাই দশ দিনে শেষ হল বটে, কিন্তু শেষাশেষি প্রতিদিন দুটো-তিনটে করে অধিবেশন চালাতে হয়েছে। শেষ অধিবেশন হল রাত্রি এগারোটা থেকে তিনটে। এর উপরে কমিশনের মিটিং আছে—তন্দ্রায় ঢুলছেন সকলে, রাত কাবার হয়ে যাবার দাখিল, তবু ছাড়ান নেই। বড় কঠিন কাজ—হুকুম-হাকাম দিয়ে সৈনিকদের লড়াইয়ে পাঠানো নয়, লড়াইবাজদের ধূলিশায়ী করা। যাতে আবার উঠে বসে তারা দল জোটাতে না পারে।

(২)

বাঘা শীত—ভোরে উঠা অতিশয় কঠিন। কায়ক্লেশে উঠে তবু বেরিয়ে পড়লাম, উষালোকে পিকিনের চেহারা দেখব। তামাম শহর ঝকঝক তকতক

করে—সে ব্যবস্থা হয়ে যায় মানুষের ঘুম থেকে উঠবার আগে। আগের দিন গান্ধি-জয়ন্তীতে উঠে ব্যাপারটার আন্দাজ পেয়েছি, তাই আজকে আরও সকাল-সকাল উঠে পড়েছি। ছেলেবেলায় যাত্রার সাজ-ঘরে উঁকি দিতাম—বিড়িখোর ছোঁড়াটা হঠাৎ কি করে রাজকন্যা হয়ে যায়! এ-ও প্রায় তাই। কি করে এত বড় শহর এমন ফিটফাট রাখে?

পথে-পার্কে বিস্তর মানুষ। দস্তরমতো ভিড় জায়গায় জায়গায়। দোকান-পাট বেলায় খোলে—তার আগে এখন চতুর্দিকে পরিমার্জনা হচ্ছে। রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, জল দিয়ে ধোয়াধুয়ি হচ্ছে, নর্দমার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে বীজাণুমুক্ত করছে। ময়লা ফেলার পাত্রগুলো সাফ-সাফাই। নতুন দিনে জেগে উঠে পথে বেরিয়ে সর্বত্র দেখতে পাবেন নির্মল প্রসন্নতা। মানুষগুলোর নাকে মুখে কাপড়ের পটি, চোখ দুটো শুধু খোলা। বীজাণুরা তাড়া খেয়ে ঐ সব ছিদ্রপথে দেহ-মধ্যে ঢুকে না পড়ে—তারই ব্যবস্থা। এই কাপড়ের পটি খুব চলেছে—ফেরিওয়ালারা দু-পয়সা চার পয়সায় বিক্রি করে, লোকে দেদার কেনে আর পরে। যারা বাইরে বাইরে ঘোরে, পরতেই হবে তাদের। রাস্তার ধারে দোকান দিয়ে বসেছে, তারা সব নাক-মুখ ঢেকে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে আছে। ইস্কুলের ছুটির সময়, দেখতে পাচ্ছি, ঐ বস্তুতে নাক-মুখ ঢেকে ছেলে-মেয়েরা সারবন্দি বাড়ি ফিরছে। মোটর-ড্রাইভারের আবার নাক-মুখ ঢাকা শুধু নয়, দু-হাতে দস্তানা—ষ্টিয়ারিং চাকার ময়লা যাতে হাতে না লাগে।

নজর কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে দিন। এক সঙ্গে, দেখুন দেখুন, কত মানুষ ব্যায়াম করছে। রেডিওয়, এই এত ভোরে ব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে এখন বাজনা বাজাচ্ছে। আর, এরা সব হাত-পা খেলাচ্ছে সেই বাজনার তালে তালে। এ পার্কে ঐ মাঠে এমন কি ফুটপাতের যেখানটা বেশি রকম চওড়া সেখানেও হয়তো দেখবেন, একই ধরণের শরীর-চর্চা। গ্রামে গ্রামেও নাকি এমনি সময়ে এই ব্যাপার। ছেলে-বুড়ো চাষী-মজুর ছাত্র-মাস্টার সবাই একই সঙ্গে হাত নাড়ে, পা তোলে, ঘাড় বাঁকায়। মানুষ মানুষে অজান্তে এক হয়ে যাচ্ছে—অযুতলক্ষ নরনারী সকলে তারা এক।

আর ঐ এক মজা আছে—যা-কিছু করবে তাই মিলে এক-একটা আন্দোলন। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকবে—সেই বাবদেও। আন্দোলনের নাম হল, চার সাফাই...পাঁচ মার। সাফাই রাখো খাবার ও রান্নাঘর; সাফাই রাখো গোয়াল ও পায়খানা; সাফাই রাখো কাপড় ও বিছানা; সাফাই রাখো

রাস্তা ও ঘরবাড়ি। মারো মাছি; মারো মশা; মারো পোকামাকড়; মারো জোঁক; মারো ইঁদুর। এ ছাড়া আর যত প্রাণী রোগবীজাণু ছড়ায়, মেরে মেরে তাদের শেষ করে ফেল।

এক-এক আন্দোলনের ফুলকি ছেড়ে দেয়, আর তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। 'মাকড মারলে ধোকড় হবে—তুমিও যেমন!' অতি-বুদ্ধিমন্তেরা তুড়ি মেরে সমস্ত কিছু উড়িয়ে দেবার সাহস পায় না। প্রতি চেষ্টার দ্রুত সাফল্য দেখে আত্মবিশ্বাস এসে গেছে সকলের মনে। চেষ্টা করলে আলবত হবে। যে মতলবটা উঠল, অচিরে তা হাসিল হবেই—তাবৎ লোকজন মরিয়া হয়ে লেগে যায়। এক গ্রামে গিয়েছিলাম···গ্রাম-প্রধান নানা গৌরব-প্রচেষ্টার মধ্যে পরিচয় দিচ্ছেন, কত হাজার মাছি মারা হয়েছে এতাবৎ। এখানে শুধুমাত্র মাছিমারা কেরানী নয়, মাছিমারা সর্বজন। সরু জালে মাছি মেরে মেরে গোনাগুণতি করে রাখে। বেশি মারতে পারলে মুনাফাও আছে, উ ম পুরস্কার।

দেহ আপনার বটে, কিন্তু সেটা পরিপাটি করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ রাখার পুরোপুরি দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মানুষ নিয়েই সব...মানুষকে মজবুত করবার তাই দেশব্যাপ্ত আয়োজন। ডাক্তারকে ফি দিতে হবে না, অসুধের দাম লাগবে ন, রোগ-চিকিৎসা মুফতে; সিকি পয়সা সে বাবদে ডাক্তার-নার্সের প্রাপ্তি নেই। তাই রোগ যাতে কারো না হয়, ডাক্তারেরও চেষ্টা... হলে মুনাফা নেই, উপরন্তু হাঙ্গামা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি এখনো হয়ে ওঠে নি। নিশ্বাস ফেলে ওরা দুঃখ করছিল—ইচ্ছে আমাদের তাই বটে। কিন্তু ডাক্তার কোথায় পাচ্ছি অত?

তবু যা হয়েছে, তাজ্জব মানি। ১৯৫১ সনে শ্রমিক-বীমা আইন হল। বীমা করতেই হবে সকলকে। খনি ও ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, চিকিৎসা বাবদে তাদের এক পয়সাও লাগছে না বীমার কল্যাণে। ন্যাশনাল মাইনরিটি যত আছে, তাদের বীমার ব্যাপার নেই—তবু বিনামূল্যে চিকিৎসা। গবর্নমেন্ট তরফের যত লোক—তাদের সম্পর্কেও এই। এই দেখুন, মুখ বাঁকাচ্ছেন আপনারা। সে তো হবেই—সরকারি লোক, তারা আবার পয়সা দিতে যাবে নাকি? তাদের চাই সকলের আগে। আজ্ঞে না, গবর্নমেন্ট মানে জন-সাধারণ থেকে পৃথক তকমা-আঁটা রকমারি হিস্যার কর্তৃত্বভোগী এক দাম্ভিক গোষ্ঠী নয়—ঐ রাষ্ট্র-ধারণা মুছে ফেলতে হবে মন থেকে, মস্তিষ্ক ধুয়ে সাফসাফাই করতে হবে। এদের রাষ্ট্র গাঁয়ে গাঁয়ে; রাষ্ট্র-শক্তি ছড়িয়ে আছে

যাবতীয় জনসংস্থার মধ্যে। চাষীদের সমিতি আছে; তাদেরও নিখরচায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা তাদের সমিতিগুলোর মাধ্যমে।

তবুও বাকি থেকে যায় কতক লোক। তাদের পয়সা খরচ করতে হয়। সেই হেতু নতুন চীন হা-হুতাশ করে। তিনটে বছরেও সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা হল না—কি হল তবে আর বলুন। অতএব দ্রুত ডাক্তার বানিয়ে তোলো ছেলেমেয়েদের, গড়ো ল্যাবরেটারি, চালাও গবেষণা, তৈরী করো রকমারি অষুধপত্তর।

রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ কিসে না হয়, সেই চেষ্টা। মশামাছির সঙ্গে লড়াই। ডাক্তারের সংখ্যা ছিল কম—শতকরা নব্বুই তার মধ্যে শহরে। গ্রামাঞ্চলে যে দু-দশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তথায় না ডাক্তার না অষুধপত্তোর—অব্যবস্থার চরম। আজকের গ্রামগুলো নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলছে—স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করে তারা, রোগ প্রতিষেধ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করে।

আগে ছিল, প্রতি তিন বছরে একবার করে কলেরার প্রকোপ। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম, কলেরা তেমনি যথানিয়মে আসবেই। সারা চীনে এখন কলেরা বন্ধ হয়ে গেছে; তিন বছর অতীত হয়ে গিয়েও কোন লোককে কলেরায় ধরেনি। কখনো কারো কলেরা হবে না—ওরা জোর করে বলে। খাবার জল ফুটিয়ে খায় বারো মাস তিরিশ দিন—অবিরত প্রচারের ফলে কাঁচা-জল বিষের সমতুল্য ভাবতে শিখছে। ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে দেশব্যাপী সংগ্রাম-ঘোষণা। তার উপরে নির্বিচারে কলেরা-টাইফয়েড ইনজেকশন—বিশেষ করে বন্দর জায়গা এবং চীনে ঢুকবার ঘাঁটিগুলোয়। জগৎবেড় জাল পেতে আছে যেন—একটি মানুষ বাইরের রোগ নিয়ে ঢুকে পড়বে, কিছুতে তা হবার জো নেই।

বসন্তের ব্যাপারেও এমনি যুদ্ধং দেহি ভাব। দেশ জুড়ে পায়তারা চলছে। ঠিক করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে মা-শীতলাকে পুরোপুরি এলাকাচ্যুত করবে। পাঁচ বছরের তিনটে পার হয়ে গেছে। আর দুটো বছর।

কি দুরন্ত বেগে স্বাস্থ্যোন্নতি চলছে! মানুষ কিলবিল করছে—তবু বলে কেউ মরবে না অকালে, রোগা-ডিগডিগে হয়ে থাকবে না—বাঁচার মতন করে সকলে বাঁচবে। রোগ খেদাও, রোগের জড় মারো, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াক মানুষ। মানুষ বাড়ুক আরও—মানুষ বোঝা নয়, মানুষই লক্ষ্মী।

কাজের মানুষ তৈরী করবে, সেই জন্য আরো বেশি মানুষ চাই। মৃত্যুর হার কমেছে, জন্ম বাড়ছে। বিশেষ করে ন্যাশনাল মাইনরিটিদের মধ্যে—দিনে দিনে যারা নিশ্চিহ্ন হবার দাখিল হয়েছিল।

আমার কি বিপদ হল, শুনুন তবে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুখের কাছে অবিরত খাদ্য এনে ধরে, অভ্যাস বসে খেয়ে যাই। এস্তবিধ খাটনির দরুন পাকযন্ত্র একদা উষ্মা প্রকাশ করল। দেশে-ঘরে এমন একটু-আধটু হামেশাই হয়ে থাকে, আমলে আনি নে। এটা অনেক দূরের দেশ, আর শীতের দেশও বটে। রোগি হয়ে চোখ-কান বুজে শয্যায় পড়ে থাকতে মন্দ লাগে না অসুখের চেয়ে কু-মতলবই অধিক ছিল (ফাঁস করে দেবেন না কিন্তু)। তারিখটা ৭ই অক্টোবর—পাঁচদিন তৎপূর্বে কনফারেন্স হয়ে গেছে। পাঁচ পাঁচটা দিন একনাগাড় ডজন পাঁচেক বক্তৃতা শুনেছি—তাই ভাবলাম, ভাগ্যবশে শরীর যখন খারাপ লাগছে— সভার ঝামেলা আজকে নয়; চুপিসারে ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি।

তাই হতে দেবে নাকি? তক্কে তক্কে ঠিক চলে এসেছে সুইং—মেয়েটার চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরে ঘুরে ত্রিভুবন পাহারা দেয়। এখনো ওকে পুলিশের বড়কর্তা কেন বানায় নি, তাই ভাবি।

অসুখ করেছে আপনার?

না হে, এমন-কিছু নয়...

অসময়ে শুয়ে কেন তবে?

মুহূর্তকাল নজর করে দেখে সে বেরিয়ে গেল। হাঙ্গামা চুকল ভেবে আরামে লেপমুড়ি দিলাম।

ফিরল সুইং অনতি পরেই। হাতিয়ারপত্র সহ ত্রিমূর্তি সঙ্গে। ডাক্তার এবং এক জোড়া নার্স। সে কি কাণ্ড! শোয়ায় বসায় দাঁড় করায়; আর হাত জিভ বের করে আছি; নিরিখ করে দেখে; খুন্তির মতো এক বস্তু গলার ঢুকিয়ে দিয়ে টর্চের আলো ফেলে। পেট টিপে দেখে, বুকে নল বসিয়ে দেখে। বিশ মিনিট ধরে নানা রকম প্রক্রিয়ার পর ডাক্তার কায়েমি ভাবে শুইয়ে দিয়ে গেল। পাছে উঠে বসি, একটা নার্স মোতায়েন করে গেল শিয়রে।

তারপর অষুধপত্রের বোঝা এসে পড়ে। কোনটা খাওয়ার কোনটা শোঁকার। আয়োজনটা দেখে আঁতকে উঠি। রোগটা নিশ্চয় শক্ত। সত্যি বলুন, কি হয়েছে আমার?

মধুর হাস্যে নার্স ঘাড় নাড়ে।

কিছু নয়। ঘুমোন দিকি...আচ্ছা এক ঘুম দিন। জেগে উঠে দেখবেন শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

বলছে ভাল, চোখ বুজে থাকাই নিরাপদ। ডাক্তার এসে আবার যদি পরীক্ষা করতে চায়, সে চোখ কিছুতে আর খুলছি নে।

পাক্কা ছ-ঘণ্টা মড়ার মতো পড়ে থেকে সে যাত্রা রেহাই পেলাম।

আমার তো এই। আর এক অভাজন এসেছেন, তাঁর নাড়িতে সত্যি সত্যি ছু-ডিগ্রি জ্বর পাওয়া গেল।

আর যাবে কোথা? মুহুর্মুহুঃ ডাক্তারের আনাগোনা। শিয়রে ছোটখাটো ডিস্পেনসারি। দশ মিনিট অন্তর নাড়ি টিপে চার্টে লিখছে, অষুধ খাওয়াচ্ছে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা চলল এই প্রকার। ইতিমধ্যে জ্বর ছেড়েছে। রেহাই নেই...শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। জ্বর আবার যদি আসে?

সকালবেলা একবার একটু ফাঁক পাওয়া গেছে ঃ...নার্স-ডাক্তার কেউ নেই। রোগি অমনি পিঠটান দিয়েছে। খোঁজ, খোঁজ···কি সর্বনাশ! এ-ঘর ও-ঘর উপর নিচে...কোনখানে পাত্তা নেই। খোঁজ মিলল অবশেষে সাততলার খানা ঘরে। এক গণ্ডা আণ্ডার রাক্ষুসে অমলেট রং কফির বাটি নিয়ে তিনি টেবিলে বসেছেন।

নাকে খত দিচ্ছি মশায়, কদাপি আর রোগে ধরবে না যত দিন এ দেশে আছি। বড় ভয়ে ছিলাম। রোগের চেয়ে বেশি ভয় নার্স-ডাক্তারেব।

(৩)

সেক্রেটারিদের একজন খবর দিয়ে গেলেন, দুপুরবেলা জাপানিদের সঙ্গে খানাপিনা। চর্বচোষ্য ঠেসেই যে অমনি ঘরে ঢুকে শয্যা নেবেন, সেটা সভ্য রীতি নয়। অনেকক্ষণ বসে বসে উদ্গার তুলতে হয়। বচনে—এবং কখনো কখনো গানে। ভারতীয় দলের হয়ে আজকে আমি বলব। আর বলবেন উমাশঙ্কর যোশি। ব্যাপারটা ঘোরতর—দুই সাহিত্যিক জোড়ে আসরে নামছেন। দেশে থাকতে হিতার্থীরা বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিলেন, রা কাড়বে না মোটে ও-সব জায়গায়—চোখ মেলে শুধু দেখে আসবে। জবান যা-কিছু ছাড়তে হয়, স্বদেশের নিরাপদ সীমানার মধ্যে ফিরে এসে। সতর্ক বাক্যগুলো বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি। ভুল হয়ে যায় যে, ভিন্ন দেশে এসেছি—চতুস্পার্শের এরা আমার আপন লোক নয়। ঘরের দুয়োর এঁটে বসে, দোহাই প্রাজ্ঞবর্গ, মানুষকে পর ভাববেন না। বিজ্ঞানের দয়ায় পথে বেরুনো আজকাল তো কঠিন নয়—দেখে আসুন, দেশ-বিদেশে কত আত্মীয়তা বিছানো আছে, মানুষজন কত ভাল!

সকাল-বিকাল দু-বেলা আজ অধিবেশন। সভাপতি পুরোপুরি এক ডজন। খটমট একগাদা নাম শুনে কি হবে, সভাপতি মশায়দের দেশগুলো কেবল জেনে রাখুন। অস্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, বর্মা আর কলম্বিয়া। সকালে সভারোহণ করলেন। বিকালের জন্য আর ছ-জন—তুর্কি (নাজিম হিকমত), কোরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা ও ইকুয়েডর।

নতুন দেশে প্রথম আজ মুখ খুলব। মওকা পেয়ে গেছি, ছাড়ব কেন? আচ্ছা করে স্বদেশের গুণ-কীর্তন করা গেল। আর সত্যি কথাই তো, দুর্গম ইতিহাসের সুদূরকাল অবধি বিচরণ করুন—হেন দৃষ্টান্ত একটি পাবেন না, পররাজ্য গিলবার জন্য ভারত হাঁ করেছে। হানা দিয়েছে বটে ভারতের মানুষ—সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নয়, সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা—কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র, শান্তি প্রীতি ও আনন্দের বাণী···

শেষ করে বসতে না বসতে উমাশঙ্কর যোশি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ঐ যে বললেন, 'পাহাড-সমুদ্রের ওপার থেকে চিরকাল আমরা বাইরের ভুবনের দিকে প্রীতির হাত বাড়িয়েছি—'ভারি সুন্দর! কিন্তু লেখক হয়ে অন্য লেখকের প্রশংসা—তবে কি লেখায় ইস্তফা দিয়েছেন উনি? অথবা ভিন্ন ভাষায় লিখলে বোধহয় নিয়মটা খাটে না। বাংলা দেশে আমরা তো হেন ক্ষেত্রে কাষ্ঠ-হাসি হেসে চুপ করে থাকি। হেসে হেসেও কত কান্না কাঁদা যায়, বুদ্ধিমানে বুঝে নেন।

বক্তৃতার আরও এক অহঙ্কার করেছিলাম। আর সেই সময়টা জওহরলালকে প্রাণ ভরে নমস্কার করেছি। বাইরের দশটা জাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তখনই বুঝতে পারি, কতখানি ইজ্জত হয়েছে আমাদের, কত শক্তি ধরি আমরা। বুক ঠুকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় বললাম, শোন হে জাপানি ভায়ারা, ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা সানফ্রান্সিসকো চুক্তিতে সই মেরে বসলেন—ভারত কিন্তু নয়। এমনি অপমানের দশা আমাদেরও গিয়েছে এই সেদিন অবধি, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের সময়—ইংরেজ যখন মাথায় চড়ে ছিল। দেশের মানুষ না-রাম না-গঙ্গা কিচ্ছু জানে না, অথচ দুনিয়ার লোক জেনে বুঝে রইল, লড়নেওয়ালাদের মধ্যে ভারতও আছে। গান্ধিজীর সঙ্গে দেশসুদ্ধ আমরা চেল্লাচেল্লি করলাম, না গো—নেই আমরা। কার কথা কেবা শোনে? সে মনের দাগা এখনো মিলায় নি। তোমাদের জাপানি মানুষদের অবস্থাটা তাই মালুম হল। চুক্তিতে তোমরা রাজি হয়েছ বটে—বুঝতে পারি, সেটা খুশ মেজাজে নয়, কর্তার ইচ্ছাক্রমে।

কেমন-কেমন চোখে তাকায় জাপানিরা। সমব্যথীর কথায় বিচলিত হয়েছে। এই কথাগুলোই পরে আর এক বৈঠকে হচ্ছিল। সেবারে নানান দেশের অনেকে সেখানে। আমাদেরই পড়শি এক ব্যক্তি মাথা চুলকান, 'স্যানফ্রান্সিসকো-প্যাক্টে আমরা সই দিয়েছি বটে—কিন্তু সে হল গবর্নমেণ্ট, পিপল্‌স্ নয়।' আর উপায় কি, দেশের গবর্নমেণ্টের কান মলে দেশের আসরে কায়ক্লেশে মান বাঁচানো। আমাদের সে দায় ঠেকতে হল না; আমাদের জওহরলালের দূরের নজর অতি পরিষ্কার।

এক বক্তৃতা ঝেড়েই কিঞ্চিৎ পশার জমে উঠল—পিছন-বেঞ্চি থেকে পয়লা সারিতে প্রমোশন। লোকটা তবে কলম-পেশা লেখক মাত্র নয়, গরজ মতো বচনও ছাড়তে পারে! আর গণতান্ত্রিক ভুবন তো তারই মুঠোয়, তূণ-ভরা যার বাক্য-অস্ত্র।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ শেকহ্যাণ্ড করে বললেন, আপনাদের লেখকদের দিন এলো এবার। কি বলতে চাইলেন, ঠিক বুঝি না। কলমের খোঁচায় এ যুগে মানুষের পুরু চামড়া ভেদ করা শক্ত—তাই বুঝে জগতের লেখককুলও রসনায় শান দিচ্ছেন—এই নাকি। অমৃত রায় বললেন, আপনি এমন বলেন, তা তো টের পাইনি। যথারীতি আমি না-না করছি, অর্থাৎ বলুন না আরও-কিছু মনোরম বাক্য—আঙুর আপেলের সঙ্গে চেখে চেখে স্বাদ নেওয়া যাক। আর এক জন—উড়িষ্যার চিন্তামণি পাণিগ্রাহি—বয়স বেশি নয়, জাত-লেখক। যা-কিছু চোখে পড়ছে, টুকে বেড়াচ্ছেন আমারই মতো। অবসর পেলেই লেখাপড়ায় বসেন। ইংরেজি লেখেন বেশি, এক টাইপরাইটার অবধি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছেন সেই কটক থেকে। পাণিগ্রাহী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন··· উঁহু, আপনাদের ভ্রূকুঞ্চিত হচ্ছে, আন্দাজ পাচ্ছি। কি হে লেখক মশায়, সার্টিফিকেটের মালা গলায় ঝুলিয়ে শোভা বাড়ানোর লোভ হয়েছে?

এই দেখুন, কিঞ্চিৎ নাম জাহিরের চেষ্টায় ছিলাম, ঠিক ধরে ফেললেন! বক্তৃতা শুনে আমাদের সুবোধ বন্দ্যো বড় খুঁতখুঁত করছেন, বাংলায় বললেন না কেন আপনি? জাপানিরা তাদের ভাষায় বলল—জাপানি থেকে চীনায় তর্জমা, তারপরেই ইংরেজি। আপনারও তেমনি হত। বাংলার সাহিত্যিক—বাংলা ভাষায় শুনতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে।

ক্ষোভের কথাই বটে! আন্তর্জাতিক সমাবেশে সবাই প্রায় স্বভাষায় বলে, আমরা কেন তবে লালাসিক্ত ভাঙা ইংরেজি বর্ষণ করি? কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এত বড় এই পিকিন শহরে, যত দূর জানি, বাংলা-জানা আছেন

একজন মাত্র—এক বিদুষী রমণী, অধ্যাপক উ শিয়াও-লিঙের স্ত্রী। শান্তিনিকেতনে স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন, ভাল বাংলা শিখেছেন, মহিলার ঐ সময় নাম হয়েছিল পার্বতী দেবী। সাহিত্যের উত্তম সমঝদার রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের তিনি চীনা তর্জমা করেছেন! অধ্যাপক উ-র সঙ্গে খানিকটা দহরম-মহরম হয়েছে। কিন্তু পার্বতী দেবীর ধরা পেলাম না। ফোনে উত্যক্ত করেছি, অনেককে বলেছি একটুখানি মোলাকাতের উপায় করে দেবার জন্য। শুনলাম, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তিনি—তিলেক ফুরসত নেই। তাই কি—না, গুরুতর কিছু? সে যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিরকালের চীনা গুণীদের আসরে আদর করে নিয়ে বসিয়েছেন—সে কুটুম্বিতা কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার একটা বই মহিলার নামে পাঠিয়ে রবীন্দ্রোত্তর আর-এক বাঙালি সাহিত্যিককের আগমন জাহির করে এলাম। সে বইয়ের পাঠোদ্ধারের দ্বিতীয় মনুষ্য যখন নেই—ভরসা করা যায়, উপহারটা তাঁর হাতে পৌঁচেছে।

অবস্থা তো এই। আর রইলেন আমাদেরই দলের গুটিকয়েক বঙ্গনন্দন ···বাংলায় বচন ছাড়লে অতএব ঠেলা সামলাবেন তাঁদেরই কেউ না কেউ। ইংরেজীতে তর্জমা না হওয়া অবধি শ্রোতৃবৃন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাবেন, অথবা মৃদু মধুর আন্দাজি-হাসি হাসবেন। অবোধ জনদের এমন করে খেলাতে মারা লাগে। ঝক্কিটা তাই নিজের কাঁধে রাখা···আর কিছু না হোক, সময় বাঁচে অনেকটা।

কিন্তু সুবোধ বন্দ্যোর মনোভাব মালুম হচ্ছে। এখানে যে যার নিজ ভাষায় বলছে, আমরাই বা কম কিসে? ঘাট মানলাম তাঁর কাছে। মূল শান্তি-সম্মেলনে আমায় যদি কিছু বলতে হয়, নিশ্চয় বাংলায় বলব। বলব বাংলায়, আর যদি কোথাও সুবিধা পাই।

বিস্তর জায়গায় বলতে হয়েছে আমাকে। আজ্ঞে হাঁ, ব্যস্ত হবেন না··· ধীরে ধীরে আসছি। শেষটা যেন নেশায় পেয়ে গেল। বেপরোয়া জবান ছেড়েছি···মাথা-মুণ্ড কি পরিমাণ থাকত, সেটা আর না-ই শুনলেন। ভরসা ছিল, বিষম অতিথিবৎসল জাত; যত যা-ই করি হজম করে নেবে···অতিথির হেনস্তা হতে দেবে না। অত বক্তৃতার মধ্যে দুটো বাংলায়···একটা ঐ যে শান্তি-সম্মেলনের কথা শুনলেন। আর একটা এক ভোজসভায় পাকিস্তানি ভায়াদের সম্বর্ধনার ব্যাপারে।

তবে শুনুন। অধমও ছেড়ে কথা কয়নি। অনেক পরের ব্যাপার। শান্তি-

সম্মেলন ঢুকে-বুকে গেছে—পিকিন ছাড়ব-ছাড়ব করছি। খুচরা সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গেল, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে অমন পাঁচটা-সাতটা। বক্তৃতাদি তেমন নয়, ঘরোয়া মেলামেশা—টেবিলে টেবিলে ভাগ হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা এবং তৎসহ—। উঁহু, আমি কথা দিয়েছি, খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে পাঠক-সজ্জনদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করব না। তবু বারম্বার তাই উঠে পড়ে। আজ্ঞে না, ধরে নিন কথাবার্তাই শুধু। আর যদি কিছু থাকে, আমার তা মনে নেই।

আমাদের টেবিলটা ছোট—সাকুল্যে জন আষ্টেক হবো। ভুবনের এপাড়া ওপাড়ার কয়েকটি ব্যক্তি। মেক্সিকো আছেন, ইউ-এস-এ ও ইরান আছে। হন্দুরাসের ফরসা মোটা মেয়েটিও আছেন, অনুমান হচ্ছে। আর আছেন মাও তুন—তাঁকে পাকড়াও করে এনে বসিয়েছি; যে সে ব্যক্তি নন, জাঁদরেল উপন্যাসকার—শুনলাম, আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের দোসর। আবার ওদিক বড়-কর্তাদেরও একজন—সাংস্কৃতিক মন্ত্রী। চেহারায় পোশাকে কিংবা ভাবে-ভঙ্গিমায় অবশ্য টের পাবেন না। কথার তুবড়ি ছুটছে। মাও তুন চানা বলছেন, আমাদের কেউ-ইংরেজি কেউ বা স্প্যানিশ। গোটা দুই-তিন দোভাষি ছেলেমেয়ে টপাটপ এ-ভাষা ও-ভাষায় তর্জমা করে করে এর ঠোঁটের কথা ওর কানে এনে জুড়ে দিচ্ছে। খুব জমেছে।

তখন আচ্ছা করে বললাম মাও তুনকে। এটা কেমন হল মশায়? রবীন্দ্রনাথ এলে খুব তাঁকে তোয়াজ করলেন, কলেজ অব আর্টস-এ তাঁর বিশাল ছবি। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আধুনিক ভারতীয় বই বলতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বইগুলো। তিনিও দেশে ফিরে চীনাভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে। আমাদের চিরকালের ভালবাসা তাঁকে দিয়েই ফের জমজমাট হল। আর এখানে সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার অনাদর! কলকাতা য়ুনিভার্সিটি চীনা ভাষা পড়াচ্ছে; কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যে বাংলা—

আর যাবে কোথায়! ডাইনের টেবিলে তাকিয়ে দেখিনি—রে-রে রব উঠল সেদিক থেকে। বাংলা-বাংলা করে তড়পাচ্ছেন, রাষ্ট্রভাষাটা বুঝি ফেলনা হয়ে গেল?

হিন্দী-ভাষী বন্ধুকে তাড়াতাড়ি নিরস্ত করি: ঠিক কথা? ভাষাই তো হল দুটো—বাংলা আর হিন্দী।

বাঁয়ের টেবিলে অমনি ফোঁস করে ওঠেন, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলোর খোঁজ রাখেন? না জেনে-শুনে আপ্তবাক্য ছাড়বেন না।

শান্তির সৈনিক হয়ে অশান্তির আলোড়ন তোলা চলে না। সেদিকে ফিরে ঘাড় নাড়তে হয় : আজ্ঞে হ্যাঁ—ভারতীয় সমস্ত ভাষাই অতি উত্তম।

এবং সকলে মিলে ওপক্ষকে চেপে ধরা গেল, হিন্দীর জন্য ঐ দেড়খানা অধ্যাপক রেখেই হয়ে গেল? আর কি করছেন বলুন? এবারে আমাদের যে-ই আসুক, নিজের ভাষায় কথা বলে যাবে। না বুঝতে পারেন, নাচার।

ওঁরা দোষ কবুল করেন। ঝামেলা কত রকম বিবেচনা করুন। অদূরে কোরিয়ার লড়াই। সকল দিককার তাল সামলাতে হচ্ছে, ভারতীর ভাষার ব্যাপারে তাই যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলা শেখাবার লোক কোথা পাওয়া যায়, সে-ও তো এক মহা ভাবনা!

কত চাই? বদলাবদলি চলুক না—ওখান থেকে বাংলা শেখাবার লোক আসবেন এদিক থেকে গিয়ে চীনা শেখাবেন। সেকালে যেমন শিক্ষক-ছাত্রের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল।

কিন্তু দেখুন কাণ্ড! গড়াতে গড়াতে এ কোথায় এসে পড়েছি! গল্প জুড়ে বসলে তার ঠিক থাকে না। ভোজের আসরে ওদিকে জাপানি বন্ধুরা। খানাপিনা এবং বক্তৃতাদি সারা হয়েছে, আজেবাজে কথা এখনো বেশ খানিকক্ষণ চলতে পারে।

ছাড়পত্র দেয়নি, এসে পৌঁছলে তোমার কেমন করে ভাই? ডাঙা-পথ হলে বুঝতাম, কোন গতিকে সীমানা পেরিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে হাঁটিতে হাঁটিতে চলে এসেছে। এ যে জল—জাহাজ ছাড়া গতি নেই। একটি-দুটি নয়—এতজন কি করে পার হবে উত্তাল সমুদ্র?

ওরা হাসে, বলবে না গুহ্য কথা। যা দিনকাল—আরো কতবার হয়তো এমনি হবে। কার মনে কি আছে, এতগুলোর মধ্যে মতলববাজও থাকতে পারে দু-চারটি—ফাঁস করে দিয়ে শেষটা মুশকিলে পড়ে আর কি!

তা না বলো তো বয়েই গেল! ভারি এক ব্যাপার! আমাদেরও ঢের ঢের জানা আছে। দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে। রাসবিহারী বোস দিন দুপুরে চাঁদপাল-ঘাটে জাহাজে উঠলেন—সেই ঘাটেরই দেয়ালে তার ছাপানো ছবি, ছবির নিচে মোটা অঙ্ক ফেলা আছে মাথার মূল্য হিসাবে। নেতাজি নিশিরাত্রে এলগিন রোডে মোটরে চাপলেন। সিপাহি-সান্ত্রী ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক সময়টা। ঝিম-ঝিম করে রাত, নিঃসীম স্তব্ধতা। কে যায়? যুগ-যুগান্ত ধরে আমরা চলি এমনি আগুন হাতে। আঁধারের মধ্যে আলো ছড়াই, পঙ্গুর পায়ে পাহাড় ডিঙোবার বলের যোগান দিই। নিঃসহায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ

একটি-দুটি প্রাণী—কিন্তু ইতিহাসের আমরা মোড় ঘুরিয়ে দিই, ভাবীকাল উজ্জ্বল বাহু বাড়িয়ে সমাদরে তুলে ধরে···

(৪)

বিকালে শান্তি-সম্মেলন চলছে—তার মধ্যে এক ব্যাপার। ভারতীয়দের তরফ থেকে কোরিয়ানদের উপহার দেওয়া হল—কী আর এমন জিনিস—জয়পুরী কাজ-করা কুঁজো, টেবিল-ঢাকা, আর ফুলের তোড়া। একটা বক্তৃতা সারা হতে গম্ভীর বাজনা বেজে উঠল হঠাৎ—উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল সকলে পিছন-দরজায়—দরজা খুলে গেল। পাঁচটি ভারতীয় মেয়ে ফুল আর জিনিস ক'টি নিয়ে প্লাটফরমের দিকে চলেছেন—কিচলু অগ্রবর্তী। কোরিয়ানদের মধ্যে দুটি মেয়ে—উপহার তাদের হাতে দিতে সে কী ভয়ঙ্কর হাততালি। আমাদের মেয়েদের তারা জড়িয়ে ধরল গভীর আলিঙ্গনে। ডুবন্ত মানুষের দিকে কারা যেন স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—সেই হাত যেমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কিছুতে ছাড়বে না। তারপর ছেড়ে দিল তো এ-মুখে ও-মুখে চুম্বন করছে বারম্বার। বাইরে দেশের থেকে ধ্বংস আর মৃত্যুই পাচ্ছে ওরা, তাই যেন অভ্যাস—ভালবাসা এই প্রথম পেল। পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে জল এসে যায়—বিশাল হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সকলে চোখ মুছছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর সাত তলার খানা-ঘরে খেতে যাচ্ছি। লিফটে দেখা হল কোরিয়ান কজন—তার মধ্যে মেয়ে দুটিও। তাকাচ্ছে আমার দিকে। বললাম, ইণ্ডিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সকলে। দোতলা থেকে সাত তলা—কতটুকুই বা? হাতগুলো ছোঁয়াও হল না। অনেক গেছে তাদের—ঘরবাড়ি চুরমার হয়েছে, রক্তে দেশ ভাসছে। জীবাণু-বোমার নিখুঁত বন্দোবস্ত, সকালবেলা এই হাসাহাসি ঝাঁপাঝাঁপি করছি, দুপুরের আগেই হয় তো ভবলীলা-সমাপন। পৃথিবীর এক অতি-মহৎ অতি-প্রাচীন দেশ আজকে তাদের অমৃত পান করাল—সেই নেশায় আবিষ্ট এখনো। ওরা জেনে বুঝে আছে, শক্তিমানের ভাণ্ডারে মারণাস্ত্রই শুধু—এই টের পেল দেশদেশান্তরের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি ও সমবেদনার সম্ভার। নিরাশ হবার কি আছে?

খানা-ঘর ভরতি, জায়গা খুঁজে পাইনে। এক প্রান্তে ছোট এক টেবিলে দু জন গুজরাটি আর জন তিনেক বিদেশি। কায়ক্লেশে আরও একটা জায়গা

হতে পারে। বসলাম চেয়ার টেনে নিয়ে। বিদেশিরা অস্ট্রিয়া থেকে আসছেন —বাক্যের এক বর্ণও বুঝিনে। ঐ না-বোঝা নিয়ে-ই হাসাহাসি চলল। খেয়ে দেয়ে উঠে গেল তারা। সেই দুই চেয়ার দখল করলেন তখন আর এক শ্বেতাঙ্গিনী, এবং এক শ্বেত-পুরুষ।

পুরুষটির সঙ্গে আলাপ জমাই, ইংরেজি জানো তুমি ?

ঘাড় নাড়লেন। রক্ষে পেলাম, জানেন তিনি ইংরেজি। এই পিকিনেই আছেন অনেক কাল। কুয়োমিনটাঙের আমল থেকে।

তাজ্জব লাগে মশায়, যেদিকে তাকাই ঝকঝক-তকতক করছে। কলকাতায় বিস্তর চীনা আছেন, তাঁদের দেখে চীন সম্বন্ধে উলটো ধারণা হয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, বিদেশে গিয়ে তাঁরা হয়তো অমনি হয়ে গেছেন। পরিচ্ছন্ন চিরকালই এ জাতটা। নতুন আমলে পরিচ্ছন্নতা যেন নেশায় ধরেছে।

মহিলাটি একমনে নিজকর্মে রত ছিলেন। আমাদের কথার মধ্যে সহাস্য মুখ তুলে ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ভারত থেকে আসছ ? আমি সুইডিশ, ফরাসি বলি। কিন্তু দেখছ তো, ইংরেজিও বলতে পারি—

খাওয়াটা ইতিপূর্বেই দ্রুতহাতে প্রায় সমাধা করে এনেছেন—তাঁকে এখন ঠেকায় কে ? গড়গড় করে একাই বলে চলেছেন—কমা-সেমিকোলন নেই যে তার ভিতরে পালটা কেউ একটা-দুটো জবাব গুঁজে দেবে। নাম-ধাম জাত-জন্মের নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন। আইনজীবী আন্তর্জাতিক সংঘের বড় পাণ্ডা। বলুন তাই, কথা বিক্রিই পেশা। তার উপর স্ত্রীলোক। মণিকাঞ্চন যোগাযোগ —তবে আর এমন হবে না কেন বলুন।

তিনটে দিন পরে এই মহিলার বক্তৃতা হল শান্তি-সম্মেলনে। সে-ও এক তাজ্জব। জলের মতো প্রমাণ করে দিলেন, শান্তিকামী মানুষেরাই আসলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। যাদের কাজে ভুবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়, ধরে ধরে তাদেরই কাঠগড়ায় তোলা উচিত; এবং বিচারান্তে চরম শাস্তি। আমি এই যেমন দু-কথায় সেরে দিলাম, তেমনটি ভাববেন না। দেশ-বিদেশের পাহাড়প্রমাণ আইন-নজির জুটিয়ে অশেষবিধ তর্কবিতর্কের পর শেষকালে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন।

বলছেন, তোমাদের দলেও তো উকিল-ব্যারিস্টার রয়েছেন। যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন, সকলের সঙ্গে আমি মোলাকাত করব। আমাদের ভিতর রীতিমতো বুঝসমঝ থাকা দরকার, যাতে কোনখানে বে-আইনি কিছু ঘটলে একসঙ্গে দুনিয়ার টনক নড়ে ওঠে।

তার পরে সকলের দিকে নয়ন তুলে পাইকারি প্রশ্ন, কি কারো তোমরা?

গুজরা.ট ভদ্রলোক উধাকান্ত শেঠ আমার পরিচয় দিলেন, নানা বিশেষণ জুড়ে ওজন বাড়িয়েই বললেন।

লেখক? বিগলিত কণ্ঠে মহিলা বললেন, নামটা কি বলো দিকি? হ্যাঁ হ্যাঁ—ঢের জানি, তোমার কত বই পড়েছি—

সবিনয়ে প্রতিবাদ করি, আজ্ঞে না। আপনার ভুল হচ্ছে।

নছোড়বান্দা তিনি। এই দেখ, ভেবে রেখেছ—আইনের বই ছাড়া আর আমি কিছু পড়িনে। জানি তোমর নাম—এক-আধটা নয়, বিস্তর বই পড়েছি তোমার। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি—ইংরেজিতে তোমার কি কি বই আছে, শুনি?

একটাও নয়—

কোন বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হয় নি?

গল্প পাচ-দশটার। গোটা বই একটারও নয়।*

সে কি! বিস্তর শুনেছি যে তোমার নাম—বাসু…বাসু…

বাসু (বসু) অমন দশ-বিশ হাজার আছেন আমাদের দেশে। বিস্তর গুণীজ্ঞানীও আছেন, তাঁদেরই কারো নাম শুনে থাকবেন। আমার লেখা চা-সন্দেশ কবুল করেও পাঠকদের পড়াতে পারিনে. আপনি নিজের থেকে কোন দুঃখে পড়তে যাবেন?

না হে, পড়েছি আমি। আছে তোমার বই ইংরেজিতে—তুমি জানো না। যাকগে—একটা বাণী দিতে হবে আমার দেশের সাহিত্যিকদের জন্য। তাঁরা খুশি হবে। কাল আবার খানা-ঘরে দেখা হচ্ছে তো? সেই সময় চাই।

খানা-ঘরে সেই থেকে দেখেশুনে ঢুকতে হত। আবার তাঁর খপ্পরে গিয়ে না পড়ি!

(৫)

পূর্ণিমা রাত—এত হুল্লোড়ে আকাশ পানে তাকাই কখন, কে জানে অত শত খবর!

জানিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যাপক চেন।

তৈরি থাকবেন মশায়রা, খেয়েদেয়েই শয্যা নেবেন না। চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে বেড়াবো।

* তখনকার কথা। এখন অনেক বইয়ের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

রাত্রি ঠিক দশটা, সেই সময় এলেন তাঁরা। জোর-জবরদস্তি নেই, যাঁর যাঁর খুশি চলে আসুন। একটা মাত্র বাস—সেইটে কোন গতিকে বোঝাই হলো। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, তার উপরেও চারিদিক আলোয় আলোয় সাজিয়েছে। বছরের একটা বড় পরব। পরবের নাম তর্জমা করলে দাঁড়ায় —'মধ্য শারদ রাত্রির উৎসব।'

অধ্যাপক চেন মানে করে বোঝাচ্ছেন। আমুদে মানুষ—কথায় কথায় হাসিরহস্য। অথচ বিদ্যার বারিধি। তামাম জগৎ চষে বেড়িয়েছেন; ভারত ঘুরে গেছেন মাস কয়েক আগে, কলকাতার অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সেটা অবশ্য বড়-কিছু নয়। আমার সঙ্গে এই তো আজ সর্বপ্রথম দেখা—ঘনিষ্ঠ হতে মিনিট দুই লাগল। ঘড়ি ধরে দেখেছি, দু-মিনিটের কম বই বেশি নয়।

হোটেল থেকে ডাইনে ঘুরে নিষিদ্ধ-শহরের রঙিন পাঁচিলের পাশে পাশে বাস চলেছে। তারপর তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সময়। চলেছে, চলেছে …মাঠের প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়াল। ফটক পার হয়ে হুড়মুড় করে সকলে ঢুকে পড়লাম।

পে-হাই পার্ক। পে-হাই কথার মানে হল উত্তর-সমুদ্র। লেক আছে, লেকটা বড় বটে—লেকের দরুন তোলা-মাটিতে মাঝারি সাইজের পাহাড় গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সমুদ্র বলতে কেমন-কেমন লাগে। গল্পটা আগে করেছি। রাজঅন্তঃপুরিকারা বাইরের সমুদ্র চোখে তো দেখবে না—ত' এই সমুদ্রই দেখে নাও নয়ন ভরে। আসল সমুদ্র আয়তনে খুব খানিকটা না হয় বড়ই হবে—আবার কি! পে-হাইয়ের মতো সমুদ্র আরও অনেক আছে নিষিদ্ধ-শহরের ভিতর—দক্ষিণ-সমুদ্র, মধ্য-সমুদ্র। আর তোলা-মাটির পাহাড় সমুদ্রগুলোর পাশে পাশে; দূরদূরান্তর থেকে সত্যিকার পাথরের চাঁই এনে সেই সব পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বসানো। তবে আর কি দরকার রইল চাল-চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে পাহাড়-সমুদ্র দেখতে বেরুবার? দুঃখ কিসের তবে আর রাজবধূ? নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরেই ঘুরে ঘুরে খোদাতালার দুনিয়া দেখ।

এত রাত হয়েছে, তবু কত মানুষ! ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেকের উপর নৌকা বাইছে, আড্ডা দিচ্ছে এখানে-ওখানে বসে পড়ে। দলে দলে বেড়াচ্ছে কলেজি ছেলেমেয়ে। এমনটা রোজ হয় না—আজকে, শুধু এই পরবের রাতেই, হস্টেলের দরজা অনেক রাত অবধি খোলা থাকছে। গান ধরেছে এক-একটা দল—এদিক-ওদিক থেকে গান ভেসে আসছে। আর চকিত হাস্যধ্বনি।

মনে পড়ে গেল, আমার বাংলাদেশেও এমনি! কোজাগরী রাত্রি—

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। নাটমণ্ডপে পাশা চলছে—গ্রামের মানুষের জটলা। হুঙ্কার দিয়ে নির্জীব শুষ্ক অক্ষকে শুনিয়ে দিচ্ছে, কোন দান পড়তে হবে এইবার। দানটা পড়ল তো উল্লাসের ধাক্কায় ঘরবাড়ি কাঁপতে থাকে। হুঁকো ফিরছে হাতে হাতে। পাথরের খোরায় চিঁড়ে ভেজানো নারিকেল-জলে। আজকে ফলাহার এবং নিশি-জাগরণ চারিপ্রহর। এরই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে কর্তা উন্মনা হয়ে বাইরে তাকান। কে মেয়েটা ঐ, ধবধবে কাপড়-পরা? উঁহুঁ, পোয়াল-গাদার পাশে জ্যোৎস্না পড়ে ঐ রকমটা দেখাচ্ছে। তা আসবেন তিনি ঠিক—এমনি শারদ পূর্ণিমা রাত্রে ফুটফুটে-রং হাস্যমুখী লক্ষ্মীঠাকরুন মর্ত্যলোকে নেমে আসেন। গ্রামের সুঁড়ি-পথে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় জ্যোৎস্না পড়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। তারই উপর পদ্মফুলের মতো কোমল পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে তিনি এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ান। কে জেগে আছ গো? পায়ের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সারা উঠান শুচি হয়ে যায়—এই তো, আর ক'দিন পরে মাঠের হৈমন্তী ধান তুলবে এনে ওখানে। ঝি-বউ সকলে এতক্ষণে জেগে ছিল—পুজোআচ্চার পরে গল্পগুজব করছিল কিংবা বিন্তি খেলছিল। তা চোখ যদি ঝিমিয়েই পড়ে থাকে, তাদের জেলে-দেওয়া পূজার প্রদীপ তো রয়েছে। প্রদীপ নেভাবার নিয়ম নেই, সারারাত্রি এমনি জ্বলবে। মিটি-মিটি দীপের আলোয় লক্ষ্মী দেবীও আর এক কুমারী মেয়ে হয়ে ঘুমন্ত গ্রামাকন্যাদের মধ্যে একটুখানি বসে পড়েন।

ছেলেবেলা এমনি ছবি গ্রামে দেখেছি। পে-হাই পার্কে ঘুরতে ঘুরতে তাই মনে পড়ল! পালপার্বণেও এত মিল দুটো দেশের মধ্যে!

কথা হল, নৌকোয় করে চলে যাবো লেকের শেষ প্রান্ত অবধি; পায়ে হেঁটে ফিরব। কম সময়ে বিস্তর জিনিস দেখা যাবে। কিন্তু ঘাট হা-হা করছে, কোথায় নৌকো? বিস্তর খোঁজাখুঁজিতে শেষ অবধি মিলল একটা বটে, কিন্তু মাঝি নেই। এত রাতে কে বসে রয়েছে আপনার নৌকো বেয়ে দেবার জন্যে? নৌকো বেঁধে রেখে সে-ও হয়তো গান ধরেছে কোন পাহাড়তলীর বাঁশঝোপে।

পায়ে হাঁটা ছাড়া অতএব গতি নেই। রোহিণী ভাটকে জিজ্ঞাসা করি, পথ অনেকটা কিন্তু। পারবেন?

ঘাড় দুলিয়ে তিনি বললেন, হাঁটতে আমি খুব পারি।

এই এক ডাহা মিথ্যা বলে বসলেন। স্বচক্ষে দেখেছি সেদিন মহাপ্রাচীরের উপর ওঠা। হাঁটেন না তো উনি; নাচুনে মেয়ে—চলেন নাচের চালে। কিংবা বাতাসে লঘুদেহের ভর রেখে আঁচল মেলে পাখির মতো।

লেকের গা বেয়ে বাঁধানো পথ। ঘাটের যত নৌকো কারা সরিয়েছিল, এবার ঠাহর হচ্ছে। ডানপিটে যত কলেজি ছেলেমেয়ে। মাঝির তোয়াক্কা রাখে না, নিজেরাই বাইছে। নৌকোর পর নৌকো যাচ্ছে সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে। জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিচ্ছে। আর তার সঙ্গে দু-এক টুকরো হাসি, দু-এক কলি গান, একটু বা রাজনা। আমাদের গাঙে পৌষ-সংক্রান্তির সেই বাইচখেলা যেন। অধ্যাপক চেন বললেন, রাতে বুঝতে পারছ না—এই লেকের জল অবিকল কাশীর গঙ্গার মতো। ভারতে ঘুরে আসার পর প্রতি কথায় তিনি ভারতবর্ষ এনে ফেলেন।

আর এই ডক্টর আলিম। ইতিহাস একেবারে গুলে খেয়ে আছেন। পা ফেলতে না ফেলতে জায়গাটার হাড়হদ্দ বিশ পুরুষের খবর। খ্রীষ্টীয় নয় শতকে এই রাজ্যোদ্যান গড়তে হাত লাগানো হয়। তারপর কাজ কখনো টগবগিয়ে চলেছে, কখনো ঢিমে-তেতালায়; কখনো বা বিলকুল বন্ধ। সামনে ঐ যে সকলের বড় পাহাড়টা—বানানো-পাহাড় বলে নাক সিঁটকাবেন না, উঠে বুঝুন না গায়ে কত দূর শক্তি ধরেন। চড়াই-উতরাই, গুহা, গাছপালা—চাই কি হোঁচট খাবার পাথরের চাঁই অবধি রয়েছে। রাজরাজড়ার গড়া জিনিস—ঈশ্বরের চেয়ে তাঁরা বড় বেশি কম যান না। (ঝরনা দেখি নি, এই একটা ব্যাপারেই ঈশ্বরের জিত।) চূড়ায় সমাধি-মন্দির। এক তিব্বতী লামা মারা যান, শবদেহ তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল—মন্দির রচিত হল তাঁর স্মৃতিতে। নিয়মমাফিক এক ঝুটো সমাধিও তৈরি আছে মন্দিরের ভিতরে।

সেইখানে আমরা উঠছি। হিমরাত্রি, কিন্তু গায়ে ঘাম দিল—পা আর চলে না। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আনন্দ-মূর্তি ঐ ছেলেমেয়ের দল ধুপধাপ করে উঠে যাচ্ছে। গান গাইছে, মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, নাচছেও কখনো কখনো। তখন নিজের উপর রাগ ধরে যায়। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, আমরা না হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলি—ফিরে গেলে বড্ড অপমান। আমাদের গ্রামের বিলে দেখেছি, অগুন্তি আলেয়ার মুখে দপ-দপ করে আগুন ওঠে। আলোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে পথিককে তারা তেপান্তরে নিয়ে ফেলে। এরাও এদিকে-সেদিকে তেমনি ছুটোছুটি দাপাদাপি করে আমাদের চূড়োয় নিয়ে তুলল।

আলো-ঝলমল রাতের পিকিন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কি জ্যোৎস্না! রাত দুপুরে দিনমান। মন্দির ও সমাধি দেখছি চারিপাশে বারাণ্ডায় ঘুরে ঘুরে। মন্দিরের গায়ে অগুন্তি বুদ্ধমূর্তি। নাক-ভাঙা—এই এক

মজা দেখছি, শত শত মূর্তির মধ্যে একটিরও নাক আস্ত নেই। নাকের উপর এত আক্রোশ কেন বলুন দিকি? ওদের মঙ্গোল-মুখের উপরে থ্যাবড়া নাক থাকে বলে? এক জনে—ছাত্রই হবে—বলল, জাপানিদের কীর্তি। ডক্টর আলিম তা মানেন না, ইতিহাস এমন কথা বলে না কোথাও।

এই ঊর্ধ্বলোকেও চা-কফি-সরবতের দোকান। লোকে খাচ্ছে আর গুলতানি করছে। এখানে-ওখানে মগ্ন হয়ে বসেও কত জন—জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ দেখছে। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের দিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসে—ছায়ামূর্তি ঐ যেন কারা! ঘড়ি দেখে শিউরে উঠি—বারোটা বেজে গেছে। আর নয়, আর নয়—পালানো যাক।

তা বলে এত সহজে? মোড় ঘুরে দেখি, পথ আটকেছে অনেক ছেলে। হাত বাড়িয়েছে, শেকহ্যাণ্ড করবে। আমরা এই ক-জন আর ওরা অতগুলো—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাড়ের নড়া ছিঁড়ে দেয়। কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র তারা। চেন আমাদের জনে জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জকার উঠছে; হোপিং ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। ক্ষমা দেও লক্ষ্মীভাইরা এবারে যাই—। শান্তি-সৈনিক—বুঝতে পারছ তো? বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকালে চোখ মুছেই আবার গিয়ে সম্মেলনে বসতে হবে।

পরীক্ষা দিতে যেতে হবে—কটা চীনা কথা বলুন, তবে ছুটি। বলে ফেলুন—

একটা কেন—অমন এক গণ্ডা কথা ইতিমধ্যে জমেছে ভাণ্ডারে। পরোয় কিসের? লাগসই বুঝে ছেড়ে দিলাম—ছে-ছে অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এবারে তাদের চেপে ধরি, বাংলা বলো। টেগোরের ভাষা—বলতে হবে একটা বাংলা কথা।

বেবাক হার। বোবা হয়ে রইল। দুও—দুও—আসবে আর লাগতে? ছাড়ো পথ। কিন্তু হেরে গিয়েও ছেড়ে দেব না। শিখিয়ে দিয়ে যাও বাংলা একটুখানি। শুনুন আবদার—রাত দুপুরে এখন টিলার উপরে ক্লাস করতে বসে যাই!

হাত ছাড়িয়ে পালাতে বড্ড দেরি হল। জোরপায়ে নামছি। একটা বড় জিনিস দেখা বাকি রইল—সাত ড্রাগনের দেয়াল। নাম ঐ বটে, ড্রাগন গুণতিতে ডবল। এ-পিঠে সাত, ও-পিঠে সাত। চেন বললেন, বাকিই থাক মশায়। আবার একদিন আসতে হবে এই লোভে লোভে। দু-দিন কেন, দশ দিন এলেও ক্ষতিও নেই এ জায়গায়।

চওড়া রাস্তা—মাঝখানটা বাঁধানো, ঢালু হয়ে ক্রমশ নেমে গেছে। রোহিণী পাশের দিকে চলতে চলতে পা পিছলে যাচ্ছিলেন। চেন বলেন, পথ হাঁটবার সময় মাঝামাঝি যেও সব সময়। বিপদ ঘটবে না।

আলিম বলেন, রাজনীতিতেও। মাঝ-রাস্তা সব ক্ষেত্রেই ভালো।

খানিকটা দূরে আর এক মাটির পাহাড়, তার উপরে প্রাসাদ। জ্যোৎস্না বলেই নজরে আসছে। আজ এই উৎসব-নিশীথে সারা শহর আলোর মালা পরেছে—শুধু কেন্দ্রভূমে ঐ জায়গাটুকুই নীরন্ধ্র অন্ধকার। আলো জ্বালতে মানা, দুয়োর খুলতে মানা—অন্ধকার হয়ে থাকবে প্রাসাদ-কক্ষগুলো দিবারাত্রি। শেষ সুঙ-রাজা ওখানে আত্মহত্যা করেন। জানি না, বিলাসলাস্য-নিক্কণিত নিষিদ্ধ-নগরের সর্বময় প্রভু শক্তিধর সম্রাটের কি ছিল অন্তর-বেদনা!

মার্বেল পাথরের মনোরম সেতু পার হয়ে বাসের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। দলের দুটি লোকের সন্ধান নেই। জ্যোৎস্নালোকিত এই মায়াপুরীতে কোথায় তাঁরা পাগল হয়ে ঘুরছেন, সময়ের খেলায় নেই। ডাকতে চলে গেলেন একজন। কি ব্যাপার, তিনিও ফেরেন না। তারপর আবার একজন। এখনও দলে দলে মানুষ এসে ঢুকছে। বাসের হর্ন টিপে এই বিপুল উল্লাসের তাল ভাঙা যায় না। কি করব, শীতার্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

(৬)

গৌরাঙ্গ মাস্টার মশায় সেকালে আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ছেলেরা বলাবলি করত, গৌরাঙ্গ নয়—গণ্ডার মাস্টার। উঃ, কি পিটুনিই দিতেন! শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মতন ভুবনের যাবতীয় জনপদ তাঁর ঠোঁটের আগায়। দেয়াল ম্যাপ টাঙানো—মুখের কথার রেশ না মেলাতেই ম্যাপের উপর দেশ দেখাতে হবে। ঈশ্বরকে শাপশাপান্ত করতাম মনে মনে—এত বড় ভুবন কেন গড়ালে প্রভু, কেন এত সব রকমারি জায়গা? একমাত্র উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে, গ্রামবালকগুলোকে গৌরাঙ্গ মাস্টারের বেত খাওয়ানো। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

তারপর উঁচু ক্লাসে উঠে গৌরাঙ্গের বেতের দাগ অঙ্গ থেকে মেলালো—ভূগোল তৎপূর্বেই বেমালুম মিলিয়ে গেছে মন থেকে। সে এক দুঃস্বপ্ন! শত শত শুকনো নাম, আর সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। অনেক দিন অবধি আঁতকে উঠেছি পুরানো কথা মনে ভেবে।

সেই নামগুলো মানুষের মূর্তি হয়ে আজকে এক ঘরে জমেছে। ভুবন

অতি ছোট—বাল্যের কামনা পুরল এত দিনে। পাহাড়-সমুদ্র ব্যবধানের দেশ-ভূঁইরা মিলে মিশে দিব্যি যেন এক সংসার রচনা করেছে। সারির মাথায় মাথায়, দেখ, নানান দেশের নামের ফলক আঁটা; আর সেই সঙ্গে ছোট এক এক পতাকা। কনফারেন্সের চেয়ে বিরতিগুলোই বেশি আরামের। ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর খানিকক্ষণের ছুটি। নিন, দেহমন চাঙ্গা করে আসুন। পিছনের লাউঞ্জে এবং আরও পিছনে এদিক-ওদিকের ঘরগুলোয় আঙুর, কলা, আপেল, কেক, স্যাণ্ডুইচ, কফি, চা, মিনারেল-ওয়াটার—। নিজের হাতে যত দফায় যেমন খুশি তুলে নিন। দোভাষি ছেলেমেয়েগুলো ঘুরছে পরস্পরের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য! কোন কিছুর অকুলান দেখলে—হয়তো বা গেলাস পাচ্ছেন না অরেঞ্জেড ঢেলে নেবার, কিংবা কাপগুলোর চা ঢেলে খেয়ে গেছে—ছুটে জোগাড় করে এনে হাতে দেবে। এই রে, ভুল করে নানান অকথ্য খবর দিয়ে বসলাম!...শীতের স্নিগ্ধ রোদে আসুন ঘুরে ঘুরে বেড়াই পিছনের প্রকাণ্ড মাঠে। বেড়ানো কি বলছি—আক্রমণ, ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে একে অন্যের উপর। কোন জায়গার মশায় আপনি? আমি ইকুয়েডরের আমি এল-স্যালভেডরের। পেরু থেকে আসছি আমি। আমি পানামা থেকে। আমার নিবাস ইরাক।...আপনার আমার মতোই দু-হাত দু-চোখ-বিশিষ্ট মানুষ সকলে (বিশ্বাস করছেন তো পাঠক?)—হো-হো করে হাসে মজাদার কথায়, মেয়েগুলো বাহার করে মন ভোলায়, প্রশংসা-বাণীতে গলে পড়ে। এর মধ্যে সাধ্য কি আপনি আলতো হয়ে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন! আরে ছোঃ—এরই নাম দুনিয়া, এরাই সব দুনিয়ার মানুষ! ভাবনা কিসের তবে, কেন মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি নে? দুনিয়া তবে তো আমারই! কনফারেন্সের ব্যাপারে গিয়েছিলাম বটে...কিন্তু সত্যি বলছি, শুধুমাত্র বক্তৃতার কচকচানি হলে ফিরে এসে জাঁক করে এই রকম আসরে বসতাম না আপনাদের নিয়ে। উঁচু প্লাটফরমে উঠলেই বক্তা আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেন...কি এদেশে, কি সেদেশে। সে আর নতুন কি? কনফারেন্সের কথা রাজনীতি ধুরন্ধরেরা বলুন গে...আমি যে ওরই মধ্যে ভুবনের সঙ্গেও যৎকিঞ্চিৎ মোলাকাত সেরে এসেছি, ঐ এক আনন্দ নানারকম সুর ভেঁজে আপনাদের শোনাই।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা। দিন তিনেক তো কেটে গেল, থামবার গতিক দেখিনে। পুরো দশ দিন চলবে নাকি। দু-বেলা হচ্ছে, তাতে কুলোবে না...শুনি, রাত্রিবেলাও বসতে হবে মাঝে মাঝে। ওরে বাবা, ইস্কুলের ছেলে-

মেয়ে বানিয়ে ফেলেছে আমাদের। আরও মুশকিল, প্রাজ্ঞ প্রবীণ সকলে—তিলেক মাত্র চাপল্য দেখানো চলবে না। পাকাচুল ব্রেজিলের ব্যক্তিটি দৈবাৎ হাই তুলে ফেলেছেন—চারিদিক তাকিয়ে ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসলেন আবার। পরম মনোযোগে বক্তৃতা শুনছেন—উঁহু, ভূমিকম্প জলস্তম্ভ দাবানল যাই ঘটুক না কেন আর তিনি মুখ ফেরাচ্ছেন না মঞ্চের দিক থেকে।

ভারি এক কাণ্ড হল সেদিন। এক বিদেশিনী পড়ে যাচ্ছিলেন শুনতে শুনতে। মাটিতেই পড়তেন, পাশের মানুষ ধরে ফেলল। বক্তৃতা অতি প্রখর তখন ওদিকে! ক্লান্ত মুদিত-চক্ষু মহিলা—নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। এত লোক বাদ দিয়ে বক্তৃতার বাণ বিঁধল এসে অবলাজনকে! চাপা উদ্বেগ চতুর্দিকে সকলের মুখে, ক-জনে কর্তাদের খবর দিতে ছুটলেন। জাঁদরেল এক ডাক্তার আমাদের মধ্যে—উঠে গিয়ে তিনি নাড়ি টিপে দেখেন। ও-তরফের নার্স-ডাক্তার স্ট্রেচার-ফার্স্টএডের বাহিনী এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। সুযোগ পেয়েছে তো ছাড়বে কেন? হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আমাদের ডাক্তার হাঁকিয়ে দেন—উঁহু, কদাপি নয়।

সকলের উদ্বেগ-কাতর প্রশ্ন—হল কি ডাক্তার সাহেব, নাড়ানাড়ির ধকলও সইবে না এ অবস্থায়? বরফ দেওয়া হোক তবে, আর কিছু অষুধপত্তোর?

কিছু নয়, কিছু নয়।

রোগিণীকে সাবধানে বসানো হয়েছে চেয়ারের উপর, ঘাড় এলিয়ে পড়েছে। আহা রে, কী সর্বনাশ বিদেশবিভূয়ে এসে! কিন্তু কঠিন-প্রাণ ডাক্তার সাহেব—ওদের নার্স-ডাক্তার সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা তখন মালুম হল—নিদ্রাকর্ষণ। ঝিমুনির মাত্রাধিক্য ঘটেছিল—তার পরে হৈ-চৈয়ের মধ্যে অমনি অবস্থায় নিঃসাড় নিশ্চেতন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? ঘুম ভেঙে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে থাকেন মান বাঁচানোর দায়ে। ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে ব্যাপারটা পরে ফাঁস করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে।

ছবি তুলছে ক্ষণে ক্ষণে—স্থির অস্থির, উভয় রকমের। আমাদের মধ্যে দু-জন এই তালেই আছেন শুধু। ক্যামেরা যখন কোন দিকে তাক করছে, তদনুযায়ী ঘাড় বাড়িয়ে দিচ্ছেন—কোনও ছবি ফসকে না যায়? আসন ছেড়ে কেউ হয়তো বাইরে গেছেন, কিংবা বক্তা রূপে মঞ্চের উপর উঠেছেন—সেই সব খালি জায়গায় কখনো এটায় কখনো ওটায় গিয়ে বসলেন ছবি স্পষ্ট ওঠে যাতে। দেখুন দেখুন—বিশিষ্ট এক ব্যক্তি পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন টেবিলের

খোপে সকলের নজরের আড়ালে বই রেখে। ইস্কুলের ছেলের উপমা দিলাম...
—দিব্যি সেটা লাগসই হয়েছে তবে তো!

হাতে আমার কলম...ইতি-উতি চেয়ে অপর সকলের দোষ টুকে নিচ্ছি। নিজেও পরমহংস নই, এই থেকে মালুম। আজেবাজে এতেক কাহিনী লিখছ লেখক মশাই, এই কি সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ? এই জন্যে কি এমন খাসা ফাইল পকেট-বই আর কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে? মানি সেটা। কিন্তু একমনে কাঁহাতক এইপ্রকার জবানের পর জবান শোনা যায়? গরজও নেই...টাইপ-করা ও ছাপা যাবতীয় বিবরণই তো আপনা থেকে পেয়ে যাবো।

বিপদ হয়েছে, হলেও ভিতরে যতক্ষণ আছি মাথা থেকে হেডফোন নামাবার জো নেই। সকলে তাকাতাকি করবে। দেখ, দেখ, কী দুর্জন···শুনছে না, কনফারেন্স ফাঁকি দিচ্ছে। তিনিই মহাজন, যিনি ধরা পড়েন না; ধরা পড়লে গোল্লায় গেলেন। দু-কান জুড়ে অবিরত ভ্যানর-ভ্যানর...মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তার পরে ভারি এক বুদ্ধি এসে গেল...আহা, কি চমৎকার! স্যুইচ-বোর্ডে ফালতু যে তিনটে ফুটো আছে, তারই একটায় প্লাগ ঢুকিয়ে দাও। বাস নিশ্চিন্ত...একেবারে নির্বাধ শান্তি। নিরুপদ্রবে তীরবেগে কলম চালাও এবার। সকলের চোখে চোখে সম্ভ্রম...হাঁ, খাটনি খাটছেন বটে মানুষটি, বক্তৃতার কমাটুকুও ছাড়ছেন না।

ডাক্তার ফরিদি আমার ডাইনে। লক্ষ্ণৌয়ে বসতি, ভারি দরের ডাক্তার, ডিগ্রির অন্ত নেই। আগের বছর আন্তর্জাতিক চিকিৎসক-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন। প্রতি দেশ থেকে দু-জন করে প্রতিনিধি··· ভারতের দু-জনের মধ্যে তিনি একটি। তারপর তামাম আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিন-চার মাস ধরে। এবারে এই নতুন-চীনে। রসিক মানুষ... ফিসফিসিয়ে মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি চলে আমাদের। বলেন, পৃথিবী বেড়ানো মোটামুটি শেষ হল এই বারেরটা দিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আমার লেখা।

বই শেষ করে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে?

আজ্ঞে না, শুধু মাত্র দাগা বুলানো। আজকের এই হৃদয়গুলোর আনন্দ-উত্তাপও যদি একটু লিখে নিতে পারি। দেশে ফিরে অনেক রাতে কলম নিয়ে বসব। মন তখন পিছিয়ে এই দিনে পৌঁছুবে লেখাগুলো ধরে ধরে।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভাষায় লিখবেন বই? ইংরেজি...ইংরেজিতে কিন্তু। নইলে আমাদের বঞ্চনা করা হবে।

বইয়ের নামে কৌতূহল অনেকেরই। পিছনের সারি থেকে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উঁকি দিচ্ছেন, দেখি কি লিখলেন? হাত ঢাকা দিই। দেখাবার মতন কি কিছু? এই খড়কুটোর উপর মাটি লেপে মূর্তি বানাই, তার পরে দেখবেন।

বাইরে যখন মাঠে ঘুরছি, হাতছানি দিয়ে একজন ডাকলেন। শুনুন, উত্তম চেয়ার-টেবিল, অফুরন্ত সময়, দেদার লিখে যান। আমি এক কায়দা বাতলে দিচ্ছি...

কানের কাছে মুখ এনে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কায়দাটা বাতলে দিলেন। আমি হেসে বললাম, ফালতু ফুটোয় প্লাগ ঢোকানো...এই কর্মই চালাচ্ছি মশায় কয়েকটা দিন।

বলেন, কি, ওটা তো আমারই মাথায় এলো।

দায়ে পড়ে অনেক মাথাই খুলেছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন।

ডক্টর কিচলু উঠলে উৎকর্ণ হলাম। এখানে ফাঁকি নয়। সাংস্কৃতিক লেনদেন নিয়ে বলছেন। আমার মনের কথাগুলোই তাঁর কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হয়ে বেরুচ্ছে।

"ইউরোপে বিভিন্ন দেশ, কিন্তু সাংস্কৃতিক লেনদেন তাদের মধ্যেই বরাবরই চলেছে। এখনই থমকে যাচ্ছে লড়াইয়ের আলাদা আলাদা ঘাঁটি বানাবার দরুন। এশিয়ার আমরা বহু পুরানো কাল থেকেই এক...মাঝখানটায় কেবল ছন্নছাড়া হয়ে ছিলাম, বিদেশীরা যখন ঘাড়ে চেপে বসল। তাদের সংস্কৃতি বয়ে এনে চাপান দিল আমাদের ঘাড়ে।

"প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের তাবৎজাতি এখানে জমায়েত হয়েছেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ফিলিপাইন নিউজিল্যাণ্ড...ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক কম। প্রীতির বাহু বিস্তার করুন ওঁদের দিকে...সমস্যা একই সকলের। সংস্কৃতি মানে আর এমন ধর্ম ও দর্শন নয়, সাহিত্য ও শিল্প নয়···সামগ্রিক জীবনরীতি। তারই বিস্তারে গোটা দুনিয়া এক হয়ে যাবে, শান্তি আসবে।

"এগিয়ে আসুন লেখক-শিল্পীরা, এদেশে-ওদেশে যাতায়াত ও মেলামেশা করুন। আসুন সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজ-কর্মী, অভিনেতা...সকলেই। চাষী-কারিগর চিনে ফেলুন পরস্পরকে। খেলুড়ের দল খেলাধূলো করুন এদেশে-বিদেশে। বাচ্চাদের মধ্যেও প্রসার হোক ঐক্য-চেতনা খেলনা-পুতুলের লেনদেন চলুক। এদেশের পড়ুয়ারা চলে যাবেন ঐ সব দেশে; ওদেশ থেকে

আসবেন এখানে। বিদেশে পড়াশুনোর জন্ম বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। একজিবিশন হবে; সভা হবে ভুবনের তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে। সিনেমা নাটক নাচ-গানের পালটাপালটি হবে। ভাষা শিখতে হবে এদেশের ওদেশের; বইপত্তোর তর্জমা হয়ে ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। বড় বড় ওস্তাদ গুণীজ্ঞানীদের স্মৃতিতে আন্তর্জাতিক উৎসব…"

নিমন্ত্রণ! কনফারেন্স করছি, সেক্রেটারি-চমূর একজন স্লিপ পাঠিয়ে খবর জানালেন। কয়েকজন চৈনিক পণ্ডিতের বাঞ্ছা হয়েছে…আমাদের পাঁচ জনকে ভোজ খাওয়াবেন…ডক্টর কিচলু, সর্দার পৃথ্বী সিং, অধ্যাপক উপাধ্যায়, কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেসরি এবং এই অধম। উক্তোক্তা মহাশয়দের পাণ্ডিত্যে খাদ নেই, তা এই মহৎ ইচ্ছা থেকে মালুম। অধিবেশনের পর হোটেলে না… সোজা চলে যাবো তাদের সঙ্গে, আহারাদি অন্তে পুনশ্চ এইখানে হাজির করে দেবেন বৈকালিক সভাশোভন বাবদে। দুপুরবেলাটা খাটে গড়ানো আজকে কপালে নেই।

আর একটু হাঙ্গামা…দাঁড়িয়ে যান হলের বাইরে এইখানাটায়। গোটা ভারতীয় দল নিয়ে ফোটো তোলা হচ্ছে। ঝানু ব্যক্তিরা তক্কে তক্কে…কিন্তু জুত হল না, রমেশচন্দ্র জায়গা ঠিক করে দিচ্ছেন। বলেছি তো…পয়লা সারির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিচলু সাহেবের পাশেই আমি। আরে দূর…তাই হয় কখনো? রবিশঙ্কর মহারাজ আর ডক্টর জ্ঞানচাঁদকে মাঝে ঢুকিয়ে নিলাম। সে ছবি দেখেছেন আপনারা বইয়ের গোড়ায়।

সকলে মিলে নিমন্ত্রণ খেতে চললাম দুখানি গাড়ি নিয়ে। তা-বড় পণ্ডিত…অতএব বিস্তর ভাল কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি। এই পিকিনের কথাই ধরুন। অতি-পুরানো…শহর…কিন্তু আশ্চয ব্যাপার…গোটা দুই-তিন রাস্তা মাত্র আঁকাবাঁকা; আর সমস্ত সোজাসুজি চলে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় কাটাকাটি সঠিক সমকোণে। প্ল্যান করে শহর বানিয়েছে সেই প্রাচীন কালের ইঞ্জিনিয়াররা! চওড়া চওড়া রাস্তা ছিল তখন। নতুন আমলে এখন ছোট রাস্তাগুলো বড় করা হচ্ছে…দুপাশের বাড়ি ভেঙে ফেলে। খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচের সেকালের পুরানো পয়ঃপ্রণালী বেরিয়ে পড়ছে। অনেক রকম বিপর্যয় ঘটেছে পিকিনের উপর দিয়ে, চেহারা পালটেছে অনেক বার। কালে কালে মানুষ রাস্তা গ্রাস করে তার উপরে ঘরবাড়ি তুলেছিল।

উঁচু ঘর কিন্তু বানাতে দিত না সে আমলে। আপনার আমার ঘর

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে মাথা তুলবে, এ কেমন কথা? যতদূর খুশি ছড়িয়ে ঘরবাড়ি করুন, কিন্তু উপর দিকে নয়। ছ-সাত তলা এই যে অট্টালিকা দেখছেন, নিতান্তই হাল আমলের এগুলো।

আরে···ঘুরে ফিরে গাড়ি যে আবার পিকিন-হোটলের সামনে। হোটেল ছাড়িয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। তারপর আরো খানিকটা গিয়ে থেমে দাঁড়ায়।

রেস্তোরাঁ। পুরানো প্যাটার্নের বাড়ি—চেহারা চমকদার নয়! খানা-পিনার জায়গা, বাইরে থেকে মালুম হয় না। রসিক অধ্যাপক চেন হ্বান-সেং নিমন্ত্রকদের একজন। আর আছেন চেং চেন তো, ভারি জাঁদরেল পণ্ডিত—সাহিত্যিক, সহকারী সাংস্কৃতিক মন্ত্রী।

তা নেমন্তন্ন করে রেস্তোরাঁয় কেন মশায়? বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন?

এই রেওয়াজ। কি কি পদ ভারতীয়েরা তারিফ করেন, আগে থাকতে জেনে গিয়েছিলাম; এরা সেই মতো আয়োজন করেছে। বাড়িতে এসব হয় না।

ঘরগুলো আধ-অন্ধকার, ঘিঞ্জি মতন। চেং বললেন, এই থেকে আমাদের সেকেলে গৃহস্থবাড়ির আন্দাজ নিন। ঐ হল উঠোন, এইগুলো, শোবার ঘর, ওখানে ওঠা-বসা হত। একজনের বসতবাড়ি এটা। জাপানিরা পিকিন দখল করল, তাদের এক দল গৃহস্থ তাড়িয়ে এখানে আস্তানা গড়ে। মালিকেরা ফৌত। কোথায় গেল, কি হল সেটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এমন বিস্তর ঘটেছে, শেষটা তাই মরিয়া হয়ে উঠল একেবারে। কম্যুনিস্টদের মুক্তি-সৈন্য ধেয়ে আসছে পিকিনমুখো; কুয়োমিনটাং নানা রকম গুজব ছড়াচ্ছে—মানুষ নয়, ভূতপ্রেত দত্যিদানো হল বেটারা। লোকে তবু ভয় পায় না একটুও। যা-ই ঘটুক, জাপানিরা যে কাণ্ড করে গেছে তার বেশি তো নয়। ভাগ্য ভাল মশায় যে আপনাদের ভারত কখনো জাপানের তাঁবে থাকে নি।

এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছি। নানা রকম তুকতাক, অদ্ভুত ধরনের চিহ্ন দেয়ালে। শয়তানকে ভয় দেখাতে এই সব করে। দেশময় কুসংস্কার ছড়ানো ছিল—পুরানো জাতের যেমন হয়ে থাকে। রেলগাড়ির যখন চলন হল, রেলের পাটি মাইলের পর মাইল উপড়ে দিয়েছিল—এই সব কাণ্ডকারখানায় শয়তান যদি খেপে যায়, তখন?

তবে আভিজাত্য ও জাতিভেদ বলে কিছু ছিল না কোন কালে। গরিব-ধনী মূর্খ-বিদ্বান সবই ছিল, জাত হিসাবে ইনি মোটা উনি খাটো এমন বিধান

চলে নি। বুদ্ধিজীবী চাষী, শিল্পী ও সৈন্য—চতুর্বর্ণের সমাজ। আপনি গুণ দেখিয়ে এ-বর্ণ থেকে ও-বর্ণে স্বচ্ছন্দে প্রোমোশন নিয়ে যান, কেউ রুখতে পারবে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নাকি এই নিয়ম চালু।

আর নয়—আসুন, এবারে খাওয়াদাওয়া। ভাগ্যবশে এমন সঙ্গ পেয়ে গেছি, খাদ্যে রুচি নেই—জ্ঞানীগুণীদের মুখের বাক্যই গোগ্রাসে গিলছি। টুকে নিচ্ছি একটু-আধটু খাতায়।

নিজ দেশকে ওরা বলে চুং-কো (মাঝের দেশ)—চীন নয়। জাতটা ভারী ঠাণ্ডা মেজাজের। দুজনের মারামারি হচ্ছে—তাই দেখে বলত, ভারি বোকা তো! যুক্তি-তর্কে হারিয়ে দাও, গায়ের উপর খোঁচাখুঁচি কেন? সেই চীনকে কত কাল ধরে কি বিষম লড়াই করতে হল, দেখুন! লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নয়, নিজেদের ভদ্র চরিত্র ও চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। হীনবল ও প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় গেরিলা-যুদ্ধ চালাল জাপানির সঙ্গে। রেগে তারা অগ্নিশর্মা। কি রকম অভদ্র বিবেচনা করুন—যুদ্ধের নিয়ম-কানুন মানবে না, পরনে ইউনিফর্ম নেই, পাহাড়-জঙ্গল রাস্তা-সাঁকোর আড়ালে আবডালে থেকে নোটিশ না দিয়ে আঘাত হানবে। তা, যেমন মুগুর তেমনি কুকুর হবে তো···জাপানিরাও এক-একটা অঞ্চল ধরে বিলকুল সাবাড় করতে লাগল।

(৭)

'সাদা চুলের মেয়ে' (White-haired Girl) চীনা ছবিটা দেখেছেন? দুনিয়ায় অমন নাকি দ্বিতীয় নেই। সেবারে ফিলম-উৎসবের সময় কলকাতায় এসেছিল। চীনে যাবার যদি মনন থাকে, তার আগে অতি-নিশ্চয় দেখে যাবেন ছবিটা। অনেকবার উঠবে ছবিটার কথা; নানা রকম জেরার তালে পড়ে যাবেন। জবাব না পেলে ছেলেমেয়েগুলো অভিমানে মুখ ভার করবে! অতএব তৈরি-জবাব নিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাগ্যবশে আমার দু-দুবার দেখা। চীনভূমিতে পা দিয়ে সেন-চুনের রেলগাড়ি থেকেই ঐ ছবির কথা। দেখেছ তুমি? নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে—লাগতেই হবে।

লাগুক যেমনই, সভ্য সমাজে হেন অবস্থায় একটিমাত্র বিধি···হাসিমুখে হাঁ-হাঁ করে ঘাড় নেড়ে যাওয়া।

অপেরার পালা—পালাটার নামে মানুষজন ভেঙে পড়ে! সিনেমার ছবিতে

গেঁথে ফেলার পর থেকে ভারি জুত হয়েছে। অপেরার তোড়জোড় হামেশাই তো হয়ে ওঠে না—এখন সিনেমার টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে হলে গিয়ে বসুন। এমন একটা জিনিস শতবার দেখেও নাকি আশ মেটে না।

এমনিতরো উচ্ছ্বাস শুনি, আর স্ফূর্তিতে প্রাণ ডগমগ হয়ে ওঠে। সিনেমার ব্যাপারটায় আমরা তা হলে অনেক বেশি লায়েক, অনেকদূর এগিয়ে আছি। উন্নতি হোক তোমাদের—তবে যতই করো, মুরুব্বির আসরে কলকে-প্রাপ্তির দেরি আছে অনেক। অনেক দেরি।

দু কথায় পালাটার একটু আঁচ দেবো নাকি? বাসন্তী পরবের দিন ভারি ঝাড়জল—তার মধ্যে ইয়াং বাড়ি আসছে। জমিদারের ভয়ে বেচারি হপ্তাভোর পালিয়ে ছিল। বড় আদরের মেয়ে সিয়ার—ভেবেছিল, মেয়ের সঙ্গে আজকের দিনটা চুপিচুপি উৎসব করে যাবে। হেন কালে জমিদারের লোক এসে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল। জবরদস্তিতে পড়ে ইয়াং জমিদারের কাছে মেয়ে বেচে দিয়ে এলো বাকি খাজনার দরুন।

শাশুড়ি ও হবু-স্বামী তা-কে নিয়ে সিয়ার ওদিকে ভোজ খাচ্ছে। এক বন্ধু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ইয়াংকে। তা সে সময়টা উজ্জ্বল মুখে মুক্তিবাহিনীর গল্প করছে। তারা আসছে, এসে পড়ল বলে, সকল দুঃখের অবসান হবে। জমিদারবাড়ি যে কাণ্ড করে এসেছে, ইয়াং সে সমস্ত এ আসরে বলতে পারল না। গভীর রাতে দেখল, আনন্দ-প্রতিমা মেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। বিষ খেয়ে ইয়াং ব্যথা-বেদনার শেষ করল।

সকালবেলা তা এসেছে প্রিয়তমার কাছে—এসে দেখে ইয়াঙের শবদেহ। সিয়ার জেগে উঠল। বাপের জামার মধ্যে পাওয়া গেল সর্বনেশে দলিল। অনতিপরে জমিদারের দল এসে ধরে নিয়ে গেল সিয়ারকে।

জমিদারের মায়ের দাসী সে এখন। অত বড় বাড়ির মধ্যে মুখের দিকে তাকাবার শুধু একটি মানুষ—বুড়ি চাকরানি চ্যাং। তা একদিন জমিদারের লোককে আচ্ছা করে ঠেঙানি দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ল। জেল হল। জেল থেকে পালিয়ে সে মুক্তিবাহিনীতে ভিড়ল। সিয়ারকে বলে পাঠিয়েছে, ফিরে আসবে সে দলবল নিয়ে—সিয়ার যেন অপেক্ষা করে তার জন্য।

তারপরে সেই ভয়ানক রাত্রি—জমিদারের ধর্ষিতা হল সিয়ার। বাপের মতোই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োবে, কিন্তু বুড়ি চ্যাং হতে দিল না।

জমিদারের বিয়ে খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। সিয়ারকে অতএব বাড়ি

থেকে চালান করে দিতে হয়। গণিকালয়ে—তা ছাড়া কোথায়? টের পেয়ে সিয়ার ক্ষেপে গেল। তালা আটকে রাখল তখন তাকে। চাবি চুরি করে চ্যাং দোর খুলে দিল। খোঁজ, খোঁজ—সিয়ারের খোঁজে জমিদারের দলবল তোলপাড় করছে চতুর্দিক। নদীর ধারে সিয়ারের জুতো—অতএব জলে ডুবে মরেছে নিশ্চয়ই হতভাগী। তাই সকলে ধরে নিল।

কিন্তু সিয়ার পালিয়ে আছে জঙ্গলে-ভরা দুর্গম পাহাড়ের গুহায়। সেই পাহাড়ে লাই-লাই মন্দির—লোকে পুজো দিয়ে যায়। পুজোর নৈবেদ্য আর বনের ফল খেয়ে থাকে সিয়ার। নুন খেতে পায় না, আর রোদও বড় একটা লাগে না গায়ে—চুল তাই সাদা হয়ে গেল। চাষীরা কেউ কেউ দেখেছে তাকে ···তারা বলে প্রেতিনী। জমিদার একদিন পুজো দিতে এসে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে। দুর্যোগের মধ্যে সিয়ার যথারীতি নৈবেদ্য কুড়োতে গেল। ঐ ভয়াবহ মূর্তি দেখে আঁতকে ওঠে জমিদার। সিয়ারও উদ্যত আক্রোশে ধেয়ে যায় তার দিকে।

জাপানির তাড়ায় কুয়োমিনটাং-দল দুড়দাড় পালাচ্ছে; মুক্তিবাহিনী এসে রুখল। সিয়ারের হবু-বর তা হল বাহিনীর নায়ক। তারপর তা গাঁয়ে এসে পড়ল। জমিদারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলছে সে চাষীদের। জমিদার ওদিকে ভয় ধরাচ্ছে প্রেতিনীর গল্প ছড়িয়ে! তা নিজেই ছুটল রহস্যের আস্কারা করতে। কতকাল পরে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তা আর সিয়ারের মিলন হল।

গণ-আদালতে বিচার। মেয়েটা গান গেয়ে বলছে···তার মধুর নিষ্পাপ জীবন কেমন করে ওরা পায়ে থেঁতলে দিয়েছে। জনতার ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ফেটে পড়ে শয়তান জমিদারের দিকে।

গল্পটা এই। বাঁধুনি আহা-মরি নয়; বিশ্বাস করতে বাধে অনেক জায়গায়। আর, বক্তব্য ওরা সাদামাঠা ভাষায় বলে না, কেবলই গান। ছবি দেখে তারিপ করতে পারি নি, খোলখুলি বলছি।

সেই 'সাদা-চুলের মেয়ে' আজ রাত্রে অপেরায় করবে। নানান দেশের সজ্জনেরা জুটেছেন···আয়োজনটা বিশেষ করে তাদেরই জন্যে। আমি যাবো না, গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছি। সেই যে শেয়াল-পণ্ডিতের কুমিরের বাচ্চা দেখানো। খেয়েটেয়ে সবে-ধন একটিতে এসে ঠেকেছে···সন্তানের খোঁজে যে কুমির আসে, তাকে সেইটে দেখিয়ে দেয়। তেমনি ব্যাপার। এক পালা কতবার দেখব বাপু কাজকর্ম না থাকে তো পড়ে পড়ে ঘুমবো ঐ সময়টা।

তা কাজেও জুটে গেল—যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না, আড্ডা দেবার আমন্ত্রণ। সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুচ্ছি। এমনি তাড়া…রমেশচন্দ্র নিজে সেইখানে এসে হাঁকডাক লাগিয়েছেন। হাত চালিয়ে নিন একটু…

অ্যানিসিমভের সঙ্গে সেদিনের মোলাকাতটা উপাদেয় হয়েছিল। চেহারায় জাঁদরেল হলে কি হয়, মানুষটি বড় ভালো। তাই বলেছিলাম, কোন একদিন নিরিবিলি একটু বসতে পারা যায় না? শুনেছি, বাংলা চর্চা হয় রাশিয়ায়, অনেকে বাংলা জানে। বাঙালি গিয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেছেন, লোক জুটেছে রুশভাষায় তর্জমা করবার। এখানকার মতন বঙ্গজের দুর্ভিক্ষ নয় সেখানে। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে রীতিমত নাড়াচাড়া হয় নাকি। এই সমস্ত শুনতে চাই একটু জমিয়ে বসে। সেদিন সপ্তরথী ব্যূহবেষ্টনে ঘিরে প্রশ্নবাণে ঘায়েল করবার তালে ছিলাম—এবারে হবে ধরণীর দুই প্রান্তবাসী লিখিয়ে দু-জনের আজেবাজে গল্পগুজব। জ্ঞানান্বেষণের মহতী আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন তত্ত্বরসিক অতএব উৎকর্ণ হবেন না। রমেশচন্দ্রকে বলেছিলাম, এমনি কোন ব্যবস্থা হয় না?

তাই হয়েছে। এক্ষুনি। একটা অ্যানিসিমভে হবে না, চাই পোপোভকেও। আমার ইংরেজি বাক্য যিনি অ্যানিসিমভকে সমঝে দেবেন, অ্যানিসিমভের রুশ ইংরেজিতে হাজির করবেন আমার কাছে। এখন যোগাযোগটা ঘটেছে—তাঁরা দু-জনে অপেক্ষায় আছেন। একটা জামা চড়িয়ে নিন তো গায়ে। ব্যস, ব্যস —উঠে পড়ুন।

খানকয়েক বই হাতে করে গেলে কেমন হয়? বাংলা পড়ার মানুষ আছে ওদের দেশে, বাংলা বইও আছে। কোন এক লাইব্রেরির বাংলা তাকের উপর অধমও সম্ভবত ঠাঁই পাবে। ভিড় নেই, থাকা যাবে আরাম করে দিব্যি গতর ছড়িয়ে। বইগুলো যখন দিলাম, অ্যানিসিমভও ঠিক সেই ভরসা দিলেন। তা দেখে এলাম এবারে মস্কো শহরে, কথা রেখেছেন তিনি। জায়গা হয়েছে গোর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচার্সে রবীন্দ্রনাথের ঠিক পাশেই। বুঝুন, কাঁকতালে সুদূর দেশে এই কায়দায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। দেশে আপনাদের কাছে বিস্তর ঝামেলা—কেমন লিখেছেন, সেটা বিবেচ্য নয়। পোঁ ধরে থাকবার সানাইওয়ালা আছে তো? আর কানে তালা-ধরানো ঢাকি? তাঁরা বহাল তবিয়তে থাকলে নাম-যশ ঠেকায় কেডা?

যাক গে যাক গে—কথাটা কি হচ্ছিল? রমেশচন্দ্র নিয়ে গিয়েছেন অ্যানিসিমভের ঘরে—ঐ পিকিন-হোটেলেরই পাঁচতলায়। হাজির করে দিয়ে

তিনি কেটে পড়লেন। বই ক'খানা টেবিলের উপর রেখে একটু ভূমিকা করি— টেগোরের বাংলা ভাষার আমি এক লেখক ; রুশ-ভারতের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হচ্ছে, অধম কাঠবিড়ালি সেই ব্যাপারে মুঠোখানেক বালুর জোগান দিতে এসেছে।

কতবার যে ধন্যবাদ দিলেন অ্যানিসিমভ—পোপোভ তাই তর্জমা করে করে বলছেন। পরম সমাদরে রেখে দেওয়া হবে আপনার বইগুলো ; যারা বাংলা জানে, বই পেয়ে তারা খুব খুশি হবে।

সামান্য কয়েকখানা বই—তাই তাই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস! লজ্জায় সঙ্কোচে তাড়াতাড়ি একথা-ওকথায় চলে যাই।

খাসা জমেছে, দিব্যি গদিয়ান হয়ে বসা গেছে। পোপোভ সহসা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ইতি করা যাক এবারে। অপেরা আছে।

হাত নেড়ে বলি, যেতে দাও। ওরা তো এক পালাই শিখে রেখেছে— এক কথা কতবার শুনব ?

না হে, খুশি হবে। আমি বলছি, ঠকবে না।

আমি না গেলেও, বোঝা যাচ্ছে, ওঁরা না দেখে ছাড়ছেন না। অনিচ্ছায় সঙ্গে তাই উঠে পড়তে হল। খালি ঘরে একা বসে লাভ কি ?

দেরি হয়ে গেছে, নিজের ঘরে যাবার আর সময় নেই। ওঁদের সঙ্গে বেরুলাম। লিফটের মুখে দাঁড়িয়েছি ভূতলে নামবার জন্য। গ্রহ এমনি, দুটো লিফটই নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠানামা করছে। অনেকবার চেষ্টা করা গেল—তিন-তিনটে গতর কিছুতে সেঁধোনো যায় না ওর ভিতর। আরে, নেমে যাওয়া তো! সিঁড়ি ভাঙা যাক—কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব ?

লনে বাস নেই, মানুষজনও দেখছি না ড্রইংরুমে। সবাই বেরিয়ে পড়েছে। পোপোভ বলে, আমাদের গাড়িতে চলো—

অগত্যা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, দোভাষি এলো ছুটতে ছুটতে। টিকিট আছে তো আপনার ? টিকিট নইলে ঢুকতে দেবে না।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। টিকিট কেটে নাকি পিকিন শহরে অপেরা দেখতে হবে! কাজ নেই মশায়, নেমে যাচ্ছি—

কিন্তু তৎপূর্বেই মানুষটি টিকিট জুটিয়ে এনে হাতে গুঁজে দিলেন।

যতগুলো সিট আছে, তারই হিসাব মতন টিকিট। আপনার টিকিট রয়ে গেছে আপনাদের দলের সেক্রেটারির কাছে।

হলের ভিতর ঢুকলাম—তখন আলো নিভিয়ে দিয়েছে, কনসার্ট বাজছে। তারপরে এক সময় দেখি, দুর্যোগ নিশায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে থপথপ করে করে ক্লান্ত পায়ে এক চাষী চলেছে···

অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এসেছি নিতান্তই পোপোভের জেদে পড়ে। খাতা-কলম আনি নি—টুকবার কি আছে—ঘণ্টা কয়েকের অপব্যয় শুধুমাত্র। কিন্তু একটুখানি দেখেই ছটফটানি মনের মধ্যে। হারাতে দেওয়া হবে না এ বস্তু—কি করি, কি করি! প্রোগ্রাম ভাগ্যক্রমে দিয়েছে—তার পৃষ্ঠা দুই সাদা। সন্তোষ খাঁ-এর কলমটা চেয়ে নিলাম। বাইরে-থেকে-আসা কয়েকটা দিনের অতিথি আর নয় তখন,—মহাচীনের অজানা এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, মিলেমিশে গিয়েছি স্টেজের ঐ চরিত্রগুলোর সঙ্গে। অন্ধকারে আন্দাজি কলম ছুটছে। এতদিনের পরে আজকে তার পাঠোদ্ধারে বসলাম।

স্টেজের তক্তার ছাউনির ঠিক নিচে বাজনার দল। সামনেই আমরা—তাদের কাজকর্ম পুরোপুরি নজরে আসছে। আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা নিচুতে তারা। গুনতিতে বত্রিশ। নাটকের চরিত্রগুলোর মনোভাব টেনেটুনে জাহির করে দিচ্ছে বাজনায়। নিসর্গ পরিবেশ, এমন কি এক দৃশ্য থেকে ভিন্ন দৃশ্যে চলে যাওয়া—বাজনা যেন সুরের কথায় বলে বলে যাচ্ছে।

এমনি তো দেখি, অপচয় মানা—কাঁচি চালানোর দাপট সর্বক্ষেত্রে। ঝিকমিকে মেয়েগুলো একটু ব্যবহারের পোশাক পরতে পায় না। কিন্তু অপেরায় এ কি কাণ্ড—দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচা করে বসে আসে। নাচের আসরেও দেখছি এমনি দরাজ হাত। এ যেন হল—রুইমাছ যখন খাবে ঘিয়ে ভেজেই খাও, সর্ষের তেলে নয়। অপেরা হাজার বছরের ঐতিহ্য টেনে আসছে। নিজেদের উপর দিয়েই যত কঞ্জুসপনা—বাপ-ঠাকুর্দার বস্তুর তিলেক অঙ্গহানি ঘটলে ও-জাত রক্ষে রাখে না।

কত উঁচু দরের শিল্পী, সিনসিনারি থেকেই মালুম পাই। ভোঁতা নজরওয়ালা দর্শকের জন্য রংচঙে সিন নয়। পর্দা খাটানো, তার এদিকে কুড়েঘরের চালের মতো করেছে—ঐটে হল চাবী ইয়াঙের বাড়ি। আবার একসময়ে দেখি, রঙবেরঙের অনেক পর্দা—সামনে চেয়ার কতগুলো। জমিদারের ঘর এটা। পয়সার সাশ্রয়? আজ্ঞে না—রাজপোশাকে আলোয় বাজনায় যে প্রকার বাহুল্যের ঘটা, তার মধ্যে দু-দশটা থিয়েটারি কাটা-সিন ও উইংস বানানো নিতান্তই নস্যি। চিরকাল ধরে ক্লাসিক অপেরার এই ঢং চলে আসছে—তার থেকে এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না। আমাদের যাত্রাগানের সঙ্গে

খানিকটা যেন মিল…দর্শকের কল্পনার অবাধ প্রসার সেখানেও। সামিয়ানা ও ঝুলানো লণ্ঠনের নিচে এই রাজসভা বসল, পর মুহূর্তে ভয়াল অরণ্য…হিংস্র শ্বাপদকুল বিচরণ করছে। গেঁয়ো দর্শকেরা প্রায়ই তো নিরক্ষর, কিন্তু রসের স্রোতে তাঁরা অবাধে ভেসে বেড়ান, একটিবারও কোথাও ঠোক্কর খেতে হয় না। বরঞ্চ সিনে-আঁকা চ্যাপ্টা স্তম্ভ ও কাপুড়ে দেয়াল দেখেই রাজসভা মানতে শরম লাগে।

ঘরবাড়ি এমনি। আর, পাহাড়-জঙ্গলের যে রচনা দেখাল, চক্ষে তাতে পলক পড়ে না। পর্দার আকাশ…চাঁদ-তাঁরা ঝিকমিক করছে। ইতস্তত পাথর ছড়ানো। সরল সমুন্নত দেওদার একটি। চাঁদের আলোয় বিশাল পাহাড় তন্দ্রাচ্ছন্ন রয়েছে যেন।

আমাদের দু-দুজনের মধ্যে একটি ছেলে বা মেয়ে। অভিনয় বুঝিয়ে দেবার জন্য এসে বসেছে।…একা একা কি সব স্বগত উক্তি করেছে ঐ লোকটা? আমার নাম হল ইয়ং পাই-লাও, পালিয়েছিলাম জমিদারের ভয়ে, এখন বাড়ি ফিরছি। পালার গোড়ার দিকে নতুন চরিত্র স্টেজে ঢুকে আত্মপরিচয় দেবে, এই হল অপেরার রেওয়াজ (আমাদের পুরানো সংস্কৃত নাটকেও অনেকটা এই রীতি)। পথ চলছে…তখন ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে। বাজনায় ঝড় বহাচ্ছে…বরফগুঁড়ির মতো সাদা সাদা কি ফেলছে উপর থেকে। দ্রুত চলেছে লোকটা, কিন্তু পা দিয়ে তেমন নয়…অঙ্গভঙ্গিতে চলন বোঝাচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো বকবক করছে অজ্ঞজনদের বোঝাবার প্রয়াসে। পালা জমে উঠলে বিরক্ত হয়ে তাড়া দিই, থামো দিকি বাপু। ওদের বোঝানোয় ছন্দ কেটে যাচ্ছে যেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় হচ্ছে, মুখের কথা আর কতটুকু? কথা আদপে না হলেও ক্ষতি ছিল না।

পর্দা খাটিয়ে জমিদারের যে ঘর হয়েছে, এক বিশাল বাঘের ছবি তার মাঝামাঝি। বাজনা বাজছে ভয়াবহ রকমের—বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। বাঘের ছবি আর বাজনা থেকেই আতঙ্ক হচ্ছে—কি কাণ্ড ঘটবে রে এখুনি! পরক্ষণে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। বেশবাস বিশৃঙ্খ্যা, চেহারাই পালটেছে এক লহমার ভিতর। মুখ দেখাবে না সে জনসমাজে। পালার গোড়ার দিকে হবু-বরের সঙ্গে মুখর আনন্দ-দীপ্তি দেখেছিলাম—কে বলবে সে আর এই একই মেয়ে। গান গাইছে—গানের মানে ক'জনই বা বুঝি—কিন্তু হলসুদ্ধ নরনারী ফোঁতফোঁত করছে, চোখ মুছছে রুমালে। আর সামনে তীক্ষ্ণ-

নখদংষ্ট্রা রক্তদৃষ্টি সেই বাঘ। একই বাঘের ছবি—কিন্তু মনে হচ্ছে, বাঘটার চেহারা হিংস্রতর হয়ে উঠেছে এবার।

জ্যোৎস্নাপ্রদত্ত রাত্রি—আলো ফেলে কি অপরূপ জ্যোৎস্নাবিস্তার! পর্দার আকাশে চাঁদ উঠেছে! রূপালি মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে—তার মাঝখানে, যেমন দেখে থাকেন, হাসছে পূর্ণচন্দ্র। তারপর ঘোর হয়ে আসে ধীরে ধীরে মেঘের রং। বিদ্যুৎ চমকায় এক একবার কালো মেঘ কেটে কেটে। বিদ্যুৎ আকাশময় ছুটোছুটি করছে। প্রবল ধারায় জল নামল। স্টেজের খুব কাছে আমরা—এত বৃষ্টি, কিন্তু সত্যিকারের জল পড়ছে না এক ফোঁটাও কোন দিকে। অথচ সেই ছায়াচ্ছন্ন কালো পাহাড়, অন্ধকার আকাশ, মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-চমক, ঝরঝর জলের আওয়াজ—সমস্ত মিলে আমরা তাবৎ দর্শকজনও বিষম দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি, ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম বুঝি! পরের দিন বন্ধুদের বর্ণনা দিয়েছিলাম, অন্ধকার হলের মধ্যে বাঁ-হাত হাতড়ে আমি ছাতা খুঁজছি···ছাতা মেলে মাথায় ধরব···

দেখুন দেখুন, দাড়িওয়ালা লোকটা ঐ আত্মগোপন করছে। স্টেজের বাইরে গেল না, নড়লই না জায়গা থেকে। পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর অপর লোকগুলো ঠিক সামনে এসেও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দেখবে কি করে, পাঁচিলের এধারে সে, ওপাশে ওরা। পাঁচিলও আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। স্টেজের কিনারা থেকে খানিকটা অবধি পাঁচিল তার পরেই হঠাৎ কেটে দেওয়া হয়েছে। পাঁচিলটা পুরোপুরি থাকলে এদের দু-পক্ষের মাঝ দিয়েই যেত। কিন্তু পাঁচিল থাকতে পারে না—পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গিয়ে তাহালে তো ওদিককার লোকের অভিনয় নজরে আসত না। পাঁচিলের অবস্থান অতএব আন্দাজ করে নিন। অপেরা-দর্শকের চোখ-কান শুধু নয়, মনেরও কাজ রয়েছে দস্তুরমতো; দৃশ্যপটের ফাঁকগুলো মনে মনে পরিপূরণ করে নিতে হবে।

চরিত্রগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, অথচ সময়ক্ষেপ সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আলো এবং বাজনা বদল করে। দিন দুপুর কাটিয়ে দিয়ে এখন রাত দুপুরে এসেছি—বুঝতে একটুও আটকায় না। ঘুরন-মঞ্চ নয়, দৃশ্য-বদল তবু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হয়ে যাচ্ছে। একবার পর্দা একটুখানি আটকে গিয়েছিল—কত লোক ছুটোছুটি করে ভিতরে কাজ করছে, ওরে বাবা!

আর ঐ কনসার্ট। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মতন একটু একটু আলো প্রতিটি বাজনার সঙ্গে—স্বরলিপি দেখছে সেই আলোয়। ছায়ামূর্তি বাজন-

দারগুলো—ব্যাণ্ডমাস্টার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে চালনা করছে। নাটকের চরম ভাবাবেগের সময় মানুষটি খেপে যাচ্ছে যেন। কণ্ঠ মিশিয়ে দিচ্ছে এক এক সময় বাজনার সঙ্গে। সেগুলো অর্থময় কথা কিনা জানি নে, কিন্তু সুরঝঙ্কারে অন্তলোক কাঁপিয়ে তোলে।

বিরাম সময় আলো জ্বলে উঠল। ব্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে ছুটে গিয়ে শেকহ্যাণ্ড করি, তাজ্জব দেখালে বটে ভায়া! দেরি করে এসেছি, হলে তখন আলো ছিল না। এবারে চেয়ে চেয়ে দেখছি, সামনে পিছনে কে কোথায় বসল। কি আশ্চর্য, পিছন দিকে গোটা তিনেক সারির পরে—উঁহু, আমার চোখেরই ভুল···তাই কখনো হতে পারে? প্রায় একই প্যাটার্নের গোলালো মুখ এখানকার মেয়েদের—তাঁদের একের জায়গায় অন্যকে ভেবে বসা বিচিত্র নয়। আমার কেশব-জেঠার সাহেব দেখা আর কি—দশ-দশটা বছর শহরে কাটানোর পরেও এক সাহেব থেকে অন্য সাহেবের তফাত ধরতে পারতেন না। সুন-চিন-লিঙ অর্থাৎ সানইয়াৎ-সেনের স্ত্রী চুপচাপ আমাদের পিছন দিকে বসে—এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? নতুন-চীনে মাও সে-তুঙের পরেই বলতে গেলে তাঁর পদমর্যাদা। সাজসজ্জা নেই এবম্বিধ বিশিষ্টার, দেহরক্ষীই বা কোন দিকে? তার পর দেখি, কো মো-জো, মাও-তুন ইত্যাদি বাঘা-বাঘা নেতারাও পিছন সারিতে গা এলিয়ে মজাসে পালা দেখছেন।

লাউঞ্জে গেলাম। বসে বসে ধকল হয়েছে তো! সেই কষ্ট-নিরাকরণের ব্যবস্থা—যেমন সর্বক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দোভাষি মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে; অপেরা নিয়ে তাকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করি। সিয়ারার পাঠ বলছে, তার নাম ওয়াং কুন; এমন আশ্চর্য অভিনয় কোথায় সে শিখল? দোভাষি গড়গড় করে বোঝাতে লেগে যায়। এই পিকিনে অভিনয়ের ইস্কুল আছে দস্তরমতো—এক্সপেরিমেণ্টাল স্কুল অব ক্লাসিক্যাল ড্রামা। মুফতে শেখা সেখানে। তারই ফাঁকে একবার বলে, কমলার রস একটু চেখে দেখুন না।

আমিও খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করি, তোমরা এত ভালো কেন, বলো তো?

জবাব দেয়, আমরা শান্তি ভালবাসি। শান্তির দূত তোমরা—এত ভালবাসি তাই তোমাদের।

কত রকমের প্রশ্ন—মাথামুণ্ডু থাকে না অনেক সময়। নিরিবিলি সময়ে ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা লাগে। তারা কিন্তু হাসিমুখে জবাব দিয়ে

যাচ্ছে। না বলতে পারলে লজ্জিত হাসি হাসে। না বুঝতে পারলে বলে, ইংরেজি আমি কম জানি। সর্বক্ষণ হাসিমুখে হোটেলে পরিবেশন করে, সেই মেয়েগুলোই বা কি! শত শত লোকের হাজারো বায়নাক্কা—একে এ দাও, ওকে তা দাও। ছুটোছুটি করে কুল পায় না। হাসতে হাসতে ছোটে। হাসে তাদের চোখ-মুখ, হাসে গতিভঙ্গিমা।

এক কলেজি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে পারো—কেমন করে তোমায় রাগানো যায়?

আমি রাগব না।

কেন?

তোমরা বিদেশি, আমাদের অতিথি। তোমাদের কাছে কিছুতেই রাগতে পারি নে।

ওয়াং সিয়াও-মিই-র কথাটা সেই আর একদিন বলতে গিয়ে বলা হয় নি। পিকিন সিনওয়াল য়্যুনিভার্সিটির মেয়ে। বুদ্ধি প্রতি কথায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তাকে বললাম, মেয়েরা যেন বেশি বুদ্ধিমান ছেলেদের চেয়ে?

একটি ছেলে তার পাশে—চেন-চি, সাংহাই য়্যুনিভার্সিটির। স্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ওয়াং বলে, ছেলেরা মেয়েদের মতোই বুদ্ধিমান।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বিনয়?

না, এটাই সত্য।

কথা পড়তে পায় না। সভ্য সংযত জবাব—মৃদু হাসি খেলে যায় মুখে। চেনের দিকে সকৌতুক তাকাচ্ছে এক একবার।

মাঝে মাঝে কিন্তু রাগ হয়ে যেতো দুরন্তপনায়। হিংসাও হতে পারে। জন্মাতে মানিক পঞ্চাশটা বছর আগে, মজা টের পেয়ে যেতে। জন্ম থেকে লোহার জুতো এঁটে পা ছোট করে রাখত, কাঙারুর মতন থপথপ করে চলতে সেই পায়ে। বড় ঘরে বিয়ে হলে দু-শো পাঁচশো বউয়ের একজন; নিতান্ত গরিব-ঘর হল তো পাঁচ-সাত গণ্ডার ভিতরে রইলে। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ হাঁড়িপানা মেয়ে জন্মানোর পর। আগাছা গোড়া থেকে সাফ করলে হাঙ্গামা কম—বাচ্চা মেয়েকে তাই জলে ডুবিয়ে মারত, গলা টিপে মারত।

আহা, আমাদের—এই বেটাছেলেদের—কী সত্যযুগই ছিল সেকালে! সাত চড়ে মেয়েগুলোর রা কাড়বার জো ছিল না। সব পুরোনো দেশের এক গতিক। তাই ওদের বলতাম, পুরুষজাতটা কি বোকা! তোমাদের পায়ের শিকল ভেঙে দিলাম আমরাই তো! খোঁড়া পায়ে ঘর-উঠোন করতে, দেবতা

হয়ে বসে রাতদিনের সেবা নিতাম! দিব্যি ছিলাম। আর এখন যা কাণ্ড, শ্রীমতীরা উল্টে আমাদেরই না শিকলে বাঁধতে লেগে যায়!

১৯১২ অব্দ—তিন বন্ধন কেটে ফেলল ওরা। পয়লা নম্বর হল পুরুষের মাথার লম্বা টিকি! পুরানো ছবিতে দেখেন নি? আরে মশায়, মাথায় চুল হল বাপ-মায়ের সম্পত্তি। কোন হিসাবে সে বস্তু কাটা চলে, কেটে ফেললে গুনাহ্ হবে না? সমস্ত চুল রাখলে বড্ড ঝাকড়ামাকড়া হয়, তাই বেশ ওজনদার একটি গোছা নমুনা রেখে দিত। মাতৃগর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে এসেছে, সেই আদি অকৃত্রিম বস্তু হওয়া চাই। দুই নম্বর হল, ঐ যে বললাম—লোহার জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা ইঞ্চি পাঁচেকের ভিতরে রাখা। চলতে গিয়ে টলবে, রূপ কেটে পড়বে সেই চলনে! আর তিন নম্বর—কাউ-তাউ। উঠ-বোস করে ভারি এক মজার অভিবাদন-প্রথা।

কোথায় ছিলে সেদিন আনন্দমতীরা—উল্লাসে বীর্যে কর্মিষ্ঠতায় নতুন চীনের ছেলেদের যারা সমভাগিনী? ওয়াং ঘাড় নাড়লে কি হবে—বেশি উজ্জল দেখতে পাচ্ছি, মেয়েরাই। ছেলেরা কাজ করে; মেয়েগুলোর কাজ করা শুধু নয়, আনন্দের তুফান বইয়ে দেওয়া ঐ সঙ্গে। যত শক্ত কাজই হোক, গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মনে হবে।

ঘরগৃহস্থলীর চেহারা বিলকুল পালটেছে। আগেকার দিনের কর্তামশায়, এবং পোষা-মুরগি ও পোষা-রমণীদল নয়। ঘর এখন আনন্দ-নিকেতন; নতুন ছেলেমেয়েদের জন্মের সূতিকাগার। ভূমি-সংস্কারের পর মেয়েরাও জমির মালিক, পুরুষের সমান হকদার। তাদের সমাদর আর সম্মান তাবৎ চীনদেশ জুড়ে।

দু-বেলা কনফারেন্স—সকালের দিকটা একটু আগেভাগে তাই ছুটি মিলেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, রকমারি প্যাকেটে টেবিল ভর্তি। গরম সোয়েটার, পাজামা, ছাপা-সিল্কের স্কার্ফ—ব্যাপার কি হে, কোত্থেকে এলো এত সমস্ত?

সুইং বলে, শীত পড়ে গেছে বড্ড কি না!

চটে গিয়ে বলি, কি ভেবেছ বলো দিকি? ঈশ্বরের দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোই মাত্র দেশ থেকে নিয়ে এসেছি—শীতের পোশাক দেবে, রোদের ছাতা দেবে...না না, এ সমস্ত হবে-টবে না, ফেরত নিয়ে যাও বলছি।

সুইং নিতান্ত গোবেচারি ভালমানুষ।

আমি তার কি জানি—যারা দিয়ে গেছে, তাদের ডেকেডুকে ফেরত দিনগে—

শুধু কি পোশাক! প্যাকেট খুলে খুলে তাজ্জব হয়ে যাই। হৃষ্টপুষ্ট ছবির বই, গ্রামোফোন-রেকর্ড, কারুকর্ম-করা কৌটো—সে কৌটো খুললে আর এক কৌটো—তার ভিতরে আর একটা—তার ভিতরে—তার ভিতরে···সাতটা এই প্রকার। আরও কত কি বস্তু—মনে পড়ছে না এত দিনের পরে।

একবারে কিচ্ছু জানো না সুইং, চুপিসারে কোন চোর এসে এত সমস্ত রেখে গেল?

না—বলে মেয়েটা সরে পড়বার কিকিরে আছে।

নিশ্বাস ফেলে বলি, দিয়ে গেল বটে কিন্তু পাজামাটা বড্ড ছোট। কাজে আসবে না। মাপসই হলে পরে আরাম পাওয়া যেত। তা কার জিনিস কে-ই বা বদল করে দেয়! থাকুক গে পড়ে এমনি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে সুইং শুনে নিল, মুখে কিছু বলল না।

ক্ষিতীশের ওদিকটা ভারি জমজমাট। নতুন দুই ভদ্রলোক।

আসুন দাদা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন মি ল্যান-ক্যাং। আর ইনি সাও ইয়েই।

ওরে বাবা, মি এসে পড়েছেন আমাদের ঘরে! নাম শুনছি এসে অবধি। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—ক্লাসিক্যাল অপেরার রাজ্যে সার্বভৌম সম্রাট। আরও বড় পরিচয়, পরম লাঞ্ছনার দিনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই মহাশিল্পী। দেশ জাপানিদের তাঁবে—মি'কে তারা হুকুম করল, নাট্যশালার দরজা খুলে দাও, নাচ-গান-অপেরা চলুক আগেকার দিনের মতো। না, কক্ষনো না—পরাধীনতা আনন্দের সময় নয়। স্ফূর্তির নেশায় মানুষ ভুলিয়ে রাখতে বলছ, সেটা হবে স্বদেশদ্রোহিতা। টাকাপয়সা দেখিয়ে হল না তো জোরজবরদস্তি। ঘর-বাড়ি জায়গাজমি বাজেয়াপ্ত। সারা চীনের মানুষ মি'র নামে পাগল—এর অধিক জাপানিরা এগুতে সাহস করল না। নতুন আমলে নবীন যুবার বল-শক্তি নিয়ে মি আবার অপেরা খুলেছেন। তাঁর লেখা অভিনয় সম্বন্ধে একটা বই আমায় দিয়েছেন নিজহাতে নাম লিখে। পড়বার বিদ্যে নেই, কিন্তু এ সম্পদ আমি বুকে করে রেখেছি।

আর এই সাও ইয়েই। ছোকরা মানুষ—নাটক লেখেন। ইংরেজি জানেন বলে সঙ্গে এসেছেন, কথাবার্তায় দোভাষির কাজ করবেন।

তা আমিও তো দলের বাইরে নই—নাটক লিখি, থিয়েটারে নাটক হয়েছে। একটা নাটক উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাব করে ফেললাম মি'র সঙ্গে। খাতা-কলম নিয়ে আসছি—বসুন।

কলম বাগিয়ে জমিয়ে বসা গেল ওঁদের মধ্যে। অপেরার সম্বন্ধে শুনতে চাই। আপনার মতন কার জানাশোনা? বলুন আমায় দু-চার কথা।

চীনা অপেরা কি আজকের? অনেক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। লোকজনের মনের সঙ্গে গাঁথা। চল্লিশ বছরের উপর স্টেজের সঙ্গে সম্পর্ক আমার। কুঁয়োমিনটাং আমলে দেখেছি, আর এই নতুন আমলেও দেখছি।

সেকালে যারা নাটক করত, সমাজে ইজ্জত ছিল না তাদের। লোকে মুখ বাঁকাত, বেটা পালা গেয়ে বেড়ায়। পালা শুনতে কিন্তু মানুষ ভেঙে পড়ে—রাজা রানী বা সেনাপতি সেজে যখন অ্যাক্টো করছে, তখন মাতোয়ারা। ব্যস, ঐ অবধি—আসরের সীমানাটুকুর মধ্যেই সমাদার। এখন দিন পালটেছে। আপনি সাহিত্যিক—আপনারই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছি আমরা ইদানীং। আপনি লিখে বলেন, আমরা গান গেয়ে অ্যাক্টো করে বলি।

কাজেই দায়িত্ব এসে পড়েছে—বলার কথা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে এখন। এবং শুধু কথাগুলোই নয়, বলা হবে কোন কায়দায়। আজকে, দেখতে পাচ্ছেন, যে যার কাজ নিয়ে চলেছে—মুখে না বলুক, দস্তুরমতো পাল্লাপাল্লির ব্যাপার। দেশের কাজের কাজী সকলেই আমরা—কোন মানুষ আজ হেলাফেলার নয়। হাজার হাজার লোকে আমাদের কথা শোনে—মনে মনে তাই বড্ড ভাবনা, আজে-বাজে কথা শুনিয়ে দেশের উন্নতি পিছিয়ে না দিই।

শুনুন তবে। সেই মান্ধাতার আমলের বিস্তর পালাগানই চলছে আজও। গোটাকয়েক মাত্র বাদ গেছে। পুরানো বস্তু নিয়ে বড্ড দেমাক আমাদের। পাঁচ-সাতশ বছর ধরে যা চলে আসছে, বাপ-ঠাকুর্দা যা শুনে গেছেন, এক কথায় তা বাতিল করবার জো নেই। তবে কি বলতে চাও, তাঁরা বোকা—রুচি ও রসবোধ ছিল না তাঁদের? ঐ যে বললাম—এমন গোঁড়া বামনাই দুনিয়ার অন্য কোন জাতের যদি দেখতে পান!

পালা ঠিকই আছে, অভিনয়ের ঢংটা শুধু বদলেছি। একালের মানুষকে নয়তো খুশি করা যায় না। যেমন ইয়াং কুই-ফি'র জীবন নিয়ে লেখা নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা—ইয়াং ছিল এক সম্রাটের উপপত্নী। তার আশ্চর্য রূপ আর অহঙ্কারের গল্প চীনের বাচ্চা-বুড়োর মুখে মুখে। হুবহু সেই একই নাটক

—কিন্তু আগেকার অভিনয়ে ফুটে উঠত ইয়াণ্ডের প্রমোদ-লাস্য, আর এখনকার অভিনয়ে রূপসী দুর্ভাগিনীর নিঃসহায় একাকিত্ব। প্রায় একই কথাবার্তা— কিন্তু অভিব্যক্তির রকমফেরে আজকের শ্রোতা লাজ-অন্তঃপুরিকার বন্দীত্ব-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নতুন পালাও অবশ্য বিস্তর লেখা হচ্ছে। কিন্তু নতুন অর্থ বিকিরণ করছে অতি-প্রাচীন কাহিনীগুলোও।

মুইং ঝড়ের বেগে এসে পড়ল।

গল্প শেষ করুন। পাকিস্তানিদের আপনারা নেমতন্ন করেছেন, মনে নেই ?

ঠিক বটে! আজকে দ্বিতীয় দফা। সেই যে কথা চলছিল, ভারত-পাকিস্তান গণ্ডগোল করব না, আপোসে ফয়শালা করে নেবো সমস্ত—তারই পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হবে আজকে খাওয়ার সময়। যাচ্ছি মুইং, ওঁরা গিয়ে বসতে লাগুন, এক্ষুনি গিয়ে হাজির হবো।

মানুষ কি রকম বদলে গেছে শুনবেন? একটা পালায় রাজার পার্ট করে আসছি আমি আজ তিরিশ বছর। লড়াইয়ে হেরে এসে বলেছি—"আমি চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ—রাজ্য আমার ধ্বংস হবেই।" অ্যাক্টো করছি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। সেকালে দেখতাম, এই শুনে হলের তাবৎ মানুষ চোখ মুছছে। এখনকার শ্রোতারা হাসে একই কথায়—বিধাতার আক্রোশে রাজার লড়াই হারবার কথা শুনে। সেকেলে এক নাটকের এক জায়গায় আছে—"মেয়েলোকের ব্যাপার তো! বোলো না, বোলো না, ওতে আবার কেউ কান দেয় নাকি?"···কথাগুলো এখন উচ্চারণ করবার জো নেই স্টেজের উপর। গুঞ্জন উঠবে—ঝাঁঝালো প্রতিবাদ হবে। মেয়ো নয় শুধু, পুরুষ ছেলেদেরও অমন কথায় ঘোরতর আপত্তি। একটা পালা ছিল—সেনা-পতি তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে মেরে ফেলল মায়ের তুষ্টির জন্য; মা বউকে মোটে দেখতে পারত না। মেরে ফেলে তারপর বিষম শোকার্ত হয়েছে সেনাপতি। মাতৃভক্তির চরম পরাকাষ্ঠায় হৈ-হৈ করত সেকালের শ্রোতারা। এখন পালাটা বাতিল—লোকে দু-কানে আঙুল দেয় শোনাতে গেলে। ভাঁড়ামি করে লোক হাসানো হত সেকালের অনেক পালায়; এখানকার মানুষ হাসে না, চটে আগুন হয়। কি ভাবো আমাদের, রুচি নোংরা করে দিতে চাও এই সব শুনিয়ে? কাগজে চিঠিও বেরোয় এই রকম পালা গাইলে।

রকমারি সাজপোশাকে রঙবেরঙের আলোর মধ্যে চল্লিশটা বছর রাতের

পর রাত্ত কেমন বেশ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এলাম। স্টেজ বিনে আর কিছু জানিনে। দেশের মানুষ কি বেগে এগিয়ে চলেছে, ওখান থেকেই মালুম হচ্ছে ; বাইরে এসে চতুর্দিক নিরীক্ষণের দরকার হয় না। নেচেকুঁদে স্ফূর্তির যোগান দেওয়া নয় শুধু, দশজনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও সকলের সঙ্গে আমরা কাঁধ পেতে নিয়েছি। মাও-তুচির কথা—পুরানো বনেদের উপর নতুন ইমারত গড়ে তোল। আমাদের নাট্যকে ব্যাপারও ঠিক তাই। সারা চীন জুড়ে অগণ্য অপেরা-দল আছে—১৯৫০অব্দে সবাই এসে পিকিনে জমল। আলাপআলোচনা হল—কারা কোন দিকে চলছে, সকলে একসঙ্গে বসে তার নমুনাও দেখলাম। মোটামুটি একটা পথ ছকে নেওয়া গেছে সবাই যাতে পাশাপাশি চলতে পারি। আবার শিগগিরই আমরা মিলছি, যত অপেরা দল আছে। কারা কদ্দুর কি করল, তার হিসাবনিকাশ হবে···

অমিয় মুখুজ্জে এক সেক্রেটারি—খোদ সেই প্রভু এসে হাজির। সবাই হাত কোলে করে বসে, আর দিব্যি আপনারা গল্প জমিয়ে বসেছেন। আচ্ছা মানুষ !

তাড়া খেয়ে উঠতে হল—বাপরে বাপ, সেক্রেটারির তাড়া। ভোজনই শুধু নয়, উদ্গারণ-ক্রিয়াও আছে আজ আমাদের—আমার বক্তৃতা, ক্ষিতীশের গান। কিন্তু গুণীজনদের ছেড়ে যাই কেমন করে ?

আপনারাও আসুন না—খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেতে খেতে আরও কথা শুনব।

এমন দরের মানুষ...কিন্তু প্রস্তাবমাত্রেই উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ক্ষিতীশ আর আমি দুই মান্য অতিথিকে মাঝে নিয়ে বসেছি। খাওয়া অন্তে গান হচ্ছে, আবৃত্তি হচ্ছে মি-কে বলি, আপনার কিছু হবে না ?

মি ঘাড় নাড়েন। উঁহু, এখানে কেন ? ছিটেফোঁটায় সুবিধে হয় না আমার। আপনাদের জন্য পুরো পালার ব্যবস্থা করেছি। আমি তার নায়িকা। পরশু নাগাত দেখাব।

নায়িকা মানে বিশ-বাইশ বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। ষাট বছরের বুড়ো তরুণী রাজকন্যা সেজেছেন। বুঝুন। সামনের সিটে আমরা স্টেজের হাত-খানেকের মধ্যে। বারবার নজর হেনেও কিন্তু ধরতে পারছি নে। মি বোধ হয় ফাঁকি দিলেন শেষ পর্যন্ত। ছাপা প্রোগ্রাম উল্টেপাল্টে দেখছি, রাজকন্যা তিনিই বটে। কিন্তু এই চেহারা বুড়ো মানুষটার কি করে হতে পারে ?

পাশের দোভাষি ছেলেটা হেসে খুন। ঐ তো মজা! মেক-আপ, গলার স্বর এখন এই রকম দেখছেন—আবার যেদিন উনি রাজা সাজবেন, দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা। এমনি না হলে ওঁর নামে এত মেতে ওঠে মানুষ!

পুরুষমানুষ রাজকন্যা সেজেছে, কিন্তু কন্যার সখিবৃন্দ—গুনতিতে জন ত্রিশেক—তারা সবাই সত্যিকার মেয়ে। সেকালের রেওয়াজ—মেয়ের পার্টে পুরুষ নামত। কিন্তু যত পার্ট করেছেন, বেশির ভাগ মেয়ে। মেয়ে মিলত না, সে জন্যে নাকি? আমাদের দেশের মতন আর কি! এখন দেদার মেয়ে—কত নেবেন?

যাকগে, যাকগে। কোথায় যেন ছিলাম? ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ভোজ খাচ্ছি পাকিস্তানি ভায়াদের সঙ্গে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আসরের মাঝখানে। চতুর্দিকে এক নজর তাকিয়েই নিই।

আজকে ছাড়ব একখানা বঙ্গভাবায়। সুবোধ বন্দ্যো সেই যে বলেছিলেন—দেখা যাক কেমনতরো দাড়ায় এই ঘরোয়া সম্মেলনে। সামনেই তরুণ বন্ধু মুজিবর রহমান—আওয়ামী-লীগের সেক্রেটারি। জেল খেটে এসেছেন ভাষা-আন্দোলনে; বাংলা চাই—বলতে বলতে গুলির মুখে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরই সহযাত্রী। আর রয়েছেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান; দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন; যুগের দাবীর সম্পাদক খোন্দকার ইলিয়াস, বাংলা ভাষার দাবি এঁদের সকলের কণ্ঠে। বাঁ-দিকে দেখতে পাচ্ছি ইউসুফ হাসানকে—আলিগড়ের এম. এ. উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষার প্রবল সমর্থক। এই বিদেশে বাংলায় বলবার এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায়?

গোড়ায় একটুখানি ভূমিকা করে নিই ইংরেজিতে। মশাইরা, অবধান করুন। আমি ভারতীয় বটে, কিন্তু জন্মস্থান পূর্ব-পাকিস্তানে। আজকে আমার নিজ ভাষা বাংলায় কিছু বলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাষা। নিখিল-পাকিস্তানের বড় হিস্যাদার যে পূর্ব-বাংলা, তারও ভাষা এই।

খুব হাততালি। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন, উৎসাহ তাঁদেরই উত্তাল। মিএগ ইফতিকারউদ্দীন হৈ-হৈ করে উঠলেন উল্লাসে…

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মুজিবর রহমান এসেছেন আমার ঘরে। এমনি চলত আমাদের—কোন দিন আমি যেতাম ওঁদের আস্তানায়, কোন দিন

যা আসতেন ওঁদের কেউ কেউ। খাস-বাংলায় অনেক রাত্রি অবধি গল্পগুজব চলত। বক্তৃতার আসরে ঐ হাততালির কথা উঠল। কিগো ভায়া, পশ্চিম-পাকিস্তানিদের খুব তো নিন্দেমন্দ করেন বাংলাভাষার শত্রু বলে। অমন সম্বর্ধনা কি জন্যে হল তবে?

মুজিবর বললেন, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ওরা আমাদের ভয় করে। গুঁতোয় পড়ে বাংলাভাষার এত খাতির।

আবার বললেন, যে ক'টি এসেছে—এরা ভালো, আমাদের মনের দরদ বোঝে। এদের দেখে সকলের আন্দাজ নেবেন না।

দেশে থাকতে শুনে গিয়েছিলাম, দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের পাশপোর্ট হচ্ছে। একদিন সেই কথা উঠল। মুজিবর বললেন, কেন বলুন দিকি?

আমরা বিদ্যাবুদ্ধিমতো জবাব দিই। ভাষা-আন্দোলনের পর কর্তারা বোধ হয় সন্দেহ করেছেন, পশ্চিম-বাংলা থেকে অবাঞ্ছিত মানুষ গিয়ে উস্কানি দেয়। সেই সব মানুষ আটকানোর মতলব।

হল না। মুজিবর রহমান বলতে লাগলেন, এ হচ্ছে—পূর্ব-বাংলায় যতগুলো হিন্দু আছে তাদের তাড়াবার ফিকির। পাশপোর্ট চালু হবার মুখে আবার এক দফা পালানোর হিড়িক পড়ে যাবে, দেখতে পাবেন।

অবাক হয়ে গেছি। মুজিবর জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তাই। হিন্দুরা চলে গেলে পূর্ব-বাংলায় আমরা গুনতিতে কম হয়ে যাবো পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে। তখন আর এস্তাজারি খাটবে না, ও-তরফ থেকে যা বলবে 'জো হুকুম' বলে মেনে নিতে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ভিটেমাটি ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন, আমি পশ্চিম-বাংলায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরব তাঁদের। নিজের দেশভূঁই কি জন্যে ছাড়তে যাবেন? আর এই শুনে রাখুন—হাঙ্গামা যতই হোক, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা পূর্ব-বাংলায় কোন দিন আর হবে না।

বক্তৃতাটা আজকে কি রকম উতরাল—তাই কি খেয়াল আছে ছাই? খুব মেতে গিয়েছিলাম, এই মাত্র জানি। আমার সাত-পুরুষের ভিটা আজকের ভিন্ন রাজ্য হয়ে গেছে। সীমানা পার হতে হাজারো বায়নাক্কা। কর্তা হয়ে যারা জাঁকিয়ে বসেছে, তাদের সঙ্গে চেহারায় মেলে না, কথায় মেলে না, কথাবার্তা বোঝে না তারা কিছু। মনে দুঃখ হয় না, বলুন? এদেশ-ওদেশ হয়ে আলাদা দল করে এসেছি বটে, চীনে আসবার পর তাবৎ বাঙালি এখন তো কাঁধ-ধরাধরি করে বেড়াই। পাকিস্তানের এবং ভারতের অপর

প্রতিনিধিরা থ হয়ে গেছেন আমাদের রকমসকম দেখে। বাংলা বক্তৃতা বুঝলেন ক'জনই বা! কিন্তু সব ক'টি মানুষ আগাগোড়া চুপ হয়ে ছিলেন। একটু-আধটু মনেও ধরেছে মালুম হচ্ছে—কথা না বুঝেও আমার মনের ব্যথা ছুঁয়েছে যেন তাঁদের মনে।

রমেশচন্দ্র এগিয়ে এসে বাহবা দিলেন, ভারি চমৎকার বলেছেন—

কি বলেছি বলুন দিকি?

আমতা-আমতা করেন তিনি। দেখুন, বাংলা মোটে যে বুঝি নে, এমন নয়। তবে ঝড়ের বেগে এমন ছুটলেন যে পিছু পিছু ধাওয়া করা গেল না।

(৯)

শান্তি-সম্মেলনে মোট ছিয়াশিটা বক্তৃতা। রিপোর্ট ও ঘোষণা ইত্যাদিতে আরও গোটা চল্লিশ। একুনে কতগুলো দাঁড়াল তবে, কষে দেখুন। শুনিয়ে দেবো নাকি তার থেকে ভারী গোছের ডজন দুই? আঁতকে উঠবেন না পাঠককুল—সাদামাঠা একটু রসিকতা। এর তুলনায় হাইড্রোজেন-বোমা ডাক করাও দয়ার কাজ। দু-তিনটে বক্তৃতার যৎসামান্য নমুনা ছাড়ব। পুরো বস্তু নয়...এখান থেকে একটা লাইন, ওখান থেকে দুটো। এতে আর মুখ বাঁকাবেন না, দোহাই!

নারীর অধিকার ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন তাহিরা মজহর। সর্দার সেকেন্দার হায়াত খাঁর কথা মনে পড়ে···অখণ্ড-পাঞ্জাবের যিনি প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন? তাঁর মেয়ে। স্বামী মজহর আলী খাঁ পাকিস্তান-টাইমসের সম্পাদক...তিনিও এসেছেন। মেয়েটির অতি সুন্দর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও ইংরেজি বাচনভঙ্গি অতি চমৎকার। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে-চার শ মানুষ...আহা-ওহো করছেন। বক্তৃতা অন্তে দলে দলে সে কী অভিনন্দনের ঘটা! অধমও দলের বাইরে নয়।

...মেয়েদের কথা বলতে উঠেছি আমি। তারা লড়াই করে না, লড়াইয়ে মারা পড়ে অসহায়ের মতো। এখানকার লড়াই শুধু সৈন্য মারে না, নিরীহ মানুষের ঘর-গৃহস্থালি ভাঙে, যুগ যুগ ধরে গড়ে-তোলা মানুষের সহাজ ও সভ্যতা উৎখাত করে দেয়।

"মা ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন, কোনদিন আর চোখে দেখবেন না সেই ছেলে; হাস্যোচ্ছলা তরুণী নিঃসহায় বিধবা হয়ে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করছে; মনে মনে ভাবুন দিকি এই সব ছবি। কোন অজ্ঞাত সুদূর রণক্ষেত্রে

হাজার হাজার মায়ের বাছার উপর সঙ্গিনের ধার পরীক্ষা হচ্ছে; ফিরে যদি আসে কখনো, আসবে পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হয়ে। একটা সত্যি ঘটনা শুনুন। বেরিয়েছে আমেরিকারই এক কাগজে। দক্ষিণ-কোরিয়ার দারুণ শীতে খোলা প্লাটফরমে শ-খানেক বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে। বাপ-মা আত্মীয়জন সবাই লড়াইয়ে মরেছে—ধরণীতে আপন বলতে কেউ নেই। আমেরিকান ভদ্রলোক একটিকে গিয়ে ধরলেন, এর পরে কি করবে, ভেবেছ তুমি কিছু?

"মরব—আবার কি! গেল শীতে আমার দাদা গেছে, এবার আমি—

"মরার ক্ষণ অবধি কোন গতিকে কাটিয়ে দেওয়া—তা ছাড়া ঐ বাচ্চা ছেলের আর কোন লক্ষ্য নেই জীবনে। এ ছেলে একটি নয়—হাজার হাজার। প্যারিসে শান্তি-কংগ্রেস হয়েছিল—পাকিস্তানে সাড়া দিয়েছিলাম আমরা মেয়েদের দলই সকলের আগে। পাঞ্জাব উইমেনস ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন। কেন জানেন? নিজেদের ভাবনা তত ভাবি নে—মায়ের জাত, ছেলেমেয়ের কষ্টে দুঃখে স্থির থাকা অসম্ভব আমাদের পক্ষে! তাই বলছি, লড়াই থামাও বন্ধুরা সকলের মিলিত চেষ্টায়—নইলে তোমার বুকের মানিক নিঃসহায় নির্বান্ধব পথে দাঁড়িয়ে অমনি বলবে, আমি মরব এবারের শীত এসে পড়লে। ধরণীর সকল আলো-আনন্দ নিঃশেষে নিবে গেছে এক ফোঁটা ঐ বাচ্চা ছেলের চোখে..."

স্বর কাঁপছিল তাহিরা মজহরের। ব্যাকুল বেদনার্ত মাতৃকণ্ঠ, মনে হল, করজোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হল-ভরতি তাবৎ মানুষের চোখের সুমুখ দিয়ে।

আর একজনের দু-এক কথা বলি। আমাদের রবিশঙ্কর মহারাজ। সত্তর বছরের বুড়োমানুষ—অঙ্গে অম্লান খদ্দরের ভূষা, নগ্নপদ, মাথায় গান্ধীটুপি। আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন-ক্ষেত্রে ভারতের পুণ্যবাণী উদ্গীত হল মহারাজের কণ্ঠে। মহারাজের বক্তৃতার পর এই কথাগুলোই বললাম অধ্যাপক শুকলার কাছে। মহারাজকে গুজরাটিতে বুঝিয়ে দিতে সলজ্জ হাসি হেসে তিনি আমায় নমস্কার করলেন।

"সম্মেলন তিনটে কারণে অতি পবিত্র। সম্মেলনের শুরু মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে। সৃষ্টির আদি থেকে যত মানুষ জগতের শান্তি-সৌহার্দের জন্য কাজ করে গেছেন, মহাত্মার চেয়ে বড় কেউ নেই। দ্বিতীয় কারণ, সুপ্রাচীন চীন ভূমির উপরে এই অনুষ্ঠান। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মহাজাতি। তিলেক সঙ্কল্পভ্রষ্ট

হয় নি ; শ্রমে অবসান আসে নি। তিন বছরের মধ্যে অসাধ্য সাধন করে পীড়িত অবমানিত মানুষের চিত্তে নতুন আশা জাগিয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হল—সম্মেলনের পুণ্য লক্ষ্য, জগতের মধ্যে—বিশেষ করে এশিয়ার দেশে দেশে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের অচল প্রতিষ্ঠা।

"বারম্বার মহাত্মাজীর কথা মনে পড়ছে। শেষ নিশ্বাস অবধি তিনি জগতে শান্তি কামনা করে গেছেন, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বা গণ্ডি-ঘেরা স্বদেশপ্রেমের প্রশ্রয় দিতেন না কখনো তিনি। জগতের যা-কিছু ভালো, নিখিল মানবজাতির তা ভোগ্য হবে, কয়েকটি মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না—এই তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের সাধনা অহিংসা পথ ধরে।

"শান্তি আকাশ থেকে পড়বে না—শান্তির জগৎ গড়ে উঠবে সকলের প্রতি যদি ন্যায় আচরণ হয়। যেখানে জোরজবরদস্তি, বাধা সেখানে দিতেই হবে। অহিংস-পথিক আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের শান্ত চরিত্রই কেবল শান্তির সহায়ক হতে পারে। তবু যেখানে যে-কেউ অন্যায়ের প্রতিরোধ করে—তা সে যে উপায়েই হোক—আমার শ্রদ্ধা স্বতই তার প্রতি উৎসারিত হয়ে ওঠে।

"প্রতিটি মানুষ নিজ শ্রমের ফল ভোগ করবে। জাগতিক ভোগ-সুখ নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে কখনো বিশ্বশান্তি আসবে না। ত্যাগের মনোভাব চাই। ভোগলিপ্সা থেকেই অপরকে বঞ্চনা, সম্পদের লালসা—এবং শেষ পযন্ত লড়াইয়ের প্রবৃত্তি জাগে।'

(১০)

ছুটি, ছুটি! তারিখটা ৮ই অক্টোবর। আট-আটটা দিন একটানা কনফারেন্স হল, তাই বুঝি করুণা করে কর্তারা বিকেলটা মাপ করেছেন। রাত নটায় সাংস্কৃতিক কমিশন—তাক বুঝে গা-ঢাকা দিলে ওটাও ফাঁক কাটানো যাবে। খানাঘরের ক্রিয়া জবর রকমে সমাধা করে মনের স্ফূর্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ডবল খিল লাগাও ক্ষিতীশ-ভায়া, ছোঁড়াছুঁড়িগুলো দুয়োর ভেঙে ফেললেও চারটের আগে সাড়া দিচ্ছি নে।

হায় রে কপাল! এ বিজ্ঞান-যুগে দুয়োরে খিল দিয়ে শত্রু ঠেকানো যায় না, ঘরের মধ্যে শিয়রের পাশেও শত্রু ওত পেতে থাকে। মনোরম আমেজ এসেছে, আর অমনি ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—। হাত বাড়িয়ে ফোনের মুখ চেপে ধরবে, কিন্তু শীতের দুপুরে লেপের তলা থেকে হাত বের করা চাট্টি কথা নয়

পারেন ? আরে, আমরা কি—লড়াইয়ের তা-বড় তা-বড় যোদ্ধাও হার খেয়ে যায়।

তোমর ফোন ক্ষিতীশ, কোন গাইয়ে-বন্ধু ডাকছে—

উঁহু, ফোন আপনার—

বেশ খানিকটা ঠেলাঠেলি চলল দু-জনে। নাছোড়বান্দা ফোন বেজেই চলেছে। ক্ষিতীশ অগত্যা বেজার মুখে রিসিভার কানে তুলে নিল। পরক্ষণে বলে, কানে নিলেন না। ফোন আপনারই।

আমারই বটে! চালাকি করে সুখতন্দ্রা ভাঙলে খুনোখুনি হয়ে যেতো ক্ষিতীশের সঙ্গে। ভারতীয় দূতাবাস থেকে পরাঞ্জপে বললেন। আজ সন্ধ্যায় সময় আছে আপনার ? তাহলে যাই।

যান মশায়, আরও দুদিন এমনি বলেছেন। হা-পিত্যেশ বসে রইলাম, মশায়ের টিকি-দর্শন হল না। সামান্য কদিন আছি, যদ্দূর পারি দেখে-শুনে যাবো—তার মধ্যে দুটো সন্ধ্যের ঘণ্টা দুই আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন।

আজ নির্ঘাত রাত্তির বেলটা পুরোপুরি ফাঁক করে নিয়েছি। দেদার গল্প—কত শুনবেন ? আসছি তাহলে কিন্তু—সাড়ে-ছয় থেকে সাতের মধ্যে।

উঠতেই যখন হল, আর লেপ নয়—ওভারকোট গায়ে চাপানো থাক। ওঠো ক্ষিতীশ, বেরিয়ে পড়ি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নয়—দু-জনের দু-জোড়া পায়ের উপর নির্ভর। যেদিকে খুশি, নিয়ে চলে যাক তারা—

কিন্তু হবার জো আছে ? লনে দেখি ভারি এক দল। সুবোধ বন্দ্যো আছেন—আর ওখানকার অনেকগুলি।

কোথায় ?

চলুন না। হাঙ্গেরির একজিবিশন হচ্ছে। কর্মীদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদও দেখে আসা যাবে অমনি।

চীনা বন্ধুটি বলেন, দাঁড়ান—গাড়ির কথা বলে আসি।

আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন, পা নামক এক প্রকার অঙ্গ আছে আমাদের—আমরাও কিঞ্চিৎ হাঁটতে পারি। কিন্তু যা সতিক, অব্যবহারে যন্ত্রটাকে বিকল না করে দিয়ে আপনারা ছাড়বেন না।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। ততক্ষণে নেমে পড়েছি, দ্রুত পায়ে হাঁটছি।

কলকাতার চৌরঙ্গির মতো সুপ্রশস্ত পথ। পথের ধারে গাছপালা—ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। এক সংস্কৃতের পণ্ডিত দলে জুটেছেন। পণ্ডিত বলতে যে রকমটা আন্দাজ করেছেন, তা নয়। ছোকরা-ছোকরা চেহারা—মুখ-ভরা

হাসি। অথচ পড়ান য়্যুনিভার্সিটিতে, এবং গীতা-উপনিষদের আধাআধি তাঁর মুখাগ্রে।

পণ্ডিত এক কাণ্ড করে বসলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অনেকেই খেয়াল করে নি; আমার নজরে পড়ল। ধরণী দ্বিধা হলেন না, নির্বিঘ্নে তাই পথ হাঁটতে লাগলাম। আমাদের একজন সিগারেট খাচ্ছিলেন—গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেটের গোড়াটুকু ফেলে দিয়েছেন পথে। পণ্ডিত আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে সেই মহামূল্য বস্তু নিচু হয়ে তুলে নিলেন। হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছেন—তারপর ডাস্টবিন পেয়ে সুড়ুত করে কাছে গিয়ে তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পণ্ডিতমানুষ হলে কি হবে—জাতে চীনা! অন্যের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিতে আটকাল না। কিন্তু এ ভারি বিপদ তো! সবজ্ঞ বন্ধুরা বলে থাকেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই ওদেশে। কথাটা ঠিকই। পোড়া-সিগারেটটুকুও পথে ফেলা যায় না। স্বাধীনতা তবে আর রইল কোথায় বলুন?

তিয়েন-আন-মেনের তলা দিয়ে নিষিদ্ধ-শহরে ঢুকলাম। সেকাল হলে—ওরে বাবা, চোখ তুলে এদিকে তাকাবার কি তাকত হত! বেশ খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি উঠে এক বড় ঘর। ঘরের ভিতর দিয়ে পথ—ঘরে না ঢুকে আনাচ-কানাচ দিয়ে যে ওদিকে যাবেন, সে উপায় নেই। ঘর ছড়িয়ে উঠোন—পাথরে বাঁধানো। সারা উঠোন ভরতি দৈত্যদানোর মতো যন্ত্রপাতি। রেল-ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, মোটরকার—কোন্ বস্তু যে নেই, বলতে পারব না।

ভারতের মানুষ? আহো, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! তাই দেখলাম, বাইরের ভুবনে আমাদের বিস্তর ইজ্জত। খ্যাতির পেয়ে পেয়ে মাথা প্রায় আকাশ-ছোঁয়ার দাখিল হয়েছিল। ঐ এখন বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশে ফিরেও খাড়া মাথা আর নিচু হতে চাচ্ছে না।

উঠোনের দেখাশুনো শেষ হলে সামনের ও ডানদিকের ঘরগুলোয় নিয়ে চলল। কত রকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে রে ঐটুকু দেশ হাঙ্গেরি! হাসতে হাসতে বলে, চাই তোমাদের? তা হলে বলো। চাওয়া না-চাওয়ার মালিক যেন আমরা! হাসি থামিয়ে তারপর বলল, সত্যি, খদ্দের খুঁজছি আমরা। যে দেশের নেই, তাদের জোগান দিতে পারি।

শুধু যন্ত্রপাতি? চাষবাস ও ঘরোয়া শিল্পে কত উন্নতি করেছে—থরে থরে তার নমুনা সাজানো। সমস্ত ঘর ঘুরিয়ে তবু ছেড়ে দেবে না। তাই

কি হয় মশায়, খেয়ে যান কিছু। খাবার-দাবারও খাস-হাঙ্গেরির আমদানি—এখানকার একটি জিনিস নয়।

পাকড়াও করে নিয়ে বসাল একটা ঘরে। রকমারি মদ—ও-বস্তু আমার নয়। আচ্ছা, আরও আছে—টিনে মাংস, চকোলেট, কফি—কি বলবেন এবারে শুনি! এটা-ওটা অগত্যা মুখে ফেলে, চিত্রবিচিত্র ভারী এক-এক ক্যাটালগ বগলদাবায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবারে পশ্চিম দিকে একটু। সাইপ্রেস গাছের ঘনকুঞ্জ · মাঝখানে লাল দেয়ালের ঘর, হলদে টালির ছাত। গাছ আর এই ঘরবাড়ি প্রায় একই বয়সি—পাঁচ শ' পেরিয়েছে। দক্ষিণের গায়ে ঝিরঝিরে একটু—আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীই বলতে হবে, খাল বললে ওঁরা গোসা করবেন। সুদূর-পাহাড়ের উদ্দাম মেয়ে নিষিদ্ধ-শহরের অন্দরে এসে নিরুদ্যম নিস্তরঙ্গ ক্ষীণদেহ হয়ে গেছে। আরামে আছে অবশ্য। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো দুই তটের শুভ্র শয্যা—মার্বেলের সাতটা সাঁকো কুলবধূর সাদা শাঁখের মতো পর পর যেন হাতে পরানো। সেকালে মস্ত কাজ ছিল নদীর—আগুন-নেবানোর যাবতীয় তোড়জোড় এই বাঁধানো নদীতটে।

বাড়িটা ছিল পিতৃপুরুষের মন্দির। রাজারা এখানে অতীত মুরুব্বিদের পুজো দিতে আসতেন। রাজার রাজত্ব কৌত হয়ে গেলে তারপর আরশুলা-চামচিকেয় বাসা বেঁধেছিল। এখন ভাল করে সেরে-সুরে নতুন ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে সাংস্কৃতিক প্রাসাদ পেয়েছে। নামকরণ মাও-সে-তুংয়ের—তিনি নিজের হাতে নাম লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৫০ অব্দে। যারা খেটে খায়, তাদের নিজস্ব জায়গা। দলে দলে এসে জোটে এখানে পড়াশুনো খেলাধুলা আমোদ-স্ফূর্তি করে।

কারুকর্ম ও আসবাবপত্রের চেহারা দেখে নয়ন ফেরানো দায়। রাজরাজড়ায় বানানো বস্তু—ধরুন, একেবারে খাস এলাকা তাঁদের রাজার মূলপ্রাসাদেরই অংশবিশেষ বলা চলে। যতক্ষণ বেঁধে রয়েছে, থাকো রাজপ্রাসাদের ভিতর। মরবার পর একটু সরে এসে এখানে মন্দিরের মধ্যে জায়গা নাও। মিং আর চিং দু-দুটো রাজবংশের যাবতীয় প্রেতাত্মা ছিলেন এখানে, অদৃশ্য বায়বীয় দেহ বলেই কম জায়গায় গুঁতোগুঁতি হতে পারত না। প্রেতাত্মবর্গ বিরক্ত হয়ে এখন নিশ্চয় সরে পড়েছেন। গায়ে-খেটে-খাওয়া সামান্য লোকেরা দিন-রাতি হৈ-হল্লা করছে, হেন সংসর্গে রাজন্যেরা কি করে থাকবেন?

পুব দিকে খেলার মাঠ ; পশ্চিমের মাঠে স্টেজ—খোলা জায়গায় থিয়েটার হয়। দুটোই নতুন তৈরি। সামনের হলগুলোয় বারো মাস তিরিশ দিন একজিবিশন চলছে। জিনিসপত্র পালটাপালটি হয়, পিকিনের জিনিস বাইরে চলে গেল, বাইরের জিনিস এলো এখানে। তাই মানুষের আনাগোনা কমে না। পিছনের একটা হলে গান-বাজনা হয়, আর একটায় নাচ। সকলের পিছনে তাস-দাবা ইত্যাদি, এবং আড্ডা জমানোর জায়গা। ফুল-লতা-পাতা ও সাইপ্রেসের আলো-আঁধারি উপবনে অহরহ দেখবেন মেয়ে-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে উঠছে। খালের উপর ছোট ছোট নৌকো বেয়ে বেড়াচ্ছে ; ক্ষণে ক্ষণে নৌকো বেমালুম হয়ে যায় সাত-সাঁকোর তলায়।

ইস্কুল আছে কাছাকাছি কোথাও। ছুটি হয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। এসো গো—একটু আলাপ করি তোমাদের সঙ্গে। কি বুঝল কে জানে—জোরে হেঁটে সরে পড়বার তালে আছে। সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে পথ আটকে দাঁড়াই। হাত ধরব, তা পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। একেবারে শিশু কিনা—ভয় পাচ্ছে হয়তো আমাদের অভিনব পোশাক ও আলাদা ধরনের চেহারা দেখে। অবশেষে একটিকে ধরে একটু আদর করলাম। পোষা-হরিণের মতো মাথা চেপে রইল গায়ে। নতুন-চীনের ভাবী নাগরিক, দেখ দেখ, কেমন আমার গা লেপটে দাঁড়িয়ে আছে।

যাবার সময়টাও, ভেবেছিলাম, পায়ে হেঁটে হেলতে দুলতে যাওয়া যাবে। কিন্তু হোটেল থেকে এক ভগ্নদূত এসে হাজির হয়েছেন, দন্ত মেলে হাসছেন তিনি।

কি করে টের পেলে ভাই, আমরা এখানে ? গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছ ?

না এলে ফিরতেন কি করে ? বাস নিয়ে এসেছি, হয়ে গিয়ে থাকে তো উঠে পড়ুন।

সবাই চটে উঠলেন। কক্ষনো না। বিস্তর ঘুরবো আমরা। তোমার বাসে তুমিই চড়ে ফিরে যাও।

আমি ভেবে-চিন্তে ক্রোধ সম্বরণ করে নিই। পরাঞ্জপের সময় হয়ে এলো —ওদের সঙ্গে আমার টহল দেওয়া চলবে না। অত বড় বাসখানায় তবু যা হোক একটি চড়নদার হল—একেবারে শূন্যগর্ভে ফিরতে হল না।

সন্ধ্যায় একা হোটেল-ঘরের মধ্যে। কি করি, কি করি! বোতাম টিপে ওয়েটারকে ডেকে কফির অর্ডার দিই তো সর্বাগ্রে। আঙুর-আপেল-

চকোলেটের ছোট টেবিলটা ঘড়-ঘড় করে টেনে নিলাম পাশে। এবং তিন-চার দিনের জমে-ওঠা খবরের কাগজ।

দরজায় ঠক-ঠক। আসুন, ভিতরে চলে আসুন। আসা হল তবে সত্যি সত্যি?

কি মুসকিল—পরাঞ্জপে নয়, চক্রেশ জৈন। ব্রজরাজ কিশোর কিছু সওদা করতে দিয়েছিলেন বুঝি মেয়েটার কাছে···একগাদা জিনিস নিয়ে এসেছে। তড়বড় করে এক নিশ্বাসে বলে, নেই বুঝি তিনি? এগুলো তাঁর খাটের উপর রেখে যাচ্ছি। বলবেন।

আমাকেও তো কেনাকাটা করে দেবে বলেছিলে—

দেবো দেবো। কথা বলতে পারছি নে এখন। এগুলো রইল। আবার আসব আমি। কেমন?

এই গতিক মেয়েটির। জমিয়ে বসল তো উঠবার নাম নাই। নয় তো ঝড়ের বেগে উড়ে উড়ে বেড়াবে এমনি। কফি এসে পড়েছে চুমুকে চুমুকে তা-ও এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। সাতটা বেজে যায়, আজকেও তো আসার গতিক দেখিনে। চাই যে আমার পরাঞ্জপেকে। কুয়োমিনটাং পিঠটান দিল, পাঁচতারার নিশান উড়ল এই পিকিন শহরে—সমস্ত তাঁর চোখের উপর ঘটেছে। সেই সব গল্প শুনতে চাই তাঁর নিজ মুখ থেকে।

এলেন পরাঞ্জপে শেষ পর্যন্ত। নানান কাজে দেরি হল। কিন্তু এখানে নয়—এ জায়গায় হবে না। আমার বাড়ি চলুন।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল!

খাওয়াটা আমার সঙ্গে হবে। সে অবশ্য না খেয়ে থাকারই সামিল। এদের রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে পাল্লা দেবো কেমন করে?

রাস্তার উপরে এসেছি দু-জনে। পরাঞ্জপের সাইকেল আছে, সাইকেলে যাবেন উনি। হাত নাড়তে সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়াল আমার জন্য। মানুষ-টানা রিক্সা এখন বাতিল। একটু কথা হল রিক্সাওয়ালা ও পরাঞ্জপের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, কত নেবে?

দু হাজার ইয়ুয়ান—

অর্থাৎ আমাদের প্রায় সাত আনা?

পরাঞ্জপে হেসে বলেন, কারেন্সির জটিলতা আপনি আপনি বেশ সড়গড় করে নিয়েছেন দেখছি—

কিন্তু দরাদরি করতে হল—এই যে ওরা দেমাক করে, সব জিনিসের বাঁধাদর।

পরাঞ্জপে বললেন, রিক্সার বেলা চলে না। কোথায় কোন্ অলিগলিতে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, হিসেব করে তার দর বাঁধা চলে না। কিন্তু বেশি চায় না এরা। চেয়েছিল আড়াই হাজার। পথ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে নিজেই দু-হাজারে নেমে এলো।

এখানকার রিক্সায় এক জনের বসবার জায়গা। রিক্সা যাচ্ছে, সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে চলেছেন আমার পাশে পাশে।

ডায়েরিতে লেখা আছে দেখছি, 'স্মরণীয় রাত্রি!' তার এই শুরু হয়ে গেল। পরাঞ্জপে না হলে রিক্সা চড়ে পিকিনের অচেনা গলিঘুঁজি দিয়ে যাওয়া হত না কখনো। পরাঞ্জপের পাশাপাশি এই রকমারি গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া।

গলিপথও ঝরঝরে পরিষ্কার। কে যেন একটু আগে ঝাঁটপাট দিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে। তিনটে বছর আগেও, কি আর বলব, বিদেশি মানুষ এমনি রিক্সা করে যাচ্ছেন—ভিখারির দল পঙ্গপালের মতো ছুটত পিছু পিছু। এখন একটা ভিখারি খুঁজে বের করুন দিকি! এই রিক্সাওয়ালারাই কি কাণ্ড করত লোকের সঙ্গে! টানাটানি, মারামারি, একরকম বলে গাড়িতে তুলে শেষটা অন্য রকম কথা—বিশেষ করে বাইরের লোক হলে তো কোন রক্ষে ছিল না।

আজকের চীনে ভিখারি নেই, পতিতা নেই। হাজার হাজার বছরের সামাজিক পাপ নাকি ঘটা পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সাফ-সাফাই। আরব্য উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু আজকে থাক, সে গল্প আর একদিন।

মুক্তি-সৈন্য ঘিরে ধরেছে পিকিন শহরকে। নানান দলে ভাগ হয়ে তারা আসছে। এসে পড়ল বলে। পাঁচ-সাত-দশ দিন বড় জোর—তার ওদিকে কিছুতে নয়। মানুষ কিন্তু তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না—ওদের হল বওয়া ঘাড়, এমন বিস্তর দেখা আছে। এই সেদিন অবধি গোটা চীনের তিন ভাগের এক ভাগ জাপান দখল করে বসে ছিল। পিকিন শহরটাই কতবার হাতফেরতা হয়েছে, বিবেচনা করুন। লড়াইয়ে হেরে জাপানিরা সরে পড়ল তো কুয়োমিনটাং প্রভুরা আবার গদিয়ান হলেন। এঁরাই বা কি রামরাজত্বে রেখেছেন গো! এর উপর কমিউনিস্টরা এসে কি করে দেখা যাক। ঘা খেয়ে খেয়ে এমনি দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছিল সকলের মধ্যে। চিয়াঙের সৈন্য

মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। লড়াই করে না তারা, লড়াই করবার কারণ খুঁজে পায় না। বাইরে থেকে ভারে ভারে হাতিয়ার ও রসদপত্র আসছে... ---খবরাখবর নেয়, কবে এসে পৌছবে সেগুলো। তার পরে ষোলআনা রণসাজে সজ্জিত হয়ে টুক করে উল্টো দলে ভিড়ে যায়। চিয়াঙের হাতিয়ার-পত্র চিয়াঙেরই দিকে তাক করে। সাধারণে রসিয়ে রসিয়ে এই সমস্ত গল্প করে, ভারি যেন এক মজার ব্যাপার! পথে ঘাটে লোক-চলাচল বেশ আছে —দোকানিরা একটু দেখেশুনে দোকান খোলে, এই যা। আর এক অসুবিধা —বাইরের জিনিস খুব কম আসছে শহরে। বাজারে তরিতরকারি মিলছে না। কয়লারও বড় টানাটানি।

পরাঞ্জপে যেমন-যেমন বললেন—তাই লিখছি। আরও একজন ছিলেন— অধ্যাপক উ সিয়ো-সিনিকা। তিনিও নিমন্ত্রিত—এক সঙ্গে খানাপিনা হবে, পরাঞ্জপের বাড়ি আগেভাগে এসে বসে ছিলেন তিনি আমার জন্য। শান্তিনিকেতনে ছিলেন এক সময়ে—হাস্যমুখ আনন্দময় মূর্তি। এঁর স্ত্রী উত্তম বাংলা জানেন—শান্তিনিকেতনে থাকার সময় নাম পেয়েছিলেন পার্বতী দেবী।

মুক্তি-সেনারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওয় বলছে, আত্মসমর্পণ করো চিয়াঙের দল, প্রাচীন মহিমময় পিকিন বোমা ফেলব না আমরা ওখানে, একটি ইটের টুকরো নষ্ট হতে দেবো না। আপোসে অস্ত্র ফেলে দাও নগররক্ষীরা।

নাগরিকদের অভয় দিচ্ছে, তোমাদের সেবক আমরা। কোন ভয় নেই। কুয়োমিনটাং নিন্দেমন্দ ছড়াচ্ছে—কান দিও না ও-সমস্ত বাজে কথায়।

পালানোর হিড়িক বড়লোকদের মধ্যে। কর্তাদের পেয়ারের মানুষ জীবন ও টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়তে পারলে হয়। এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে—দমদম যেমন আমাদের কলকাতা থেকে। বড়-রাস্তায় সেই সময়টা দিন-রাত দেখতে পেতেন, মোটরের পর মোটর ঊর্ধ্বশ্বাসে এরোড্রোমে ছুটছে। প্লেন হরবখত আসছে যাচ্ছে, আকাশে অবিরত আওয়াজ।

এরই মধ্যে শোনা গেল, এরোড্রাম থেকে বেশি দূরে আর নেই মুক্তিবাহিনী। সে কি কাণ্ড! যারা তখনো পালাতে পারে নি, তারা একেবারে খেপে উঠল। প্লেনের এক-একটা সিটের অবিশ্বাস্য রকম দর—বিদেশি কোম্পানিগুলো দু-হাতে টাকা লুঠছে এই মওকায়। বড় বড় ইমারত শ্মশানভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে, শৌখিন জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি এখানে-সেখানে।

অধ্যাপক উ হাসতে হাসতে বললেন, আমার ভারি মজা সেই সময়টা।

দুষ্প্রাপ্য বই অনেকগুলোর কেবল নামই শুনেছিলাম, চোখে দেখবার ভাগ্য হয়নি—জলের দরে বিকোচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে অধ্যাপক বই কিনে বেড়াচ্ছেন। পাঁচ-সাতটা দিনের মধ্যে বিশাল এক লাইব্রেরি। তারই মধ্যে ইদানীং ডুবে থাকেন। ভাগ্যিস গোল-মালটা ঘটেছিল, নইলে সারা জীবন চুঁড়েও তো এমন সব বস্তুর নাগাল পেতেন না।

শেষটা শহরের ভিতরে, ঐ পিকিন হেটেলেরই কাছাকাছি, মাঠের উপরে প্লেন উঠানামা করছে। উপায় কি—যা হবার হোক, এরোড্রোম অবধি যাওয়া কোন মতে সাহস করা যায় না। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙিন হল—আলো আর কলের জল বন্ধ। কষ্ট কী লোকের! জ্বালানি নেই—কুয়োর জল তুলে রান্না-খাওয়া। কেরোসিন যৎসামান্য মেলে—সন্ধ্যা হতেই চতুর্দিক অন্ধকার। অথচ পাওয়ার-হাউস কিম্বা ওয়াটার-ওয়ার্কসের ত্রিসীমানায় আসেনি তারা তখনো। গোলমাল বুঝে বড়বাবুরা সরে পড়েছেন, দেখাদেখি মেজো-ছোট সকলেই। যন্ত্রপাতিও বিগড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওরা এসে সহজে আবার চালু করতে না পারে।

মুক্তিসৈন্য তারপর এসে পড়ল ঐ দুই ঘাঁটিতে। সেই সন্ধ্যায় শহরময় আলো জ্বলে উঠল। পরের দিন সকালে কলের মুখে জল। রেডিও বলছে, আলো-জল পেয়ে কুয়োমিনটাঙের সুবিধা হল। কিন্তু তোমরা যে কষ্ট পাচ্ছ —তোমাদের লোক আমরা। কয়শালা না হতেই আগে-ভাগে তাই আলো-জল দিয়ে দিচ্ছি।

আর কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, রাখতে পারবে না পিকিন; হাতিয়ার ফেলে মিটমাট করো এসে। তিনজিন বন্দরটাও দখল করে নিয়েছে, খবর এসে গেল। পিকিন শহর থেকে সমুদ্রে বেরুবার ঐ পথ। কি হে, এখনো আশা রাখো শহর ঠেকাবার? বাইরে বেরুনো বন্ধ—এবারের যে খাঁচার ইঁদুরে মতো মরবে তিল-তিল করে।

আর ভরসা নেই—কুয়োমিনটাং-সেনাপতি অতএব আত্মসমর্পণ করল। যতই হোক, শাসনকর্মটা বোঝে কুয়োমিনটাং—এরা কতকাল ধরে খালি লড়াই করে এসেছে, দুঃখকষ্ট সয়ে নিজেদের কথা প্রচার করে বেড়িয়েছে মানুষজনের মধ্যে। ঠিক হল, আপাতত এক মাস চলবে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের এজমালি শাসন-ব্যবস্থা। কাজকর্ম রপ্ত করে নিয়ে তার পরে এরা পুরোপুরি ভার নেবে। কিন্তু তার আর দরকার হয় নি। কুয়োমিনটাঙের মানুষগুলোই শেষ অবধি

এদের দলে ফিরে গেল। দেশ-গঠনে আজকে তারা তিলেক পরিমাণ খাটো নয় কারো চেয়ে। শান্তি-শৃঙ্খলায় দিব্যি কাজকর্ম চলে আসছে—শত্রুরা যত জগঝম্পই পেটাক, হাঙ্গামা বা রক্তপাত হয়নি কোনদিন, পিকিন শহরের কোথাও।

পকৌড়ি এলো প্লেটে। আর বাসনে-ভাজা আলুর টুকরো। হাতে-গরম—ফুরোচ্ছে, আবার এনে এনে দিচ্ছে। কতদিন পরে স্বদেশি বস্তু জিভে পড়ল! এদের খাদ্য খেয়ে মুখ পচে আছে। এনে দিচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেট খালি। পাচকটি জাতে চীনা—কিন্তু ভেজেছে ঠিক আমাদের মেয়ের মতন। পরাঞ্জপে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। লোকটা পরিবেশন করছে, এঁটো বাসন সরিয়ে নিচ্ছে—পরনে কিন্তু সাদা পাট-ভাঙা ধবধবে পোশাক, হাতে ঘড়ি।

তেলে-ভাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার গল্প জমে উঠল। ঐ আসে—ঐ আসে—সেই আমলের সব গল্প। আসছে মুক্তিসৈন্য—দেরি নেই, এসে পড়ল বলে—এসে গেছে অত্যন্ত কাছাকাছি, পিকিনের দশ-বারো মাইলের ভিতর।

কয়লার ভারি কষ্ট—সোনা হেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে; খাবার এক বেলা না হলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু হাড় কাঁপানো শীতে আগুন বিহনে প্রাণ টেকে না। কুয়োমিনটাং তুড়দাড় পালাচ্ছে 'চাচা আপন বাঁচা'—এই মহানীতি অনুসরণ করে। যাবার মুখে বজ্জাতি ভোলেনি। জুত পেলেই রেল-লাইন ভাঙছে, খনি ভরাট করে দিয়ে যাচ্ছে কাদামাটি ও আবর্জনায়। খনিগুলো আগে তো সাফসাফাই করো, কয়লা তুলো তারপর; রেললাইন ঠিকঠাক করে তবে কয়লা-চালানের কথা! কয়লার কড়া রেশন—অল্পসল্প যা মজুত আছে, তাতেই চালিয়ে নিতে হবে সকলের।

নানান রকম রটনা—কমিউনিস্টরা এ করেছ, তা করছে। যাঁরা বলছেন, প্রত্যক্ষদর্শী নন যদিচ, তবু প্রায় সে নিজ চোখে দেখার সামিল। মাসতুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ পিসশ্বশুর—তিনি তো আর মিথ্যে বলবার মানুষ নন। এমনি সব চলছে মুখে মুখে।

তা হলেও—লোকে যে খুব বেশি গা করছে, তা নয়। এক সাবান-কারখানা। কারখানার বড়-দরজার খিল এঁটে দিয়ে ভিতরে অল্পসল্প কাজ চলছে। সৈন্যদের গতিক ভাল করে না বোঝা অবধি মানুষজন পথে বেরুবে না।

দরজা বন্ধ তো দেয়াল টপকে দুটি সৈন্য কারখানার উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। ফটক খুলে দিল তারা। সর্বনাশ করেছে—মার-কাট লাগায় বুঝি বাইরের দলবল জুটিয়ে এনে! এত দূর করল না—লোভ অধিক-কিছু নয়। টব ভরতি কয়লা ছিল উঠানে—দু-জনে ধরাধরি করে কয়লার টব বের করে নিয়ে গেল। যাকগে, যাকগে—কী আর হবে! নতুন জায়গার এই বাঘাশীতে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে? তবু যা হোক, কয়লার উপর দিয়ে গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কারখানায় লোকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল আবার।

সন্ধ্যাবেলা এই ব্যাপার—পরের দিন ভোর না হতে আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। ফাঁড়া কাটবে এত সহজে? কাল দু-জনে দেখে-শুনে গেছে, পুরো দল এসেছে আজকে। লোকগুলো নিঃশব্দে—মড়ার মতো হয়ে আছে। ঝাঁকানি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ—দুয়োর ভেঙে ফেলে বুঝি! কানিশ বেয়ে উঠে একজনে বাইরে উঁকি দিল; আরে সর্বনাশ—সৈন্যদের প্রভুস্থানীয় একজন দোরগোড়ায়। সাধারণ ফৌজ এসেছিল কাল, তাই চাট্টি কয়লার উপর দিয়ে গেছে। খোদ ফৌজদার মশায়ের শুভাগমনে আজ কারখানার ধুলোবালি অবধি লুঠ হয়ে যাবে। কপালে যাইই থাক, রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না তো বিজয়ী প্রভুকে! দন্তে কিঞ্চিৎ হাসির ছটা বিকিরণ করে আনন্দ-আহ্বান জানাতে হয়, আসতে আজ্ঞা হোক—কি ভাগ্যি আজকে আমাদের!

দরজা খুলে কিন্তু তাজ্জব; কালকের সে দুটিও আছে পিছনে—কয়লার টব পুনশ্চ বহন করে নিয়ে এসেছে। ফৌজদার বললেন, লজ্জার অবধি নেই—নিজে আমি তাই মাপ চাইতে এসেছি। কয়লা ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বিচার হবে এদের—কি শাস্তি হল, যথাসময়ে আপনারা জানতে পাবেন।

আর ঐ যে বললাম, তিনজিন বন্দর দখলে এসে গেছে—সেই তিনজিনেরই এক ব্যাপার। সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম—জিনিসপত্র কিনে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাম দেবে; যে সব বাড়িতে থাকবে, নির্গোলে তার ভাড়া চুকিয়ে দেবে। জনগণের ভাল করতে এসেছি—এইটে যেন সবসময় সকলে বোঝে।

জনকয়েক এক বাড়িতে এসে উঠল। হোটেল ছিল আগে সেখানে। তার পরে যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কম্যাণ্ডার বাড়িওয়ালাকে ডাকলেন, দেখে নিন মশায়, আপনার জিনিসপত্রের সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিনা।

ফর্দ হাতে মালিক জিনিসপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে। সব ঠিক আছে—একটা মগ শুধু কম পড়ছে। আবার গুনে দেখে, তাই বটে!

যাক গে কতই বা দাম!

কিন্তু শুনবে না কম্যাণ্ডার। সৈন্যদের লাইনবন্দি দাঁর করিয়ে হ্যাভার-স্যাক তল্লাসি হচ্ছে। সেই মগ পাওয়া গেল একজনের কাছে! কোন কথা নয়—বন্দুক তুলে দুম করে সোজা তাকে গুলি!

এমনিতরো ব্যাপার। মানুষের মনোহরণ করেছে এমনি গোড়া থেকেই। ভারি চালাক—কি বলেন? সকল দেশের প্রভুগণ এবম্বিধ চালাকি শিখে নিন এই কামনা করি। সৈন্যরা ওখানে উপরওয়ালা নয়—জনসেবক। গটমট মার্চ করে পৌছল ধরুন এক গ্রামে। পৌছেই পোশাক-আশাক খুলে ফেলে দশ জনের একজন। সকালবেলা হয়তো বা দেখছেন; জলকাদার মধ্যে চাষাভূষোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধান কাটছে। কিম্বা কোদাল মেরে রাস্তা বাঁধছে মজুরদের সঙ্গে। শখের ব্যাপার নয়—গাঁয়ে যতক্ষণ আছে, করতেই হবে গাঁয়ের কাজকর্ম। এই হল বিধি। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার—পুনশ্চ ঐ টুপি-পোশাক না পরা অবধি আলাদা করে ধরবার জো নেই।

বৌদ্ধমন্দিরে সেদিন দেখলাম, ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। এলাহি ব্যাপার—টাকার শ্রাদ্ধ। কথাটা মনের ভিতর আনাগোনা করছিল, অধ্যাপক মশায়কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, নানান দিকে এত জরুরি কাজ আপনাদের—তার মধ্যে মন্দির-মেরামতের শখ আসছে কিসে?

অধ্যাপক হেসে বললেন, জরুরি এটাও—

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কম্যুনিস্ট দেশ—ধর্মের সঙ্গে লড়াই ওদের, মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভেঙে ভূমি চৌরস করে ফেলছে, এই তো শুনে আসছি বরাবর।

কুয়োমিনটাংদের তাড়াল বটে কম্যুনিস্টরা একাই, তারপরে ডেকেডুকে সকলকে একত্র করে শাসন-ভার নিল। শাসন-ব্যবস্থার নাম নতুন-গণতন্ত্র। কাগজপত্র মেনে নিচ্ছে না, দেশটা কম্যুনিস্ট। সে যাই হোক—প্রতিপক্ষরূপে ভাল ভাল লড়নেওয়ালারা রয়েছে; কোন দুঃখে তবে নিরীহ নির্বিরোধ ধর্ম-ধ্বজীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে?

আজ্ঞে হাঁ, ধর্মের সম্বন্ধে মতিগতি ওদের ঐ প্রকার। অধ্যাপক উ'র সঙ্গে বিস্তর ধর্মালোচনা হল—ধর্মের তত্ত্ব নয়, তথ্য। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে এসেছি—বিজ্ঞানের গুঁতো খেয়ে ধর্ম কি জোরদার আছে এখন? ধুঁকছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া শক্তির অপব্যয়। এই এক মোক্ষম নীতি মশায় জেনে রাখুন, ধর্ম ও ধার্মিকদের সোয়াস্তিতে থাকতে দিতে হয়।

ধর্ম নিয়ে পায়তারা কষতে গেলে হরেক সমস্যা অহেতুক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সত্যিই অনেক কাজ আমাদের এখন—ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই ?

চীনা জাতটা চিরকালই অধিক পরিমাণে ঐহিক। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেনি কখনো। আজকের দিনেও নানান ধর্ম রয়েছে পাশাপাশি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নামটাই শুধু। কনফুসিয়ানরা গুনতিতে সকলের চেয়ে বেশি। বৌদ্ধও বিস্তর আছেন। আছেন তাউ—সাধুসন্ত উদাসীন সম্প্রদায়। মুসলমানরা সংখ্যায় কম—কিন্তু নিষ্ঠা ওঁদেরই সকলের চেয়ে বেশি; মসজিদে নমাজ পড়েন, নীতিনিয়ম মানেন; তাঁরা সংঘবদ্ধও বটে—এক এক অঞ্চল নিয়ে বসতি। উত্তরপূর্ব দিকে এক-একটা জায়গার লোক আগাগোড়া মুসলমান। কিন্তু নাম শুনে মালুম পাবেন না—খাঁটি চীনা নাম, আরবি-পারসির গন্ধমাত্র নেই। চেহারা এবং পোশাকেও পুরো চীনা। সভাশোভনের সময়টা সাদা টুপি পরেন, এইমাত্র দেখছি। আর নাম করতে হয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের—তাঁরাও ধর্ম-কর্ম করে থাকেন। অন্য সবাই—এই আপনি আমি যে পরিমাণ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই।

মজা হল একদিন। ভুলে যাব, এইখানে বলে রাখি। ডাক্তার ফরিদিকে জানেন—লক্ষ্ণৌয়ের সেই যে জাঁদরেল ডাক্তার। সম্মেলনে আমার ডানদিকে যিনি বসতেন গো—নীচু গলায় গল্পগুজব হত। একদিন ধরে ফেললাম, আপনি পিকিন-মসজিদে গিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব—

ডাক্তার অবাক হয়ে যান, কে বলল ?

আপনি, পাকিস্তানের ওঁরা, নানান দেশের আরও অনেকে, এবং এখানকার মোল্লা-মৌলবিরা একসঙ্গে নমাজ পড়ে এসেছেন। কাগজে ফলাও করে দিয়েছে।

বটে, কোন কাগজে বেরিয়েছে বলুন তো? দেবেন মশায় কাগজখানা আমাকে; যত্ন করে দেশে নিয়ে যাবো। বাড়িতে কেউ মানতে চায় না আমি নমাজ পড়তে পারি—এবং পড়ে থাকি কখনো-সখনো। কাগজ মেলে অবিশ্বাসীদের মুখের উপর ধরব······

চীনা কর্তারা বলেন, যার যেমন খুশি ধর্ম-কর্ম করুকগে; ইচ্ছে না হলে তো করবে না। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—স্টেটের কোন মাথাব্যথা নেই এ সম্বন্ধে। ধর্ম এ যুগে কোন জাতকে বাঁচিয়ে রাখবে না—ধর্মোন্মাদনা স্বাভাবিক ভাবেই মারা পড়বে, এই ওরা সার বুঝে নিয়েছে। মুসলমান দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, হাসিখুশিই দেখলাম তাঁদের। মসজিদ গড়বার কথা

সরকারকে জানালে এক কথায় জমি পেয়ে যাই ; কোন রকম ঝামেলা নেই। শুধু মুসলমান বলে নয়—চার্চের পাদরিও হাত পেতে কখনো নিরাশ হয়ে ফেরেননি। মন্দির-প্যাগোডা যে আবার ঝকঝকে করে তুলছে—ওসব হল ওদের প্রাচীন পুরুষদের কীর্তি, অতি-বড় গর্বের ধন ; সে বস্তু নষ্ট হতে দেবে না দিন পেয়েছে যখন, মন্দিরের উঠোনের টালিখানা অবধি অবিকল সেকালের মতো করে বসাবে।

খাওয়া-দাওয়া চুকল। দেশি পদও ছিল কখানা—পুরি, আলুর দম ইত্যাদি। খেয়েদেয়ে ফের জমিয়ে বসেছি।

শিক্ষার কি অবস্থা এখানে ? ছেলেপুলে ইস্কুলে পাঠাতে হবে, আইন আছে নাকি এ রকম ?

আইন-টাইন নেই। গোটা দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ, তার সিকি ধরুন এ- একটা দেশে। পেটের বাছা কতগুলি অতএব আন্দাজ করে নিন। আইন করে সবসুদ্ধ এনে জোটালে তো হবে না—তার জন্য চাই বাড়ি বইপত্তোর পণ্ডিত-মাস্টার। বাচ্চা পড়াতে পারেন—এমনি পাকা মাস্টারেরই বেশি অকুলান। লেখাপড়াটা আগে ভদ্রলোকের একচেটিয়া ছিল—চাষাভূষো মুটে-মজুর কিংবা মেয়েলোকের জন্য ও বস্তু নয়। ইস্কুলের দায়ঝক্কি কুলানো সাধ্যের বাইরে ছিল সাধারণের। এই সেদিন অবধি শতকরা আশি জনের উপর নাম সই করতে পারত না।

কিন্তু তিন বছরে যা গতিক দাঁড়িয়েছে, শিক্ষা বাবদে আইনে বাঁধাবাঁধি কোনদিন দরকার হবে না। বাপ-মায়েরা ছেলেপুলেদের আপোসে ইস্কুলে দিয়ে দিচ্ছে। কেন দেবে না বলুন! একপয়সা মাইনে লাগে না ; বই-খাতা-কমলও দিয়ে দেয় ইস্কুল থেকে। গার্জেন গরিবানা জানিয়ে যদি দরখাস্ত করে, খাওয়ার ব্যবস্থাও মুফতে হয়ে যায়। এর পরে কোন্ আহম্মক তবে ছেলেপুলে ঘরে আটকে রাখবে ? এক সংসারে, ধরুন, বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা—দিনরাত কুরুক্ষেত্তোর। নিখরচায় ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা হবে—অন্তত এই বাবদেও বাপ-মায়েরা টুঁটি ধরে ওগুলোকে ইস্কুলে দিয়ে আসবেন। আরও আছে। অবস্থা আজকে এমন হয়ে উঠেছে, ছেলে-মেয়ে পাঠশালায় না পাঠালে বাপ-মা নিচু হয়ে যান দশ জনের চোখে। দেখ, দেখ, অমুকের ছেলে বাড়ি বসে বসে বখামি করে। যেন বিষম এক সামাজিক পাপ!

শুধু ছেলেপুলে বলি কেন, বুড়োরাও ক্ষেপে গেছে। বই পড়া শিখতে হবে,

হাতের লেখা লিখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ঘরবাড়ি মিলল না তো লাগিয়ে দাও বাড়ির রোয়াকের উপর, কি মন্দিরের চাতালে কিংবা গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে সময় না হল তো রাত দুপুরে। শহরে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি কত অধ্যবসায় আমাদের চোখে পড়েছে। চীনালিপি রপ্ত করা—সে যে কি কাণ্ড, আপনারা জানেন। ওখানকার ভাষাতাত্ত্বিকেরা আদা-জল খেয়ে লেগেছেন সহজ রাস্তা বের করবার জন্যে। তাঁদের কাজ তারা করতে থাকুন —গাঁয়ে গাঁয়ে ওদিকে দেখতে পাবেন, গাছের ডালে পিচবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে, তাতে সেই অক্ষরটা—যার মানে হল 'গাছ,' গোরুর পিঠে ঐ রকম 'গোরু' অক্ষরে সেটে দিয়েছে। পুকুরের ধারে সাইনবোর্ড তুলেছে—তাতে লেখা 'পুকুর'-অক্ষর। দেখে দেখেই কত অক্ষর শিখে ফেলছে এমন। আহা, কত সর্বনাশ হয়ে গেছে এই লেখাপড়া না জানার দরুন! খানিকটা হিজিবিজি লেখার নিচে সরল মনে টিপসই দিয়েছে—তারপর টের পেলো ক্ষেতখামার সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে মহাজনকে। মেয়ের ফ্যাক্টরিতে চাকরি হবে—আনন্দে মা দরখাস্তের উপর টিপসই দিল। তারপর জানা গেল, টিপসইর জোরে মেয়েকে নিয়ে তুলেছে পতিতাবাসে।

বারো বছর বয়সে প্রাইমারি পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা ঢুকবে জুনিয়ার মিডল ইস্কুলে। তারপরে সিনিয়ার মিডল ইস্কুলে। বই মুখস্থ নয়। খাবে পরবে, আর দেশব্যাপ্ত পরিগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্ব-শক্তিতে—সেই সমস্ত তালিম দেওয়া হয় ঐ তখন থেকেই। বৃত্তির কাজে উৎসাহ দেয় বেশি। বিস্তর কর্মী চাই, যত সব ছেলেমেয়ে ধেয়ে যাও সেই দিকে। আঠারো বছর অবধি এদিককার পড়াশুনোর পর য়্যুনিভার্সিটি। তারপরেও আছে—দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা। এসব অতি-মেধাবীদের জন্য, সংখ্যায় তারা কম। সাধারণ ছেলেমেয়েরা উচ্চ বিদ্যার্জনে প্রাণপাত করবে, এটা ওরা চায় না। উপরদিককার ছাত্রের এদিক-ওদিক খরচপত্র আছে বটে, কিন্তু একটু এলেম দেখাতে পারলেই স্কলারশিপ। স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ-খরচা চালানো শুধু নয়, উপরি দু-চার পয়সা বাড়িতেও পাঠাতে পারো।

তাই বেরুমলের একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্বদেশীয় বেরুমল —মারিশন স্ট্রিটের সিল্কের ব্যাপারি। ব্যাপার-বাণিজ্যে সে-কালের মতো জুত নেই, ভদ্রলোক সেই জন্য নতুন গবর্নমেন্টের উপর খাপ্পা। মুখ ফুটে তেমন কিছু না বললেও—দেশোয়ালি মানুষ তো—ভাবে-ভঙ্গিতে মালুম পাই। এক-দিন তোড়ের মুখে উষ্মা ও বেদনা ভরে বলে ফেললেন, আরে মশায়, চিয়াং

কাইশেকের সাধ্যি আছে আর এখানে ঘাঁটি গাড়বার? বিষম চালাক এরা—একেবারে গোড়া ধরে বন্দোবস্ত। যত পড়ুয়া ছেলেমেয়ে দেখতে পান, সবাই নতুন সরকারের নামে পাগল—সবাই নতুন ভাবের ভাবুক। বাচ্চা বয়স থেকে গড়ে-পিটে তুলছে। তোয়াজ কত ছেলেমেয়েদের—ডাইনে-বাঁয়ে স্কলারশিপ ছড়ানো, দয়া করে তুলে নিলেই হল। পড়া শেষ হতে না হতেই কাজ চুকিয়ে আছে। এখন তো এই দেখছেন—আর এই সব ছেলেমেয়ে যখন মুরুব্বি হয়ে উঠবে, সেই ভাবী আমলের আন্দাজ নিন দেখি। তাই তো বলি, তামাম দুনিয়া জোটপাট করে চিয়াংকে যদি আবার গদিতে বসিয়ে দেয়, একটা বেলাও সে এখানে টিকতে পারবে না।

চীনের দক্ষিণ ভাগটি সকলের পরে এসে মিশেছে। সে অঞ্চলে যদিই বা দু-পাঁচ জন থাকে, আর কোথাও বেকারের নাম-গন্ধ নেই। বরঞ্চ লোকের জন্যই মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি। দেশ গড়ে তোলবার জন্য হাজার দিকে হাজার রকমের কাজ—পোক্ত লোকের অভাবে রামা-শ্যামাকে দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজ জানা লোক লাখে লাখে এখন দরকার।

(পরাঞ্জপের বাড়ি ছেড়ে মাঝে একটু এখানকার কথা বলে নিই। চীন থেকে সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন। পশ্চিম-বাংলার এক কর্তাব্যক্তি ডেলিগেশনের দলপতিকে শুধালেন, কি আশ্চর্য—এত শিক্ষা ছড়াচ্ছেন, বেকার বাড়ছে না তবু আপনাদের দেশে? আমরা যে মরে গেলাম মশায়—যত উৎপাতের মূল কাজ-না-পাওয়া বেকার ছোকরাগুলো। দলপতি জবাব দিলেন, শিক্ষা আমরা এলোমেলো ছড়াই নে, রীতিমত তার হিসাব আছে। কি রকম শিক্ষায় শিক্ষিত কত জন কারিগর লাগবে, সব কারখানা তার ফিরিস্তি দিয়েছে; জানা আছে, কত ডাক্তার কত মাস্টার কি ধরনের কত কেরানি চাই। আগামী চার-পাঁচ বছর দেশের কোনখানে কোন গুণের কি রকম কর্মী কত সংখ্যায় লাগবে, সমস্ত ছকে ফেলা হয়েছে মোটামুটি। শিক্ষালয়গুলো সেই হিসাবে ছাত্র নেয়। তাই একটা বিষয়ে পাশ করে দশ-বিশ হাজার বেকার বসে রইল, আর একটা বিষয়ে মোটে গুণীলোক পাওয়া যাচ্ছে না—এমনটা হতে পারে না। কথাগুলো ডেলিগেশন-দলপতির স্বমুখ থেকে শুনেছি)

গল্পের পর গল্প। হাতে ঘড়ি-বাঁধা, কিন্তু ফুরসত কোথা ঘড়ি তাকিয়ে দেখবার? অধ্যাপক হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়ালেন, আর নয়—খাওয়া যাক এবার।

সর্বনাশ; বারোটা বেজে গেছে যে। পরাঞ্জপে সেই রাঁধুনি লোকটাকে কি

বলে দিলেন। রিক্সা এসে পড়ল। আমায় বললেন, আপনার হোটেলে পৌঁছে দেবে। সমস্ত বাতলে দেওয়া আছে, কিছু আপনাকে বলতে হবে না।

যেন চীনা ভাষায় ওস্তাদ ব্যক্তি আমি, মনে করলেই গড়গড় করে পথঘাট বুঝিয়ে দিতে পারব। নমস্কার করে রিক্সায় উঠে বসলাম।

রাত্রির এই কয়েক ঘণ্টা আমার মনের উপর দাগ কেটে রয়েছে। সে কি জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ফিনকি ফুটেছে! আঁকাবাঁকা অতি সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে চলেছে। আমাদের মোটরগাড়ি বড়, নিতান্ত-পক্ষে মেজো, রাস্তাগুলোয় বিচরণ করে। পর্যাপ্তপের উদ্যোগ না হলে পিকিনের গলিঘুঁজি অঞ্চল এমনি ভাবে দেখা হত না। জায়গায় জায়গায় এমন সরু যে রিক্সার পাশে একটা মানুষের যাবার পথও থাকে না।

নিষুপ্ত শহর। কদাচিৎ একটা দুটো মানুষ অতিক্রম করে যাচ্ছে আমাকে। তারপরে দেখি, একটা রোয়াক মতো জায়গায় জন পাঁচ সাত ষণ্ডামার্কা মানুষ গুলতানি করছে। রাত দুপুরে কলকাতা শহরেও অমন দেখতে পাবেন। মানুষগুলো হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বিদেশি লোক একা একা রিক্সা চেপে চলেছে, কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ছোটবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়তাম (সবাই পড়ে আপনারাও পড়তেন কিনা যথাধর্ম বলুন)। যত লোমহর্ষক খুন-ডাকাতি-রাহাজানি—দেখা যায়, চীনে বোম্বেটেরাই করছে। অভিভাবকের চটিজুতা ফটফট করে ওঠে—ডাকাত-বোম্বেটেরা সঙ্গে সঙ্গে অমনি জ্যামিতির তলায়। এবং প্রবল চিৎকার—ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হইলে···। চটিজুতা অতএব নিঃসংশয় হয়েছেন, ছেলেটা অতিশয় সাচ্চা। ফটফট আওয়াজে খুশি জ্ঞাপন করে চটি ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে চললেন দাবার আড্ডায়। জ্যামিতির ঢাকা সরিয়ে বোম্বেটের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। সে স্মৃতি আজও ঝিকমিক করছে। কি সব সাংঘাতিক গল্প! কি আশ্চর্য বেপরোয়া কল্পনা! নিজে এখন গল্প লিখতে লজ্জায় মরি। সাধ্য আছে অমন গল্প রচনার? কারা পড়ে আমাদের এই সব ঘরব্যাভারি জোলো কাহিনী—কেন পড়ে তা-ও জানি না।

চীনের মানুষ, সেই তখন জেনেছিলাম। যেমন গোঁয়ার, তেমনি নৃশংস। ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম মানে না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেয়াড়া জায়গা তবে চীন! বইয়ের মধ্যে ছবিও থাকত বোম্বেটের। মাথায় সুদীর্ঘ টিকি—মেয়েদের বিনুনির মতো। কিন্তু চীনা মাটির উপর এই যে এতদিন বিচরণ করছি,

সে চেহারার একটি তো চোখে পড়ল না! মুসড়ে যাচ্ছি—ছোটবেলার সেই সব ছবি একেবারে ভুয়ো? জাত ধরে বদলে গিয়েছে—তা বলে একটা-দুটো নমুনাও কি থাকতে নেই এত বড় দেশের ভিতর?

দু'ধারের প্রাচীন রহস্যময় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। কোন এক চোরকুঠরির দুয়োর খুলে হঠাৎ ধরুন বেরিয়ে এলো—হাতে ছোরা, মাথায় টিকি, আমার সেকালের ডিটেকটিভ বইয়ের এক বোম্বেটে। অপরিচিত দেশে নিশিরাত্রে নিঃসহায় আমি—পকেটে দশ-বিশ লাখ রয়েছে—ছোরাটা সে আমার বুকের উপর এনে ধরল। তারই বা গরজ কি—রিক্সা থামিয়ে সামনে এসে শুধু হাত বাড়ালেই হল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। চেঁচিয়ে সাহায্য চাইব, সে উপায় নেই—কেউ আমার কথা বুঝবে না। কাঁদছি, হয়তো ভাববে চেঁচাচ্ছি স্ফূর্তির চোটে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। গলি ছাড়িয়ে নির্বিঘ্নে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। বোম্বেটেবর্গের গুঁড়োটুকুও আর পড়ে নেই। বড় রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। একটা ট্রাম জোরে হাঁকিয়ে ডিপোয় ফিরছে। তাতে চড়ন্দার দু-চার জন।

হোটেলের সামনে নিয়ে এসেছে—নামতে যাবো, ইসারায় নিষেধ করে। ভাল করে ফুটপাথের গায়ে লাগিয়ে তবে নামতে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দেবো—রাত দুপুরে বয়ে নিয়ে এসেছে, কিছু বেশিই ধরে দেওয়া যাক—তিন হাজার?

কথায় তো বুঝবে না, তিনটে আঙুল দেখাই। রিক্সাওয়ালা ঘাড় নাড়ে। মানুষটার লোভ কম নয়। তবে—চার? যাকগে, পুরোপুরি পাঁচ হাজারই দেবো না হয়।

পাঁচটা আঙুল দেখিয়েও রাজি করা যায় না, তখন সন্দেহ হল। আমার কথা বুঝতে পারছে না। মনিব্যাগ খুলে পাঁচ হাজারের নোট সামনে মেলে ধরি। কি হে?

রিক্সাওয়ালা তড়াক করে তার সিটে লাফিয়ে বসল। একটু সেলাম ঠুকে সাঁ সাঁ করে চালিয়ে দিল গাড়ি। এক ইয়ুয়ানও নিল না। পিকিন হোটেলের সামনে বড় রাস্তার উপর ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার মধ্যে হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ করে চলে গেল বোধ হয়—আচ্ছা মানুষ!

সকালবেলা পরাঞ্জপেকে ফোনে ধরলাম। কি কাণ্ড মশায়, ভাড়া না নিয়ে সরে পড়ল।

পরাঞ্জপে বললেন, আমার লোক ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল রিক্সাওয়ালাকে

ডেকে আনবার সময়। একবার ভাড়া নিয়েছে, আবার আপনার কাছ থেকে নিতে যাবে কেন?

অজানা এক রিক্সাওয়ালা—পথ থেকে এনেছে। পরাঞ্জপের লোকও কোন দিন পাবে না আর তাকে, বিদেশি মানুষ আমি তো নয়ই। আমার চোখের আড়ালে ভাড়া দিয়েছে কি না দিয়েছে—নিযুপ্তরাত্রে কোন দিকে কেউ নেই—আমি নগদ পাঁচ হাজার মেলে ধরলাম, তা মানুষটা চোখ তুলে তাকাল না একবার। সামান্য সাধারণ লোকগুলোও এমনি যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে, আর আপনারা কিনা মুখ সিঁটকে বলছেন—নতুন চীনে ধর্মকর্ম নেই!

(১১)

স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) দেখতে গেলাম। মন্দির একটি নয়—বড় ছোট অনেকগুলো। মন্দিরের লাগোয়া বিস্তর কুঠুরি। শহরের দক্ষিণ ধারে হাজার হাজার অতি বৃদ্ধ সাইপ্রেস গাছ—বিপুলায়তন গৃহগুলি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ১৪২০ অব্দে তৈরি—বয়স, তবে তো পাঁচশ ছাড়িয়ে গেছে।

একটা হল শস্য প্রার্থনার মন্দির। পৌষের শেষাশেষি ওদের নতুন বর্ষ। বছরের পয়লা দিনে রাজা গিয়ে আকাশের কাছে হাত মেলে যাচ্ঞা করতেন ভূরি পরিমাণ ফসল যাতে ফলে। মন্দিরটা তাই আকাশের মতন করে বানানো। ছাতের নিচে নীল রঙের টালি—ঐ যেন হল নীল আকাশ। সেই আকাশ-ছাত দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌদিকে ঘোরানো আঠাশটা থামের উপর—অষ্টবিংশতি নক্ষত্র আর কি! ঠিক মাঝখান ড্রাগনমুখো আরো চারটে থাম—চার ঋতু ওরা। (চীনের চার ঋতু—জ্যোতিষিক হিসাবেও তাই বটে!) চার থাম ঘিরে লাল রঙের আরো বারোটা থাম—বারো মাস হল ওগুলো।

সূর্য চন্দ্র বাতাস আর বৃষ্টি—ওঁরা হলেন দুনিয়ার চালক, ফসল দেবার কর্তা। পুজো পেতেন ওঁরাই। ডাইনে বাঁয়ে অগুনতি ঘর। মন্দির ছেড়ে উপরমুখো চলে যান পাথর বাঁধা প্রশস্ত চত্বর ধরে। উপরে উঠছেন। আরও উপরে—উঠেই যাচ্ছেন—সত্যি সত্যি স্বর্গলোকে উঠে চললেন, এমনি মনে হবে।

অনেক ঘর সেদিকেও। রাজারা এদিকটায় ঘুরে ঘুরে পূজার আয়োজন দেখতেন। ভোগরান্নার ঘর। বলির জায়গা—পশুবলি দেওয়া হত স্বর্গের

প্রীতি-কামনায়। পূজোর হরেক জিনিসপত্র—রূপোর প্রদীপ, নানা রকম রূপোর বাসন, হাজার হাজার বছর আগেকার ঢঙে তৈরি। খাবার পাত্র, সুরাপাত্র, মাংস রাখার পাত্র। ফল রাখার ঝুড়ি—সেই কতকাল আগেকার। কত রকমের বাজনা—তারের যন্ত্র, বাঁশি, ঢাক-ঢোল জাতীয় পেটাবার বাজনা। গুণী পাঠক, নানান দেশের রকমারি বাজনা নিয়ে তো নাড়াচাড়া করে থাকেন—পাথরের বাজনা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হ্যাঁ—একখানা পাথর মাত্র। তার এখানে ওখানে ঘা দিন, মিষ্টি আওয়াজ বেরোবে; সেতারও এসরাজ হার খেয়ে যায়। একটা ঘরে নাচের সরঞ্জাম,—হায় রে, পাঁচশ বছর আগেকার নাচুনে মেয়েগুলো কোথায় ফৌত হয়ে গেছে, তাদের অঙ্গের সাজপোশাক আর পায়ের ঘুঙুর রেখে দিয়েছে কাচের বাক্স বোঝাই করে!

গোল বেদি-ঘর। বেদি হল স্বর্গের প্রতীক—তার সামনে রাজা দাঁড়িয়ে পূজো করবেন। অনেকটা উঁচু গোলাকার জায়গা—তিন থাক পর পর। সকলের উঁচু থাকের উপরে বেদি। বেদির উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলুন—আহা, বলুন না, মজা দেখবেন—চতুর্দিক থেকে শত শত কণ্ঠ আপনার সেই কথা ফিরিয়ে বলবে। এমন মজার প্রতিধ্বনি শোনেন নি আর কখনো।

বেশি মজা আর এক জায়গায়। উঠোনের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আওয়াজ করুন—দূর থেকে একবার প্রতিধ্বনি আসবে। পরের পাথরখানায় গিয়ে করুন দিকি আওয়াজ—প্রতিধ্বনি দু-বার। তার পরের পাথরে—তিন বার। অবওয়াজ করে পরখ করে দেখে তবে এই লিখছি।

গোল পাঁচিল আছে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার একটা প্রান্তে গিয়ে পাঁচিলে মুখ করে ফিসফিসিয়ে বলুন তো কিছু—দূর প্রান্তের অপর জন সব কথা শুনতে পাবেন। টেলিফোন করেন যেমন ধারা। কোন আমলের কথা—ধ্বনিবিজ্ঞানের যাবতীয় কচকচানি সেই তখনই মাথায় এসেছিল ওদের। আর মাথায় আসার ব্যাপারই শুধু নয়! বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিহনে এমন সূক্ষ্ম হিসাবের বস্তু কোন্ কায়দায় গড়ে তুলল—তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন!

উনিশ শতকে একবার বাজ পড়ে মন্দিরের অনেকটা ভেঙে যায়। আগাগোড়া মেরামত হয়েছে ঠিক পুরানো ধাঁচে। জ্ঞানী-গুণীরা ঠাউরে বলেন, আমাদের সাঁচির আদল আছে মন্দিরের কতকগুলো গেটে। তখন তো ভারি দহরম-মহরম আমাদের সঙ্গে—প্রভু বুদ্ধের নীতিধর্মের সঙ্গে আমাদের শিল্প-রীতিও চলে গিয়েছিল হিমালয় পার হয়ে। যেতে যেতে এই পিকিনে এসে হাজির হয়েছে। পিকিন ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর গিয়েছে, শুনলাম। ওসব

দেশ থেকেও এসেছে আমাদের এখানে। এমনি লেনদেন চলেছে আদিকাল থেকে।

শান্তি-সম্মেলন দোর্দণ্ড বেগে চলেছে। শুধু মাত্র বক্তৃতা নয়—বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আর যা হচ্ছে, চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে ওঠে অনেক সময়। আমেরিকার প্রতিনিধিরা একটা চারাগাছ দিল কোরিয়ানদের। সমুদ্র-পার হতে বয়ে নিয়ে এসেছে। এই চারা নিয়ে পুঁতো তোমাদের দেশের মাটিতে —প্রসন্ন বায়ু ও সূর্যালোকে গাছ বড় হবে, ছায়া শান্তি ও আনন্দ দান করবে। আরও তারা দিল ফুল, কাপড় আর কম্বল। আমেরিকান সৈন্য বোমা ফেলে মানুষ মারছে, ঘরবাড়ি চুরমার করছে—আর সেই রণজর্জরদের কম্বল বিলোচ্ছে আমেরিকারই মানুষ।

ভারত ও পাকিস্তানের যুক্ত-ঘোষণা পড়া হল একদিন। মারামারি-কাটাকাটি করব না ভাই সকল, নিজেদের মাঝে। সকল বিরোধের আপোসনিষ্পত্তি করব। লড়াই দুনিয়ার কোথাও আর হবে না। বিশেষ করে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের। আমরা সবে মাত্র স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরেছি —আমাদের মধ্যে নৈব নৈব চ। বিস্তর সুহৃদজন উতলা হয়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন—চোখ টিপে দিলেই টাকাকড়ি আর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে পড়েন,— কিন্তু খবরদার, খপ্পরে পড়েছ কি বিলকুল খতম! কাশ্মীর এবং অন্যান্য গোলমাল জিইয়ে রেখে তৃতীয় পক্ষই সুবিধা করে নেবে। কোন রকমে আস্কারা দেবো না তাদের।

তাই দু-তরফে ভেবেচিন্তে শান্তি-চুক্তির খসড়া হয়েছে। কো-মো-জো ঘোষণা করলেন চুক্তিপত্রে সই হচ্ছে এবারে। ঘর ফেটে যায় এমনি হাততালি। ঘোষণা পাঠ করলেন এক ডেপুটি সেক্রেটারি। গম্ভীর বাজনা। সইয়ের জন্য ডাকা হল প্রধানদের। চলেছেন ভারত-দলের নেতা ডক্টর কিচলু ও পাকিস্তান-দলের নেতা পীর মানকি শরিফ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। হল সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। (তালে তালে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত পড়ত। তার শেষ নেই। পাকিস্তানের আতাউর রহমান সাহেব আর আমি বলাবলি করতাম—ছাদ পেটানো। অবিকল সেই আওয়াজ) প্লাটফরমের সামনে অবধি একত্র গিয়ে দু-দিক দিয়ে উপরে উঠলেন। সই হয়ে যাবার পর কিচলু ও পীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। এ দিকেও কি মাতামাতি আমাদের দু-দলের মধ্যে! পাকিস্তানের মেয়েরা ফুল ছড়াচ্ছেন আমাদের দিকে। আমাদের মেয়েরা ওদিকে। এ তরফ থেকে ও-দলের

গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, ও তরফ থেকে এই দলে। ডক্টর কিচলু পীরকে উপহার দিলেন গালার কাজ করা কাশ্মীরি বাক্স আর সিল্কের উপরে 'পিকিনের গ্রীষ্মপ্রাসাদ'-বোনা ছবি। পীর কিচলুর মাথায় পরিয়ে দিলেন জরিদার টুপি (পাঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ওটা), আর চীনের কারুকর্ম-করা কাঠের বাক্স। এদিকে পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ভারতীয়দের মধ্যে। কোলাকুলি প্রচণ্ড আবেগে। পাকা দাড়িওয়ালা সৈয়দ মুত্তালাবি—পাক পাঞ্জাবের নাম করা কবি, আমাদের সর্দার পৃথ্বী সিং এর সুদীর্ঘ কালের বন্ধু। দেখলাম, দু চোখে জল গড়াচ্ছে বুড়োমানুষটির। দেশ ভাগ হবার সময় এতদূর ধারণায় আসেনি—আজকে নাড়ি ছেঁড়া টান মর্মে মর্মে বুঝছি সকলেই।

(১২)

সম্মেলন চলে সকাল, বিকাল এবং কখনো কখনো রাত্রে! তার উপরে কমিশন আছে। কমিশনের মীটিং সারা হতে এক একদিন দুটো তিনটে বেজে যায়। ব্যাপারটা তাই ভয়ের হয়ে উঠেছে, জুত পেলেই ডুব দিই। আমি আছি সাংস্কৃতিক লেনদেনের কমিশনে। প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে ঐ সম্পর্কে—তাই নিয়ে তর্কাতর্কির অবধি নেই। কমিশনের সভাপতি ভারতীয়—আলিগড়ের ডক্টর আবদুস আলিম। মনে পড়ছে না? কি বললেন, আপনাদের সঙ্গে অনেকবার মোলাকাত হয়ে গিয়েছে তো! রাত দুপুরে পীত সাগরের কনকনে হাওয়া দিয়েছে—ঘরে গিয়ে লেপের তলে ঢুকতে পারলে বাঁচি, প্রস্তাবটাও পাশ হয়ে যায়-যায়—হেনকালে কোত্থেকে এক নতুন ক্যাচাং তুললেন ব্রেজিলের ভদ্রলোক। 'লড়াইবাজ (warmonger) কথাটা খুব চালু—তার দেখাদেখি আমরা ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলাম শান্তিবাজ (peacemonger)।

উৎকর্ণ হোন পাঠক সজ্জন—এই অধম এবারে মঞ্চারোহণ করছেন। দেশ-বিদেশের তা বড় তা বড় লোকের বক্তৃতা শুনলেন—গোটা দুনিয়া দু-আঙুলে চোখের উপর তুলে ধরেন তাঁরা, বলেনও খাসা—বিস্তর জ্ঞানলাভ হয়। আমি সাহিত্যিক ব্যক্তি নিতান্ত সাদামাঠ কথা বলব, শুঁকে শুঁকে নাক ক্ষয়ে ফেললেও পাণ্ডিত্যের গন্ধ পাবেন না তার ভিতর।

জবানটা বাংলায় ছাড়ি, কি বলেন? বেশির ভাগ লোক নিজ নিজ ভাষা

শুনিয়ে দিচ্ছে—আমার কি লজ্জা, আমার ভাষা কম নয় কারো চেয়ে ? কর্তাদের জানানো হল যে বাংলায় বলব। তা বেশ তো, আপত্তির কি আছে ? তবে বক্তৃতার একটা ইংরেজি তর্জমা দিতে হবে কয়েকটা দিন আগে। তাই থেকে আরও তিনটে ভাষায় তর্জমা হবে—সেই কাজ ওঁরাই করবেন। মূল বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আরও চারটে ভাষায় সমান তালে ছাড়া হবে—ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্পানিশ। আপনারা নয়ন ভরে বক্তার হাত মুখ নাড়া দেখুন—আর যে ভাষাটা বোঝেন, তাতেই বক্তৃতা শুনে যান যথাস্থানে হেড-ফোনের প্লাগ ঢুকিয়ে। শুনতে না চান, সে কায়দাও বাতলে দিয়েছি আগে।

কিন্তু বাংলা বলেই মুশকিল হয়েছে। ভাষাটা ওঁদের মধ্যে কেউ জানে না। তাই বাংলা-জানা এক জনকে চাইল বুঝে-সমঝে দেবার জন্যে। নইলে হয়তো দেখবেন, বক্তৃতা চুকিয়ে আমি প্লাটফরম থেকে নেমে গেলাম, স্পানিশওয়ালা ভীমবেগে ছেড়ে যাচ্ছেন তখনো। বাংলানবিশ গিয়ে তালিম দিয়ে দেবেন, মূল-বক্তৃতা ধাপে ধাপে ধাপে কখন কদ্দুর এগুলো। তর্জমাগুলো যথাসম্ভব সেই বেগে ছাড়বে। আমাদের নন্দী গেলেন এই কাজে—ফিরে এসে তাজ্জব বর্ণনা দিলেন। এলাহি কাণ্ড ভাই, দস্তুরমতো অফিস বসিয়েছে, শ'খানেক লোক খাটছে। বক্তৃতাদি চারটে ভাষায় এক সঙ্গে প্রচার করা, সমস্ত লেখার অনুবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে পাঠানো, নিজেদের সচিত্র বুলেটিন বের করা, পুরো রিপোর্ট বানিয়ে নানান ভাষায় তর্জমা ও টাইপ করে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া—সমস্ত সমাধা হয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। মানুষগুলোর নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

বক্তৃতাটি দিই পুরোপুরি ? লেখক হওয়ার এই বড় সুবিধে, আপনারা পাল্লার মধ্যে পাচ্ছেন না। না হয় লাইন চারেক পড়ে ছেড়ে দেবেন—অধিক কি করতে পারেন ? কিন্তু মুশকিল হয়েছে, অন্যের বক্তৃতা ভেঙে চুরে পরিবেশন করেছি—নিজের বস্তু আস্ত রাখলে তাঁরা যে মাথায় মুগুর ভাঙবেন। কিছু কিছু বাদ দিয়ে ছাড়ছি, তবে শুনুন—

"ভারতের লেখক আমি—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের সমাগত বন্ধুজনকে সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষ সর্ব মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছে। ভারতের সৈন্য কখনো পর-সীমান্ত লঙ্ঘন করে নি—শান্তি, প্রীতি, ও পরম-আশ্বাসের বার্তা দিকে দিকে পরিকীর্ণ করেছেন ভারতীয় ধর্মাত্মা বিদগ্ধমণ্ডলী। অস্ত্র নিয়ে যারা আক্রমণ

করতে এসেছিল, উদার ভারত-সংস্কৃতি গভীর আলিঙ্গনে তাদের অন্তরে গ্রহণ করল। বহু মানবের বিচিত্র সমবায়ে এমনি ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে মহিমময় মহা-ভারত পরিগঠিত হয়েছে।

"সেকালের সেই শান্তি-দূতের পদাঙ্ক বেয়ে আমরা আজ সমুদ্র ও পর্বত-পারের পুরানো বন্ধুদের মাঝখানে এসে দাড়ালাম। বহু দুঃখ ও দুর্যোগ গিয়েছে আমাদের উপর দিয়ে—সেই ঘনান্ধকারে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আজ নূতন প্রভাত। ব্রিটিশের কবলমুক্ত আমরা এক সর্বমুখী অভিনব ভারত রচনায় সঙ্কল্পবদ্ধ। নানা দেশের মানবপ্রেমী নরনারীর এই পবিত্র মহাসঙ্গম থেকে অঞ্জলি ভরে আমরা নূতন আশা ও অন্তপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যাবো।

"মারণাস্ত্র মানুষ মারে, কিন্তু মন মারতে পারে না। লক্ষ-কোটি মানুষের মন দোলায়িত করি আমরা লেখক-সম্প্রদায়—অসীম আমাদের শক্তি। সাহিত্য আজ মানুষের অতি-কাছাকাছি—বিশিষ্ট কয়েকজনের বিলাসমাত্র নয়। জন-চিত্তে আনন্দ ও জীবনের প্রতি ভালবাসা জাগাবে আমাদের সাহিত্য, তাদের আত্মসচেতন করবে। সাধারণ মানুষ সংসার পেতে শান্তিতে থাকতে চায়। তারা আনন্দ চায়, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অংশীভাগী হতে চায়। মুষ্টিমেয় চক্রান্ত করে তাদের কামানের মুখে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। সমাজ-শত্রুদের চিনিয়ে দিক নূতন কালের সাহিত্য—তারা একক, শক্তিহীন, সর্বজনঘৃণ্য হয়ে নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে যাক। সকল দেশের মানুষ পরস্পর জানাশোনায় প্রীতিপর গোষ্ঠীতে পরিণত হোক...।

"রণজর্জর বসুমতী আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আমাদের দিকে: প্রভু বুদ্ধ, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী আমি ভারতীয় সাহিত্যিক---এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় জাতিপুঞ্জের সকল লেখকের সঙ্গে সমকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমাদের সুন্দরী শ্যামা ধরিত্রীর রক্তকলঙ্ক বিদূরণ করব—এই আমাদের অমোঘ সংকল্প।"

চার-পাচটা মাইক এদিকে-ওদিকে। ডাইনের টেবিলে কাচের গ্লাস। ফুলে ফুলে এমন সাজিয়েছে, যেন ফুলবাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে। ব্যবস্থা অতি উত্তম। দপদপিয়ে ফ্লাশ-লাইট জ্বলে উঠছে—ছবি তুলছে। কামানের মতন মোভি-ক্যামেরা হাঁ করে গিলতে আসছে এক-একবার। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে; কারা শুনছে, কিংবা শোনার ভান করে ঘুমুচ্ছে—আলোর

জন্যে সামনে তাকিয়ে দেখাবার উপায় নেই। তা ছাড়া দেখাবোই বা কেমনে— মুখের বক্তৃতা নয়, লেখা জিনিস পড়ে যাওয়া। কাজ শুধু মুখের নয়, চোখেরও।

পড়া শেষ করে হাততালির মধ্যে নেমে এলাম। এক মহিলা শেকহ্যাণ্ড করলেন সকলের আগে। তার এপাশে-ওপাশে আরো জন চার-পাঁচ। চোখ ধাঁধিয়ে আছে তখনো, কোন দেশের মানুষ ঠাহর করে দেখিনি। মাঝের রাস্তা দিয়ে ফিরে চলেছি নিজের সিটে। খান তিনেক চেয়ারের ওদিক থেকে অ্যানিসিমভ, দেখি, উঠে এসে হাত বাড়ালেন। এ সমাদরের মানেটা কি? গুজনদার বস্তু নেই, ঐ তো দেখলেন—(সে বুদ্ধি আছে, বিস্তে ফাঁস হয়ে না পড়ে!)—কোন রকম ধরা-ছোঁওয়া দিইনি। সাহিত্যিকের সামান্য সহজ কথা, তাই তাঁর মনে ধরল?

গভীর প্রীতিতে শেকহ্যাণ্ড করলেন, পাকিস্তানের মুজিবর রহমান। মুজিবর বললেন, বড ভাল বলেছেন, দাদা—

মুজিবর রহমানের বক্তৃতা হল মাঝে আরো কতকগুলো হয়ে যাবার পর। ইনিও বললেন বাংলায়। ছেয়াশি জন বক্তার মধ্যে বাংলার মোট দু-জন— পাকিস্তানের মুজিবর আর ভারতের এই অধম। ভারি এক মজা হল এই নিয়ে। গল্পটা বলি। এক ভদ্রলোক গুটিগুটি এসে বসলেন আমার পাশের খালিচেয়ারে। মার্কিন মুলুকের মানুষ বলে আন্দাজ হয়। চুপিচুপি শুধালেন, মশায়, আপনি বলেছেন—আর ঐ যে উনি বলছেন, দু-জনের একই ভাষা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলা।

একই রকম অক্ষর?

এক ভাষা, তা দুই অক্ষর হবে কি করে?

বুক চিতিয়ে দেমাক করি, বাংলার নাম জানো না—কে বটে হে তুমি!— টেগোর যে ভাষায় লিখলেন!

কদ্দুর কি বুঝল, মা-সরস্বতী জানেন। আমতা-আমতা করে বলে, সে তো বটেই! কিন্তু উনি এক দেশের মানুষ আপনি অন্য দেশের, অথচ দুটো দেশের ভাষা এক রকম—

বুঝতে পারলে না, বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশ সেদেশের মানুষ ঐ এক ভাষায় কথা বলে, এক রকম অক্ষর তাদের, মা বলে

ভাবে ঐ ভাষাকে, তার জন্য জান কবুল করে। তোমাদের ইংরেজি মতন আর কি!

খুব হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে স্তব্ধ হয়ে যাই। বাংলা দেশ দু-টুকরো হয়ে গেছে আজকে। তবু একই ভাষা। বাংলাভাষা বেঁধে রেখেছে আমাদের। রাডক্লিফের খড়গ মাটি কেটে ভাগ করে দিয়েছে, ভাষার উপরে তার কোপ পড়ে নি। সাতসমুদ্র পারের বিদেশি চোখেও এই ঐক্য ধরা পড়ে গেছে।

(১৩)

সম্মেলন শেষ হয়ে এলো। এটা-সেটা উপহারের জিনিস আসছে প্রায়ই। এ-সমিতি পাঠাচ্ছেন, ও-ফ্যাক্টরি পাঠাচ্ছেন। যাবে তো চলে এবার—এই ক-দিন কত আনন্দ দিয়ে গেলে, তারই সামান্য স্মৃতি। কিছুই নয়—দেবার সামর্থ কি আছে আমাদের? দেশে গিয়ে এই সমস্ত দেখো কখনো-সখনো, তখনই মনে পড়ে যাবে আমাদের কথা।

বাঘা শীত পড়েছে। এখন এই—আর শোনা গেল, দিন কতক পরে বরফ জমবে নাকি পিকিনের রাস্তায়। সুইং একদিন আমার গরম পাজামা বদল করে নিয়ে এলো। কেমন হে, কোন চোর-চূড়ামণিরা খাটের উপর এইসব ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিছু নাকি তুমি জানো না—একেবারে ভিজে-বিড়ালটি! কি মিথ্যুক মেয়েটা দেখুন, ধরা পড়েও লজ্জা নেই। হাসে—হাসি ছড়িয়ে যত অপরাধ ধুয়ে দেয়।

আজ ক-দিন দেখতে পাচ্ছি জনকয়েক ফিতে-টিতে নিয়ে হোটেলে ঘোরাঘুরি করছে। কারা ওরা, কি মতলব—জানো নাকি সুইং?

কিছু নয়, ওরা শুধু গায়ের মাপটা নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে ঠাহর হল, নানান দেশের বহুতর ব্যক্তি উত্তম কাটছাঁটের নতুন নতুন পশমি পোশাকে বাহার করে বেড়াচ্ছেন। মাপের প্রত্যাশীরা ভারতীয়দের কাছেই আমল পাচ্ছেন না। হবে-টবে না বাপু, ভাগো। আমাদের পোশাকের বাবদে এক আধলা আর খরচ করতে দেবো না।

শেষটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা তাদের। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। পিকিন ছাড়বার দিন হয়ে এলো—এর পরে কবে কি হবে, দরজিরা সরবরাহ দেবেই বা কেমন করে?

বলে দিয়েছি তো আমরা—

কার্তিক একাই সকলের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি, আমাদেরই মাথা মোটা সর্ব ব্যাপারে! খুশি মনে দিতে যাচ্ছে, অমন না-না করবার হেতুটা কি? লজ্জা লাগে—বেশ তো বিস্তর আপত্তি জানানো হয়েছে, এবার চেপে যান—গোটা তুনিয়ার মধ্যে আমরাই একমাত্র নির্লোভ—সে তো আচ্ছা করে জানান দেওয়া হয়ে গেছে সেই হাত খরচের টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারে। আবার কেন? মানুষে আদর করে দিলে না নেওয়াটা অভদ্রতা—সেটা কেন বোঝেন না?

সুইং ইঞা-মিঁ মুরুব্বিয়ানা করে বললে, সকলের হয়ে গেল, আপনারা কজন এত ভোগাচ্ছেন কেন বলুন তো?

ভারতীয়দের কেউ মাপ দেবে না—

ভারতীয় বলবেন না—আপনারা এই কটি—

কে দিয়েছে আমাদের দলের? নাম বলো।

মেয়েটা পটাপট অনেকগুলো নাম বলে দিল। বলে, যারা দেয় নি, সেই কয়েকটা নাম বলাই বরঞ্চ সোজা।

তবে আর কি হবে! দরজিকে বললাম, তোমাদের সকলের গায়ের যে পোষাক, তাই আমায় বানিয়ে দাও।

ওরা বলে, এ নিয়ে কি হবে? পরতে পারবে না তো দেশে গিয়ে।

গভীর কণ্ঠে বললাম, সেই ভালো। পরলে তো নষ্ট হয়ে যায়—চিরকাল থাকবে তোমাদের এ পোষাক। বন্ধুজনদের ডেকে ডেকে দেখাবো—চীনে এসে ভালবাসা পেয়েছিলাম, তারই সুমধুর স্মৃতি।

বাসে উঠে বসেছি, বিকালের অধিবেশনে যাচ্ছি—সেই সময়ে কারসাজিটা ধরা পড়ে গেল। কী বজ্জাত! একই চাল সকলের সঙ্গে খেলেছে। সকলকে গিয়ে বলেছে, আর সকলে মাপ দিয়ে দিয়েছে, তাদের ঘরটাই বাকি শুধু। খিল-খিল করে হাসছে এখন মেয়েগুলো। মাপ একবার দিয়ে ফেলেছে, হাহুতাশে ফল কিবা?

বাস দাঁড়িয়ে আছে, এসে পৌছচ্ছে না কেন সকলে? সেক্রেটারি ধরের উপর তদারকির ভার। জন তিনেকের পাত্তা নেই, যাত্রীরা গরম হয়ে উঠছেন, ধরও উদ্বিগ্ন। আপনারা কেউ খবর জানেন ওঁদের?

এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে পড়লেন। আমি যাচ্ছি, ধরে নিয়ে আসি। তারপরে কৌত ব্যক্তিরা হাজির হলেন, কিন্তু যিনি খুঁজতে গেলেন তিনি ফেরেন না। ক্ষিতীশ চুপিচুপি বলে, আমি বলতে পারি দাদা। সকলের

মাপ নেওয়া হয়েছে শুনে বেজার মুখে নেমে গেলেন। উনিও ঠিক মাপ দিতে বসে গেছেন, দেখুনগে।

সত্যি মিথ্যে বলতে পারি নে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস শেষটা ছেড়ে দিল। তিনি পরে আসবেন অন্য গাড়িতে। সম্মেলনের কাজকর্ম সারা হয়েছে, শেষ অধিবেশন আজ রাত দুপুরে। নিয়ম মাফিক প্রস্তাব-গ্রহণ সেই সময়। বিকেলবেলা এখন বড় কাজ—সবসুদ্ধ একটা গ্রুপ-ফোটো নেওয়া। আরও কিছু টুকিটাকি থাকতে পারে। সেজন্য গা এলিয়ে চলেছি। অন্য দিন হলে—বাপরে বাপ, ঘড়ির কাঁটা ছেলেমেয়েগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে দিত এমন হলের বাইরে?

সকলে গুলতানি করছি। পিছনের মাঠে শুনলাম, চেয়ার সাজানো হচ্ছে ছবি তোলার জন্য। পৌনে চার শ' প্রতিনিধি—কর্মী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে মোটমাট শ'পাঁচেক। একটা ছবিতে এতগুলো লোক। এবং চেনা যাবে প্রতিটি মানুষকে! বুঝুন। সারা মাঠের চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে চেয়ার সাজাচ্ছে। সকলের চেয়ারে বসা হবে না, সামনে এক সারি মাটিতে বসবেন, চেয়ারের পিছনে আর এক সারি দাঁড়িয়ে থাকবেন। চার-পাঁচটি ক্যামেরায় একসঙ্গে টুকরো টুকরো ছবি নেবে। পরে জুড়ে গেঁথে কি করবে ওরাই জানে। যোগাড়যন্ত্রের শেষ করতে ঘণ্টাখানেক এখনো।

মন ভারি সকলের। সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ বারো-বারোটা দিন এক ঘরে পাশাপাশি বসছি। ফাঁক পেলেই বাইরে এসে খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছবি তুলছি। ইংরেজি জানো তো গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো—নয়তো ঠারেঠোরে প্রীতি জানাবো। হলের মধ্যেও যতক্ষণ জুড়ে অধিবেশন, হলের বাইরের অবসর-সময় হিসাব করলে প্রায় তার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অবসর-সময়টা বিনা কাজের ভাববেন না, মানুষে-মানুষে আমরা চেনা-পরিচয় করি। কালা-ধলায় বাছবিচার নেই, তফাত নেই পোশাক-আশাকের পার্থক্যের দরুন। পেঁচার মতন মুখ করে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন, কেউ তা হতে দেবে না। শেষবারের মতো একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে নাও এই বিকেলবেলাটা। দুপুর রাতের অধিবেশনে হয়ে উঠবে না, আর কাল থেকে তো একেবারেই ইতি।

হিন্দুস্থানের মেয়েটার দেখছি আজকে একেবারে সাদামাঠা পোশাক। রোজই রং বদলে বদলে আসত সম্মেলনে। কোনদিন লাল, কোনদিন কালো, কোনদিন বা সবুজ। নজর না পড়ে উপায় ছিল না। খাতায় লেখা আছে তার বর্ণনা—আমার ঠিক সামনের দু-তিন সারি আগে বসত সে। মাথায়

চুলের বোঝা, ঈষৎ সোনালি। চুল বাঁধার ঢং আমাদের দেশের মেয়েদের মতো। ফিতে বাঁধত চুলের উপর, আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা যেমন বাঁধে। কানে দুল দুলছে—আমার পাঠিকাকুল দেখলে সেই প্যাটার্ন ঠিক পছন্দ করে বসতেন। চুলে ক্লিপ-আঁটা—ওটা আর এখন পরেন না আপনারা, সেকালে পরতেন। আর বিষম ছটফটে মেয়েটা। সম্মেলনের বিরতি হতে না হতে দেখা যেত পিছনের ঘরে গিয়ে ফল-কেক-স্যাণ্ডউইচ-চা-অরেঞ্জড—হাতের কাছে যা পাচ্ছে, এক নাগাড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তারপর এক ছুটে উঠোনে। কিবা রোদ কিবা শীত—পলকের মধ্যে দল জুটিয়ে নিয়ে তর্কাতর্কি হাসাহাসি অথবা ছবি তোলা। আজকেই দেখছি, পরম শান্ত। ভিন্ন দেশের এক সখীর সঙ্গে পপলারের ছায়ায় ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...ভিয়েতনামের একজন এসে শেকহ্যাণ্ড করলেন। সেই ভোজসভা থেকে চেনাশোনা এঁরি সঙ্গে। নামটা মনে নেই, দেখা হলেই মধুর হাসি হাসেন। চতুর্নারায়ণ মালবীয় কদিন আগে ভারতের তরফ থেকে প্রীতি-উপহার দিয়েছিলেন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের। ভালবাসা আরও এঁটেছে সেই থেকে। ...কত জনে এসে খাতা এগিয়ে দিচ্ছেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও! আমার ছোট্ট খাতাখানাও দুনিয়ার নানান মানুষের নামে নামে নামাবলী হয়ে উঠেছে। যাবেন আমাদের দেশে, যাবেন কিন্তু—হাসি-মাখানো কত অনুরোধ! হায় রে, সমুদ্র-পর্বতের ওপারে সেই সব হাসি-আনন্দ আজকে কত দুর্লভ হয়ে গেছে! খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে নিশ্বাস-ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

কোন দেশের এক অচেনা শিল্পী হুকুম ঝাড়লেন, দাঁড়াও ওখানে। হোসেন সাহেবের কাণ্ড—দরাজ-ভাবে বলছেন আমার সম্বন্ধে। অতএব দুই ভুবন-মনোরম মূর্তির স্কেচ হতে লাগল। তারপর ছবির নিচে সই করাতে নিয়ে আসেন। শুধু নাম নয়, কোন দেশ কি ঠিকানা—তা-ও। স্কেচ দেখে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে তো! অবাক কাণ্ড—শিল্পী তা হলে এমন কিছু বড় দরের নন!

কার্তিক প্রায় তুড়িলাফ দিতে দিতে এসে হাত ধরে টানে, দেখে যান—কি ব্যাপার?

রাতে সম্মেলন খতম হবার মুখে ভারি রকম কিছু দেবে।

জানলেন কি করে?

নজর খোলা রাখতে হয়, বুঝলেন? তাই দেখাবো বলেই তো ডাকছি।

হলের সামনে গাড়ি রাখবার জায়গায় দুটো লরি—ছোট্ট ছোট্ট রঙিন ঝুড়িতে বোঝাই। হাসি-ভরা মুখ তুলে কার্তিক বলে, আন্দাজ পাচ্ছেন কিছু? ঝুড়িগুলো আমাদের তরে। তবে কোন কোন বস্তু ভরতি হয়ে আসবে, তার এখন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

১২ই অক্টোবরের কনকনে রাত্রি। এগারো দিন ধরে সম্মেলন চলল, আজকে শেষ। কত দেশের কত মানুষ এসে জমেছে! প্লেনে এসেছে, ট্রেনে এসেছে, পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারের মতন হেঁটে হেঁটেই বা এসেছে কত দল! উৎসব শেষ করে আমাদের সুন্দরী ধরণীকে রক্তকলঙ্ক-মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাল থেকে যে যার ঘরে ফিরবার ভাবনা।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে ঘরে সবাই তৈরি হয়ে আছি। বড্ড শীত—পশমের পোষাকে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দুয়োর-জানালা বন্ধ করেও সামলানো যাচ্ছে না। কাগজ-টাগজ পড়ছি, ফলটা-আঁশটা খাচ্ছি—আর কতক্ষণ রে বাপু? ন টা বাজল সাড়ে-ন টা—এখনো খবর নেই।

আরও এক ঘণ্টা পরে সাড়ে-দশটায় বাসে উঠে কাচের দরজা-জানলা উত্তমরূপে এঁটে গায়ে-গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে বসলাম। শীতার্ত শহর ঘরের ভিতর ঢুকে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, পথের নিশ্চল শান্তি বিঘ্নিত করে লাইনবন্দি আমাদের বাসগুলো ছুটল।

এক বাড়ির খোলা বারাণ্ডায় আলো। ভিতর থেকে তার টেনে এনে অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—সেই আলোয় বুড়ো-আধবুড়ো জন দশেক মানুষ সাড়া-শব্দ করে পাঠাভ্যাস করছে। দিনমানে সময় পায় না—সামান্য কাজ-কর্ম করে, গভীর রাত্রের হাড়-কাঁপানো হিমে এই হল বিদ্যার্জনের জায়গা। এমনি কায়দার পাঠশালা আরও দেখেছি। য়্যুনিভার্সিটি ও ইস্কুল-কলেজের বাইরে জনসাধারণের উদ্যোগে এই সমস্ত। মানুষ ক্ষেপে উঠেছে লেখাপড়ার জন্যে। নিরক্ষরতার চেয়ে বড় অপমান কেউ সেথায় ভাবতে পারে না।

সাড়ে-এগারোটায় অধিবেশন শুরু, তিনটেয় মোটামুটি শেষ। আবেদন ও প্রস্তাবে মোট এগারোটা। আজব ব্যাপার! নানা মত ও পথের এতগুলো মানুষ—সকলে একমত প্রত্যেকটি প্রস্তাবে। ভাবতে পারা যায়নি, সম্মেলন এত দূর সফল হবে। সমাপ্তি ঘোষণা হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বেজে উঠল

গম্ভীর মন্ত্রে। তিনশ'-তিরিশ জন তরুণ শিল্পী রকমারি বাজনা নিয়ে তিন সারিতে এসে উঠলেন প্লাটফরমের উপর। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি। বাজনারও সেই সুর।

বাজনা থামতে না থামতে হলের সমস্তগুলো দরজা খুলে গেল একসঙ্গে। খিলখিল খিলখিল হাসি। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—পাখনা মেলে উড়ে এসে পড়ল পরীদেশের শিশুরা। ফুটফুটে চেহারা, ধবধবে পোশাক—রূপ আর উল্লাস ফেটে চৌচির হয়ে পড়ছে যেন। ঝুড়িভরতি ফুল প্রতিজনের হাতে। চারিদিকে ফুল ছড়াচ্ছে ছুটোছুটি করে। প্লাটফরমের উপর উঠেছে কতকগুলো—সেখানেও ফুলের হোলি। বুকে, মাথায়, গায়ে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘায়েল করে দিচ্ছে। কার্তিক বিকালে এই সমস্ত ঝুড়ি দেখিয়েছিল। ঝুড়ি ওদের অস্ত্রের তূণীর।

আমরাও শেষটা ক্ষেপে গেলাম। ওরাই মারবে, আর পড়ে পড়ে মার খাবো! বিদেশ-বিভুঁয়ে আমাদের অস্ত্রসজ্জা নেই—তা যে ফুল ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের টেবিলে, আশপাশে মেজের উপর—তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মারি ওদের। ওরা যখন ফুরফুর করে আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে, ওদেরই ঝুড়িরই ফুল লুঠ করে ছড়িয়ে দিচ্ছি ওদের মাথায় মুখে। নিজ অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল।

তার পরে আরও সাংঘাতিক আক্রমণ। ধরছি এক-একটিকে—বুকে টেনে নিচ্ছি। দু-হাতে উঁচু করে তুলে দিচ্ছি আমাদের টেবিলের উপর। টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। আর শত শত কণ্ঠের আরাবে বিশাল হল রণিত হচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে! আর ফুলের ছড়াছড়ি; পাহাড়প্রমাণ ফুল জুটিয়েছে—ডালার ফুল, অরে ডালা বয়ে নিয়ে এসেছে দেবলোকের এই যত শতদল-পদ্ম। রাত্রির শেষ প্রহরে এইটুকু-টুকু বাচ্চারা জেগে বসে রয়েছে, মা-বাপেরাও বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছে কেমন!

অফুরন্ত আনন্দের মেলা। ফুল ছড়ানো শেষ হল তো গান। দুনিয়ার তাবৎ ভাষায় যত রকম গান হতে পারে, সব এই একটা ঘরের মধ্যে। আর পেরে উঠছি না গো—চললাম আমরা একটা দল। পুবের আকাশে আলোর আভাস দেখা দিচ্ছে। পালাই।

সভা, সভা, সভা! পাঠশালার পড়ুয়ার মতো সকাল-বিকাল নিয়মিত সভায় গিয়ে বসা চুকল এতদিনে। আমি বাঁচলাম, পাঠকেরাও। প্রশ্রয়-মিশ্রিত

হাসি হাসতেন আপনারা, চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি। আহা বলছে ভদ্রলোক— বলতে দাও। শান্তি-সম্মেলন কি প্রকার হয়েছিল, কোন কোন মহাজন কি প্রকার বুকনি ছেড়েছিলেন ; কিংবা ধরুন, মহাচীনের কথা—সে বেরিয়ে গেছে, পড়ে পড়ে আপনারা ঘুণ হয়ে আছেন। নতুন কি শোনাতে পারি তার উপরে? ঠোঁট নাড়লেই তাবৎ বুঝে ফেলে দেন—জানি তো আপনাদের!

তাক লাগিয়ে দিতে পারি একটা খবরে। সেটা নিশ্চয় জানেন না। ভুবনময় ধুমধাড়াক্কা হল সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে—কিন্তু সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ আমরা যে এক পরিবারস্থ হয়ে ছিলাম, এ খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করেনি কেউ। করবার কথাও নয়—এ হল অন্তরের বস্তু। ভাষা বুঝি না —কেউ বলি হিন্দি-বাংলায়, কেউ স্প্যানিশে, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ জাপানি, কেউ রুশীয়, কেউ চীনা—এবং ইংরেজী বলি অধিকাংশই। কিন্তু ভাষার তফাৎ আটকাতে পারল না। দোভাষি থাকে ভালো, নয়তো সেই অদ্ভুত উপায়ে— যাতে অন্ধেরা দেখতে পায়, কালারা কানে শোনে—সেই উপায়ে আমাদের আলাপসালাপ হত। সাদায় কালোয় তফাৎ আছে, সাদারা পছন্দ করে না কালা আদমিদের, আবার কালোদেরও দারুণ ঘৃণা সাদার উপর—কোন মিথ্যুক রটায় বলুন তো এ সব? ফরাসি ছিল জার্মান ছিল,—এরা সাদা-জাতির মধ্যে মহানৈকষ্য কুলের মুখোটি। আর কালোর সেরা কালো নিগ্রো বংশাবতংসেরা ছিলেন—যাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে গাত্রবর্ণ বাবদে আমাদেরও আকাশচুম্বী অহংকার এসে যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি—ঐ মিসকালো মানুষ তিলেক হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আছে, কুলীন শ্বেত অমনি তার পিঠে থাবা মেরে ভাবনা ভাঙিয়ে দিল। অর্থাৎ, কি হয়েছে? আড্ডা দিই এসো, গুলতানি করি—

কাজের খোঁজই রাখেন আপনারা, কিন্তু যে সময়টা কাজ থাকে না? পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ভূগোল কমলালেবুর উদাহরণ দেয় ; আয়তনের পৃথিবী কমলালেবুর চেয়ে খুব বেশি বড় নয়—এমনি কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এলে মালুম হয় সেই মহাতত্ত্ব। কনফারেন্সের বিরাম-সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা ইত্যাদি সেবন করছি, কেকটা বড় ভাল লাগল তো গুয়াতেমালার মানুষটি প্রেমভরে আধখানা ভেঙে দিলেন, খাও গো—খেয়ে দেখ। সত্যিই এইরকম ঘটেছে একদিন। খানাঘরের একটা টেবিলে উমাশঙ্কর যোশি আর

আমি পাশাপাশি খাচ্ছি—উমাশঙ্কর নিরামিষাশী, আমি নির্বিচার। বাকি দুটো খালি চেয়ারে বসে পড়লেন—একজন সুইস, অন্যজন অস্ট্রেলীয়।

কি খাচ্ছ? কেমন চিজ ওটা ভাল লাগছে? ওহে বয়, আমাদেরও দাও দিকি ঐ বস্তু।

তার পরে গল্প—গল্প! তোমাদের কুলশীল নাড়িনক্ষত্রের খবর বলো, তাঁদেরও শোনো আদ্যন্ত। আরে ছাই, ডার্লিং-ডাউনস কি ব্রেমার—নামগুলোই কি আগে ভাল করে শুনেছি? এখন তারা সত্যি হয়ে ফোটে চোখের সামনে—সেখানকার মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলছে।

ফোটো তোলা হত বিরামের সময়। কারা তুলত জানিনে। নিজে আমি যেতাম না—অনেক সময় টেনেটুনে দাঁড় করাতো দলের মধ্যে। ক্লিক করবার ঠিক আগের মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াল হয়তো এক রঙিন মেয়ে—কিংবা এক টেকো বুড়ো। কোন দেশের কে জানবার দরকার নেই—মানুষ, এই তো ঢের। পৃথিবীর উপর গণ্ডি কেটে এদেশ-ওদেশ করছে—এ সব ভেদের কথা ভুলে বসেছিলাম নিখিল মানবজাতির মহামিলনের মাঝখানে।

তাই ভাবি, এত যেখানে স্বতোৎসারিত প্রীতি—মানুষ কেমন করে বন্দুক-বোমা তাক করে অপর মানুষের দিকে? এমন সহজ-সারল্য মানুষের মধ্যে—তাদেরও হিংস্র জানোয়ার বানিয়ে তোলা হয়, সভ্য সমাজ ক্ষমতা ধরেন বটে! সম্মেলনটা বড় বস্তু সন্দেহ নেই—আমার কিন্তু এই লিখতে লিখতে আনন্দময় অবকাশগুলো মনের উপরে বেশি ঝিকমিক করছে।

সমস্ত ইতি করে যাওয়ার সময় এলো এবারে!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টানা ঘুম দেবো এখন দশটা অবধি। তারপর স্নান ও সেবাদি অন্তে পুনশ্চ ঘুম। চারটেয় উঠে—অতঃ কিম্—তত্ত্বতালাশি করে দেখা যাবে।

তাই হতে দিল আর কি! ওদের ক্লান্তি নেই—আয়েশ বস্তুটি একেবারে ভুলে বসে আছে। আজকেও ঠাসা প্রোগ্রাম। দশটা নাগাত চোখ মেলে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার। কাগজে কাগজে ফলাও করে খবর বেরিয়েছে সম্মেলনের সাফল্যের কথা।

সাড়ে-দশটায় ডেলিগেটদের সভা। কবে ফিরে যাওয়া হবে, কে কোন পথে যাবেন, যে সব প্রস্তাব নেওয়া হল দেশে গিয়ে তৎসম্বন্ধে কি করা হবে ইত্যাদি। বেলা দেড়টায় বিরাট সভা নিষিদ্ধ-শহরের প্রাসাদ-চত্বরে। এতদিন

হলের মধ্যে সকলে মিলে সভা করছে—পিকিনের অগণ্য নরনারী উৎসুক হয়ে আছে—কি করে এলে বাপু আমাদের খানিকটা শুনিয়ে যাও।

জনারণ্য। সেকালে রাজ-দরবার বসত পাথরে-বাঁধা এই উঠোনে। একতলার সমান উঁচু প্রশস্ত জায়গা সামনের দিকে—ওরই উপর রাজা ও হোমরাচোমরা বসতেন। একেবারে তৈরি জিনিস—বড় বড় সভা ডাকতে ওদের কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না।

দু-পাশে মানুষের সমুদ্র—মাঝখান দিয়ে পথ করে দিয়েছে। চলেছি আমরা দলে দলে। শেকহ্যাণ্ড করবার জন্য পাগল—করছিও। কিন্তু সব জিনিসের সীমা আছে। ইস্পাতের তৈরি হাত নিয়ে আসি নি, এটা রক্তমাংসের। হাতের পাতা এক সময় গরম হয়ে ওঠে, অসহ্য মনে হয়। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলি তখন আমরা। দু-দিক দিয়ে তারা বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে, যতদূর লম্বা করতে পারে। নাগাল পাচ্ছে না—একটু—আর একটু—হয়তো বা দেড় ইঞ্চি দু-ইঞ্চি—আর আমরা চলেছি দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেমন ভানুমতীর খেলা দেখায়। তিলেক এপাশ-ওপাশ হলে ওদের হাতের কবলে যাবো। শেকহ্যাণ্ডের দরকার নেই—হাত ছুঁতে পারলেই যেন মোক্ষ। আর কি পারত আমরা দেখুন—উভয় দিকে কড়া নজর রেখে সন্তর্পণে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলছি। এইটুকু নিশ্চিন্ত যে লাইন ভাঙবে না মরে গেলেও।

স্বর্গধামে সেকালের রাজা-মহারাজাদের পুণ্য পাদপীঠে তো উঠে পড়লাম। নিচের বিপুল সমাবেশের দিকে নজর হেনে দেখি, কালো কালো নরমুণ্ডে একাকার। সেই কালো জমিনের উপর সাদায় চীনা অক্ষর লিখে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম, লেখাটা হল—'হো-পিন' অর্থাৎ শান্তি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে আসবার সময় নজর হয়েছিল—সকলেরই খালি মাথা, তার মধ্যে খামোকা কতগুলো মাথার উপর সাদা টুপি। কি হেতু, বলুন তো সবজান্তা কেউ কেউ তখন বলেছিলেন, মুসলমান এঁরা—উৎসব-ব্যাপারে সাদা টুপি পরা মুসলমানের রেওয়াজ। তা যেন হল—কিন্তু এই ভাবে যত্র-তত্র ছড়িয়ে থাকার মানেটা কি ? মানে মালুম এল এবার। সাদায় সাদায় লেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে—উপর থেকে আমরা সেই লেখা পড়ছি।

ফুল আর শান্তির কবুতর—জাতীয় উৎসবের দিন সেই যেমন দেখেছিলাম। পারাবতও দুই রকম—জীবন্ত আর ছবিতে আঁকা। জীবন্ত পায়রা মওকা বুঝে জনতার হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ল, ঘুরতে লাগল আমাদের মাথার উপর, তারপর আকাশের দূর প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শান্তির

তাৎপর্য বোঝালেন বক্তারা। তার পরে উপহার—সকল দেশের অতিথিরা নানান রকম উপহার দিচ্ছেন নতুন-চীনকে। কো মো-জো আর মাদাম শান ইয়াৎ-সেন হাত পেতে পেতে নিচ্ছেন। উপহার স্তূপাকার হয়ে উঠল! আমার লেখা বই নিয়ে গিয়েছিলাম পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য—প্রাচীন মহানগরের উদ্বেলিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সম্রত শ্রদ্ধায় উপহার দিলাম। তারপরে গান—আবেশমত্ত কণ্ঠে আমাদের ক্ষিতীশ গান ধরল।

এই কাণ্ড সন্ধ্যা অবধি। হোটেলে গিয়ে হাত-পা ধোওয়ার সময় দেয় না—পিকিনের মেয়র পেং চেন ভোজে ডেকেছেন। সাতটায় সেখানে। আর পারি না রে বাপু। রক্ষে করো, সমাদরের বেগটা থামাও একটু—দম বন্ধ হয়ে আসে!

খাওয়াটা সান ইয়াৎ-সেন পার্কে। পার্ক মানে শুধু মাত্র মাঠ বিবেচনা করবেন না। নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে এক এলাহী জায়গা। তিয়েন-আন-মেন পেরিয়েই ঠিক সামনে। হাজার বছর আগে মন্দির ছিল এখানে। প্রাচীন সাইপ্রেস গাছ অজস্র। আর আছে ফুল—ফুলে ফুলে রঙের বাহার। আছে বেণুকুঞ্জ ছোট-বড় টিলার উপরে। খাল আর পুকুর—খালের উপর পাথরের পুল, কাঠ পুল। চিড়িয়াখানার মতন একদিকে—বানর, ময়ূর, নানা রকমের পাখি আছে। প্রশস্ত হলওয়ালা পুরানো ঘরবাড়ি—দেয়ালে দেয়ালে বহু বিচিত্র ছবি। জায়গাটা নতুন রকমের সাজিয়ে-গুছিয়ে ১৯৩৮ অব্দে জাতির জনকের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। বিকালবেলা দেখতে পারেন, মানুষ দলে দলে এই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিড়িয়াখানা-মিউজিয়াম দেখছে, খেলাধুলা করছে।

পৌঁছবো আমরা হলগুলোর ভিতর—মেয়র মশায় যেখানে টেবিল সাজিয়ে ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন। পৌঁছনো কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। এর চেয়ে সেই যে মহাপ্রাচীরে উঠেছিলাম—সে অভিযান অনেক হাল্কা ছিল। যত কলেজের ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে। কান-ফাটানো হাততালি। আর সেই দরকার—শেকহ্যাণ্ড, অন্ততপক্ষে হাতের ছোঁয়া একটুখানি। রক্ষা এই অতি-বড় নিয়মনিষ্ঠায় এদের পেয়ে বসেছে। পথের দু-ধারে অফুরন্ত সংখ্যায় গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু সেই যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, লোভ যত প্রচণ্ডই হোক, পা সেখান থেকে এক ইঞ্চি এগুবে না। অথচ খড়ি দিয়ে লাইন দেগে দেয়নি কেউ; এইও হাঁক দিয়ে সপাং-সপাং বেতের আওয়াজও ছাড়ছে না

কোন মাস্টার। শাসনের মানুষ কোন দিকে কাউকে দেখতে পাইনে। রেল-স্টেশনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি। দলে দলে স্টেশনে যেতে সমাদর করে নিয়ে আসতে, অথবা বিদায় দিতে। কিন্তু গাড়ির গায়ে গিয়ে কেউ দাঁড়াবে না, হাতখানেক দূরে সারবন্দি হয়ে সব থাকবে। মাথায় হাতুড়ি পিটলেও সেই জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বে না, যেন খুঁটো পুঁতে শক্ত করে পা বাঁধা।

খাওয়া আর কি হুল্লোড়! ভদ্রলোকে মুখ এবং হস্ত দিয়ে ভোজ খায়—এদের ভোজ খাওয়া সর্বাঙ্গ দিয়ে। ডায়েরিতে দেখছি, ভোজের সম্বন্ধে লেখা রয়েছে—'উঃ বিষম পচা মাছ আজকের টেবিলে?' এই নাকি ভারি এক উপাদেয় তরকারি! পরম তৃপ্তিতে সকলে পচা গজাল মাছ সাবাড় করছে। খাওয়া কতটুকুই বা—নাচ-গানই প্রবল। নটরাজের প্রলয় নাচন কোথায় লাগে! আমার তাগত নেই এ হেন বীরোচিত আহারের—প্রায় নিরম্বু উপোস সে রাত্রে।

খাওয়ার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যত রাত হোক আর যত ক্লান্তি লাগুক, যেতেই হবে। মি ল্যান-ফাং সেই কথা দিয়েছেলেন—তিনি নামছেন 'কুই-ফির সান্ত্বনা' নাটকে। ফাউ হিসাবে আছে নাম-করা কতক-ক্লাসিকাল নাচ গান। আর দেশ বিদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁদেরও অনেকে নিজ নিজ লোক-সঙ্গীত গাইবেন।

চললাম অপেরায়। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে, তা হোক—হেন শুভযোগ ছাড়তে পারিনে কিছুতে। নাট্যশালার জনক আমাদেরই খাতিরে স্টেজে নামছেন,—চীনে এসে তাঁর অভিনয় না দেখলে ছি-ছি করবেন যে আপনারা!

আরও মজা। যুবতী নায়িকা সাজবেন তিনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো-মানুষ—বিশ-বাইশের সুন্দরী সেজে দাঁড়াবেন। বুঝুন। অপেরা শুধু নয়, ম্যাজিকও দেখে নিচ্ছেন এক পালার ভিতর।

'নাচ-গানের সন্ধ্যা'—খাসা নাম দিয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা অবশ্য নয়—সে পার হয়ে গেছে ঘণ্টা চারেক আগে। বাজনা, নাচ-গান আর আলোর বাহার চলল একের পর এক। রকমারি লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাচ্চাদের নাচ-গান, শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি -সংগ্রাম চলেছে তারই নানা আলেখ্য। ভাল হচ্ছে, খুব তারিপ পাচ্ছে শ্রোতাদের।

আমি অধীর ভাবে প্রোগ্রাম ওলটাচ্ছি, মূল-পালা আসবে কখন? কুই-ফির সান্ত্বনা?

এ পালা আজকের বাঁধা নতুন কিছু নয়—পুরো শতাব্দী ধরে ক্ল্যাসিক্যাল নাটক দর্শকদের মাতিয়ে আসছে। এর আগে বলেছি, আবার শুনলেও দোষ নেই। চীন প্রবাদের নাম-করা রূপসী হলেন কুই-ফি। ঐতিহাসিক চরিত্র বটে—আমাদের যেমন পদ্মিনী কি নুরজাহান। সম্রাট তাং মিং-য়ুয়াঙের উপপত্নী। সেকালের দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখত রূপবতীর বিলোল-লাস্য—দেখে ফ্,র্তিতে ডগমগ হয়ে ঘরে ফিরত। এখানকার দর্শক ঐ একই পালা দেখতে দেখতে চোখের জল মোছে। অথচ পালার কথাবার্তা প্রায় কিছুই রদবদল হয়নি। আরও তাজ্জব, কুই-ফির পার্ট চল্লিশ বছর ধরে একই মানুষ করে আসছেন—মি ল্যান-ফাং। অভিনয়ের ধারা পালটেছে, মানুষেরও রুচি বদলে গেছে।

কিন্তু এ কি, আজ যে ভিন্ন লোক! প্রথম সারিতে আমরা বসেছি, কুই-ফি স্টেজে এলে তীক্ষ্ণ চোখে বারম্বার তাকাই। না, এ মেয়ে কক্ষনো মি নন। একসঙ্গে গল্প-গুজব করেছি, খেয়েছি পাশাপাশি বসে—ঠকালেন শেষ পর্যন্ত? দোভাষিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি হে—অসুখ-বিসুখ করল নাকি তাঁর?

দোভাষি অবাক করে দেয়, ঐ তো মি। হাঁা তিনিই—

বলছে যখন, কি আর করি—কিন্তু সংশয় রয়ে গেল। বিলকুল এমন ভোল বদলানো যায় মেক-আপের গুণে? পিকিন ছাড়বার দিন মি ল্যান-ফাং তাঁর লেখা একটা বই দিলেন আমায়। চীনা বই—আমি তার কি বুঝব? শেষ দিকে অনেকগুলো ছবি—বিভিন্ন রূপসজ্জায় মি। মেয়ে-পুরুষ, রাজা-ফকির, বুড়ো-যুবা (হামাগুড়ি দেওয়া শিশু কেবল্ নয়)—নানান চেহারার ফোটো। এঁরা যে সবাই একই মানুষ, ছবি দেখে কে বলবে? তার মধ্যে স্টেজে দেখা সেই কুই-ফিরও ছবি পেলাম বটে!

সেকালে পুরুষেরা মেয়ের পার্ট করত। এই হল অপেরার ঐতিহ্য (সেই রীতিক্রমে মি এখনো মেয়ে সাজেন)। আমাদের যাত্রার মতো। সেকালে আসরে অভিনয়ের মেয়ে পাওয়া যেত না বলেই হয়তো! চীন-ভারত দুই পুরানো জাতেরই এক গতিক। এখন দিন পালটেছে। কত চাই মেয়ে? গাদা গাদা মেয়ে নাচ-গান অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। কুই-ফি রূপী মি ল্যান-ফ্যাঙের ডাইনে বাঁয়ে চার-পাঁচ গণ্ডা সখী—তাঁরা সকলেই নির্ভেজাল মেয়ে।

জোৎস্না-প্রমত্ত রাত—মনে মনে বড় সাধ, এই রাতে কুসুমমণ্ডপে কুই-ফি রাজার সঙ্গে আনন্দোৎসব করবে, ভোজ খাবে। চলল সে মণ্ডপে। সাদা

মার্বেলের সেতু চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে, য়ুয়েন-ইয়াং পাখি সাঁতার দিচ্ছে জলে। রঙিন মাছ দেখছে কুই-ফি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে, উড়ন্ত বুনো হাঁস দেখছে। হায়, রাজা এলো না, সে এখন আর এক রানীর অন্দরে। অবসাদে কুই-ফি ভেঙে পড়ছে। সুরার মধ্যে সে সান্ত্বনা খোঁজে। নাচছে—পানোন্মত্তর অবস্থায় টলে পড়ে যায় বুঝি বা! খোজা চাকরকে পাঠাল, কিন্তু সে-ও সাহস করল না রাজার কাছে হাজির হতে। হতাশ কুই-ফি আবার ঘরে ফিরে চলল।

রাত আড়াইটে। বেদনা-বিহ্বল মনে আমরা হোটেলে ফিরছি। নারী ছিল খেলার সামগ্রী বড়লোকের কাছে। দুর্ভাগিনী কুই-ফি! রূপ হল অভিশাপ, বিলাস-কক্ষ বন্দিশালা।

লিফট থেকে ঘর অবধি গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ব—তা-ও আর পেরে উঠিনে। এত ক্লান্তি লাগছে। সকাল-সকাল উঠতে হবে, কাল ভোরে আমাদের বারো জন চলে যাচ্ছেন। ভারতের নানা অঞ্চলে ঘর, কিন্তু এখানে এসে এক পরিবারের হয়ে গেছি। আবার কবে দেখা হয় না হয়—ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর প্রবাসে যেতে হলে মানুষ যেমন করে, ঘরমুখো মানুষগুলো বিকাল থেকে আজ তেমনি মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছেন।

(১২)

এরোড্রোম অবধি চললাম—আরও যেটুকু তাঁদের সঙ্গ পাওয়া যায়। আলাদা বাসে ফুলের তোড়া সহ পায়োনিয়ার ছেলেমেয়েরা; ফুলের তোড়া দিয়ে আহ্বান করে এনেছিল, তোড়া হাতে দিয়ে বিদায় দেবে। শেষ রাত থেকে দুর্যোগ চলেছে—ঝোড়ো হাওয়া, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোড্রোমের এ-কামরায় ও-কামরায়। সময় পার হয়ে গেল, তবু প্লেনে উঠবার ডাক পড়ে না। কি ব্যাপার? দেখুন না আর কিছুক্ষণ—খাওয়া-দাওয়া করুন বসে বসে, কিংবা বই-টই পড়ুন।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে, যতগুলি হোটেল থেকে গিয়েছিলাম যেটের বাছা ঠিক ততগুলিই ফিরে এলাম। প্লেন উড়বে না—সাংহাই থেকে খবর হয়েছে, আরও খারাপ সেখানকার আবহাওয়া। ফুলের তোড়া যেমন-কে-তেমন পায়োনিয়ারদের হাতে, সিকিখানাও খরচ হয়নি। কেমন, চলে যাচ্ছিলেন বড় অভাজনদের বিভুঁয়ে ফেলে?

ফিরে তো এলাম। নেমে দাঁড়াতেই আবার বলে, উঠুন—। ব্যাকট্রিও-

লজিক্যাল মিউজিয়ামে যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেখে আসুন—সভ্য মানুষ আজ কত ক্ষমতা ধরে! বাঘ ভালুক বন্যা-মহামারী নিতান্তই নস্যি। সেই যে মহাপ্রাচীর দেখে ফিরবার সময় ঝর্নার জল খেতে দিল না, দুর্গম পাহাড়ের কোনখানে হয়তো বা বীজাণু-বোমা ফেলে গেছে—সেই থেকে দেখবার ভারি লোভ, কি এমন বস্তু যার নামে গাঁয়ে চাষাভুষো অবধি সন্ত্রস্ত!

খান আষ্টেক ঘর নিয়ে মিউজিয়াম। উত্তর-কোরিয়া এবং চীনের সীমানার মধ্যে যে সব বোমা ফেলেছে, তারই খোলা ও টুকরোটাকরা সাজিয়ে রেখেছে। দোভাষিরা ওত পেতে আছে, মানুষ পেলেই বোঝাতে লেগে যায়। কিন্তু মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন—প্রতিটি বস্তুর পরিচয় লেখা রয়েছে। বোমা মারতে এসে কতকগুলো প্লেন ঘায়েল হয়েছে, বোমাবাজ সৈন্যও ধরা পড়েছে কিছু কিছু। দেয়ালে সৈন্যদের ছবি টাঙানো—আর তারা নিজ হাতে জবানবন্দি লিখে দিয়েছে, তার ফোটো। মূল দলিল কাচের বাক্সে তালাবন্ধ। টেপ-রেকর্ডে অনেকের মুখের কথাও ধরে রেখেছে, সেই সব বাজিয়ে শোনাল। সবিস্তারে বলছে, কেমন করে মারণ-যজ্ঞে তাদের নামানো হল। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ছে, এ তো লড়াই নয়—নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্বিচারে খুন করা। কেমন করে সংক্রামক রোগের বীজ ছড়িয়ে গ্রামকে-গ্রাম উৎচ্ছন্ন করা হয় সেই কাহিনী খোলাখুলি বলছে তারা।

রাত্রে বলনাচের আয়োজন। বাজনা বাজছে, ডিনারের পর সাজগোজ করে সকলে হলে নেমে যাচ্ছেন। জাতীয় উৎসবের দিন আমি নেচেছি, ওরা দেখতে পাননি। আজকে কিন্তু ওঁরা নাচবেন, আমি মজা করে দেখব।

বেড়ে জমেছে। বর্ণচোরা এতগুলি নৃত্যবিশারদ আমাদের মধ্যে, কে ভাবতে পেরেছে? পলিতকেশ একজন—বিষম কাঠখোট্টা মানুষ, সামনে যেতে বুক দুরদুর করে—দেখি, কচিকাঁচা এক মেয়ের হাত ধরে নাচের ঠমকে গলে গলে পড়ছেন। হলময় এই কাণ্ড! মগ্ন হয়ে দেখছি—হায় রে, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে অধমের দিকেও। বসে আছেন যে বড়! সকলকে নাচতে হবে, বসে বসে দেখবার এবং দেখে দেখে হাসবার একজন কাউকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কাপুরুষ ব্যক্তি আমি, প্রস্তাব মাত্রেই কপালে ঘাম দেখা দিল। শৈশবে কিঞ্চিৎ সঙ্গীতভ্যাস ছিল—ভাল লোকের আসরে নয়, হাটের ফিরতি পথে বাঁশতলার অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যখন গা কাঁপত। নাচতে পারি, সে গুণের

কথাও জেনে ফেলেছেন পাঠককুল। কিন্তু সে হল আমার সেই দশ-বছুরে নৃত্যগুরুর চোখের উপর, পথের ভিড়ের মধ্যে—সে জায়গায় সাহস কত! সাজানো আসরে জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে অত সব বড় বড় ঝিকমিক মেয়ের সঙ্গে পা উঠবে না, পা দুখানা ধর্মঘট করে বসবে।

অনেক কষ্টে হাত এড়িয়ে থামের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। প্রেমচন্দের ছেলে অমৃত রায়—তাঁর উপরেও হামলা হচ্ছে। কিন্তু নড়াতে পারল না, বেকুব হয়ে শেষটা ফিরে গেল। ভরসা পেয়ে ঐ বীরপুরুষ অমৃত রায়ের টেবিলে গিয়ে বসি। দুটি মেয়ে একটু পরে এসে আমাদের সামনের চেয়ার দুটোয় বসল। থাকো বসে; চেয়ার খালি ছিল, তাই বসেছ—ব্যস! কেউ তাকাচ্ছে না তোমাদের দিকে। আরে মুশকিল, একটি ওর মধ্যে আবার ইংরেজি-জানা—হয়ত বা দোভাষির কাজ করে। বলল, এক পাক নেচে আসুন না আমার এই বান্ধবীর সঙ্গে। ভোজের আসরে বলে না, আমার পাশের লোকের পাতে মিষ্টি দাও—সেই গতিক আর কি! আর অমৃত রায় অমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ওঠেন, হাঁ-হাঁ—বটেই তো! আমি তাঁর হিল্লেয় এসে বসেছি, অথচ দরিয়ায় ঠেলে দিচ্ছেন তিনি। হাঁ-হাঁ—মোটে নাচেন নি আপনি, যান।

যে-ই না বলা, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অপর মেয়েটা। হাসছে মৃদু মৃদু, হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত ধরলাম না আমি। ইংরেজিনবিশটাকে বললাম, পায়ে ব্যথা আমার—সিঁড়ি থেকে পিছলে পা মচকে গিয়েছে, তোমার বান্ধবীকে বুঝিয়ে দাও—

মেয়েটি কেমনধারা দৃষ্টিতে তাকাল। সে দৃষ্টি এখনো মনে ভাসে। বোধ করি অপমান করা হল তাকে, আমার পক্ষে এক সামাজিক অপরাধ। বসে পড়ল সে চেয়ারে আবার, আসরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নাচ দেখতে লাগল। টিপি-টিপি আমি সরে পড়লাম—বিপদের ত্রিসীমানায় আর থাকছি নে।

সিঁড়িতে ডক্টর কিচলুর সঙ্গে দেখা। নামছেন তিনি এতক্ষণে। হেসে বললেন, কি হে, ঘুম পেয়ে গেল এর মধ্যে?

আজ্ঞে না, পালিয়ে যাচ্ছি—

(১৩)

যে ক'টা দিন এখন পিকিনে আছি, বাঁধা-ধরা কিছু নেই—এখানে-ওখানে দেখে-শুনে বেড়ানো। একদিন গ্রামে নিয়ে চলো না, হ্যাঁ মশায়!

শহরে কি তোমাদের খাঁটি চেহারা পাচ্ছি ? চলো একদিন গ্রামযাত্রা দেখে আসি।

সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। কাল। এক-এক গ্রামে পনের-বিশ জন করে তাতে যতগুলো গ্রাম লাগে। সকালবেলা বেরিয়ে সমস্তটা দিন টহল দিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরব।

তিন বছরে নতুন-চীন অসাধ্যসাধন করেছে। সব চেয়ে তাজ্জব ভূমিসংস্কার। চীনে পা দেওয়ার প্রথম ক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষ করছি, সারা দেশ ঘনশ্যাম রং ধরেছে! ফলাফলটা আরও ফলাও করে বুঝব কাল গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মোটামুটি শুনে নেওয়া যাক। এত বড় মাতব্বরকে পাকড়ানো গেছে, তিনি কিছু হদিশ দেবেন। চলুন পীসহোটেলে।

নিচের তলার এক বড ঘরে ঘিরে বসেছি ভদ্রলোককে।

আমাদের দেশের, ধরুন, আড়াই গুণ জায়গা। চিরকালের নিয়ম ভেঙে এত বড় দেশের ভূমি-বণ্টন কি করে তিনটে বছরের মধ্যে করে ফেলবেন, বলুন দিকি ? কোন্ মন্ত্রে ?

তিন বছরে নয়, ওটা আপনাদের ভুল ধারণা। বরঞ্চ বছর ত্রিশেক বলুন। উনিশ শ' একুশ থেকেই এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

জমির ক্ষুধা চাষীমানুষের চিরকালের। নিজের ক্ষেতখামার হবে, আপন জমি চাষ করবে, এ তার সবচেয়ে বড সাধ। এর জন্য বিস্তর লড়াই করে এসেছে—চীনের ইতিহাসে দু হাজার বছর আগেও তার খবর মেলে।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশের অক্টোবর থেকে গোটা চীন জুড়ে নতুন ব্যবস্থার চলন হল। কিন্তু আগেও কোন না কোন এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল! ঘাঁটি বানিয়েই সঙ্গে সঙ্গে এমনি ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা···যাবতীয় পরিকল্পনার সকলের পয়লা নম্বরে হল এটা। হাতে-কলমে করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে অনেক রকম, বিস্তর কাটকুট করতে হয়েছে। গোড়ায় ছোট্ট দাবি, —জমির খাজনা কমানো হোক, সুদ-খরচাও অত দিতে পারব না। দাবি বাড়তে বাড়তে উনিশ শ' ছেচল্লিশে একেবারে মোক্ষম কথা—জোড়াতালিতে হবে না, জমিদারের জমি খাস করে চাষীদের ভিতর বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। লাঙল যার জমি তার। জাপানিরা উৎখাৎ হল ঐ সময়ে! অনেক জমিদার জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তাদের জমি কেড়েকুড়ে চাষীদের দেওয়া হল। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, ঘাসপাতা আর-মুখে

তুলছে না। মাও সে-তুঙের সেই কবে থেকে চাষীদের সঙ্গে মহরম-মহরম—তিনি ঠিক বুঝেছিলেন চীনের শাসনভার পাবে সেই দল, চাষীকে যারা জমি দিতে পারবে। তাই আজ দেখুন সরকারের একটু-কিছু ঘটলে কোটি কোটি চাষী মুঠোয় করে প্রাণ নিয়ে আসবে ছুম করে ছুঁড়ে দেবার জন্য! পুরানো বনেদি জাত ওরা—নতুন দলের সম্পর্কে বিস্তর ভয়-সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঐ একটা কাজ করেই রাতারাতি এরা তাবৎ চাষীর হৃদয় জয় করে ফেলল। চাষী, শ্রমিক আর ছাত্র ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা দলে ভিড়ে গেছে। একটা কথা জেনে রাখুন—ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা জোট পাকিয়ে বোমায় পথ সাফাই করে বেয়নেট ঘিরে চিয়াংকে যদি গদিতে এনে বসান, চীনের মাটিতে তিলার্ধ সে ব্যক্তি তিষ্ঠাতে পারবেন না।

জমির মালিক জমিদার—ঈশ্বর বোধ করি ইজারা দিয়ে দিয়েছেন তাকে। জমি চষবে কিন্তু অন্য লোক। অথবা টাকা পেয়ে জমিদার জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে অন্যকে; নিয়মিত খাজনা আদায় করে তার কাছে। এক শ' জনের মধ্যে পাঁচজন এরা গুনতিতে—অথচ জমি দখল করে ছিল অর্ধেকেরও বেশি।

চাষী হল চার রকম। জমিদারের নিচেই ধনী-চাষী, আমাদের দেশের জোতদার-তালুকদার আর কি! তার নিচে মধ্যবিত্ত-চাষী—নিজ হাতে চাষবাস করে, কায়ক্লেশে অশন-বসন জোটায়। গরিব-চাষী হল সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি, তারা দিনরাত ক্ষেতে খেটেও খেতে পায় না, মজুর-বৃত্তি করতে হয়। ফসলের প্রায় অর্ধেক দিতে হয় খাজনা বাবদে; অসময়ে ফসল ধার করতে হয়, সুদ তার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। কোন দিন শোধ হবার আশা নেই। বাদবাকিদের আর চাষী বলা কেন—পুরোপুরি মজুর—পরের জমি চাষ করে, নিজের বলতে এক কাঠাও নেই দুনিয়ার উপর।

কৃষক-সমিতি গ্রামে গ্রামে। সমিতির মধ্য দিয়া চাষীরা বল-ভরসা পায় জমিদারের অত্যাচারের কথা মুখে বলবার। একা হলে পারত না। অত্যাচারের দু-একটা শুনতে চান নাকি আপনারা? বেশি শোনালে তো কানে আঙুল দেবেন। শুধু মাত্র টাকা-পয়সার শোষণ নয়—বিস্তর বীরপুরুষ আছেন যাঁরা খুনই করেছেন দশ-বিশটা। মাকড় মারলে ধোকড় হয় তো গরিব মারলে হানি কিসের? শুধু বাইরের মানুষ মারে নি, ঘরের দু-পাঁচটা পত্নী ও উপপত্নী মেরে পূর্বাহ্নে হাত রপ্ত করে নিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত হামেশাই মেলে। আর এ গৌরব পুরুষমানুষেরই নয় শুধু। মেয়ে জমিদারনীও চাপে

পড়ে মানুষ খুন করার আত্মকীর্তি ফাঁস করেছেন। এক প্রবীণ সৌম্যদর্শন জমিদার দুঃখ জানালেন, প্রজাপাটকের মধ্যে বিয়েথাওয়া হলে নববধূর প্রথম রাত্রিবাস তাঁর সঙ্গে। বরাবর তিনিই এই অধিকার উপভোগ করে এসেছেন। এমন পাওনাটাই যদি রহিত হয়ে গেল, জমিজমা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। চুলোয় যাকগে জমিদারি!

ভূমি-সংস্কার—চিরকালের এক পাকা রীতি চুরমার করে দেওয়া—বড় কঠিন কজ—জমিদারের বিস্তর অর্থ ও প্রতিপত্তি—সহজে ছেড়ে দেবে না তারা। চাষীরাও কিল খেয়ে কিল চুরি করবে যতক্ষণ না সুনিশ্চিত বুঝছে, দেশের শাসনশক্তি পুরোপুরি তাদের দিকে। সমিতিগুলোর মধ্যে চোরাগোপ্তা জমিদারের লোক ঢুকে যাচ্ছে, পরিকল্পনা নিয়ে খুব সতর্ক ভাবে এগুতে হবে অতএব।

এক একটা অঞ্চল নিয়ে পড়ো, তার মধ্যে বিশেষ করে একটা গ্রাম বেছে নাও। শহর থেকে পাকাপোক্ত কর্মীরা এসে গেছে, গ্রামকর্মীরা আছে, আছে সমিতির প্রতিনিধিরা। সরকারি নীতি তারা লোককে বোঝাচ্ছে। বুঝে দেখ ভাই সব, জমিদার প্রজাসাধারণের জমিজমা ছলে বলে আহরণ করেই তো এমন ফেঁপে উঠেছে? মিটিং হচ্ছে, জমিদারের ছল-চাতুরী পাপ-অন্যায় সর্বসমক্ষে মোকাবিলা হবে সেখানে। গণ-আদালতে বিচার হবে বড় বড় অপরাধে অপরাধী যারা। 'হোয়াইট-হেয়ার্ড গার্ল' ছবির শেষটা দেখেছেন তো? সেই ব্যাপার।

দুটো শ্রেণী এমনি ভাবে আলাদা করে ফেলা হল, যাদের স্বার্থ একেবারে উল্টো। আপিল চলবে অবশ্য এই দল ভাগ করার ব্যাপারে। সকল পদ্ধতি পার হয়ে এলে সর্বশেষে পাকা সরকারী মঞ্জুরি। তার পরেও ব্যতিক্রম আছে কিছু কিছু। ধরুন, বুড়ো অশক্ত হয়ে পড়েছে একটা লোক কিংবা বাপ-মা হারিয়েছে এক শিশু। অথবা মুক্তিবাহিনীতে থেকে লড়াই করেছে কেউ। জমিদার শ্রেণীর হলেও এদের সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা হবে, আক্রোশ বসে কিছু করা হবে না।

তারপরে জমিদারি বাজেয়াপ্ত—চাষীর মধ্যে জমির বিলিব্যবস্থা। জমিদারি উৎখাত হল, কিন্তু জমিদারও সমাজের মানুষ—নিয়মমাফিক তারাও জমি পাবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীর চেয়ে কিছু বেশিই। আর ভাল লোক হলে, তাকে প্লট বেছে নিতে দেওয়া হবে আগেকার দখলি সম্পত্তির ভিতর থেকে। তবে, বাপু, নিজে চাষবাস করতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো

মজুর লাগাও। কিন্তু অন্যকে বিলি করে দিয়ে খাটে বসে পা দোলাবে আর উপস্বত্ব খাবে—সে সত্যযুগ চিরকালের জন্য খতম হয়ে গেল।

চাষীর সব চেয়ে বড় সাধ, নিজের ভুঁই-ক্ষেত হবে, সেখানে ফসল ফলাবে। সাধ পুরেছে এত দিনে। গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত উৎসব। পুরানো দলিলপত্র গাদা গাদা বয়ে এনে আগুনে দিচ্ছে। দলিল পুড়ল, আর পুড়ল চাষীর চিরকালের মনোবেদনা।

রবিশঙ্কর মহারাজ বেজায় মেতেছেন। মানুষের ভাল দেখলেই খুশি। কোন্ জাত, কোথায় ঘর—এই সব অবান্তর কচকচি নিয়ে মাথা ঘামান না। একদিন বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মহাত্মাজী যা সমস্ত চেয়েছিলেন—সে আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, এই আমাদের চিরদিনের রীতি মহারাজ! গেঁয়ো যোগীদের কলকে দিইনে ভিন্‌দেশে গিয়ে তাঁদের আসর জমাতে হয়। প্রভু বুদ্ধের নাম আমার দেশে ক'টা জায়গায় শুনে থাকেন? এখানে তাঁর কত মঠ-মন্দির! নতুন আমলে এখনও হলদে আলখেল্লা-পরা শ্রমণরা বুদ্ধের নামগানে আকাশ-ভুবন বিমন্দ্রিত করছেন। মহাত্মাজীরও হয়তো বা তাই—স্বদেশের চেয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে বেশি খাতির হবে।

দুপুরে মহারাজের দলে ভিড়ে পড়লাম। ছোট্ট দল ওঁদের—উমাশঙ্কর যোশি, যশোবন্ত, প্রাণশঙ্কর শুকলা আর মহারাজ—বড় দলের মধ্যেও দেখছি, এই তিনজন স্বতন্ত্র সদাই। হৈ-চৈ নেই, শান্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন এটা-ওটা। আজ ওঁরা পিকিনের এক ইস্কুল দেখতে যাচ্ছেন। চলুন, আমিও যাবো।

আট নম্বর মিডল-ইস্কুল। ইস্কুলের নাম এখানে সংখ্যা দিয়ে। তার মানে পড়াশোনার ইতরবিশেষ নেই এ ইস্কুলে ও-ইস্কুলে। ঝকঝকে বাড়ি, অনেকটা জায়গা নিয়ে। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—হাঁকডাক করে পরম আদরে নিয়ে গেল। ধবধবে পোষাক পরা ছেলেরা ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়া করছে। আমাদের গেঁয়ো পাঠশালায় সেকালে ইনস্পেক্টর এলে এই দেখেছি। আগের দিন সমঝে দেওয়া হত—ধোপানো কাপড় পরে আসবি, টুঁ শব্দ হয়েছে কি পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর। বারোমেসে অনিয়মের মধ্যে একটা দিনের ঐ শৃঙ্খলার উৎপাত। কিন্তু আমরা তো আগে-ভাগে জানান দিয়ে আসিনি—এত ছিমছাম হবার এরা সময় পেলো কখন?

সকলের নিচের ক্লাসে ঢুকলাম ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট মশায়ের সঙ্গে। ভারত কোথায় জানো, এঁরা হলেন সেই ভারতের লোক। তামাম ক্লাস ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলো দিকি? মনে রাখবেন, এ হল নেহরুর চীনে যাবার অনেক আগের কথা। তবু নানান দিক থেকে অনেকেই নাম বলে ওঠে। নানান শ্রেণীর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে দেখি, নেহরুর নাম জানা অনেকেরই। আর রবীন্দ্রনাথকে জানে—কলেজ-পড়ার মধ্যেই বেশি।

উপর-নিচে এক পাক বেড়িয়ে এলে হলের ভিতর লম্বা টেবিলের দুধারে জাময়ে বসা গেল। আমরা চারজন, মাস্টার মশায়রা আর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চা-সেবন এবং তৎসহ মোলাকাত চলছে। যেমন যেমন শুনলাম, টুকে নিয়েছি। এর থেকে শিক্ষার হাল-চাল বুঝে নিন গে আপনারা।

জুনিয়ার সিনিয়ার দুটো বিভাগ। তিন বছর লাগে এক এক বিভাগের পড়া শেষ করতে। সাতাশটা ক্লাশ—ছেলেও সাতাশ শ'র কাছাকাছি। কর্মীরা হচ্ছেন মোট পঁচানব্বই—ওর মধ্যে মাস্টার হলেন চুয়ান্ন জন। কেরানি ইত্যাদি তবে হিসাব করে নিন।

প্রেসিডেন্ট আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন আমাদের যেমন হেডমাস্টার ও অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার। পড়াতে হয়, আবার দেখাশুনাও করতে হয় সকল রকম। আমাদেরই মতই। আবাসিক ইস্কুল—ছেলেদের বোর্ডিং-এ থাকতে হবে; তিন বারের খাওয়া—এক মাসের মোটমাট খাইখরচা ৭৫,০০০ ইয়ুয়ান। ঘরভাড়া ছয় মাসের একসঙ্গে দিতে হয়—১০,০০০ ইয়ুয়ান। মাইনেপত্তোরের ঝামেলা নেই, পাঠ্য বইও মুফতে পাওয়া যায়। এ দায় সরকার ঘাড় পেতে নিয়েছেন। শিক্ষালাভ করতে চায়—সে বাবদে আবার গাঁটের পয়সা খরচ করবে, এ কেমন কথা! গরিব বলে দরখাস্ত ছাড়লে খাইখরচাও মকুব হয়ে যায়, সরকার সেটা দিয়ে দেন স্কলারশিপ হিসাবে।

ইস্কুল আটটা-পাঁচটায়—মাঝে দু-ঘন্টা, বারোটা থেকে, ছুটো, নাওয়া-খাওয়া ফাঁক। তিন ঘণ্টা পড়াতে হয় মাস্টার মশায়দের। বাকিটা অবসর। তা-ও ঠিক নয়—নিয়মিত গবেষণা ও শলাপরামর্শ হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার যাতে উন্নতি করা যেতে পারে!

এই ইস্কুলটা চালু করেন কুয়োমিনটাং-কর্তারা। এখন ন'টা ক্লাস, সাড়ে চার শ' ছেলে। এই যে বিশাল বাড়ি দেখছেন, ১৯৫০-এর শেষাশেষি এটা তৈরি—নতুন-চীনের জন্মের ঠিক এক বছর পরে। এ বছরও তিনটে নতুন ক্লাস বেড়েছে। খেলার মাঠের ঐ দেয়ালটাও এ বছরের।

শিক্ষার কায়দাকানুন বদলে যাচ্ছে নতুন কালে। শুধু পাণ্ডিত্য নয়—ছেলেরা যাতে স্বদেশপ্রাণ হয়, সেই শিক্ষা আমাদের। স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণতা শেখানো হয়—মানুষে মানুষে তফাত নেই, এই তত্ত্ব শিখছে শিশু বয়স থেকে। লড়াইয়ের উপর বিষম ঘৃণা—বড় হয়ে এরা পৃথিবীর শান্তি কোন রকমে বিঘ্নিত হতে দেবে না। মাও-তুচিকে বড় ভালবাসে ছেলেরা আপন জন মনে করে।

কেমিস্ট্রির যন্ত্রপাতি ৩৫৪২ দফা, বায়োলজির ৯৩৬ দফা—সবই প্রায় হালের আমদানি। ল্যাবরেটারির উত্তম ব্যবস্থা—ঘুরে দেখেই মালুম পাবেন। লাইব্রেরির বই আঠাশ হাজারের উপর

মাস্টার মশায়দের উপর সরকারের খুব নেকনজর। মাইনে গড়পড়তা ন' লক্ষ ইয়ুয়ান। সব চেয়ে বেশি যিনি পান তিনি দশ লক্ষ! সব চেয়ে কম ছ' লক্ষ। ৫৫০ ক্যাটিশ চাল বা ময়দা মেলে ন-লক্ষ ইয়ুয়ানে! আগেকার দিনে মাস্টারেরা পেতেন ২২০ ক্যাটিসের মতন। জীবনমান অতএব শতকরা পঞ্চাশ যাটের মতন বেড়েছে। বিষম খুশি সেজন্য তাঁরা, প্রাণ ঢেলে পড়াচ্ছেন। ছাত্র-শিক্ষকে ভারি ভাব। ছেলেদের পড়াশুনোর চাড় খুব বেড়ে গেছে। আগেকার দিনে ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে যাবতীয় পড়াশুনো হত। ছেলেদের নিয়ে দেশময় দেদার ঘোরাঘুরি এখন।

ল্যাবরেটারিতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সত্যিই তাজ্জব হলাম। এই তো এক ইস্কুল—দশ-বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলেরা। সেই বালখিল্যমণ্ডলীর গবেষণার বাহার দেখুন একবার! ভারিক্কি চাল—এটা ঢালছে ওটা মাপছে। তাকিয়ে হেসে পড়ছে আমাদের দিকে, আবার তখনই ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কাজে লেগে গেল। তিলেক অপব্যয়ের সময় নেই। লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে দুটো করে মাইক্রোস্কোপ। চোঙায় একবার করে চোখ দিচ্ছে, আর কাগজে আঁকছে যা আসছে চোখের নজরে···

তারপরে ছুটির ঘণ্টা বাজল। ওদের সঙ্গে আমরাও ছুটে এলাম খেলার মাঠে। নানান দলে ভাগ হয়ে খেলছে, খেলাই বা কত রকমের! নাচ হচ্ছে—নাচে-গানে মিলিয়ে আধেক-তাণ্ডব গোছের খেলা। দেবশিশুর মতো একটা ছেলে তার নিজের হাতে আঁকা ছবি দিল আমাকে। আর বুকের ব্যাজ খুলে আমার জামায় পরিয়ে দিল। ছেলেটার নাম নিয়ে এসেছি—চাও-উই-সিয়ান (Cao-wei-Hsian)। আর কিছু জানিনে তার, শুধু এই নামটুকু। চেয়ে দেখি, আর তিন জনকেও অমনি ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে। ইস্কুলের ব্যাজ—

ছাত্ররাই শুধু পরতে পারে। কি করব বলুন—আপনাদের কাছে এত গণ্যমান্য হয়েও বিদেশ-বিভূঁয়ে এক মিডল ইস্কুলের পড়ুয়া হয়ে যেতে হল।

(১৪)

১৬ অক্টোবর। তারিখটার নিচে দাগ দিয়ে রাখবার মতো। গ্রামে যাচ্ছি—খাঁটি চীন সেখানে দেখতে পাবো। সেদিন অবধি দুঃখী সর্বসম্বলহীন—আজকে কত হাসি সেই সব মানুষের মুখে। কোন্ ম্যাজিকে এসব হয়, গাঁয়ে গিয়ে তার যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।

বাসে চড়ে ছুটেছি প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে। সঙ্গে মোটরকারও যাচ্ছে—তদ্‌গর্ভে রবিশঙ্কর মহারাজ ইত্যাদি। আমার গাঁয়ের বাড়ি স্টেশন থেকে বিশ মাইল। বাসে যেতে হয়। সেই বাড়ি যাওয়ার ফূর্তি হঠাৎ লাগছে মনে। পিকিন কত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, খোলামেলার মধ্যে সেটা মালুম পাচ্ছি। শহরে সরে গিয়ে দু ধারে মাঠ এখন। মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। অলস চোখে চেয়ে বাংলা দেশ বলে দিব্যি ভাবা যেতো, কিন্তু খামোকা এক এক পাহাড় উদয় হয়ে ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

রাজপথ ছেড়ে ডাইনে বাঁকলাম। এ পথও কিছু নিন্দের নয়—আগের তুলনায় কতকটা সরু। তার পরে মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি। একটা নালা মতন জায়গা, উপরে পাথর ফেলা। বাস পাথরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা—প্রণিধান করে দেখতে ড্রাইভার নেমে পড়ল। আমরাও নেমেছি।

উঠুন, উঠে পড়ুন, যাবে—

কিন্তু একবার যখন মাটিতে পা ঠেকিয়েছি, কার কত ক্ষমতা আবার ঐ খোপে নিয়ে তুলবে! প্রাণ এমন ফেলনা নয় হে বাপু, নতুন-চীনে যা দেখে যাচ্ছি, দেশের ভাইব্রাদারদের কাছে তাই নিয়ে আসর জমাতে হবে না?

হেঁটে চললাম খুচরো খুচরো দল হয়ে। স্লুইস গেট। খালের জল ক্ষেতের উপরে সরবরাহের ব্যবস্থা; গাঁয়ের জলনিকাশও হয় এই খাল-পথে। বাঁধা-পুলের উপর দাঁড়িয়ে আবর্তিত জলধারা দেখলাম খানিক। মাছ মারছে বুঝি—কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে, বদরসিক সঙ্গীরা অত উজান ঠেলতে রাজি নন। মনোবাসনা অতএব ঝেড়ে ফেলতে হল। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ—পরিচ্ছন্নতার ব্যাধি এদ্দুর এই গাঁয়ে এসেও পৌঁছেছে। পাশাপাশি গোটা কয়েক ডোবার

ধার দিয়ে যাচ্ছি। অগভীর স্বচ্ছ জল—তলা অবধি দেখা যায়। তলায় ঝাঁঝি, অজস্র লাল মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যে লাল মাছ কাচের বোয়ামে পুরে আপনার বৈঠকখানার শোভা বাড়ান, ওদের খানা-ডোবা ভরতি সেই মাছে।

তারপর পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। ঘরবাড়ির গা ঘেঁসে চলেছি। দু-তিনটে রাস্তার মোহনা অথবা একটুকু সদর জায়গা হলেই দেখতে পাচ্ছি, ব্লাকবোর্ড টাঙানো, তাতে অজস্র চীনা হরপ লিখে রেখেছে। প্রশ্ন করে অবগত হওয়া গেল, গ্রামের যাবতীয় খবরাখবর। এবং কৃষক সমিতি ও অপরাপর সমিতির নির্দেশনামা। যত্র-তত্র কপোতের ছবি—অতএব পিকিনে যে সম্মেলন সেরে এলাম তার যাবতীয় বার্তা পৌঁছে গেছে; সারা চীনের সকল জায়গায় শান্তির কপোতের বাসা। মানুষের ছবিও বিস্তর লটকানো। হিজিবিজি পরিচয়—পড়তে না পারলেও চেহারা দেখে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, সাধারণ চাষাভুষো কেউ। সকলের নজরের সামনে ঐ সব বদখত মূর্তি টাঙিয়ে দিয়েছ কেন হে?

কৃষক-বীর ওঁরা—

শুনলেন? লাঙল ছাড়া জীবনে যারা হাতিয়ার ধরে নি, তাদের নামে লেজুড় লাগিয়ে দিয়েছে—'বীর'!

আপনি আমি হাসছি বটে, কিন্তু কৃষক-বীরের ভারি ইজ্জত সমাজের মধ্যে, লড়াই-জেতা সেনাপতিও বোধ হয় অত খাতির পান না। কি না, জমিতে উনি দেড়া ফসল ফলিয়েছেন। শুধুমাত্র ছবিতে শোধ নয়—যাও দিন কতক আরামের প্রাসাদে কাটিয়ে এসো। জাতজন্ম আর রইল না! রাজা মহারাজারা শখ করে বানিয়ে অনুপম সজ্জায় সাজিয়েছে—দেখুনগে যান তাদের গদির উপর ঠ্যাং তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা
তাদের গদির উপর ঠ্যাং তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা
চাষী, কয়লা-খনির কালি-মাখা শ্রমিক।

গাঁয়ের নামটা কি যেন বললে?

কাওবিত্তিয়েং—

ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকি। পিকিন থেকে দোভাষি সঙ্গে এসেছে। ইংরেজি বানানে সে লিখে দিল। গ্রামের মণ্ডল দলের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম হু-চিং। নিতান্তই হাল আমলে ভদ্রলোক এবং মণ্ডল হয়েছেন, দাঁত-উঁচু চুল-খাটো একেবারে গ্রাম্য চেহারা। এক দঙ্গল মেয়ে আর ছেলে পাড়াগাঁয়ের বর এগোবার কায়দায় চলে এসেছে অভ্যর্থনা করতে। ছোট ছোট ঢোলক বাজাচ্ছে মেয়েরা—যে রকম ঢোলক নিয়ে

আমাদের বাচ্চারা খেলা করে। ঢোলকের সঙ্গে কত্তাল—রাক্ষুসে কত্তাল, বড় বগিথালার সাইজ। তারা আমরা মিলে দস্তুর মতন এক মিছিল।

নিয়ে বসাল জুনিয়ার মিডল-স্কুলের বাড়িতে। বড় হল—হলের লাগোয়া ঘর। তারপর উঠান। উঠানের ওদিকে আরও তিনটে ঘর পাশাপাশি। ইস্কুল বসেছে ওদিকটায়। আগে দেবস্থান ছিল গোটা বাড়িটাই। পুরানো বাড়ি আগাগোড়া মেরামত হয়েছে, কাচের জানলা বসেছে। মাও-র ছবি সামনের দেওয়ালে। টানা-টেবিলের দুধারে আমরা বসেছি খানাপিনা ও আলাপ-সালাপ হচ্ছে। মহিলা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী জো এসেছেন, তিনিও দরিদ্র চাষী-ঘরের মেয়ে। মেয়েদের এমন সম্ভাবনার কথা কে ভাবতে পেরেছিল ক'টা বছর আগে?

মণ্ডল মশায় বক্তৃতা পড়ছেন, দোভাষি ইংরেজি করে যাচ্ছে। আমি পাশে বসে টুকছি। জবর এক বই লিখব চীন সম্পর্কে, এটা কেমন চাউর হয়ে গেছে। দোভাষি থেমে থেমে বলছে, তাকিয়ে দেখে ঠিক মতো আমি টুকতে পারছি কিনা।

"৬৫৩ ঘর বসতি এ গ্রামে, মোটমাট ৩০১২ জন মানুষ। আবাদি জমির পরিমাণ ৫২৫৬ মো। ভূমি-সংস্কারের আগে ১২টা জমিদার ছিল—২০৮৮ মো জমি তাদের দখলে। কি অত্যাচার করতো যে জমিদারগুলো। যাবতীয় রাজনীতিক ক্ষমতাও প্যাঁকে-চক্রে তারা দখল করেছিল। এর মধ্যে আটজন ভারি জবরদস্ত—তাদের নাম হয়েছিল আট মুগুর। এক জমিদার—ম্যাং-আউং কত নারীর যে সর্বনাশ করেছে! ভূমি-সংস্কারের অল্প কিছু দিন আগেও এক কৃষক-বধূকে ধরে নিয়ে গেল। কি হল মেয়েটার, আর কোন খোঁজ হয়নি।

নতুন-চীনের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি-সংস্কার। জমিদারি উৎখাত করে চাষীদের জমি দেওয়া হল। কত কাল থেকে বলুন তো, ভূমির জন্য ক্ষুধাতুর হয়ে আছি আমরা!

গাঁয়ে কৃষক-সমিতি হল, সভ্য প্রায় ছ'শ। কিছু কর্মী এলো বাইরে থেকে। জমিদারের বিরুদ্ধে এরাই সব ব্যবস্থা করল। জমিদার কি অল্পে ছেড়েছে? নানান রকম কায়দা-কৌশল, দল-ভাঙাভাঙি। জমি, মজুত ফসল, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করবার পর তবে তারা সায়েস্তা হল। বাইশের মধ্যে বারোটি জমিদার-পরিবার আছে এখনো গাঁয়ে, তারা লোক খারাপ নয়, বেশি শয়তানি-বজ্জাতি করেনি ভূমি-সংস্কারের সময়। তাই দেশের একজন হয়ে

দিব্যি আছে তারা। জন-প্রতি ২'২ মো জমি (৬ মো=১ একর) তবে বাপু গায়ে গতরে খাটতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো, মজুর-কিষাণ খাটাও। কিন্তু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাজনা আদায় আর প্রজাপাটকের উপর হুমকি দেওয়া চলবে না। জমিদার ছাড়া ১১ ঘর ধনী-চাষী আছে—তারা জন-প্রতি পেয়েছে ২'৭ মো। ১৭৩ ঘর মধ্যবিত্ত-চাষী—তাদের প্রতি জনের জমি ৩'৩ মো। আর গরিব-চাষী ও ক্ষেত-মজুর হল ৪১০ ঘর—তাদের প্রতি জন জমি পেলো ১'২৫ মো হিসাবে। অত্যাচারী জমিদারের জমির সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মোট ২৪০ খানা ঘর, ৪টা চাষের পশু, ৩টা বড় গাড়ি আর ১২৫ দফা আসবাবপত্র। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি তার কতক পেয়েছে, বাদ-বাকি বিলি করে দেওয়া হয়েছে চাষীদের মধ্যে। এক মেয়ে জমিদার আছে—ওয়া-চাউ। ভূমি সংস্কারের পর নিজেই সে চাষবাস করে। স্ফূর্তিতে আছে, দশ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে গেছে একেবারে।

নতুন চেহারা গ্রামের। সেদিন ন্যুব্জদেহ ভূমিদাসেরা নেই। আজ তারা বলিষ্ঠ মানুষ—রাজনীতিক চেতনা হয়েছে তাদের, শিক্ষা পাচ্ছে। চাষবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাই প্রধানত। সরকার গেল বছর ৫৯১ লক্ষ মিলিয়ন ইয়ুয়ান চাষীদের ধার দিয়েছে পশু ও যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য। উৎপাদন খুব বাড়ছে এই ভাবে। এক জমিতে দুটো তিনটে ফসল ফলাচ্ছে বছরে। ১৯৫০ সালে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ ১৪৪৩ পিকো (১ পিকো=১৩৩ পাউণ্ড); ১৯৪৯ এর তুলনায় ২৩'৮ শতক বেশি। আর ঠিক হয়েছে, এই ১৯৫২ সালে ওটা ১১৫১২ পিকোয় তুলতে হবে সরকারের খুব নজর এদিকে। লাভও আছে। খাজনা টাকায় নয়, উৎপন্ন জিনিষের শতকরা ১৩ ভাগ। উৎপন্ন বাড়লে খাজনাও বেড়ে যাবে। ৩২টা কুয়া আছে গ্রামে; ১১টা জলচাকি। পশুর সংখ্যা বেড়েছে—৮৪ থেকে ৯৬। গাড়ি ৪৯ থেকে ৮১। তিনটে স্প্রে আনা হয়েছে জমিতে জল দেবার জন্য, তিনটে নতুন ধরনের লাঙল।

৪২টা মিউচুয়্যাল-এইড-টিম আছে। বস্তুটা কি বুঝলেন? ধরুন, এক বাড়ির জমি আছে ১৪ মো, খাটনির মানুষ ৩ জন। আর এক বাড়ির জমি ১২ মো খাটনির মানুষ ১০ জন। দু'বাড়ির ২৬ মো জমি ১৩ জনে মিলেমিশে চাষ করল, ফসল তুলল এক খামারে। তারপর ফসল সমান ভাগ করে নিল। ওদের জমি বেশি, মানুষ কম। এদের মানুষ বেশি, জমি কম—তারই হারাহারি করে নেওয়া হল। পদ্ধতিটা মোটের উপর এই।

মানুষ সুখী সচ্ছল,—খুব খরচপত্র করছে। ষোলটা পরিবার নতুন ঘর

বেঁধেছে মোট ৭০ খানা। তার মধ্যে ১৬ খানা প্রয়োজনের নয়, তিনাইই শখ করে বানানো! নববর্ষের উৎসবটা সকলের সেরা। ঐদিন একটু ময়দা খাবার জন্যে সকলে আঁকুপাকু করত; সঙ্গতিতে কুলিয়ে উঠতে পারত না। এখন মাসে দশ-বারো দিন তারা ময়দা খায়। আগে এক প্রস্থ কোট-পাজামায় বছর কাবার হত, এখন শীতের গরমের আলাদা আলাদা পোশাক। আর উৎসবের পোশাক-আশাক দেখে তো চক্ষু কপালে উঠবে---নিষিদ্ধ শহরের কবরখানা ফুড়ে বেরিয়ে সেকালের রাজরানীরা যেন গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনটে বছর আগে একমুঠো ভাত পেলে যারা বর্তে যেতো, সেই চাষার ছেলে মেয়ের হাতে রিস্ট-ওয়াচ, পকেটে ফাউন্টেন-পেন।

সমবায়-দোকান হয়েছে, গাঁয়ের মানুষ টাকা দিয়ে সভ্য হতে পারে; লাভের বখরা পাবে। জিনিসপত্র ওখানে অন্য জায়গার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ সস্তা। ২৭০ রকম জিনিস পাওয়া যায়।

আগেও প্রাইমারী ইস্কুল ছিল। কুয়োমিনটাং আমলের ছাত্রসংখ্যা ২০৪, এখন ৫০৯-এ উঠেছে। নতুন মিডল ইস্কুল হয়েছে—তাতে ২৯০ জন ছাত্র। বেশির ভাগ ছেলেই সরাসরি বৃত্তি পায়। চাষীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ানোর জন্য ইস্কুল হয়েছে—৩৫২ জন পড়ছে এখন সেখানে। সংক্ষিপ্ত উপায়ে কম সময়ে চীনা ভাষা শিখবার কায়দা বেরিয়েছে, সেই ভাবে শেখানো হয়। সংস্কৃতি-ভবন দেখতে পাবেন। থিয়েটারের হল হয়েছে অবসর-বিনোদনের জন্য। ভূমি-সংস্কারের মরশুমে দুটো পালাগান বড্ড সমাদর পেয়েছিল—'সাদা চুলের মেয়ে' 'আর লাল পাতার নদী'।

স্বাস্থ্যের উপর খুব নজর চাষীদের। এই গাঁয়ে এ বছর ৬১৩ টা ইঁদুর মেরেছে, ৩৭০০০ মাছি মেরেছে (জাল পেতে মাছি মারে, এর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় গ্রাম-সমিতি থেকে)। হাসপাতাল বানানো হয়েছে ১৯৫০ অব্দে। আর নতুন পদ্ধতির সূতিকাগার। শান্তি-আন্দোলন খুব চালু হয়েছে…লড়াই করব না, শান্তি চাই আমরা মনে দেহে বাক্যে। যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে—প্রত্যাশা করছি দু-এক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর আসবে, মিলিত ভাবে চাষ করব আমরা।

দেশে ফিরে আপনাদের চাষীদের কাছে আমাদের কথা বলবেন, আমাদের ভালবাসা জানাবেন। ভারত-চীন এক হোক, শান্তি সুদীর্ঘজীবী হোক!"

বক্তৃতা পড়া শেষ হল। সকলে কানে শুনছেন, আর হাতে-মুখে চালিয়ে

খাচ্ছেন সমান তালে। আমি বোকারাম পিছিয়ে পড়েছি, কলমই চালিয়েছি শুধু। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি মুখবিবরে ফেলে উঠে পড়লাম! দু-জন চার-জনে একএক দল হয়ে চলেছি। মুখের কথায় শুনব না বাছাধন, নিজ চোখে দেখব। একটা ভাত টিপে হাঁড়িসুদ্ধ ভাতের গতিক বোঝা যায়— একটা গ্রাম থেকেই চীনের গ্রাম-জীবনের আন্দাজ নিয়ে নেবো।

কড়া রোদ। আরও পথও আমাদের বাংলাদেশের দশখানা গাঁয়ের যেমন হয়ে থাকে। কখনো আ'লের উপরে চলেছি, কখনো শুকনো পুকুরের খোলে। এর ঘর-কানাচ, ওর সদর-উঠান পেরিয়ে চলেছি। তারপর, যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়ি এক বাড়ির অন্দরে।

তিন দিকে তিনটে ঘর, মাঝে উঠোন। উঠোনে মরাই। এক দিকে গাড়ি পড়ে রয়েছে—খচ্চরে টানে এ গাড়ি। শোবার ঘরে বেমক্কা রকমের উঁচু খাট, খাটের উপর মাদুর পাতা। খাটের নিচে হরেক জিনিসপত্র। দুটো ডিপ্লোমা টাঙানো ঘরের দেয়ালে—দুই ছেলে গ্রাজুয়েট! বসুন ঐ খাটের উপরে উঠে, বিশ্রাম করুন।

খাটে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, কসরত করতে হবে। সে না হয় দেখা যেতো, কিন্তু সময় কোথা? এক নিশ্বাসে সাত-কাণ্ড রামায়ণ পড়ার মতন সারা গ্রামখানা বিকালের মধ্যে শেষ করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

প্রাইমারী ইস্কুল। ইস্কুলের বড় ঘরটা মেরামত হচ্ছে। হেড-মাস্টারকে নিয়ে বারাণ্ডায় বসা গেল খবরাখবর নিতে। ১১টা ক্লাস, ১৬ জন মাস্টার। শতকরা ৯২ জন ছাত্র চাষী-শ্রমিকের ঘরের। পড়া শেষ হতে আগে ছ-বছর লাগত; নতুন পদ্ধতিতে এখন পাঁচ বছর হবে। শিখবে অনেক বেশি। মাস্টার মশায়দের মাইনে ও সামাজিক ইজ্জত বেড়ে গেছে, কাজকর্মে তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

আগে ছেলেদের মারধোর করা হত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের। ছেলেদের মন জাগাতেই চাই, ইচ্ছে করে তারা বেশি শিখবে। পড়ানোর বিষয় হল—চীনা ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, গান, ছবি-আঁকা, দেহ-চর্চা···

ছোট ছোট ছেলারা উঠোনে বেরিয়ে পড়েছে, গান করছে নেচে নেচে। আর বলুন ভদ্র হয়ে বসে তথ্য কুড়াবে, হেন অবস্থায়? খাতা বড় বন্ধ করে উঠলাম। তারা দত্ত আর পানিগ্রাহী পুরোপুরি মেতে গেছেন ছেলেদের হুল্লোড়ে। কি আনন্দ, কি আনন্দ।

ঢের হয়েছে গো! ঘরে এসো ছেলেরা, ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার আর ডেস্ক, ছোট মানুষদের মাপসই খাওয়ার পাত্র।

অনেকক্ষণ থেকে চেঁচামিচি শুনেছি, বহু লোকের বচসা। ছেলেবয়সের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। জমির জোর-দখল নিয়ে খুব দাঙ্গা হত সে আমলে। চষা ক্ষেতে এক একটা মাটির চাঁই টেনে নিয়ে বসেছে মরদগুলো—তেল চকচকে রাঙা লাঠি শোয়ানো। ওদিকে উঁচু ডাঙার খেজুরতলায় আছে বিরুদ্ধ দল। বাগ্‌যুদ্ধে গোড়ায় মেজাজ গরম করে নিতে হয়। এ দল বলছে, ও দল জবাব দিচ্ছে। গলা চড়ে উঠছে ক্রমশ। তারপর উত্তর-প্রত্যুত্তর নয়, আকাশভেদী চিৎকার। এবং ছুটে এসে যে যাকে পাচ্ছে, পিটছে দমাদম। মুহূর্তে রক্তগঙ্গা। চীনেও সেই ব্যাপার নাকি?

পা চালিয়ে গণ্ডগোলের জায়গা এসে পৌঁছলাম: পুরানো বাড়ির ভিতর সৈন্যরা বিচরণ করছে। হুঙ্কার তাদেরই। ভয়াবহ বটে, কিন্তু চিৎকারের মধ্যে কেমন যেন সুর পাওয়া যায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সুর করে চেঁচাবে কেন?

কি মুশকিল! দাঙ্গা কোথায়—লেখাপড়া হচ্ছে। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদের দিনকতক গাঁয়ে পাঠিয়েছে। নিরক্ষর অনেকেই—এখন এমন দিনকাল, পেটে দু-কলম বিদ্যে না থাকলে জনসমাজে মুখ দেখানো দায়। বিশ্রামের কয়েকটা দিন তাড়াহুড়ো করে খানিকটা শিখে নিচ্ছে। কলহ বলে মালুম হচ্ছিল, ওটা পাঠ্যাভ্যাস। লড়নেওয়ালা মানুষ—আপনার-আমার ন্যায় সাবুবার্লি-খাওয়া নিরীহ ভদ্রজন নয়—পাঠচর্চার বিক্রমে তাই পিলে চমকে যায়।

আরও এগিয়ে একটা খুব বড় বাড়ির বড় হলে এসে উঠলাম। জমিদার-বাড়ি ছিল, জমিদার কোত হয়ে গিয়ে এখন সংস্কৃতি-ভবন। এ হেন ভবন আরও তিনটে আছে। সেগুলো শাখা, মূলকেন্দ্র এটা। মিস্ত্রি-মজুর খাটছে —বাড়ির ভাঙচুর চলছে, দু-একটা নতুন ঘর তোলবারও প্রয়োজন হবে এর পর। গ্রামে গ্রামে এমনি চলেছে। চাষীদের শুধু খাওয়া-পরা নয়, মানুষ হয়ে বেঁচে উঠতে হবে।

দেয়ালে রকমারি পোস্টার। মাঝখানে এক জায়গায় আনকোরা নতুন পেণ্ডুলাম দুলছে টক-টক করে। লাইব্রেরি—সাড়ে চার হাজার বই—বেশির ভাগ চাষবাস সম্পর্কে। শ' দুই লোক পড়াশুনা করে রোজ এসে। এ ছাড়া শিক্ষণ-বিভাগ আছে, চারটে ম্যাজিক-লণ্ঠন—স্লাইডের সাহায্যে নানা বিষয়ে

নিয়মিত শেখানো হয়। চারটে গ্রামের দল, প্রতি দলের পঁচিশটা করে ঢোলক। কাজের শেষে গ্রামের মানুষ ঢোলক বাজিয়ে আমোদ-স্ফূর্তি করে। সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন প্রোগ্রাম। তাদেরই একটা দল সংবর্ধনা করেছিল আমাদের। বায়স্কোপ দেখানো হয় শান্তি ও দেশ-পরিগঠন সম্পর্কে।

ব্ল্যাকবোর্ডে নানান হাতের অনেকগুলো লেখা দরজার ঠিক সামনে রেখে দিয়েছে ঢুকেই যাতে পয়লা নজর পড়ে। কি হে বাপু এগুলো?

নতুন যারা লিখতে শিখল, তাদের নাম সই। নিরক্ষরতা তাড়াবেই। চীনা শেখার নতুন কায়দা বেরিয়েছে—দু-ঘণ্টা করে পড়ে তিন মাসে মোটামুটি ভাষা শেখা যায়। যাদের শেখা হয়ে গেল, তারাই মাস্টার হয়ে পরের দলকে শেখাতে লেগে যায়।

ভিন্ন পাড়ায় এসেছি। এক তরুণী পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল চেহারা, পোশাকও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বেশি রকম ফিটফাট। এতক্ষণ ধরে কত মেয়েকে দেখলাম, এ জন গোত্রছাড়া। হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। কথা বুঝতে পারিনে। দোভাষিকে হাত নেড়ে তাই কাছে ডাকলঁ। কাছেই বাড়ি, বেশি পথ নয়—ভারতীয় বন্ধুদের আমার বাড়ি নিয়ে এসো, একটু বসবেন।

তা সে দাবি আছে তার বটে। মস্ত বড় কুলীন—ভলান্টিয়ার হয়ে তার স্বামী ও এক ভাই কোরিয়ায় লড়াই করছে; যারা মুক্তিসৈন্যের দলে ছিল, ইজ্জত নতুন-চীনে আর কারো নয়। স্বামী আর ভাইকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েও মেয়েটা তাই অমন হাসছে। আচারজাতীয় জিনিস বানিয়ে রেখেছে ফ্রন্টে পাঠাবে বলে। আর পুঁটলি বেঁধে রেখেছে শীতের কাপড়। বোন আর ছেলেটাকে নিয়ে সংসারধর্ম করে। হাত ধরছে আমাদের, পিঠের উপর হাত রাখছে কারো। সরল নিঃসংকোচ। চেহারায় আগে তো ভেবেছিলাম এক কচি কুমারী মেয়ে—মা হয়েছে সে। ফ্রন্টে গুলিগোলার মধ্যে লড়ছে ছেলের বাপ। আহা, কী ছেলে! এই আমি লিখতে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। লাল পাজামা-পরা, দু-গালে লাল রং মাখা, কপালে রাঙা ফোঁটা। অমন সাজে কেন সাজিয়েছে, জানি না। চার বছরের তো ছেলে—আমাদের এতটুকু সমীহ করে না বিদেশি বলে! ও-দেশের কোন ছেলেটাই বা করে! স্বাস্থ্য ফেটে পড়েছে। গান ধরেছে।—গানে কি বলছে হে? একটুখানি শুনে নিয়ে দোভাষি ইংরেজিতে মানে বাতলে দিল—'প্রাচী মহান…।' তার পর দু-হাত উদ্যত করে বীররসের আর এক গান।

'দেশ রক্ষা করতে ইয়েলু নদী পার হবো আমি...।' বাপের বাপ, শত্রুর আর রক্ষে নেই তুমি যখন পার হয়ে হয়ে যাচ্ছ !

গান বন্ধ হঠাৎ, গায়ক বেঁকে বসেছে। কি হল ? তোমরা হাসছ, গাইব না—কিছুতে গাইব না আর আমি।

বিস্তর সাধ্যসাধনায় মান ভাঙল। মুখ গম্ভীর করে শুনছি আমরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে হাস্যলেশ আছে কিনা কোন মুখের উপর। খুশী হয়ে তার পর ঐকথাগুলোই গাইল বার কয়েক।

তখন মুশকিল, কিছুতে ছেড়ে দেবে না আমাদের। কদ্দুর যাবে খোকা ? যাবে, যেখানে আমরা নিয়ে যাবো ? ইণ্ডিয়ায় যাবে ? মাটিও তেমনি—ছেলে গুটগুট করে চলল, হাসছে সে সকৌতুকে। চলেছে ছেলে কখনো আগে আগে, কখনো পিছনে। সমবায়-দোকান অবধি এসেছি, তখনো সঙ্গে আছে ? রোদে ঘাম ফুটেছে সোনা মুখে। দোভাষিকে বললাম, আর নয়—জোরজার করে দিয়ে এসো একে বাড়ি পৌঁছে। পাষণ্ড মা খালি হাসে—ছেলে যদি সত্যি সত্যি ইয়েলু নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে চলে যায়, তখনো বোধ করি হাসবে অমনি। ধরতে যাবে না।

সমবায়-দোকানে এসে কয়েকজন আমাদের শশব্যস্তে দরদাম টুকছেন। টুকেই চলেছেন। চলুন, চলুন—পরের আতিথ্যে চর্বচোষ্য দেদার চালিয়েছি, দোকানে দাড়িয়ে অত হিসাব-নিকাশের গরজ কি আমাদের ?

নতুন-চীনের আর্থিক চেহারাটা পুরোপুরি পেতে চাই।

অনেক তো হল ! আর কেন চলুন—

সুবোধ বন্দ্যো বললেন, জমিদারি কেড়ে নিয়েছ—তাদেরই কোন এক বাড়ি নিয়ে চলো দিকি। আলাপ-সালাপ করে বুঝি তাদের মনোভাবটাই বা কি রকম।

প্রোগ্রামে এটা ছিল না। সবাই হাঁ-হাঁ করে সায় দিল।

হাসপাতাল দেখতে যেতে হবে তাঁদের বলে রাখা হয়েছে। তার উপরে এটা চড়ালে যেতে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

তাই তো চাই। উদর অবকাশ পাবে, তোমাদের আয়োজন একেবারে বরবাদ হবে না।

মাঝারি গোছের এক জমিদার-বাড়ি পথে পড়ল, সদলবলে ঢুকে পড়লাম। বাড়ি দেখে সম্ভ্রম হয় না, জমিদার না হয়েও এ হেন বাড়ি আমাদের অনেকেরই। বাড়ির গিন্নি এগিয়ে এলেন। বয়স হয়েছে, বলিরেখায় চিত্রিত মুখ।

অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু জলটল খেয়ে যেতে হবে—দাঁড়ান, সেই ব্যবস্থা আগে করি। জানিনে তো যে আপনারা আসবেন।

আমরা আপত্তি জানিয়ে বললাম, বেলা হয়ে গেছে—সে সব তালে থাকেন না। দুটো-একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে। দেশে ফিরলে সকলে জিজ্ঞাসা করবে কিনা—

গিন্নি হেসে বলেন, গিয়ে যে নিন্দেমন্দ করবেন—ঠিক দুপুরবেলা এক বাড়ি গিয়েছিলাম, শুকনো মুখে বকবকানি শুধু সেখানে।

কিছু না। কিছু না। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন দিকি একটু।—

বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। মুখ-ভরা সহজ স্বচ্ছ হাসি।

জমিদারি গিয়ে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে ?

মোটেই নয়। বেশ ভাল আছি আগেকার চেয়ে।

চমক লাগল। এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা ? জবাবটা দোভাষি ইংরেজিতে তর্জমা করে দিল, তারই কারসাজি হয়তো। এমনও হতে পারে, আমাদের ইংরেজী প্রশ্ন চীনাতে উল্টো ভাবে বুঝিয়েছে গিন্নিকে।

আবার এ-ও হতে পারে গিন্নিই একদিনের উটকো লোকের কাছে মনের দুয়োর খুলেছেন না, সেরে-সামলে বুঝে-সমঝে বলছেন। বিশেষ করে আধা-সরকারি অতিথি যখন আমরা। কিন্তু মুখের কথা নিয়ে যে সন্দেহই কার, মুখের উপর ঐ যে হাসি খেলছে—ওটা জাল বলি কেমন করে ? হেসে হেসে গিন্নি বলছেন, দিব্যি আছি। জমিদারির বিস্তর হাঙ্গামা; প্রজারা পয়সা-কড়ি দিতে চায় না, দশের কাছে শত্রু হয়ে থাকতে হয়। জান বেরিয়ে যায় ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে। বেঁচেছি এখন। বৃহৎ সংসার পুষতে হত, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তেইশ জন, তার উপরে একগাদা ঝি-চাকর। জমিদারি খতম হবার পর পরগাছা সরে পড়েছে। ছেলে বউ আর আমি—তিনটি প্রাণীর সংসার। ছেলে পিকিনে থাকে, সেখানে কাজ করে। আগে হবার জো ছিল না। জমিদার-বাড়ি ছেলে খেটে খেটে খাবে, কি সর্বনাশ ! আগে এক শ বাইশ মো জমি ছিল, এখন সেখানে সাত মো ! তার মধ্যে দুই মো হল পুকুর, বাদবাকি চাষের জমি। নিজেই চাষবাস দেখি। তাতে যে খুব কষ্ট হয়, তা মনে করবেন না। মিউচুয়াল-এইড-টিম—খাটাখাটনি কম।

ওখান থেকে হাসপাতালে। এ-ও আর এক জমিদার-বাড়ি; আট শুণ্ডরের একজন। গাঁ-ঘর ছেড়ে সরে পড়েছে। হাসপাতাল খোলা হয়েছিল ১৯৪৫ অব্দে অন্য এক বাড়িতে। তখন এক ডাক্তার আর চল্লিশ-পঞ্চাশ

রকমের ওষুধ। সেই ওষুধই বা কে খাচ্ছে! চাষীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত রোগমুক্তির জন্ত। ঈশ্বরের মরজি হল তিনি ওষুধেই সেরে যায়; আর মরজি না হলে ঐ পঞ্চাশ রকম একসঙ্গে গুলে খাইয়ে দিলেও রোগের কিছু হবে না। এখনো—গাঁয়ের প্রতিষ্ঠান তো—এমন-কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়। তিন জন ডাক্তার, দুই জন সহকারী, চার জন নার্স। ওষুধ তিন শ' দফার মতন। দুটো ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন কুড়িখানার উপর। সত্তর-আশী জন রোগী রোজ আসে চিকিৎসার বাবদে। সর্দি-জ্বরই বেশি।

দুপুর গড়িয়ে এলো। ফিরে চললাম—যে স্কুল-বাড়িতে প্রথম এসে উঠেছি। দুপুরের খাওয়া সেখানে। লম্বা টেবিল পড়েছে সারি সারি, স্তূপাকার আয়োজন। আর পল্লী-অঞ্চলের খাঁটি মাল—পানের সময় নাকি গলা দিয়ে আগুন নামে। অধম অরসিক—গুণাগুণ শুনেই আসছি শুধু। গেলাস থেকে একটু ঢেলে নিয়ে জলন্ত কাঠি নিক্ষেপ করলাম দপ করে জ্বলে উঠল।

খাওয়ার পরে আবার বেরুনো। বসে থাকতে আসিনি—যতটুকু সময় আছে দেখেশুনে সঞ্চয় করে নিই। আহা, ঠিক যেন আমাদেরই কোন গ্রাম। সদর রাস্তা ধরে চলেছি মেটে রাস্তা, দুধারে পগার। এধারে ওধারে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি। কুয়োর জল তুলছে খচ্চর দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মানুষজন দেখবার জন্য ভিড় করেছে। দেখবে বই কি! একদল বিচিত্র মানুষ ঘোরাঘুরি করছে, রামা-শ্যামা নয়—ভারতের মানুষ। হেন ভাগ্য ক'টা গ্রামের হয়ে থাকে?

পথের প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে—এই যে বলা হয়, ভিখারি নেই মোটে এ দেশে—ছেঁড়া পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল, বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলোয় না। হাজার দুই ইয়ুয়ান দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—

দোভাষি হাসল। সেকেলে গেঁয়ো-মানুষ—ওদের ধরনধারণ এই রকম। বিদেশি বলে কুতূহলী হয়ে তোমাদের দেখাচ্ছে। তাই একেবারে ভিখারী ভেবে বসেছ? টাকাকড়ি চাচ্ছে না বুড়ো, দিলেও নেবে না। দিতে গেলে অপমান করা হবে।

নিজেরই লজ্জা লাগে তখন। ছি-ছি, কাপড়-চোপড় দিয়ে আমরা মানুষেক বিচার করি।

বেলা পড়ে আসে। ইস্কুলবাড়ি ফিরি এবার—আমাদের আড্ডাখানায়। ঘুরে-ফিরে সবাই ওখানে এসে জুটবেন, ওখান থেকে পিকিনে রওনা।

তুমুল বাদ্যভাণ্ড ইস্কুলবাড়ির উঠানে। দূর থেকে আওয়াজ পাচ্ছি। গাঁয়ে ঢুকবার মুখে সেই যে দেখেছিলাম—তারা সব এসে জুটেছে। শুধু বাজনা নয়, বাজনার সঙ্গে নাচ। নাচছে ওরাই শুধু নয়, ভারতীয়দের ধরে ধরে নামাচ্ছে। ঘন-বিন্যস্ত গাছের ছায়া, আধপুকুর গোছের জলাভূমি—তারই পাশে আসন্ন সন্ধ্যায় সে কি হল্লোড়! সন্তর্পণে এক গাছতলায় দাঁড়াই। তবু দেখে ফেলল।

আসুন, নেবে পড়ুন—

কোঁচার কাপড় গুঁজে দিই কোমরে। অর্থাৎ নামবোই নির্ঘাত। নেমে পড়লামও বটে, আসরে নয়—পগার লাফিয়ে একেবারে রাস্তার উপর। হনহন করে চলেছি—দৌড়নো বললেও আপত্তি করব না। বেশ খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর আমাদের বাস রয়েছে, তার খোপে ঢুকে পড়ে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি। সকলে এসে পড়লে বাস ছেড়ে দিল।

(১৫)

পিকিন ছাড়তে হবে দু-এক দিনের মধ্যে, দেখা-শুনোর যা-কিছু তাড়তাড়ি চুকিয়ে নাও। প্রত্নপণ্ডিত চেং চেন-তো-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেই যে রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়ালেন আমাদের ক'জনকে। নিষিদ্ধ-শহরের এলাকার মধ্যে লেখক-সঙ্ঘ—সেইখানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অদূরে পে-হাই পার্ক, খাসা পরিবেশ! জায়গাটুকুকে বলে গোল-শহর। গিয়েছি একলা আমি সঙ্গে দোভাষি। এসে অবধি চেষ্টা করছি চেং মশায়ের সঙ্গে একটু নিরিবিলি বসব। অতীত কালের মধ্যে অতিস্বচ্ছন্দ তাঁর পদচারণ। ভারত-চীনের পুরানো সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর নতুন কথা তিনি বললেন।

পে-হাই পার্কের সামনে ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি। তেরো শতকের তৈরি মূর্তি এদিকে-ওদিকে—নানা রকম সমুদ্রজন্তু, ড্রাগন, ঘোড়া, স্বস্তিক। বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে। প্রশস্ত অঙ্গন ছুটে পার হয়ে লাইব্রেরি-বাড়িতে উঠে পড়লাম।

পুরানো ধাঁচে তৈরী নতুন বাড়ি। বিশাল চীন দেশে একাল-সেকালের

বিস্তর লাইব্রেরি আছে, তার মধ্যে সকলের সেরা। একতলা, দোতলা, তেতলা ঘুরে বেড়াচ্ছি উঁচু ঘর যেমন, তেমনি আছে নিচু নিচু খোপ। সিঁড়ি নানান দিকে—এই উপরে উঠছি, এই নেমে যাচ্ছি আবার। বই আর বই আর বই। আর বই পড়বার এবং বই-পুঁথি থেকে টুকে নেবার মানুষ। অত বড় বাড়ি—লাইব্রেরির লোকজন ও পড়ুয়ার হাজারের বেশি বই কম হবে না। কিন্তু নিঃশব্দ—একটা সূঁচ পড়ে গেলে তার আওয়াজ পাবেন।

গ্রন্থগারিক নিজে এঘর-ওঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুরানো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তোয়াজ বড্ড বেশি। আলমারিতে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে তাঁরা বিরাজ করছেন; ডেস্কের মধ্যেও শুয়ে আছেন অনেকে। এঁদেরই মধ্যে এক তাজ্জব—একটা জায়গায় এসে গ্রন্থাগারিক মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে চেয়ে, আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন ডেস্কের কাচের দিকে। কি ব্যাপার? পুঁথির বয়স লেখা আছে হাজার খানেক বছর। পুঁথিখানা—তাই তো মালুম হচ্ছে যেন বাংলা হরফে লেখা। এ পুঁথি আমার বাংলা দেশ ছেড়ে হিমালয় লঙ্ঘন করে, দিগ্‌ব্যাপ্ত মরু দুস্তর নদী অগণন জনপদ পার হয়ে রহস্যকীর্ণ প্রাচীন পিকিন নগরীতে হাজার বছর ধরে সম্মানের আসন নিয়ে আছে।

দোভাষি জিজ্ঞাসা করে, পড়তে পারো? পড়ো দিকি কি আছে পুঁথিতে লেখা?

তাবচ্চ শোভতে—ইত্যাদি। অতএব চুপ করে রইলাম।।

রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ক্রমশ লাইব্রেরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠা; বয়স ছ-শ পেরিয়ে গেল। মাঞ্চু রাজাদের তাড়ানো হল উনিশ শ এগারোয়। পরের বছর ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি নাম নিয়ে এই জায়গায় লাইব্রেরির পত্তন।

ঝড় ঝাপটা অনেক গেছে এর উপর দিয়ে। উনিশ শ অব্দে পিকিন লুঠ-পাট করল—অনেক বই পোড়াল, বিস্তর বই খোয়া গেল সেই সময়টা। আরও অনেক বার এমনি হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লাখ এখন। পাঁচটা বিভাগ, আলাদা আলাদা কাজ তাদের। একদল বই কেনে ও যোগাড় করে। আর একদল যোগাড় করে দুষ্প্রাপ্য বই; ঐ সব বইয়ের সযত্ন রক্ষণ-ভারও এই দলের উপর; ভিতরের মালামাল নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণার কাজও এদের। একদলের কাজ ক্যাটালগ তৈরি—বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে পাঠকের সামনে যতদূর সম্ভব পরিচয় তুলে ধরা। আর একদল রিডিং-রুমে বইয়ের বিলি-ব্যবস্থা করে; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের বন্দোবস্ত

এদের। তাছাড়া রকমারি বক্তৃতা ও নানা জায়গায় বইয়ের প্রদর্শনী এদের উদ্যোগেই হয়। কিছুদিন থেকে একটা বিশেষ বিভাগ হয়েছে—সোভিয়েট লাইব্রেরি; আলাদা তার রিডিং-রুম। সোভিয়েট বই আর সাময়িকপত্রাদির বিশেষ চাহিদা ইদানীং; অসংখ্য বই চীনায় তর্জমা হচ্ছে।

চীনের নবজন্ম থেকে দেদার বই কেনা হচ্ছে—সাবেক আমলের অনেক গুণ; আর এক ব্যবস্থা হয়েছে—বই ধার দেওয়া ও ধার নেওয়া। এক দেশকে ধরুন দশ হাজার বই ধার দিলাম, আনলাম সেখান থেকে ঐ পরিমাণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে দেওয়া হল। অনেক জায়গার সঙ্গে এই রকম লেনদেন চলছে।

বইয়ের একজিবিশনে চক্কোর দিচ্ছি। হাড় ও কচ্ছপের খোলার উপর লেখা—বই না কি বলবেন তাকে? বয়স হল খ্রীষ্টপূর্ব তেরো শ থেকে এক শ। কাঠের উপর লেখা বুদ্ধের নানা উপদেশ—৪৪৮ থেকে ৭৫০ অব্দের। আগে যে পুঁথির কথা বললাম, তাছাড়া আরও বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি আছে। ১৫০০ অব্দের খবরের কাগজ। কাঠের উপর আঁকা বহু বিচিত্র ছবি। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা এক লাখ চল্লিশ হাজার।

মস্ত বড় পাঠাগার, সর্বসাধারণ সেখানে বসে বসে সাধারণ বই পড়ে। আর দুটো আলাদা পাঠাগার আছে বিজ্ঞান আর কারিগরি বই পড়ার জন্য। দুটো নতুন হল বানানো হচ্ছে—একটায় একজিবিশন মনের মত করে সাজানো হবে, আর একটা হবে বাচ্চা ছেলেদের পড়বার ঘর। শুধু বই পড়া নয়, নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা পাঠাগারে—লেখক ও গুণী-জ্ঞানীরা পাঠকদের সামনে হাজির হয়ে মোলাকাত করেন। চিঠিচাপাটি আসে রোজ—লোকে নানান রকম প্রশ্ন করে চিঠি লেখে, পণ্ডিত-জনের সঙ্গে পরামর্শ করে তার জবাব দেওয়া হয়। বই ধার দেওয়া হয় অন্যান্য লাইব্রেরীতে—পিকিন ও আশেপাশে সাত শ তেত্রিশটা লাইব্রেরির সঙ্গে এমনি ধার দেবার ব্যবস্থা। সর্বব্যাপ্ত শিক্ষা প্রচেষ্টায় লাইব্রেরিও দায়িত্ব বহন করছে।

দূতাবাসে আজকে চায়ের নিমন্ত্রণ। শুধু মাত্র তরল চা নয়—লুচি তরকারি ইত্যাদি নির্ভেজাল ভারতীয় খাদ্য। সেই পরাঞ্জপের বাড়ি মুখবদল হয়েছিল, আর আজ আকণ্ঠ ঠেসে দুর্ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে নিলাম। এর পরে যে কটা দিন পিকিনে রইলাম, ঐ স্বাদ জিভে জড়ানো ছিল।

বিকাল বেলা এই, সন্ধ্যার পর আবার একদফা ভারী ভোজ। আহা,

চলে যাচ্ছেন যে কটা দিন পরে! ধকলটা কিছু বেশিই হচ্ছে—তা খেয়ে নিন কষ্টে-সৃষ্টে, কি আর হবে! মাসবধি ধরে যাঁদের খাচ্ছি, তাঁরাই আবার আলাদা করে নিমন্ত্রণ করলেন আজ। এবং পিকিন হোটেলেই—নিচের তলার খানা-ঘরে। সব রকম ভোজই মজুত থাকে প্রতিদিনের খানা-টেবিলে—নতুন আর কি আসবে এর উপরে? নতুন এই হল, বিশেষ নিমন্ত্রণের নাম করে যাবতীয় বিশিষ্টেরা আজ আমাদের সঙ্গে খাচ্ছেন।

বড়দের বাদ দিয়ে চারজনে আমরা একটেরে আলাদা ভাবে ছোট্ট এক টেবিলে বসেছি। তিন জন ভারতীয়—আর এক প্রৌঢ়া চীনা মহিলা এসে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন! নিতান্ত সাদা-মাঠা পোষাক, মাথার চুলগুলো অবধি পরিপাটি গোছানো নয়। ইংরেজি কিন্তু উত্তম বলেন। তা হলে দোভাষি করে নি কেন এঁকে? বাচ্চা ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ উঠল—তার মধ্যে ডাক্তারির ফোড়ন শুনে মালুম হল, ঐ বিদ্যাও কিছু কিছু জানা আছে। তা সে যা হোক, ভারি স্ফূর্তিবাজ মহিলা, অবিরত হাসিরহস্য করছেন, বয়সের তুলনায় অতি চপল। হিন্দুস্থান আর চীনের অধিবাসী ভাই ভাই—এই মর্মে কয়েক দিন থেকে একটা শ্লোগান চালু হয়েছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই। মহিলা ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সকলের চেয়ে উঁচু গলায় সেই বুলি ছাড়ছেন। আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন এ-কথায় ও-কথায়।

এই মাস কয়েক আগে মহিলাকে কলকাতায় দেখে চমকে উঠলাম। চীনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছেন, সংবর্ধনার সমারোহ। নলিনীরঞ্জন সরকারের 'রঞ্জনী' বাড়িটা এখন কলকাতার চীনা দূতাবাস। ঐখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের ব্যাপারে। হলের দরজায় দাঁড়িয়ে কনসাল-জেনারেল অভ্যর্থনা করছেন, পাশে সেই আমুদে মহিলাটি। আমায় দেখে হেসে উঠলেন পিকিনের ভোজের আসরের মতোই। বললেন, একেবারে নাম করে বলে উঠলেন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল বোস। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বললেন, ব্যানার্জি, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। তার পরে ভিতরে গিয়ে মহিলাটি বসলেন আমাদের রাজ্যপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খাতির দেখে তখন বুঝলাম। পিকিনে সাধারণ এক ডাক্তার কিংবা নার্স ভেবেছিলাম—ওরে বাবা, খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনিই যে! বিলাতে বিস্তর দিন কাঠ-খড় পুড়িয়ে ডাক্তারি শিখেছেন, কিন্তু সারল্য ও রস-রসিকতার উপর বিলাতি পলস্তরা পড়েনি।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় ছিলেন, তাজ্জব ব্যাপারটা শোনালাম তাঁকে।

সামান্য মানুষ সেই কবে চীনে গিয়েছিলাম, কত দিন হয়ে গেল—কত রকম দায়ঝক্কি ওঁদের উপর—অথচ নামটা অবধি মনে করে রেখেছেন।

সুনীতকুমার বললেন, সাহিত্যিক মানুষ—তার উপর আপনার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। তাই হয়তো চিনে ফেললেন—

কিন্তু বিজয় বাড়ুজ্জে ? তাঁকেও তো ভোলেননি—

অসাধারণ স্মরণশক্তি অতএব মহিলার। আশু মুখুজ্জে মহাশের এমনি ছিল। যাকে একবার দেখতেন, কখনো তাকে ভুলতেন না।

হবে তাই। স্মরণশক্তির আরও পরিচয় পেলাম অচিরে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে পুরানো কথা উঠলো, পিকিনে এক টেবিলে খেয়েছিলাম আমরা; খেতে খেতে চেঁচাচ্ছিলাম 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'—

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, খুব মনে আছে। 'ভাই-ভাই' কেন হবে ? 'বাই-বাই'। তাঁর ভাঙা উচ্চারণে 'ভাই-ভাই' কথাটা 'বাই-বাই'তে দাঁড়িয়েছিল, এত দিন পরে সেই মোতাবেক সংশোধন করে দিলেন।

এই দেখুন, গল্পে গল্পে কোথায় এসে পড়েছি। এমন করলে চীনের কথা কবে শেষ হবে! হচ্ছিল কোথায় ?

ওঁরা ধরেছেন, চলে যাচ্ছ তো—কি রকম দেখলে, বলে যাও একদিন আমাদের রেডিয়োয়। জন আষ্টেককে বাছাই করা হয়েছে রেডিও বক্তৃতার জন্য। বক্তৃতার রেকর্ড করে নেবে, যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে হোটেলে। সুবোধ বন্দ্যোর উপর ভার—সকলকে-ডেকে-ডুকে বক্তৃতা করাবেন। যথারীতি দক্ষিণাও দেওয়া হবে বক্তৃতার জন্য।

দক্ষিণা ? তবে এই ঠোঁট বন্ধ, মশায়। এত আদর-যত্ন, ডাইনে-বাঁয়ে ভালবাসার উপহার—এর উপরেও টাকা ? ভাবেন কি বলুন তো আমাদের।

কড়া হয়ে বলায় দক্ষিণা শেষ অবধি মকুব হল। এই একটা বস্তু মুফতে দিয়ে এলাম।

এক পাক বাজার ঘুঁড়ে আসব। আমার সেই পাকিস্তানি কনিষ্ঠ খোন্দকার ইলিয়াস ধরে ফেললেন, অবেলায় কোথায় ছুটলেন দাদা ?

ব্লেড ফুরিয়ে গেছে। আজকের ক্ষৌরকর্ম হয়নি। ব্লেডের সৃষ্টি-ছাড়া দর এখানে—একটা-দুটো তবু না কিনে উপায় নেই।

চক্ষু কপালে তুলে ইলিয়াস বলেন, কি সর্বনাশ, নিজে দাড়ি কামান আপনি ?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন আমায়। হলের অপর প্রান্তে অনেকগুলো

ঘর, দোভাষিরা বলা-ওঠা করে—ওদিকটায় কোন দিন যাইনি। তারই এক খোপের সামনে গিয়ে ইলিয়াস দাড়ি চাঁচার ইঙ্গিত করলেন! সঙ্গে সঙ্গে ছাপা ফরমে সই মেরে দিল তাঁতে। পিছনে এরে একটা ঘর—সেলুন। চেয়ারে বসিয়ে দিল—সে চেয়ার কখনো কাত হচ্ছে, কখনো শুয়ে পড়ছে। এমনি করে নানান ভাবে শুইয়ে বসিয়ে বিশ মিনিট ধরে ক্ষৌরকর্ম করল। তা-বড় তা-বড় অপরেশনেও বোধ করি এত ঘোর-প্যাঁচের প্রয়োজন হয় না।

হায় রে, পিকিনে পা দেওয়ার পরে এই ইলিয়াসকে আমি নানাবিধ পাঠ দিয়েছিলাম। ভায়া ইতিমধ্যে বিস্তর লায়েক হয়েছে, অগ্রজকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

সেই দুপুরে আর এক ব্যাপার শ্রীমতী কোটনিশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে—আগে-পিছে খেয়ে নেবেন না, এক সঙ্গে খাবো সকলে। ডাক্তার কোটনিশের কি পরিচয় দেবো—'কোটনিশ কা অমর কাহিনী'—সিনেমা-ছবি দেখেছেন নিশ্চয়! যুদ্ধের আমলে নেতাজি-নেহরুর উদ্যোগে ভারত থেকে দুর্গত চীনে মেডিক্যাল মিশন গিয়েছিল, কোটনিশ সেই দলের। ইনি সেই মেয়ে, যিনি কোটনিশের আমৃত্যু কর্মের সাথী—এবং জীবনসঙ্গিনীও হয়েছিলেন। এখন আর শ্রীমতী কোটনিশ বলা চলবে না, এক চীনা ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। এটা হামেশাই চলে ওঁদের সমাজে। শ্রীমতী পিকিনে থাকেন; একটা ইস্কুলের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক। আমাদের মধ্যে যে কজন মারাঠি, হঠাৎ তাঁরা অনুষ্ঠানের মাতব্বর হয়ে উঠেছেন। আগে ধরতে পারিনি, তারপর মালুম হল, কোটনিশ জাতে মারাঠি। অতএব বাড়ির বউ এসেছে, এমনি একটা ভাব মারাঠি বন্ধুদের।

শ্রীমতী বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়ত্বে এসে গেছেন। যে সব মিষ্টি রোমান্সের কাহিনী শোনা গেছে, এ চেহারায় সঙ্গে তা যেন খাপ খায় না। ছেলেটি খাসা, বছর দশ-বারো বয়স, চেহারায় ভারতীয় আমেজ আছে, নামেরও মানে করলে দাঁড়ায় 'চীন-ভারত'। বললাম, দেশে যাবে খোকা? চলো না আমাদের সঙ্গে। লাজুক মুখে সে ঘাড় নাড়ে, উঁহু—এখন নয়। ওর মা-ও বললেন, যাবে বই কি; নিশ্চয় যাবে। আর একটু বড় হোক। কোটনিশের অনেক গল্প করলেন শ্রীমতী, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী।

মাও-তুন জাঁদরেল ঔপন্যাসিক, প্রায় আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের সমতুল্য। হাস্যমুখ, সদালাপী ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কোন উপন্যাস ধরেছেন? হেসে উনি ঘাড় নাড়েন, উঁহু, বই লেখা আর বোধহয়

হবে না! কবি এমি-সিও পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন, ধরেছেন বই কী! চীনের তাবৎ নরনারী বালবৃদ্ধ নিয়ে জীবন্ত উপন্যাস। হেন উপন্যাস পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক লিখেছেন, জানি নে।

মাও-তুন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—চীনের মহানায়কদের একজন। সেই কথাটা বলে দেওয়া হল আর কি। বলে না দিলে কে বুঝবে, এই চেহারা, এই চালচলনের মানুষ হলেন মাননীয় মন্ত্রী! বলে দিলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত। ফেডারেশন অব চাইনিজ রাইটার্সের সভাপতি। খুব ব্যস্ত আজকে—তাঁতের মাকুর মতন ছুটাছুটি করছেন। বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক—অভ্যাগতদের বসবার জায়গা দেখিয়ে আবার বাইরের সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াচ্ছেন সকলের অভ্যর্থনার জন্য। ওরই মধ্যে খাতাটি বাড়িয়ে দিলাম—সই মেরে দিন তো একটা। স্মৃতি থাকবে, চিঠিপত্র লিখব। চীনায় ও ইংরেজিতে নাম লিখে দিলেন।

লেখক ও শিল্পীদের সমাবেশ। বড় কিছু নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধিদের মাঝ থেকে সাহিত্য-শিল্পের ছিটগ্রস্তদের বাছাই করে ডাকা হয়েছে। আর চীনা গুণীরা তো আছেনই।

লোক বেশি অতএব জাত হিসাব করে কয়েকটা টেবিলে ভাগ হওয়া গেল। জাত মানে—এঁরা লেখেন, ওঁরা আঁকেন, ওঁরা থিয়েটার করেন ইত্যাদি। খোদ মাও-তুন আমাদের টেবিলে। তিনি বলছেন, "আমাদের চীনা জাতি বড় শান্তিপ্রিয়। কখনো তারা পরের রাজ্যে হামলা দেয়নি। আমাদেরই উপর বাইরের লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শান্তির বাণী আজকের নয়—খুব পুরানো আমলের গুণী জ্ঞানীদের লেখার মধ্যেও এই শান্তির কথা। 'যা তুমি নিজে চাও না, অন্যকে তা কক্ষনো দিও না'—লড়াই সম্পর্কে কনফুসিয়াস বলেছেন। চীনের এক প্রাচীন প্রবাদ—যুদ্ধ হল আগুন, এ নিয়ে খেলা কোরো না, সব ঠাঁই ছড়িয়ে যাবে। বারুদের প্রথম আবিষ্কার হল আমাদের দেশে, কিন্তু সে বস্তু আমরা আগ্নেয়াস্ত্রে ভরিনি, বাজি বানিয়ে লোকের নয়ন বিমোহন করেছি।"

আমি এর মধ্যে ফোঁস করে উঠি একবার। হাঁ মশায়, নিজের দেশ নিয়ে কাহনখানেক তো বলছেন—আমাদের ভারত? আমাদের সৈন্যবাহিনী দেশের সীমানার বাইরে কবে পা বাড়িয়েছে? গিয়েছেন দেশ-বিদেশে ভারতের সাধুসন্ত জ্ঞানী-গুণীরা—

"তাই বটে। হাজার হাজার মাইল জোড়া দুই দেশের সীমানা। ইতিহাসে

তবু হানাহানির একটা দৃষ্টান্ত নেই। আর আজকের দিনে শুধু মাত্র চীনভারত নয়—যত লোক সমবেত হয়েছেন; তাঁদের সকলের দেশের ঐকান্তিক কামনা শান্তি। মাতৃভূমিকে ভালবাসি—তাকে উজ্জ্বল গৌরবে গড়ে তুলব শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। নানান শ্রেণীর শিল্পী এখানে উপস্থিত—হয়তো এই প্রথম বার আমাদের চাক্ষুষ দেখা, মুখোমুখি এসে বসা—কিন্তু এক সাধারণ শান্তির ভাষা আমাদের। সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রত্যেকজনেই আমরা একটি প্রত্যাশা মনে মনে লালন করছি—পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মনের কথা এই একটি মাত্র। এই ভাবনাই আমাদের সকল সাহিত্যের অন্তর্বাহী হয়ে চলবে। এই মীটিঙের পরেও আমি আশা করি, আমাদের মিলন শেষ হবে না—পরস্পরের কাছে পরিচিত থাকব আমরা সকলে, যাতে পৃথিবীর মানুষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দিন দিন নিবিড়তর হয়। চীনা লেখক-শিল্পীরা তোমাদের স্বাস্থ্যশ্রী ও সাফল্য কামনা করছে।"

তারপরে নীচু গলায় গল্পগুজব চলছে আমাদের। আর যা চলছে—থাক, কথা দিয়েছি, ওসবের পরিচয় আপনাদের লোভ সঞ্চার করব না। জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে পাশাপাশি বসে এ-ওর পরিচয় নেবো বলে। কত জায়গার কত মানুষ—নাম-ঠিকানায় খাতা ভরে গেল। চিঠি লেখালেখি চলে যেন বারবর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেদিন আন্তরিক ভাবেই স্থির করেছিলাম, মানুষ আমরা দূরে দূরে চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু চিঠি আমাদের মনগুলোকে এক করে বেঁধে রাখবে। ব্যস, ঐ অবধি। ঠিকানা মতো একখানাও চিঠি লিখি নি আজ অবধি! তিন-চারটে চিঠি এসেছে, তারও জবাব দেওয়া হয়নি।

লেখকেরা রয়্যালটি পান ওখানে দেশ থেকে পনের পার্সেন্ট। আগে ভাষা নিয়ে খুব পায়তারা চলত—স্টাইলের নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণবাহুল্য। নতুন কালে এখন সে ঝোঁক কেটেছে। সাদামাঠা ভাষায় লিখছেন লেখকেরা, জনগণের সঙ্গে তার ফলে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। লোকে খুব বই পড়ছে, বইয়ের কাটতি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। আর সেই সঙ্গে সাধারণের মুখের ভাষারও উন্নতি হচ্ছে!

গ্রাম্য ভাষাতেও বই লেখা হচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এক মেয়ো চাষী আশ্চর্য এক উপন্যাস লিখেছেন—'নরকরাজ্য'। নতুন-চীন গড়ে উঠবার পর এই ধরুন বছর দুই-তিন মাত্র উন্নত-সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছেন তিনি। পুরানো ইতিহাস নিয়েও নবযুগের উপন্যাস হয়েছে। আর লেখা হচ্ছে—হাসিমস্করায় ঠাসা গল্প, রম্যরচনা! এ বস্তুর খুব চাহিদা। নাটকের নামে

চীনা মানুষ চিরকাল পাগল; অভিনয় কিংবা সিনেমার ছবি দেখবার জন্ত লোকে বিশ মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গররাজি নয়, সারারাত্রি হয়তো ধৈর্য ধরে বসে আছে। তাই বিস্তর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে সুপ্রচুর। ধর্ম নিয়ে লোকের মাথাব্যথা নেই, হালফিল ধর্মের বই বড় একটা বেরুচ্ছে না।

জীবনের সত্য পরিচয় নেবার জন্য লেখকরা অনেক সময় চাষী শ্রমিক কিংবা সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে থাকেন। শুধু দর্শক হিসাবে নয়, তাদেরই একজন হয়ে; তাদের কাজকর্ম আশাআকাঙ্খার ভাগিদার হয়ে। চো লি-বাউ 'ঝড়' উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন। শহরের আত্মীয়জন ছেড়ে দীর্ঘকাল অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে ছিলেন ঐ বই লেখার জন্য। আর একজন লেখক—শ্রীযুত রোবিও বলতে লাগলেন, বিস্তর দিন ইংলণ্ডে থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম। কিন্তু আসল শিক্ষা পেলাম দেশঘরে চাষাভুষোর মধ্যে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে জল তুলেছি, বীজ বুনেছি। জীবন বুঝতে হলে কাজকর্ম দেখাই শুধু নয়, তাদের অন্ধি-সন্ধিতে বিচরণ করতে হবে। নইলে চাষী তার জমির সম্পর্কে গোরুবাছুর সম্পর্কে চাষের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যা ভাবে, কখনো তা জীবন্ত হবে না তোমার বইয়ে। তারা যখন জানবে, নিতান্তই তুমি আপন লোক, তখনই তোমার কাছে মন খুলবে!

যেমন বড় চীনদেশ, ভাষাও তেমনি শতেক রকম। প্রতিটি ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়। কতকগুলো ভাষার অক্ষর পর্যন্ত নেই, নতুন করে তাদের অক্ষর বানানো হল। চীনা ছাড়া প্রধান ভাষা হল মঙ্গোলিয়ান, তিব্বতী এবং আর দু-তিনটি। চীনাটা সব অঞ্চলেই শিখতে হচ্ছে। তিনহাজার বছরের সুপ্রাচীন এই ভাষা বহু কোটিকে জাতীয়তার বাঁধনে একত্র বেঁধেছে।

আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন—ঘরে থাকলে কি হবে, তামাম দুনিয়া নখ-দর্পণে নিয়ে বসে আছেন। বার বার তাঁরা বলেছিলেন, গিয়ে লাভটা কি? সাজানো-গোছানো কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দেবে বই তো নয়! কিন্তু এসে যে বিষম ফেরে পড়লাম! কিছুতে ছাড়ে না, নানান অজুহাতে আটকে আটকে রাখে। এদ্দিন ছিলে কনফারেন্সের তালে—থাকো আর দুটো-পাঁচটা দিন, নিশ্চিন্তে আলাপ-সালাপ করি। আমাদের পাড়াগাঁয়ের যেমন রেওয়াজ ছিল, ছেলেবয়সে দেখেছি। আত্মীয়-কুটুম্ব এলে তাকে ফিরে যেতে দেবে না—ছাতা সারছে, জুতো সারছে। সবজান্তা বন্ধুদের কথা সত্যি হলে তো কাজকর্ম

তড়িঘড়ি চুকিয়ে দিয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক' নমস্কার জানাবে; খুঁত চোখে পড়বার আগে সরিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌণে চারশ মানুষ—বেছে বেছে দুনিয়ার যত গবেট নিয়ে গেছে এটা হতে পারে না, দু-পাঁচজন বুদ্ধিওয়ালা লোকও থাকতে পারে। অথচ আটকে আটকে রাখছে—এটা কি রকম ব্যাপার বলুন দিকি?

যাহোক, ছাড়া পেয়েছি অবশেষে। যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। এ-দল যাচ্ছে, ও-দল যাচ্ছে। নিচের হলে মালের পাহাড়—গাড়িভর্তি সেগুলো রওনা হয়ে গেল তো আবার এসে জমছে। হোটেল ফাঁকা হয়ে গেছে, খানাঘরে ভিড় নেই।

গা ছড়িয়ে অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে আছি। কাজকর্ম নেই, কেউ ডেকে তুলবে না। তারপরে এক সময়ে উঠে যথা ইচ্ছে বেড়িয়ে বেড়াই। আমাদের ভারত দলের খানিকটা আজ সন্ধ্যায় আরও উত্তরে মুকডেন অঞ্চলে চললেন। আর ষোল জন আমরা কাল ভোরে সাংহাইয়ে উড়ব। ডক্টর কিচলুর চিকিৎসা-ব্যাপার আছে, তিনি ক'দিন পরে রেলে চড়ে সোজা ক্যান্টনে গিয়ে হাজির হবেন।

স্টেশনে গেলাম সন্ধ্যাবেলা মুকডেন-যাত্রীদের বিদায় দিতে। স্পেশ্যাল গাড়ি, ঘন সবুজ রং। অতি-সম্প্রতি বানিয়েছে এসব গাড়ি। দুটো করে শয্যা প্রতি কামরায়—উপরে আর নিচে; দামি পর্দা, বসবার চেয়ার-টেবিল। কম জায়গার মধ্যে আরামের সকল রকম আয়োজন। জাতীয় সৈন্যবাহিনী স্টেশনে ঢুকল বিদায় দিতে, একপাশে আলাদা হয়ে দাঁড়াল। আবীর দিচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! জনারণ্য। গলায় লাল রুমাল জড়ানো পায়োনিয়ার দল—কি মনোরম স্বাস্থ্য, কি হাসি! হাতে কুসুমগুচ্ছ। আমরা আবার ফিরে আসব, সেজন্য প্লাটফরমে ঢোকবার সময় নীল ব্যাজ পরিয়ে দিল। পিকিনের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরা এসেছেন, তাঁদের বুকেও ঐ নীল ব্যাজ। আভিজাত্য নেই, পদ-প্রতিষ্ঠার অভিমানে আলাদা নন কেউ। সরল, উদার, অমায়িক। উল্লাস-চিৎকারে কান পাতা যায় না। আর কাওবিত্তিয়াং গাঁয়ে দেখেছিলাম, সেই ধরনের ঢোল-কত্তাল বাজাচ্ছে স্টেশনে। গভীর আলিঙ্গনে এ-ওকে বুকে চেপে ধরছে। কত ভালবাসা মানুষে মানুষে! দেখে দেখে তাজ্জব লাগে, চোখের কোণে জল এসে যায়।

ফিরবার সময় কি কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেমেয়ে এক দল আটক করল। একটু-আধটু হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে সরে পড়ব—তা আমার হাত চেপে ধরেছে তুলতুলে

হাতটুকুন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তর নানা দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ভয়াবহ ব্যাপার, পুরোপুরি বন্দী। জড়িয়ে পড়েছে গায়ে গায়ে—নাচছে, নাচতে নাচতে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমাকেও একটু-আধটু পা ফেলতে হয়। হাসবেন না, অমন নির্মল অমায়িকতার দাবড়ি খেলেন না তো কখনো—ঐ অবস্থায় পড়লে আপনারা পাগল হয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতেন। দপ করে হঠাৎ জোরালো আলো জ্বলে উঠল ঠিক সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছু আর দেখতে পাই নে। ঘর-ঘর আওয়াজ—এই রে, মোভি-ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল। দোভাষি এগিয়ে এলেন করুণাপরবশ হয়ে। ছেলেমেয়েরা শুধালো—আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম—কোন দেশের এই ব্যক্তি? হিন্দী? আমি ভারত থেকে এসেছি, পরিচয়টা নিল নর্তন-কুর্দন শান্ত হয়ে যাবার পর। ভারত হোক কিংবা মেক্সিকো-আবিসিনিয়াই হোক, ওদের কাছে একই কথা। অচেনা বলে ভয়ডর নেই, মানুষ হলেই হল। হামেশাই যেন মোলাকাত হয়ে থাকে আমাদের সঙ্গে, ভাবখানা এই প্রকার। বাচ্চাদের ওরা এমনি আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা দিচ্ছে।

পিছন দিক থেকে কাঁধের উপর এক ভারী হাত এসে পড়ল। মি ল্যান-ফ্যাং যে! উনিও স্টেশনে এসেছিলেন বিদায় দিতে। ভারিক্কি উভয়েই আমরা—কিন্তু ছোকরাদের মতন কেমন গলাগলি হয়ে ফিরছি। দোভাষিকে দেখা যাচ্ছে না, দরকার নেই—মুখের কথার গরজটা কি? মিটিমিটি হাসছি এ-ওর দিকে তাকিয়ে।

(১৬)

একুশে অক্টোবর ভোরবেলা মুখ গোমড়া করে ঘরে বসে আছি। পিকিন ছাড়ব অনতিপরেই, সাতটা নাগাদ এসে ডাকবে। এখানে যেন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে, আপন জন এরা সকলে। মন বিগড়াবার আরও কারণ, হোটেলের কাউকে কিছু দিতে পারব না। কড়া নিষেধ। লোকগুলোও এমন হয়েছে, বকশিশ হাতে দিলে বেজার হয়।

বিদায়বেলা তাই ওদের হাত জড়িয়ে ধরছি, কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। বাইরের কত জনেও দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের এই বিদায়যাত্রা দেখছে। তাদেরও চোখ ছলছল করে বুঝি! দোভাষি অনেকে চলল এরোড্রোম অবধি। দোভাষি বলে পরিচয় হল না, আমাদের পরমতম বন্ধু। সেই যে বলে, বুক

পেতে দেবো, পায়ে কুশাঙ্কুর না বেঁধে—সত্যি সত্যি তাই যেন পারে ওরা। শুধুই কাজের সম্বন্ধ হলে প্রাণের এত কাছে আসত না।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। আর আসব না হয়তো জীবনে, আর ওদের দেখতে পাব না। সকল মানুষ—রাস্তায় অজানা মানুষটা অবধি কত ভালো, কত ভদ্র! ইয়ং বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বললাম, সত্যি ভাই, বড্ড খারাপ লাগছে।

ইয়ং বলে, আমাদেরও। তবু বলি, সোয়াস্তিও পাচ্ছি মনে মনে। অহোরাত্রি এত দিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে তোমাদের কোনরকম কষ্ট হয়। যাবো তোমাদের দেশে—যদি কখনো যোগাযোগ ঘটে। ভারত চোখে দেখবার জন্ম বড্ড লোভ।

এত ছেলে-মেয়ে এরোড্রোম চলেছে, সুইং কোথায়? সকাল থেকে তাকে দেখতে পাইনি। মালপত্র ও মানুষগুলো ওজন হওয়ার পরে এক মুশকিল। এত বোঝা প্লেন বইতে পারবে না। কমাও সাড়ে চার-শ কিলোগ্রাম। চড়ন্দার আমরা ষোল জন; আর ভারী মাল সবই প্রায় ট্রেনে চলে গেছে। তবু এই! দোষ বাপু তোমাদেরই। দু-হাতে উপহার দিয়েছ—আর এমন খাওয়ান খাইয়েছ মানুষগুলোও ওজনে দেড়া দুনো হয়ে গেছে।

কি করা যায়! মানুষে ছাঁট-কাট চলে না, জিনিসপত্র কি ফেলে যাওয়া যায়, দেখ। নীলিমা দেবী স্যুটকেশ খুলে নিতান্ত দরকারি কাপড়-চোপড় কিছু বোঁচকায় বেঁধে নিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোঁচকা বাঁধলেন। খাঁটি ভারতীয় কায়দায় বোঁচকা। বাড়তি জিনিস ট্রেনে চলে যাবে সাংহাই।

এই সব হচ্ছে—একটা বাস এসে পড়ল। হাতে ফুলের তোড়া—কলধ্বনি করে গুটি দশেক পায়োনিয়র ছেলেমেয়ে নামল। বিশিষ্ট বর্ষীয়ান আরও এক দল এসেছেন—অত সকালে হোটেলে এসে পৌঁছতে পারেননি, সোজা এরোড্রোমে এলেন। সকলের পিছনে—কে বট হে তুমি? সুই-ইঞা-সিঁ ধীরে-সুস্থে নামল। চশমা খুলে কাচটা ভাল করে মুছে আবার চোখে পরে। ভারি শান্ত।

আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে মাল চালাচালির দরুন। প্লেন ছাড়বে এবং সিঁড়ি লাগিয়েছে, প্রপেলার ঘুরছে। পায়োনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়ার আঘ্রাণ নিচ্ছি। ফুলেরই নয় শুধু—কচি কচি সোনার হাতে ফুল তুলে দিয়েছিল, আঘ্রাণ সেগুলিরও। ভিড়ের সর্বশেষ প্রান্তে সুইং—নিকেলের গোল চশমার ফাঁকে ফাঁকে নিঃশব্দে চেয়ে রয়েছে।

স্থইং, লক্ষ্মী বোনটি, আসি এবারে ? চলে যাবার সময় আমাদের ভারতে 'যাই' বলে না, বলতে হয় 'আসি'—

জবাবে স্থইং ভারতীয় রীতির একটি নমস্কার করল। কৌতুকি ঝগড়াটে দামাল মেয়েটা ভালমন্দ একটি কথা উচ্চারণ করল না। মুক্রুকর কপালে ঠেকিয়ে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শুধু। তার ছবি আজও চোখের উপর দেখতে পাই। নিকেলের গোল চশমা-পরা গম্ভীর ম্লান একটি মুখ।

প্লেন আকাশে উঠল, কত স্নেহ-ভালবাসা ফেলে এলাম ঐ মাঠের প্রান্তে। বিদায় বন্ধু বিদায়! আর কি কখনো দেখতে পাবো তোমাদের ? পর্বত সমুদ্র ও হাজার হাজার মাইল ভূমির ব্যবধানে আবার আমরা তফাত হয়ে গেলাম!

কাচের জানালা দিয়ে দৃষ্টি আমার মাটির দিকে তাকিয়ে আকুলি-বিকুলি করছে। মানুষ এমন ভালো! তুমি একটুও জানো না, দুনিয়া-ভরা কত আত্মীয়তা তোমার জন্য! আমার ভাগ্যদেবতাকে আমি বার বার প্রণাম করি। ভুবনের কত রূপ দেখে গেলাম, ভুবনের দেশে দেশে পরমাশ্চর্য সুন্দর মানুষ!

এক পাক দিয়ে গ্রীষ্মপ্রাসাদ। বিশাল লেক, জলের উপর ঘর, মাটি কেটে পাহাড় উঁচু-করা, পাহাড়ের উপরের হর্ম্যমালা—ঐ যে গ্রীষ্মপ্রাসাদ, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আর এক দিন বিমুগ্ধ সম্ভ্রমে কক্ষ-অলিন্দে-চত্বরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, আজকে চাঁদ-তারাদের মতন আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। দেখে হাসি পায়। শ্বেতবরন জয়স্তম্ভ—কোন এক মহারাজা রাজদম্ভ পাথরে গেঁথে পাকা করে গেছেন। স্তম্ভটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হচ্ছে ঐই উপর থেকে। মহারাজ ভেবেছিলেন কি বিশাল কীর্তিই না স্থাপন করে যাচ্ছি! তখন যে মানুষের উড়বার পাখা হয়নি। আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে নিজেরই তাঁর লজ্জা করত।

দিনটা ভালো নয়, জোর বাতাস বইছে। কাল সর্বক্ষণ টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে, আজকেও সূর্য মুখ দেখালেন না এখন অবধি। নগর-গ্রাম চৌবন্দি ক্ষেত-খামার এবং কারখানার খোপ-কাটা ছাত দেখতে দেখতে—হঠাৎ এক সময় ডুবে গেলাম মেঘ ও কুয়াশা-সমুদ্রের মাঝখানে।

স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে দিকচিহ্নহীন আকাশে উল্কা-গতিতে ছুটছি। বিচিত্র অনুভূতি। ধরণীর সঙ্গে কোন বন্ধন নেই। কান দুটো আচ্ছা করে তুলো এঁটে বধির করে দিয়েছি। কর্মহীন চক্ষু দুটো অলস-

ভাবে কামরাটুকুর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে; এদিকে-ওদিকে লেখা কয়েকটা পড়ব—তা-ও চীনা হিজিবিজি। তাজ্জব ভাষাপ্রীতি এদের। সেদিনকার সেই যে লেখক-শিল্পী সমাবেশ, তাতে এক কাণ্ড হল। সেই কথা মনে পড়েছে! মাও-তুন বক্তৃতা করছেন—দোভাষি মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি করে যাচ্ছে। লাগসই কথা বলতে পারছে না, মাও-তুন শুধরে দিলেন তাকে দু-তিন বার। অথচ নিজে কিছুতে ইংরেজি বলবেন না—ইজ্জতহানি হয়।

তাক বুঝে হোস্টেস বসবার আসনটা নিচু করে দিল। বাক্স থেকে কম্বল নামিয়ে গায়ে চড়াবার উদ্যোগ করছিল, হাত নেড়ে নিষেধ করলাম। তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কামরার বাকি প্রাণীগুলি কম্বলের তলে চোখ বুজেছেন। জাগরণ আর ঘুমে যেখানে কোন তফাত নেই, মিছে কষ্ট করে চোখ মেলে থাকে বোকারাই।

বেলা দুটোয় প্লেন ভুঁয়ে নামল। সাংহাই। প্লেনের ভিতরে সবাই পথ করে দিলেন, আমি আগে নামব! নেমে ক্যামেরার আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাচ্চার হাতের ফুলের মালা নেবো সর্বাগ্রে। ওঁরা সঙ্গে থাকবেন। দলনেতা কিচলু বরাবর এই ঝক্কি ঝুলিয়ে এসেছেন। তিনি পিকিনে। তখন বুঝিনি, ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে।

সারবন্দি মোটরকার—বড়লোকের বিয়ের শোভাযাত্রার মতো রাস্তা কাঁপিয়ে শহরতলী ছাড়িয়ে আমরা চললাম। অবশেষে আসল-শহর। পরিচ্ছন্ন, আধুনিক। পিচ-দেওয়া ঝকমকে চওড়া রাস্তা। পনের তলা, বিশ তলা, তিরিশ তলা ঘরবাড়ি। নগর-পরিকল্পনা পশ্চিমি মগজের। অনেক বছর ধরে মনের মতো করে গড়েছিল, আজকে তাদের দেশেঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরের জায়গায় ফোপরদালালি আর নয়। সাদা মানুষ তবু অবশ্য দশ-বিশটার দেখা মেলে—পিকিনের চেয়ে অনেক বেশি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তারা পথ চলে—ভূত হয়ে চলেছে যেন। ভূতই বটে, সকল প্রতাপ অস্তমিত। কেউ আর সম্ভ্রম করে না, প্রাণ-ধারণের গ্লানি পদে পদে। বরাবর যাদের কুকুর-বিড়াল ভেবে এসেছে, তারাই মাতব্বর। নিতান্তই পেটের দায়ে, যে ক'টা দিন পারা যায়, চোখ-কান বুজে পড়ে আছে।

আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সামনে গাড়ি একে একে এসে থামতে লাগল। ক্যাথে হোটেল আগেকার নাম, এখন কিংকং হোটেল। সিঁড়ি নেই, হলের এদিক-ওদিক চারটে লিফট অবিরত ওঠা-নামা করছে। আচ্ছা মশায়, বিদ্যুৎ-

সরবরাহ বানচাল হয়ে লিফট যদি অচল হয়, তখনকার উপায়? এত বড় বাড়ির একটা সিঁড়ি হয়নি কেন?

সে যে প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াত! সিঁড়ি ভেঙে উঠবে কোন জন? হোটেলের নিজস্ব বিদ্যুৎ-তৈরির ব্যবস্থা আছে। শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হল তো বয়ে গেল—তক্ষুনি নিজেদের কল চালু করে দেবো।

এগারো তলায় নিয়ে তুলল। ঐখানে স্থিতি। খেতে হবে একতলা নেমে গিয়ে—দশ তলায়। লাউঞ্জে বসে কাপ দুই সবুজ চা খেয়ে চাঙ্গা হলাম। সে বস্তু খান নি বোধ হয় আপনারা—দুধ-চিনি ঠেকালেই বিস্বাদ হয়ে যাবে, গন্ধটুকু থাকবে না।

ঘরে ঢুকে জানালায় দাঁড়ালাম। শহর কত নিচে, মানুষগুলি গুড়িগুড়ি কলের পুতুলের মতন। আমরা আছি রীতিমত উঁচু মেজাজে। আকাশে উড়ে এসে যেখানটায় বাসা দিল, সে-ও আধেক আকাশ। মস্ত বড় ঘর—তার মধ্যে যথারীতি আমি এবং ক্ষিতীশ।

(১৭)

দরজায় ঠকঠকি। আলনার কোটটা গায়ে চাপিয়ে এক মুহূর্তে ভদ্রলোক হয়ে বসি।

আসুন—

আসছেন তো আসছেনই। দলে যত আছেন সকলেই। অত জনের বসবার জায়গা কোথায় দিই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলল।

কিচলু তো আসেন নি। নেতা বিহনে কি করে চলে! নেতা ঠিক করতে হবে একজনকে!

বেশ, হোক তবে তাই—

তৎক্ষণাৎ নেতার নাম প্রস্তাব, সমর্থন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনান্তর। ঝটপট সকলে বেরিয়ে গেলেন। বিচারক যেমন রায় দিয়ে কামরায় ঢুকে যান—তাকিয়ে দেখেন না, হতভাগ্য আসামির অবস্থাটা কি দাঁড়াল। আধ মিনিটে শেষ। আমার একটা কথা শোনাবারও ফুরসত হল না। দলবল সাজিয়ে তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকেছেন, আগে তা কেমন করে বুঝব?

তা যেন হল। কিন্তু নেতা হওয়ার ধকল যে বিস্তর! যেখানে পা ফেলবেন, আদ্য কিংবা অন্ত্য ভাগে সভা একটু হবে। নেতা মশায়ের সেই সময় জবান ছাড়তে হবে। ভারতীয় মানুষ—বাক্যের ব্যাপারে অবশ্য নিতান্ত

অপারগ নই। আর একটা আছে—অতিথির সম্মাননায় পয়লা মওকায় বিরাট ভোজ। অধিকন্তু ন দোষায় হিসাবে আবার বিদায়ভোজেরও আয়োজন থাকে অনেক জায়গায়। এবম্বিধ ভোজসভায় ইতিপূর্বে একটেরে বসে আত্মরক্ষা করেছি। নজর ফাঁকি দিয়ে পাঁচ বছরের বাসি-ডিম এবং ঐ জাতীয় বাছাই পদগুলি বেমালুম ডিশের তলায় চালান করেছি। কিন্তু নেতাকে বসতে হবে কেন্দ্রস্থলের বড় টেবিলে—ও তরফের বাছা বাছা মাতব্বরের সঙ্গে। কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন, ঘূর্ণ্যমান বহু-তারকা সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। এমনিতরো শতেক বিপদ নেতার।

ফাঁসির হুকুমে আপিল চলে। সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের কাছে অতএব ধর্না দিয়ে পড়লাম! কিন্তু পাষাণ অধিক মাত্রায় গলালো গেল না! শেষ পর্যন্ত রফা হল—নেতা আমিই; বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দিল্লীর যজ্ঞদত্ত শর্মা আমায় মন্ত্রণাদান করবেন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অতিথির খাতিরে রাত্রিবেলা নাচ-অপেরায় দরাজ আয়োজন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ভোজের হাঙ্গামা। ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে শহরের যেটুকু দেখা যায়।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। থামবার নয়—চলছে তো চলছেই। নতুন দোভাষি আমার গাড়িতে যাচ্ছে, মেয়েটির নাম তুন-সু-সে (Tung Shu-Tse)। অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছে সম্প্রতি। ভাল মেয়ে, খাসা ইংরেজি বলে—নয়তো একফোঁটা মানুষটাকে অধ্যাপক করে! কিন্তু বৃষ্টিজলে পণ্ড করে দিল সমস্ত। নামতে পারছি না, গাড়ির খোলে বসে বসে কি জায়গা দেখা হয়? দেবরাজ, ক্ষমা দাও—কম সময়ে কত কি দেখবার! আমরা চলে গেলে যত খুশি তুমি জল ঢেলো।

চীনের সব চেয়ে বড় শহর সাংহাই। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলেছি তরঙ্গিণী হোয়াং-পুর কিনারা ধরে। সমুদ্র বেশি দূরে নয়। মস্ত বড় বন্দর। নানকিনের সন্ধির মহিমায় যে সব জায়গা বিদেশির করায়ত্ত হয়েছিল, তার মধ্য সকলের সেরা। ক-বছর আগেও বিদেশি মানোয়ারি জাহাজ ঐ জলের উপরে ঘুরে ঘুরে বিদেশি স্বার্থ পাহারা দিত; চীনের মানুষজনকে উপোসি রেখে সমুদ্র-পারে খাদ্য পাচার করত। পরগাছারা বিদেয় হয়েছে। জাহাজঘাটায় তাই ভিড় নেই—নিজেদের যে দু-পাঁচটা জাহাজ, তারাই গতর ছড়িয়ে আছে। ঐ যে সব বড় বড় বাড়ি—এমনধারা নিরামিষ ছিল কি আগে? হোটেল-

রেস্তোঁরা, পতিতালয়—সারা রাত আমোদ-স্ফূর্তি হৈ-হল্লা! সারা দুনিয়ার মানুষ, আসত আমোদ লুঠতে—সাংহাইর নাম দিয়েছিল 'পুব অঞ্চলের প্যারি'। বিদেশিদের জন্য আলাদা এক পাড়া—ফ্রেঞ্চ টাউন। নামেই মালুম—মানে বোঝাবার প্রয়োজন নেই! ফ্রেঞ্চ টাউনের বড় বড় বাড়ির ছায়ান্ধকার ভাঙা চোরা বস্তির মধ্যে কীটের মতন জীর্ণ-শীর্ণ চীনা ভিক্ষুকের দল। নদীর এধারে-ওধারে ফ্যাক্টরিগুলোর মালিক সমস্তই বিদেশি। আটটার ভোঁ বাজলে কোথা থেকে মজদুরের দল কিলবিল করে আসত, ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে আবার নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ত তারা।

এখন ভিন্ন এক জায়গা। ভিখারি নেই, পতিতা নেই। স্ফূর্তি আর মাতলামির জায়গা হোটেল-রেস্তোঁরার বাড়িগুলোয় রকমারি জন-প্রতিষ্ঠান হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস সর্বত্র। কুয়োমিনটাং সৈন্যরা বোমা মেরে মেরে শহরের বুকে অগণ্য বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করেছিল, বেমালুম এরা আরোগ্য করে ফেলেছে!

ভিক্ষা আর পতিতাবৃত্তি নির্মূল হল—গল্পটা বলতে হবে নাকি? ঝটপট এখন বই শেষ করতে চাই, কত আর গল্প শোনাবো? তুন মেয়েটা দেমাক করছিল—আদিম কাল-থেকে-আসা এত পুরানো ব্যাধি ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমরা নিরাময় করে ফেললাম। পতিতালয়ে আগের সন্ধ্যায় মধুপায়ীরা ভিড় জমিয়েছিল, পরের সন্ধ্যায় এসে দেখে ভোঁ-ভোঁ। নির্জন ঘরবাড়ি—একটি হতভাগিনী নেই কোন জানলার ধারে। একটা-দুটো বাড়ি নয়, গোটা শহরই পতিতাশূন্য। তাই বা কেন—পতিতা নেই মহাচীনের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কোন জায়গায়।

মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে গভর্নমেণ্ট নয় ওখানে—রাজশক্তি দেশের সর্বমানুষের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে। নতুন আইন হবার আগে দেশময় জানান দেওয়া হয়। মীটিং করে, ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করে, প্রস্তাব পাশ করে বিভিন্ন ইউনিয়ন। মাসের পর মাস ধরে চলে এই সমস্ত। তারপরে আইনটা পাশ হতে লাগে দশ-বিশ মিনিট মাত্র; বক্তৃতাদি আগেভাগে চুকিয়ে রাখা হয় আইন-সভায় নয়—শহর-গ্রামের গণমানুষের মধ্যে। দেহ বিক্রি করা অথবা অর্থমূল্যে দেহ কেনা বে-আইনি—আইনটা পাশ হল ধরুন বেলা দুটোর সময় পিকিন শহরে। তিনটে নাগাত দেখা গেল শহরের পতিতালয়গুলোয় সরকারি লোক হানা দিয়েছে—হাতে এক এক ফর্দ। তুমি শ্রীমতী অমুক বুড়ো অশক্ত হয়েছ—বেখরচায় সরকারি আশ্রমে গিয়ে ওঠো।

তুমি চলে যাও অমুক জায়গায় নার্সিং শিখতে, তুমি অমুক ফ্যাক্টরিতে। তোমার অসুখ আছে—অমুক হাসপাতালে চলে যাও। এ বাচ্চাটি অমুক ইস্কুলের বোর্ডিং-এ যাবে, এটি অমুক নার্সারি-হোমে। এই যে হল, এটা পিকিন বা অমনি একটা-দুটো জায়গায় নয়—খবর নিয়ে দেখুন, দেশের সর্বত্র। আগে থেকে বিভিন্ন সমিতির মারফত তালিকা বানিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করে রেখেছে; শুধু আইন করেই দায় খালাস নয়। ভিখারি সম্পর্কেও এমনি ব্যাপার। দেশের মধ্যে অপচয় বন্ধ—সেটা জিনিসপত্র জীবজন্তু এবং বিশেষ করে মানুষের সম্পর্কেই। সেদিনের সামাজিক আবর্জনারা আজকে তাই হীরা-মানিক কোহিনূর হয়ে উঠেছে। বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করছে অনেক মেয়ে। নার্স হয়েছে, রেলের গার্ড-ড্রাইভার হয়েছে। কয়েকটি স্বচক্ষে দেখলাম আমরা। আর দশটার মতন সমাজের সম্মানিতা মেয়ে—স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল।

অপেরায় তিনটে পালা একের পর এক। রাত কাবার করে ছাড়বে! নাচ আর গান, গান আর নাচ। সে আর দেখাই কেমন করে আপনাদের—দু-কথায় গল্প তিনটে বলে দিই। পয়লা পালা পৌরাণিক—'সিচাউ শহরের গল্প'। সিচাউর কাছে রামধনু-সাঁকোর নিচে জলকন্যা থাকে। নগরপালের ছেলে সি টিং-ক্যাংকে জলকন্যা ভালবেসে ফেলল; মায়া করে তাকে জলতলের প্রাসাদে নিয়ে এলো বিয়েথাওয়ার জন্য। সি র কিন্তু কনে পছন্দ নয়। বিয়ের ভোজের মধ্যে সে জলকন্যাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে, তার কণ্ঠ থেকে মায়ামুক্তা নিয়ে জলতল থেকে পালিয়ে উপরে উঠে গেল। জলকন্যা ক্ষেপে গেল প্রতারিত হয়ে; বন্যায় শহর ভাসিয়ে দিল। লোকের দুঃখের অবধি নেই। জলকন্যার উপর-ওয়ালা দেব-রাজপুত্র। জলকন্যার কাণ্ড দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবসৈন্য পাঠালেন তাকে দমনের জন্য। নদীর নীচে বিষম লড়াই। জলকন্যা হেরে গেল অবশেষে।

পরেরটা ঐতিহাসিক পালা—'প্রিয়তমার সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ'। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৭ অব্দের ব্যাপার। অত্যাচারী চিন সি-ওয়াঙের বিরুদ্ধে লড়াই করছে লিউ পোঙের নেতৃত্বে চাষীর দল, এবং সিয়াং উ। লড়াই জিতে সিয়াং উ হল রাজচক্রবর্তী আর লিউ পোং হল হানের রাজা! তার পরে বেধে গেল সিয়াং উ আর লিউ পোঙের মধ্যে। সিয়াঙের মন বড় খারাপ—লড়াই সুবিধা করা যাচ্ছে না। সিয়াঙের উপপত্নী উ চি অসি-নৃত্য করল সিয়াংকে খুশি করবার জন্যে। উন্মাদক নৃত্যে নবোৎসাহে মেতে উঠল সিয়াং; উয়াং সি নদীর পূর্ব-

পারে সে নতুন করে ব্যূহ রচনা করল। করল বটে, কিন্তু মন যায় না রূপসী প্রিয়া উ চি'কে ছেড়ে যেতে। উ চি অবশেষে আত্মহত্যা করে পথ নিষ্কণ্টক করে দিল। বিরহব্যাকুল সিয়াং হেরে গেল লড়াইতে; আত্মহত্যা করে সে-ও প্রিয়তমার পথ নিল। লিউ পোং সর্বময় হয়ে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল —দেশব্যাপ্ত চাষী-বিদ্রোহের ফল আত্মসাৎ করল একা একটি লোক।

শেষ পালাটা পরী-কাহিনী—'মায়াপদ্মের লণ্ঠন'। উত্তর-চীনে আকাশ জুড়ে অপরূপ হু-সান পর্বত। এই পর্বত নিয়ে যুগে যুগে বিস্তর পরী-কাহিনী চলেছে। এর ল্যাং-সেং দেব-রাজপুত্র। ছোট বোন দেবীকে নিয়ে সে পর্বতের উঁচু চূড়ায় থাকত। হু-সান পর্বতের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য হল মায়াপদ্মের লণ্ঠন। পরী-জগতের কর্তা হবার জন্য এ এই লণ্ঠন চুরি করল, লোহা দৈত্যকে পর্বত চাপা দিল, নিজের বোন দেবীকে রাখল অত্যন্ত কঠোর শাসনে।

লিউ ইয়েন-চ্যাং কবি; অফিসের পরীক্ষায় ফেল হয়ে মনমরা ভাবে বাড়ি ফিরছে। হু-সান পার হবার সময় পশ্চিম-চূড়ার মন্দিরে সে রাত কাটাচ্ছে। সেই মন্দিরে দেব-রাজপুত্র ও দেবীর মূর্তি। দেবীর রূপ দেখে পাগল হয়ে কবি দেয়ালে তার নামে এক কবিতা লিখল। জ্যোৎস্না রাত। লিউ ঘুমিয়ে পড়েছে—দেবী তখন মন্দিরে এলো। পড়ল দেয়ালের কবিতা।

সকালবেলা বড় কুয়াশা। তারই মধ্যে লিউ মন্দির ছেড়ে বেরুল। দেব-রাজপুত্রের এক ভয়ানক কুকুর—সে তাড়া করেছে লিউকে। দেবী আর তার সহচারী লিন চি দেখতে পেলো লিউর অবস্থা। হু-সানের চূড়ায় গিয়ে জোর করে তারা মায়াপদ্মের লণ্ঠন নিল লিউকে বাঁচাবার জন্য। লিউশের সঙ্গে দেবীর বিয়ে হল; লোহা-দৈত্যও মুক্তি পেলো। স্বামী নিয়ে দেবী মহাসুখে থাকে। এদিকে দেব-রাজপুত্র কুকুরের কাছে সমস্ত শুনে বিষম খাপ্পা। কুকুর মায়া-লণ্ঠন চুরি করে নিল। দেবী তখন লিউকে দেশে পাঠিয়ে দিল, নয়তো ভাইয়ের আক্রোশ থেকে তাকে বাঁচানো অসম্ভব। দেবীর এক ছেলে হল— চেং সিয়াং। এর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছিল, লিন চি অনেক কৌশলে বাঁচাল। তখন দেবীকেই পর্বতের নিচে আটকে রাখল এর। লিন-চি লিউর কাছে সমস্ত খবর দিল। কিন্তু কি করতে পারে শক্তিহীন নিঃসহায় লিউ!

পনের বছর কেটেছে, চেং সিয়াং বড় হয়েছে। সবাই তাকে ডাইনির ছেলে বলে। লিউ একদিন ছেলেকে সব বলল। রাত্রে চেং কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল মায়ের উদ্ধারের জন্য। অসংখ্য বাধাবিপত্তি। শেষটা লোহাদৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চেঙের মায়ের উদ্ধারের জন্য দৈত্য সকল

সাহায্য করবে। দেব-রাজপুত্রকে কিছুতে খুঁজে পায় না। মন্দিরে তার যে মূর্তি ছিল, চেং এক কোপে সেই মূর্তির গলা কেটে ফেলল। এর আর কুকুর বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে। কুকুরকে মেরে ফেলল, এরকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিল। পাহাড় কেটে দু-ভাগ করে মায়ের উদ্ধার করল চেং শিয়াং।

(১৮)

অপেরা থেকে ফিরেছি গভীর রাত্রে, কথাবার্তার তখন সময় ছিল না। পরদিন ব্রেকফাস্টের আগেই রমেশচন্দ্র তুন ও আর কয়েকটিকে নিয়ে ঘরে এলেন। নেতা তুমি—চটপট এখানকার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেল। দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত সকলে। পরের ভাত খেয়ে গতর বাগানো যাচ্ছে বটে—তা-হলেও দেশে কাজকর্ম রয়েছে। তারও বড় কথা, লজ্জা-শরম আছে তো কিঞ্চিৎ—কত দিন আর থাকা যায় পরের কাঁধে চেপে? সময় কম, দেখবার জিনিস বিস্তর। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার প্রোগ্রাম বানাও দিকি একটা!

চার জায়গায় আজকে—কর্মিদের সংস্কৃতি-ভবন, সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি, একটা কর্মিকপল্লী আর কাপড়-চোপড় ছাপানোর সরকারি ফ্যাক্টরি। আর এক ব্যাপার আছে—কাল বহু লক্ষ লোকের বিরাট সভা। পিকিনের পাট চুকিয়ে বিস্তর প্রতিনিধি সাংহাইয়ে জমেছেন। শান্তি-সম্মেলন থেকে ফিরে এলে—এখানকার মানুষও শান্তির কথা শুনতে চায়। পিকিনের মতো সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ নেই, তবু যে দেশগুলো হাজির আছে সকলের তরফ থেকে বলা হবে কিছু কিছু। ভারতের দু-জন বলবেন। দলনেতা হিসাবে আমার রেহাই নেই—অপর কে বলবেন, ঠিকঠাক করে ফেল।

জওহরলালের দেশের মানুষ—মুখ চুলকানো ব্যাধি অনেকেরই। তাই ঠিক করেছি, বক্তৃতা আর একজন-দুজনের একচেটিয়া কারবার থাকবে না, যত জনকে পারি, সুযোগ দেবো। সুযোগ পেয়েও না যদি বলেন, তখন আমায় দোষ রইল না।

পশুপতি বেঙ্কট রাঘবিয়া পার্লামেন্টের সদস্য—তাঁকে বললাম বক্তৃতা তৈরি করবার জন্য। রাত্তের মধ্যে আমায় দেবেন; দুই বক্তৃতা সকালবেলা ওদের কাছে দেবো চীনা তর্জমার জন্য। আমরা তো ইংরেজিতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে চীনায় না বলে দিলে সাধারণে কেউ বুঝবে না।

কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন। মস্ত বড় বাড়ি—নতুন রংচং এবং একটু-আধটু রদবদল হয়ে আরও ঝকমকে হয়েছে। কুয়োমিনটাং আমলে হোটেল ছিল

—'প্রাচ্য হোটেল'। সেই সব হোটেলের একটি, যার নামে স্ফূর্তিবাজ বিদেশির মুখে লালা ঝরতো। ১৯৫০ অব্দের ১লা অক্টোবর সংস্কৃতি-ভবন রূপে বাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হল কর্মিক সাধারণের জন্য। রোজ তখন হাজার পাঁচেক লোক আসত, এখন আসে কমসে কম দশ হাজার।

নানান বিভাগ—একটা হল, শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ। সাহিত্য, রাজনীতি ও কারু-শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একবার। দেশের ইন্দ্রচন্দ্রেরা এসে বক্তৃতা দিয়ে যান এখানে। লাইব্রেরি আছে—আটাত্তর হাজার বই। শ-দুয়েক বই রোজ বাড়ি নিয়ে যায় পড়তে; হাজার তিনেক লোক পাঠাগারে বসে পড়ে। পাঠাগার অনেকগুলো—ঘুরে ঘুরে দেখছি। বই-কাগজ টেবিলে সাজানো সুস্বাদু খাদ্যের মতো—লোকগুলো অন্য মনে গোগ্রাসে গিলছে। যারা বেশি এগিয়েছে, তাদের পাঠাগার স্বতন্ত্র; বেশি ছিমছাম—নিস্তব্ধতা সেখানে বেশি। বাড়িটার তেতলায় বইয়ের দোকান। পড়ে পড়ে কর্মিকদের নেশা ধরে গেছে, নিজস্ব বই না হলে তৃপ্তি হয় না। দৈনিক হাজার বই বিক্রি—ওদের জন্যে বিশেষ সস্তা সংস্করণ।

এরই মধ্যে একবার এক প্রশস্ত হলঘরে টেনে নিয়ে লম্বা টেবিলের এধারে-ওধারে চাপিয়ে বসিয়ে দিল। (এবং টেবিলের উপর—উঁহু, কতকগুলো প্লেটকাপ, তাতে কোন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ছে না।) সেক্রেটারি মশায় আমাদের সংবর্ধনা জানালেন, আমাকেও পাল্টা জবাব দিতে হল তার। এই এক প্রতিযোগিতা—কে কার সম্বন্ধে কত ভাল কথা বলতে পারে!

অনেকগুলো ঘর নিয়ে রকমারি জিনিসের একজিবিশন। যেখানে যাই, একজিবিশন আছেই। মানুষকে শেখাবার এমন কৌশল আর নেই। যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে বিস্তর এগিয়েছে এরা—ট্রলিবাস বানাচ্ছে নিজেরা, বয়লারের বিস্তর উন্নতি করেছে। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। সহজে ও সস্তায় বাড়ি তৈয়ারির নানা কায়দা বের করেছে নিতান্ত এক সাধারণ মিস্ত্রি—মেজে পালিশ করা, মশলা মাখা ও গাঁথনির নানা পদ্ধতি। এমনিতরো অনেক আবিষ্কারেরই গৌরব হাতে-কলমে কাজ-করা ওস্তাদ কর্মিকদের, বই-পড়া ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকের কাছে। কাজ করতে করতে মাথায় এসে গেছে নতুন ভালো কায়দা। এক মেয়ে-কর্মিক আবিষ্কার করেছে কাপড় বোনার নতুন রীতি—কম সময়ে কম দামে ভাল জিনিস উতরাবে। দেখতে দেখতে এই কথাই বারম্বার মনে আসে—কর্মিকরা যদি উপলব্ধি করে তারা খাটছে নিজের দেশ ও নিজ মানুষদের

জন্য, তাদের গতর-ঘামানো লাভ অন্য কেউ লুঠ করে নেবে না, তবে তো অসাধ্যসাধন হয় তাদের দিয়ে।

সাংহাইয়ের কর্মিকদের মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার। কারখানা-মজদুরের যে চেহারা আমাদের মনে আসে, সে আঁধার উত্তীর্ণ হয়ে এরা এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাত্র সংস্কৃতি-ভবন নয়, ছোট-মাঝারি বিস্তর ক্লাব আছে। অনেকে ছবি আঁকে—কর্মিকদের আঁকা বিস্তর ছবি দেয়ালে। উড-কাটও আছে। কবিতা লেখে—তা-ও রেখে দিয়েছে একজিবিশনে। পোস্টার ও প্রচারপত্র ; গোটা চীনদেশের অগ্রগমনের ছবি। নবজাগ্রত জাতি দুরন্ত বেগে সকল দিকে এগিয়ে চলেছে—ছবি দেখেই সেটা মালুম হবে। ছবিতে লেখায় ও জিনিসপত্রে কর্মিক-আন্দোলনের ইতিহাস সাজিয়ে-রেখেছে, কয়েকটা ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও ও-প্রান্ত। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই ইতিহাস মনের উপর জলজ্বল করবে। ১৯২৯ অব্দ থেকে আন্দোলনের শুরু বলা যায়—রাজনীতিক অর্থনীতিক উভয়মুখী। তার আগেও ছিল, কিন্তু সে হল ইতস্তত বিস্ফোরণ—নিয়মবদ্ধ কিছু নয়। পয়লা মওকায় আন্দোলনের নেতাদের জেলে ঢোকালো—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। তাতে ফল হল না—সর্বত্র যেমন দেখা যায়। কুচাং-ফুং নামে এক মেয়েকে মেরে ফেলল (১৯২৩ অব্দ) ; থানার সামনে বিরাট মিছিল—সেই পুরানো ছবি দেখতে পাচ্ছি। জাপান ও আমেরিকার মিলিত-অভিযান। কী কষ্ট, কী কষ্ট দেশের মানুষের কত মেরেছে, কত জনের হাত-পা কেটেছে ! তারও বিস্তর ছবি। শহর জুড়ে সাধারণ-ধর্মঘট। সেই সময়কার কাগজে ধর্মঘটের ছবি দিয়েছিল—খবরের কাগজের সেই অস্পষ্ট ছবি কেটে রেখে দিয়েছে। তার পর বন্যা এলো আন্দোলনের। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে। সে আমলের নগণ্য তরুণ কর্মীদের সব ফোটো। এঁদের অনেক আজ নতুন-চীনের কর্ণধার। প্রাণ গেছে কত জনের—নির্জন সেলের ভিতর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে শান্তচিত্তে কত ভাবনা ভেবেছেন, বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয়। পালা বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় করে জাপানকে রুখতে বলেছে। আহা, ভাগ্যিস ফোটো-গুলো তুলে রেখেছিল—তাই তো আন্দোলনের নানা পর্যায়ের খানিক আন্দাজ নিয়ে ফিরলাম। ১৯৩৮ অব্দে লড়াইয়ে জখম হয়ে এক মৃত্যুপথযাত্রী লিখছে, "আমার মরণ কিছুই নয়—এক হয়ে সকলে সংগ্রাম করে যাও।" ১৯৪৭ অব্দে মার্কিন জিনিসপত্র বয়কট করল, তাই নিয়েই বা মারা পড়ল কত মানুষ।

আর দেখলাম, এক সর্বত্যাগী তরুণের প্রতিমূর্তি—ওয়াং সাও-হো। ১৯৩৮ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কুয়োমিনটাঙের লোক গুলি করে মেরেছিল তাকে। প্রতিমূর্তির নিচে এক কাঠের বাক্স—তার মধ্যে শহীদের জামা-প্যাজামা-টুপি, বই-খাতা-ফাউন্টেনপেন। গুলিতে জামা ফুটো হয়ে গেছে, রক্ত বেরিয়ে চাপ-চাপ এঁটে রয়েছে জামার উপর। সমস্ত আছে। কলেজি ছেলে, ক্লাসের অঙ্ক কষা রয়েছে খাতায়। এই তো সেদিন চারটে বছর আগে সে এই সব অঙ্ক কষেছে। চোখ জলে ভরে আসে। আমার কিশোর বয়সে কয়েক জনকে দেখেছি—যেদিন ডাক এলো, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসতে হাসতে ছুঁড়ে দিল। ক-জনই বা মনে রেখেছে তাদের! ওয়াঙের ঐ মূর্তির পাশে তাদের মুখগুলো ভেসে উঠছে। ওরা সকলে এক।

সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি। আগে এক সামান্য বাড়ির গোটা-দুই তিন ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। এক কানাডাপ্রবাসী বন্ধু (চীনেরই মানুষ) এই বাড়ি করে দিয়েছিলেন। দোতলা ছোট বাড়ি—একটু লন আছে, শহরের দৈত্যাকার বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনা হয় না। ছোটখাটো ছিমছাম সুন্দর একখানা ছবির মতন। পড়ার ঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর, অফিস ঘর—ঘুরে ঘুরে দেখছি। যে টেবিল-চেয়ারে কাজকর্ম করতেন, যে শয্যায় শুতেন, তাঁর দৈনিক ব্যবহারের টুকিটাকি অসংখ্য জিনিসপত্র। কোন জিনিস নড়ানো-সরানো হয়নি। বিপুল পুস্তক-সংগ্রহ—দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছেন, নিজের হাতে-লেখা নোট রয়েছে অনেক বইয়ের পাশে। নানা বয়সের নানা অবস্থার ছবি। সুন-চিন-লিঙের যৌবন-বয়সের একখানা ছবি—আশ্চর্য রূপের প্রতিমা। এখনকার প্রবীণ মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের মধ্যেও সেকালের সেই রূপের আঁচ পাওয়া যায়।

১৯২৫ অব্দে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর মাদাম সুন চিন-লিং বাড়িটা জাতিকে দিয়ে দিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্পত্তি—দলে দলে মানুষ এসে দেখে যায়। চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে। তীর্থযাত্রীর মতো নত-মস্তকে আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

নাকে মুখে দুটো গুঁজে আবার বেরিয়েছি। বিশ্রামের সময় নেই। একটা কর্মিক-পল্লী—সাও-ইয়াং ভিলা—শহর থেকে ছয় মাইল, সাংহাইর শহরতলি বলা যায়। চারিদিক ফাঁকা, তার মধ্যে একশ-ছটা দোতলা বাড়ি। প্রতি

বাড়িতে ছটা করে ফ্লাট। ছশ ছত্রিশটা পরিবার অতএব থাকে এখানে। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো একতলা বাড়ি—ইস্কুল, ডাক্তারখানা, সমবায়-দোকান ইত্যাদি। চল্লিশ হাজার ইয়ুয়ান দিয়ে সমবায়-দোকানের মেম্বার হতে হয়। বাড়িগুলোর সামনে পিছনে রাস্তা। গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছি—সে কি বিপদ! এ ডাকে, আসুন আমার বাড়ি; ও ডাকে, আসুন আমার বাড়ি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা সংবর্ধনা করছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবি হোক! এলাহি ব্যাপার। আমরা খুশি মতো এর ঘরে একজন ওর ঘরে দুজন এমনি ঢুকে পড়লাম। যত বেশি ঘর দেখে নিতে পারি, বিচারটা তত সাচ্চা হবে। আমরা আসছি দেখে, যদি ধরুন ফিটফাট করে রেখে থাকে! কিন্তু ছশ ছত্রিশটা ফ্লাট লহমার মধ্যে নিখুঁতভাবে সাজানো এক আরব্য উপন্যাসের দৈত্য ছাড়া আর কেউ পারবে না। বেড়ে আছে সত্যি! অনেকের হিংসে হচ্ছে। একজন বললেন, দিল্লির পার্লামেণ্ট-সদস্যরা যে সব বাড়িতে থাকেন সেই কায়দায় নয়!

ছুটুন, ছুটুন। ফ্যাক্টরিতে এর পর। কাপড়-ছোপানোর এক নম্বর সরকারি ফ্যাক্টরি। মেয়ে ডিরেক্টার—মিং চুং-কাং। আগেকার দিনের নিতান্ত এক সাধারণ কর্মী—মজবুত চেহারা, চিরকাল কঠিন শ্রম করে আসছেন সে আর বলে দিতে হয় না। নিয়মমাফিক বক্তৃতা করে সংবর্ধনা জানালেন তিনি। এবং যথারীতি আমার মুখের জবাব পাওয়ার পর কারখানা দেখাতে নিয়ে চললেন। চোদ্দ শ কর্মি খাটে এখানে। খাটুনি দশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে সম্প্রতি আট ঘণ্টায় আনা হয়েছে। সব রঙের ছাপা হয়, ডিজাইন বহু রকমের। তবে শতকরা নব্বুই ভাগ হচ্ছে নেভি-ব্লু রঙের থান ছোপানো। এই রঙের কোট-প্যাণ্টলুন মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়োর সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বিষম চাহিদা। ডিরেক্টারের অঙ্গেও ঐ পোশাক—তবে ধূসর রঙের। উঁহু—ঠাহর করে দেখি, আদিতে নেভি-ব্লুই ছিল। কাচতে কাচতে এই দশা।

(১৯)

স্বদেশের শুভার্থীরা বিস্তর উপদেশ ছেড়েছিলেন। কম্যুনিস্ট দেশ—যে প্রকার এতদিন জেনে বুঝে এসেছ, ঠিক উল্টোটি সেই রাজ্যে। বড়লোক-গুলোকে কেটে কুচি কুচি করেছে, মন্দির-দেবস্থানে রোলার পিষেছে, ঘর

গৃহস্থালি চুরমার। খাটবে এবং খাওয়া-পরা পাবে—ব্যস, এই মাত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—রাস্তার ল্যাম্পপোস্টটা অবধি কান খাড়া করে রয়েছে। এমন-অমন বলেছ—কিংবা মুখ ফুটে বলতেও হবে না, বেয়াড়া রকমের কিছু মনে মনে ভেবেছ কি অমনি নিয়ে তুলবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। দুনিয়ার মানুষ তার পরে আর চিহ্ন দেখবে তোমার।

অনেক দিন হয়ে গেল, রোমহর্ষক বর্ণনার সবগুলো মনে নেই। সকৌতুকে মনে মনে সেই সব আনাগোনা করতাম! কিছুই তো মেলে না হে! সারা জীবনে উঠোন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হননি বটে, কিন্তু ভুবনের যাবতীয় সঠিক সংবাদ তাঁদের নখাগ্রে। তাঁদের সতর্কবাণী বিলকুল ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে!

না, মিলল একটা বটে এত দিনে! ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে নেই. তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শুনুন—অধমের উপর হামলা হয়েছিল কি প্রকার। তাজ্জব হয়ে যাবেন। হয়তো বা চক্ষু বাষ্প-বিজড়িত হয়ে উঠবে।

দলনেতা এবং রুগ্ন অসমর্থের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, অন্য সকলের পাইকারি বাস। দলনেতা বলেই নিরালা কোটের আটকাবে, এ কেমন কথা? এই নিয়ে পিকিনে নিন্দে-মন্দ করতাম! শেষটা নিজেকে নিয়েই টান পড়ল তো বিদ্রোহ করে বসলাম দস্তুর মতো। সে কিছুতে হতে দিচ্ছি নে। তখন করল কি মশায়, জন কয়েক তাগড়া জোয়ান বাসের দরজা চেপে দাঁড়াল—ঢুকবেন কেমন করে বাসে—ঢুকুন না! তাতেই শেষ নয়। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো দু-জনে দু-হাত ধরে টেনে জোরজার করে নেতার গাড়ির মধ্যে পুরে ফেলল। ইংরেজের আমলে দেখছি, স্বদেশি ছেলেদের এই কায়দায় কয়েদির গাড়িতে ঢোকাত। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি, দলের সকলের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করছি—দেখ হে তোমরা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুরোপুরি বিলোপ-সাধন, শারীরিক বলপ্রয়োগ—তা পাষাণ আমরা স্বদেশবাসীরা! সকলের চোখের উপর দিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, তাঁরা হাসতে লাগলেন। অধমের দুর্গতিতে সকলে খুশি!

প্রতিকারের ভার তখন নিজের হাতে নিই। মোটরকার ও বাস পরদিন যথারীতি এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। সকলের আগে আমি চুপিচুপি বাসে উঠেছি, একটা বেঞ্চির কোণ নিয়ে নিঃসাড়ে বসে আছি। তারপর ওরা এসে পড়ল। খোঁজ—খোঁজ—নেতা মশায় গেলেন কোথা? হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তো!

ঘাড় নিচু করে পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগোপন করেছি অবশেষে দেখে ফেলল। বাসে ঢুকেছে গ্রেপ্তার করতে।

উঠে আসুন। আপনার এ জায়গা নয়—

আমি আইন দেখাই, ডেলিগেট যখন—নিশ্চয় এক্তিয়ার আছে বাসে উঠে বসবার।

কার্ড দেখান—

এর ইতিহাস বলি। সাহাই পৌঁছবার পরেই প্রতিনিধিদের একটা করে কার্ড দিয়েছিল। প্রয়োজন হলে বাসের লোককে ঐ কার্ড দেখাতে হবে; আজে-বাজে মানুষ যাতে বাসে উঠে না পড়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা-আমরা ভাই-ব্রাদার—যেন দশ শ বছরের পরিচয়। কে বা চাচ্ছে কার্ড আর দেখাতে যাচ্ছেই বা কোন জন? কার্ড যেমন দিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে টেবিলের উপর। অথবা ঘর-সাফাইয়ের সময় ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভরসা সেইখানে। তাই হুমকি দিচ্ছে, দেখান আপনার কার্ড—

কপাল গতিকে আমার কার্ডখানা সেদিন পকেটেই ছিল। নাকের সামনে বের করে ধরি। হতভম্ব—ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না। তবু কি অমে ছাড়বার পাত্র। আবার এক দুষ্ট মতলব ঠাউরে ফেলেছে।

আপনি মোটা মানুষ বেঞ্চির অনেকটা জুড়ে বসেছেন। এত জায়গা দিতে পারব না। বাস ছেড়ে আপনাকে অন্য জায়গা দেখতে হবে।

সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্র রোগা মানুষ—তাঁকে পাশে টেনে বসালাম। হল তো? দু-জনের জায়গা—আমি যদি দেড় হই, ইনি আধ। ব্যস, মিটে গেল। এবারে কি বলবে?

বলবার কিছু নেই। বেবুক হয়ে নেমে গেল হাসতে হাসতে। দলনেতার স্বতন্ত্র গাড়িটা গেল না আর সেদিন।

বাসে চড়ে জাহাজঘাটায় গেলাম। সাংহাই ডকের জগৎজোড়া নাম—কিন্তু আজকে আর কি দেখবেন! সন্ধিবন্দর ছিল—সন্ধিসূত্রে মাতব্বর জাতগুলোর অগাধ ব্যাপার-বাণিজ্যের অধিকার। বাণিজ্যের নামে মহাচীনের মেদ মজ্জা শুষে নিত অক্টোপাস। অক্টোপাস অর্থাৎ অষ্টভুজের উপমাটা খুব লাগসই। শোষক জাতিগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনভূমিতে আড্ডা গেড়েছিল—গুনতিতে তারা আটই বটে!

জাহাজঘাটায় বিদেশি বলতে রয়েছে ব্রিটিশ ব্যাপারি জাহাজ একটা।

গতিক বুঝে আর সবাই আপোসে সরে পড়েছে, ঝামেলা করেনি। করমোশায় ওত পেতে রয়েছে তাদেরই কেউ কেউ; ঐখান থেকে প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলছে। এক চীনা-জাহাজের লোকলস্কর আমাদের দেখে শশব্যস্তে নেমে এলো, হাততালি দিয়ে খুব খাতির করে জাহাজে নিয়ে তুলল।

এখান থেকে জেড-মন্দিরে। বুদ্ধমূর্তি মূল্যবান জেড পাথরে তৈরি। খুব নাম এই মন্দিরের। তাজ্জব ব্যাপার—রোলার চালিয়েছে তবে কই? স্বদেশের কয়েকটি দিকৃপাল যে তারস্বরে এই বুলি ধরেছেন! জানি, দোষ তাঁদের নয়—কলওয়ালারা পিছন থেকে স্প্রিংয়ে দম দিয়ে পুতুলের মুখ দিয়ে এই বুলি বলাচ্ছে। উঁহু, হাত দিয়ে লেখাচ্ছে। কিন্তু থাকুক এ সব। পীতাম্বর শ্রমণরা আমাদের দেশের গেরুয়াধারী সাধু মহারাজদের মতোই। ভারত থেকে আমরা, প্রভু বুদ্ধের দেশের মানুষ—ভারি খাতির! আমাদের চেয়ে আপন কে আছে বুদ্ধ-ভক্তদের কাছে?

বিস্তর জায়গা-জমি নিয়ে মন্দির। ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে যাই। সম্রাট ও যুগ-যুগের ভক্তদের আনুকূল্যে এই সমস্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। এবং ভক্তদেরও বিস্তর মূর্তি আছে। দেয়ালে রাজা লিয়াং-তির প্রকাণ্ড ছবি —যিনি প্রথম এদেশে বৌদ্ধধর্ম আনলেন। শ্রমণদের আবাস এবং ধর্মালোচনা ও পড়াশোনার জায়গা। বিচিত্র অলঙ্করণ সর্বত্র—নানাবিধ দেয়াল-চিত্র। পুরো দিন ঘুরেও দেখা হয় না, অথচ ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে নমো নমো করে সারতে হবে। সময় নেই।

আরও তাজ্জব—মন্দির মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রি-মজুরদের দল ভারা বেঁধে কাজ করছে। পিকিনেও এই দেখেছি। মন্দিরের কোন কোন অংশ ব্যবহার হত না, ভেঙেচুরে পড়ে ছিল। বোমার আঘাতেও কিছু কিছু জখম হয়েছিল। সেই সমস্ত নতুন করে গড়া হচ্ছে পুরোনো স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। নতুন-চীনের কর্তারা ধর্মকর্ম মানে না—তবে এ সমস্ত কেন? মানি আর না-ই মানি—যে সব মানুষ মানে, তাদের বিশ্বাসে বাধা দিতে যাবো কেন?

শ্রমণরা ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের, চা ইত্যাদি দিলেন। বুদ্ধ-ভূমির মানুষ—মহা মাননীয় তোমরা। অজস্র ধন্যবাদ, এত দূরে আমাদের দেখতে এসেছ। প্রভু বুদ্ধ পরম শান্তিবাদী। আঠার শ বছর আগে বৌদ্ধধর্ম এদেশে এসেছিল, সেই তখন থেকে বন্ধুত্ব তোমাদের সঙ্গে। আমাদের শ্রমণ-সম্প্রদায়ের

ভালবাসা তোমার দেশের মানুষদের জানিও। বোলো, সকলে আমরা মিলে-মিশে ভাই-ভাই শান্তিতে থাকতে চাই।

ফোটো তোলা হল সবাই একত্র হয়ে। বললেন, নতুন আমল বলে গোড়ায় খুব ভয় হয়েছিল—কিন্তু না, ভালই আছি আমরা মশায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জা এবং যাবতীয় পুরানো কীর্তি সেরেসুরে দিচ্ছে ওরা। থোক টাকা পয়সার দরকার হলেও পাওয়া যায়। কর্তাদের সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই, দোষ হল হাল আমলের ছেলেমেয়েগুলোর। ভক্তি-নিষ্ঠা কিচ্ছু নেই, মন্দিরে আসে না—কেমন যেন সব হয়ে যাচ্ছে। সেকালের বুড়ো-আধবুড়োরাই শুধু মন্দিরে আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের অন্তে কি যে হবে—

শুষ্ক মুখে করুণ কণ্ঠে আমরাও সমবেদনা জানাই, বলেন কেন—সব দেশের ঐ এক রীতি। আমাদের পুরুত-পাণ্ডারাও ব্যাকুল হচ্ছেন এই ভাবনা ভেবে। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না ছেলেমেয়েরা—কী যে হচ্ছে দিনকে দিন।

ছুটলাম এক নম্বর কটন মিলে। এটাও সরকারি কারখানা। কর্মিক চল্লিশ হাজারের বেশি—তার মধ্যে আঠাশ হাজারের মতো মেয়ে। সরকারের হাতে আসার পর কর্মিকদের বড় স্ফূর্তি বেড়ে গেছে; মাইনেও পাচ্ছে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, কর্মিকদের শরীর মজবুত রাখার জন্য মুফতে নানা রকম ব্যবস্থা। এখানে-ওখানে বোর্ড ঝুলিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান উপদেশ লিখে দিয়েছে—বাচ্চাদের নার্সারি—মেয়ে কর্মিকরা শিশুসন্তান ওখানে গছিয়ে দিয়ে কাজে লাগে; কারখানা বন্ধ হলে ছেলে কোলে ঘরে যায়। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া লেখাধুলো ও পড়াশুনোর হরেক বন্দোবস্ত। মা কাছে নেই, সমস্ত দিনের মধ্যে তা খেয়ালই থাকে না। কর্মিকরাও পড়ে—আট ঘণ্টা ডিউটি, তার পয়লা দু-ঘণ্টা লেখাপড়া। দিনের খাটনির পর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, লেখাপড়ার পাট সেজন্য আগেভাগে সেরে নেওয়ার নিয়ম। প্রায় সবাই আগে একেবারে নিরক্ষর ছিল, এখন দিব্যি খবরের কাগজ পড়ে। ছ-মাস পরে মিলের একটি মানুষও নিরক্ষর থাকবে না, এই ওরা পণ নিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সব কর্মিকের এক মাইনে। পরিচালক ও সাধারণ কর্মিকের মধ্যে মাইনের বেশি ফারাক নয়। মেয়েরা প্রসবের আগে-পিছে পুরো মাইনের বাড়তি ছুটি পায়। বিপদ-আপদ ও দুর্দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক কর্মিকদের শ্রম-বীমা আছে—প্রিমিয়াম কারখানা থেকে দিয়ে দেয়। কারখানায়

ঢুকলাম—কর্মিকরা একমনে কাজ করছে। তাদের মাঝখান দিয়ে এ-পথ ওপথ উপর-নিচে করছি আমরা। এত ভুলো উড়ছে যে বহাল তবিয়তে ঘোরাফেরাই দায়। কর্মিকদের নাক-ঢাকা, তাদের অসুবিধে নেই।

দেখাশুনোর পর বক্তৃতা—ঘরের ভিতরে নয়, প্রাঙ্গণে। তারা দত্তকে বললাম, আমাদের হয়ে দু-কথা বলবার জন্য। খাসা বললেন অল্পের ভিতর।

হোটেলে ফিরতি মুখে দেখছি, রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এখন থেকেই সভায় গিয়ে জমেছে। দল বেঁধে পতাকা উড়িয়ে মিছিল করেও যাচ্ছে। ব্যাপার তবে তো রীতিমত গুরুতর! গোটা সাংহাই শহর ভিড় জমাবে আজকের ময়দানে। নিতান্ত যারা যেতে পারবে না, তারা বাড়ি বসে শুনবে—সাংহাই রেডিও সেই ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু আমি এক মুশকিলে পড়ে গেছি। ভারতের তরফ থেকে ঐ মহতী সভায় দু-জনে দু-খানা জ্বালাময়ী ছাড়ব, এই ব্যবস্থা ছিল। শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যাচ্ছে। কাল রাতে আরও কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি এসে পড়েছেন, তাঁরাও বলবেন। সময়ের অকুলান পড়ছে অতএব। দু-জনে নয়, বলতে হবে শুধু একজনকে। সেই নামটা অবিলম্বে ঠিক করে দিন।

নাম ঠিক করতে আমার সেকেণ্ডও লাগে না। রাঘবিয়া বলবেন—আবার কে? আমি বাতিল। আমার কথায় তিনি যখন বক্তৃতা তৈরী করেছেন—তিনিই বলবেন। এ ছাড়া আর কোন রায় দিতে পারি আমি?

রমেশচন্দ্রের আপত্তি। একজনকে বলতে হলে বলবেন দলনেতাই। সর্বক্ষেত্রে এই রীতি।

রীতিটা ভাঙ্গতে চাই আমি—

রমেশচন্দ্র বললেন, মতভেদ হচ্ছে যখন, মন্ত্রণাদাতা দু-জনের মত নিয়ে দেখুন।

কিন্তু তাঁরা রমেশচন্দ্রের কথায় সায় দিলেন। ভোটে হেরে গেলাম একজন বলবে যখন, সে জন আমিই।

দুপুর দুটোয় সভা। জায়গাটা এক সময়ে ছিল কুকুর-দৌড়ের মাঠ। ব্রিটিশরা বানিয়েছিল। লড়াইয়ের মধ্যে জাপানিরা সাংহাই দখল করে নিল। তখন সৈন্যদের ঘাঁটি হয়েছিল। জাপানি হটিয়ে তারপর মার্কিনরা আড্ডা গাড়ে। ১৯৫১ অব্দে নতুন-চীনের গণতন্ত্রী সরকার বিরাট একজিবিশন খোলেন। ইদানীং আরও বিস্তর জমি ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পিপল্‌স পার্ক

হয়েছে। সাঁতারের পুকুর আছে। বড় বড় সভা-সমিতি ও জাতীয় উৎসব এইখানে হয়ে থাকে। বিশাল স্টেডিয়াম—লাখ লাখ বসতে পারে।

বক্তৃতায় উত্তম উত্তম বচন ঝেড়েছিলাম। সাংহাই-নিউজে পরদিন অনেকখানি বেরিয়েছিল, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি নে। অতএব বেঁচে গেলেন আপনারা। কামনা করুন, কোন দিনই না পাওয়া যায়। আমার পরেই বললেন সোভিয়েট দলনেতা অ্যানিসিমভ। এই সেদিন মস্কোয় দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। যে সে ব্যক্তি নন, গোর্কি ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামক এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। এতৎসত্ত্বেও এক নজরে চিনে ফেললেন। এবং বার তিনেকের দেখা-সাক্ষাতে অজস্র কথাবার্তা হল। সাংহাইয়ের সভার কথা উঠল। বললেন, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা চলেছিল যেন—আপনি সব চেয়ে বেশি হাততালি পেলেন। আমি ঘাড় নেড়ে বলি কখনো না—আপনি। এই নিয়ে হাসাহাসি চলল; আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, উপভোগ করছিলেন আমাদের কলহ।

কিন্তু থাক এ সব। বক্তৃতার কথা ভুলে গেছি—কিন্তু এটা মনে আছে, অসুবিধা লাগছিল, বিরক্ত হচ্ছিলাম। বক্তৃতা করে জুত হয় না ওদেশে। আবেগভরে আচ্ছা এক মনোরম কথা বলে ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাই। চারদিক চুপচাপ—শ্রোতাদের মধ্যে না-রাম না গঙ্গা—কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই। কুমারী তুন ইংরেজি বাক্যগুলো ধীরগতিতে চীনায় তর্জমা করে যাচ্ছে। অবশেষে—বক্তৃতা ছাড়বার মিনিট দু-তিন পরে কলরোল উঠল, প্রবল হাততালি। ততক্ষণে কিন্তু আমার উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে—পরবর্তী লাগসই কথাগুলো মুখের কছাকাছি আসতে চায় না।

দিনের পাট চুকিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি ক-জনে। বাজার করছি। সরকারি ও সাধারণ দোকান বিস্তর; কিন্তু ভিড় ঠেলে ঢোকা যায় না। মানুষের হাতে পয়সা হয়েছে, দেদার জিনিসপত্র কিনছে। কিছু কেনাকাটা করে বিরক্তি ভরে বেরিয়ে এলাম। আজকের সঙ্গী এক ছাত্র—সে-ও চলে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি, তাঁরা এটা-ওটা পছন্দ করে ঘুরছেন। আমি আর সেই ছেলেটি মোটরে বসে গল্প করছি, ছেলেটাকে, এই লিখতে লিখতে, আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। লম্বা চওড়া উজ্জ্বল চেহারা—বয়স যা বলল, সে তুলনায় দেখতে অনেক বড়। আমি লেখক—পরিচয়টা শোনা, অবধি যখনই সুবিধা পায়, কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। হবু-সাহিত্যিক। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সলজ্জে মুখ নিচু করল। কাঁচা

লেখকদের এখানেও ঠিক এই রকম দেখে থাকি। তার একটা কথা কানে বাজছে—বলতে বলতে সেই কিশোরের চোখ দুটো যেন দপদপ করে জ্বলতে লাগল। রাস্তার বিদ্যুতের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জানো বোস, কটা বছর আগে এ জায়গায় আমাদের আসতে দিত না। নোটিশ টাঙিয়ে রেখেছিল—'কুকুর আর চীনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

বললাম আমাদেরও অমনি দশা গেছে ভাই। হরেক বাধা ছিল নিজের দেশভুঁয়ে স্বচ্ছন্দে চলে-ফিরে বেড়াবার। কলকাতার অনেক হোটেলে ধুতি পরে ঢোকবার জো ছিল না।

(২০)

চব্বিশে, শুক্রবার। হ্যাংচাউ যাবো আজ। ওয়েষ্ট-লেকের উপর পাহাড়ের ছায়ায় অপরূপ শহর। ওরা বলে, মাটির ধরায় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, এই হ্যাংচাউ। সাংহাইর পালা অতএব দুপুরের আগে পুরোপুরি শেষ করব।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোর পায়ে কি-রকম একটা ব্যাথা উঠেছে। আধেক শয্যাশায়ী। বেরুবেন না। সেই ভাল, বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমবে। পায়ের গতিকে হ্যাংচাউ যদি পণ্ড হয়, মনোবেদনা রাখবার ঠাঁই হবে না। বৈদ্যনাথ হোটেলে রইলেন, আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

নার্সারি ইস্কুল। ইস্কুল বলা ঠিক হল না, গোটা নাম—নার্সারি অব চায়না ওয়েলফেয়ার ইনষ্টিট্যুট। শহরের একধারে মস্ত বড় বাগান-বাড়ি। তার মধ্যে ফালি ফালি খেলার মাঠ, সিমেণ্টে বাঁধানো নির্জলা লেক, লেকের মধ্যে নৌকা। আপাতত লেকে এক ফোঁটাও জল নেই বটে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। তখন নৌকো জলের উপরে দুলবে। এ সংসারের বাসিন্দা কেবল বাচ্চারা। লেকে তারা নৌকা বায়, সাঁতার কাটে। দুর্ঘটনার ভয় নেই, জল হাতখানেক হবে বড় জোর, ইচ্ছে করলেও ডুবে যাওয়া যায় না।

প্রধান কর্মকর্ত্রী মাদাম সান ইয়াৎ-সেন—তাঁরই চেষ্টায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমাদরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললেন। মুখে মুখে পরিচয় দিচ্ছেন। দুটো বিভাগ—তিন বছরের নিচে যাদের বয়েস, আর যারা তিনের উপর। শিশু-লালনের অভিনব বন্দোবস্ত।

শরীর গড়ে তুলছে—ওজন নিতে হয় না, যে কোন শিশুর মুখে তাকিয়ে আন্দাজ পাওয়া যায়। আর নতুন কালের পুরো মানুষ হয়ে উঠছে তারা। তার এক পরিচয়ে, সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়েছে, এইটুকু বয়স থেকেই মানুষের কাছ থেকে আশ্চর্য কায়দায় আদর কাড়তে শিখেছে—তা সে মানুষ যে কোন দেশের যেমন রং ও প্রকৃতির হোক না কেন।

একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। ওরা অভিনয় দেখাচ্ছে। বুড়ো মানুষ সেজেছে—বছর চারেকের হবে সে বাচ্চাটি—পাকা গোঁফ পরেছে, মাথায় পাকা চুল। চীনের সাবেকি ধরনের পোশাক পরে থপথপ করে সামনে এসে দাঁড়াল। ভারী গম্ভীর—বড়োমানুষের যেমনটি হতে হয়; আমরাও ঠোঁট চেপে থেকে কোনপ্রকার চপলতা হতে দিচ্ছিনে। আসে তারপর নৌ-সৈন্যরা। বয়স তিন বছরের মধ্যে। সাজপোশাক অবিকল নৌবাহিনীর। গটমট করে মার্চ করে আসছে—বাপ রে বাপ, অন্তরাত্মা ভয় কাঁপে। নেহাত আমরা অত জনে একসঙ্গে আছি, খোদ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন—তাই বসে থাকতে ভরসা পাচ্ছি, ভয়ে পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলাম না। এক এক দফা অভিনয় হয়ে যায়, আর সাজপোশাক সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে সামনে বসা আমাদের এক একজনের কোলে। তখন আমাদের আর মোটেই ভয় করে না, কোলে বসিয়ে—মুখের কথা চলবে না—চোখের দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আদর করি। কোলে বসে বড় বড় চোখ মেলে ওরা পরের দলের অভিনয় দেখে। তার পরে তড়াক করে এক সময় কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে সাজঘরে ছোটে। ওদের পালা এর পরে; নতুন এক সাজে সেজে এক্ষুনি আবার দেখা দেবে। এলো নাচের দল—পিয়ানো বাজাচ্ছে, পরীদেশের ছেলেমেয়েরা তালে তালে নাচছে বাজানার সঙ্গে। শুধু বাজনা শোনাতে একবার এলো গোটা কনসার্ট-পার্টি। ভায়োলিন ড্রাম ইত্যাদি অন্য লোকে ধরে দাঁড়িয়েছে, ওঁরা বাজাচ্ছেন। ভায়োলিন লম্বায় বাদককে ছাড়িয়ে যায়। ব্যাণ্ডমাস্টারও আছেন, বয়স সাত—সব বাদক, তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায় ছড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

বাগানে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কেউ ছুটোছুটি করছে, রোদ পিঠ করে বসে ছবি দেখছে কেউ। মিষ্টি মিষ্টি শিশুকাকলী সমস্ত বাগানবাড়ি জুড়ে। বাচ্চাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখছি। ছবি আঁকছে, নানা রঙের মাটি দিয়ে জিনিসপত্র গড়ছে, পুতুল গড়ছে! নিজেরাই এক-একটা পুতুল—ঐ পুতুল ছেলেমেয়েদের আবার পুতুল আছে আলাদা। ওদের ছেলেমেয়ে। পুতুলের

ঘর-বাড়ি, ঘুমিয়ে পড়েছে কয়েকটা পুতুল, খাচ্ছে কোন কোন পুতুল টেবিলে বসে। পুতুলের মালিকদেরও খাওয়া-শোওয়ার জায়গা দেখলাম।...আমি এক বিপদে পড়ে গেছি ইতিমধ্যে। চোখের চশমাটা খুলে একজনের চোখে একটু পরিয়ে দিয়েছি, আর যাবে কোথায়—যে যেদিকে আছে, ছুটে আসছে। ঘিরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচুতে তোলে। একটু একটু সকলকে পরিয়ে দাও ঐ চমশা। মাঠের ওধারে এক খুকিকে পেরাম্বুলেটারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে—সে-ও দেখি, তুলতুলে হাত বাড়িয়েছে। চশমা পরবে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, কদিন আছ আর তোমরা? জবাব দিলাম, এক মাসের উপর তো হয়ে গেল—যা খাতির-যত্ন, মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাবো তোমাদের দেশে। বক্তৃতার মধ্যেও ভয় দেখালাম, জাতির গোড়া থেকে তোমরা গড়তে শুরু করেছ। আমারা তো যাচ্ছিই নে—চিঠি লিখে দিয়েছি, ছেলেপুলেদেরও যাতে পত্রপাঠ এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখানে এসে থাকবে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হারাবেন কেন—তিনি পাল্টা বললেন, বেশ তো, ভালই তো! স্বাস্থ্য ভাল এখানকার, তারা আরামে থাকবে। আর একটা চিঠি লিখে দিন ছেলেপুলের মায়েরাও যাতে চলে আসেন। হাসি-স্ফূর্তিতে একসঙ্গে বেশ থাকা যাবে।

ঐটুকু বাচ্চারাও মিষ্টি রিনরিনে গলায় বিদায়-সম্ভাষণ দিচ্ছে, হিন্দি-চীনী জিন্দাবাদ! বলছে, হোপিন ওয়ানশোয়ে!

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল! কম্পাউণ্ডের ভিতর ঘাসে-ঢাকা বিস্তৃত লন—তারই পাশে আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়াল। এক দঙ্গল ছাত্র-ছাত্রী ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে গুলতানি করছিল, লাফ দিয়ে উঠে ঘিরে দাঁড়িয়ে এসে হাততালি দেয়। উ-উ-উ—আওয়াজ উঠল আকাশ থেকে। ঘাড় তুলে দেখি, তা সে আকাশই—তিনতলায় ছাতের আলসেয় ঝুঁকে পড়েছে কতকগুলো মেয়ে। মুখে মুখে আওয়াজ তুলেছে তাকাই আমরা যাতে ওদিকে। তাকিয়ে পড়তেই হাততালি। তারপরে মেয়েগুলো নিচে ছুটল। দুমদাম দুমদাম—কংক্রিটের সদ্য-তৈরী সুপ্রকাণ্ড সিঁড়ি ভেঙে না পড়ে ললনাদলের পদদাপে। একদা এমনি কাণ্ড ঘটতে পারে—এই সব ভেবেই হয়তো লোহার জুতোয় মেয়েদের পা শক্ত করে রেখেছিলেন সেকালের দূরদর্শী মুরুব্বিরা।

এসে গাড়ি-বারাণ্ডায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শেকহ্যাণ্ডের জন্য ব্যাকুল।

বিদেশি হাতগুলো কায়দার মধ্যে পেয়ে—আপনার বলব কি—হাত ঝাঁকাচ্ছে আর দস্তরমতো লম্ফ দিচ্ছে সেই তালে তালে। সে আমি কোনদিন ভুলব না। বাইশ-চব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যম্বিতা মেয়েগুলোর পা দুটো ভূমিতল থেকে অন্তত পক্ষে ইঞ্চি ছয়েক উঠে যাচ্ছে শেকহ্যাণ্ডের সময়টা। বুঝুন। একটা তুলনা মনে আসে—তেজি ঘোড়া কখনো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; এরাও ঠিক তাই। চীনের কত জিনিসই ভুলে গেছি, কিন্তু সাংহাই মেডিকেল কলেজ এবং মেয়েগুলোর এই লাফঝাঁপ মিলে মিশে এক বস্তু হয়ে রয়েছে। কলেজের প্রায় আধাআধি ছাত্র মেয়ে।

অধ্যাপক-ডাক্তাররা এবং স্বয়ং অধ্যক্ষ এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়ে নানান বিভাগ দেখাচ্ছেন। জাপানিরা সাংহাই দখল করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে দেয়, অথবা পাচার করে। তারা বিদেয় হবার পর সব আবার নতুন হয়েছে।

শুধু মাত্র কলেজি পড়াশুনো নয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের কাজ করতে হয়। এটা শিক্ষারই অঙ্গ—গ্রাজুয়েট হবার কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এক একটা দল হয়ে বেরিয়ে পড়ে ফ্যাক্টরি কয়লার খনি ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ঐ সব জায়গার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাতে-কলমে কাজ করে। স্বদেশের সঙ্গে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে এখানকার এক ডাক্তারি দল। দু-মাস অন্তর দলের লোক বদলাবদলি হয়; কতক ফিরে আসে, নতুন নতুন ছেলে-মেয়ে যায় তাদের জায়গায়।

আর এক ব্যবস্থা শুনলাম। আগের আমলের ডাক্তাররা কেবল শহরেই ভিড় করত—গ্রামের লোকের জল-পড়া ফুল-পড়ার উপর নির্ভর। এখন চারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই এরা ডাক্তারি শিখছে—পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কাকে কোথায় পাঠানো হবে সমস্ত ছকে ফেলা আছে। রোগের চিকিৎসা বড় কথা নয়। রোগ যাতে মোটে না হয়, সেই উপায় করো—তবে বলি বাহাদুর। তার জন্যে বক্তৃতা করো, বেতারে বলো, স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী খোলো এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে।

হোটেলের সামনে নানা বয়সের একপাল ছেলেমেয়ে। দরজা ও ফুটপাত জুড়ে দাঁড়িয়েছে। শতখানেক হবে গুনতিতে। কি ব্যাপার, সত্যাগ্রহ করেছ—ঢুকতে দেবে না আমাদের? অটোগ্রাফ দিলে তবে পথ ছাড়া হবে।

শ খানেক খাতা তলোয়ারের মতো উচিয়ে ধরেছে। তার মানে বিকাল অবধি নাম-সই চালিয়ে যাও অবিরাম। সে না হয় হত—কিন্তু সময় কোথা ভাই? দুটো সাতচল্লিশে হ্যাংচাউ রওনা—ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া ও বোঁচকাবুঁচকি বাঁধা আছে।

এতগুলি মানুষ আমরা—যে যাকে হাতের মাথায় পাচ্ছি, সই মেরে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু একজনের একটিমাত্র নাম নিয়ে খুশি নয়—সকলের নাম চাই প্রতিটি খাতায়। কর্তাদের এক ব্যক্তি ছুটে এসে তাড়াতুড়ি দিয়ে পথ খালি করে আমাদের হোটেলে ঢুকিয়ে নিলেন। আহা, বেচারারা দাঁড়িয়েছিল কখন আমরা ফিরে আসব সেই প্রতীক্ষায়! সময় ছিল না যে—তা হলে কি ওদের মুখ অন্ধকার হতে দিই!

আবার এক কাণ্ড। লিফট থেকে বেরিয়ে এগারো তলায় পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে একটা মেয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলছে, নমস্কার—কেমন আছেন? খাসা বাংলা জবানে। নাম উ যিং-তাং (Woo Ching-tung)। আমার ছোট্ট খাতায় তার হাতের সই দেখতে দেখতে মনের পটে ফুটে উঠল থোপা থোপা কালো চুলে-ঘেরা পদ্ম-রঙের কচি মুখখানা। চোখা নাক-চোখ—দক্ষিণ-চীনের কোন এক অঞ্চলে মেয়েটার বাড়ি। কলেজে পড়ে। বয়সে বড় কাঁচা বলে কেউ বিশেষ আমল দেয় না। উ তা বলে ঘাবড়াবার পাত্রী নয়, সর্বত্র আগ বাড়িয়ে পড়ে নিজেকে জাহির করে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে একদিন তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলে উঠল, আমিও ইণ্টারপ্রেটার—আমায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করো না কেন তোমরা? সেই মেয়েটা হাসি ছড়াতে ছড়াতে আমাদের প্রশ্ন করছে, আছেন কেমন?

তাজ্জব হয়ে মুখের দিকে তাকাই। তারপর সে একলা কেবল নয়—এ দিক থেকে ওদিক থেকে আরও পাঁচ-সাতটা বেরুল। সকলের মুখে কুশল-প্রশ্ন, কেমন আছেন? নমস্কার!

ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে গিয়েছি—এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতজনের কি হেতু এত উদ্বেগ, ভেবে পাইনে। এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বঙ্গভাষায় এবম্বিধ পরিপক্ক হয়ে উঠল কোন প্রক্রিয়ায়, তা-ও এক সমস্যার বিষয়।

বৈদ্যনাথের পায়ের সংবাদ নিতে কামরায় ঢুকলাম, তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। নিষ্কর্মা শুয়ে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা তখন বৈদ্যনাথকে গিয়ে ধরল, এক্ষুনি বাংলা শিখিয়ে দাও—

সে কি রে! এতই সোজা আমাদের ভাষা শেখা?

নাছোড়বান্দা ওরা। নেহাত পথে গোটা দুই-চার বাংলা কথা—তাকমাফিক ছেড়ে তাতে অবাক করে দেওয়া যায়। আচ্ছা, কেউ এসে দাঁড়ালে কি কায়দায় সম্ভাষণ করো তোমরা, কোন সব কথা বলো?

ঘণ্টা তিনেকের প্রাণপণ চেষ্টায় নমস্কারের প্রণালীটা রপ্ত করেছে। এবং 'কেমন আছেন'—এই কুশল-প্রশ্ন। তারই সমবেত প্রয়োগ চলছে আমাদের উপর। যা ওরা চেয়েছিল—কুশল-প্রশ্নের ঠেলায় সতি সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেছি।

(২১)

চলুন হ্যাংচাউ। ২-৪৭-এ গাড়ি। যাচ্ছি একটা দিনের তরে—কাল রাত দুপুরে আবার সাংহাই ফিরব। হাতে মাঝারি সাইজের ব্যাগ—তার মধ্যে এক দিনের মতন কাপড়চোপড় টুকিটাকি জিনিস। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দলনেতা ব্যাগ বয়ে চলেনে! আরে, আছ কে কোথায় সব? কা কস্য পরিবেদনা! খ্যাতির করে কেউ ছুটে এসে বলে না, কি সর্বনাশ! দিয়ে দিন ওটা আমার হাতে। নেতা মশায় অতএব হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় ব্যাগ তুলে ফেললেন। সকলের এই দশা।

গাড়ি ছাড়ল। নিঃসীম ধানক্ষেত আর জলাভূমি ভেদ করে যাওয়ার সেই অপরাহ্নটি বড় মনে পড়ছে। চোখ বুজলেই ছবি দেখি। চলতি ট্রেনে বসে চারিদিক দেখতে দেখতে নানান কথা লিখে রেখেছিলাম; সেইগুলো তুলে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনারাও উঠে আসুন না আমাদের সঙ্গে সেই কামরায়।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। লাইনের গা অবধি চাষ করেছে—নানান রকমের শাকসব্জি। সড়াক-সড়াক করে খাল পার হলাম কতকগুলো। গাড়ি শহরতলির স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সকলের একই রঙের পোশাক; তার মধ্যে দু-পাঁচটা অবশ্য এদিক-ওদিক আছে। প্রাচীন মানুষ ওরা; সাবেকি পোশাক পরে বেড়াচ্ছে। আপদ গাউন, তার উপরে কোর্তা, মাথায় হাতল-ওয়ালা অদ্ভুত ধরনের টুপি; মুখে বিশ-ত্রিশ গাছি লম্বা দাড়িও দেখা যায় কারো কারো। গুনতিতে অবশ্য অতি সামান্য তারা। ফ্যাক্টরি অদূরে; কর্মিকদের ঘর—ঝাড়াপোঁছা তকতক করছে। বড় বড় প্যাকিং বাক্সে উল্টোদিকের প্লাটফরম বোঝাই—মুটেরা সেই সব বাক্স বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাথার টুপি ও পোশাকে কারো কারো তালি-মারা হলেও পরিচ্ছন্ন সকলেই। প্লাটফরমে এত লোকের উঠানামা, কিন্তু নোংরা-আবর্জনা দেখি নে। আজ সকালেই এই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। একজনে বললেন, ছিমছাম থাকা এ জাতের অভ্যাস বটে—কিন্তু এত বেশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় সতর্কতা রাশিয়ার কাছ থেকে শিখেছে।

মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি, মাঝে টেবিল। এ-বেঞ্চিতে দু-জন ও-বেঞ্চিতে দু-জন বসে। কামরার মাঝ বরাবর পথ চলে গেছে—সেই পথ ধরে ট্রেনের আগাপাস্তলা যথেচ্ছ বিচরণ করুন। বিনামূল্যে যত খুশি চা সেবন করুন। গরম জল পাত্রে দিয়ে গেল, পাশে একটা করে মোড়ক। দু-রকমের মোড়ক—সবুজ আর লাল। সবুজ চা হালকা, লাল চা কড়া—ইচ্ছে করুন যে রকম অভিরুচি। মোড়ক ছিঁড়ে চায়ের পাতা ক'টি পাত্রে ঢেলে দিন—ব্যাস। লাউডস্পীকার তো আছেই। একটা লোক সঙ্গীত ধরেছে, গাড়িসুদ্ধ মানুষ তাল দিচ্ছে। সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেও কেউ কেউ।

থুংচাং নামে ছোট শহর পার হয়ে এলাম। আধেক-খাওয়া চা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে আবার নতুন করে গরম জল দিয়ে গেল। দু-পাশে দিগন্ত অবধি পাকা ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম—খড় আর খোলার ছাওয়া কুটির। খোড়ো চাল অবিকল বাংলা দেশের মতো; খোলার চাল চীনা পদ্ধতিক্রমে কিছু দুমড়ানো। খুব জল এদিকে—খাল আর ছোট ছোট নদীতে দুর্বার জলস্রোত। আর মাঠে মাঠে সতেজ সুপুষ্ট ফসল। আমাদের মেয়েরা সবেগে গান শুরু করে দিয়েছেন দোভাষি মেয়েগুলোর সঙ্গে। চীনা গান এঁরা শিখবেনই, আর ওরা শিখে নেবে হিন্দি গান।

জোলো হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। মুখে বলতে হল না—হয়তো বা একটু ভ্রূকুঁচকেছি, ছোকরা তাড়াতাড়ি এসে কাচ ফেলে জানালা বন্ধ করল। ক্ষিতীশ গুণী মানুষ—কাঁহাতক মুখ বুঁজে থাকবে—সে-ও গিয়ে পড়ছে গানের আসরে। সব চেয়ে তাজ্জব করলেন রাঘবিয়া। পার্লামেন্টের মেম্বর ভদ্রলোক—একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। ভ্রমণের এই সর্বশেষ অধ্যায়ে আবিষ্কৃত হল, উঁচুদরের গায়ক তিনি। চমৎকার গলা—আর গান অতি যত্ন করেই শিখেছেন। বিদেশি অজ্ঞদের তাক লাগিয়ে কত কত এরম-গায়ক মহাক্রম বনে গেল, আর রাঘবিয়া এত ক্ষমতা ধরেন তার ভাঁজও কাউকে জানতে দেন নি।

সন্ধ্যা নামল, অন্ধকার হয়ে আসে চারিদিক। গ্রামের ধারে তিনটে খালের মোহনা। একটা নৌকো যাচ্ছে—একজন বোঠে বেয়ে চলেছে, আর একজন

গলুয়ের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দেশের গাঙে কতদিন ঠিক এমনি ধারা দেখেছি! দাঁড়ানো লোকটার চীনা পোশাক—এই যা একটুখানি আলাদা।

এক স্টেশনে চার জন কামরায় এসে উঠল—পূর্ব-চীন ছাত্র-সমিতির (East-China Student Society)-এরা—অটোগ্রাফ চায় আমাদের। সই করবার পর হাততালি। কী এক মহৎ কাজ করে ফেললান যেন! আমাদের কত-বড় সুহৃৎ ভাবে, সব জায়গায় সকল শ্রেণীর মধ্যে তার পরিচয়।

ঘোর হয়ে এলো। চব্বিশে অক্টোবর দিনটার অবসান হল দিগ্ব্যাপ্ত ধানক্ষেত ও দূরাস্তৃত খাল-বিলে ভরা অজানা মাঠের মধ্যে। চিরকালের মতো এই মাঠে সূর্যাস্ত দেখলাম, এই মাঠের মাথায় একটা-দুটো করে তারা ফোটা দেখলাম...

হ্যাংচাউ পৌছলাম ঠিক সাড়ে-আটটায়। স্টেশন আলোয় ফেস্টুনে সাজিয়েছে। বাজনা বাজছে। বিপুল জনতা দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। পরিচিত হচ্ছি বিশিষ্টদের সঙ্গে। বাঁ-হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ, ডান হাতে পাওনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়া। এত বড় ব্যাপার—তা কেউ এগিয়ে এলো না স্যুটকেশটা নিয়ে নিতে। সেটা নামিয়ে রেখে ডান হাতের ফুল বাঁ হাতে নিয়ে তবে শেকহ্যাণ্ড করছি! দপ-দপ করে আলো জ্বালিয়ে ফোটো নিচ্ছে বারম্বার!

শহরের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লোকজন দেখতে দেখতে লেকের ধারে এসে পড়লাম। সী-হু অর্থাৎ পশ্চিম হ্রদ। কিনারা ধরে যাচ্ছি। এমনই বেশ শীত—তার উপর লেকের জোলো হাওয়ায় হাড় অবধি কনকনিয়ে উঠল। সরকারি অতিথিশালায় উঠলাম। আগে হোটেল ছিল এখানে, বাড়িটার একদিক লেকের জলের মধ্যে থেকে গেঁথে তোলা। বিস্তর বড় বড় জায়গায় থেকে এসেছি—কিন্তু এ বাড়ির যা আসবাবপত্তোর, লাখপতি-কোটিপতিরা ব্যবহার করলেই মানায় ভাল (চীনের কোটিপতির কথা বলছিনে)

সময় বেশি নেই, এক্ষুনি ব্যাঙ্কুয়েটে ডাকবে। পয়লা রোজের ব্যাঙ্কুয়েট—বুঝতে পারছেন—সে রাজসূয় কাণ্ড ভাবতে গেলে অন্তরাত্মায় কাঁপুনি ধরে যায়। তবু দু-মিনিট একটু ফাঁক কাটিয়ে লেকের বারাণ্ডায় বসে নিই। আবছা-আবছা পাহাড়, জলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ। জোনাকির মতন অগুন্তি আলো লেকের জলে ছড়ানো। নৌকোয় আলো জ্বলছে; দ্বীপের আলো স্থির দাঁড়িয়ে আছে জলের উপরে ছায়া ফেলে।

ডাকাডাকিতে খানাঘরে এলাম। দরজায় শান্তি-কমিটির প্রেসিডেন্ট—এগিয়ে এসে তিনি হাত ধরলেন। উল্লসিত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে আপনারা এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে। আসুন, দেখুন এসে—

এক আজব ফুল ফুটেছে আজ। পোর্সিলেনের রঙিন টবে অনেক যুগ ধরে চারাটা তৈরি। এ ফুল বোঁটায় ফোটে না—ফোটে গাছের পাতার উপর। ফোটে ফুলের খেয়ালখুশি মাফিক, কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। হয়ত ফুটল দশ-পনেরো বছর পরে, হয়তো বা দু-তিন বছরে। এই যেমন আজ ফুটেছে তিন বছর অন্তে। ফোটা অবস্থায় এখন অনেক কাল থাকবে। ফুলের নাম হল থাং। অথবা চোন ফুলও বলে। আকারে খুব বড়, অল্পসল্প গন্ধও আছে। কিন্তু উত্তেজনার কারণ আলাদা; বরাবর দেখা যাচ্ছে, এগুলো ফোটবার পরেই দেশের কোন পরম ক্ষণ আসে। ১৯৪১ অব্দে ফুটেছিল, মুমূর্ষু চীনের সেই তখন থেকেই বিচিত্র জীবনোল্লাস। থাং ফুল ফুটিয়ে শান্তির দূত আপনাদের এই যে শুভ পদার্পণ—আমাদের বিশ্বাস, চীনের মাটি মানুষের রক্তে ধারাস্নাত হবে না কখনো।

ফুলের ছবি তোলা হল। আবার দলের ছবি তুলল ফুল মাঝখানে রেখে। তার পরে সেই ভোজ। ভোজ সেরে রাত দুপুরে আবার বারাণ্ডায় গিয়ে বসি। কনকনে শীত, ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে—তবু যতক্ষণ পারা যায়! ওয়েস্টলেকের পাশে এমনি রাত্রি জীবনে তো আর আসবে না!

(২২)

ভোরবেলা বাড়ি থেকে লেকের কিনারে নেমে এলাম। ক্ষিতীশ আছে; আর সঙ্গী হয়েছেন পাটনার শাণ্ডিল্য মশায়। মানুষ-জন বড় কেউ ওঠেনি এখনো। ছলাত ছলাত করে ঢেউ ভাঙছে অতিথিশালা-বাড়িটার গায়ে। ঠিক সামনের লেকের পারে পাহাড়; উঁচু শিখরে গির্জার চূড়া; পাহাড়ের নিচে ঘরবাড়ি। শহর ওদিকেও আছে।

পাকা গাঁথনির সঙ্কীর্ণ একটু বাঁধ মতন—লোক চলাচলের রাস্তা নয়—তার উপর দিয়ে যাচ্ছি। শাণ্ডিল্য বলেন, করছেন কি—পড়ে যাবেন যে!

এমন লেকে ডুবে মরেও সুখ আছে। আসুন না—আসবেন?

হাত ধরে তাঁকেও টানতে চাই বাঁধের উপর। কিন্তু রাজনীতিক মানুষ, বেকার কলমবাজ নয় অধমের মতন—স্বাধীন-ভারতে বিস্তর প্রত্যাশা রাখেন,

কোন দুঃখে তিনি ডুবে মরার ঝামেলায় পড়তে যাবেন? ভদ্রজনের জন্য চওড়া পথ, সেই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি চললেন।

ছোট ছোট নৌকো কূলের কাছে কাছি দিয়ে বাঁধা। আরো খানিক পরে চড়ন্দার এসে জুটবে, নৌকো করে কাজে-অকাজে মানুষ লেক ঘুরবে। ছ'টা নৌকো ছপ-ছপ করে এসে আমাদের বাড়ির গায়ে লাগল। একটা দরজা সেখানে—অতিথিশালার এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই জল। নৌকোগুলো আমাদের জন্য; ব্রেকফাস্ট খেয়ে লেকে বেরুব। নৌকো বায় বেশির ভাগ মেয়ে। জল তুলে তারা কুলকুচো করছে, মুখ-হাত ধুচ্ছে। গল্পগুজব হচ্ছে এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। গলুয়ের লাগোয়া ছোট্ট এক-এক কাঠের বাক্স, বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে এক মনে তারা পড়তে বসল। সব ক'টি নৌকোয় এক গতিক—অত ভোরবেলা ঘাটে যেন পাঠশালা বসে গেল। মানুষজন উঠে পড়লে আর হবে না—তার আগে যেটুকু লেখাপড়া শেখা হয়ে যায়।

একটা দিন শুধু এখানে—বিস্তর ঘোরাফেরা। সকাল সকাল তাই ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। খানা'দ সেরে আমি আবার বারাণ্ডায় বসলাম। এমন জায়গায় চার-দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে কোন মূর্খশ্য মূর্খ? আমার খানা বাপু এইখানে পাঠিয়ে দাও।

ছয় নৌকোয় মিছিল করে লেকে চক্কোর দিচ্ছি। স্প্রিঙের গদিওয়ালা জুটো সোফা মুখোমুখি—দু-জন করে আরামে বসে পড়ুন। মাঝে টেবিল। এবং টেবিলের উপর, বুঝতেই পারছেন···ছবি দিয়েছি, ছবিতে দেখে নিনগে যান; আমি কিছু বলব না। কি নৌকোয় এক জন দোভাষি কিংবা স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের কেউ। ক্যামেরাও যাচ্ছে গোটা দুই-তিন।

দোভাষির মধ্যে জুটেছে দুষ্ট মেয়েটা—উ চিং-তাং। এলেম দেখাবার জন্য সাংহাই থেকে এতদূর অবধি চলে এসেছে। কাল ভোজের বক্তৃতায় আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি করতে গেল। বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা ছিল 'রক্তস্নাত'; কথাটা দশ রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, কিছুতে তার মাথায় ঢোকে না। ইংরেজি বিদ্যের আমরাও তো বিদ্যাসাগর—দেশে-ঘরে পারতপক্ষে ইংরেজি জবান ছাড়িনে গ্রামার-ভুলের আশঙ্কায়। এ রাজ্যে পরমানন্দে লক্ষ্য করছি, পিতার উপরে বহুতর পিতামহেরা আছেন। আর সবার সেরা হল ঐ—উ চিং-তাং। দেদার ইংরেজি ভুল করে, কিন্তু সে কারণে তিলেক পরিমাণ লজ্জা নেই। বরঞ্চ বীরত্বের ভাব—ইংরেজরা চীনকে বিস্তর জ্বালিয়েছে, জাতটার মাথায় মুগুর ঠুকছে যেন এই প্রণালীতে। সকলের আগে ভাগে, দেখ, পয়লা

নৌকোটায় ভাল মানুষ হয়ে উঠে বসে দিব্যি পা দোলাচ্ছে। মানুষ কাছে পেলেই, নিজে না-ই বা বুঝল, ইংরেজিতে ধড়াধ্বড় বোঝাতে লেগে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে আমি উঠে পড়েছিলাম আর কি ওর নৌকোয়, হঠাৎ দেখে পিছিয়ে এলাম। শেষ অবধি যেটায় উঠলাম, সেখানে আমি আর ক্ষিতীশ। আর দোভাষি পেলাম হ্যাংচাউরই মেয়ে—জ্ঞানে-শোনে প্রচুর, বলেও খাসা।

লেকের জল আয়না হয়ে সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে। পাহাড়, পাহাড়—পাহাড়ের ঘেরের মধ্যে এসে পড়লাম যে! এক পাশে একটুখানি ঐ বেরুবার ফাঁক দেখা যাচ্ছে। অপরূপ নিসর্গদৃশ্য, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়; হলে হবে কি—আমার হাতে খাতা-কলম। এই দুষ্ট সর্বনেশে বস্তু জীবনের সকল উপভোগ মাটি করে দিল। শনির দৃষ্টির মতো অহরহ সঙ্গে ঘোরে। শ্মশানের বহ্নিদাহের পূর্বে যে গ্রহশান্তি হবে, এমন মনে হয় না।

তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া (Shadow of the Moon in Three Pagodas)—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বিশাল নাম জায়গাটার। নামের মধ্যে কবিতা গুনগুনিয়ে ঘুরছে। চলুন চলুন—। নৌকোয় নৌকোয় পাল্লা, কে যেতে পারে আগে; একবার বা পিছনে পড়ি, আগে মেরে উঠি আবার। কুমুদিনী মেহতা এবং আরো কে কে যেন গান গেয়ে উঠলেন ওপাশের নৌকো থেকে! গানে কলহাস্যে কথাগুঞ্জনে দাঁড়ের তাড়নায় নিস্তরঙ্গ হ্রদে আলোড়ন লেগেছে।

এদিক-ওদিক থেকে কত নৌকো কাছে এসে পড়ছে। নতুন মানুষদের সঙ্গে ক্ষনিক চোখাচোখি...সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার তারা মিলিয়ে যায়। একটা পাথরের মরগার নিচে এসে পড়েছি। ফোটো তুলল সামনেটা নৌকোয় আটকে দিয়ে—হঠাৎ যাতে পালাতে না পারি। একটা রাস্তা লেক ভেদ করে সোজা গেছে ওদিককার পাহাড় অবধি। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র স্থলপদ্ম—ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। আবার ঐ ফোটো নিল—আমি লিখছি এই সময়ে। আহা—জলেও পদ্ম! পদ্মবনে এসে পড়েছি, ফুটে আছে একটা-দুটো—বেশির ভাগ ঝরে গেছে। ফুল ঝরে গিয়ে ডাঁটাগুলো শূলের মতন বেরিয়ে আছে। পদ্মপাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নৌকো এগোচ্ছে।

প্যাগোডার গায়ে ঠকাস করে নৌকো ঠেকল। একটা এখানে, একটা ঐ আর-একটা উই যে! মোট তিন। জলের উপরে হাত দুয়েক পরিমাণ গোলাকার মাথা তুলে আছে। যতটা উঁচু হয়ে জেগে আছে, কারুকার্যে ভরা। রাত্রিবেলা প্যাগোডার মাথায় আলো দেয়, জলের মধ্যে আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই থেকে মিষ্টি নামটা—তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া। স্থং—

রাজাদের আমলের বিস্তর ভাল ভাল কবিতা আছে এর উপরে। মজা দেখুন—আমাদের এই নৌকোর গায়েও কাঠ খোদাই করে এক প্রাচীন কবিতা—'যেন এক পাতা ভেসে যাচ্ছে, নৌকোটাকে এমনি দেখাচ্ছে খালের উপরে।' আ মরি, মরি! মরবার পক্ষে অতিথিশালার ঘাটের তুলনায় এটা আরও মনোরম স্থান। আজকে যেন কি হয়েছে...লেকের উপর ভাসতে ভাসতেও সেই মরার কথা।

পাশের নৌকো থেকে কুমুদিনী বললেন, মরা-মরা করছেন—ডুবে মরার উপন্যাস লিখতে চান বুঝি?

আর একজন—পেরিনই বোধ হয়—বললেন, তবে তো অন্য কারও মরার দরকার। উনি নন। উনি উপন্যাস লিখবেন সেই মানুষটির মরণ নিয়ে।

অতএব হাঁকডাক শুরু হল, মরে গিয়ে উপন্যাসে কে চির-অমর হতে চান? উঠে দাঁড়ান—

দোভাষি হেসে বলল, জল এখানে মোটে এক মিটার—অর্থাৎ চল্লিশ ইঞ্চির কম। ঝাঁপিয়ে যদি পড়েন ডুবে মরার উপায় নেই, শেওলা আর কাদা মেখে ভূত হবেন শুধু। নিরর্থক খাটনি।

অতএব নিরস্ত হওয়া গেল।

প্যাগোডার সামনাসামনি জায়গাটা দ্বীপ। লম্বায় অনেকটা। গাছপালাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লেকের জলে। একটা ঘন সবুজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দ্বীপের উপরেও জল—জলের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথরের সেতু চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘর; যেখানেই মাটি পাওয়া গেছে, মন্দিরের ঢঙে ঘর তুলেছে, বেদি বানিয়েছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের অন্য প্রান্তে এসে দেখি—বা রে, আমাদের ছয় নৌকো আগে-ভাগে পৌঁছে অপেক্ষা করছে।

কোণাকুণি পাড়ি মেরে উঠলাম এবারে এক বিলাস-প্রাসাদে। জল ছাড়া পথ নেই সে বাড়ি ঢোকবার। সমস্তটা জায়গা জুড়ে বাড়ি আর বাগান। জলের ভিতর থেকে বাড়ি গেঁথে তুলেছে। পুরানো অট্টালিকা, বনেদিয়ানার ছাপ সর্বত্র। শৌখিন আসবাবপত্র। শখ করে এমনি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে এমন সজ্জায় সাজিয়ে যাঁরা বসবাস করতেন, কি দরের মানুষ তাঁরা আন্দাজ করুন। সাত শ বছর আগেকার এক মস্ত কবি সু তুং-ফু; তাঁর কবিতায় এই অট্টালিকা পাওয়া যাচ্ছে—'চাঁদ উঠেছে, ফুরফুরে হাওয়ার পোষাক উড়ছে ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙের। এখানে যে গান, পিকিন তা মোটে ভাবতেই পারে না। শত্রু এসে পড়ল—তবু দেখ, ফুল ফুটে আছে আর নাচ চলেছে।'

সেই জায়গা। ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙও হলেন কবি, প্রচারক, মস্ত বড় বীর। শত্রুরা মেরে ফেলল, তিনি কিছুতে আত্মসমর্পণ করলেন না।

পরবর্তী কালে লিউ নামে এক জাঁদরেল সরকারি লোক গ্রীষ্মাবাস বানালেন এখানে। পঁচিশ বছর আগেও তিনি ছিলেন। এখন কবর রয়েছে। মূল কবর ঘিরে আরও এগারোটা কবর এগারো বউয়ের। মরে গিয়েও বধূকুল পরিবেষ্টনে উত্তম জমিয়ে আছেন। নতুন আমলে আইন খারাপ, একাধিক বউ নিয়ে ঘর করবার জো নেই। ঐতিহাসিক এই অট্টালিকা এখন রেলকর্মিদের বিশ্রামপুরী; মহাকবি স্যু তুং-ফু'-র নামে উৎসর্গ-করা। সেরা কর্মিক যারা—বেশী কাজ করছে আর খুব ভাল কাজ করেছে—এমনি ষাট জন করে এখানে থাকতে পায়। ভারি ইজ্জতের ব্যাপার বিশ্রামপুরীতে এসে থাকা। তাই তো দেখে এলাম, এক হাত পুরু গদির উপর কর্মিক মশায়রা গড়াচ্ছেন কিংবা উবু হয়ে বসে তাস পিটছেন। শুধু তাস নয়, নানা রকমের খেলাধুলা রেডিও গ্রামোফোন বই পত্র-পত্রিকা—মনোরঞ্জনের হরেক ব্যবস্থা। আমাদের দেখে হাততালি; এ-ঘরে ও-ঘরে উঠোনে-বাগানে যেখানে যাই, হাততালি সামনে-পিছে ঘিরে চলেছে। হাততালি আর অভিনন্দন তাড়িয়ে তুলল ফের আমাদের নৌকোয়। জোরে জোরে বাও গো মা-লক্ষীরা! জলের কিনারে কর্মিকরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও হাততালিতে প্রত্যভিনন্দন দিতে দিতে পিঠটান দিচ্ছি।

বিশ্রামপুরী থেকে এক অভিনেতা সঙ্গ নিয়েছেন। নৌকার উপর তিনি অ্যাক্টো শুরু করলেন। আমাদের এরাঁই বা কম কিসে, ধরলেন গান। উটকো মানুষ যারা এদিকে-ওদিকে যাচ্ছিল, চুম্বকের টানে এসে আমাদের নৌকোর মিছিলে ভিড়ে যায়।

লেক-বিহার শেষ করে অবশেষে ডাঙায় উঠলাম। হ্যাংচাউয়ের আর এক প্রান্ত। এক বাগিচা—বাগিচার পুকুরে রঙিন মাছের বিপুল সংগ্রহ। মাছের খেলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলো। উ চিংতাঙের সর্বত্র কড়কড়ানি—ইংরাজিতে পরিচয় দিচ্ছে, মাছগুলো 'ওয়েল অরগানাইজড'। বলতে চেয়েছিল বোধ হয় 'ওয়েল অ্যারেনজড'। আর যাবে কোথা, অট্টহাসি চতুর্দিকে। সমস্ত দিন এবং সাংহাইয়ের ফিরতি ট্রেনে গভীর রাত্রি অবধি, যে পারছে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছে।

কাল কি কাণ্ড করেছিল, সে বুঝি জানেন না? কার একটা শাড়ি চেয়ে নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সজ্জা করেছে। বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন।

দেখাচ্ছে সত্যি চমৎকার! ফুটফুটে রঙে খাসা মানিয়েছে, চোখ ফেরানো যায় না। হাঁটতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে মরে আর কি! সেই যে সেকালে লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, তারই দোসর। ট্রেনে উঠে এক নতুন ডাংপিটেমি মাথায় উদয় হল, সিগারেট খাবে। খাবে ঠিক কল্কে-টানার কায়দায়। একজন কাকে দেখেছিল ঐভাবে টানতে, সেই থেকে মাথায় ঘুরছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট খাড়া রেখে সোঁ-ও-ও ও করে দিয়েছে মোক্ষম টান। চোখ লাল হয়ে কেশে ভিরমি লেগে পড়ে যাবার দাখিল। ঝিম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তা বলে ছেড়ে দেবে—সামলে নিয়ে আবার টানছে। এবার মৃদু ভাবে, বেশ সইয়ে সইয়ে। কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। এবারে কেমন জব্দ! ঐ মেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ভুল ইংরেজীর বেকুবি এবং সেই বাবদে ক্ষেপানো শুরু হওয়ার পর থেকে।

জায়গাটা যেমন মনোরম, পুরানো কীর্তিরও তেমনি গোনাগুনতি' নেই। এখানে-সেখানে বহু সাধক ও শহীদের স্মৃতি-নিদর্শন, প্রভু বুদ্ধের নামে উৎকৃষ্ট অসংখ্য গুহা ও মন্দির। ঘণ্টা কয়েক মাত্র হাতে, এর মধ্যে কটা জায়গায় বা যাবো, আর কি-ই বা পরিচয় দেবো আপনাদের! দুই বুদ্ধ-মন্দিরের মাঝে শ্যাম গিরিচূড়া—সেই-লাই (Tse Lai)। ভারতের রাজগির থেকে উড়তে উড়তে উনিই নাকি লেকের ধারের জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঝুপ করে বসে পড়েন। 'হাস্যানন বিশাল-বুদ্ধ'—মস্ত এক পাহাড় খোদাই করে বুদ্ধ-মূর্তি বানিয়েছে, হাসিতে ঝলমল মুখখানা। এক পাহাড়ের কাছাকাছি তিন মন্দির—মন্দিরের নাম বাংলা করলে দাঁড়াচ্ছে—ঊর্ধ্ব ভারত-মন্দির, মধ্য ভারত-মন্দির আর নিম্ন ভারত-মন্দির। আর একটা মন্দিরের নাম হল—ছয় দিকের মন্দির। ছ'টা দিক হল—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, ঊর্ধ্ব-অধঃ। পৃথিবীর তাবৎ অঞ্চল থেকে ভক্তেরা বুদ্ধের উপাসনায় সমবেত হবেন, তদর্থে মন্দিরের এই নাম।

একটু এগিয়ে রাস্তার উপর বাস। অমিতাভ বুদ্ধ-মন্দিরে এবার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তর মন্দির; উঠোন এবং পূজা-অর্চনার ঘরও। অনেক; ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে ঠাসা লাইব্রেরী। শ্রমণদের বাসা এক দিকে—দিব্যি খোলামেলা। বুড়োরা দিনরাত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন। জোয়ান যুবাদের এ সব তো আছেই, তার উপরে বাড়তি কাজ—চারি পাশের জায়গা-জমিতে ফলমূল শাকসব্জি ও নানারকম ফসল ফলানো। নতুন চীনের সঙ্কল্প, এক ফোঁটাও পতিত জায়গা থাকতে দেবে না—সে কর্মে সাধুরাও কোমর বেঁধেছেন।

বহুমূর্তি—সোনার পাতে মোড়া বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দিকপালেরা। মুখ্যমন্দির অতি প্রকাণ্ড; রকমারি রঙিন চিত্রে ছাত ভরতি। ভিতরে মধ্যমূর্তির মাথা ঐ অমন উঁচু ছাত অবধি গিয়ে উঠেছে। কপালে উজ্জ্বল বৃহৎ মুক্তা, বুকে স্বস্তিক। সামনে ধূপাধার—তার সাইজও বুদ্ধমূর্তির অনুপাতে। ধূপের ছাইয়ে অত বড় পাত্র কানায় কানায় ভরতি।

পিছনে আর এক মন্দির। তিনটি বৃহৎ মূর্তি পাশাপাশি—তিন মূর্তিরই বুকে স্বস্তিক। মধ্যমূর্তির হাতে অর্ধচক্র—সেই দিকে বুদ্ধ নিবদ্ধদৃষ্টি। জগতের যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য তিনি অবলোকন করছেন এমনি ভাবে। এই মূর্তিদের ঘিরে চতুর্দিকে আরও চুরাশী মূর্তি—ভারত থেকে গিয়ে হাজির হয়েছেন নাকি। পূজার বিস্তর হাঙ্গামা, অনেক রকম জোড়জোড় করতে হয়। মন্দিরের বাইরে দোকানপাট পূজার উপকরণ বিক্রির জন্য। আমাদের তীর্থস্থানে যে রকম দেখতে পান।

একটা ছাত ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, নতুন আমলে সেটা মেরামত হয়েছে। এখনো টুকিটাকি কাজকর্ম চলেছে, দেয়াল-ছবিতে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। ষোল শ বছর আগে এ সব তৈরি। পাশের মন্দিরে স্থাপয়িতার মূর্তি। মন্দির তৈরির কাঠ আসত বহু দূর থেকে। আসত নাকি মাটির নিচে পাতালপুরীর পথে। এক কুয়োর তলায় পৌঁছে সেখান থেকে সমস্ত কাঠ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভুঁয়ের উপরে উঠে আসত। মন্দির শেষ হয়ে এলে মানা করে দেওয়া হল, আর কাঠ লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমদানি বন্ধ। কাঠ আসতে আসতে বন্ধ হয়ে গেল পাতালে; একটা কাঠ কুয়োর তলা অবধি চলে এসেছিল—সেইখানে আটকে রইল। তার পরে খেয়াল হল —আরে সর্বনাশ, সব চেয়ে বড় কড়িকাঠটাই তো লাগানো হয়নি। আর উপায় নেই। কুয়োর তলার কাঠ কোন রকমে উপরে তোলা গেল না। তখন জোড়াতালি দিয়ে মূল-কড়িকাঠ বানানো হল। চোখেও দেখলাম তাই। উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে মন্দিরের অন্য সকল কাজকর্ম—কিন্তু আসল কাঠখানায় তালি দেওয়া। সেই কুয়ো রয়েছে মন্দিরের চত্বরে—দড়িতে আলো ঝুলিয়ে তার ভিতরে নামিয়ে দিল। অন্ধকার তলদেশে দেখতে পেলাম বটে প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদোর অগ্রভাগ। একটু কারুকর্মও আছে সেই কাঠের উপর।

বাসায় ফিরে দেখি, খাওয়ার ঘণ্টাখানেক দেরি। সময়ের অপব্যয় করি কেন—সিল্কের দোকানে কিছু কেনাকাটা করা যাক। হ্যাংচাউ নানা জাতীয় শিল্প-কর্মের জায়গা; এখানকার রেশমি ব্রোকেডের ভারি নাম। সবাই চললাম; সওদা হল প্রচুর।

নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এবার, একজিবিশনে। যে জায়গায় যাচ্ছি, একজিবিশন আছেই। সেই অঞ্চলে কি কি বস্তু তৈরি হয়, কি তার দাম, কোন কোন বিষয়ের নতুন কি চেষ্টাচরিত্র চলছে—এক নজরে মালুম হবে। মানুষও ছোটে মেলা দেখবার মতো। ধরতে পারে না, কায়দা করে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের। সর্বত্র যেন শিক্ষার ফাঁদ পেতে রেখেছে; না শিখে যাবে কোথা বাছাধন!

পাটচাষের বিপুল উদ্যোগ। একটা লম্বা ঘরে কলকব্জা বসিয়ে গাঁইটবাঁধা এবং চট ও থলে তৈয়ারি দেখানো হচ্ছে। তেমনি দেখাচ্ছে সিল্কের উপর ছবি-বুনানি ও ব্রোকেড-তৈরি। কাগজের কল, সিগারেটের কল—আরও বিস্তর ভারী ভারী কলকব্জার নমুনা রেখে দিয়েছে।

একজিবিশন থেকে মিউজিয়াম। ভারি এক মজার জিনিস এখানে। পুরানো এক পাত্র—ওরা বলল, হাজার খানেক বছর বয়স—পাত্রের নিচে খোদাই করা আছে চারটে মাছ, মাছের মুখ থেকে থেকে ফোয়ারার মতন জলধারা উঠছে। পাত্রটা জলে ভরতি করে আংটা দুটো ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে শুনি, শিরশির করে আওয়াজ উঠছে জলে। তারপর সত্যি সত্যি ফোয়ারার ধারায় জল উঁচু হয়ে উঠতে লাগল পাত্রের নিচে ঠিক যেমনটা আঁকা রয়েছে। হ্যাংচাউ-মিউজিয়ামের এই আশ্চর্য বস্তুটা অতি অবশ্য দেখে আসবেন।

হ্রদের ঠিক উপরে পাহাড়ের গায়ে বাগিচা। ঝরনা আছে সেখানে, কুঞ্জবন, রং-বেরঙের মাছ, নানা রকম গাছপালা। টিলার উপরে বসবার জায়গা—বসে বসে হ্রদ-শোভা অবলোকন করুন। হ্রদটা দু-ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে—সীমন্তিনীর কালো চুলে সিঁথিপাটির মতন। আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো অগুন্তি পাহাড় ও দ্বীপের টুকরো।

মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের। সংবর্ধনা করছে, আর ঐ সঙ্গে মাও-তুচি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও'র চিরজীবন কামনা। ভাষা না বুঝি—এটা বুঝতে পারি, ওদের বুক কানায় কানায় ভরে আছে মাও'র প্রতি ভালবাসায়।

বিদায়বেলা শান্তি কমিটির এক কর্তাব্যক্তি বললেন, বসুন—ক'টি জিনিস নিয়ে যেতে হবে,—আমাদের সামান্য স্মরণ-চিহ্ন। হ্যাংচাউয়ের হাতের কাজের জুড়ি নেই। তারই একগাদা করে দিয়েছে প্রতি জনকে। হাতির দাঁতের মূর্তি, চন্দনকাঠের পাখা, চিত্রবিচিত্র ছাতা, রুমাল—আরও কত কি, এতদিন বাদে ফর্দ দিতে পারব না। বিদায়-বক্তৃতায় বললাম, ভাষার কারিগর

বটে আমি, কিন্তু অন্তর ভরে গেছে। ধন্যবাদ দেবো, সে ভাষা আজকে খুঁজে পাচ্ছি নে···

বাড়িয়ে বলা নয়, সত্যি সেই অবস্থা। স্টেশনে যাচ্ছি, পদে পদে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে এগোচ্ছি যেন। এক দঙ্গল চলল স্টেশন অবধি। সাড়ে সাতটায় হাংচাউ ছেড়ে ট্রেন রাত-দুটোয় সাংহাই এসে দাঁড়াল। ঘুমোবার অধিক সময় নেই, ন'টার আগে এরোড্রোমে হাজির হব। এখান থেকে ক্যাণ্টন। আসবার সময় ক্যাণ্টনে একটা রাত শুধু নিলাম—ফিরতি মুখে এবারে কিছু দেখে-শুনে যাবো।

(২৩)

বিদায় সাংহাই!

এরোড্রোমে প্লেনের ভিতরে বসে বসে দেখছি। তেপান্তরের মাঠ। লড়াইয়ের কাজে এত বড় করে বানিয়েছিল। এখন খানিকটা জায়গায় প্লেনের উঠানামা, বেশির ভাগ পোড়ো-জমি ও ঘাসবন হয়ে আছে। এই উঠানামার এলাকা বাড়ানো হচ্ছে, গ্যাংওয়ে লম্বা করা হচ্ছে, নতুন নতুন কোঠাবাড়ি উঠেছে এদিকে-ওদিকে। কাচের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে দেখছি।

নদী অদূরে। জল দেখতে পাইনে, কিন্তু মন্থরগতি পাল ভেসে চলেছে হাওয়ায়। গোটা দুই-তিন জাহাজের মাস্তুল স্থির দাঁড়িয়ে। কাশবন মাঠের প্রান্তে, হু-হু করে হাওয়া দিয়েছে—পলিতকেশ বুড়োর মতন কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। নাম-না-জানা গুল্মে অজস্র হলদে ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে চারিদিক। রুমাল নাড়ছে হাস্যমুখ মেয়েরা ওধারে বারাণ্ডার উপর ভিড় করে। বারাণ্ডার নিচে পায়োনিয়র ছেলেমেয়ের দল। মুরুব্বিরা প্লেনে উঠবার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে এসেছেন। রুমাল আর হাত নাড়ছে সকলে। আমরা যেমন করে কাউকে কাছে ডাকি, ওরা ঠিক তেমনি ভাবে হাত নেড়ে বিদায় দেয়। এঞ্জিন গর্জন করছে, বিদায়, বিদায়!

সুপ্রাচীন এক প্যাগোডার চূড়া, নামটা জেনে নিয়েছি—লং-ফা প্যাগোডা। আর ফ্যাক্টরির অসংখ্য চোঙা ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশে। আমার পাশে বসে এক ভদ্রলোক শহর থেকে এরোড্রোম অবধি এলেন। অল্প-সল্প ইংরেজি জানেন, মনের দোর মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি একেবারে। দু-জনেই পরস্পরকে উত্তম রূপ বুঝি, এটা তিনি ধরে নিয়েছেন; অপার দুঃখ-রাত্রি কাটিয়ে উভয় জাতিরই সূর্যালোকের পথে যাত্রা। তাঁকেও ঐ দেখতে পাচ্ছি

—দলের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ছুটছে প্লেন গ্যাংওয়ের উপর, গর্জন ভয়ানক রকম বেড়েছে। উঠে পড়লাম আকাশে। খাল-নদী, বিশাল শহর, শহরের ঘরবাড়ি একদিকে হেলে পড়েছে। শহর পিছনে ফেলে সাঁ করে বেরিয়ে এলাম।

সকালবেলা আজ কিংকং হোটেলের জানালা দিয়ে প্রসন্ন রোদ মেজেয় পড়েছিল। পেরিন লাফিয়ে উঠলেন, দেখ, দেখ—কি আশ্চর্য রোদ্দুর! সোনা কুড়িয়ে পেলে মানুষ অমন করে না। চলে যাবার ক্ষণে সাংহাইয়ের সূর্য প্রথম আমাদের মুখ দেখালেন; রোদ পোহাতে পোহাতে এসে প্লেনের খোপে ঢুকেছি। কিন্তু আকাশে উঠেই কোথায় সব রোদ মিলিয়ে গেল! মেঘ, মেঘ —মেঘের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছি, মেঘ ছাড়া কিছু নেই কোন দিকে। জানলার কাচ কুয়াশায় আচ্ছন্ন। জানলার এধারেও দেখি জল ফুটেছে, ফোঁটা হয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশের মানে—আপনাদের কাছে ফিরে আসবার জন্য, মেঘ ভেদ করে তীরবেগে ছুটনি। আচ্ছা, টুপ করে যদি ভূঁয়ে পড়ত প্লেন, এমন তো আকচার হচ্ছে—কাগজে এক ছত্র নামটা হয়তো দেখতে পেতেন, কিন্তু আমাদের মনের আকুতি একটুও পৌঁছত কি আপনাদের মনে?

২-৩৫-এ ক্যাণ্টন পৌঁছবার কথা। ছুটো নাগাদ পাইলটের ঘর থেকে কবলু জবাব এলো—দেরী হবে, পৌঁছচ্ছি ৩-১৮ মিনিটে। বিষম এক মুখোড় বাতাসের সামনে পড়েছিলাম, বিস্তর হুটোপুটির পর পবনদেব পরাস্ত হয়েছেন। বাইরে এত কাণ্ড, ভিতরের আমরা কিছু জানিনে—আঙুর-আপেল মুখে ঠাসছি আর হাতে কলম চালাচ্ছি।

আবার উজ্জ্বল রোদে এসে পড়েছি, রোদের সমুদ্রে ঢেউ তুলে তুলে যেন উড়ছি। ভূমিতল স্পষ্ট হয়ে এলো। পাহাড়ের উপরে এখন—অগণ্য শিখর, ঝিকমিকে ঝরনাধারা। আরে, এসে গেলাম যে ক্যাণ্টনে! সেই আর একদিন এইখানে আমায় একলা ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন, আজকে দলনেতা হয়ে সকলকে বহাল তবিয়তে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। এরই নাম মহৎ প্রতিশোধ!

নতুন জায়গায় পা ফেললে যেমন হয়ে আসছে—কচি কচি হাতের কুসুম-গুচ্ছ, আর শত শত হাতের হাততালি। এবং নানান দিক থেকে ক্যামেরার ঝিলিক হানা। হোটেলে ঢুকবার মুখে পুনরায় এক দফা অভ্যর্থনা।

সেই আই-চুন হোটেল—পাশে বয়ে চলেছে আনীল-সলিলা তরঙ্গময়ী পার্ল।

স্নান এবং বিশ্রামাদি হল। বাহাত্তর শহীদের সমাধিভূমি—যাবার সময় মোটে একটা রাত্রি ছিলাম, কোনখানে যাওয়া হয়নি। কুমুদিনী মেহতা, পেরিন এবং আরও কে কে যেন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এলেন। হঁ্যা, সকলের আগে ঐ শহীদস্থানে ফুল দিয়ে তাঁদের প্রণাম করব। মেয়েরা বেরিয়ে পড়লেন; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তৈরি করিয়ে আনলেন সাদাফুলের দেড়মানুষ সমান স্তবক। পরম যত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সেই বস্তু গাড়িতে তুলে নিয়ে দলসুদ্ধ আমরা চললাম।

জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'হলদে ফুলের পাহাড়'। তাই বটে! মর্মরসৌধের চতুর্দিকে লক্ষ-কোটি তারার মধ্যে হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। ২৯শে মার্চ, ১৯১১—সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের গর্বনরের বাড়ি হানা দিল একশ সত্তর জন তরুণ বিপ্লবী। তার মধ্যে বাহাত্তর জনকে পাওয়া গেল—বাহাত্তরটি স্তূপীকৃত শবদেহ। বাকি তারা কোথায় গেল, কেউ জানে না। সেই বাহাত্তর বীরকে বয়ে নিয়ে এসে এইখানে মাটি দেওয়া হল। স্মৃতিসৌধ অনেক পরে হয়েছে ১৯১৯ অব্দে—বেশির ভাগ খরচ দিয়েছিলেন প্রবাসী চীনারা।

সেই বিশাল পুষ্পোপহার-বহনের গৌরব আমাকেই দিলেন সকলে; ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে আমি পুষ্পার্ঘ্য দিলাম। কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দিবারাত্রি এখানে পাহারা দেয়। আমাদের দেখে এদিক-ওদিক থেকে বাড়তি সৈন্য অনেক এসে জুটল। সাধারণ মানুষও বিস্তর দাঁড়িয়ে গেছে। দোভাষি বললেন, বলুন আপনি কিছু; ওরা শুনতে চাচ্ছে। পেরিনও বলছেন, বলুন; বলুন। কিন্তু কী এদের সম্বন্ধে এখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলব! এত বয়স অবধি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বেঁচে রয়েছি—তাতে যেন আজকে ছোট হয়ে যাচ্ছি এদের সামনে, লজ্জা লাগছে। এরাও তো বেঁচে থাকতে পারত! কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের শতেক লাঞ্ছনা হজম করে বাঁচতে তারা চাইল না। আমি যে জানতাম এমনি কত জনকে, কত তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি! কথার বেসাতি করে তো জীবন কাটল,—কিন্তু এমন কথা কোথায় আজ পাই, যা দিয়ে এদের স্তুতি-গান গাঁথা যায়।

না, বক্তৃতা নয়; শুধু গান। এই দিনান্তগুলো সুরে সুরে ক্ষিতীশ এদের বন্দনা করবে। সে কোন নতুন গান নয়—ঠিক এই গানই আরও কতবার

শুনেছি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে গানের কথা আজকে পাগল করে তুলল। আর বাংলায় গান যখন, আমারই বুঝিয়ে দেবার দায়। কিন্তু এ কি করছি—গানের মধ্যে নেই, তেমনি কত কি বলে চলেছি আকুল কণ্ঠে। বক্তৃতা বলবেন না একে, আমার মর্মছেঁড়া অশ্রুজল। বন্ধু, চোখে না-ই দেখে থাকি, চিনি আমি তোমাদের সকলকে। ভাল করে চিনি। আমাদেরও কত ছেলেমেয়ে গেছে এমনি! তারা আর তোমরা এক জাতের। এক তোমাদের ধর্ম, একটি মন। মানুষের মুক্তির জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, যে দেশ এবং যে কালেরই হোন—তাঁদের নামে কুসুমাঞ্জলি। কুসুম দিলাম ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রীতিলতা, ভগৎসিংদেরও। আমার স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আজ এই সন্ধ্যালোকে সকলকে আমি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি…

শহরের ভিতর ঘোরাঘুরি করতে করতে এলাম—কৃষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে। চাষীদের একেবারে আপন জায়গা। ১৯২৬ অব্দে মাও সে-তুং শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক-আন্দোলনে কৃষকদের গড়ে তোলবার জন্য। তিনিই ছিলেন পরিচালক। আজকের প্রধানমন্ত্রী চাউ এন-লাই ছিলেন এক মাস্টার এখানকার; কো মো-জো এক কর্মী। গাছের তলায় একটুখানি চাতাল মতন—এইখানেই গভীর রাত্রি অবধি বসে মাও চাষীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। রাত্রি বেলা কেন্দ্রের কাজকর্ম এখন বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরবাড়িগুলোই শুধু দেখা হল।

হোটেলে ফিরতে না ফিরতে ব্যাঙ্কুয়েটে গিয়ে বসল। দলনেতার বসতে হয় হলের মাঝখানটায় সকলের বড় টেবিলে সর্বদৃষ্টির সামনে। একটেরে বসে আত্মরক্ষা করব, সে জো নেই। টেবিলের উপরে থরে থরে রাক্ষুসে আয়োজন। এ-ও কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা—খাওয়া বলবেন না একে, নিতান্তই চাখা। চাখার কাজ শেষ হয়ে গেলে তখনই আসল খাবার পদের পর পদ আসতে থাকবে। চীনে আমাদের দিন শেষ হয়ে এলো, আয়োজন তাই হিমালয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। যাকে বলে শেষ মার।

ডক্টর কিচলু ভোরবেলা ট্রেনে এসে পড়ছেন। এলে তো বেঁচে যাই। আমার এই আবুহোসেনি বাদশাহির ভার-বোঝা নামিয়ে বাঁচি। একটা দিন আগে যদি আসতেন, এই বিষম ভোজ থেকেও রক্ষা পেয়ে যেতাম। শীতের জায়গা, তবু—হলপ করে বলছি—আলোয়ানের নিচে সর্বদেহ ঘেমে উঠেছে। মুখ শুকনো করে বলি, শরীর ভাল লাগছে না। রাত্তিরবেলাটা নিরম্বু উপোস করবো ভেবেছিলাম—

মুরুব্বিরা শশব্যস্তে শুধান, অ্যাঁ, সে কি? অসুখ-বিসুখ করল বুঝি? কি রকমটা হচ্ছে বলুন তো?

সর্বনাশ, এ কোন দিকে চলেছি! চাটু থেকে উনুনের আগুনে। সেই পিকিনের মতন ডাক্তার-নার্সের জিম্মায় যদি ঠেলে দেয়! মিনিটে মিনিটে ওষুধ খাওয়াতে লেগে যায় শিয়রে নার্স মোতায়েন রেখে! সুরটা যেন সেই ধরনের। তার চেয়ে চোখ-কান বুজে যতদূর পারি চালিয়ে যাই। এখন তো গলাধঃকরণ করে নিই, তার পরে কায়ক্লেশে ঘর অবধি গিয়ে যে কাণ্ড হবার হোক গে।

কি হয়েছে আপনার?

এক গাল হেসে তাড়াতাড়ি সামলে নিই, হবে আবার কি। বড্ড বেশি খাওয়া হচ্ছে, এ বেলাটা একটু বিশ্রাম নেবার তালে ছিলাম। যাকগে— কম কম খাবো। এই আরজি জানিয়ে রাখছি আগে-ভাগে।

ওঁরা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। ষোল আনা যে বিশ্বাস করেছেন, তা নয়। কিন্তু আমার অত উৎসাহের উপর কি আর বলবেন। নিরামিষ ব্যাঙের ছাতা গোটা দুই-তিন একসঙ্গে মুখে পুরে কপ-কপ করে চিবিয়ে অটুট স্বাস্থ্যের প্রমাণ দিয়ে দিই।

এর পরে সর্বোত্তম তরকারিটা এলো—শুওরের পাখনার ডালনা। সাবু খেয়ে থাকেন তো জ্বরজারি হলে? রং অবিকল অমনি, এবং বস্তুটা ওর চেয়েও আঠা-আঠা।

কম করে দেবেন।

শান্তি-কমিটির সভাপতি আমার পাশে, বড় পাত্র থেকে তিনি চামচে কেটে কেটে দিচ্ছেন। বিগলিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, মুখে ঠেকিয়েই দেখুন না। তার পরে বলবেন।

এক নাগাড়ে তারিপ শুনে শুনে দুর্বুদ্ধির বশে প্রায় পুরো চামচে গলায় ঢেলে দিয়েছি। আর যাবে কোথায়! যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই বুঝি এই ভোজের টেবিলে ঘটে যায়। অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথম-খাওয়া অন্নগ্রাস অবধি ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

অসহায় ভাবটা মুখে চোখে প্রকট হয়ে থাকবে। চতুর মেয়ে কুমুদিনী হলের নির্বিঘ্ন দূরপ্রান্ত থেকে খুক-খুক করে চাপা হাসি হাসলেন। হেন অবস্থায় ধৈর্য থাকে না। ঠেলেঠুলে এই বিপাকে ফেলে দিয়ে এখন আপনারা মজা দেখছেন। এই বটে কলির ধর্ম।

আজকে আমার শেষ-সম্ভাষণ চীনদেশে এই চীনা বন্ধুদের মধ্যে। কিচলু এসে পড়লে কে ঝামেলায় যাচ্ছে। আছিও মোটে আর কালকের দিনটা। বললাম সেই কথাই—এক মাসের বেশি হয়ে গেল, এই ক্যাণ্টনে এমনি এক রাত্রে ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছিলাম। সেদিন ছিলাম নিতান্ত পরদেশী। তার পরে আত্মীয় করে নিলেন আপনারা। আজকে আমি পুরোপুরি আপনাদের একজন। আমাদের দলের সকলেই তাই। চলে যাবো, তাই দেখুন চোখে জল ভরে আসছে, কথা ফুটছে না মুখে—

বড্ড ভারি হয়ে যাচ্ছে, তাই কিঞ্চিৎ হাসিয়ে রসিয়ে দিই।—যেতে মন চায় না আপনাদের ছেড়ে। ভেবেছিলাম যাবো না আর—পাকাপাকি থেকে যাবো। তাই কি হতে দেবেন? এমন খাওয়াচ্ছেন যে পাকস্থলী বিদ্রোহ করে বসেছে। সেই জন্যেই তো থাকা চলল না।

প্রায় পেশাদার বক্তা হয়ে উঠেছি, বিদেশ-বিভুঁয়ে এদের বোকাসোকা পেয়ে মজাসে আগডুম-বাগডুম চালাচ্ছি। তা বলে কামারের বাড়ি সূচ চুরি চলে না। আপনাদের কাছে হলে—ওরে বাবা, হাততালি দিতেন না, একখানা হাত বক্তার গলদেশে স্থাপন করতেন, আর এক হাতে পথ দেখাতেন। ক্ষিতীশ ভারি খুশি। বলে, আচ্ছা জমিয়েছেন দাদা! এবং আরো খুশি ভোজ অন্তে যখন এক গাদা উপহারসামগ্রী এসে পড়ল। ক্যাণ্টন ভালবাসে তোমাদের—ভাগ্যবশে এই যাদের কাছাকাছি পেয়েছি, তাদেরই শুধু নয়, ভারতের সকল নরনারীকে। এবং আজ বলে না, হাজার হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা। ছয়-বটগাছের প্যাগোডা দেখে এসো কাল—ঐ এক জায়গা থেকেই পুরানো সম্পর্কটা ঠাহর হবে।

(২৪)

একদা ছিল সাত বটগাছ। একটা মরে গিয়ে এখন ছটা আছে। ডালপালা মেলানো ছায়াময়—দূর থেকেই নজরে আসছে। শ্রমণরা রাস্তা অবধি ছুটে এলেন, আসুন—আসুন —এ তো আপনাদেরই জায়গা। এই যত বটগাছ—সমস্ত ভারত থেকে এনে পোঁতা। পবিত্র জ্ঞানে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আমরা পালন করে আসছি।

এক হাজার শ্রমণের বসতি এই প্যাগোডায়। ৫৩৫ থেকে ৫৪৫—দশ বছর লেগেছিল প্যাগোডা ও ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সতেরো তলা স্তম্ভ; বাইরে থেকে দেখবেন কিন্তু সাত তলা। স্তম্ভের খানিকটা অবধি উঠে নেমে এলাম হাঁপাতে হাঁপাতে। চূড়ায় ওঠা হল না।

সেই পুরাকালে কাঞ্চিয়ান (আসল নামটা কি, পণ্ডিতেরা বলুন)। কাঞ্চন? অথবা কাঞ্চীপুরবাসী? ওদের মুখে মুখে কাঞ্চিয়ান নাম দাঁড়িয়ে গেছে। অবোধ্য হওয়ায় বানান করতে বললাম দোভাষিকে। সে ইংরেজী বানান দিল —Kunchin নামে এক ভারতীয় এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। নানান তরফের শত্রুতা, প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল তাঁর। শেষটা তিনি নারী-বেশ নিলেন; নারীর সজ্জায় থাকতেন অহোরাত্রি, ঐ বেশে ধর্মকথা বলতেন। সেই নারীরূপের প্রতিমূর্তি রয়েছে এখানে। পুরুষমূর্তিও আছে নাকি অন্যত্র। আর আছে ওয়াং-নাং রাজার তাম্রমূর্তি—যাঁর আমল থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার।

প্যাগোডায় আসবার আগে সকালবেলা আজ একা-একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিঞ্চিৎ বকুনি খেলাম সেই অপরাধে।— অমন ধারা দুঃসাহস কদাপি দেখাতে যাবেন না, দোহাই,! হেসে হেসে তখন আমি পিকিনের গল্প করি। মরিশন স্ট্রিটের বাজার চুঁড়ে বেড়ানো, ভাষা না জেনেও পথের জনতার সঙ্গে দহরম-মহরম; চন্দ্রালোকে তিয়েন-আন মেনের সামনে সেই আহা-মরি নৃত্য; ওঁরা বলেন, পিকিনে যত্র-তত্র ঘোরাঘুরি করুন গে, সাংহাইতেও আপত্তি করব না; কিন্তু এখানে—জানেন, গেল-বছর ভারতের বন্ধুরা ক্যাণ্টনে পা দিলেন, আর সেই রাতে বিপদের সাইরেন বাজল। আজকে অবিশ্যি ক্যাণ্টন অবধি এসে চিয়াং কাইশেকের বোমা মারবার তাগত নেই। তাহলেও চেলা-চামুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাদের কোন রকম শারীরিক হানি ঘটানো বিচিত্র নয় চীন- ভারতের বন্ধুত্বে চিড খাওয়াবার মতলবে। তাই এত সামাল, সামাল!

যাকগে। কিছু তো হয়নি—আছি বহাল-তবিয়তে, তবে আর কথা কি! প্যাগোডা দেখা শেষ করে শিশলস স্টেডিয়ামের দোর-গোড়ায় মোটরগুলো এসে থামল। এখনো কাজ চলছে, লোক খাটছে। আগে ভিক্ষা করে খেতো এই সব লোক—এক ক্যাণ্টনেই ছিল তিন হাজার ভিক্ষুক। বৃত্তিটা বে-আইনি হয়ে যাবার পর সক্ষম সমর্থগুলোকে বেছে নিয়ে এমনি নানান কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ অব্দে পাঁচ মাসের ভিতর তড়িঘড়ি এই স্টেডিয়াম বানিয়ে ১ লা অক্টোবরের জাতীয় উৎসব করল। ত্রিশ হাজার বসবার জায়গা, আরও ষাট হাজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তিন দিকে পাহাড়—এটাও ছিল পাহাড় মতো জায়গা। মাঝের মাটি-পাথর খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমান চৌরস

করেছে। চতুর্দিকের উঁচু অংশে কেটে কোর্ট ধাপ বানানো; সিমেণ্টের পলস্তারা ধাপের উপর। ঐ হল গ্যালারি। চালাকি করে কত সস্তায় কিস্তিমাত করেছে দেখুন।

পাশে পাঁচতলা বাড়ি—পিপলস মিউজিয়াম। ঐ যে বললাম—যেখানে পা ফেলবেন, মিউজিয়াম-একজিবিশন আছেই। সোভিয়েট দেশেও এমনি দেখে এলাম। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা! না শিখে যাবেন কোথা? যত রকমে পারো মানুষের চোখ-কান ফুটিয়ে দাও, তারাই তারপরে দুনিয়ার হালচাল বুঝে নেবে। ঘুরে ঘুরে দেখছি। চারুকলা, ইতিহাস ও প্রত্নত্বের নানা সামগ্রী। বিস্তর ছবি—১৯১১ থেকে ১৯৪৯, বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে এঁকে দিয়েছে। একটা অতি-পুরানো জিনিস —হাতির দাঁতের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা! জোরালো ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাসেও সে-লেখা পড়া মুশকিল।

সন্তরণাগার। আগে পোড়ো-জমি ছিল, হাল-আমলে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছে। ক্যাণ্টনে এলে এটা দেখতেই হবে। এখনো কাজ চলছে। বাইরের দিকে লম্বা খাল কাটা হচ্ছে, নৌকো বাইবে দাঁড় টেনে টেনে। সে খালের উপরে পুল হচ্ছে আবার। দেখুন, দেখুন, রাক্ষুসে ব্যাং একটা পাথরে তৈরি; তিনটে বিশাল সারস তিন দিকে। এই চার মুখে জলের ফোয়ারা। সাঁতারের সব রকম বন্দোবস্ত। উজ্জ্বল আলো। স্টেডিয়াম বানিয়েছে—সেখানে বসে লোকজন সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখে। অমনি যে টুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হবে না। বাথরুম আছে, সাবান ঘষে আগে ভাল করে নেয়ে-ধুয়ে নেবেন, পরিচ্ছন্ন সাঁতারের পোষাক পরবেন, তবে নামতে দেবে।

আর চব্বিশ ঘণ্টাও নেই চীন-ভূমিতে। চীন দেখা সাজ হয়ে এলো। স্পেশ্যাল ট্রেনে আমাদের সীমান্ত পৌঁছে দেবে। রাত বারোটায় যাত্রা। সান-ইয়াৎ-সেনের স্মৃতি-ভবন তবে তো এই বেলার মধ্যেই সেরে নিতে হয়।

১৯২১-৩১ অব্দে তৈরি। পাহাড়ের নিচে অষ্টকোণ বিরাট সৌধ—পুরো-পুরি চীনা পদ্ধতির। লাল দেয়াল, কাঠের কাজ, ছাতটা নীল টালির। হলে সাড়ে পাঁচ হাজার চেয়ার, দেয়াল ভরা খাসা ফ্রেস্কো ছবি। একটা থাম নেই এত বড় হলের ভিতর। স্টেজের অংশটা ভেঙে ১৯৫০ অব্দে নতুন ভাবে তৈরি। ডাক্তার সনের বিশাল মূর্তি প্রান্তদেশে। এই অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন হবে এখানে—তাই মাও-র ছবি দিয়েছে, পাঁচ তারার পতাকা আর রকমারি রঙিন আলোর সজ্জা করেছে।

পিছনে পাহাড়ের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ। জাপানিরা বোমা মেরে জখম করেছিল, মেরামত হয়ে গেছে। আর হলের প্রবেশ মুখে সান ইয়াৎ-সেনের নিজের হাতের অক্ষরে খোদাই করা আছে—তিয়েন সিয়া উই কুং—আকাশের নিচে যত মানুষ আছে সকলে এক।

সেই কতদিন আগে ক্যান্টন-স্টেশনে ফুটফুটে এক পায়োনিয়র মেয়ে নতুন আগন্তুকের হাত ধরে পথ দেখিয়ে এনেছিল। ওয়াই মিঁঞা—নামটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলাম, ওয়াই মিঁঞা। আজকে শেষ দিন সেই ক্যান্টনে।

ওঁরা বলেন, পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে একবার যাওয়া তো উচিত!

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সব শহরে এমনতরো ঘাঁটি আছে, একটাও দেখার ফুরসত হয়নি। তা ভালই হল। যাচ্ছি ওয়াই মিঁঞাদের ওখানে। কি বিপদেই ফেলেছিল মেয়েটা! হাত কিছুতে ছাড়বে না—মোটরে উঠে দরজা দিতে পারিনে। এক হাতে ফুলের তোড়া, আর এক হাত তার ফুলের হাত দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ছাড়িয়ে নেওয়া সোজা! আজকে যদি—কপালের কথা কি বলা যায়?—ওয়াই মিঁঞাকে আজকে যদি পেয়ে যাই ওখানে! চিনতে কি পারব আলো-ঝলমল স্টেশনের বিপুল জনতার মধ্যে রূপের উন্মাদের দীপ্তির মাঝখানে মিনিট কয়েকের দেখা আমার ক্ষুদ্র বান্ধবীকে? সকলের থেকে আলাদা করে নিতে পারব?

পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে ওয়াই-মিঁঞাকে পেলাম না, কিন্তু তাতে কি! আর অন্তত পঞ্চাশটা রয়েছে অবিকল সেই মেয়ে। বিদেশি মানুষ কালো চেহারা—তা বলে এতটুকু ভড়কে যায় না কোনটি। যেন সকালে বিকালে দেখা হচ্ছে, হামেশাই এসে গল্পগুজব করি—আজকেও এসেছি। অচেনা নেই, এক নজর একটুখানি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখাও নয়! গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষের পলকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল আমাদের। গুনতিতে আমরা কম, তারা অনেক বেশি। তাই তিনটি চারটি এজমালি সম্পত্তি হয়ে পড়লাম আমরা প্রতি জন। ভাগের মা গঙ্গা পান না, কিন্তু ভাগ-করা এই বুড়ো বুড়ো ছেলে গুলোকে হুল্লোড় করে এ গঙ্গায় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাদের পায়োনিয়রদের ঐশ্বর্যের অবধি নেই—এবাড়ি ওবাড়ি এঘরে-ওঘরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ধরল ডান-হাত তো ও এসে ধরে বাঁ-হাত। এ সোনালি মাছ দেখাবে তো ও টেনে নিয়ে দেখাবে লাল পাতাবাহার।

লান ফুল-লিন নামে অতি ছোট্ট মেয়ে—আমি পড়েছি তার দখলে। আরও

তিন-চারটে ভাগীদার আছে, কিন্তু সানের দোর্দণ্ড প্রতাপে তারা আমল পাচ্ছে না। লোক যেমন ছাতা কি ঘটি-বাটি কিংবা গামছাখানা খুশি মতন হাতে নিয়ে ঘোরে, আমাকেও তেমনি এদিক-ওদিক যথা ইচ্ছা হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে—তারও ভাগের আমি—বোধ করি, একেবারে বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলেই আস্তে আস্তে আমার পিছন ঘেঁসে দাঁড়াল; সান অমনি মিলিটারি কায়দায় গটমট করে এল, ছেলেটাও আমার মাঝখানে গুঁজে দিল নিজেকে। গতিক বুঝে বেচারি আপোসে আরও খানিক পিছিয়ে গেল, ও-মেয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের তাগত নেই। সান ঘড়ঘড় করে একগাদা কি বলে গেল আমার মুখের দিকে চেয়ে। মূর্খ মানুষ—আমি কি বুঝব তার কথা, বোকার মতন ক্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি! কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি? যা মেজাজ এই দেখলাম—বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। বিপন্ন হয়ে দোভাষিকে বললাম, শিগগির মানে বলে দাও, ভুবন রসাতলে গেল—দেখছ না মুখভাব? মহাপ্রলয় নির্ঘাত এসে পড়ল, আর রক্ষে নেই। কি বলছে বুঝিয়ে দাও শিগগির।

দোভাষির সঙ্গে গোনা-গুনতি এই তো কয়েকটা কথা—তাতেও চটে গেছে। নিয়ে বের করল সেখান থেকে, দোভাষির কাছ থেকে নিরাপদ দূরে নিয়ে গেল। বটেই তো! সে যখন নেত্রী, যত কিছু বলাকওয়া একমাত্র তারই সঙ্গে। তার আদেশ বিনা অন্য লোকের কাছে মুখ খুললে সহ্য করবে কেন? মিউজিয়ামে নিয়ে হাজির করল। মিউজিয়াম তো কতই দেখলেন, এ-মিউজিয়াম একেবারে আলাদা। ছেলেপুলেদের নিজ হাতে বানানো। আমরা বড়রা কি পারি ওদের সঙ্গে? বলুন। দলের পর দল বড় হয়ে বেরিয়ে যায়, নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসে—মিউজিয়ামের সঞ্চয় বেড়ে চলেছে সকলের যত্নে ও ভালবাসায়। এ-আলমারির সামনে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে, ও-টেবিলের কাছে ঝুঁকে দেখাচ্ছে। বকবক করে তাবৎ বস্তুর পরিচয় দিচ্ছে, অনুমান করি।

দোভাষি দূর থেকে হাসি-হাসি চোখে অবস্থা তাকিয়ে দেখে,—কিন্তু তার ক্ষমতা কি আমাদের এলাকার মধ্যে এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেয়! সানের মা-বাবা যখন অক্লেশে তার কথা বোঝে, ভাইবোন ও অন্য সব লোক বুঝতে পারে, আমাদের বেলা দোভাষির বোঝাতে হবে কি জন্যে? তবু এতটুকু সন্দেহ হয়ে থাকবে—মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সায় নিচ্ছে, বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধে হচ্ছে কি না। আরে, 'না' বলবার কি তাগত আছে, পরোমোৎসাহে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছি—অর্থাৎ, হে কন্যা মনসাঠাকরুন, তোমার কমাদাঁড়ি-হীন তাবৎ চীনা বকবকানি জলের মতন বুঝে যাচ্ছি; ফোঁস কোরো না, দোহাই! শ্রোতার বুদ্ধিমত্তায় পরম খুশি হয়ে সান কথার তোড় আরও বাড়িয়ে দেয়।

দেয়ালে-দেয়ালে ছবি। ইজেলের উপর ছবি—আধেক-আঁকা, পুরো-আঁকা সব ছবির গাদা বের করে মেলে ধরে দেখাচ্ছে। ছবি আঁকে—তার বাবদে

কত রং কত সরঞ্জাম! অভিনয় করে তার জন্যে সাজ-পোশাকের বাহার কত! রেলগাড়ি এরোপ্লেন বানায়, টুকরো টুকরো লোহা সাজিয়ে ক্রেন তৈরি করে। আরো কত রকম কারিগরি! ঐশ্বর্য অনন্ত। কত পুতুল, কত রকম-বেরকমের খেলা! এসো না খেলবে একটু আমাদের সঙ্গে। এক আছে গাড়ি-গাড়ি খেলা—দৌড়তে হবে এঞ্জিন হয়ে।—আরে দূর, দৌড়ঝাঁপের খেলা ভদ্রলোক খেলে বুঝি! চেয়ারে বসে বসে যা খেলা যায়! কানামাছির বুড়ি হয়ে বসি—ছোঁও দেখি চোখ বুজে কেমন পারো! তা ছুঁয়েই তো দিল প্রায় সকলে। হেরে গেলাম। হেরে গিয়ে তখন জোর করে কোলের উপরে তুলে নিই। তোমরা শুধু মাত্র ছুঁয়েছ, আমি এই ঝাপটে ধরেছি বুকে। শেষ অবধি জিত আমারই, কি বলো? চলো, আর কোথায় যাওয়া যায়, অন্য কি দেখবার আছে?

ছোট হলঘর। ঐ যে অভিনয়ের কথা শুনলেন, তার স্টেজ হল এখানে। থিয়েটার ছাড়া সভাও হয়ে থাকে। স্টেজটুকু বাদ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চেয়ারে বাকি ঘর বোঝাই। সেই চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। দেখাচ্ছে আমাদের কত ছোট। কেউ ফোটো তুলে রাখেনি যে! তা হলে আপনাদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোট্ট এইটুকু হওয়া যায়। ভেবেছিলাম চেয়ার ভেঙে পড়বে। তা নয়, দিব্যি শক্ত। কিংবা হতে পারে, মাথা থেকে জ্ঞানবুদ্ধির আবর্জনা নেমে গিয়ে আমরাই ওজনে হালকা হয়ে গেছি। চেয়ার কেন তবে ভাঙবে?

সে তো হল, বক্তৃতা শুনতে চাই যে একটু। যেইমাত্র বলা বালখিল্য এক বক্তা গটমট করে স্টেজের উপর উঠে গেল। একটু দৃকপাত নেই। ভাবখানা হল এ আর শক্তটা কি—হলে এসে বসে পড়েছ, শোনাতেই হবে যাহোক কিছু। মরীয়া হয়ে দোভাষিকে কাছে টানলাম। বক্তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখছি—কথার মানে না বুঝলে পুরো মজা পাওয়া যাবে না।

'বিদেশী বন্ধুরা, তোমাদের পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। দেশে ফিরে ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে বলো আমাদের কথা। তাদের সঙ্গে ভাব করতে চাই।'

আমরা হলেও এর চেয়ে বেশি কি বলতাম? বক্তৃতার পরে আবার এক আবদার—গান শুনব তোমাদের। তাতে ডরায় বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তানসেন আঁ-আঁ করে তান ধরল। গান হয়ে গেল তো—এবারে কি? নাচ। মস্ত বড় এক ঘরে নিয়ে দাঁড় করাল। ঘুরে ঘুরে নাচছে বাচ্চারা। আনন্দের মেলা। নাচছে, লাফালাফি করছে। এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছি। সাল উসখুস করছে। লোলুপ চোখে একবার নাচিয়ে দলের দিকে তাকায় তার পরে একবার আমার দিকে।

তা যাও না তুমিও নেচে এসো একটু—

এক পা করে এগোয় আর মুখ ফিরিয়ে দেখে আমাকে। হাত নেড়ে খুব স্ফূর্তি দিচ্ছি, যাও—যাও না—

লোভ কতক্ষণ আর সামলানো যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের মধ্যে, চক্ষের পলকে বেমালুম মিশে গেল।

কিন্তু এক পাক হয়েছে কি না। হয়েছে—ছুটে এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে আবার হাত ধরে। নাচলেই হল, ইতিমধ্যেই অপর কেউ দখল করে বসে যদি। আর, সত্যিই তো—কয়েকটা ছেলেমেয়ে সন্দেহজনক ভাবে আমাদের আশে-পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাচের পা কি ওঠে এ অবস্থায়? বলুন।

কষ্ট হল। আহা, সবাই স্ফূর্তি করছে—ও বেচারা পারছে না মনের ধুকপুকানির জন্য। এগিয়ে তখন নাচের একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়াই। এই রইলাম নজরের সামনে। মন খুলে নাচোগে—ভাবনা নেই।

তবু জমে না। নিয়ে চলল এবার মাছ আর শেওলা-ঝাঁঝি দেখাবার ঘরে। কাচের বাক্সে সারি সারি রেখে দিয়েছে। বলে, একটা একটা করে সমস্ত দেখবে। সবগুলোই। (দোভাষি শুনিয়ে দিল হুকুমটা) বাস রে, রাত্রে যে চলে যাবো, সময় কোথা অত? তা কে জানে—দেখতেই হবে। না দেখে ছুটি নেই।

ঘোরা হয়ে এলো। এবারে ইতি। একটুকু মন্তব্য দিতে হবে যে কি রকম দেখলে। সেটা হয়ে গেল তো অটোগ্রাফ। গাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এক এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়—নাম লেখো, আমরা খাতায় সেঁটে রাখব। সাদা কাগজে সই করিয়ে নিচ্ছে, হ্যাণ্ডনোট লিখে নেবে না তো বাপু ঐ নামসইর উপরে? যে চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অত্র তারিখে শ্রীমতী সান য়ুন-লিন দেব্যার নিকট হইতে চলিত সিক্কার এক কোটি ইয়ুয়ান ধার করিয়া লইলাম—

পাঁচ দশটায় সই হতে না হতে গাড়ি ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাত বারোটায় রওনা, সমস্ত নয়-ছয় হয়ে আছে, কখন যে কি হবে—চলুন, চলুন!

(২৫)

আই-চুন হোটেলের করিডরে সকলের মালপত্র এসে জমেছে। সর্বনাশ! চীনের সীমানা অবধি এরা না হয় বয়ে দিল—তারপরে? প্লেনে পুরে এই পর্বত দেশে নিয়ে তুলতে হবে তো!

ভোজে ডাকছে। না, আজকে আর যাবো না। কিচলু এসে তাঁর ভার-বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন—আমি আর কে এখন? এ কয় দিন দায়ে পড়ে ধকল সয়েছি, নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচি রে বাবা! সামান্য কিছু খাবার ঘরে পাঠিয়ে দাও, বসে বসে আমি লিখব। চীনের মাটির উপর শেষ কলম ধরা।

লিখছি। একার জন্য একটি ঘর—কতক্ষণ ধরে লিখে চললাম, হুঁশ নেই। ক্ষিতীশের ঘর পার্লনদীর ঠিক উপরে; ক্লান্ত হয়ে এক সময় তার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নদী দেখছি। কাশ্মীরে গিয়ে হাউস-বোটে ছিলাম, এ নদীতে বিস্তর তেমনি বোট। কিনারায় বেঁধে রয়েছে। বোট স্পষ্ট নজরে আসে না, বোটের উপরের মিটমিটে লণ্ঠনগুলো শুধু। সন্ধ্যার মুখে চাঁদ

দেখেছিলাম, সে চাঁদ কোন বড় বাড়ির আড়ালে চলে গেছে। মাঝে মাঝে স্টিমারের বাঁশি—সার্চলাইটে সাদা হয়ে যাচ্ছে মাঝনদীর জলতরঙ্গ। নৌকোও চলাচল করছে—নৌকো নয়, ভাসমান আলোর কণিকা। আট তলার ঘর থেকে দেখছি, রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে জলের উপর দিয়ে অগণিত তারা ভেসে চলেছে।

ঘরে ফিরে আবার ডায়েরি খুলে বসেছি, দরজায় ঘা পড়ল।

এসো, এসো ভাই—

ইয়ং—পিকিন দোভাষিদলের সর্দার আমাদের সেই ইয়ং। ডক্টর কিচলুর সঙ্গে ভোরবেলা ট্রেনে এসে পৌঁছেছে। আবার তাকে দেখব, ভাবতে পারি নি। কী ভাল যে লাগল পুরানো মানুষ কাছে পেয়ে!

ইয়ং বলে, কিছুই তো খেলেন না! তা শুয়ে পড়ুন এবারে, কত আর লিখবেন?

বারোটায় রওনা—তাই ভাবছিলাম, লিখেই কাটিয়ে দিই সময়টুকু। খাতা-কলম পকেটে পুরে গাড়িতে উঠব।

ইয়ং জেদ ধরল, না—গাড়িতে ঘুম হয় কি না হয়—ঘুমিয়ে নিন এই ঘণ্টা দুই। আমরা জেগে রয়েছি, ঠিক সময়ে তুলে নিয়ে যাবো।

আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইয়ং চলে গেল। এবং রাতদুপুরে ডেকে তুলে মোটরে চাপাল। শহরের ঘরবাড়ি তখন দুয়োর-জানালা এঁটে ঘুমুচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো শুধু অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমনি নিশিরাত্রে আর একদিন চৌরঙ্গি থেকে দমদম-এরোড্রোমের দিকে ছুটছিলাম, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি তখন।

বড় বড় বাড়ির ছায়ায় রহস্যময় জনশূন্য এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে স্টেশনে এলাম। আরে মশায়, শহরের রাস্তায় লোক থাকবে কি—সবাই তো দেখছি স্টেশনে! সাধারণ গাড়ি এখন নেই, আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটা শুধু। শীতার্ত রাত্রে এত মানুষ বিদায় দিতে এসেছে। একদিন এই স্টেশন থেকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, বিদায়-দিনেও ঠিক তেমনি সুবিপুল জনতা।

ঝকঝকে স্পেশ্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে পৌনে একটা। সেই অগণ্য মানুষের হাতে হাত দিয়ে আমরা কামরায় উঠে পড়লাম। প্রতি খোপে দুজনের জায়গা। ব্যবস্থায় তিলপরিমাণ খুঁত নেই। ছেলেমেয়েরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে—এই একেবারে ইঞ্জিন অবধি। বেশির ভাগ মেয়ে—সব কাজে মেয়েরাই বেশি আগুয়ান। প্রথম ঘণ্টা পড়ল, আর চক্ষের পলকে প্রতিটি প্রাণী

গাড়ি থেকে হাত দেড়েক দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে হাত বাড়াচ্ছে শেষবারের ছোঁওয়া ছুঁয়ে নেবে। ট্রেন ছাড়বার মুখে ভিড়ের দরুন দুর্ঘটনা না ঘটে—সেজন্য এই ব্যবস্থা।

ঠিক একটায় গাড়ি ছাড়ল। শত শত কণ্ঠে স্টেশনে মন্দ্রিত হচ্ছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই! আর—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। এত ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে গাড়িও যেন এগুতে পারে না—যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। কামরার আলো এক একবার আনন্দে-টলটল মুখের উপর ঝিলিক হেনে হেনে যাচ্ছে। সে মুখ বলছে—শান্তি...শান্তি···শান্তি—নিখিল ধরিত্রী শান্তিময় হোক।

প্লাটফরম শেষ হল। শেষ হয়ে গেল চকিত-দেখা মুখের পর মুখ। অন্ধকার। জানলায় বসে আছি বাইরে চেয়ে। ফুল দিয়ে গেছে—সবুজ আলোয় কামরা ভরা সুগন্ধ। মাঠ নদী পাহাড় আবছা-আবছা নজরে আসছে। দেখে দেখে দেখে—তার পরে এক সময় শুয়ে পড়লাম। ঘরমুখো ছুটছি, কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দ কই?

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। তোলপাড় করে তীব্রগতিতে ট্রেন ছুটছে। সুবিস্তীর্ণ এক জলাভূমির কিনারা ঘেঁসে ছুটছি। করিডরে বেরিয়ে এসে দেখি উল্টো দিকটায় পাহাড়। ঝরনার জলধারা তারার আলোয় চিকচিক করছে। জানালা ধরে এক তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম, ইসারা করে সে অন্য দিকে যেতে বলল। নিজে এলো পিছু পিছু—বাথরুমের দরজা এসে খুলে দিল। দেখছি, একা সে নয়—দোভাষি ছেলেমেয়ে অনেকেই পাহারা দিচ্ছে দশ-বিশ হাত অন্তর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ক্যান্টন থেকে এই এলাকাটা ভাল নয়, চিয়াং-এর চরের আনাগোনা আছে বলে সন্দেহ। ট্রেনের কামরায় বিদেশি মানুষগুলো বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছে, ওদের চোখে সারা রাত্রির মধ্যে পলক পড়ল না।

সেন-চুনে এসে গাড়ি থেমে দাঁড়াল। তখনো চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ক্ষিতীশ ডাকল, উঠে আসুন। চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক। ডাইনিং-কারে চা সাজিয়ে বসে আছে।

কামরা থেকে নেমে পড়লাম। মুখ-আঁধারি তখনো। শীতও খুব—ওভারকোট ইত্যাদি গায়ে-চড়িয়েও কাঁপুনি যায় না। কতটুকু সময়ই বা আর নতুন-চীনের মাটিতে! ডাইনিংকারে গিয়ে বসেছি। আহা, ছেলে-মেয়েগুলো

রাত জেগেছে···প্রভাত-কুসুমের মতো স্নিগ্ধ মুখে এখন আবার হাতে হাতে চা এগিয়ে দিচ্ছে। কালো পাজামা সাদা শার্ট ও কালো কোর্তায় কি অপরূপ দেখাচ্ছে! এমন আতিথ্য এত সহৃদয়তা কোথায় পাবো ছনিয়ার ভিতর!

ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ, ঝোপে-ঝাড়ে পাখি ডাকছে। দূর পাহাড়ের উপর ছবির মতো ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সীমান্ত পাহারাদার আর রেলকর্মীরা থাকে ঐ সব বাড়িতে। একদল জাতীয় সৈন্য এলো উপর-পাহাড় থেকে। স্টেশন বইয়ের টেবিলগুলো খালি; বই আলমারিতে বন্ধ। কাল যাত্রীদের পড়াশুনো হয়ে যাবার পর যত্ন করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে; পড়বার লোক এত সকালে এখনো এসে জমেনি।

ক্রমে জেগে উঠল চারি দিক। বেরুবার ভিসা দিতে বড় দেরি করছে— সেটা হল ওপারে ব্রিটিশ-এলাকার ব্যাপার। তা হোক, আমাদের তাড়া নেই। ভালই ে া করছে—সীমান্ত-স্টেশনে আরও খানিকটা ওদের সঙ্গে জমিয়ে বসার সময় পাওয়া গেল। আর ক-গজই বা নতুন-চীন—খাল দেখা যাচ্ছে, পুরো খালটাও নয়, খালের মাঝ বরাবর গিয়েই শেষ।

অবশেষে ভিসা এসে গেল। চলি ভাই। পুলের উপরে উঠেছি। ছোট-খাট এক মিছিল—আমরা যাচ্ছি, ওরা আসে পিছনে-পিছনে। পা আর চলে না, চোখ ছল-ছল করছে সকলের। ঘরে চলেছি, না ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি— গতিক দেখে কেউ বুঝবেন না। কুমুদিনী মেহতা আমার পাশে; ধরা-গলায় তিনি বললেন, প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে ঠিক এমনি অবস্থা হয়—কি বলো বোন? ভুলে গেছেন, তার মতন স্ত্রী-জাতীয় নই আমি। পুরুষরা শ্বশুরবাড়ি যায় ড্যাং-ড্যাং করে—চোখ মুছবে তারা কোন্ দুঃখে? এই সব বলে আবহাওয়া একটু হালকা করতে চাই। কিন্তু জমে না, হাসল না কেউ। কাঁটা-তারের বেড়ার মুখে এসে গিয়েছি। কাস্টমসের লোকগুলো অভিবাদন করে পথ ছেড়ে দিল, বোঁচকা-বুঁচকিতে হাতটাও ছোঁয়ায় না। আরে বাপু, তামাম মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমার দেশ থেকে—দেখ হে, নয়ন তুলে চেয়ে দেখ একবার! নয়ন তুলল বটে বলাবলির পর—হাসিমুখে আর একবার নমস্কার করল।

পুলের আধখানা অবধি এদের যাওয়ার এক্তিয়ার। সেই অবধি এসে দাঁড়িয়েছি। মেয়েরা হাত জড়িয়ে ধরছে এক এক করে। ছেলেরা বুকের মধ্যে লুকে নিচ্ছে। ছেড়ে দেবে না, কিছুতে ছাড়বে না। এই একবার হয়ে গেল তো আবার। গান ধরল ক্ষিতীশ। সকলের মুখে গান। বন্ধু, তোমাদের ছেড়ে যেতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে—ঘুরে-ফিরে এই এক গানের কথা! গান আর কোথায়—তানকর্তব গিয়ে এখন তো কান্নায় দাঁড়িয়েছে। পরশু রাতের সেই যে বক্তৃতা—এসেছিল বিদেশি হয়ে, চলে যাবার মুখে অশ্রুতে

কণ্ঠরোধ হচ্ছে—আর সেটা সাহিত্যিকের অতিশয়োক্তি রইল না। তাকিয়ে দেখুন, চোখে-চোখে জল। এই নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাশা করব—তবে তো নিজের চোখ দুটোও শুকনো রাখতে হয়। সেটা বড় মুশকিল।

পুল পার হয়ে ভিন্ন পারের মাটি ছুঁয়েছি। আর ওদের আসবার জো নেই। দূরত্ব নগণ্য, কিন্তু ব্যবধান অতি-দুস্তর। এখানে আর এক জগৎ। গান চলছে দু-দিক দিয়ে অবিশ্রান্ত। হাত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—গান আমাদের এক করে রেখেছে। হাওয়ায় ভেসে গানের সুর এপার-ওপার করছে—তাতে প্যাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। আরও এগিয়ে গেলাম। চেহারাগুলো অদৃশ্য—শুধু ঐ গান। গানও শেষে বন্ধ হয়ে গেল।

লাউ-হু স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসেছি। ওদিককার কিছুই আর নজরে আসে না। হঠাৎ দেখা যায়, টিবি মতন একটা জায়গায় ওরা উঠে পড়েছে—রুমাল নাড়ছে সেখান থেকে। আমাদের ক'জন স্টেশনের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন, খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরুলেন। দু'দিক দিয়ে উড়ছে রুমাল। উড়ন্ত শান্তির পারাবত পাখা নড়ছে এপারে-ওপারে। প্রশান্ত হিমপ্রভাতে, দেখ দেখ কত পাখির নিঃশব্দ কাকলী।

ওয়েটিংরুমে ঢুকেই, কী সর্বনাশ, বিদ্যুতের শক খেলাম যেন। এক তরুণী কোথায় যাবে, গাড়ির অপেক্ষা করছে। পোশাক-আশাক নিরতিশয় স্বল্প। অন্যমনস্ক মানুষের তবুও যদি নজর এড়িয়ে যায়, সেই কয় টুকরো কাপড়ে রামধনুর মতো রঙের বাহার। ছাত্রেরা পাঠ্য-বইয়ের দরকারি জায়গায় জায়গায় লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখে, মেয়েটার উপরেও তেমন যেন রঙিন ডোরা কাটা। একটা ইংরেজি বইয়ের নাম মনে এলো হঠাৎ—ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন, কুমায়ুনের মানুষখেগো বাঘ। কিন্তু কোথায় কুমায়ুন পর্বত আর কোথায় বা—উঁহু, ডোরাকাটা বাঘের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। এ-ও এক চীনা মেয়ে—কিন্তু এতদিন ধরে চীন ঘুরলাম, একটা মেয়েরও এমন বেশরম বদরুচি পোশাক দেখতে পাইনি।

ওয়েটিংরুমে হল না তো প্লাটফরমের শেষ দিকে গাছতলার এক বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সিগারেট ধরিয়েছি। কালেভদ্রে কদাচিৎ ধোঁয়া খাই। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট আপনি পুড়ছে। উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে মালুম হল, পুড়তে পুড়তে গোড়ায় এসে ঠেকেছে। পোড়া সিগারেটের টুকরো নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। তাই তো কোথায় ফেলি? কোথায়, কোথায়? ফেলবার জায়গা পাইনে তো—

সহযাত্রীর নজরে পড়েছে। বললেন, হংকঙের এলাকা—যেখানে খুশী ফেলে দাও। বিলকুল ডাস্টবিন—

যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠি। নতুন-চীন পার হয়ে এসেছি—অবাধ-স্বাধীনতা। পোড়া সিগারেট প্লাটফরমের উপর ফেলে জুতোর তলায় পিষে দিলাম।

শেষ